নাট্যরসিক অধ্যাপক

ডক্টর শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র লাহিড়ী

এম. এ., পি-এইচ্. ডি. (লণ্ডন)

মহোদয় শ্রীচরণেষু—

সূচী

বিষয় | পৃষ্ঠা

আধুনিক যুগ
(১৯০০ - ১৯৬০)

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়

নবম অধ্যায়

পরিশিষ্ট—ক

পরিশিষ্ট—খ

বাংলা
নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস

দ্বিতীয় খণ্ড

আধুনিক যুগ

(১৯০১—১৯৪৭)

স্বদেশী আন্দোলন হইতে স্বাধীনতা লাভ পর্যন্ত

সূচনা

যে দেশাত্মবোধ অবলম্বন করিয়া খ্রীষ্টীয় বিংশতি শতাব্দীর প্রথম দশকের প্রথম ভাগেই বাংলাদেশে স্বদেশী আন্দোলনের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, তাহার ভাব উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ হইতেই এই জাতির মনে ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। বিংশতি শতাব্দীর প্রারম্ভেই এই ভাবটি যখন অনেকটা পরিণতি লাভ করিল, তখনই স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যে ইহার পরিচয়টি বাহিরে প্রকাশ পাইল। অতএব বাংলার স্বদেশী আন্দোলন কোন একটা আকস্মিক উত্তেজনা-জাত গণ-আন্দোলন মাত্র ছিল না, জাতির সুদীর্ঘ তপস্যার শক্তি ইহার মধ্যে সঞ্চিত হইয়াছিল। সেইজন্য ইহার ক্রিয়া বহুমুখী ও সুদূর-প্রসারী হইয়াছে।

বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগের তুলনায় নাট্যসাহিত্য বিভাগেই ইহার প্রভাব সর্বাপেক্ষা প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল। নবযুগের নূতন চৈতন্যে উদ্বুদ্ধ হইয়া সে যুগে যেমন প্রতিভাশালী নাট্যকারের আবির্ভাব হইয়াছিল, তেমনই প্রাচীন যুগের যে সকল নাট্যকার সেই যুগ পর্যন্ত আসিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহারাও নূতন যুগের প্রভাব স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইহার ফলে বিংশতি শতাব্দীর প্রথম দশক হইতেই বাংলার নাট্যসাহিত্য ইহার মধ্যযুগের ধারা পরিত্যাগ করিয়া নূতন ধারায় অগ্রসর হইতে লাগিল—বাংলা নাট্যসাহিত্যের আধুনিক যুগের এখানেই সূত্রপাত হইল।

উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার প্রথম সংস্পর্শে আসিবার ফলে যে বাঙ্গালী পাশ্চাত্ত্য জাতির কেবলমাত্র আপাতরমণীয় দোষত্রুটিগুলিই অনুকরণ করিয়া সমাজের নিন্দাভাজন হইয়াছিল, বিংশতি শতাব্দীর প্রথম হইতেই তাহার সে মোহ কাটিয়া গিয়া পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার গুণগুলির প্রতিও তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল—দেশ ও দশের সেবার জন্য বাঙ্গালীর

আত্মোৎসর্গের প্রেরণা তাহা হইতেই আসিয়াছিল। অতএব সামাজিক প্রহসন রচনার যে একটি বিশিষ্ট ধারা বাংলা নাট্যসাহিত্যের আদি যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্যযুগের শেষ পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া আসিয়াছিল, বিংশতি শতাব্দীর প্রথম হইতেই তাহার গতি হ্রাস পাইয়া গেল। উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজি-শিক্ষিত যে নব্য বাঙ্গালী সম্প্রদায় নৈতিক অধঃপতনের শেষ স্তরে গিয়া পৌছিয়াছিল, তাহাদেরই বংশধরগণ বিংশ শতাব্দীতে উত্তীর্ণ হইয়া পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সর্ববিধ মোহ কাটাইয়া উঠিয়া স্বদেশীয় সমাজকেই নূতন আদর্শে পুনর্গঠন করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিল। তখন হইতেই সমাজের জন্য মানুষ নহে, মানুষের জন্যই সমাজের স্থান নির্ণীত হইল। এই আদর্শ অবলম্বন করিয়া সামাজিক প্রহসন বা নক্সা রচনার পরিবর্তে এই যুগে যথার্থ সামাজিক নাটক রচনার প্রয়াস দেখা দিল। স্বদেশী যুগের আত্মোৎসর্গের মধ্য দিয়া বাঙ্গালী তাহার সমাজ ও ব্যক্তিজীবনের গুরুতর দিকটিরও যে সন্ধান লাভ করিয়াছিল, এ যুগের নাট্যসাহিত্যে তাহারও পরিচয় প্রকাশ পাইতে লাগিল।

স্বদেশী আন্দোলন যতদিন স্থায়ী ছিল, ততদিন পর্যন্ত সাধারণতঃ নাট্যসাহিত্যের মধ্যে বাংলার সমাজ-জীবন ততখানি প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতে পারে নাই। তখন ভারতীয় ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়া তাহার মধ্যে আধুনিক পাশ্চাত্ত্য দেশাত্মবোধের ভাব আরোপ করিয়া লইয়া নাটক রচনা করা হইত। ইহাদিগকে প্রকৃত ঐতিহাসিক নাটক বলা যায় না; কারণ, ঐতিহাসিক তথ্য পরিবেষণ অপেক্ষা বিশিষ্ট একটি আধুনিক মনোভাব প্রচারই ইহাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল। এই দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে ইহাদিগকে রোমান্টিক নাটক বলিয়াই উল্লেখ করিতে হয়। কিন্তু ঐতিহাসিক পটভূমিকা ইহাদের মধ্যে ব্যবহৃত হইত বলিয়া ইহারা সহজেই ঐতিহাসিক নাটক বলিয়া দর্শকের ভ্রান্তি উৎপাদন করিতে পারিত। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত হইতেই এই শ্রেণীর নাট্যরচনা লইয়াই বাংলা নাট্যসাহিত্যের নবযুগের সূচনা হয়। স্বদেশী যুগের অবসানে এই শ্রেণীর নাটক রচনার প্রেরণা যখন লুপ্ত হইয়া যায়, তখনই নূতন আদর্শে উদ্বুদ্ধ সামাজিক নাটক রচনার প্রেরণা দেখা দেয়। এই নূতন নাটকের মধ্যে পূর্ববর্তী যুগের মত সামাজিক দোষত্রুটির চিত্র অঙ্কিত হইত না, বরং তাহার পরিবর্তে সমাজের মধ্যে ব্যক্তির দাবী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা থাকিত।

বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ প্রধানতঃ রোমান্টিক যুগ। আমি আধুনিক যুগ বলিতে ইহাকে অতি-আধুনিক বা সাম্প্রতিক যুগ হইতে পৃথক্ করিতেছি। রোমান্টিকতার প্রভাবের ফলেই আধুনিক বাংলা কাব্যসাহিত্য বিচিত্র ও সমৃদ্ধ হইয়াছে। কাব্যের ক্ষেত্র হইতে এই যুগে রোমান্টিকতার প্রভাব নাটকের ক্ষেত্রেও বিস্তার লাভ করিয়াছিল। কিন্তু নাটকের বাস্তবমুখীনতার যে একটি বিশিষ্ট ধর্ম আছে, তাহা ইহার রোমান্টিক ধর্মের সঙ্গে যোগ রক্ষা করিয়া চলিতে পারিল না; কারণ, ইহাদের পরস্পরের মধ্যে বিরোধ আছে। বাংলা নাট্যসাহিত্যের আধুনিক যুগে রোমান্টিকতার মূলে বাংলা নাটকের বাস্তবধর্ম বিসর্জিত হইয়াছে। পূর্বেই বলিয়াছি, এই যুগে যে ঐতিহাসিক নাটক রচিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে নাট্যকার সম্পূর্ণ আত্মনির্লিপ্ত থাকিয়া ঐতিহাসিক তথ্য পরিবেশন ও ঐতিহাসিক চরিত্র সৃষ্টি করিতে সফলকাম হন নাই, বরং তাহাদের পরিবর্তে ইহাদের মধ্যে নাট্যকারের বিশিষ্ট মনোভাবের অভিব্যক্তি হইয়াছে। এই যুগের পৌরাণিক নাটকগুলিও ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা পৌরাণিক নাটকের মত নিজেদের বস্তুধর্ম রক্ষা করিতে পারে নাই। সে-যুগের পৌরাণিক নাটকের মূল সুর ছিল ভক্তি ও আত্মসমর্পণ, বিংশ শতাব্দীতে অহৈতুকী ভক্তি ও নির্বিচার আত্মসমর্পণের আদর্শ সমাজ হইতে বহুলাংশে বিদূরিত হইয়া গিয়া তাহার স্থলে যুক্তিবাদের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল; সেইজন্য এই যুগের পৌরাণিক নাটকের মধ্যেও তাহার পরিবর্তে আধুনিক যুক্তিবাদেরই প্রতিষ্ঠা দেখা দিয়াছিল। বাংলা নাট্যসাহিত্যের মধ্যযুগ পৌরাণিক নাটকের স্বর্ণযুগ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছি; কিন্তু ইহার আধুনিক যুগে পৌরাণিক বিষয়-বস্তু অবলম্বন করিয়া নাটক রচনার প্রবৃত্তি যেমন হ্রাস পাইয়াছিল, তেমনই ইহা বহুলাংশেই নাট্যকারের ব্যক্তিগত মনোভাবের বাহন ছিল বলিয়া ইহাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হইতেও বঞ্চিত হইয়াছিল। পূর্ববর্তী যুগে পৌরাণিক নাটকই সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ছিল, কিন্তু এই যুগে ইহাই জনপ্রিয়তা হইতে সর্বাধিক বঞ্চিত হইয়াছে। আধুনিক যুগের সূচনায় ঐতিহাসিক লক্ষণাক্রান্ত রোমান্টিক নাটকগুলি জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল, কিন্তু ক্রমে সামাজিক ও পারিবারিক সমস্যামূলক নাটকগুলি অধিকতর জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। এক কথায় বলিতে গেলে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা নাট্যসাহিত্য ভক্তিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, বিংশ শতাব্দীর নাট্যসাহিত্য জ্ঞানবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে অলৌকিকতা বাংলা

নাটকের প্রধান অবলম্বন ছিল। বিংশ শতাব্দীর সূচনাতেই বাঙ্গালী যে কঠিন এক বাস্তব সংগ্রামের সম্মুখীন হইয়াছিল, তাহার ফলেই তাহার সকল অলৌকিকতাবোধ লুপ্ত হইয়া গিয়া তাহার স্থলে কঠিন ও বাস্তব জীবন-বোধের বিকাশ হইয়াছে। তারপর ক্রমে জাতির অর্থনৈতিক জীবন-সংগ্রাম যতই কঠিন হইয়া আসিতেছে, ততই তাহার মধ্যে কঠিনতর বাস্তববোধের বিকাশ হইতেছে—এ যুগের নাট্যসাহিত্যের মধ্যে তাহার পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। আধুনিক যুগ হইতে অতি-আধুনিক যুগে বাংলা নাটক ক্রমে রোমান্টিক ভাব হইতে মুক্ত হইয়া পরিপূর্ণ বাস্তবের দিকে অগ্রসর হইতেছে। বাংলা নাট্যসাহিত্যের মধ্যযুগ পর্যন্ত অনুবাদমূলক নাট্যরচনার যে ধারাটি অগ্রসর হইয়া আসিয়াছিল, নূতন নূতন মৌলিক বিষয়বস্তু লাভ করিবার ফলে বিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতেই তাহা সম্পূর্ণ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। বাংলা নাট্যসাহিত্যের আধুনিক যুগের ইহা অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।

পূর্বেই বলিয়াছি, বাংলা নাট্যসাহিত্যের ক্রমবিকাশের ধারার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কোন যোগ নাই। কিন্তু নাট্যরচনায় রবীন্দ্রনাথের যে বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা বাংলা নাট্যসাহিত্যের আধুনিক যুগেরই লক্ষণ, মধ্যযুগের লক্ষণ নহে—সেইজন্য রবীন্দ্রনাথকে পরিপূর্ণ এ যুগেরই প্রতিনিধি বলিয়া নির্দেশ করিতে পারা যায়। রবীন্দ্রনাথের নাটকে মানবপ্রীতি ও মর্ত্য-মমতার যে পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা নবযুগের নবপ্রবুদ্ধ সমাজচৈতন্য ও দেশাত্মবোধেরই ফল ; তাঁহার নাটকে সংস্কার-মুক্তির যে আনন্দ বিচ্ছুরিত হইয়াছে, তাহা বিংশ শতাব্দীর সর্ববিধ সামাজিক মুক্তিসংগ্রামেরই জয়োল্লাস মাত্র। অতএব রবীন্দ্রনাথের সাধনা আত্মকেন্দ্রিক হইলেও, আধুনিক যুগের সমাজচৈতন্যের সঙ্গে ইহার যোগ বিচ্ছিন্ন হয় নাই।

আধুনিক বাংলা কথা-সাহিত্যে যেমন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, নাট্যসাহিত্যেও তাহার সূচনা দেখা দিয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় যে সকল সামাজিক সমস্যা দেখা দিয়াছিল, বিংশ শতাব্দীতে সে সকল সমস্যা আর নাই—তাহা হয় মিটিয়াছে, নতুবা ইহাদের পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া লইয়াছে। সেইজন্য বহুবিবাহ, বিধবা-বিবাহ, পণ-প্রথা, মদ্যপান, লাম্পট্য ইত্যাদি অবলম্বন করিয়া আর কোন নাটক রচিত হইবার আবশ্যকতা লুপ্ত হইয়াছে, ইহাদের পরিবর্তে সামাজিক নাটক নূতন বিষয়-বস্তুর সন্ধান

পাইয়াছে—তাহাই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দাবী ; সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের মধ্যে ব্যক্তিগত সুখদুঃখ, অভাব-অভিযোগ বোধের উপরই ইহার প্রতিষ্ঠা। অতি-আধুনিক নাট্যসাহিত্যে ইহা লইয়াই নানা দিক হইতে বিচার আরম্ভ হইয়াছে, রঙ্গমঞ্চের পটভূমিকা গৌণ হইয়া পড়িয়া ইহার চরিত্রগুলিই আজ ইহাদের মধ্যে মুখ্য হইয়া উঠিয়াছে। এই সূত্রেই আধুনিক যুগকেও দুইটি ভাগে ভাগ করা যায়, একটি আধুনিক ও অপরটি অতি-আধুনিক বা সাম্প্রতিক যুগ।

সাম্প্রতিক যুগের আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে মধ্য যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র আধুনিক যুগ ব্যাপিয়া বাংলা নাটক ও ইহার অভিনয়ের ক্ষেত্রে যে রোমান্টিকতার অবাধ অধিকার স্থাপিত হইয়াছিল, তাহার সঙ্গে ইহাতেই প্রথম বিচ্ছেদ সৃষ্টি হইয়াছে। যদিও স্থূলভাবে স্বাধীনতা লাভের সময় পর্যন্তই আধুনিক যুগের সীমা নির্দেশ করা যায়, তথাপি এ কথা সত্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নগ্ন রূপ বাংলাদেশের উপর অনাবৃত হইয়া পড়িবার সময় হইতেই বাংলা নাট্যসাহিত্য আধুনিক যুগ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়া সাম্প্রতিক যুগে প্রবেশ করিয়াছে। স্বাধীনতা লাভের পূর্বেই বাংলা দেশের বুকের উপর দিয়া মনুষ্যেরই নিষ্ঠুরতার ফলে যে লোকক্ষয়কারী দুর্ভিক্ষের অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে, তাহা হইতেই বাংলার সমাজ মানুষের জীবন সম্পর্কে নূতন মূল্যায়ন আরম্ভ হইয়াছিল। দীর্ঘকাল যাবৎ মানুষ ও তাহার সুখদুঃখ, স্নেহ ও ধর্ম বোধ সম্পর্কে এ জাতির যে সংস্কার ও বিশ্বাস গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা তখন সেই দুর্যোগের মুখে ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে। মানুষ, মনুষ্যত্ব ও মনুষ্যধর্ম সম্পর্কে তখন যে নূতন চেতনা জাগ্রত হয়, তাহাই সাম্প্রতিক নাটকের পটভূমিকা রচনা করিয়াছে। এই জন্য ইহা আধুনিক যুগ হইতে স্বতন্ত্র।

প্রথম অধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১৮৮১—১৯৩৯)

জোড়াসাঁকো ও শান্তিনিকেতনে নাট্যাভিনয়

কলিকাতার ঠাকুর পরিবারকে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের সকল প্রকার সংস্কৃতি-মূলক অনুষ্ঠানেরই অগ্রদূত বলিয়া নির্দেশ করা হইয়া থাকে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে কলিকাতায় যখন ইংরেজি রঙ্গমঞ্চের অনুকরণে বাঙ্গালী কর্তৃক সর্বপ্রথম বাংলা নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত হয়, তখন হইতেই ইহার সহিত ঠাকুর পরিবারেরও সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে কলিকাতায় প্রসন্নকুমার ঠাকুরের নেতৃত্বে ইংরেজি-শিক্ষিত নব্যবাঙ্গালী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রথম নাট্যশালার দ্বারোদ্ঘাটন হয়। বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাসে ইহা একটি স্মরণীয় ঘটনা।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যম ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা গিরীন্দ্রনাথ ও নগেন্দ্রনাথ এই ব্যাপারে যথেষ্ট উৎসাহী ছিলেন। কেবলমাত্র নাট্যাভিনয়েই নয়, নাট্যরচনাতেও গিরীন্দ্রনাথের উৎসাহের পরিচয় পাওয়া যায়। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার সম্পর্কে লিখিয়াছেন, "মেজকাকা 'বাবুবিলাস' নামে একটি নাটক রচনা করেছিলেন, একবার তার অভিনয় হয়েছিল। তাঁহার মোসাহেবদের মধ্যে দীননাথ ঘোষাল বলে একটি চালাক চতুর লোক ছিল, সে-ই 'বাবু' সেজেছিল। অভিনয় কি রকম ওত্‌রাল বিশেষ কিছু বল্‌তে পারি না। আমরা ত আর সে মজ্‌লিসে আসন পাইনি, উঁকিঝুঁকি দিয়ে যা কিছু দেখা ('ভারতী'—আশ্বিন ১৩১৯, পৃঃ ৩৪৬)"। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি নাট্যশালা প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হইয়াছিলেন বলিয়া জানিতে পারা যায়। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বর তারিখের 'দি ন্যাশানাল পেপার' নামক একটি ইংরেজি পত্রিকায় সম্পাদক নবগোপাল মিত্র মহাশয় এ দেশের নাট্যশালার উৎপত্তি সম্পর্কে এক প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন—

The first project of the kind was contemplated by the late Hon'ble Baboo Prósonno Coomar Tagore. The next

attempt of the kind was made by Baboo Nobin Chandra Bose, of Shambazar. The theatre got up by him was of a high order. The play of Bidya Shoondur was enacted in it. The third attempt of the kind was made by the late Baboo Nagendra Nath Tagore. He was very successful in his attempt.

মনে হয়, ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দ কিংবা তাহার নিকটবর্তী কোন সময়ে নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর কলিকাতায় কোন নাট্যশালা প্রতিষ্ঠায় বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছিলেন। এই নাট্যশালার বিস্তৃত কোন পরিচয় পাওয়া না গেলেও মনে হয়, ইহা জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতেই প্রতিষ্ঠিত ছিল।

গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দুই পুত্র গণেন্দ্রনাথ ও গুণেন্দ্রনাথ বাল্যকাল হইতেই পিতার ন্যায় নাট্যাভিনয়ে উৎসাহশীল ছিলেন—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথও তখন নবীন যুবক, বয়ঃকনিষ্ঠ হইলেও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই বিষয়ে সর্বাপেক্ষা উৎসাহী ছিলেন। ইঁহাদের সমবেত চেষ্টায় ঠাকুর-বাড়ীতে একটি ক্ষুদ্র নাট্যসম্প্রদায় গড়িয়া উঠিল। বাহির হইতে যাহারা এই পরিবারের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, তাহাদিগের মধ্যে প্রকৃত প্রতিভাবান্ কয়েকজনকে লইয়া এই ক্ষুদ্র নাট্যসম্প্রদায়টি ক্রমে বৃহত্তর পরিকল্পনার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। অভিনয়ের আয়োজন, নাট্যনির্বাচন প্রভৃতি কার্যের জন্য পাঁচজনকে লইয়া একটি 'কমিটি অব্ ফাইভ' গঠিত হইল—এই পাঁচজন সদস্যের নাম, কৃষ্ণবিহারী সেন, গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, কবি অক্ষয় চৌধুরী এবং যদুনাথ মুখোপাধ্যায়। কৃষ্ণবিহারী সেন কেশবচন্দ্র সেনের ভ্রাতা এবং যদুনাথ মুখোপাধ্যায় দেবেন্দ্রনাথের জামাতা। ইঁহাদের মধ্যে কৃষ্ণবিহারী সেন অভিনয়-শিক্ষক ছিলেন। এইভাবে জোড়াসাঁকো নাট্যশালার ভিত্তি স্থাপিত হইল।

ঠাকুরবাড়ীতে যখন এই নাট্যশালার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনই ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ ভূমিষ্ঠ হন। জোড়াসাঁকো নাট্যশালায় মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক সর্বপ্রথম অভিনীত হয়, ইহার কিছুদিন পরই মধুসূদনের প্রহসন 'একেই কি বলে সভ্যতা'র অভিনয় হয়। ঠাকুরবাড়ীতে যখন এই নাটক দুইটির অভিনয় হয়, তখন রবীন্দ্রনাথ নিতান্ত শিশু—জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কৈশোর উত্তীর্ণ হইয়াছে মাত্র, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই দুই

অভিনয়েই অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি 'কৃষ্ণকুমারী নাটক'-এর অভিনয়ে কৃষ্ণকুমারীর মাতা ও 'একেই কি বলে সভ্যতা'র অভিনয়ে সার্জনের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

জোড়াসাঁকো নাট্যশালায় এই দুইটি নাটক অভিনীত হইবার পর উদ্যোক্তারা অভিনয়যোগ্য নূতন নাটকের অভাব অনুভব করিতে লাগিলেন। অভিনয়ের ভিতর দিয়া লোকশিক্ষা প্রচার তাঁহাদের অন্যতম উদ্দেশ্য হইল, কিন্তু তাহার উপযোগী নাটক বাংলাভাষায় তখনও বিশেষ ছিল না। সেইজন্য নূতন নাটক রচনা করাইবার জন্য তাঁহারা ব্যবস্থা করিতে উদ্যোগী হইলেন। তাঁহারা ঠাকুরবাড়ীর গৃহশিক্ষক স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র নন্দীকে সামাজিক নাটক রচনার উপযোগী বিষয় নির্বাচন করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন; ঈশ্বরচন্দ্র নন্দী ওরিয়্যাণ্টাল সেমিনারীর প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তিনি বিষয় নির্বাচন করিয়া দিলে ১৮৬৫ সালে জোড়াসাঁকো নাট্যশালার উদ্যোক্তারা বহুবিবাহ-বিষয়ক একখানি উৎকৃষ্ট নাটকের জন্য দুইশত টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিয়া সংবাদপত্রে এক বিজ্ঞাপন প্রচার করিলেন। অতঃপর বিজ্ঞাপনটি প্রত্যাহার করিয়া রামনারায়ণ তর্করত্নের উপর এই বিষয়ক একখানি নাট্যরচনার ভার দেওয়া হইল। ইতিপূর্বে ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে রামনারায়ণের সুপ্রসিদ্ধ সামাজিক নাটক 'কুলীন-কুল-সর্বস্ব' প্রকাশিত হয়। তাহা দ্বারাই নাট্যকার হিসাবে তাঁহার খ্যাতি কলিকাতার সুধীসমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সেইজন্যই জোড়াসাঁকোর নাট্যসম্প্রদায় তাঁহাকেই এই কার্যের ভার দিলেন।

রামনারায়ণের উপর বহুবিবাহ-বিষয়ক একখানি সামাজিক নাট্যরচনার ভার দিয়াও জোড়াসাঁকো নাট্যশালার উৎসাহী উদ্যোক্তারা আরও দুইখানি স্বতন্ত্র বিষয়ক সামাজিক নাটকের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করিয়া সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রচার করিতে থাকেন। তাহাদের মধ্যে 'হিন্দুমহিলাগণের দুরবস্থা' বিষয়ক একটি নাটকের জন্য দুইশত টাকা ও 'পল্লীগ্রামের জমিদার' বিষয়ক আর একটি নাটকের জন্য একশত টাকা পুরস্কার ঘোষিত হয়। পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্নের উপর যে নাটকখানি রচনার ভার দেওয়া হয়, তাহা অল্পদিনের মধ্যেই রচিত হয়। নাটকখানির নাম 'নব-নাটক'। 'নব-নাটক' ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়; এই নাটক রচনার জন্য জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-বাড়ীতে এক বিশেষ সভার অনুষ্ঠান করিয়া ইহার নাট্যকার রামনারায়ণকে

দুইশত টাকা পারিতোষিক প্রদান করা হয়। সুপরিচিত সাহিত্যিক প্যারীচাঁদ মিত্র এই সভায় সভাপতিত্ব করেন।

জোড়াসাঁকোর নাট্যশালায় 'নব-নাটক' অভিনীত হইবার আয়োজন হইতে লাগিল। ঠাকুর পরিবারের মধ্যে যাঁহারা বয়োজ্যেষ্ঠ বা 'বড়'র দল, তাঁহারাই অভিনয়ের আয়োজন করিতে লাগিলেন। 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতিতে' এই সম্পর্কে যাহা উল্লেখিত হইয়াছে, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল। ..."বড়র দলই অভিনয়ের আয়োজন করিতে লাগিলেন। দোতালার হলের ঘরে স্টেজ বাঁধা হইল। তারপর পটুয়ারা আসিয়া 'সীন' (scene) আঁকিতে আরম্ভ করিল। 'ড্রপ-সীনে' রাজস্থানের ভীমসিংহের সরোবর-তটস্থ 'জগ-মন্দির' প্রাসাদ অঙ্কিত হইল। নাট্যোল্লিখিত পাত্রগুলির পাঠ আমাদের সবাইকে বিলি করিয়া দেওয়া হইল। আমি হইলাম নটী, আমার জ্যেঠতুত ভগিনীপতি নীলকমল মুখোপাধ্যায় সাজিলেন নট, আমার নিজের আর এক ভগিনীপতি ৺যদুনাথ মুখোপাধ্যায় চিত্ততোষ, আর এক ভগিনীপতি ৺সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় হইলেন গবেশবাবুর বড স্ত্রী। সুপ্রসিদ্ধ কমিক অক্ষয় মজুমদার লইলেন গবেশবাবুর পাঠ। বাকী আমাদের অন্যান্য আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবের জন্য নির্দিষ্ট হইল।" (পৃঃ ১০৪)

ছয়মাস কাল ব্যাপিয়া এই অভিনয়ের জন্য দিনে রিহার্সাল ও রাত্রে 'বিবিধ যন্ত্রসহকারে কন্‌সার্টের মহলা' চলিয়াছিল বলিয়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথ উল্লেখ করিয়াছেন। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই জানুয়ারী অভিনয়ের দিন স্থির হয়। কলিকাতার বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হইয়া এই অভিনয় দর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে লর্ড ল্যান্সডাউন ও তাঁহার পত্নীও উপস্থিত ছিলেন বলিয়া জানিতে পারা যায়। নাট্যকার রামনারায়ণও অভিনয়ের সময় উপস্থিত ছিলেন এবং স্বরচিত নাটকের অভিনয়ের সাফল্যে উচ্ছ্বসিত হইয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। অভিনয়ও সর্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য উদ্যোক্তারা যত্নের কোন ত্রুটি করেন নাই। এই সম্পর্কে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁহার 'জীবন-স্মৃতিতে' লিখিয়াছেন,—

"তখনকার শ্রেষ্ঠ পটুয়াদিগের দ্বারা দৃশ্যগুলি অঙ্কিত হইয়াছিল। স্টেজও যতদূর সাধ্য সুদৃশ্য ও সুন্দর করিয়া সাজান হইয়াছিল। দৃশ্যগুলিকে বাস্তব করিতে যতদূর সম্ভব চেষ্টার কোন ত্রুটি করা হয় নাই। বনদৃশ্যের সীনখানিকে নানাবিধ তরুলতা এবং তাহাতে জীবন্ত জোনাকী পোকা আটা দিয়া জুড়িয়া

অতি সুন্দর এবং সুশোভন করা হইয়াছিল। দেখিলে ঠিক সত্যিকারের বনের মতই মনে হইত।" (পৃঃ ১০৮)

নাটকের অভিনয়ও আশানুরূপ সাফল্য লাভ করিয়াছিল। সমসাময়িক সংবাদপত্রসমূহে এই অভিনয় সম্পর্কে যে মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা হইতেই ইহা বুঝিতে পারা যায়। জোড়াসাঁকোর নাট্যশালায় উপর্যুপরি নয়বার এই 'নব-নাটক'-এর অভিনয় হয়। প্রথমবারের অভিনয়ের সময় রবীন্দ্রনাথের বয়স ছিল মাত্র ছয় বৎসর। এই অভিনয়ের কথা তাঁহার স্মরণ ছিল।

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দেই জোড়াসাঁকোর নাট্যশালা 'বিগতজীবন' হয় বলিয়া জানিতে পারা যায় এবং এই সঙ্গেই ঠাকুরবাড়ীর নাট্যাভিনয়ের প্রথম পর্ব সমাপ্ত হয়।

রবীন্দ্রনাথকে লইয়াই জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীব নাট্যাভিনয়ের দ্বিতীয় পর্বের সূত্রপাত হয়, এই দ্বিতীয় পর্বের ইতিহাস প্রথম পর্ব হইতে অনেক বিষয়েই স্বতন্ত্র। জোড়াসাঁকো নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক প্রেরণা বাহির হইতে আসিয়াছিল, ইহার কৃতিত্ব ও সাফল্য বাহিরের উপকরণের উপরই অনেকখানি নির্ভর করিয়াছিল; সেইজন্যই ইহাকে অধিককাল রক্ষা করা সম্ভব হয় নাই; কিন্তু দ্বিতীয় পর্বের প্রথম ভিত্তিই ঠাকুরবাড়ীর নিজস্ব উপাদানের উপর স্থাপিত হইয়াছিল, ইহার অস্তিত্বের জন্য তখন হইতে আর বাহিরের কোন উপকরণের উপর নির্ভর করিতে হয় নাই, সেইজন্যই ইহা দীর্ঘ স্থায়িত্ব লাভ কবিয়া এ দেশের নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে ইহার নিজের বৈশিষ্ট্য কার্যকরী ভাবে প্রমাণ করিয়া গিয়াছে। এই দ্বিতীয় পর্বের আনুপূর্বিক ইতিহাস ঠাকুর পরিবারের প্রধানতঃ রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব কৃষ্টিমূলক আদর্শ দ্বারা গঠিত হইয়াছিল।

জোড়াসাঁকোর নাট্যশালার প্রথম পর্বের ইতিহাসের আলোচনা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, রবীন্দ্রনাথ প্রকৃত কি আবহাওয়ার মধ্য দিয়া বাল্যকাল হইতেই গড়িয়া উঠিতেছিলেন। কেবল নাট্যাভিনয়ের প্রতিই অনুরাগ নহে, সাহিত্য ও সঙ্গীতানুরাগও ঠাকুর পরিবারের বিশিষ্ট কৌলিক ধর্ম ছিল। ইহাদের মধ্য দিয়াই রবীন্দ্রনাথের প্রথম সাহিত্য-সাধনার সূত্রপাত হয়। রবীন্দ্রনাথ যখন অপরিণতবয়স্ক বালক, তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ পূর্ণ যুবক, তাঁহার যুব-মন কাব্যের ভাব-বিলাসিতায় বিভোর। তখন তিনি 'স্বপ্ন-প্রয়াণ' কাব্য রচনা করিতেছিলেন। তাঁহার

ভাব-বিলাসিতা বালক রবীন্দ্রনাথের কবিমনকে স্পর্শ না করিয়া পারিল না,—এই কাব্যের স্বপ্নবিলাসিতার পার্শ্বেই ঠাকুরবাড়ীর সঙ্গীতের সুরপুরী গড়িয়া উঠিতেছিল। ব্রাহ্ম সমাজে সঙ্গীত ধর্মানুষ্ঠানের অঙ্গ বলিয়া গৃহীত হয়—সেইজন্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের উৎসাহে ঠাকুর পরিবারের তরুণ যুবকদিগের জন্য সঙ্গীত শিক্ষারও যথোচিত ব্যবস্থা ছিল। রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারা প্রত্যেকেই সঙ্গীতে অনুরাগী ছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথও অতি সহজেই তাঁহার গীতমধুর কণ্ঠস্বর লইয়া সেদিকে নিজের কৃতিত্ব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের নাট্যরচনায় ভাব-বিলাসিতা ও গীতিপ্রবণতার ইহাই ইতিহাস।

কাব্যে হাতেখড়ির সঙ্গে সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ সেক্সপীয়রের 'ম্যাকবেথ' নামক নাটকখানি বাংলায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। এখানেই পাশ্চাত্ত্য নাট্য-সাহিত্যের সঙ্গে তাঁহার প্রথম পরিচয় স্থাপিত হয়। তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স ১৩ বৎসর মাত্র; অবশ্য সেই নিতান্তই অপরিণত বয়সের পরিচয়ের ভিতর দিয়া সেক্সপীয়রের রসোপলব্ধি তাঁহার পক্ষে কতখানি সম্ভব হইয়াছিল, তাহা বিচার করিয়া কোন লাভ নাই এবং তাহার কোন উপায়ও নাই; তথাপি আজন্ম চোখের সামনে নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে পরিচিত থাকিয়া এবং বাল্যকালীন শিক্ষার ভিতর দিয়া উচ্চাঙ্গ নাট্যসাহিত্যের সঙ্গেও এইভাবে প্রত্যক্ষ পরিচয় স্থাপন করিয়া তাঁহার যে সাহিত্য-সংস্কার গড়িয়া উঠিতেছিল, তাহা যে নাট্যরচনায় প্রেরণা লাভের সকল দিক দিয়াই অনুকূল ছিল, তাহাই অনুমান করা যায়।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীর নাট্যশালাটি লুপ্ত হইয়া যাওয়ায় কিছুকাল পর 'বিদ্বজ্জন সমাগম' নামে এক নূতন প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। তাহাতে গীতিবাদ্য, আবৃত্তি প্রভৃতির ব্যবস্থা থাকিত এবং মধ্যে মধ্যে নাট্যাভিনয় হইত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ইতিমধ্যেই নিজে কয়েকখানি নাটক রচনা করিয়াছেন, সেই সব নাটকই প্রধানতঃ ইহাতে অভিনীত হইত। ইহাদের মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রচিত 'এমন কর্ম আর করব না' নামক একটি প্রহসনের অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ অলীকবাবুর ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহাই রবীন্দ্রনাথের সর্বপ্রথম নাট্যাভিনয়। এই গীতবাদ্য ও নাট্যাভিনয়ের আবহাওয়ার মধ্য দিয়া কৈশোর ও বাল্য উত্তীর্ণ হইয়া রবীন্দ্রনাথ যৌবনে পদার্পণ করিলেন। এই সময়ে ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র ১৭ বৎসর বয়সে তিনি প্রথমবার বিলাত যান।

বিলাতে বাসকালীনই তিনি 'ভগ্নহৃদয়' নামক তাঁহার সর্বপ্রথম গীতি-নাট্যটি রচনার সূত্রপাত করেন। দুই বৎসর পরই তিনি বিলাত হইতে ফিরিয়া আসেন এবং 'ভগ্নহৃদয়' নাট্যকাব্যখানির রচনা শেষ করেন। প্রথমবার বিলাতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ বিদেশীগণের সুর দ্বারা বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, দেশে ফিরিয়া আসিয়া দেশীয় সুরচর্চার সঙ্গে বিদেশী সুরেরও চর্চা করিতে লাগিলেন। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "এই দেশী ও বিদেশী সুরের চর্চার মধ্যে 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র জন্ম হয়" (জী-স্মৃ ১৫১)। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে 'বাল্মীকি-প্রতিভা' রচিত হয়। ইহার অভিনয়ে রূপদান করিবার উদ্দেশ্যেই এই নাটকখানি রচিত হইয়াছিল। ঠাকুরবাড়ীর 'বিদ্বজ্জন সমাগম' নামক যে সভার পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, তাহার এক অধিবেশনে ইহা অভিনয় করিবার জন্য আয়োজন হইতে লাগিল। রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব তত্ত্বাবধানে এই অভিনয়ের আয়োজন হইতে লাগিল এবং ঠাকুরবাড়ীর পূর্ববর্তী নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে ইহার সকল বিষয়েই পার্থক্য সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল।

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে এই 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র প্রথম অভিনয় হইল। রবীন্দ্রনাথ নিজে বাল্মীকির ভূমিকায় অবতীর্ণ হইলেন এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রী (৺হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা) প্রতিভা দেবী সরস্বতীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হইলেন। ইহা যে কেবল-মাত্র রবীন্দ্রনাথের স্বরচিত নাটকের সর্বপ্রথম অভিনয় তাহাই নহে, এই অভিনয়ের মধ্যে স্ত্রীভূমিকায় নিজের পরিবারস্থ কুমারীদের ইহাই সর্বপ্রথম প্রকাশ্য অভিনয়। রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী নাট্যাভিনয়ের এখানেই সূত্রপাত হয়। এই নাটকের অন্যান্য ভূমিকা অক্ষয় চৌধুরী, অবনীন্দ্রনাথ, অরুণেন্দ্রনাথ প্রভৃতি গ্রহণ করেন।

'বাল্মীকি-প্রতিভা'র অভিনয়-সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া রবীন্দ্রনাথ কিছুদিন পরই অনুরূপ আর একখানি গীতিনাট্য রচনা করেন, তাহার নাম 'কাল-মৃগয়া'—রামায়ণ হইতে সিন্ধুমুনি-বধের বৃত্তান্তটি গ্রহণ করিয়া এই গীতিনাট্য রচিত হয়। এই নাটকখানিকেও অভিনয়ে রূপ দিবার জন্য অনুরূপ আয়োজন হইতে লাগিল। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে ইহার অভিনয় হয়। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীর তেতলার ছাদে রঙ্গমঞ্চ নির্মাণ করিয়া অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়। তাহাতে রবীন্দ্রনাথ অন্ধমুনি ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দশরথের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। কলিকাতার বহু সম্ভ্রান্ত

ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হইয়া এই অভিনয় দর্শন করিয়াছিলেন। এই সম্পর্কে ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ইংরেজি 'স্টেট্‌সম্যান' পত্রিকায় যে বিবরণটি প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা এখানে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে,—[১]

"A conversazione of Bengali authors was held at the house of Baboo Debendranath Tagore, at No. 6 Dwaraka nath Tagore's Street, Jorasanko, on Saturday evening last. There was a large gathering of Bengali authors, editors and other gentlemen. A short melodrama named Kalamrigaya or the "The Fatal Hunt" was written for the occasion by Baboo Rabindranath Tagore well known to the literary world. The drama was based upon a story from Ramayan. The dramatis personae were represented by the members of the Tagore family, both male and female. All the parts were well sustained."

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীর নাট্যাভিনয়ের পালা একরকম এইখানেই শেষ হয়—রবীন্দ্রনাথের নাট্যাভিনয়ের পরবর্তী ইতিহাস শান্তিনিকেতনের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে জড়িত।

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে শান্তিনিকেতনের মন্দির স্থাপিত হয় এবং সেই উপলক্ষেই ৭ই পৌষের উৎসব ও মেলার প্রবর্তন হয়। এই মন্দিরটিকে কেন্দ্র করিয়াই ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রতিষ্ঠা হইল। রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহকেই তাঁহার সাহিত্য-সাধনার পীঠস্থান করিয়া লইয়াছিলেন; কিন্তু শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপিত হইবার পর তিনি শিলাইদহের বাস উঠাইয়া দিয়া শান্তিনিকেতনে আসিয়া নবপ্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মচর্যাশ্রমে শিক্ষকতার কার্য আরম্ভ করিলেন। এই ভাবেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শান্তিনিকেতনের সম্পর্ক গড়িয়া উঠিল। ১৩০৯ সাল (১৯০২) ১লা বৈশাখ তারিখে এই ব্রহ্মচর্যাশ্রমে শান্তিনিকেতনের প্রথম নববর্ষ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানগুলি প্রথমতঃ কেবলমাত্র মৌখিক বক্তৃতা ও ব্রহ্মোপাসনার মধ্যেই নিবদ্ধ থাকিত, ক্রমে ইহাদিগকে উপলক্ষ্য করিয়া রবীন্দ্রনাথের নূতন নূতন নাটক রচিত ও অভিনীত হইত। শান্তিনিকেতনের এই উৎসব উপলক্ষ্যে রবীন্দ্র-নাথের সর্বপ্রথম নাট্যরচনার প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহার 'শারদোৎসব'

রচনায়। ১৩১৫ সালের শারদীয় অবকাশের অব্যবহিত পূর্বে রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছাত্রদিগের জন্য সময়োপযোগী নাট্যরচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তাহার ফলেই শারদোৎসব রচিত হয়। নাটকখানি রচনা করিয়া রবীন্দ্রনাথ তাহা পুজার ছুটির পূর্বে আশ্রমের বালক ও অধ্যাপকগণদ্বারা অভিনীত করাইলেন। তৎকালীন আশ্রমবাসীর অভিনয়োপযোগী করিবার জন্যই ইহাকে স্ত্রীভূমিকা-বর্জিত করিয়া রচনা করা হয়। এই 'শারদোৎসব' অভিনয়ের ভিতর দিয়াই শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব অভিনয় পরিকল্পনা সর্বপ্রথম রূপ পাইয়াছিল, ইহার সঙ্গে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-বাড়ীতে ইতিপূর্বে যে সকল নাট্যাভিনয় হইয়া গিয়াছে, তাহাদের যে কেবল দৃশ্যতঃই পার্থক্য ছিল তাহাই নহে—অন্তরের দিক দিয়াও কোন সম্পর্ক ছিল না। 'শারদোৎসব'-এব অভিনয়াঙ্গিকের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের ভবিষ্যৎ নাটকসমূহের অভিনয়বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের নাট্যা-ভিনয়ের ক্ষেত্রে পরবর্তী কালে যে যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল, এই 'শারদোৎসব' অভিনয়ের মধ্য দিয়াই তাহার প্রথম সূচনা দেখা দিয়াছিল। শান্তিনিকেতনে 'শারদোৎসবের' এই প্রথম অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজে তখনও কোন ভূমিকা গ্রহণ কবিলেন না সত্য কিন্তু অনতিকাল ব্যবধানেই তিনি নিজেও অভিনেতারূপে রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হইতে লাগিলেন।

'শারদোৎসবে'ব পব বোলপুব ব্রহ্মচর্যাশ্রমের বালকদের দ্বাবা অভিনীত হইবার উদ্দেশ্যে 'বালক' পত্রে প্রকাশিত 'মুকুট' নামক ক্ষুদ্র উপন্যাস হইতে নাট্যীকৃত হইয়া একটি ক্ষুদ্র নাটিকা প্রকাশিত হইয়াছিল ; তাহারও নাম ছিল 'মুকুট'। ইতিমধ্যে 'প্রাযশ্চিত্ত' নামক আব একখানি নাটক রচনার পর রবীন্দ্রনাথ ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাব প্রসিদ্ধ নাটক 'রাজা' রচনা করেন। পৌষ মাসে নাটকখানি রচিত হয় এবং পরবর্তী চৈত্রমাসেই গ্রীষ্মাবকাশের পূর্বে শান্তিনিকেতনে তাহা অভিনয় করিবার ব্যবস্থা হইতে থাকে। এই নাটকা-খ্যানের মধ্যে বসন্তোৎসবের যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহা নাটকের অভিনয়-কালের উপর লক্ষ্য করিয়াই রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

শান্তিনিকেতনে 'রাজা' নাটকের প্রথম অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ ইহার ঠাকুরদার ভূমিকায় স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। নবপর্যায়ে নূতন পরিকল্পনায় শান্তিনিকেতনের নাট্যাভিনয়ের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের এই সর্বপ্রথম ভূমিকা গ্রহণের পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার পরও 'রাজা' নাটক শান্তিনিকেতনে

ও জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে বহুবার অভিনীত হইয়াছে, তিনিও তাহাতে বিভিন্ন ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ইহার ঠাকুরদার ভূমিকাতেই তাহার প্রথম সূচনা। 'রাজা'র পর 'ডাকঘর' রচিত হয়। এই সময়ে কবির জীবনের পঞ্চাশৎ বর্ষ পুর্তি উপলক্ষ্যে কলিকাতার বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ তাঁহাকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। এই সময় তিনি তাঁহার 'ডাকঘর' নাটকখানি তাঁহার কলিকাতার গুণগ্রাহী বন্ধুবান্ধবদিগকে পাঠ করিয়া শোনান। 'ডাকঘরে'র অভিনয় অপেক্ষা রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে ইহার আদ্যোপান্ত পাঠ অধিকতর চিত্তাকর্ষক বলিয়া বিবেচিত হইবার যোগ্য ছিল।

১৩২০ সালের চৈত্র মাসে গ্রীষ্মাবকাশের জন্য শান্তিনিকেতনের আশ্রম ও বিদ্যালয় বন্ধ হইবার পূর্বে অধ্যাপক ও ছাত্রদিগের দ্বারা রবীন্দ্রনাথের 'অচলায়তন' নাটকটির অভিনয় হয়। এই অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং আচার্যের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই অভিনয়ের আর একটি স্মরণীয় বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, ইহাতে এণ্ড্রুজের সহকর্মী পিয়ার্সন সাহেব শোনপাংশুদের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। 'রবীন্দ্র-জীবনী'কার এই সম্পর্কে উল্লেখ করিয়াছেন—'তাঁহার সেই ভাঙা ভাঙা বাঙলায়—খেসারির ডাল যদি মুখ পর্যন্ত আনে, তবে তাকে আর একটু ঠেলে দিই'—সেই কথা কয়টির সুর এখনও কানে বাজিতেছে।'

পরের বৎসরই চৈত্র মাসে রবীন্দ্রনাথের সুপ্রসিদ্ধ নাটক 'ফাল্গুনী' প্রকাশিত হয়। নাটকখানি প্রকাশিত হইবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শান্তিনিকেতনে ইহার অভিনয়ের আয়োজন হয়। শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক ও ছাত্রদিগের দ্বারা অভিনীত হইবার উদ্দেশ্যে ইহা রচিত হইয়াছিল বলিয়া ইহাও স্ত্রীভূমিকা-বর্জিত নাটক। শান্তিনিকেতনে ইহার প্রথম অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ অন্ধ বাউলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।

পরের বৎসর মাঘ মাসে এই নাটকটির আরও কতক অংশ নূতন রচিত হইয়া বাঁকুড়ার নিরন্নদের জন্য অন্নভিক্ষা কল্পে কলিকাতায় জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে পুনরভিনয়ের আয়োজন হয়। এই অভিনয়ের একটু বিশেষ তাৎপর্য ছিল। এযাবৎকাল রবীন্দ্রনাথের নূতন নাটক কেবলমাত্র শান্তিনিকেতনে অভিনীত হইতেছিল। কেবলমাত্র শান্তিনিকেতনের অভিনয়ের ভিতর দিয়া রবীন্দ্রনাট্যাভিনয়ের সঙ্গে বাংলা দেশের সাধারণ শিক্ষিত সমাজের কোনরূপ যোগ স্থাপিত হইতে পারে নাই, অতএব এ পর্যন্ত তাহার প্রভাবও কোথাও

বিস্তৃত হইতে পারে নাই। এইবার কলিকাতায় 'ফাল্গুনী'র অভিনয়ের ভিতর দিয়া রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম বৃহত্তর দর্শক সমাজের সম্মুখীন হইবার সুযোগ গ্রহণ করিলেন। এই অভিনয়ের ভিতর দিয়াই রবীন্দ্রনাথের নিজের নূতন নাটক ও নিজস্ব অভিনয়-কৌশল কলিকাতার সুধীসমাজের সম্মুখে প্রথম প্রচার লাভ করিল।

'ফাল্গুনী'র 'বৈরাগ্য-সাধন' নামক অংশে রবীন্দ্রনাথ সেদিন কবিশেখরের ও মূল নাটকে পূর্ববৎ অন্ধ বাউলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।

এই অভিনয়ের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল রূপসজ্জা। মঞ্চসজ্জার গতানুগতিক রীতির সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম করিয়া কেবলমাত্র সৌন্দর্য শিল্পের দিক হইতে যে মঞ্চ পরিকল্পনা করা হইয়াছিল, তাহা বাংলা নাট্যাভিনয়ের ইতিহাসে সম্পূর্ণ অভিনব। রবীন্দ্রনাথের সহায়তায় অবনীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথ এই মঞ্চসজ্জার যে পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, তাহা বাংলা নাট্যাভিনয়ে একটা নূতন দিক নির্দেশ করিয়াছিল।

'ফাল্গুনী'র অভিনয়ে কলিকাতার বিশিষ্ট নাগরিকগণ উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু সকলের নিকটই যে ইহা সমান সমাদর লাভ করিয়াছিল, তাহা বলিতে পারা যায় না। অনেকে ইহার সম্বন্ধে অতি কঠোর বিরুদ্ধ মন্তব্যও সংবাদপত্রে প্রকাশ করিয়াছিলেন। অনেকে আবার ইহার উচ্ছ্বসিত প্রশংসাও করিয়াছিলেন। তবে একথা স্বীকার করিতেই হয় যে, দর্শকদিগের মধ্যে রবীন্দ্র-নাট্যাভিনয় দর্শনে অনভ্যস্ততাও এই অশ্রদ্ধার একটি প্রধান কারণ। রবীন্দ্রনাথের নূতন নাট্যাভিনয় কলিকাতার সুধীসমাজ প্রথম যে ভাবেই গ্রহণ করুক, ইহার মধ্য দিয়াই বাংলা নাট্যাভিনয়ের গতানুগতিকতার সম্মুখে যে এক নূতন আদর্শ স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা কিছুতেই অস্বীকার করিতে পারা যায় না।

'ফাল্গুনী'র দুই বৎসর পর জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে 'ডাকঘর' নাটকের প্রথম অভিনয় হয়, তাহা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। 'ডাকঘর' নাটকটি রচনা করিয়াই তিনি তাঁহার কলিকাতার গুণগ্রাহী বন্ধুবান্ধবদিগকে জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়া তাহা পাঠ করিয়া শুনান। এইবার 'ডাকঘর-'এর অভিনয়ের ব্যবস্থা হইল এবং রবীন্দ্রনাথ ইহাতে ঠাকুরদার অংশ অভিনয় করিলেন। দুই দিন এই অভিনয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। অভিনয়ে তৎকালীন প্রাদেশিক জাতীয় মহাসভার বিশিষ্ট কর্মী ও সম্ভ্রান্ত নাগরিকবৃন্দ নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন।

ইহারও প্রায় দুই বৎসর পর ১৩২৬ সালে শারদীয় অবকাশের পূর্বে শান্তিনিকেতনে পুনরায় 'শারদোৎসব'-এর অভিনয় হয়। শান্তিনিকেতনে 'শারদোৎসব'-এর পূর্ববর্তী অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ কোন অংশ গ্রহণ করেন নাই, এইবার সন্ন্যাসীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হইলেন। ইতিমধ্যে 'শারদোৎসব' নাটকখানি সামান্য পরিবর্তিত আকারে 'ঋণ-শোধ' নামে প্রকাশিত হয়। ১৩২৮ সালে শান্তিনিকেতনের শারদীয়া অবকাশের পূর্বে 'ঋণ-শোধের' প্রথম অভিনয় হয়, রবীন্দ্রনাথ ইহাতে কবিশেখরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। এই পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের নাট্যাভিনয়ের প্রথম পর্ব শেষ হয়।

যতদূর আলোচনা করা গেল, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে, রবীন্দ্রনাথ এই পর্যন্ত কেবলমাত্র জোড়াসাঁকোর নিজ বাড়ী ও শান্তিনিকেতনের নিজ প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্য কোন সাধারণ রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হন নাই। জোড়াসাঁকো ও শান্তিনিকেতনের পরিচিতির পরিসর খুব বিস্তীর্ণ নহে। সে জন্য তখন পর্যন্তও অভিনেতা হিসাবে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় খুবই সীমাবদ্ধ ছিল। যদিও রবীন্দ্রনাথ আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য কোনদিনই সাধারণ রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে অভিনেতা কিংবা নাট্যকার হিসাবে কোন যোগ স্থাপন করিবার চেষ্টা করেন নাই, তথাপি শান্তিনিকেতনের জন্য অর্থসংগ্রহের ব্যাপারে তাঁহাকে পরবর্তী জীবনে কয়েকবার কলিকাতার সাধারণ রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হইতে হইয়াছে। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার আলফ্রেড রঙ্গমঞ্চ ও ম্যাডান রঙ্গমঞ্চে 'শারদোৎসব' অভিনয়ের ভিতর দিয়াই তাঁহার এই বিষয়ে প্রথম প্রয়াস। রবীন্দ্রনাথ এই নাটকে সন্ন্যাসীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। অবশ্য একথা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিলেও নিজস্ব মঞ্চ-বৈশিষ্ট্য ও দৃশ্যসজ্জা পরিকল্পনা তিনি কখনও বিসর্জন দেন নাই, অর্থ-সংগ্রহের অনুরোধে সাধারণ দর্শকের রুচিকর করিবার জন্য নিজের শিল্পবোধকে তিনি কখনও খর্ব করেন নাই। সাধারণ রঙ্গমঞ্চের উপর এই প্রথম অভিনয়েও তিনি তাঁহার শান্তিনিকেতনের, নিজস্ব সম্প্রদায়টি লইয়াই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইহার পরের বৎসরই তিনি তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ নাটক 'বিসর্জন' লইয়া কলিকাতা এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে পুনরায় আবির্ভূত হন। এই নাটকে তিনি জয়সিংহের অংশে অভিনয় করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের নাট্যাভিনয়ের দ্বিতীয় পর্ব এইখানেই শেষ হইল।

তৃতীয় পর্বে রবীন্দ্রনাথ নাট্যাভিনয়ের মধ্যে নৃত্যকে প্রাধান্য দিয়াছেন।

শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে তখনও নৃত্যের কোন স্থান ছিল না। সেই জন্যই রবীন্দ্রনাথের প্রথম আমলের নাট্যাভিনয়গুলির মধ্যে নৃত্যের কোন স্থান দেখিতে পাওয়া যাইত না—সঙ্গীতকারী বালকদল ঘুরিয়া ফিরিয়া গান গাহিত—এই পর্যন্তই। তারপর ক্রমে অভিনয়ের মধ্যে নৃত্য সংযোগ করিবার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু তাহাও একদিনে হয় নাই। শিক্ষিত মনের রুচি ও নীতির মূলে কোনরূপ আঘাত না করিয়া অতি সতর্কতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এই বিষয়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে থাকেন। ১৩৩১ সালের ভাদ্রমাসে কলিকাতায় আলফ্রেড রঙ্গমঞ্চে 'অরূপ রতন' নাটকের মূকাভিনয়ে এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ নাটকটি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া গিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অভিনেতৃগণ অপরিস্ফুট নৃত্যের অনুরূপ ভঙ্গিদ্বারা ভাবের অভিব্যক্তি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। এখানেই রবীন্দ্রনাথের ভবিষ্যৎ নৃত্যনাট্যের প্রথম সোপান রচিত হইল। ইহার পর হইতেই ছাত্র-ছাত্রীগণের মিলিত অভিনয়ের মধ্য দিয়া শান্তিনিকেতনের কলাভবন প্রবর্তিত নৃত্যানুষ্ঠান রবীন্দ্র-নাট্যাভিনয়ের একটি বিশেষ অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইল।

রবীন্দ্রনাথের ৬৫তম জন্মতিথি উৎসব উপলক্ষ্যে তাঁহার সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ নৃত্যনাট্য 'নটীর পূজা' শান্তিনিকেতনে অভিনীত হয়। রবীন্দ্রনাথের এই নূতন নাট্যানুষ্ঠান সম্বন্ধে 'রবীন্দ্র-জীবনী'কার লিখিয়াছেন, 'কিছুদিন হইতে কেবল মেয়েদের দ্বারা অভিনয় হইতে পারে, এমন একটি নাটিকা প্রণয়নের জন্য তাঁহাকে আশ্রমের মেয়েরা তাগিদ করিতেছিল। সেই উদ্দেশ্যে লিখিতে আরম্ভ করেন। বহু গান সেই সঙ্গে রচিত হয়। তবে এই নাটিকাটি খ্যাতি লাভ করে ইহার নৃত্যের জন্য। শ্রীমতী গৌরী বসু নটীর ভূমিকা গ্রহণ করেন; তাঁহার নৃত্যে একটি অপরূপ অপার্থিব সৌন্দর্য ফুটিয়া উঠিয়াছিল। শান্তিনিকেতনে নৃত্য একটি নূতন রূপ লইল। 'অরূপ রতনে'র কলিকাতায় মূক অভিনয় হইয়াছিল। সাহসভরে নৃত্যের ছন্দ তখনও দেখাইবার মত হয় নাই। কিন্তু গৌরীর শ্রীমতীর ভূমিকা দেখিয়া কবির সন্দেহ থাকিল না যে বাহিরে শান্তিনিকেতনের কিছু দেখাইবার আছে। কিছুকাল পরে কলিকাতায় এই নাটিকার অভিনয় হয়; গৌরীর নৃত্য সত্যই নৃত্যকলায় যুগান্তর আনিল। বাঙ্গালা দেশের নৃত্যের ইতিহাস ১৩৩৩ সাল হইতে নূতন পথে চলিল।'

'নটীর পূজা'র শান্তিনিকেতনে ও কলিকাতা জোড়াসাঁকোর বাড়ীর

অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ ভিক্ষু উপালির ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। যে গৌরী বসুর কথা উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে, তিনি প্রসিদ্ধ শিল্পী নন্দলাল বসুর কন্যা। জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে 'নটীর পূজা'র সর্বপ্রথম অভিনয় কলিকাতার সকল শ্রেণীর লোকেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল। 'নটীর পূজা'র অভিনয়ের পর হইতে নৃত্যানুষ্ঠান রবীন্দ্র-নাট্যাভিনয়ের একটি অপরিহার্য অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইল। তখন হইতে রবীন্দ্রনাথের নাট্যরচনায় নাটকের কাহিনী অপেক্ষা ইহার সঙ্গীত ও নৃত্যের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হইল। শান্তিনিকেতন কলাভবনের শিক্ষায় প্রাচ্যনৃত্যের যে নূতন আদর্শ গড়িয়া উঠে, তাহা অবলম্বন করিয়াই তখন রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি গীতি-বহুল ঋতু-বিষয়ক নৃত্যনাট্য রচিত ও অভিনীত হয়; ইহাতে কলাভবনের ছাত্রছাত্রীরাই যোগদান করিত। বলা বাহুল্য, এই সকল নৃত্যাভিনয়ের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ প্রধানতঃ প্রযোজকের দায়িত্বই গ্রহণ করিতেন, কদাচিৎ অংশবিশেষ আবৃত্তি করিতেন মাত্র।

প্রায় সত্তর বৎসর বয়সের নিকটবর্তী হইয়া রবীন্দ্রনাথ আর একটি পূর্ণাঙ্গ নাটকে দীর্ঘ এক ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহা 'তপতী'। ১৩৩৬ সালের আশ্বিন মাসে কলিকাতার জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে 'রাজা ও রাণী'র পরিবর্তিত গদ্য নাট্যরূপ 'তপতী'র প্রথম অভিনয় হয়। তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স ৬৮ বৎসর। রবীন্দ্রনাথ সেই বয়সে রাজা বিক্রমের অংশে অবতীর্ণ হইলেন, এবং স্বর্গীয় অজিতকুমার চক্রবর্তীর কন্যা অমিতা দেবী তপতীর অংশে অবতীর্ণ হইলেন। কলিকাতার জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে ক্রমান্বয়ে চারি রাত্রি এই নাটকের অভিনয় হয়—রবীন্দ্রনাথের পরিণত বয়সের এই অভিনয় দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

'তপতী'তে বিক্রমদেবের অভিনয়ই রবীন্দ্রনাথের সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য নাট্যাভিনয়। ইহার পরও জোড়াসাঁকো ও শান্তিনিকেতনে আরও কয়েকটি পূর্বাভিনীত নাটকের মধ্যে তিনি অবতীর্ণ হন, তাহাদের মধ্যে চুয়াত্তর বৎসর বয়সে শান্তিনিকেতনে 'শারদোৎসবে' সন্ন্যাসীর ভূমিকায়ই তাঁহার সর্বশেষ নাট্যাভিনয়। তখন তাঁহার দেহ অশক্ত হইয়া আসিয়াছে, সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারেন না, শান্তিনিকেতনের ছাত্রদিগকে উৎসাহ দিবার জন্য তিনি নিজে সেইবার তাহাদিগের সহিত শেষবারের মত অভিনয় করিলেন।

রবীন্দ্রনাথ একজন শ্রেষ্ঠ নাট্যকার, নট ও প্রযোজক। কিন্তু এই বিষয়েও তাঁহার বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি স্বরচিত নাটক ভিন্ন অন্যের রচিত নাটকের অভিনয়ে কোনদিন অংশ গ্রহণ করেন নাই। কিংবা অন্যের কোন নাটকের প্রযোজনাও করেন নাই। বাংলা রঙ্গমঞ্চের অভিনয়-প্রকৃতির সহিত তাঁহার কোন যোগ ছিল না; তিনি স্বরচিত নাটকের অভিনয়াঙ্গিক নিজেই গড়িয়া লইয়াছিলেন এবং নিজেব অভিনয়ের মধ্যে তাহারই রূপদান করিয়াছেন। তিনি এতদ্দেশীয় প্রচলিত অভিনয়-পদ্ধতিকে কোনদিন স্বীকার করেন নাই, কিংবা সর্বসাধারণের ক্ষেত্রে নিজের অভিনয় বৈশিষ্ট্য প্রচার করিবারও সুযোগ গ্রহণ করেন নাই। বাংলার জাতীয় রঙ্গমঞ্চের সহিত যোগ না থাকায় অভিনেতা হিসাবে রবীন্দ্রনাথেরও পরিচয় নির্দিষ্ট দর্শকমণ্ডলীব মধ্যে নিতান্ত সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও স্বীকার করিতে হয় যে, উচ্চাঙ্গ অভিনয়-গুণ ববীন্দ্রনাথের আয়ত্ত ছিল। তাঁহার সুগঠিত সুদীর্ঘ দেহ, আয়ত চক্ষু, তীক্ষ্ণাগ্র নাসিকা প্রত্যেকটিই কৃতী নটের যোগ্য অলঙ্কার। তাঁহার কণ্ঠস্বরের ঐশ্বর্যও অতুলনীয় ছিল, তথাপি তাহার মধ্যে একটু ত্রুটি এই ছিল যে, তাহাতে পুরুষোচিত গাম্ভীর্যের অভাব ছিল, তাহা প্রয়োজনমত খুব উচ্চগ্রামে উঠিয়া গেলেও কখনও গীতিসুরমুক্ত হইতে পারিত না। তাঁহার কণ্ঠস্বর সঙ্গীতের অনুগামী ছিল, তাহার মধ্যে কর্কশ পৌরুষের স্পর্শ ছিল না। অভিনেতার পক্ষে তাঁহার মুখাবয়বের আর একটু ত্রুটি এই ছিল যে, তাহা অনতিপ্রসর থাকাতে বিচিত্র ভাবের সূক্ষ্মতম অভিব্যক্তি কদাচিৎ সম্ভব হইত। এই বিষয়ে দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তুলনা করিলেই এই কথার তাৎপর্য বুঝিতে পারা যাইবে। দিনেন্দ্রনাথের মুখাবয়ব প্রশস্ততর ছিল, তাহাতে বিচিত্র ভাবের সূক্ষ্মতম অভিব্যক্তিও সম্ভব হইত। সেইজন্যই তিনি হাস্য, করুণ, গম্ভীর প্রভৃতি সকল প্রকৃতির অভিনয়েই সমান কৃতিত্ব দেখাইতে পারিতেন। কিন্তু কেবলমাত্র গম্ভীর বিষয়ক অভিনয়েই রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব প্রকাশ পাইত। অভিনেতা হিসাবে রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা দিনেন্দ্রনাথের কৃতিত্ব অধিকতর স্বীকৃত হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ নিজের যোগ্যতা অনুযায়ীই অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করিতেন। হাস্যরসাত্মক কিংবা লঘুবিষয়ক কোন ভূমিকায় তিনি কোনদিন অবতীর্ণ হন নাই। অতএব তিনি যে অংশে অবতীর্ণ হইতেন, তাঁহার দিক হইতে তাহা নিখুঁতভাবেই অভিনীত হইত। এই বিষয়ে বিদেশী দর্শক টমসনের একটি

উক্তি এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে 'শারদোৎসব'-এর অভিনয় দেখিয়া এডোয়ার্ড টম্‌সন তাঁহার রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক ইরাংজী গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"......the star performance of the evening was Rabindranath's own rendering of the double parts of Chandrasekhar and, later, in the mask proper, of Baul the blind bard. Both parts were greatly sustained, but the interpretation of Baul reached a height of tragic sublimity which could hardly be endured. Not often can men have seen a stage part so piercing in its combination of fervid acting with personal significance. It was almost as if Milton had acted his own Samson Agonistes. Knowing through what storms the poet's mind was passing, and what forebodings were with him, I felt as if the acting might easily be precursor of reality." স্বরচিত নাটক অভিনয়ের মধ্যে অভিনেতার যে বিশেষ কতকগুলি সুবিধা আছে, রবীন্দ্রনাথও তাহার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিতে পারিয়াছিলেন।

এইবার প্রযোজক হিসাবে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে দু'একটি কথা বলিতে হয়। পূর্বেই বলিয়াছি, রবীন্দ্রনাথ নিজের নাটক ব্যতীত অন্য কাহারও রচিত কোন নাটক কোনদিন প্রযোজনা করেন নাই; স্বরচিত নাটকের প্রযোজনা বিষয়ে প্রযোজকের যে সুবিধাটুকু আছে, রবীন্দ্রনাথ তাহাও পূর্ণমাত্রায় কাজে খাটাইয়াছিলেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও দেখিতে পাওয়া যায়, মঞ্চের ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিষয় সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা একটি ক্রম-বিকাশের ধারা অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইয়াছে। রঙ্গমঞ্চের ব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁহার যে কি অভিমত, তাহা তাঁহার রচিত 'রঙ্গমঞ্চ' (১৩০৯) নামক প্রবন্ধে ব্যক্ত হইয়াছে। তাহাতে তিনি মঞ্চসজ্জার বাস্তব আবেদনকে সম্পূর্ণ অনাবশ্যক বিবেচনা করিয়াছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এ দেশে পাশ্চাত্ত্য ধরণের রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা রঙ্গমঞ্চের যে আদর্শ স্থিরীকৃত হইতে চলিয়াছিল, তাহার সম্মুখে রবীন্দ্রনাথের এবিষয়ে নূতন আঙ্গিকের উদ্ভাবনা একটু নূতনত্বের সৃষ্টি করিলেও, তাহা যে সর্বসাধারণের মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিল, তাহা নহে। কারণ, এ কথা সত্য, মঞ্চব্যবহারের দিক দিয়া, নূতন আঙ্গিক পরিকল্পনা

বাঙ্গালার সাধারণ রঙ্গমঞ্চে কোন কার্যকর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। প্রথম জীবনের নাট্যাভিনয়ে রবীন্দ্রনাথও এই সাজপোষাক ও মঞ্চোপকরণকে একেবারে অস্বীকার করিতে পারেন নাই; পূর্বেই বলিয়াছি, এই বিষয়ে তিনি একটি ক্রম-পরিণতির ধারা অনুসরণ করিতে করিতে শেষ পর্যন্ত গিয়া মঞ্চোপকরণকে একেবারেই পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তখন কেবলমাত্র অভিনয়-কলার উপরই জোর দিয়াছিলেন। এই বিষয়ে শান্তিনিকেতনের একজন প্রবীণ ছাত্রের অভিজ্ঞতা উল্লেখযোগ্য,—'প্রথম আমলে দেখিয়াছি, নাটকে কেনা পোষাক ব্যবহৃত হইত। ক্রমে কেনা পোষাকের যুগ গিয়া এখানকার শিল্পিগণ কর্তৃক পরিকল্পিত পোষাক ব্যবহৃত হইতে লাগিল। পটভূমিকা ও যবনিকায় সত্যকার শিল্পীদের তুলির দাগ পড়িল। সাজপোষাকের আড়ম্বরের চেয়ে আলোর নিপুণ প্রয়োগের দিকে চোখ গেল। বাদ্যযন্ত্র হিসাবে হার্মোনিয়াম দূর হইয়া গিয়া বীণা, বাঁশী, এসরাজ দেখা দিল। এক কথায়, অভিনয়ের সৌন্দর্যকলার উন্নতি সাধনের জন্য চেষ্টা আরম্ভ হইল' (প্রমথনাথ বিশী, 'রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন' ১৩৫৩ পৃঃ৭২)। জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে তিনি যে 'তপতী' নাটকের অভিনয় করিয়াছিলেন, তাহাতে দৃশ্যপটের কোন পরিবর্তন করা হয় নাই। তিনি এই সম্পর্কে কৈফিয়ৎ দিয়াছিলেন—'আধুনিক য়ুরোপীয় নাট্যমঞ্চের প্রসাধনে দৃশ্যপট একটা উপদ্রবরূপে প্রবেশ করেছে। ওটা ছেলেমানুষী। লোকের চোখ ভুলাবার চেষ্টা।' (ভূমিকা)

রবীন্দ্রনাথ রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে প্রেক্ষাগৃহের যে একটা কৃত্রিম ব্যবধান আছে, তাহা উচ্ছেদ করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, এই সম্বন্ধে বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ নট শিশিরকুমার ভাদুড়ী উল্লেখ করিয়াছেন—'আমাদের দেশে নাট্যকারদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম উপলব্ধি করেছিলেন যে, দর্শক বিচারকের মত আসনে বসে থাকবেন এবং অভিনেতা মঞ্চের কাঠগড়ায় আবদ্ধ আসামীর মত অভিনয় করবে—এই ব্যবস্থার মধ্যে একটা ঘোরতর অসামঞ্জস্য আছে। দর্শক এবং অভিনেতার মধ্যে যে বেড়া সেকালের যাত্রায়, গ্রীক ট্র্যাজিডির অভিনয়ে, এমন কি সেক্সপীয়রের থিয়েটারেও ছিল না, সে বেড়া তুলে দেবার জন্য বর্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ দুইজন (প্রয়োগাচার্য মায়ার সোল ও রাইন্‌হার্ট) চেষ্টা করে আংশিকভাবে কৃতকার্য হয়েছেন। সেই বেড়া তুলে দেবার চেষ্টা রবীন্দ্রনাথও নিজস্ব দল নিয়ে দু'একবার করেছেন।' ('রঙ্গমঞ্চ ও রবীন্দ্রনাথ' আনন্দবাজার পত্রিকা, পূজা সংখ্যা, ১৩৪৮ সাল, পৃঃ ২০৭)।

নাট্যাভিনয়ের জন্য অনভিজ্ঞ অভিনেতাকে উপযুক্ত শিক্ষাদান বিষয়েও রবীন্দ্রনাথের বিশেষ কৃতিত্ব ছিল। প্রয়োগ-শিল্পীর পক্ষে ইহা একটি প্রধান গুণ; এই কার্যে সার্থকতা লাভ করিবার জন্য যে অধ্যবসায় ও ধৈর্যের প্রয়োজন, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে তাহার অভাব ছিল না; তিনি কোনদিন কোন ব্যবসায়ী অভিনেতা ও অভিনেত্রীকে লইয়া রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হন নাই; তিনি যাহাদিগকে লইয়া অভিনয় করিতেন, তাহাদের অধিকাংশ শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাপক; অভিনয় ইহাদের কাহারও ব্যবসায় নহে—কিংবা এই বিষয়ে তাহাদের কাহারও কোন পূর্ব সংস্কারও থাকিবার কথা নাই। ইহাদিগকে লইয়া অভিনয় কার্যে সাফল্যের কৃতিত্ব বহুলাংশেই প্রযোজকেরই প্রাপ্য। শান্তিনিকেতনের প্রসিদ্ধ নৃত্যশিল্পী শ্রীযুক্ত শান্তিদেব ঘোষ লিখিয়াছেন, 'নাটকের বিভিন্ন চরিত্রের অভিনয় একা তিনি শিখিয়েছেন পাখী পড়ানোর মত ক'রে। প্রত্যেকটি কথার সঙ্গে কোথায় কি ভাবে ঝোঁক দিতে হ'বে, কি ভাবে স্বরের বৈচিত্র্য আসবে, সবই তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিয়েছেন। বইয়ের অক্ষরে অক্ষরে দাগিয়ে দিয়েছেন যাতে তাদের মনে থাকে। এক সময় এমন ব্যক্তিকেও তৈরী ক'রেছেন, যাকে দেখে সেই অভিনয়েব পূর্বে কেউ মনে করতে পারে নি যে, তার মুখ দিয়ে কথা ফুটতে পারে। অভিনয়কালে, অভিনেতার চালচলনে, হাবভাবে, পাছে কোন প্রকার জড়তা বা আড়ষ্টতা প্রকাশ পায়, সেই কারণে প্রতি পদক্ষেপে ওঠা-বসার, হাতের ও দেহের ভঙ্গি কি ভাবে চালালে অভিনয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য থাকবে সেদিকেও তাঁর ভাবনার অন্ত ছিল না' ('প্রযোজক রবীন্দ্রনাথ'—ঐ, পৃঃ ২১১)।

রচনার রসটি দর্শকের মনে জাগ্রত করিয়া দেওয়াই রবীন্দ্রনাথের নাট্য-ভিনয়ের উদ্দেশ্য—বাহিরের আড়ম্বর দ্বারা এই রস অযথা বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতে পারে; রবীন্দ্রনাথের অন্তর্মুখী সাধনা চিরদিনই বাহিরের আড়ম্বরকে অস্বীকার করিয়া আসিয়াছে; তাঁহার অভিনয়ের মধ্যেও ইহার কোন ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথের প্রত্যেক নাট্যাভিনয়ই প্রায়ই অভিন্ন আদর্শের অনুগামী বলিয়া ইহার বৈচিত্র্যের অভাবও উপেক্ষণীয় নহে।

রবীন্দ্র-নাট্যের ভূমিকা

রবীন্দ্র-প্রতিভা বাংলা সাহিত্যের যে-সকল বিভিন্ন বিভাগ স্পর্শ করিয়াছে, নাটক তাহাদের অন্যতম। ইহার বিস্তৃতি ও বৈচিত্র্যের দিকে লক্ষ্য করিলে এ'কথা সহজেই মনে হইতে পারে যে, রবীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র নাটক ব্যতীত বাংলা সাহিত্যের যদি অন্য কোন বিভাগে হস্তক্ষেপ নাও করিতেন, তাহা হইলেও তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতিলাভ করিতে পারিতেন; কারণ, তাঁহার কয়েকখানি নাটক চিরন্তন মানব-জীবনের শাশ্বত ভাব অবলম্বন করিয়া রচিত, ভাষান্তরিত হইয়াও দেশ-দেশান্তরে ইহারা সমাদর লাভ করিয়াছে। বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে আর কেহ এই দুর্লভ সৌভাগ্যের অধিকারী হইতে পারেন নাই।

রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলি প্রধানতঃ দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে—রোমান্টিক নাটক ও সামাজিক নাটক। রোমান্টিক নাটকগুলিকে আবার আরও কতকগুলি উপবিভাগে ভাগ করা যায়, যেমন, গীতিনাট্য, নাট্যকাব্য, ঋতুনাট্য, নৃত্যনাট্য, রূপক নাট্য ও সাঙ্কেতিক নাট্য। সামাজিক নাটকগুলিও দুই ভাগে ভাগ করা যায়; যেমন, রঙ্গনাট্য ও সমাজনাট্য। • রবীন্দ্রনাথ গীতি-কবি, নাট্যরচনাকালেও তিনি তাঁহার গীতিকবিসুলভ মনোভাব কোনদিক হইতেই সঙ্কুচিত করিয়া লইতে পারেন নাই, যদিও ইহা মূল নাট্যরচনার আদর্শ-বিরোধী, তথাপি ইহাই রবীন্দ্রনাথের নাট্যধর্ম। সেইজন্য রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যে যে নাটক রচনা করিয়াছেন, তাহা তাঁহার নিজের রচনার আদর্শ দিয়াই বিচার করিতে হয়, সাধারণ নাট্য-রচনার মাপকাঠিতে বিচার করিতে গেলে তাহা ভুল হয়। রোমান্টিক নাটকগুলিতে রবীন্দ্রনাথের আত্মসচেতনতা সর্বত্রই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, এই আত্মসচেতনতার পরিচয়টি গীতিকবির মানস-পরিচয়ে পরম রসোজ্জ্বল—নাটকের দিক দিয়া ইহার মূল্য যাহাই থাকুক না কেন, কাব্যের রসবিচারে ইহার সৃষ্টি সার্থক।

গীতিনাট্যগুলিই রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের রচনা। ইহাদের প্রধান সুর প্রেম—শিথিলবদ্ধ কাহিনী অবলম্বন করিয়া নরনারীর মনের প্রেমভাবটি ইহাদের মধ্যে ব্যক্ত করা হইয়াছে। যৌবনোদ্গমে কবি যে ভাব-স্বপ্নে

বিভোর ছিলেন, সমসাময়িক কালে রচিত গীতিকবিতাগুলির ভিতর দিয়া তাঁহার যে ভাব ব্যক্ত হইতেছিল, ক্ষীণসূত্র নাট্যকাহিনী অবলম্বন করিয়া এখানে সেই ভাবই ব্যক্ত হইয়াছে। ইহাদিগকে নাটক বলা ভুল, রবীন্দ্রনাথ নিজেও অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গেই ইহাদিগকে নাটক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তথাপি রবীন্দ্রনাথের ভবিষ্যৎ নাট্যকার-জীবনের প্রথম ভিত্তি ইহাদের উপরই স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া রবীন্দ্র-নাট্যসাহিত্যের আনুপূর্বিক ইতিহাস যাঁহারা পাঠ করিতে চাহেন তাঁহাদের পক্ষে ইহারা অপরিহার্য। কারণ, রবীন্দ্রনাট্য-সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ধারার এখান হইতেই সূত্রপাত হইয়াছিল।

নাট্যকাব্যই রবীন্দ্রনাট্যসাহিত্যের সমৃদ্ধতম রচনা। কাহিনীর দৃঢ়বদ্ধতার গুণে ইহা অনেকাংশে নাটকীয় গৌরব লাভের অধিকারী হইয়াছে। তদুপরি বহির্দ্বন্দ্ব, অন্তর্দ্বন্দ্ব, ঘটনা-সংঘাত, চরিত্রবিকাশ প্রভৃতি দ্বারা ইহাদের সর্ববিধ নাটকীয় গুণ সৃষ্টি করিবার প্রয়াস বহুলাংশে সার্থক হইয়াছে। এই নাটক-গুলির মূল কথা প্রীতি, হৃদয়কে এখানে সকলের উপর স্থান দেওয়া হইয়াছে, এই হৃদয়ের স্পর্শে সকল নির্জীবতা দূর হইয়া গিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের ঋতুনাট্যগুলির লক্ষ্য সৌন্দর্য, এই সৌন্দর্য অখণ্ডতারই রূপান্তর। বিশ্বজীবনের উপর দিয়া চিরপ্রবহমাণ এক অখণ্ড সৌন্দর্য ঋতু-চক্রের নৃত্যের তালে তালে আবর্তিত হইয়া চলিয়াছে; এই নৃত্যের তালে ছন্দ বাজিতেছে, সুর জাগিতেছে, ষড়্ ঋতুর চরণমঞ্জীরে সমগ্র বিশ্বব্যাপী এক অখণ্ড রাগিণী অনুরণিত হইতেছে। এই নাট্যরচনাগুলির ভিতর দিয়া প্রকৃতি-বিলাসী কবির সৌন্দর্য পূজার অর্ঘ্য নিবেদিত হইয়াছে।

শান্তিনিকেতন কলাভবনে নৃত্যশিক্ষা প্রবর্তিত হইবার পর রবীন্দ্রনাথ নাট্যাভিনয়ের ভিতর নৃত্যকে প্রাধান্য দিলেন। নাটকের দিক দিয়া ইহা গুরুতর ক্ষতির কারণ হইলেও, রবীন্দ্রনাথ যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ইহা নাটকের ভিতর দিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা এক হিসাবে সার্থক হইয়াছে। নাটকের দিক দিয়া ইহাতে প্রধান ক্ষতি এই হইল যে, ইহাতে নাট্যকাহিনীর সংহতি বিনষ্ট হইল; নাটকের মধ্যে কাহিনীর স্থান মুখ্য; কিন্তু রবীন্দ্রনাট্য-সাহিত্য কাহিনীর দিক দিয়া চিরদিনই শক্তিহীন। প্রথম জীবনের গীতিনাট্য-গুলির মধ্যে কাহিনীগত শৈথিল্য যতটা দেখা গিয়াছিল, তাহা তিনি নাট্যকাব্য রচনার যুগে কতকটা সংশোধন করিয়া উঠিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কিন্তু গীতি-ভাব যাঁহার মধ্যে এত প্রবল, তাঁহার পক্ষে কাহিনীগত দৃঢ়তা সৃষ্টি করা

নিতান্তই কঠিন, সেইজন্যই তাঁহার রূপক নাট্যরচনার যুগেই সেই শৈথিল্য পুনরায় কতকটা প্রকাশ পাইল। তারপর সর্বশেষে তাঁহার নৃত্যনাট্য রচনার যুগে কাহিনীগত শৈথিল্য একেবারেই চরমে গিয়া উঠিল।

রূপক ও সাঙ্কেতিক নাটকগুলি রবীন্দ্রনাথের এক একটি বিশিষ্ট সম্পদ। প্রথমতঃ রবীন্দ্রনাথ সুন্দরের পূজারী, সেইজন্য সংসারের নীরস তত্ত্বকথাগুলি সৌন্দর্যের আবরণে প্রচ্ছন্ন করিয়া নাটকের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার ফলেই তাঁহার রূপক নাট্যগুলির জন্ম হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ রবীন্দ্রনাথ সত্যসন্ধানী, এই সত্য তিনি হৃদয়ের মধ্যে লাভ করিয়াছেন। জাগতিক বিশ্লেষণের মধ্যে যে সত্য তিনি পাইয়াছেন, তাহা জগতের মধ্যেই আবদ্ধ সসীম সত্য; কিন্তু এই সসীম জগৎ উত্তীর্ণ হইয়া যে সত্যের অবস্থিতি, তাহা অনুভূতি ভিন্ন জাগতিক কোন পরিচয়ের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিবার উপায় নাই। যাহা অসীম, তাহা জগতের সীমার মধ্যে টানিয়া আনিয়া ব্যাখ্যা করিব কি করিয়া? তাহা অন্তরের মধ্যে নিজে অনুভব করিতে পারি, অন্যের অনুভূতিও জাগ্রত করিয়া তাহার দিকে সঙ্কেত নির্দেশ করিতে পারি মাত্র—তাহা কোনভাবে প্রত্যক্ষ করাইতে পারি না। কবি রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনের এই অভিনব পরিচয় তাঁহার সাঙ্কেতিক নাটকগুলির মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের সামাজিক নাটক কয়খানি বড়ই বৈচিত্র্যহীন। অথচ তিনি তাঁহার ছোটগল্পগুলির মধ্যে বাংলার সমাজের যে রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, ইহার বিস্তৃতি ও জটিলতার যে বিচিত্র পরিচয় তিনি ইহাদের মধ্য দিয়া সার্থকভাবে রূপায়িত করিয়াছেন, নাটকের ক্ষেত্রেও তাহাদের কেন যে সদ্ব্যবহার করিতে পারিলেন না, তাহা প্রকৃতই বিস্ময়ের বিষয়। অবশ্য ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে প্রকৃত নাট্যকারের প্রতিভা ছিল না; তাহা না হইলে বাংলার সমাজ-জীবন সম্পর্কে তাঁহার এই বহুমুখী ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তিনি নাটকের ক্ষেত্রে ব্যবহার করিতে পারিলেন না কেন?

রবীন্দ্রনাথের সামাজিক নাটকগুলি দুই ভাগে ভাগ করিয়াছি—রঙ্গনাট্য ও সমাজ-নাট্য। রঙ্গনাট্যগুলি এক শ্রেণীর নহে বলিয়াই তাহাদিগকে প্রহসন সংজ্ঞা দেওয়া যায় না। ইহাদের মধ্যে যেমন অনাবিল হাস্যরসেরও পরিচয় আছে, আবার তীব্র ব্যঙ্গেরও কশাঘাত অনুভব করা যায়। তবে

অনাবিল হাস্যরসের ভাগ কম, ব্যঙ্গের ভাগই বেশি। নাট্যোক্ত বিষয়ের মধ্যেও বৈচিত্র্যের অভাব আছে। গুরুবিষয়ক সামাজিক নাটক রবীন্দ্রনাথের এক প্রকার নাই বলিলেই চলে। এই বিষয়ে মাত্র যে তিনখানি নাটক তাঁহার আছে, তাহাদের মধ্যে দুইখানি তাঁহার পূর্ববর্তী রচনা 'গল্পগুচ্ছে'র দুইটি গল্পের নাট্যরূপ, একটি মাত্র স্বাধীন রচনা। সামাজিক নাট্যরচনার বিচিত্র উপাদানের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যে পরিচয়ের অভাব ছিল না, সে কথা বলিয়াছি; অতএব তাঁহার এই বিষয়ক নাট্যরচনার অভাব রবীন্দ্রনাট্যসাহিত্যের পাঠককে আঘাত করে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নাট্যকাব্য 'বিসর্জন'-এর ভূমিকায় তাঁহার এই নাটকখানি সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন,

কেহ বলে ড্রামাটিক বলা নাহি যায় ঠিক
'লিরিকে'র বড় বাড়াবাড়ি।

এই কথাটি রবীন্দ্রনাথের প্রায় সকল নাটক সম্পর্কেই প্রযোজ্য হইতে পারে। রবীন্দ্রনাথের সকল নাটকই অসঙ্গতরূপে গীতি-প্রবণ। পূর্বেই বলিয়াছি, রবীন্দ্রনাট্যসাহিত্যও রবীন্দ্র কবি-মানসেরই এক অভিনব অভিব্যক্তি মাত্র; এই হিসাবে রবীন্দ্রনাথের নাটক সাধারণ নাটকের আদর্শে বিচার করা যায় না। এই গীতি-প্রবণতা রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের নাটকগুলির মধ্যে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিলেও, ইহা তাঁহার মধ্যজীবনে রচিত নাটকগুলির মধ্যে কতকটা স্তম্ভিত হইয়াছিল, কিন্তু পুনরায় শেষ জীবনের নৃত্যনাট্যগুলির মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। এই গীতি-প্রবণতার জন্য নাট্য-কাহিনীর স্বচ্ছন্দ গতি প্রায় সর্বত্রই বিনষ্ট হইয়াছে, সমগ্রভাবে কাহিনীগত দৃঢ় সংবদ্ধতাও রক্ষা পায় নাই।

নাট্যিক ক্রিয়া অপেক্ষা ভাবের অনুভূতি প্রকাশই রবীন্দ্রনাথের নাটকের বৈশিষ্ট্য—তাহার ফলে প্রায় সর্বত্রই তাঁহার নাট্যোল্লিখিত ঘটনা ভাবের অধীনস্থ হইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে হওয়া উচিত ছিল ইহার বিপরীত। তাহার ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, অনেক নাটকেই ঘটনাপ্রবাহ একেবারে রুদ্ধ হইয়া চরিত্রগুলির সুদীর্ঘ সংলাপ কিংবা দীর্ঘতর স্বগতোক্তির মধ্য দিয়া বিশেষ কোন সূক্ষ্ম ভাবের সুচতুর বিশ্লেষণ চলিয়াছে—ইহাও রবীন্দ্র-নাট্যসাহিত্যের গীতিপ্রবণতারই ফল। গীতিকবির দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা নাট্যিক কাহিনীর গতিসাম্য রক্ষা করা কঠিন। কারণ, গীতিকবির লক্ষ্য খণ্ড সৌন্দর্যের

উপর, খণ্ডতার মধ্য দিয়াই তাঁহার অখণ্ডতার উপলব্ধি হইলেও খণ্ড বস্তু আশ্রয় করিয়াই তাঁহার ভাব-সাধনা সিদ্ধিলাভ করে। সমগ্র নাট্যকাহিনীর একটি খণ্ডাংশ যত আকর্ষণীয়ই হউক না কেন, তাহা নাট্যিক কাহিনীর প্রয়োজনীয়তা অনুসারে নিয়ন্ত্রিত করিয়া লইতে হয়; কেবল সমগ্র কাহিনীর অনুরোধে যতটুকু অত্যাবশ্যক তাহাই রক্ষা করিয়া অনাবশ্যক অংশ সতর্কতার সঙ্গে পরিত্যাগ করিতে হয়,—কিন্তু সৌন্দর্যের কোন খণ্ডাংশই গীতি-কবির পরিত্যাগ করিবার ক্ষমতা নাই; কাহিনীর জন্য ইহার প্রয়োজন থাকুক বা নাই থাকুক, যতক্ষণ পর্যন্ত ইহা তাঁহার সমগ্র কল্পনার রাজ্য অধিকার করিয়া না লইবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁহার চিত্ত ইহা পরিত্যাগ করিতে পারিবে না।

যে নৈর্ব্যক্তিকতা নাট্যসাহিত্যের প্রধানতম গুণ, তাহাও রবীন্দ্রনাট্যসাহিত্যে বহুল পরিমাণে খর্ব হইয়াছে। প্রখর আত্মসচেতনতা রবীন্দ্রকবি-মানসের বিশিষ্ট ধর্ম; আত্মকেন্দ্রিক সাধনাই রবীন্দ্র-সাধনার মূল—রবীন্দ্রনাথের নাট্যসাহিত্যেও তাঁহার এই আত্মসচেতনতার ধর্ম সম্পূর্ণ সজাগ রহিয়াছে। সেইজন্য রবীন্দ্রনাথের যে কোন নাটক পাঠ করিবার সময়ই তাহার ভিতর তাঁহার বিশিষ্ট ব্যক্তিসত্তাটি প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে। নাট্যকারের এই ব্যক্তি-অভিসার তাঁহার সমগ্র নাট্যসৃষ্টির মধ্যেই অব্যাহত রহিয়াছে বলিয়াও রবীন্দ্রনাট্য-সাহিত্য বৈচিত্র্য সৃষ্টির বড় অবকাশ পায় নাই। এই ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের নাটকই বাংলা সাহিত্যে একমাত্র নাট্যরচনা যাহা রঙ্গমঞ্চের বাহিরেও সাহিত্যরূপে স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে। ইহাদের মধ্য দিয়া যে জীবন-দর্শন ও সৌন্দর্যবোধের অভিব্যক্তি হইয়াছে, তাহা রঙ্গমঞ্চের ভিতর দিয়া সার্থক ভাবে প্রকাশ না পাইলেও, সাধারণ পাঠকের ইহা হইতে রসোপলব্ধির কোন বাধা হয় না। রবীন্দ্রনাথের নাটকই বাংলা সাহিত্যে একমাত্র পাঠ্য-নাটক (reading-drama)।

পূর্বেই বলিয়াছি, রবীন্দ্র-নাট্যসাহিত্যের সঙ্গে বাংলা নাট্যসাহিত্যের ক্রম-বিকাশের ধারার কোন যোগ নাই; তাঁহার নাট্যসৃষ্টি তাঁহার নিজের মধ্যেই উদ্ভব ও তাঁহার নিজের মধ্যেই বিকাশ পাইয়াছে। তাহা তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া গিয়া বাহিরে কোনও প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। আধুনিক বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের কোন উত্তরাধিকারী নাই। ইহার প্রধান কারণ, কাব্য রচনায় তাঁহার যে শক্তি প্রকাশ পাইয়াছে, নাটকের রচনায় তাহা পায় নাই। বিশেষতঃ যে দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা রবীন্দ্রনাথ এই সমাজ ও

তাহার জীবন লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহা দ্বারা তাঁহার সমসাময়িক কিংবা পরবর্তী আর কেহই তাহা প্রত্যক্ষ করেন নাই—তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গি স্বতন্ত্র ছিল।

আখ্যানমূলক গাথা-কাব্য-রচনার ভিতর দিয়াই রবীন্দ্র-কাব্যসাধনার সূত্রপাত হয়। রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'কবি-কাহিনী' আখ্যানমূলক গাথা-কাব্য। কবিহৃদয়ের ভাব যখন পর্যন্ত নিরাশ্রিত ও প্রত্যক্ষ রূপে তাহা প্রকাশ করা সম্ভব হইতেছিল না, জীবনের সেই অপরিণত বয়সে কবি এক একটি কল্পিত আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া সেই ভাবটির বিকাশ করিতে চাহিতেছিলেন—তাহার ফলেই তাঁহার প্রথম জীবনের কাব্যোপন্যাসগুলি রচিত হইয়াছিল। পর পর দুইখানি কাব্যোপন্যাস—'কবি-কাহিনী' ও 'বনফুল' রচনার পর সামান্য একটু বৈচিত্র্য সৃষ্টির প্রয়াসেই হউক কিংবা অন্য যে কোন কারণেই হউক, রবীন্দ্রনাথ ক্রমান্বয়ে কয়েকখানি গীতিনাট্য রচনা করিলেন। রবীন্দ্রনাট্যসাহিত্য সম্পর্কে এই গীতিনাট্য সংজ্ঞাটি বড় ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে ; সেইজন্য কি বিশেষ অর্থে রবীন্দ্রনাথের কোন্ রচনা এই সংজ্ঞাদ্বারা এখানে অভিহিত করা হইয়াছে, তাহা প্রথমেই ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।

এক হিসাবে রবীন্দ্রনাথের মাত্র কয়েকটি রচনা বাদ দিলে প্রায় সকল নাট্যরচনাই গীতিনাট্যের পর্যায়ভুক্ত। কিন্তু ইহাদের মধ্যেও যাহাদের প্রকৃত গীতি-লক্ষণ সর্বাপেক্ষা প্রবল, রবীন্দ্রনাথের সেই প্রথম জীবনের রচনা কয়েকখানিই এখানে গীতিনাট্য বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। গীতি-লক্ষণটির উপর এখানে বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে—অবশ্য কাব্য ও গীতির পার্থক্য সম্বন্ধে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। এখানে যে সকল নাট্যরচনা কাব্য কিংবা কবিতার সুপরিণত কোন লক্ষণাক্রান্ত হইবার পরিবর্তে কেবল মাত্র অস্পষ্ট ভাবাবেগ দ্বারা উচ্ছল হইয়া রহিয়াছে, তাহাদিগকেই গীতিনাট্য সংজ্ঞায় অভিহিত করা হইয়াছে। আখ্যায়িকার একটি ক্ষীণ অবলম্বন ইহাদের মধ্যে থাকিলেও ইহারা প্রধানতঃ সুরপ্রাণ, এই সুরটিও একটি সুপরিণত রাগিণীযুক্ত নহে—তাহা কেবলমাত্র বিশিষ্ট হৃদয়-বেদনার এক একটি অসংযত অভিব্যক্তি মাত্র। রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের কয়েকটি নাট্যরচনার এই লক্ষণই অতিশয় প্রবল বলিয়া অনুভূত হয়। তাঁহার এই লক্ষণাক্রান্ত নাটকগুলি গীতিনাট্য বলিয়া অভিহিত করা হইল।

অনতিকাল ব্যবধানে রবীন্দ্রনাথ এই শ্রেণীর কয়েকখানি নাটক রচনা

করেন এবং এই রচনাগুলির উপরই তাঁহার পরবর্তী সমৃদ্ধতর নাট্যরচনার ভিত্তি স্থাপিত হয়। 'রুদ্রচণ্ড', 'ভগ্নহৃদয়', 'কাল-মৃগয়া' 'বাল্মীকি-প্রতিভা', 'নলিনী', 'মায়ার খেলা' প্রভৃতি রচনা এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহাদের মধ্যে 'রুদ্রচণ্ড' হইতে 'নলিনী' পর্যন্ত রচনাগুলি ক্রমান্বয়ে তিন বৎসর কালের মধ্যেই প্রকাশিত হয় এবং এই তিন বৎসর কালই তাঁহার এই গীতিনাট্য রচনার যুগ বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। এই যুগ অতিক্রম করিয়া চারি বৎসর পর তাঁহার নাট্যরচনার পরবর্তী যুগে তিনি 'মায়ার খেলা' নামক আর একখানি এই শ্রেণীরই নাটক রচনা করেন সত্য, কিন্তু তাহার বিষয়-বস্তু তিনি তাঁহার এই গীতিনাট্য রচনার যুগ হইতেই গ্রহণ করেন; সেইজন্য তাঁহার 'মায়ার খেলা'র রচনাকাল তাঁহার গীতিনাট্য রচনার যুগের মধ্যবর্তী বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়।

এই গীতিনাট্যগুলি রচনার সমসাময়িক কাল রবীন্দ্রনাথের কাব্যের জীবনে প্রধানতঃ 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' রচনার কাল। 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে'র মধ্যে ভাব-প্রকাশের যে অস্পষ্টতা রহিয়াছে, এই গীতিনাট্যগুলিও তাহা হইতে মুক্ত নহে। তবে 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' হইতেই রবীন্দ্রনাথের কাব্যস্রোত যে রকম ক্ষীণভাবে সুরু হইয়াছে, তাঁহার রচনা নিজের পথ ধরিয়াছে, তেমনই এই গীতিনাট্যগুলির মধ্যেও রবীন্দ্রনাথের ভবিষ্যৎ পূর্ণতর নাট্যরচনার পূর্বাভাস সূচিত হইয়াছে —সাহিত্যিক বিচারে স্বাধীন ভাবে ইহাদের কোনও মূল্য না থাকিলেও রবীন্দ্রনাট্যসাহিত্যের ক্রমবিকাশ আলোচনায় ইহাদিগকে কিছুতেই পরিত্যাগ করা চলে না।

'সন্ধ্যাসঙ্গীত'-এর প্রধান সুর বেদনার সুর। এই বেদনা অতৃপ্তি ও অব্যক্তের বেদনা। অন্তরের উদ্বেল ও অস্পষ্ট ভাবরাশি সুপরিণত রূপের মধ্যে ধরা দিতেছে না বলিয়াই কবি-হৃদয় অস্বস্তিবোধ করিতেছে, অন্তরের এই অস্বস্তিবোধ হইতেই 'সন্ধ্যাসঙ্গীত'এর বেদনার সুর জাগিয়াছে। রবীন্দ্র-নাথের প্রথম জীবনের গীতিনাট্যগুলির সুরও এই বেদনার সুর—ইহাদের মধ্যেও অতৃপ্তি, অসম্পূর্ণতা ও নৈরাশ্যের বেদনা আসিয়া বারবার কবি-হৃদয় অভিভূত করিয়া দিতেছে। 'সন্ধ্যাসঙ্গীত'-এর বেদনা-বোধের সঙ্গে ইহার মৌলিক কোন পার্থক্য নাই। 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র মধ্যে কবির ব্যক্তিমানসের পরিবর্তে তাঁহার কাব্যগুরু বিহারীলালেরই প্রভাব অধিকতর বলিয়া ইহার প্রকৃতি একটু স্বতন্ত্র—এমন কি, ইহার অন্তর্নিহিত ভাবও অন্যান্য গীতি-নাট্য

হইতে পৃথক্। রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের এই গীতিনাট্যগুলির মুখ্য উপজীব্য প্রেম, কিন্তু ‘বাল্মীকি-প্রতিভা’র তাহা নহে। ‘বাল্মীকি-প্রতিভা’র মূল উপজীব্য করুণা। এই হিসাবে রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্যগুলির আলোচনায় ‘বাল্মীকি-প্রতিভা’র একটু বিশেষ স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করিতেই হয়। ‘বাল্মীকি-প্রতিভা’ অন্তরে বাহিরে বিহারীলালের প্রভাবজাত রচনা বলিয়া রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য রচনার যুগের বিশিষ্ট ভাবগত আদর্শ ইহার উপর কার্যকর হইতে পারে নাই।

এই গীতিনাট্যগুলি দুইটি স্থূল ভাগে ভাগ করা যায়; যেমন, আখ্যান-প্রধান ও সুর-প্রধান। আখ্যান-প্রধান রচনা ‘রুদ্রচণ্ড’র মধ্যে আনুপূর্বিক একটি কাহিনী বিবৃত হইয়াছে, এখানে কাহিনীটি সুরের মায়াজালে বাঁধা পড়ে নাই—পরিণতির দিকে অব্যাহত ভাবে অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সুর-প্রধান গীতিনাট্যগুলি হইতে সুরের মায়াজাল ছিন্ন করিয়া কাহিনীটি উদ্ধার করা কঠিন। এখানে আখ্যানটি গৌণ, সুরটিই মুখ্য। বলাই বাহুল্য যে, এই শেষোক্ত শ্রেণীর গীতিনাট্যগুলির নাটকীয় মূল্য একেবারেই অকিঞ্চিৎকর। আখ্যায়িকা বর্ণনা ইহাদের উদ্দেশ্যও নহে, কেবল মাত্র বিচ্ছিন্ন সঙ্গীতগুলি একটি স্তবকে বাঁধিয়া রাখিবার জন্য একটি ক্ষীণ কাহিনীসূত্রের সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে।

গীতি-নাট্য

'রুদ্রচণ্ড' নাটিকাটিই রবীন্দ্রনাথের সর্বপ্রথম রচিত গীতিনাট্য বলিয়া ধরিয়া লইতে পারা যায়। প্রকৃত পক্ষে ইহা একটি ক্ষুদ্র কাব্য—চতুর্দশ দৃশ্যে বিভক্ত, অধিকাংশই অমিত্র পয়ার ছন্দে রচিত, মোট আট শত চরণে সম্পূর্ণ। এই কাব্যের বিশেষত্ব এই যে, ইহা আদ্যোপান্ত ছন্দোবদ্ধ কথোপকথন দ্বারাই পূর্ণ। সেইজন্য ইহার আভ্যন্তরীণ প্রাণবস্তু কাব্যের উপাদানে গঠিত হইলেও বাহ্যতঃ ইহা নাটকের লক্ষণাক্রান্ত। রবীন্দ্রনাথ ইহার পূর্বেও কয়েকটি আখ্যায়িকা-মূলক কাব্য ও গাথা রচনা করিয়াছিলেন। 'রুদ্রচণ্ড'ও প্রকৃতপক্ষে এই প্রকারই আখ্যায়িকা-মূলক কাব্য। কিন্তু ইহাই রবীন্দ্রনাথের নাট্যিক ভঙ্গিতে আখ্যায়িকা-মূলক কাব্য রচনা করিবার সর্বপ্রথম প্রয়াস। ইহার নাট্যিক গঠন-কৌশল অপরিণত ও অসম্পূর্ণ হইলেও রবীন্দ্রনাথের নাট্যিক পরিকল্পনার সর্বপ্রথম উন্মেষ ইহার মধ্যেই দেখা দিয়াছে। সেইজন্য ইহাকে নাট্যসাহিত্যের আলোচনায় স্থান দেওয়া যাইতে পারে।

ইহার গল্পাংশ সংক্ষেপে এইরূপ—হস্তিনাপুরের রাজা রুদ্রচণ্ড পৃথ্বীরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সপরিবারে বনবাসী হইয়াছেন। তিনি এই পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার জন্য কালভৈরব দেবতার নিকট শক্তি ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। রাজকন্যা অমিয়ার মনে পিতার পরাজয়ের গ্লানি স্পর্শমাত্র করিতে পারে নাই। অরণ্য-প্রকৃতির সাহচর্যে তাহার জীবন আনন্দেই কাটিতে লাগিল। তাহার পিতৃ-শত্রু পৃথ্বীরাজের একজন সভাসদ্ ছিলেন, তাঁহার নাম চাঁদকবি। চাঁদকবি অরণ্যে আসিয়া প্রায়ই অমিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতেন, তাহাকে সঙ্গীতে পারদর্শিনী করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেন। শত্রুর সঙ্গে সম্পর্কিত বলিয়া রুদ্রচণ্ড চাঁদকবিকে দেখিতে পারিতেন না। চাঁদকবি যাহাতে অমিয়ার সঙ্গে আসিয়া আর সাক্ষাৎ না করেন, সে বিষয়ে তিনি অমিয়াকে সাবধান করিয়া দিলেন। চাঁদকবির প্রতি পিতার এই মনোভাবে অমিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইল। পর দিন চাঁদকবি যখন পুনর্বার তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন, তখন অমিয়া পিতার অত্যাচারের ভয়ে ভীতা হইয়া চাঁদকবিকে অনুনয় করিয়া কহিল, 'তুমি পিতাকে বুঝাইয়া বল, তোমার ও আমার মধ্যে যে সম্পর্ক, তাহার মধ্যে কোন

দোষ নাই, তুমি আমাকে ভালবাস, তাই মধ্যে মধ্যে আসিয়া আমাকে দেখিয়া যাও।' চাঁদকবি বলিলেন, 'আচ্ছা সে কথা বলিব, কিন্তু তাহার পূর্বে তোমাকে সেদিন যে গানটি শিখাইয়াছি, সে'টি গাহিয়া শোনাও।' অমিয়া গান গাহিল, তারপর চাঁদকবি নিজে আর একটি গান গাহিয়া অমিয়াকে শিখাইতে গেলেন, এমন সময় রুদ্রচণ্ড আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রুদ্রচণ্ড চাঁদকবিকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিলেন। কিন্তু তিনি চাঁদকবির নিকট পরাজিত হইয়া তাঁহার নিকট প্রাণভিক্ষা চাহিলেন। ইহাতে চাঁদকবির উপর আক্রোশ তাঁহার আরও বাড়িয়া গেল। অমিয়ার জন্যই তাঁহাকে এই অপমান সহ্য করিতে হইল বলিয়া অমিয়ার উপরও তাঁহার বিদ্বেষের সৃষ্টি হইল। অমিয়া পিতার নিকট ক্ষমাভিক্ষা চাহিল; কিন্তু রুদ্রচণ্ড তাহাকে ক্ষমা করিলেন না। অনন্যোপায় হইয়া অমিয়া তাহার প্রণয়ী চাঁদকবির সন্ধানের জন্য রাজধানীর দিকে যাত্রা করিল। মহম্মদ ঘোরী তখন দিল্লী আক্রমণ করিয়াছেন। চাঁদকবি তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য বাহির হইয়া গিয়াছিলেন। অমিয়া বহু সন্ধানেও চাঁদকবির সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিল না। রাত্রিতে ঝড় উঠিল, অসহায়া বালিকা দারুণ দুর্যোগে পথিপার্শ্বে আশ্রয় লইল। এক কাঠুরিয়া তাহাকে সেদিনের মত আশ্রয় দিয়া প্রাণরক্ষা করিল। হস্তিনাপুরে প্রত্যাবর্তন করা অবধি চাঁদকবি অমিয়ার কথা মুহূর্তের জন্য বিস্মৃত হইতে পারিলেন না। যুদ্ধে বহির্গত হইয়াও শিবিরে বসিয়া তাহারই কথা ধ্যান করিতে লাগিলেন। এদিকে মহম্মদ ঘোরী হস্তিনাপুর আক্রমণ করিবার আয়োজন করিয়া পৃথ্বীরাজের শত্রু রুদ্রচণ্ডের সহায়তা প্রার্থনা করিলেন। রুদ্রচণ্ড ভাবিলেন, পৃথ্বীরাজকে নিজ হস্তে দণ্ড দিবার সুযোগ হইতে মহম্মদ ঘোরী তাঁহাকে বঞ্চিত করিবেন। তিনি মহম্মদ ঘোরীর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন। যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত চাঁদকবি মহম্মদ ঘোরীর বিরুদ্ধে সৈন্য চালনা করিতে চলিয়াছেন, এমন সময় অতি পরিচিত কণ্ঠস্বরে এক অপূর্ব সঙ্গীত শুনিতে পাইলেন; কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার মনে হইল, সে এখানে কি করিয়া আসিবে? সৈন্যদল অগ্রসর হইয়া চলিল। অমিয়া পথিপার্শ্বে থাকিয়া চাঁদকবিকে চিনিতে পারিল, তাঁহাকে ডাকিল; কিন্তু অগণিত সৈন্যের পদ সঞ্চারণের শব্দে তাহা কেহই শুনিতে পাইল না; অমিয়া হতাশ হইয়া পথিমধ্যে বসিয়া পড়িল। অমিয়া যখন দেখিল, যাহার আশায় সে পিতার আশ্রয় ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছে, সে তাহাকে পরিত্যাগ

করিয়া গেল, তখন সে পুনরায় পিতার সন্ধানে অরণ্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করিল। মহম্মদ ঘোরীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ নিহত হইলেন। তাঁহার উপর নিজে প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে পারিলেন না ভাবিয়া রুদ্রচণ্ড অত্যন্ত মর্মাহত হইলেন। এতকাল যে লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া জীবন ধারণ করিতেছিলেন, তাহা এমনভাবে বিলুপ্ত হইয়া গেল দেখিয়া তিনি জীবনে বীতস্পৃহ হইয়া উঠিলেন। একদিন নিজের বক্ষে ছুরিকাঘাত করিলেন। এমন সময় অমিয়া পিতার সম্মুখে ফিরিয়া আসিল। পিতার রক্তাক্ত দেহ ধূল্যবলুণ্ঠিত দেখিয়া তাঁহার পায়ের উপর কাঁদিয়া লুটাইয়া পড়িল। মৃত্যুর পুর্বে রুদ্রচণ্ড কন্যাকে ক্ষমা করিলেন ; অমিয়াকে সস্নেহে বক্ষের উপর টানিয়া লইয়া শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। মহম্মদ ঘোরী পৃথ্বীরাজকে পরাজিত করিয়া তাঁহার রাজধানী হস্তিনাপুর অধিকার করিয়া লইলেন। রাজধানীর সহিত চাঁদকবিরও সম্পর্ক ঘুচিয়া গেল। তিনি অমিয়ার সন্ধান করিতে করিতে অরণ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, পিতার মৃতদেহের পার্শ্বে তাহারও মুমূর্ষু দেহ ধূলায় লুটাইতেছে।

কাহিনীর দিক দিয়া বিচার করিলে ইহার বিষয়-বস্তু অতিনাট্যিকই (melodramatic) বলিতে হয় ; কিন্তু রচনাব দিক দিয়া ইহা গীতিকাব্য। নাট্য-রচনায় উত্তরজীবনেও রবীন্দ্রনাথ এই ক্রটির হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারেন নাই। ইহা আখ্যায়িকা-প্রধান রচনা। 'রুদ্রচণ্ডে' কাহিনীই যেমন প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, তেমনি বর্ণনাত্মক রচনার (narration) ভিতর দিয়া সেই কাহিনীর বিষয়-বস্তুও সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। 'রুদ্রচণ্ড' রচনার সমসাময়িক কালে রবীন্দ্রনাথ কতকগুলি গাথা রচনা করেন। গাথা আখ্যায়িকামূলক কাব্য। রবীন্দ্রনাথের জীবনের এই সময়কে 'গাথা রচনার যুগ' বলা হইয়াছে। অতএব 'রুদ্রচণ্ড'ও সেই যুগে রচিত বলিয়া ইহার উপর গাথারচনার প্রভাবও একান্তই স্বাভাবিক হইয়াছে।

'রুদ্রচণ্ডে' রবীন্দ্রনাথের নাট্যিক চরিত্রসৃষ্টির প্রয়াস সার্থকতা লাভ করিবার ক.।নহে। কিন্তু ইহার মধ্যেই চরিত্রসৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। পরবর্তী কালে নাট্যকাব্য রচনার যুগে তিনি যে শ্রেণীর চরিত্র সৃষ্টি করিয়া বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছেন, ইহার মধ্যে তাহার সূচনা দেখিতে পাই। অতএব রবীন্দ্রনাথের নাট্যসাহিত্যের ধারা আলোচনায় 'রুদ্রচণ্ড' যে বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

রুদ্রচণ্ড এই গীতিনাট্যের নায়ক। নাট্যকার রুদ্রচণ্ডকে প্রকৃত বীর, আদর্শের প্রতি নিষ্ঠায় চরম দুঃখসহিষ্ণু ও প্রতিহিংসা-পরায়ণ বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। মহতের গুণ ক্ষমা—ক্ষমা সত্ত্বগুণ; কিন্তু ক্ষমা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম নহে; সেইজন্য রুদ্রচণ্ড প্রকৃত ক্ষত্রিয়ের মত প্রতিহিংসা-পরায়ণ। কবি তাঁহাকে তাঁহার নামের সঙ্গে চরিত্রের সাদৃশ্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সর্বদাই সতর্ক ছিলেন। কিন্তু এ কথাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, তাঁহার চরিত্র সর্বতোভাবে বাক্‌সর্বস্ব। প্রকৃত কর্ম কিংবা বীরত্বের ক্ষেত্রে তাঁহাকে আমরা পাই নাই। প্রথমেই রাজ্যভ্রষ্ট অবস্থায় তাঁহার সহিত পাঠকের পরিচয় হয়, তারপর তাঁহার নষ্টরাজ্য পুনরুদ্ধারের কোন সুযোগ তাঁহাকে না দিয়াই তাঁহাকে আত্মঘাতী করা হয়। এই কাহিনীর মধ্যে প্রচুর কর্মের অবকাশ ছিল; কিন্তু কবি ইহার নায়ককে প্রকৃত কর্মের ক্ষেত্র হইতে সর্বদা দূরে রাখিয়াছেন। একবার মাত্র তাঁহাকে চাঁদকবির সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধের সুযোগ দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতেও তাঁহার হয় পরাজয়। ইহার পর তাঁহার সকল বীরত্ব-ব্যঞ্জক উক্তিগুলি অসার দম্ভোক্তি ও শক্তি-হীনের আস্ফালন বলিয়াই মনে হয়—তাঁহার উপর হইতে পাঠকের সকল শ্রদ্ধাই দূর হয়। রুদ্রচণ্ডের জীবনের শেষ দৃশ্যটি অত্যন্ত করুণ। তাঁহার চোখে সেই প্রতিহিংসা-পরায়ণ দৃষ্টি আর নাই—তাহা স্নেহে কোমল হইয়া আসিয়াছে; তাঁহার চরিত্রে এই স্নেহই ছিল সত্য এবং প্রতিহিংসা-পরায়ণতা ছিল কৃত্রিম। সেইজন্য স্নেহের ভিতর দিয়াই রুদ্রচণ্ডের সহজ স্বরূপটি প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহার কণ্ঠে তাঁহার নিষ্ফল দম্ভোক্তিগুলি অপেক্ষা স্নেহ-সম্বোধন অধিকতর স্বাভাবিক হইয়াছে।

অমিয়ার চরিত্রসৃষ্টিতে লেখক সাধারণতঃ রোমান্টিক আদর্শে অনুপ্রাণিত হইলেও, কোন কোন স্থলে যেখানে বাস্তবের স্পর্শ লাগিয়াছে, সেখানে তাহা অত্যন্ত মনোরম হইয়াছে। তাহার বিকাশোন্মুখ যৌবনের অনাস্বাদিত-পূর্ব বেদনা তাহাকে এক দুর্ভাগ্য হইতে অনবরত অন্য দুর্ভাগ্যের তরঙ্গ-চূড়ায় উৎক্ষিপ্ত করিয়াছে। কিন্তু অন্তরের সৌন্দর্য হইতে সে কোনদিন ভ্রষ্ট হয় নাই। বিয়োগান্তক কাহিনীর নায়িকাগণ যে সকল গুণের জন্য সাধারণতঃ পাঠকের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হয়, তাহাদের সমস্তই তাহার মধ্যে ছিল। চরিত্রগত দৃঢ়তা তাহার ছিল না সত্য, কিন্তু কমনীয়তাই তাহার বিশেষ গুণ। এই চরিত্রটিই বিশেষ করিয়া এই নাট্যের গীতিরসের অনাবিল

প্রবাহ প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত অব্যাহত রাখিয়াছে। রুদ্রচণ্ডের পার্শ্বে এই চরিত্রটির বৈপরীত্য প্রকাশ পাইয়াছে—তাহা এই ক্ষুদ্র গীতিনাট্যটির অন্যতম বিশিষ্ট গুণ।

এই গীতিনাট্যের অন্যতম উল্লেখযোগ্য চরিত্র চাঁদকবি; কিন্তু ইহার সৃষ্টিতে লেখক কোন কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নাই। অমিয়ার সঙ্গে তাঁহার যে প্রণয়ের কাহিনী বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা কেবল অসম্পূর্ণ বলিয়াই যে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে না, তাহা নহে—তাহা একান্ত অস্বাভাবিক রোমান্টিক দৃষ্টিতে পরিপূর্ণ। মানব-মনের প্রণয়-বিকাশের যে এক স্বাভাবিক গতিপথের সন্ধান পাওয়া যায়, চাঁদকবি তাহা হইতে বহুদূরে বিচরণ করিয়াছেন। চাঁদকবি একদিকে কবি, আর একদিকে বীর যোদ্ধা, অন্য একদিকে কুমারীর প্রণয়াকাঙ্ক্ষী—এই সকল নানা বিচিত্র গুণের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনের ব্যর্থ প্রয়াসে তাঁহার চরিত্র-পরিকল্পনা নিষ্ফল হইয়াছে।

এই গীতিনাট্যের ভাষা সর্বতোভাবে নাট্যিক ভাষার প্রতিকূল। সেই জন্য রুদ্রচণ্ডের দীর্ঘ স্বগতোক্তিগুলি অত্যন্ত বৈচিত্র্যহীন ও নীরস বলিয়া মনে হয়। রবীন্দ্রনাথের নাটকীয় ভাষার তখনও জন্ম হয় নাই। পূর্বেই বলিয়াছি, রবীন্দ্রনাথের গাথারচনার যুগে এই গীতিনাট্যটি রচিত হয়। সেইজন্যই গাথার ভাষার প্রভাব ইহাতে সুস্পষ্ট। কিন্তু গাথার ভাষা হইতে ইহার ভাষা এক বিষয়ে নিকৃষ্ট। গাথার ছন্দ সর্বত্র মিত্রাক্ষর বলিয়া তাহার গীতিধর্ম অক্ষুণ্ণ থাকে। ইহার ছন্দ প্রকৃত অমিত্রাক্ষরও নহে, অথচ গাথার মিত্রাক্ষরও নহে—ইহা প্রায় আদ্যোপান্ত অমিত্র পয়ারে রচিত। ইংরেজি নাটক হইতে অমিত্রাক্ষরের বাহ্য প্রভাব ইহার উপর আসিয়া থাকিবে, কিন্তু ইহা স্বীকার্য যে, রবীন্দ্রনাথের নাট্যিক ভাষার রূপ তখনও তাঁহার রচনায় ধরা পড়ে নাই। শুধু তাহাই নহে, 'রুদ্রচণ্ডে'র রচনায় রবীন্দ্রনাথের জন্মলব্ধ কাব্য-ভাষাও স্থান পায় নাই। ইহার ভাষার মধ্যে কোন ধ্বনি নাই, কোন ঝঙ্কার নাই, কিংবা কোন রসও নাই।

'রুদ্রচণ্ডে'র সঙ্গে ইহার সমসাময়িক গীতিনাট্য 'ভগ্নহৃদয়ে' কিছু পার্থক্য আছে। 'রুদ্রচণ্ড' আখ্যায়িকা-প্রধান নাট্য। 'ভগ্নহৃদয়' আখ্যায়িকা-প্রধান নহে, ইহা গীতি-প্রধান। গীতি-কবিতার সূত্রে ইহাতে মূল আখ্যায়িকা অত্যন্ত শিথিলভাবে সংবদ্ধ হইয়াছে। 'রুদ্রচণ্ডে'র রচনা আখ্যায়িকা-প্রধান হওয়ার ফলে ইহার যে নাট্যিক গুণ কতকটা পরিলক্ষিত

হইয়াছিল, ইহা গীতি-প্রধান হওয়ার জন্য ইহাতে সেই গুণটুকুও সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়াছে। অতএব 'ভগ্নহৃদয়' রবীন্দ্রনাথের 'রুদ্রচণ্ডে'র সমসাময়িক রচনা হইলেও নাট্যিক বিচারে ইহার মূল্য তাঁহার 'রুদ্রচণ্ড' হইতে অনেক কম। লেখকও এই বিষয়ে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন। এই গীতিনাট্যটি যখন 'ভারতী' পত্রিকায় (১২৮৭, কার্ত্তিক, ৩৩৬) প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন তিনি ইহার ভূমিকায় লিখিয়াছিলেন, 'নিম্নলিখিত কাব্যটিকে যেন কাহারো নাটক বলিয়া ভ্রম না হয়। দৃশ্যকাব্য ফুলের গাছের মত; তাহাতে ফুল ফুটে, কিন্তু সে ফুলের সঙ্গে শিকড়, কাণ্ড, শাখা, পত্র, কাঁটাটি পর্যন্ত থাকা অনাবশ্যক। নিম্নলিখিত কাব্যটি ফুলের তোড়া। গাছের আর সমস্ত বাদ দিয়া কেবলমাত্র ফুলগুলি সংগ্রহ করা হইয়াছে। নাটকাকারে কাব্য লিখিত হইয়াছে।' রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি তাঁহার প্রায় সকল নাটক সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। নাটকাকারে কাব্য রচনাই তাঁহার নাট্যিক প্রতিভার বৈশিষ্ট্য এবং তাঁহার সাধনার সূচনাতেই তিনি এই বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছিলেন।

এই গীতিনাট্যটির রচনা-সম্বন্ধে তিনি তাঁহার 'জীবনস্মৃতি'তে লিখিয়াছেন—'ভগ্ন-হৃদয় যখন লিখতে আরম্ভ করেছিলেম, তখন আমার বয়স আঠারো। বাল্যও নয় যৌবনও নয়। বয়স এমন একটা সন্ধিস্থলে যেখান থেকে সত্যের আলোক স্পষ্ট পাবার সুবিধে নেই। একটু একটু আভাস পাওয়া যায় এবং খানিকটা ছায়া। এই সময়ে সন্ধ্যেবেলাকার ছায়ার মত কল্পনাটা অত্যন্ত দীর্ঘ এবং অপরিস্ফুট হ'য়ে থাকে। সত্যকার পৃথিবী একটা আজগুবি হ'য়ে ওঠে। মজা এই, তখন আমারই বয়স আঠারো ছিল, তা নয়—আমার আশেপাশে সকলের বয়স যেন আঠারো ছিল। আমরা সকলে মিলে একটা বস্তুহীন ভিত্তিহীন কল্পনালোকে বাস করতেম। সেই কল্পলোকের খুব তীব্র সুখদুঃখও স্বপ্নের সুখদুঃখের মত। অর্থাৎ তার পরিমাণ ওজন করবার কোনো সত্য পদার্থ ছিল না, কেবল নিজের মনটাই ছিল; তাই আপন মনে তিল তাল হ'য়ে উঠত।' 'ভগ্নহৃদয়ে'র অন্তর্নিহিত আদর্শবাদের ইহাই একমাত্র ব্যাখ্যা বলিয়া ধরিয়া লইতে পারা যায়।

'ভগ্নহৃদয়ে'র কাহিনীভাগ অত্যন্ত জটিল এবং এতই শিথিলগ্রন্থি যে ইহার মূল সূত্রটি উদ্ধার করা এক রকম দুরূহ। সংক্ষেপে তাহা বর্ণনা করা যাইতেছে—বনমধ্যে মুরলা একাকিনী আসীনা, সখী চপলা তাহার সন্ধানে আসিয়া তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিল যে, সেদিন অনিলের ফুল-শয্যা। তাহাতে তাহাদের

সকলকেই উপস্থিত থাকিতে হইবে। মুরলাকে সকল বিষয়ে উদাসীনা দেখিতে পাইয়া চপলা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'বল্‌ত, কার কথা তুই দিবারাত্র ভাবিস্?' মুরলা বলিল, যার কথা সে ভাবে সে অতি মহান্, তার নাম পর্যন্ত সে মুখে লইবার যোগ্য নহে। চপলা পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। মুরলা কবিকে দেখাইয়া দিল। কবি আসিয়া উপস্থিত হইল। চপলা চলিয়া গেল। কবিও মুরলার নিকট জানিতে চাহিল, সে কাহার জন্য সর্বদা এমন চিন্তা করে। কবির কথায় মুরলা ব্যথিত হইল, ভাবিল, তাহার মনোভাব এখনও তাহার অভীষ্ট প্রণয়ী জানিতে পারে নাই। তাহাকে তাহা জানিতে দিতেও তাহার পরম সঙ্কোচ বোধ হইতে লাগিল। মুরলার মনের কথা কবি জানিতে পারিল না। নলিনী অনিলের ফুলশয্যায় যাইবার জন্য ফুলবেশ পরিতেছে। তাহার সখীগণ তাহাকে মনের মতন করিয়া সাজাইয়া দিতেছে। তাহার এই ফুলবেশ ধারণের কারণ আর কিছুই নহে, সেদিন অনিল ও ললিতার ফুলশয্যা উপলক্ষে নলিনীর প্রণয়-প্রার্থীরা সকলেই উপস্থিত থাকিবে, তাহাদের মনোহরণ করিবার জন্যই নলিনীর এই আয়োজন। অনিল মুরলার ভ্রাতা। মুরলা তাহার ভ্রাতার নিকট কবির প্রতি তাহার অনুরক্তির কথা প্রকাশ করিয়া দিয়াছিল। কবি মুরলার প্রতি উদাসীন দেখিয়া সে কবিকে ভর্ৎসনা করিতে গেল, কিন্তু মুরলা তাহাতে বাধা দিল। কবি নলিনীর প্রণয়াসক্ত ছিল। এইজন্যই মুরলার প্রতি তাহার ঔদাসীন্য। নলিনীর প্রণয়াকাঙ্ক্ষীর অভাব ছিল না। প্রত্যেককে লইয়া সে হৃদয়হীন কৌতুক করিত, কাহারও প্রেমে সে ধরা দিত না—ইহাই ছিল তাহার আনন্দ। কবি মুরলাকে সখীর মতই জ্ঞান করে। কবির ম্লানমুখ দেখিয়া মুরলা তাহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। কবি মনের কথা তাহার কাছে খুলিয়া বলিল। নলিনীকে কবি ভালবাসিয়াছে শুনিয়া মুরলার হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল, কিন্তু বাহিরে সে তাহা প্রকাশ করিল না। সে মনে মনে এই ভাবিয়া সান্ত্বনা পাইতে গেল যে, নলিনীর মত সুন্দরীই কবির প্রিয় হইবার যোগ্য। কিন্তু নলিনী কবিকে উপেক্ষা করে। অবশেষে এই কৌতুকময়ী নলিনীও একদিন প্রেমের জালে ধরা দিল। সে কবিকে সত্যই একদিন ভালবাসিল। চাঞ্চল্যই ছিল যাহার স্বভাব, সে সহসা যেন কিসের স্পর্শে ভাবগম্ভীর হইয়া পড়িল; কবির সাক্ষাৎ লাভের জন্য পথের ধারে অপেক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু কবি আর আসে না। অন্যান্য প্রণয়ীদের সে ঘৃণা করিয়া তাড়াইয়া দিল। কবি

মুরলার কাছে আসিয়া নলিনীর প্রতি প্রগাঢ় প্রেমের কথা খুঁটিনাটি করিয়া বলিতে লাগিল। একদিন কবি মুরলাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমাকে নির্জনে বসিয়া বহুদিন কাঁদিতে দেখিয়াছি; বল, তুমি কাহাকেও ভালবাসিয়াছ কি না।' মুরলা মনের কথা ব্যক্ত করিতে পারিল না। মুরলা কবিকে যত্ন করিতে চাহিল, কিন্তু নলিনী কবির সঙ্গে যে আচরণ করে, তাহা কবি বারবার তাহার কাছে প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিল। মুরলা অন্তরে অন্তরে আঘাত পাইল, কিন্তু তাহার সখীর সুখে নিজেকে সুখী মনে করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। অবশেষে মনে করিল, সে সর্বত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসিনী হইবে। অনিল ললিতার কাছে প্রণয় নিবেদন করিয়া কোন সাড়া পায় নাই। ললিতা লজ্জার বাঁধ ভাঙ্গিয়া সেদিন তাহার প্রণয়ীর নিকট আত্মসমর্পণ করিতে পারে নাই। সেইজন্য অনিল সংসারত্যাগী হইয়া গিয়াছে। ললিতার প্রতি তাহার মন বিমুখ হইয়াছে। ললিতার এখন অনুতাপের সময় উপস্থিত হইয়াছে। সে প্রিয়তমকে সংসারে ফিরাইয়া আনিতে চায়; কিন্তু অনিলের প্রতি বিরূপতা কিছুতেই ঘুচে না। উভয়েই উভয়ের প্রতি অভিমানে উভয়কে আবার পরিত্যাগ করিল। সমগ্র রমণী জাতির উপর অনিলের বিতৃষ্ণা জন্মিয়া গেল। এদিকে পথশ্রান্তিতে অবসন্ন মুরলা একাকিনী বসিয়া নিজের অবস্থার কথা চিন্তা করিতেছে। সংসারত্যাগী ভ্রাতা অনিলের সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হইল—সে তাহাকে কবির উদ্দেশ্যে একবার পাঠাইল। মৃত্যুর পূর্বে একবার সে কবিকে দেখিয়া যাইবে, ইহাই তাহার সাধ। নলিনীর প্রণয়াকাঙ্ক্ষীরা তাহার কাছ হইতে উপেক্ষিত হইয়া একে একে সকলেই বিদায় লইয়া গিয়াছে। কবিও তাহার উপেক্ষার কথা স্মরণ করিয়া তাহার কাছে আর যাইতে সাহস পায় না। বিগতপ্রায়-যৌবনা নলিনীর নিঃসঙ্গ জীবন হাহাকার করিয়া উঠিল। মুরলার শেষ মুহূর্ত উপস্থিত হইয়াছে। তাহার পর্ণশয্যা-পার্শ্বে সখী চপলা, কবি ও অনিল আসীন। শেষ মুহূর্তে কবি সেদিন বুঝিতে পারিল যে, এতদিন এত কাছে ছিল বলিয়া মুরলার অন্তরের কথা সে বুঝিবার চেষ্টা করে নাই। মুরলা তাহাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছে; কবিও নিজের অন্তরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল, মুরলাকেই সে আন্তরিক ভালবাসিত। সে'কথা সেদিন মুমূর্ষু মুরলার কাছে সে স্বীকার করিল। মুরলার আবার বাঁচিয়া উঠিবার সাধ হইল। সে মৃত্যুশয্যায় কবির সঙ্গে ফুল-মালা বদল করিয়া অন্তিম নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। ললিতারও অন্তিম-

কাল উপস্থিত। তাহার মৃত্যুশয্যা-পার্শ্বে অনিল আসিয়া উপস্থিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে ললিতার সব শেষ হইয়া গেল।

এই গীতিনাট্যের মূল কাহিনীর নায়ক কবি ও নায়িকা মুরলা। ইহার মধ্যে অনিল ও ললিতার কাহিনী যেমন অপ্রাসঙ্গিক, তেমনই নলিনীর কাহিনীরও কোন সার্থকতা নাই। এই সকল কাহিনীর পারস্পরিক যোগ অত্যন্ত ক্ষীণ বলিয়া কাহিনীর দিক দিয়া রচনাটি অনাবশ্যক জটিল হইয়া পড়িয়াছে। ইহার ভাষা যদিও নাটকের ভাষা নহে, তথাপি গীতিকবিতার ভাষা হিসাবে মূল্যবান্। আদ্যোপান্ত রচনার মধ্যে কোথাও কোন জড়তা নাই, সুমার্জিত ও পরিপাটি ভাষার লাবণ্যে সমগ্র রচনাখানি উদ্ভাসিত। ইহার ছন্দে কোন কোন স্থলে রবীন্দ্রনাথের পূর্ববর্তী কোন কোন কবির বিশেষতঃ তাঁহার কাব্য-গুরু বিহারীলালের প্রভাব সুস্পষ্টভাবে অনুভব করা যায়। শুধু তাহাই নহে, ইহার ভিতর তাঁহার মৌলিক রচনা-শক্তির নিদর্শনও প্রচুর। ইহার মধ্যে গীতিকাব্যের লঘু ও চটুল ভাব এবং ভাষার যেমন অভাব নাই, তেমনই ইহাতে সুপরিণত ভাব-গাম্ভীর্যেরও আভাস রহিয়াছে। এই কাব্য-নাটিকাটির মধ্যে মুরলার চরিত্রসৃষ্টি অনুপম হইয়াছে। যদিও আদ্যোপান্ত রোমান্টিক আদর্শে ইহা গঠিত, তথাপি ইহার মধ্যে মানবোচিত কমনীয়তারও স্পর্শ রহিয়াছে—তাহাতেই কাব্যটি সুখপাঠ্য হইয়াছে। অন্তরের উদ্যত প্রেম প্রণয়ীর পায়ে অঞ্জলি দিতে গিয়া কুমারী-হৃদয়ের সুকুমার লজ্জা দ্বারা বার বার মুরলা প্রতিহত হইয়া ফিরিয়াছে। তারপর যখন সে শুনিতে পাইল যে, তাহার প্রণয়ী অন্যের প্রণয়াকাঙ্ক্ষী, তখনও তাহার অন্তরের সংযম অক্ষুণ্ণ রহিল। এই সংযমের মধ্যেই মুরলা-চরিত্রের সৌন্দর্য। দুঃখের অগ্নিপরীক্ষায় তাহার চরিত্র বার বার পুড়িয়া পুড়িয়া উজ্জ্বল হইয়াছে। অন্তিম মুহূর্তে তাহার জীবনে যে পরিপূর্ণতা দেখা দিল, তাহা আদর্শলোকের কল্পনা হইলেও কাব্যের সমাপ্তির জন্য ইহার পরম ও সুসঙ্গত সার্থকতা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে নলিনীর চরিত্রটি উল্লেখযোগ্য। জীবনের যে একটা দিক তাহার চরিত্রের ভিতর দিয়া কবি প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন, তাহা যেমন বাস্তব, তেমনি করুণ। জীবনে যে বস্তু সহজ আয়ত্তের অধীন, তাহাকেই তাচ্ছিল্যের অপমান সহ্য করিতে হয়। অবহেলার অভিমানে সেই বস্তু যখন আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যায়, তখন তাহার সম্বন্ধে দুর্লভতার বোধ

জন্মায়। কবি এই কথাটি তাঁহার বহু পরবর্তী রচনার মধ্যেও বলিতে চাহিয়াছেন। অতএব রবীন্দ্রনাথের সাধনার একটি মূল এবং মৌলিক সুর এই চরিত্রটির মধ্য দিয়া সর্বপ্রথম প্রকাশ পাইয়াছে।

বিহারীলাল চক্রবর্তীর 'সারদা-মঙ্গল' কাব্য প্রকাশিত হইবার পরের বৎসরই রবীন্দ্রনাথের 'বাল্মীকি-প্রতিভা' রচিত হয় এবং সেই বৎসরই জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীতে 'বিদ্বজ্জন সমাগম সভা'য় সর্বপ্রথম অভিনীত হয়। এই অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বাল্মীকির ভূমিকায় এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রী প্রতিভা দেবী সরস্বতীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। 'বাল্মীকি-প্রতিভা' নামের ইহাই ইতিহাস বলিয়া মনে হয়, নতুবা এই গীতিনাট্যের মধ্যে এই নামের আর কোন তাৎপর্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ইহার কাহিনীভাগ এই—দস্যুদলের অত্যাচারে অরণ্য শ্মশানে পরিণত হইল। বনদেবীর করুণ সঙ্গীতের ভিতর দিয়া অরণ্যের সেই ভয়ার্ত কাতরতা নিত্য প্রকাশ পায়। দস্যুদলের সর্দারের নাম বাল্মীকি। তাহার ইঙ্গিতে দস্যুরা বনমধ্যে দৌরাত্ম্য করিয়া বেড়ায়। বাল্মীকি তান্ত্রিকমতে কালীর উপাসক, নরবলি সেই উপাসনার অঙ্গ। দস্যুরা তাঁহার আদেশে অরণ্যে বলির সন্ধান করিয়া বেড়ায়। সারাদিন বনভ্রমণে ক্লান্ত একটি বালিকাকে ধরিয়া লইয়া একদিন দস্যুদল বাল্মীকির পুজাস্থলে উপস্থিত করিল। বাল্মীকি তাহাকে দেবীর সম্মুখে বলি দিতে উদ্যত হইলেন। এমন সময় নেপথ্য হইতে বনদেবীর কণ্ঠে এক অতি করুণ সঙ্গীত ধ্বনিত হইল। ইহাতে বাল্মীকির ভাবান্তর উপস্থিত হইল। তিনি বালিকার বন্ধন মুক্ত করিয়া দিয়া উদাসীনের মত বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। দস্যুরা ইহাতে দলপতির উপর বিরক্ত হইয়া বালিকাকে পুনরায় ধরিয়া আনিয়া কালী-প্রতিমা ঘেরিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। বাল্মীকি আসিয়া পুনরায় বালিকাকে মুক্ত করিয়া দিলেন। মনের এই ভাবান্তর দূর করিবার জন্য বাল্মীকি দস্যুদিগকে লইয়া শিকারে বাহির হইলেন; কিন্তু দয়াপরবশ হইয়া দলবলসহ এই দারুণ খেলাও পরিত্যাগ করিলেন; পুর্ববৎ উদাসভাবে বনে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। একদিন দেখিলেন, এক ব্যাধ ক্রৌঞ্চমিথুনকে লক্ষ্য করিয়া তীর ছুঁড়িতেছে; তাঁহার নিষেধ সত্ত্বেও ব্যাধ বাণ নিক্ষেপ করিল, ফলে একটি ক্রৌঞ্চ শরাহত হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল। বাল্মীকি আদিশ্লোক উচ্চারণ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সরস্বতী আবির্ভূতা হইলেন; তাঁহার জ্যোতির্ময়ী করুণা-মূর্তি দেখিয়া বাল্মীকি

অভিভূত হইলেন। কিন্তু সেই মুহূর্তেই দেবী অন্তর্হিতা হইলেন; তখন লক্ষ্মীর আবির্ভাব হইল, কিন্তু বাল্মীকি লক্ষ্মীকে বিসর্জন দিয়া সরস্বতীর সন্ধান করিতে লাগিলেন। সরস্বতী পুনরায় আবির্ভূতা হইয়া বাল্মীকিকে বর দান করিলেন।

আদ্যোপান্ত সঙ্গীত দ্বারা কাহিনীর সূত্র রচনা করা হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ ইহাকে 'সুরে নাটিকা' বলিয়াছেন। এই সকল সঙ্গীতের নাটকীয় উপযোগিতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজে বলিয়াছেন, 'যাঁহারা এই গীতিনাট্যের অভিনয় দেখিয়াছেন, তাঁহারা আশা কবি একথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, সঙ্গীতকে এইরূপ নাট্যকার্যে নিযুক্ত করাটা অসঙ্গত বা নিষ্ফল হয় নাই।' অভিনয়ের মধ্যে ইহা অসঙ্গত না হইবার একমাত্র কারণ, এই কাহিনীটির নাট্যিক গুণ। ইহা যে কেবল গীতাত্মক রচনা, তাহাই নহে—দৃশ্যাত্মক গুণও ইহার অন্যতম আকর্ষণ। দৃশ্যের পর দৃশ্যের মধ্য দিয়া ইহার ঘটনা এমন ভাবে নাটকীয় গতিতে অগ্রসর হইয়াছে যে, তাহা কোথাও রুদ্ধ হইয়া পড়িবার অবকাশ পায় নাই। বিচিত্র সুরের মধ্য দিয়া ইহার অভিনয় সেইজন্যই কতকটা সার্থকতা লাভ করিযাছিল। দেশীয় গীতিসুরের সঙ্গে ইহার মধ্যে কতকগুলি বিদেশীয় সুবও আনিয়া যোজনা করা হইয়াছিল; সঙ্গীতের সুরবৈচিত্র্যও ইহাব অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ছিল। রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্যগুলির মধ্যে ইহাই সর্বপ্রথম অভিনয়ের দিক দিয়া সাফল্য লাভ করিয়াছিল।

এই গীতিনাট্য বচনায় ববীন্দ্রনাথ তাঁহার পূর্ববর্তী নাটকগুলির পথ কতকটা পরিত্যাগ করিয়া আসিলেও, ইহার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের মৌলিক প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় না। ইহার মধ্যে বিহারীলালের নিকট ঋণ এত গভীর যে, ইহা রবীন্দ্র-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য হিসাবে কোন দিক দিয়াই বিচার করা সঙ্গত হয় না। তবে বিহারীলালের পরিকল্পনাটিকে এখানে নাটকীয় রূপ দেওয়া হইয়াছে, এই মাত্র এবং তাহাতেও যে রবীন্দ্রনাথ খুব বেশি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা নহে। পূর্বেই বলিয়াছি, এই নাটকের 'বাল্মীকি-প্রতিভা' নামের কোন সার্থকতা নাই। বিশেষতঃ আদিকবির জীবনের যে অংশ কাহিনীর মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা তাঁহার রত্নাকর নামীয় দস্যু-জীবনের কাহিনী; অতএব দস্যু-দলপতিকে এখানে বাল্মীকি বলিয়া উল্লেখ না করিয়া রত্নাকর বলিয়া উল্লেখ করাই সঙ্গত ছিল। কবি বাল্মীকি, কিন্তু দস্যু

রত্নাকর ; এখানে দস্যু রত্নাকরের মধ্যে সবে মাত্র কবিত্বের আশীর্বাদ লাভ ঘটিয়াছে—কবিত্বের বিকাশ হয় নাই ; অতএব এখানে আমরা রত্নাকরকেই পাইয়াছি, বাল্মীকিকে পাই নাই।

ইহার মধ্যে একমাত্র উল্লেখযোগ্য চরিত্র বাল্মীকি। কাহিনীর অপরিসর ক্ষেত্রে ইহাও সম্যক্ বিকাশ লাভ করিবার অবকাশ পায় নাই। ইহাতে দস্যু-সর্দার রত্নাকর-চরিত্রের নির্মমতার রূপটি অপরিস্ফুট রহিয়াছে। কেবল মাত্র সঙ্গীতোক্তির মধ্য দিয়া তাহা সম্যক্ পরিস্ফুট করাও সম্ভব নহে। সেইজন্য তাঁহার সত্যোপলব্ধির মধ্য দিয়া তাঁহার যে পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল, তাহার সঙ্গে তাঁহার পুর্বতন অবস্থার বাহ্যিক বৈপরীত্য সুস্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট হয় নাই। শেষ দৃশ্যে লক্ষ্মীর আবির্ভাব ও তিরোধান উভয়ই আকস্মিক এবং কিছুতেই কাহিনীর অবশ্যম্ভাবী পরিণতির ফল বলিয়া মনে হয় না। শুধু বিহারীলালের প্রসিদ্ধ উক্তিটি 'যাও লক্ষ্মী অলকায়, যাও লক্ষ্মী অমরায়, এসো না এ যোগিজন তপোবন দ্বারে'—ইহার উপর লক্ষ্য রাখিয়াই নাটকে ইহার স্থান দেওয়া হইয়াছে।

এই নাটকের মূল কথা হইতেছে করুণা। বিহারীলালের সারদাও এই করুণারূপিণী। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবিমন তখনও প্রেম-বিষয়ক রচনাতেই আসক্ত। প্রেমানুভূতিই তখন রবীন্দ্রনাথের আন্তরিক কবি-অনুভূতি ছিল ; সেইজন্য সেই যুগে প্রেমবিষয়ক গীতিনাট্যগুলির রচনার ভিতর দিয়া রবীন্দ্রনাথ মানবিক বৃত্তিগুলি যত স্পষ্ট প্রকাশ করিতে সক্ষম হইয়াছেন, 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র মধ্য দিয়া এই করুণামূলক মানবিক বৃত্তি তত স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিতে পারেন নাই ; প্রেম-বিষয়ক গীতিনাট্যগুলির মধ্যে যে অনুভূতির তীব্রতা দেখিতে পাওয়া যায়, করুণা-বিষয়ক নাটকটির মধ্যে অনুভূতির সেই তীব্রতা নাই। বিহারীলালের অনুভূতি ইহা অপেক্ষা অনেক তীব্র ও কার্যকরী। করুণা-বিষয়ক ভাবের প্রতি রবীন্দ্রনাথের তেমন কোন আন্তরিকতা ছিল বলিয়া মনে হয় না ; বিহারীলালের গীতিসুর তাঁহার সেই গীতিভাব-প্রভাবিত যুগে বিশেষভাবেই তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়াছিল বলিয়া তিনি তাহারই অনুকরণে এই গীতিনাট্যখানি রচনা করেন।

রবীন্দ্রনাথ বহু পরবর্তী কালে এই গীতিনাট্যটি সম্পর্কে যে 'মন্তব্য' করিয়াছেন, তাহা এখানে বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন, 'একটা সময় এসেছিল, যখন আমার গীতিকাব্যিক মনোবৃত্তির ফাঁকের মধ্যে

মধ্যে নাট্যের উঁকিঝুঁকি চল্‌ছিল। তখন 'সংসারের দেউড়ী পার হয়ে সবে ভিতর মহলে পা দিয়েছি; মানুষে-মানুষে সম্বন্ধের জাল বুনোনিটাই তখন বিশেষ করে ঔৎসুক্যের বিষয় হয়েছিল। 'বাল্মীকি-প্রতিভা'তে দস্যুর নির্মমতাকে ভেদ করে উচ্ছ্বসিত হ'লো তার অন্তর্গূঢ় করুণা। এইটেই ছিল তার স্বাভাবিক মানবত্ব, যেটা ঢাকা পড়েছিল অভ্যাসের কঠোরতায়। একদিন দ্বন্দ্ব ঘটল, ভিতরকার মানুষ হঠাৎ এল বাইরে (র-র ১)।' অভ্যাসের কঠোরতা ভেদ করে স্বাভাবিক মানবত্বের উদ্ধারই রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী যুগের নাট্যকাব্যগুলির মুখ্য বিষয়; কিন্তু পরবর্তী নাট্যকাব্যগুলির মধ্যে যে দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া এই মানবত্বের উদ্ধার হইয়াছে, ইহার মধ্যে তখনও তাহার আভাস পাওয়া যায় না।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগে রচিত গীতিনাট্যগুলির মধ্যে একখানি মাত্র নাটক গদ্যে রচিত হইয়াছিল—তাহার নাম 'নলিনী'। রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্যের প্রধান আকর্ষণই তাঁহার স্বরচিত সঙ্গীতগুলি; এই নাটক-খানির মধ্যে কয়েকটি গানের সন্নিবেশ করা হইলেও, আদ্যোপান্ত ইহার গদ্য রচনা সমসাময়িক পাঠক সমাজের রুচিকর বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। নাটকখানির গদ্যে রচিত হইবার একটি ইতিহাস আছে এবং তাহার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অন্তরের যোগ খুব নিবিড় নহে। নাট্যরচনার ক্ষেত্রে এই গদ্যরচনার প্রেরণা রবীন্দ্রনাথের আন্তরিক নহে, ইহা বাহ্যিক। বিশেষতঃ ইহার বিষয়বস্তু রবীন্দ্রনাথের পুর্ববর্তী গীতিনাট্য 'ভগ্নহৃদয়'এর সমধর্মী এবং পরবর্তী গীতিনাট্য 'মায়ার খেলা'র অনুরূপ। অতএব গদ্য-রচনা হইয়াও বিষয়-ধর্মে ইহা গীতি-রচনারই সহোদর—ইহার গদ্য-রচনার মধ্য দিয়া এই গীতিভাবের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। সেইজন্যই বাহিরের দিক হইতে ইহা রবীন্দ্রনাথের সর্বপ্রথম গদ্য-নাটক বলিয়া মনে হইলেও, ইহা তাঁহার পরবর্তী যুগের অন্যান্য গদ্য-নাটকের সঙ্গে কোন রকম ঐতিহাসিক যোগসূত্রে আবদ্ধ নহে, বরং ইহার প্রকৃতি বিচার করিয়া ইহাকে তাঁহার গীতিনাট্যেরই অন্তর্ভুক্ত বলিয়া নির্দেশ করিতে হয়। কাহিনীটি সংক্ষেপে এইরূপ—নীরদ নবীন যুবক; সে নলিনী নাম্নী তাহার প্রতিবেশি-কন্যাকে ভালবাসে। কিন্তু নলিনীর যৌবন তখনও মুকুলিত হয় নাই—নীরদের প্রতি তাহার প্রণয়ের কোন প্রত্যক্ষ পরিচয় পাওয়া যায় না; কিন্তু তথাপি নলিনী তাহার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে—তাহা যে

কিসের আকর্ষণ তাহা সে বুঝিতে পারে না। নবীন নামে আর একজন যুবকও নলিনীর কাছে যাতায়াত করিয়া থাকে। সে নীরদের মত এত গম্ভীর প্রকৃতির নহে, সে নলিনীর সঙ্গে হাস্য-পরিহাস করিয়া কাটায়। নলিনীর নিকট হইতে কোন প্রণয়াভাস না পাইয়া নীরদ একদিন দেশত্যাগী হইল। নীরদ চলিয়া গেলে নলিনীর চৈতন্য হইল; সে বার বার জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার সংবাদ জানিতে চাহিল। কিন্তু কেহই তাহার প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারিল না। নীরদ নিরুদ্দেশ হইবার পর নলিনীর মধ্যে যে ভাবান্তর দেখা দিল, তাহা নবীন লক্ষ্য করিল; সে বুঝিল, নলিনী নীরদেরই যথার্থ অনুরাগিণী; তাহার সঙ্গে এতদিন যে চাপল্য প্রকাশ করিয়াছে, তাহার মধ্যে কোনরূপ প্রণয়ের স্পর্শ নাই। নলিনী নীরদের ধ্যানে সর্বদা নিঃসঙ্গ সময় কাটায়—সঙ্গিনীদের সহিত মিশে না, নবীনের আহ্বানে সাড়া দেয় না। বিদেশে গিয়া নীরদ নীরজা নাম্নী এক যুবতীর প্রতি আকৃষ্ট হইল। নীরজাও নীরদকে ভালবাসিল, কিন্তু নীরদের ব্যথা কোথায় তাহাও তাহার বুঝিতে বাকি রহিল না। নীরদ নীরজাকে বিবাহ করিয়া তাহাকে লইয়া দেশে ফিরিল। একদিন নলিনীদের বাড়ীতে বসন্তোৎসবে তাহার নিমন্ত্রণ হইল, সে নীরজাকে সঙ্গে লইয়া উৎসবে গিয়া উপস্থিত হইল; দেখিল, নলিনী শীর্ণা হইয়া গিয়াছে, তাহার পূর্ব কান্তি আর নাই। নলিনী নীরদের কাছে আসিল; তাহার সঙ্গে কথা বলিয়াই সে মূর্ছিতা হইয়া পড়িয়া গেল; নীরজা নলিনীর সেবা করিয়া তাহাকে সুস্থ করিল। নীরজা নলিনী ও নীরদের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া তাহাদের মধ্যে মিলন ঘটাইবার জন্য সঙ্কল্প করিল। শেষ দৃশ্যে মুমূর্ষু নীরজা নলিনীকে নীরদের হাতে তুলিয়া দিয়া শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল।

এই নাটকখানির ত্রুটি সম্বন্ধে অবহিত হইয়া রবীন্দ্রনাথ ইহা রচনার অনতিকাল ব্যবধানেই ইহার সংশোধিত রূপে তাঁহার পরবর্তী গীতিনাট্য 'মায়ার খেলা' রচনা করিলেন।

'নলিনী' রচনার সঙ্গে সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য রচনার যুগের অবসান হইয়া নাট্যকাব্য রচনার যুগের সূত্রপাত হয়; কিন্তু এই সময় বিশেষ প্রয়োজনের অনুরোধে তাঁহাকে আর একখানি গীতিনাট্য রচনায় হস্তক্ষেপ করিতে হয়— তাহার নাম 'মায়ার খেলা'। নাট্যকাব্য রচনার যুগের সূচনাতেই যে তাঁহার গীতিনাট্য রচনার সমগ্র প্রেরণা নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছিল, তাহা এই

গীতিনাট্যখানির রচনার ইতিহাস হইতেই জানিতে পারা যাইবে। প্রথমতঃ ইহা প্রয়োজনের অনুরোধে রচিত হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা ভগিনী স্বর্ণকুমারী দেবী 'সখি-সমিতি' নামক এক নারীহিতকর প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছিলেন, ইহারই উদ্যোগে 'মহিলা-শিল্পমেলা'র অধিবেশনের ব্যবস্থা করা হইত। স্বর্গীয়া সরলা রায় এই 'মহিলা-শিল্পমেলা'য় অভিনয়োপযোগী একটি গীতিনাট্য লিখিয়া দিবার জন্য রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করেন। তাঁহারই অনুরোধ রক্ষাকল্পে রবীন্দ্রনাথ 'মায়ার খেলা' রচনা করেন। গীতিনাট্যরচনার মৌলিক প্রেরণা তাঁহার মধ্যে যে তখন সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছিল, তাহার প্রমাণ—এই গীতিনাট্যখানি প্রকৃতপক্ষে তাঁহার পূর্ববর্তী নাটক 'নলিনী'রই একটি সংশোধিত রূপ মাত্র। অতএব রচনার কালানুসারে ইহা রবীন্দ্রনাথের নাট্যকাব্য রচনার যুগের অন্তর্গত হইলেও, ভাব এবং আঙ্গিকের দিক দিয়া ইহা তাঁহার পূর্ববর্তী যুগের রচনার অন্তর্ভুক্ত বলিয়াই গ্রহণ করিতে হয়।

রবীন্দ্রনাথের 'মানসী' কাব্যগ্রন্থ তখনও প্রকাশিত না হইলেও, 'মায়ার খেলা' প্রধানতঃ 'মানসী'র কবিতাগুলি যখন রচিত হইতেছিল, তখনই রচিত হয়, অতএব ইহা 'মানসী'র যুগের অন্তর্ভুক্ত রচনা বলিয়াই গৃহীত হইয়া থাকে। ইতিপূর্বে প্রকাশিত 'কড়ি ও কোমল'-এর মধ্যে যৌবনের সৌন্দর্যানুভূতির যে আকুতি প্রকাশ পাইয়াছে, 'মায়ার খেলাতে'ও তাহারই অভিব্যক্তি দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক এই কবি-মনোভাব ইহাতে অত্যন্ত স্পষ্ট। ইহা প্রেম-বিষয়ক নাট্যরচনাগুলির অন্যতম হইলেও রচনার দিক দিয়া অন্যান্য এই শ্রেণীর নাটকের অনুরূপ নহে—রচনার দিক দিয়া ইহা 'বাল্মীকি-প্রতিভার'ই অনুরূপ। অর্থাৎ ইহাও আদ্যোপান্ত সঙ্গীতের মধ্য দিয়াই রচিত নাটক। এমন কি, বিচ্ছিন্ন গানের মধ্য হইতে ইহার আখ্যান সংগ্রহ করা সহসা পাঠকদের পক্ষে দুরূহ বোধ হইতে পারে বিবেচনায় নাটকের প্রথমেই ইহার কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা এইরূপ—মানব-হৃদয়ে মায়াকুমারীরা কুহকশক্তিবলে হাসি, কান্না, মিলন, বিরহ, বাসনা, লজ্জা ও প্রেমের মোহ সৃষ্টি করিয়া থাকে। একদিন বসন্ত রাত্রিতে তাহারা প্রমোদপুরের যুবক-যুবতীদিগের মনে প্রেমের উন্মেষ করিবার বাসনা করিল। অমর নবযুবক, সে বিশ্বসৌন্দর্যের মধ্যে আপনার মানসী-প্রতিমার সন্ধান করিয়া বেড়াইতেছে, কিন্তু কোথাও সন্ধান পাইতেছে না। শান্তা তাহার নবমুকুলিত কুমারী-হৃদয় অমরকে সমর্পণ করিয়াছে, কিন্তু অতি-পরিচয়ের

অবজ্ঞা-বশতঃ অমর শান্তার প্রতি আসক্ত হইতে পারে না। প্রমদা কুমারী, কিন্তু এখনও তাহার হৃদয়ে প্রেমের স্পর্শ লাগে নাই; সে বসন্ত বায়ু-হিল্লোলের মত ক্রীড়া-চঞ্চল, কোন বস্তুতেই তাহার হৃদয় আসক্ত হইতে পারে না; এই অনাসক্ত আনন্দই তাহার গর্ব, মায়াকুমারীগণ তাহার হৃদয়ে প্রেমের সঞ্চার করিয়া তাহার গর্ব চূর্ণ করিবার সঙ্কল্প করিল। অমর প্রমদাকে দেখিয়া তাহার প্রতি আসক্ত হইল, প্রমদাও তাহাকে দেখিয়া তাহার স্বাভাবিক চঞ্চলতা পরিহার করিয়া তাহার প্রতি কৌতূহলাক্রান্ত হইল; প্রমদার সখীগণ উভয়ের ভাবই লক্ষ্য করিল, তাহারা অমরের প্রতি বিরূপ হইয়া তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া তাড়াইয়া দিল। ভগ্ন হৃদয়ে অমর এইবার আসিয়া শান্তাকে আশ্রয় করিল, অবসর মুহূর্তে শান্তার প্রেম নিজের প্রাণে অনুভব করিল এবং তাহার সঙ্গেই তাহার মিলনের আয়োজন করিতে লাগিল। প্রমদার সহচরীগণ মনে করিয়াছিল, অমর ফিরিয়া আসিবে, কিন্তু সে ফিরিল না; প্রমদা হতাশায় দিন যাপন করিতে লাগিল। শান্তা ও অমরের মিলনোৎসবের দিনে অমর যখন শান্তার কণ্ঠে বরণ-মাল্য পরাইতে যাইতেছে, সেই মুহূর্তে মলিন ছায়ার মত প্রমদা আসিয়া প্রবেশ করিল; অমরের হাত হইতে পুষ্পমাল্য খসিয়া পড়িয়া গেল। শান্তা বুঝিতে পারিল, অমর ও প্রমদা পরস্পর প্রণয়াবদ্ধ; তখন সে তাহাদের মিলন নিষ্পন্ন করিয়া দিতে চাহিল। কিন্তু প্রমদা বলিল, 'আমার বেলা গিয়াছে, খেলা ফুরাইয়াছে—তুমি এই মালা গলায় পর, তোমার নূতন সুখ পূর্ণ হউক।' অমর বলিল, 'আমারও সুখের সমাধি হইয়াছে, এখন আমার এই অশ্রুসিক্ত মাল্য আর কাহার গলায় পরাইব, কেই বা তাহা লইতে চাহিবে?' শান্তা বলিল, 'আমি লইব, আমার নিজের সকল দুঃখ গোপন করিয়া তোমার দুঃখের ভার বুকে লইয়া বেড়াইব।' অমর ও শান্তার মিলন হইল। প্রমদা ম্লানমুখে বিদায় হইল।

এই আখ্যানভাগ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে, 'ইহা কোন সমাজ-বিশেষে বদ্ধ নহে। সঙ্গীতের কল্পরাজ্যে সমাজ-নিয়মের প্রাচীর তুলিবার আবশ্যক বিবেচনা করি নাই। কেবল বিনীতভাবে ভরসা করি, এই গ্রন্থে সাধারণ মানব-প্রকৃতি-বিরুদ্ধ কিছু নাই'—(প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন)। এই দিক দিয়া ইহা বিশেষ ভাবেই কাব্যের লক্ষণাক্রান্ত, নাটকের লক্ষণ ইহাতে কিছুমাত্র নাই। 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র কাহিনীর মধ্যে যে একটি নাট্যিক গুণ ছিল, ইহাতে তাহাও নাই। একটি বিশিষ্ট ঘটনা-প্রবাহকে প্রাধান্য দিবার

ফলে 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র মধ্যে নাট্যিক গুণের বিকাশ হইয়াছিল, কিন্তু হৃদয়াবেগকেই ইহাতে মুখ্য করার ফলে ইহার মধ্যে সেই গুণ বিকাশ লাভ করিতে পারে নাই। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র গীতিনাট্যের মধ্যে ভাবে ও বিষয়ে ইহাই সর্বাপেক্ষা গীতি-প্রবণ। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, ইহা প্রধানতঃ রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্যরচনার যুগের অন্তর্ভুক্ত রচনা নহে, ইহা তাঁহার 'মানসী' কাব্য রচনার যুগের রচনা। সেইজন্য 'মানসী'র কবি-মনোভাব ইহার মধ্যে এত স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং কাব্যের দাবীই ইহাতে সমধিক। ইহাতে একদিক দিয়া রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কবি-মনোভাব যেমন প্রত্যক্ষ হইয়াছে, তেমনই ইহার মধ্যেই তাঁহার পরবর্তী নাট্যরচনার যুগের ভাষাগত পূর্বাভাসও সূচিত হইয়াছে।

'মায়ার খেলা'র কোন চরিত্রই ব্যক্তিরূপ লইয়া প্রকাশ পায় নাই, ভাবরূপেই তাহারা প্রকাশমান। চরিত্রগুলির মধ্যে স্বভাব ও অভ্যাসের দ্বন্দ্বই ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং এই দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়াই চরিত্রগুলির যথাসম্ভব বিকাশ নির্দেশ করা হইয়াছে। 'মায়ার খেলা'য় অমরের হৃদয়ের মধ্যে যখন প্রেমের সঞ্চার হইল, তখন শান্তাকে সম্মুখে পাইয়াও সে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল না—নিত্য সান্নিধ্যের অভ্যাসে তাহার প্রতি তাহার প্রেম বিকাশ লাভ করিবার সুযোগ পাইল না। আর প্রমদা 'আপনার স্বভাবকেই জান্‌তে পারেনি অহংকারে, অবশেষে ভিতর থেকে বাজ্‌ল বেদনা, ভাঙ্‌ল মিথ্যে অহংকার, প্রকাশ পেল সত্যকার নারী।' শান্তা অমরকে অন্যের প্রতি আসক্ত জানিয়াও, তাহাকে বরণ করিয়া লইয়া অভ্যাস দ্বারা স্বভাবকে জয় করিল। প্রমদার ব্যর্থতা এই গীতিনাট্যে অধিকতর স্পষ্ট হইয়া উঠিলেও, শান্তার ত্যাগ ইহার মধ্যে মহত্তর—তবে অপরিসর রচনায় তাহা সুপরিস্ফুট হইতে পারে নাই। 'নলিনী' নাটকের নবীন চরিত্রটি এই নাটকে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

গীতিনাট্য রচনার যুগ উত্তীর্ণ হইবার বহুকাল পর রবীন্দ্রনাথ আর একখানি প্রায় এই শ্রেণীর নাটক রচনা করিয়াছিলেন—তাহার নাম 'চণ্ডালিকা'। সেই যুগে মৌলিক বিষয়বস্তু লইয়া নাট্যরচনার ধারাও তাঁহার নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছিল। আলোচ্য নাটকের বিষয়বস্তুটি তিনি একটি প্রচলিত বৌদ্ধ আখ্যান হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিষয়বস্তুর দিক দিয়া ইহা রবীন্দ্রনাথের নাট্যকাব্যগুলির সমধর্মী, কিন্তু রচনার দিক দিয়া ইহা

তাঁহার গীতিনাট্যগুলির পর্যায়ভুক্ত করিতে হয়—অবশ্য দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানের জন্য ইহার সঙ্গে স্বভাবতঃই তাহার পূর্ববর্তী গীতিনাট্যগুলির ভাষাগত ঐক্য রক্ষিত হইতে পারে নাই। এই নাটিকাটি অবলম্বন করিয়া রবীন্দ্রনাথ অল্পদিন পরই 'নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা' নামে একখানি স্বতন্ত্র নৃত্যনাট্য রচনা করেন। তাহার আলোচনা-সম্পর্কে ইহার কাহিনীর সারাংশটি উল্লেখ করিয়াছি বলিয়া এখানে তাহা আর উল্লেখ করা হয় নাই।

নাটক হিসাবে 'চণ্ডালিকা'র প্রধান ত্রুটি এই যে, ইহার কাহিনীর পরিণতি একটি অলৌকিক ক্রিয়ার উপর নির্ভর করিয়াছে। বিশেষতঃ ইহার মধ্যে যে দ্বন্দ্বের অবতারণা করা হইয়াছে, তাহা প্রত্যক্ষগোচর নহে, বরং অপ্রত্যক্ষ বর্ণনার বিষয়ীভূত। সেইজন্য ইহার মধ্যে উচ্চাঙ্গের নাট্যিক গুণ থাকিলেও তাহা রসস্ফূর্তি লাভ করিতে পারে নাই; ইহার দুইটি দৃশ্যের মধ্যে মাত্র দুইটি চরিত্র—চণ্ডাল-কন্যা প্রকৃতি ও তাহার জননী, তৃতীয় চরিত্র বুদ্ধশিষ্য আনন্দ কাহিনীতে অপ্রত্যক্ষ হইয়া রহিয়াছে। অথচ কেবল মাত্র এই দুইটি চরিত্রের ভিতর দিয়া একটি অতি দ্বন্দ্বসঙ্কুল কাহিনী প্রকাশ পাইবার ফলে ইহার মধ্যে রসবৈচিত্র্যও সৃষ্টি হইবার অবকাশ পায় নাই। 'নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা'য় এই দোষটি নাট্যকার খণ্ডন করিয়া লইয়াছিলেন। 'চণ্ডালিকা'র কাহিনীর সমাপ্তিটি অস্পষ্ট রহিয়া গিয়াছে বলিয়া ইহা দর্শক কিংবা পাঠকের মনে কোন কার্যকর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। 'নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা'য় এই সকল ত্রুটি কিছু কিছু সংশোধিত হইয়াছিল বলিয়া যথাস্থানে তাহার বিস্তৃততর আলোচনা করা হইয়াছে। তবে 'চণ্ডালিকা' সম্বন্ধে একটি কথা এখানে উপেক্ষা করা যায় না—তাহা ইহার ভাষা। সঙ্গীত ব্যতীত ইহার অন্যান্য অংশ রবীন্দ্রনাথের তৎকালীন গদ্যে রচিত, এই গদ্য যেমন প্রত্যক্ষ, তেমনই সতেজ—নাটকীয় ভাষার যথার্থ রূপ ইহাতে আছে, কিন্তু 'নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা'য় এই বিশেষ গুণটির অভাব আছে।

নাট্যকাব্য

গীতিনাট্য রচনার যুগ অবসান হইলে রবীন্দ্রনাথের নাট্যকাব্য রচনার যুগের সূত্রপাত হয়। গীতিনাট্য রচনার যুগের সঙ্গে কতকগুলি বিষয়ে ইহার সুস্পষ্ট পার্থক্য অতি সহজেই অনুভূত হইতে পারে। প্রথম পার্থক্য কাহিনী-পরিকল্পনার দিক দিয়া। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, গীতিনাট্যগুলির মধ্যে গীতিসুরের প্রাবল্যে কাহিনীর বাঁধ সর্বত্রই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—বিশেষতঃ রোমান্স-প্রবণতায় সেই অস্পষ্ট কাহিনীও ধরণীর ধূলিমাটি হইতে এত উর্ধ্বে উঠিয়া গিয়াছে যে, তাহার ফলে সেই অকিঞ্চিৎকর কাহিনীও পাঠকের অন্তরের সঙ্গে কোন যোগ স্থাপন করিয়া উঠিতে পারে নাই। কিন্তু নাট্যকাব্যগুলির মধ্যে কাহিনী দৃঢ়সংবদ্ধতা লাভ করিয়াছে, ধূম্র ও বাষ্পরাশি হইতে সুপরিণত জলবিন্দুর সৃষ্টি হইয়াছে এবং তাহা আকাশ হইতে নামিয়া আসিয়া ধরিত্রীর সর্বাঙ্গে স্নেহসিক্ত কল্যাণস্পর্শ বুলাইয়া দিয়াছে ; রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি অন্তরের একান্ত আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া এই সর্বপ্রথম বিশ্বসংসারের দিকে চোখ মেলিয়া তাকাইয়াছে। এই নাট্যকাব্য রচনার যুগে রবীন্দ্রনাথের যে কেবল শ্রেষ্ঠ কয়খানি নাটকই রচিত হয়, তাহা নহে—এই যুগই রবীন্দ্র-সাহিত্যের সমৃদ্ধতম যুগ বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। কাব্যসাধনায় রবীন্দ্রনাথ তখন 'মানসী'র ভিতর দিয়া 'সোনার তরী'তে পৌছিয়াছেন, তাহারই সমসাময়িক কালে রবীন্দ্র-সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ 'গল্পগুচ্ছে'র ছোট গল্পগুলিও রচিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। বিস্তৃতি, বৈচিত্র্য ও সমৃদ্ধিতে রবীন্দ্র-সাহিত্য সেই যুগেই চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। রবীন্দ্র-সাধনার এই যুগের আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, তিনি তাঁহার সমগ্র জীবনের মধ্যে একমাত্র সেই সময়ই বাস্তব সমাজ-জীবনের প্রত্যক্ষ সংস্রবে আসিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। শিলাইদহে বাসকালীন বাংলার যে বিচিত্র জীবন তিনি সেদিন প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাহার সাক্ষাৎ প্রেরণা দ্বারাই তাঁহার সে যুগের সাহিত্য সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ তখনও আধ্যাত্মিকতার জগতে প্রবেশ করেন নাই। প্রত্যক্ষ জগৎ ও প্রত্যক্ষ জীবনই তখনও তাঁহার নিকট চরম ও পরম সত্য। মানুষের প্রাত্যহিক সুখদুঃখ,

আশানৈরাশ্যই সেদিন তাঁহার ধ্যানদৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। প্রতিভার সেই মধ্যাহ্ন-দীপ্তিতে জগৎ ও জীবন সম্পর্কিত সেই বাস্তব চৈতন্যের মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নাট্যরচনার শ্রেষ্ঠ সম্পদ নাট্যকাব্য কয়খানি রচনা করিয়াছেন।

'মানসী', 'সোনার তরী', 'চিত্রা'র পটভূমিকায় প্রধানতঃ এই নাট্যকাব্যগুলি রচিত। সেইজন্যই মানব-প্রীতিই এই নাটকগুলির অন্যতম প্রধান উপজীব্য। এই নাট্যকাব্যগুলির মধ্যেও কবির আত্মসচেতনতার ভাব খুব প্রখর বলিয়া অনুভূত হয়। কাব্য ও নাট্যরচনায় রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ব্যক্তি-চৈতন্য সমানভাবেই কার্যকর হইয়াছে; নাট্যরচনার মধ্যে আত্মবিলুপ্তির যে একটা দাবী আছে, তাহা এখানে স্বীকৃত হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের পূর্ববর্তী গীতিনাট্যগুলির মধ্যে কবির এই আত্মসচেতনতার ভাব এত প্রখর ছিল না বলিয়া তাহাদের দুই একটির মধ্যে কাহিনীগত গুণের যে বিকাশ দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল, নাট্যকাব্যগুলির মধ্যে তাহার অভাব আছে। ইহাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব বক্তব্যটি বড় স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে; ইহা দ্বারা ইহাদের নাট্যগুণ বহুলাংশে যে খর্ব হইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য।

গীতিনাট্যগুলির মধ্যে যে একটি বিষাদের সুর শুনিতে পাওয়া গিয়াছিল, নাট্যকাব্যগুলির মধ্যে তাহা নাই। গীতিনাট্যগুলির কাহিনীর মধ্যে আদ্যোপান্ত একটি বেদনার রাগিণী বাজিয়া গিয়াছে, নাট্যকাব্যগুলির সুরে সেই বিষণ্ণ ভাবের যে অভাব আছে, তাহা নহে—কিন্তু তাহা সংসারের বিচিত্র রাগিণীর সঙ্গে একাকার হইয়া আছে—তাহা স্বতন্ত্র করিয়া অনুভব করা যায় না।

নাট্যকাব্যগুলির অন্যতম বিষয়—গীতিনাট্যগুলির মত কেবল মাত্র প্রেমেব জন্যই প্রেম নহে, কল্যাণের জন্য প্রেম। যে প্রেম কল্যাণের জন্য আত্মোৎসর্গ স্বীকার করে না, সেই প্রেম ব্যর্থ। রবীন্দ্রনাথের প্রেম-বিষয়ক যে দৃষ্টি গীতিনাট্যগুলির মধ্যে কেবলমাত্র স্বার্থপরতার সঙ্কীর্ণতায় আবদ্ধ হইয়াছিল, নাট্যকাব্যগুলির মধ্যে তাহাই সহস্র ধারায় যেন বিশ্বের কল্যাণের ক্ষেত্রে নামিয়া আসিল। এই প্রেম কথাটিকে এখানে কিছু ব্যাপকভাবে বুঝিতে হইবে।

ধর্ম সম্পর্কেও রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট একটি মনোভাব সর্বপ্রথম এই নাট্য-কাব্যগুলির মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। যে ধর্মপালনের সঙ্গে হৃদয়ের সম্পর্ক

নাই, সেই ধর্ম সত্য ধর্ম নহে—হৃদয়ধর্মই প্রকৃত সত্যধর্ম। এই সম্পর্কে তিনি নিজেও লিখিয়াছেন,—'আমার মনের মধ্যে ধর্মের প্রেরণা তখন গৌরীশংকরের উত্তুঙ্গ শিখরে শুভ্র নির্মল তুষারপুঞ্জের মতো নির্মল নির্বিকল্প হয়ে শুব্ধ ছিল না, সে বিগলিত হয়ে মানবলোকে বিচিত্র মঙ্গলরূপে মৈত্রীরূপে আপনাকে প্রকাশ করতে আরম্ভ করেছে। নির্বিকার তত্ত্ব নয় সে, মূর্তিশালার মাটিতে পাথরে নানা অদ্ভুত আকার নিয়ে মানুষকে সে হতবুদ্ধি করতে আসে নি'। কোনো দৈববাণীকে সে আশ্রয় করে নি'। সত্য যার স্বভাবে, যে মানুষের অন্তরে অপরিমেয় করুণা তার অন্তঃকরণ থেকে এই পরিপূর্ণ মানব-দেবতার আবির্ভাব অন্য মানুষের চিত্তে প্রতিফলিত হতে থাকে। সকল আনুষ্ঠানিক সকল পৌরাণিক ধর্ম-জটিলতা ভেদ করে তবেই এ'র যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ হতে পারে (র-র-৪)।'

এই নাট্যকাব্যগুলির দুই একখানির মধ্যে নারীর ব্যক্তিত্ব-সম্পর্কিত রবীন্দ্রনাথের পাশ্চাত্ত্য শিক্ষালব্ধ একটি বিশিষ্ট ধারণাও বিশেষ কার্যকরী হইয়াছে—ভারতীয় নারীত্বের আদর্শ তাহার সম্মুখে কতকটা বিপর্যস্ত হইলেও ইহার মধ্য দিয়া রবীন্দ্রনাথ নারীত্বের যে একটা নূতন কল্যাণ-রূপের সন্ধান দিয়াছেন, তাহা উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর নবপ্রবুদ্ধ সামাজিক চৈতন্যের যুগে বিশেষ মূল্যবান্ বলিয়াই বিবেচিত হইয়াছিল।

'প্রকৃতির প্রতিশোধ' রবীন্দ্রনাথের রচিত সর্বপ্রথম মৌলিক নাট্যকাব্য। ইহার পূর্বে তাঁহার একজন গৃহশিক্ষকের সহায়তায় তিনি সমগ্র 'ম্যাকবেথ' নাটকের পদ্যানুবাদ করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ অনুবাদটি হারাইয়া যায়। ষোলটি দৃশ্যে বিভক্ত অমিত্র পয়ার ও গদ্যের সংমিশ্রণে রচিত 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' একটি নাটিকা। ইহার আকার ক্ষুদ্র হইলেও নাট্যকাব্যের আদর্শেই ইহা রচিত হইয়াছে। এই নাটিকাটি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজেও বলিয়াছেন, 'এই আমার হাতের প্রথম নাটক যা গানের ছাঁচে ঢালা নয়। এই বইটি কাব্যে এবং নাট্যে মিলিত। সন্ন্যাসীর যা অন্তরের কথা তা প্রকাশ হয়েছে কবিতায়। সে তার একলার কথা। এই আত্মকেন্দ্রিক বৈরাগীকে ঘিরে প্রাত্যহিক সংসার নানারূপে নানা কোলাহলে মুখরিত হয়ে উঠেছে। এই কলরবের বিশেষত্বই তার অকিঞ্চিৎকরতা। এই বৈপরীত্যকে নাট্যিক বলা যেতে পারে (র র ১, 'কবির মন্তব্য')।' এই নাটকের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব পরিস্ফুট করিবার প্রয়াস দেখা যায়, তাহা সর্বতোভাবেই অন্তর্মুখী। তাহা অন্তরাশ্রিত

হইয়া রহিয়াছে বলিয়াই বাহিরের কোলাহলপূর্ণ জনতাকে কবি তাহার পার্শ্বেই আনিয়া স্থান দিয়াছেন। বাহিরের বিচিত্র সংসার-জীবনের বিরুদ্ধে নায়কের আত্মকেন্দ্রিক জীবন যে সংঘাতের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাই ইহার একমাত্র নাট্যিক গুণ। কাহিনীর দিক দিয়া নাটকটি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হইলেও, ইহার মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী কয়েকটি শ্রেষ্ঠ নাট্যকাব্যের বীজ প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে বলিয়া অনুভব করা যায়।

'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাট্যকাব্যটি রচনা করিবার অব্যবহিত পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ 'প্রভাত-সঙ্গীত' ও 'ছবি ও গান' নামক কাব্যগ্রন্থ দুইটি প্রণয়ন করেন। বস্তুতঃ এই দুইটি কাব্যের প্রেরণাই কবি 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাট্যকাব্যেও রূপায়িত করিয়াছেন। অতএব ইহার পরিকল্পনার মূলে যে প্রেরণা, তাহা প্রকৃতপক্ষে কাব্যেরই প্রেরণা, নাটকীয় প্রেরণা ইহার মুখ্য নহে। এখানে কাহিনীটি সংক্ষেপে বর্ণনা করা যাইতেছে।

এক সন্ন্যাসী অন্ধকার গুহার মধ্যে বসিয়া তপস্যায় মগ্ন হইয়া আছেন। একদিন তাঁহার মনে হইল, তাঁহার সাধনা সিদ্ধ হইয়াছে। প্রকৃতির মায়াজাল ছিন্ন করিয়া আত্মকেন্দ্রিক সাধনায় সিদ্ধির আনন্দে সন্ন্যাসীর হৃদয় সে'দিন পরিপূর্ণ। সংসারের তুচ্ছ খেলাধূলা দেখিবার জন্য তিনি রাজপথে বাহির হইলেন। দেখিলেন, কৃষক-বালকেরা গান গাহিয়া গোঠে যাইতেছে, পিতা পুত্রের হাত ধরিয়া ঠাকুরের পূজা দিবার জন্য পথে বাহির হইয়া পুরোহিত ঠাকুর ও প্রতিবেশীদের সঙ্গে নানা তুচ্ছ গল্পগুজবে মন দিয়াছে, নাগরিকদিগের মধ্যে নগণ্য স্বার্থ লইয়া দ্বন্দ্ব বাধিয়াছে, কোথাও পাণ্ডিত্যের অভিমান চলিয়াছে, কোথাও যুবতীদের রঙ্গরস চলিয়াছে, নিরন্ন ভিক্ষুক দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা মাগিয়া বেড়াইতেছে, চতুর্দোলায় চড়িয়া মন্ত্রিপুত্র চলিয়াছে। সন্ন্যাসী এই সব বিচিত্র জনকোলাহল হইতে নিজেকে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন বিবেচনা করিয়া ইহাদের একপার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইলেন।

সেই পথিমধ্যে এক অনার্য কন্যাকে দেখিয়া পথিকগণ ঘৃণায় দূরে সরিয়া যাইতে লাগিল, মন্দির রক্ষক মন্দির-প্রাঙ্গণ হইতে তাহাকে দূর করিয়া দিল। সন্ন্যাসী বালিকাকে কাছে ডাকিয়া আনিলেন। মাতৃপিতৃহীনা অনাথাকে সঙ্গে করিয়া বালিকার ভগ্ন কুটীরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বালিকা সন্ন্যাসীকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করিল। সন্ন্যাসী নিজের অন্তরে এক অভূতপূর্ব পুলক অনুভব করিতে লাগিলেন। আবার প্রকৃতির মায়াজালে জড়াইয়া পড়িতেছেন, এই

আশঙ্কায় সন্ন্যাসী ভীত হইলেন। একদিন বালিকাকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। কিন্তু তাঁহার অন্তরের যে স্নেহ-প্রবৃত্তি এতকাল রুদ্ধ হইয়া ছিল, এই অনাথা বালিকার সংস্পর্শে আসিয়া তাহা মুক্ত হইয়া গিয়াছে, তিনি পথিপার্শ্বে সর্বত্র এই স্নেহপ্রেমের লীলাভিনয় দেখিতে পাইলেন। বালিকা তাঁহার সন্ধান করিতে করিতে আসিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। সন্ন্যাসী পুনরায় বালিকাকে পরিত্যাগ করিয়া নির্জন অরণ্যে পলাইয়া গেলেন। সেখানে এক ঝড়ের রাত্রে যেন বালিকার করুণ ক্রন্দন শুনিতে পাইলেন। সন্ন্যাসী অরণ্য হইতে ছুটিয়া বাহিরে আসিলেন। আবাব সেই জনকোলাহলমুখর রাজপথের উপর দিয়া বালিকার সন্ধান করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহার নিজের পরিত্যক্ত আশ্রয়ের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, বালিকার প্রাণহীন দেহ তাঁহারই সম্মুখে ধূলায় লুটাইতেছে। যে সংসার-প্রকৃতিকে মায়া জ্ঞান করিয়া সন্ন্যাসী তুচ্ছ বিবেচনা করিয়াছিলেন, তাহাই আজ তাঁহার কাছে পরম সত্য বলিয়া প্রতিভাত হইল।

নাট্যসাহিত্যের যাহা বিশিষ্ট গুণ অর্থাৎ নৈর্ব্যক্তিকতা তাহা ইহাতে আদৌ নাই। ইহা অতিমাত্রায় কবির আত্মভাব-প্রধান রচনা। যে আত্মভাব-প্রধান গীতি-কবিতার সুর কবির তখনকার জীবন আচ্ছন্ন করিয়া ছিল, তাহার সংস্কার হইতে মুক্ত হইয়া তাঁহার পক্ষে নৈর্ব্যক্তিক সাহিত্যসৃষ্টি তখন সম্পূর্ণ অসম্ভব ছিল। অতএব 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাট্যকাব্য বলিয়া আখ্যাত হইলেও, ইহা যে গীতি-কবিতারই সহোদর, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কবির মনোভূমির যে অংশ হইতে তাঁহার সমসাময়িক গীতিকাব্যগুলির উদ্ভব হইয়াছে, তাহা হইতেই এই নাট্যকাব্যখানিও জন্মলাভ করিয়াছে বলিয়া ইহাও বিশেষ করিয়াই গীতিধর্মী হইয়া আছে। তথাপি ইহাকে গীতিনাট্য বলিবাব উপায় নাই; কারণ, ইহার মধ্যে আভ্যন্তরিক দ্বন্দ্বসংঘাত ও বাহ্যিক বৈপরীত্যের যে চিত্র-সমাবেশ করা হইয়াছে, তাহাও নাট্যিক-গুণ-বর্জিত নহে। ইহা রবীন্দ্রনাথের নাট্যকাব্য রচনার সর্বপ্রথম সার্থক প্রয়াস বলিয়া স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করা যায়।

'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাট্যকাব্যটি আরও একটি কারণে বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য। পূর্বেই বলিয়াছি, রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী জীবনে রচিত সমগ্র নাট্যকাব্যগুলির ইঙ্গিত ইহাতে প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। গীতিনাট্যের প্রভাব

ইহার উপর থাকা সত্ত্বেও কিংবা ইহার বিষয়-বস্তু প্রধানতঃ বিশ্লেষণ বা তর্কমূলক হইলেও ইহার কাহিনীর পরিণতি একটু অতি-নাট্যিক (melo-dramatic)। কাহিনীর পরিণতিতে অতি-নাট্যিক ঘটনার সমাবেশ রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনে রচিত সমগ্র নাট্যকাব্যেরই বিশেষত্ব। 'প্রকৃতির প্রতিশোধে' অনাথা বালিকা যেমন করিয়া আত্মত্যাগের ভিতর দিয়া সন্ন্যাসীকে সত্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়া গেল, তাঁহার পরবর্তী রচনা 'রাজা ও রাণী'তেও দেখিতে পাই, কুমারসেনের আত্মত্যাগের ভিতর দিয়া রাজা বিক্রমদেব সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তাঁহার তৎপরবর্তী রচনা 'বিসর্জনে'ও রঘুপতি জয়সিংহের আত্মত্যাগে সত্যের সন্ধান পাইলেন। ইহাতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, 'প্রকৃতির প্রতিশোধে'র মধ্যে রবীন্দ্রনাথের নাট্যকাব্যের যে সুর সর্বপ্রথম ধ্বনিত হইয়াছে, তাহা তাঁহার পরবর্তী জীবনেও অনেক দূর পর্যন্ত অব্যাহত রহিয়াছে। কেবল আদর্শ ও অন্তর্বস্তুর দিক দিয়াই নহে, 'প্রকৃতির প্রতিশোধে'র গঠন-কৌশলও তাঁহার পরবর্তী উপরোক্ত প্রধান দুইটি নাট্য-কাব্যের সম্পূর্ণ অনুরূপ।

চরিত্র-সৃষ্টিতে 'প্রকৃতির প্রতিশোধে' কোন বৈচিত্র্য নাই। ইহার প্রধান কারণ, নাটকটি পূর্ণাঙ্গ নহে। পরিপূর্ণ কোন চরিত্র-সৃষ্টির অবকাশও ইহাতে ছিল না। ইহার মধ্যে একমাত্র উল্লেখযোগ্য চরিত্র সন্ন্যাসীর। তাঁহার চরিত্রও একান্ত অন্তর্মুখী করিয়াই দেখান হইয়াছে। কর্মবিমুখ অন্তর্মুখী চরিত্র নাট্যরস সৃষ্টির কতখানি অন্তরায়, সেই তর্ক এখানে তুলিতে চাহি না; কিন্তু ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, সন্ন্যাসীর এই চরিত্র একান্ত ভাবপ্রধান হইবার ফলে তাহাতে নাটকীয় ক্রমবিকাশ নির্দেশ সুস্পষ্ট হয় নাই। প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে এমন চরিত্রের অভিনয় যেমন সার্থক হইতে পারে না, তেমনি সাধারণ পাঠকের নিকটও ইহার তর্কমূলক দার্শনিক স্বগতোক্তিগুলি বিরক্তি উৎপাদন করিতে পারে। সন্ন্যাসীর উক্তি অধিকাংশই স্বগত। তাহাতে তাঁহার অন্তর্দ্বন্দ্ব বুঝিবার পক্ষে সহায়তা হইলেও, অনেক সময় বৈচিত্র্যের অভাবে তাহা একঘেয়ে হইয়া উঠিয়াছে। তবে সন্ন্যাসীর দীর্ঘ স্বগতোক্তিগুলি নাট্যিক গুণ অনেকাংশেই খর্ব করিলেও ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, সংসার হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন একটি আত্মকেন্দ্রিক চরিত্রের উপর অসঙ্গত বাহ্যিক কর্মতৎপরতা আরোপ করিয়া লেখক ইহা অস্বাভাবিক করিয়া তুলেন নাই। নাটকের ক্ষেত্রে এমন চরিত্রের

পরিকল্পনা অসমীচীন হইতে পারে, কিন্তু প্রয়োজনের অনুরোধে এমন চরিত্রের অবতারণা করিয়া নাটকীয় আদর্শের মর্যাদা রক্ষাকল্পে ইহার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য যে নষ্ট করা হয় নাই, এই চরিত্রটি সম্পর্কে ইহাই বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য।

অনাথা বালিকার চরিত্রটি একটি অবাস্তব রূপক চরিত্রের মত। 'বিসর্জন' নাট্যকাব্যের 'অপর্ণা' চরিত্র ইহারই সম্পূর্ণ অনুরূপ। সন্ন্যাসীর সম্পর্কে ইহাকে সংসার-প্রকৃতির প্রতীক্ বলা হইয়াছে। নাটকের মধ্যে ইহার কোন ব্যক্তিত্ব নাই। অতএব ইহা নাট্যিক চরিত্র-সমালোচনার বিষয়ীভূত নহে। প্রাত্যহিক সংসারের যে বিভিন্ন জনমণ্ডলীর দৃশ্য ইহাতে দেখান হইয়াছে, তাহা এই সংক্ষিপ্ত নাট্যকাব্যটি সম্পর্কে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। লোক-চরিত্রে কবির বিচিত্র অভিজ্ঞতার পরিচয় এখান হইতেই পাওয়া যায়। যদিও চিত্রগুলি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও খণ্ডিত, তাহা হইলেও ইহাদের দ্বারাই নাট্যিক বৈপরীত্য সুপরিস্ফুট করিয়া তোলা হইয়াছে। এই চিত্রগুলির মধ্যে সূক্ষ্ম কৌতুকরস পরিবেশনের যে নিপুণতা রহিয়াছে, তাহাও উপেক্ষণীয় নহে। নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, রবীন্দ্রনাথের আর কোন নাট্যকাব্যে সংসারের বিচিত্র জনতার এমন সুপরিস্ফুট চিত্র পাওয়া যায় না। তাঁহার পরবর্তী রচনা 'রাজা ও রাণী' এবং 'বিসর্জনে'র মধ্যেও জনতার প্রায় অনুরূপ চিত্র আছে, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় তাঁহার এই অপরিণত বয়সের রচনার সঙ্গে তাহাদের তুলনা হইতে পারে না।

এই ক্ষুদ্র নাট্যকাব্যটির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই এখানে উদ্ধৃত করিয়া এই বিষয়ে আলোচনার উপসংহার করিব। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—" 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' সম্বন্ধে শেষ কথাটা এই দাঁড়াল শূন্যতার মধ্যে নির্বিশেষের সন্ধান ব্যর্থ, বিশেষের মধ্যেই সেই অসীম প্রতিক্ষণে হ'য়েছে রূপ নিয়ে সার্থক, সেইখানেই যে তাকে পায়, সেই যথার্থ পায়।" (র-র ১, ঐ)

'রাজা ও রাণী'ই রবীন্দ্রনাথের সর্বপ্রথম পূর্ণাবয়ব নাটক। ইহার ঘটনাবিন্যাস ও চরিত্র-পরিকল্পনার মধ্যে নাট্যিক প্রতিভার যে সম্ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা তাঁহার ইতিপূর্বে রচিত আর কোন নাটকের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায় নাই। এই নাটকের রচনায় যদিও অপরিণত প্রতিভার

ও প্রথম প্রয়াসের কতকগুলি ত্রুটি বর্তমান, তথাপি ইহার মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম নাটকের নিতান্ত গীতিধর্মী বৈচিত্র্যহীন উপকরণের পরিবর্তে নাট্যিক উপাদানের সন্ধান লাভ করিলেন। কাহিনীভাগ সংক্ষেপে আলোচনা করিলেই তাহা প্রমাণিত হইবে।

জলন্ধরের রাজা বিক্রমদেব কাশ্মীরের রাজকন্যা সুমিত্রার পাণিগ্রহণ করিয়া তাঁহার প্রতি অন্ধ আসক্তির বশে নিজের রাজ-কর্তব্য সমস্তই অবহেলা করিয়া চলিয়াছেন। রাজকার্য পরিচালনায় রাজার ঔদাসীন্যের পরিচয় পাইয়া উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারিগণ স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠিল, দরিদ্র প্রজার উপর নিপীড়ন চলিল, রাজ্যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। মন্ত্রী রাজাকে রাজ্যের বিষয় জানাইতে গেল, তিনি অন্তঃপুরে পলায়ন করিলেন। রাজ-বয়স্য দেবদত্ত কৌশলে রাজাকে সমস্ত গোচর করিয়া তাঁহার কর্তব্য পালন করিতে বলিলেন, তিনিও ব্যর্থ হইলেন। অবশেষে দেবদত্ত গিয়া রাণীর নিকট রাজ্যের সমস্ত অবস্থা জ্ঞাপন করিলেন। রাণী রাজাকে স্বেচ্ছাচারী রাজকর্মচারীদের দমন করিতে বলিলেন; কিন্তু তাহারা সকলেই কাশ্মীরাগত ও রাণীর আত্মীয় বলিয়া তিনি তাহাদের বিরুদ্ধে কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলেন না। রাজকার্যে রাজার ঔদাসীন্য ও স্বেচ্ছাচারী রাজকর্মচারীদিগকে তাঁহার শাসন করিতে ব্যর্থতার মূলে রাণী নিজেকেই অপরাধিনী বিবেচনা করিলেন। তিনি একদিন পুরুষের ছদ্মবেশে প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া কাশ্মীর যাত্রা করিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য তাঁহার ভ্রাতা কাশ্মীরের যুবরাজের সহায়তায় তাঁহার পিতৃরাজ্য হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া লইয়া আসিয়া উদ্ধত রাজকর্মচারীদের সমুচিত দণ্ডদান করিবেন ও জলন্ধর রাজ্যে পুনরায় শান্তি প্রতিষ্ঠা করিবেন। রাণীর প্রতি আসক্তি এইবার রাজার মনে প্রবল হিংস্রতায় পরিবর্তিত হইয়া গেল। তিনি সেই মুহূর্তেই সৈন্য লইয়া বিদ্রোহী রাজকর্মচারীদিগকে দমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজার উদ্যত রোষের সম্মুখে কেহ পরাজিত হইয়া বশ্যতা স্বীকার করিল, কেহ বা পলাইয়া গেল। এমন সময় রাণীও কাশ্মীর হইতে তাঁহার ভ্রাতা কুমারসেনকে সঙ্গে লইয়া পথিমধ্য হইতে পলায়িত বিদ্রোহীদিগকে বন্দী করিয়া লইয়া বিক্রমের শিবিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভিন্ন রাজ্যের একজন রাজপুত্র তাঁহার রাজ্যে বিদ্রোহ দমন করিতে আসিয়াছেন শুনিয়া তিনি তাঁহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন। দর্শনপ্রার্থিনী রাণীকেও তিনি শিবিরের দ্বার হইতে ফিরাইয়া দিলেন। অপমানিতা ভগিনীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া

কুমারসেন স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন। তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিবার জন্য বিক্রমদেব কাশ্মীর পর্যন্ত তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। কুমারের পিতৃব্য চন্দ্রসেন কাশ্মীরের রাজ্য শাসন করিতেন। কুমার বিক্রমকে বাধা দিবার জন্য পিতৃব্যের নিকট সৈন্য প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু পত্নীর পরামর্শে চন্দ্রসেন তাহাতে অস্বীকৃত হইলেন, বরং কুমারকে বিক্রমের হাতে সমর্পণ করিয়া কাশ্মীরের সিংহাসন নিজের জন্য নিষ্কণ্টক করিয়া লইতে চাহিলেন।

কুমার ভগিনীকে লইয়া বনে পলাইয়া গেলেন। বিক্রম কাশ্মীরে আসিয়া ঘোষণা করিলেন, কুমারসেনকে যে জীবিত বা মৃত তাঁহার সম্মুখে আনিয়া দিতে পারিবে, তাহাকে তিনি পুরস্কৃত করিবেন। কিন্তু কাশ্মীরের প্রজাবৃন্দ যুবরাজ কুমারসেনকে অত্যন্ত ভক্তি করিত, তাহারা কুমারকে বনমধ্যে গোপনে রক্ষা করিতে লাগিল, কেহই সন্ধান বলিয়া দিল না। কুমারের এক প্রতিপালক বৃদ্ধ ভৃত্য ছিল, নাম শঙ্কর। তাহার নিকট হইতে কুমারের সন্ধান জানিবার জন্য বিক্রমের লোক তাহাকে পীড়ন করিতে লাগিল। কুমারের সন্ধানকারী রাজপুরুষেরা নিরীহ প্রজার গৃহ জ্বালাইয়া দিতে লাগিল, প্রজাবৃন্দের উপর যথেচ্ছ অত্যাচার চলিতে লাগিল—রাজ্যময় হাহাকার উঠিল। কুমার শুনিয়া নিজেই প্রাণত্যাগ করিবেন, সঙ্কল্প করিলেন; সুমিত্রাকেও ইহাতে সম্মত করাইলেন। স্থির করিলেন, সুমিত্রা ভ্রাতার ছিন্নমুণ্ড লইয়া বিক্রমকে আতিথ্যের ভেট অর্পণ করিবেন, রাজ্যের অত্যাচার দূর হইবে। ত্রিচূড়ের রাজকন্যার নাম ইলা, সে কুমারকে ভালবাসিত। তাহাদের বিবাহের দিনও স্থির হইয়া গিয়াছিল, ইতিমধ্যেই কুমারের এই বিপদ দেখা দিল। কুমারের বিপদের কথা শুনিয়া ইলার পিতা কুমারের নিকট তাঁহার কন্যা সম্প্রদানের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন এবং বিক্রমকে তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণ করিবার জন্য আমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন। ইলা বিক্রমের নিকট আসিয়া বলিলেন, তিনি কুমারকে নিজের প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন, কুমার তাহা গ্রহণ না করিলে তিনি এই প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন, অন্য কাহাকেও তাহা দিতে পারিবেন না। একনিষ্ঠ প্রেমের এই আদর্শ দেখিয়া বিক্রম বিস্মিত হইলেন। তাঁহার নিজের হিংস্রতার মূলেও ছিল এমনি প্রেম, অতএব তিনি ইহার মূল্য দিতে অগ্রসর হইলেন। তিনি বন্ধুভাবে কুমারকে সন্ধান করিয়া আনিয়া তাঁহার হস্তে ইলাকে সমর্পণ করিয়া

তাঁহাদিগকে কাশ্মীরের সিংহাসনে উপবিষ্ট করাইতে চাহিলেন। এমন সময় সংবাদ পাইলেন, কুমার নিজেই আত্মসমর্পণ করিবার জন্য তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইতেছেন। শুনিয়া ভৃত্য শঙ্কর কুমারকে ধিক্কার দিতে লাগিল। নির্ধারিত দিনে এক রুদ্ধ শিবিকা আসিয়া বিক্রমের সম্মুখে দাঁড়াইল। শিবিকার দ্বার খুলিয়া এক সোনার থালে কুমারের ছিন্নমুণ্ড লইয়া আসিয়া সুমিত্রা বিক্রমকে উপহার দিলেন। দেখিয়া সকলেই হাহাকার করিয়া উঠিল। সুমিত্রাও সেই মুহূর্তেই মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। ভৃত্য শঙ্কর কুমারকে সাধুবাদ দিতে দিতে প্রভুর অনুগমন করিল। চন্দ্রসেন সিংহাসনে পদাঘাত করিয়া রাজমুকুট দূরে নিক্ষেপ করিলেন। ইলাও ছুটিয়া আসিয়া প্রিয়তমের ছিন্নমুণ্ডের নিকট লুটাইয়া পড়িলেন।

এই নাটকের কাহিনী রোমান্টিক—ইতিহাসের সঙ্গে ইহার কোন সম্পর্ক নাই ; যদিও এই নাটকের ঘটনা ইহার পরবর্তী নাটক 'বিসর্জন'-এর মত এমন সুবিন্যস্ত নহে, তথাপি ইহা সর্বাংশেই যে গীতিভাব-বর্জিত নাটকের উপযোগী, সে'বিষয়ে কোন সংশয় নাই। ঘটনা-বিন্যাসে ইহার প্রধান ত্রুটি এই যে, ইহার প্রথমাংশে তাহা অতি আড়ষ্ট। এই প্রথম অংশের মধ্যে তখনও নাট্যকার তাঁহার পূর্ববর্তী গীতিনাট্যগুলির প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে পারেন নাই; কিন্তু ইহারই শেষাংশে নাটকীয় ঘটনা আকস্মিক ভাবে যেন এক অনির্দিষ্ট পরিণতির আকর্ষণে দুর্বার হইয়া উঠিয়াছে। ইহার পরিণতি অতি-মাত্রায় অতি-নাট্যিক, অথচ ভাবে কিংবা ক্রিয়ায় ইহার এই অতি-নাট্যিক পরিণতির কোন ইঙ্গিত ইহার অপেক্ষাকৃত গীতিভাব-প্রভাবিত প্রথমাংশে অনুভব করিতে পারা যায় না। এতদ্ব্যতীত ইহার কাহিনীর আর একটি ত্রুটি এই যে, ইহার কোন অংশ যেমন অস্পষ্ট, তেমনই আবার অপর কোন অংশ মূল নাট্যকাহিনীর মধ্যে অপ্রাসঙ্গিক। ইহা একটু আলোচনা করিয়া দেখা যাইতেছে।

রাণীর প্রতি প্রেম যখন বিক্রমের মনে প্রতিহত হইল, তখন তাহাই হিংস্রতার রূপ ধারণ করিল। হিংস্রতার প্রাবল্য দেখাইতে গিয়া নাট্যকার বিক্রমকে কুমারসেনের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করাইলেন ; কিন্তু মুখ্যতঃ ইহার যে কারণ নাটকের মধ্যে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা যেমন দুর্বোধ্য তেমনই অস্পষ্ট। কুমার বিক্রমের উপকারার্থ অগ্রসর হইয়াছিলেন, অথচ সেই বিক্রমই যখন কুমারের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছেন, তখন তাহার যথেষ্ট কারণ থাকার

প্রয়োজন ছিল। বিদেশী হইয়া কুমার তাঁহার রাজ্যের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে আসিয়াছে—কুমারের এই অপরাধ যথেষ্ট বলিয়া মনে হইতে পারে না। সেইজন্য কুমারের বিরুদ্ধে বিক্রমের শত্রুতার কারণটি অস্পষ্টই থাকিয়া যায়। কুমার ও ইলার প্রসঙ্গ নাটকের গীতিসুরই যে অকারণ বাড়াইয়া তুলিয়াছে, তাহাই নয়—ইহা নাটকের মূল কাহিনী অপ্রধান করিয়া দিয়া স্বয়ং নাটকের মধ্যে প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও তাঁহার এই ত্রুটি স্বীকার করিয়া লিখিয়াছেন, 'কুমার ও ইলার প্রেমের বৃত্তান্ত অপ্রাসঙ্গিকতার দ্বারা নাটককে বাধা দিয়েছে এবং নাটকের শেষ অংশে কুমার যে অসঙ্গত প্রাধান্য লাভ ক'রেছে, তা'তে নাট্যের বিষয়টি হ'য়েছে ভার-গ্রস্ত ও দ্বিধা-বিভক্ত ('তপতী', ভূমিকা)।' তারপর কুমারের জীবনের যে অতি-নাট্যিক পরিণতি নির্দেশ করিয়া সহজ চমৎকারিত্ব উৎপাদন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে, তাহাও যে 'আখ্যান-ধারার অনিবার্য পরিণাম নয়' ('তপতী,' ভূমিকা) তাহাও নাট্যকার নিজেই অনুভব করিয়াছিলেন। ইহার কাহিনী ও চরিত্র-গত এই সকল ত্রুটি সংশোধন করিয়া লইবার উদ্দেশ্যেই রবীন্দ্রনাথ এই নাটকখানি অবলম্বন করিয়া পরবর্তী কালে 'তপতী' নামক নাটক রচনা করেন। সে কথা পরে উল্লেখ করিতেছি।

'রাজা ও রাণী'র মুখ্য বিষয় প্রেম ;) রবীন্দ্রনাথের ইহার পূর্ববর্তী গীতি-নাট্যগুলির বিষয়বস্তুও ছিল তাহাই—তাহা পূর্বের আলোচনা হইতে দেখা গিয়াছে। অতএব ভাবের দিক দিয়া ইহা তাঁহার পূর্ববর্তী নাটকগুলিরই সমপর্যায়ভুক্ত। 'রাজা ও রাণী'র পূর্ববর্তী নাটক 'মায়ার খেলা'য় রবীন্দ্রনাথ যে বলিয়াছেন,

> "এরা সুখের লাগি' চাহে প্রেম, প্রেম মেলে না
> শুধু সুখ চলে যায়
> এমনি মায়ার ছলনা'।" (৭ম দৃশ্য)

এই কথাই 'রাজা ও রাণী'র মধ্য দিয়াও ব্যক্ত করিতে চাহিয়াছেন। (প্রেম উপলব্ধি করিতে হইবে বৃহত্তর কল্যাণের ক্ষেত্রে—একান্ত আসক্তির মধ্যে নয়—তবেই প্রেমের সার্থকতা। রাজা রাণীকে একান্ত ভোগ্যবস্তু করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন, সেইজন্য প্রকৃত প্রেম তিনি লাভ করিতে পারিলেন না।) রবীন্দ্রনাথ এই সম্পর্কে নিজেও বলিয়াছেন,—"সংসারের জমি থেকে প্রেমকে উৎপাটিত ক'রে আনলে সে আপনার রস আপনি জোগাতে পারে

না, তার মধ্যে বিকৃতি ঘট্‌তে থাকে (র-র ১, 'রাজা ও রাণী'র মন্তব্য)।'

ভোগের দিকটাই প্রেমের যথার্থ পরিচয় হইতে পারে না, প্রকৃত প্রেম ত্যাগ ও স্বার্থবিসর্জনের দ্বারা সার্থক। কামনা জয় করিয়াই প্রেমের প্রতিষ্ঠা। অসংযত কামনার মধ্য দিয়াই প্রেমের বিকৃত রূপের পরিচয় প্রকাশ পায়। কিন্তু বিক্রম এই কামনার মোহ অতিক্রম করিতে পারেন নাই বলিয়াই ইহার মধ্যে প্রেমের পরিতৃপ্তি সন্ধান করিয়া ব্যর্থকাম হইয়াছিলেন।' কামনার রূপ অতি বীভৎস—যখন একান্ত আসক্তির মধ্য দিয়া ইহার অভিব্যক্তি, তখনও যেমন ইহার পরিচয় নির্লজ্জ স্বার্থপরতা দ্বারা সঙ্কীর্ণ, তেমনই যখন ইহার অসংযত বৃত্তি হিংস্রতার মধ্যে দুর্বার হইয়া উঠে, তখনও ইহার রূপ তেমনই ভয়ঙ্কর। অন্তরের কামনা জয় করিয়া বিশ্বের কল্যাণের ক্ষেত্রেই প্রেমের যথার্থ উপলব্ধি। ইহাই প্রেম-বিষয়ক নাটক এই 'রাজা ও রাণী'র মুখ্য বক্তব্য। রবীন্দ্রনাথ এই নাটকের সঙ্গে তাঁহার 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটকের এক স্থানে সামঞ্জস্য কল্পনা করিয়া ইহাদের বক্তব্য বিষয় সম্পর্কে বলিয়াছেন—"'প্রকৃতির প্রতিশোধে'র সঙ্গে 'রাজা ও রাণী'র এক জায়গায় মিল আছে। অসীমের সন্ধানে সন্ন্যাসী বাস্তব হ'তে ভ্রষ্ট হ'য়েছে, বিক্রম তেমনি প্রেমে বাস্তবের সীমাকে লঙ্ঘন কর্‌তে গিয়ে সত্যকে হারিয়েছে" (রবীন্দ্র রচনাবলী ১, 'রাজা ও রাণী', কবির মন্তব্য)। তিনি অন্যত্রও বলিয়াছেন, 'সুমিত্রা ও বিক্রমের সম্বন্ধের মধ্যে একটি বিরোধ আছে—সুমিত্রার মৃত্যুতে সেই বিরোধের সমাধা হয়। বিক্রমের যে প্রচণ্ড আসক্তি পুর্ণভাবে সুমিত্রাকে গ্রহণ করবার অন্তরায় ছিল, সুমিত্রার মৃত্যুতে সেই আসক্তির অবসান হওয়াতে সেই শান্তির মধ্যেই সুমিত্রার সত্য উপলব্ধি বিক্রমের পক্ষে সম্ভব হ'লো! এইটেই 'রাজা ও রাণী'র মূল কথা ('তপতী', ভূমিকা)।' রবীন্দ্রনাথ যথার্থই স্বীকার করিয়াছেন যে, 'রচনার দোষে এই ভাবটি পরিস্ফুট হয় নি।' প্রকৃত পক্ষে এই নাটকের মধ্যে বিক্রমের সত্যোপলব্ধি অপেক্ষা কুমারের আত্মত্যাগই অধিকতর পরিস্ফুট হইয়াছে; অথচ ইহা নাটকের মুখ্য বিষয় নহে। এই সম্পর্কে আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে যে, যদিও রাণী সুমিত্রার আত্মত্যাগ কুমারের আত্মত্যাগ অপেক্ষা মূলতঃ কোন অংশেই ন্যূন নহে, তথাপি রচনার ত্রুটির জন্য রাণীর ত্যাগের এই মহিমা কুমারের ত্যাগের সম্মুখে নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছে। ইহার কারণ, রাণীর আত্মত্যাগ তাঁহার গোপন অন্তরের কঠিন

সাধনার ধন ছিল, তাহা কোনদিনই বাহ্য জগতের চমৎকারিত্বের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে নাই ; অপর পক্ষে বাহ্য চমৎকারিত্বের দ্বারা কুমারের আত্ম-ত্যাগের গৌরব সাধারণ দৃষ্টিতে শতগুণ সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। রচনার এই সকল ত্রুটি নাটকের মূল বক্তব্য বিষয় প্রচ্ছন্ন করিয়া দিয়া কি ভাবে যে বিষয়ান্তরকে প্রাধান্য দিয়াছে, ইহা হইতে তাহাই বুঝিতে পারা যাইবে। অন্তরের স্বভাব-সুলভ গীতি-প্রবণতাকে রবীন্দ্রনাথ তখনও নাট্যিক কাহিনী-সংগঠনের নিয়মের বশীভূত করিতে পারেন নাই। এই নাটকের মধ্যে যখন যে চরিত্র বা চিত্র তিনি রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, মূল নাট্যকাহিনীর মধ্যে তাহার যথার্থ প্রয়োজনীয়তার কথা বিস্মৃত হইয়া গিয়াই যেন তিনি তাহার বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সেইজন্য নূতন নূতন চরিত্রের সংস্পর্শে আসিয়াই ইহার পূর্ববর্তী চরিত্রগুলি নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছে। কুমারের সম্মুখীন হইয়া বিক্রম এবং ইলার নিকটবর্তিনী হইয়া সুমিত্রা এই অবস্থাই প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। যে সংযত শিল্পদৃষ্টি দ্বারা নাট্যিক কাহিনীর মধ্যে অপরিহার্য সংক্ষিপ্ততার গুণ ফুটিয়া উঠিতে পারে, রবীন্দ্রনাথ তখন পর্যন্তও সেই দৃষ্টির অধিকারী হইতে পারেন নাই। সেইজন্য এই নাটকের অতি-নাট্যিক পরিবেশের মধ্যেও গীতি-সুরের হৃদয়াবেগ এত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ইহাকে নাটকের আকারে একটি কাব্য বলিলেও খুব বেশি ভুল করা হয় না। রবীন্দ্রনাথ নিজেও এই সম্পর্কে লিখিয়াছেন,—'এ'র নাট্য-ভূমিতে র'য়েছে লিরিকের প্লাবন, তাতে নাটককে ক'রেছে দুর্বল। এ' হয়েছে কাব্যের জলাভূমি। এই লিরিকের টানে এর মধ্যে প্রবেশ ক'রেছে ইলা এবং কুমারের উপসর্গ। সেটা অত্যন্ত শোচনীয়রূপে অসঙ্গত (রবীন্দ্র রচনাবলী ১, 'রাজা ও রাণী', কবির মন্তব্য)।'

তবে এ কথা সত্য যে, সুমিত্রা ও বিক্রমের বিরোধের মধ্যে যথার্থ নাট্যিক উপকরণ বর্তমান ছিল ; নাট্যিক গঠন-কৌশল রবীন্দ্রনাথের আয়ত্ত ছিল না বলিয়া এই উপকরণের যথাযথ প্রয়োগ হইতে পারে নাই। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, 'এই নাটকে যথার্থ নাট্যপরিণতি দেখা দিয়েছে যেখানে বিক্রমের দুর্দান্ত প্রেম প্রতিহত হ'য়ে পরিণত হয়েছে দুর্দান্ত হিংস্রতায়, আত্মঘাতী প্রেম হ'য়ে উঠেছে বিশ্বঘাতী।' কিন্তু পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, নাটকের এই অংশ অত্যন্ত অস্পষ্ট, অর্থাৎ বিক্রমের পরিবর্তন বা তাঁহার হিংস্রতা কোন সুস্পষ্ট [illegible]গের পথরেখা ধরিয়া অগ্রসর হইয়া যায় নাই। সেইজন্য নাট্যকারের মতে

যেখানে এই নাটকে প্রকৃত নাট্যপরিণতি দেখা দিয়াছে, তাহাই পাঠকের নিকট প্রকৃত নাট্যরস সৃষ্টি করিতে পারে না।

এই বিয়োগান্তক অতি-নাটকের নায়ক রাজা বিক্রমদেব। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজি বিয়োগান্তক নাটকের আদর্শে এই নায়ক চরিত্রের পরিকল্পনা হইলেও, এই সম্পর্কে ইহার কতকগুলি ত্রুটিও বিশেষভাবেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিক্রমদেবের চরিত্রের মধ্যে এমন কোন গুণ নাই, যাহা পাঠকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারে; অথচ এই শ্রেণীর নায়ক-চরিত্রের বিশেষ কোন না কোন গুণ থাকা একান্ত প্রয়োজন। সুমিত্রার প্রতি যখন তাঁহার আসক্তির পরিচয় পাই, তখন তাহা যেমন স্বার্থপরতা দ্বারা সঙ্কীর্ণ দেখিতে পাই, আবার তাহার হিংস্ররূপের সঙ্গে যখন আমাদের পরিচয় হয়, তখনও তাহা ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিয়া উঠে। একমাত্র শেষ মুহূর্তে ইলার সঙ্গে ব্যবহারের মধ্যে তাঁহার সামান্য মানসিক ঔদার্যের পরিচয় পাই সত্য, কিন্তু তাহা সংক্ষিপ্ত ও নাটকের প্রসঙ্গ-বহির্ভূত বলিয়াই নহে, নাট্যিক ঘটনার কোনও কার্যকর অংশ নহে বলিয়াও তাঁহার চরিত্রের উপর কোন সক্রিয় প্রভাব স্থাপন করিতে পারে না। 'রাজা ও রাণী'র এই নায়ক চরিত্র কোন গুণেই পাঠকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারে না; সেইজন্য তাঁহার সত্যোপলব্ধির মধ্যে যে নাট্যকাহিনীর সমাপ্তি নির্দেশ করা হইয়াছে, তাহা দ্বারা কোনও নাটকীয় গুণের সৃষ্টি হইতে পারে নাই। ইহা এই নাটকের একটি ত্রুটি। এই চরিত্রের দুইটি অংশ—প্রথম অংশে সুমিত্রার প্রতি গভীর প্রেমাসক্তির ও দ্বিতীয় অংশে ইহার হিংস্রতার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। এই দুইটি অংশের সুস্পষ্ট বৈপরীত্য নির্দেশের মধ্যেই এই চরিত্রের সার্থকতা। ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, অতিরিক্ত গীতিভাব-ভারাক্রান্ত হওয়ার ফলে এই চরিত্রের এই বৈপরীত্য নির্দেশের দিকটা ততখানি সুস্পষ্ট হইতে পারে নাই। ইহার হিংস্রভাবের মধ্যেও গীতিসুলভ কমনীয়তা প্রশ্রয় পাইয়াছে—কার্যে, কথায় ও চিন্তায় ভাবপ্রবণতা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত করিয়া বিক্রমকে সুকঠিন নিষ্ঠুর কর্তব্যের মধ্যে স্থাপন করিবার প্রয়াস নাট্যকারের তেমন সার্থক হয় নাই। পরিবর্তিত বিক্রমদেবকে সম্পূর্ণ এক নূতন মানুষরূপে উপস্থিত করিবার প্রয়াসও তেমন কার্যকর নহে।

এই নাটকের নায়িকা চরিত্র রাণী সুমিত্রা। তাঁহার চরিত্রের মধ্যে বিয়োগান্তক নাটকের নায়িকা-সুলভ গুণাবলীর অভাব নাই। তিনি দয়াশীলা,

কর্তব্যপরায়ণা ও মহীয়সী। বিক্রমকে সম্পূর্ণরূপে পাইবার মূলে তাঁহার মধ্যে যে বিরোধ ছিল, তাহা এই চরিত্রটির মধ্য দিয়া যথাযথরূপেই ব্যক্ত হইয়াছে। প্রকৃত প্রেমের স্বরূপ সুমিত্রা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা তিনি তাঁহার অন্ধ প্রণয়াস্পদকে কিছুতেই উপলব্ধি করাইতে পারিতেছিলেন না। ইহাই সুমিত্রার জীবনের সমগ্র ব্যর্থতার মূল। প্রেমের সত্য তাঁহার প্রণয়াস্পদকে বুঝাইবার জন্য শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে আত্মবিসর্জন করিতে হইল। ইহাই এই নাটকের ট্র্যাজিডির বিষয়। রচনার ত্রুটির জন্য সুমিত্রার চরিত্রের শেষ ভাগ সুপরিস্ফুট হইতে পারে নাই। নাটকের শেষাংশে যে এক অপ্রাসঙ্গিক কাহিনী আসিয়া নাটকের সহিত যুক্ত হইয়াছে এবং তাহাই যে মূল নাটকের নায়িকা-চরিত্রের প্রাধান্য লোপ কবিয়াছে, তাহা পূর্বেও উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু নাটকের শেষ দিকে উক্ত কাহিনীর সংস্পর্শে আসিবার পূর্ব পর্যন্ত তাঁহাব চরিত্র সুপরিস্ফুট হইয়াছে। পরের দুঃখ অনুভব কবিবার মত মহত্ত্ব, মহান্ দুঃখ বরণ করিয়া লইবার পরম গৌরব ও মহত্তর আত্মবিসর্জনের উদার প্রেরণা তাঁহাব চরিত্রের সকল দিক সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। নাটকের মধ্যে এই চরিত্রটির প্রতি মমত্ববোধ হইতেই পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ 'তপতী' নাটক রচনাব প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন।

কুমারের চরিত্র এই নাট্যকাব্যের অন্যতম আকর্ষণ। পূর্বাপর এই চরিত্রটিকে ভাগ্য-বিড়ম্বিত করিয়া অঙ্কিত করা হইয়াছে। তিনি রাজপুত্র হইয়াও আশৈশব মাতৃপিতৃ-ক্রোড়বঞ্চিত ও ভৃত্যের ক্রোড়ে পালিত, ন্যায়তঃ সিংহাসনের অধিকারী হইয়াও সিংহাসন হইতে বঞ্চিত, প্রজাবর্গের শ্রদ্ধাস্পদ হইয়াও অগণিত প্রজার দুঃখের কারণ, ভগিনীর স্নেহ ও ভক্তির পাত্র হইয়াও তাঁহার মর্যাদা রক্ষায় অক্ষম, ইলার প্রেমের অধিকারী হইয়াও তাঁহাকে পরিপূর্ণরূপে লাভ করিতে অসমর্থ। রাজ্যের ঐশ্বর্য, প্রজার শ্রদ্ধা, ভগিনীর স্নেহ, প্রণয়িনীর প্রেম সব কিছুর অধিকারী হইয়াও নিয়তির নির্মম অভিশাপে তিনি অপরিণত যৌবনে তাঁহার জীবন জলাঞ্জলি দিলেন। মূল নাট্যকাহিনীর মধ্যে অপ্রাসঙ্গিক হইয়াও এই চরিত্রটি নাটকের মধ্যে একটি প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে।

ইলা একটি অনতিমুকুলিত কুন্দপুষ্প। কুমারের প্রেমে তাঁহার অন্তর পরিপূর্ণ। এই প্রেমে দ্বিধা নাই, আশঙ্কা নাই, অবিশ্বাস নাই, কিন্তু অভিশাপ আছে। নিয়তির এই অভিশাপেই একটি মাত্র দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া অনতি-

প্রস্ফুটিত কুন্দকুসুম শুকাইয়া গেল।) এই চরিত্রটি রবীন্দ্র-কবি-মানসের গীতিকাব্যের 'জলাভূমি' হইতে সৃষ্ট, নাটকের মধ্যে ইহার সংস্থান সঙ্কুচিত ; কিন্তু ইহার সহিত পরিচয় লাভ করিয়া মন সহজেই প্রসন্ন হয়।

(এই নাটকের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র কুমারের পুরাতন ভৃত্য শঙ্করের। শঙ্কর পুরাতন রাজভৃত্য ; দীর্ঘকাল রাজপরিবারের সঙ্গে সান্নিধ্যের ফলে রাজমর্যাদা, রাজসম্মান এ সব সম্বন্ধে তাহার সুদৃঢ় কর্তব্যবুদ্ধি জাগিয়াছে। কুমার ও সুমিত্রার প্রতি সে স্বভাবতঃই নিতান্ত স্নেহশীল, কিন্তু এই স্নেহ অন্ধতা দ্বারা আচ্ছন্ন নহে।)এই স্নেহবোধ তাহার সুদৃঢ় কর্তব্যবোধ বিমূঢ় করিয়া দিতে পারে নাই। একটি অভিজাত রাজপরিবারের সঙ্গে দীর্ঘকাল সম্পর্কযুক্ত থাকিবার ফলে তাহার চরিত্রে যে অভিজাত-বুদ্ধি সংস্কারের মত আশ্রয় লাভ করিয়াছে, তাহারই পরিচয় তাহার মধ্যে পাওয়া যায়। কাশ্মীর রাজপুত্রের সম্মান-রক্ষার জন্য সে নিঃশব্দে কঠোর নির্যাতন সহ্য করিয়াছে, পরম স্নেহাস্পদ রাজপুত্রকে আত্মসম্মান রক্ষায় মৃত্যুবরণ করিতে দেখিয়াও প্রাণ ভরিয়া আশীর্বাদ জানাইয়াছে।) 'বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদুনি কুসুমাদপি' এই উভয় গুণেরই সমাবেশ তাহার চরিত্রের মধ্যে সুপরিস্ফুট হইয়াছে। চরিত্রটির মধ্যে বৈদেশিক কোন চরিত্রের প্রভাব আসিয়াছে বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন।

ইহার পরই রেবতী ও চন্দ্রসেনের চরিত্রের কথা উল্লেখ করিতে হয়। রেবতীর চরিত্রটি সেক্সপীয়রের 'ম্যাকবেথ' নাটকের লেডি ম্যাকবেথের চরিত্রের অনুকরণে পরিকল্পিত হইয়াছে। কিন্তু চন্দ্রসেনের চরিত্রটিতে কতকটা মৌলিকতা অনুভব করা যায়। রেবতী এই নাটকের খল-চরিত্র এবং কুমারের জীবনের পরিণতির জন্য অনেকখানি দায়ী। নারীচরিত্রে পাশ্চাত্ত্য নাটক-সুলভ হিংস্রতার পরিকল্পনা বাংলা নাটকে একেবারে নূতন না হইলেও, রবীন্দ্রনাথের এই চরিত্রটি বিশেষত্বপূর্ণ। ইহার ভাষণ পরিমিত, আত্মবিশ্বাস অপরিমিত ও হিংস্র মনটি সর্বত্রই অনাবৃত।) ইহার কথায় সহজেই জ্বালা অনুভব করা যায় ; নাটকের অনতিপরিসর ক্ষেত্রেই চরিত্রটি জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। ইহার প্রধান কারণ এই যে, তাহার হিংস্রবুদ্ধির মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নাই। কুমার কাশ্মীর-সিংহাসনের উত্তরাধিকারী, কুমারের প্রতি তাহার স্নেহের লেশ মাত্রও নাই। অতএব কুমারকে যে ভাবেই হউক বঞ্চিত করিয়া সিংহাসন তাহার স্বামীর জন্য নিষ্কণ্টক করিতেই হইবে, এই জন্য কুমারের

প্রতি তাহার হিংস্রবুদ্ধি এত তীব্র ও প্রত্যক্ষ। চন্দ্রসেনের মধ্যে দ্বন্দ্ব আছে। একদিকে তাঁহার স্বার্থবোধ, অপর দিকে কুমারের প্রতি তাঁহার স্নেহবোধ। এই দ্বন্দ্বের মধ্যেই তাঁহার চরিত্রের বিকাশ হইয়াছে। শেষ দৃশ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি নিজের স্বার্থবোধ দিয়া ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রতি স্নেহবোধ কোনদিনই জয় করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তাঁহার চরিত্রে দৃঢ়তার অভাব ছিল, পত্নীর প্ররোচনায় নিজের স্বার্থবোধ জাগ্রত করিয়া তুলিলেও, কুমারের প্রতি স্নেহবোধ সর্বদাই তাঁহার প্রচ্ছন্ন ছিল। ব্যক্তিত্বহীন ও স্বার্থপরবশ পুরুষচরিত্র রূপে তাঁহার চরিত্রটি সুপরিস্ফুট হইয়াছে বলিয়াই অনুভূত হয়।

এই নাটকের আর দুইটি চরিত্র দেবদত্ত ও ত্রিবেদী। দেবদত্ত রাজার বিশ্বস্ত অনুচর। রাজাকে সত্যে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য সর্বদাই তিনি সচেষ্ট ছিলেন; কিন্তু তিনি যতদিন মোহগ্রস্ত ছিলেন, ততদিন তাঁহার মূল্য বুঝিতে পারেন নাই। দেবদত্ত রাজার বাল্যসখা—এই অধিকারে রাজাকে সর্বদাই কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করিয়া দিতে তাঁহার যথার্থ অধিকারের বাহিরেও অনেক দূর পর্যন্ত অগ্রসর হইতেন; কিন্তু রাজা তাঁহার বাল্যসখা বলিয়াই রাজার প্রতি ব্যক্তিগতভাবে কোন সম্পর্কের বন্ধন তিনি একান্তভাবে স্বীকার করেন নাই—রাজার উপরও তিনি রাজ্যকে দেখিয়াছেন। তিনি ব্রাহ্মণ, কিন্তু অর্থহীন সংস্কারের দাস নহেন, বিবেকবুদ্ধি সর্বদাই তাঁহার সক্রিয়। মোহান্ধ রাজার পার্শ্বে যেন এই চরিত্রটি একটুখানি সত্যের আলো—তাহা অন্ধ রাজাকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতে পারে নাই সত্য, কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে পথের আভাস ব্যক্ত করিয়াছে।

ত্রিবেদী চরিত্রটি সংক্ষিপ্ত হইলেও সুপরিস্ফুট। কপট বাহ্য সারল্যের আবরণে তাঁহার অন্তরের প্রচ্ছন্ন ধূর্ততার রূপ অপূর্ব কৌশলে কবি ইহার মধ্যে ব্যক্ত করিয়াছেন। গীতিকাব্যের প্রেরণা হইতে এই নাটকের জন্ম বলিয়া ব্যাপকভাবে ইহার ঘটনা-বিন্যাস ও চরিত্র-পরিকল্পনায় যে ত্রুটি দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার বিচ্ছিন্ন কোন অংশ কিংবা খণ্ড কোন চরিত্রে তাহা অনুভূত হয় না। সেইজন্য ইহার অপ্রধান চরিত্রগুলি অপেক্ষাকৃত সুপরিস্ফুট।

অপরিণত বয়সের এই নাট্যরচনার প্রয়াসের মধ্যে যে সব ত্রুটি বর্তমান ছিল, তাহাদের সম্বন্ধে পরিণত বয়সে রবীন্দ্রনাথই সর্বাপেক্ষা অধিক সচেতন হইয়াছিলেন। এই নাটক রচনার প্রায় চল্লিশ বৎসর পর যখন ইহা একবার

ঠাকুর-পরিবারে অভিনয়ের উদ্যোগ হয়, তখন ইহা তিনি যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত ও পরিবর্তিত করিয়া অভিনয়যোগ্য করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রাণী'র কবিকৃত নূতন সংস্করণের নাম ছিল 'ভৈরবের বলি'। কিন্তু এই সংশোধনও কবির মনঃপূত হয় নাই। তিনি এই সম্পর্কে লিখিয়াছেন, 'দেখলুম এমনতরো অসম্পূর্ণ সংস্কারের দ্বারা সংশোধন সম্ভব নয়। তখনই স্থির করেছিলুম, এ নাটক আগাগোড়া নূতন ক'রে না লিখ্‌লে এর সদ্গতি হ'তে পারে না' ('তপতী', ভূমিকা)। ইহার ফলে দীর্ঘকাল পরে 'রাজা ও রাণী'র সম্পূর্ণ পরিবর্তিত রূপ 'তপতী' প্রকাশিত হয়। 'তপতী' আদ্যোপান্ত গদ্যে রচিত। নাট্যকাব্য রচনার যুগ বহুদিন অতিক্রম করিয়া রবীন্দ্রনাথ ইতিপূর্বে গদ্যনাট্য রচনার যুগে প্রবেশ করিয়াছিলেন। নাট্যকাব্য 'রাজা ও রাণী'র পরিবর্তিত রূপ 'তপতী' এই গদ্যনাট্য রচনার যুগে রচিত হইয়াছিল বলিয়া ইহাতে তাঁহার সমসাময়িক নাটকের ভাষার প্রভাব অপরিহার্য হইয়া রহিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ 'তপতী'র ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, 'এই নূতন নাটকখানি লিখে এই বইটার ('রাজা ও রাণী'র) সম্বন্ধে আমার সাধ্যমতো দায়িত্ব শোধ করেছি।' এই দায়িত্ব প্রকৃতই কতখানি শোধ করা হইয়াছে, তাহা সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া দেখা যাইতেছে।

'তপতী' হইতে কুমার ও ইলার কাহিনী পরিত্যক্ত হইয়াছে, তৎপরিবর্তে নরেশ ও বিপাশার একটি কাহিনীর অবতারণা করা হইয়াছে। নরেশ ও বিপাশার কাহিনী মূল নাট্যকাহিনীর সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কযুক্ত সন্দেহ নাই, তদুপরি ইহা মূল কাহিনীর প্রাধান্য কোন স্থানেই খর্ব করে নাই। বিক্রম ও সুমিত্রার বিরোধের যে ভাবটি 'রাজা ও রাণী'তে অস্পষ্ট ছিল, তাহা 'তপতী'তে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। এই বিরোধের বাহ্য কারণ নির্দেশ করিতে গিয়া নাট্যকার এখানে দেখাইয়াছেন যে, সুমিত্রাকে বিক্রম জোর করিয়া তাঁহার পিতৃরাজ্য হইতে ধরিয়া আনিয়াছেন বলিয়াই যেন তাহাদের মিলনের মধ্যে একটা অন্তরায় ছিল। এই নির্দেশ 'তপতী'র মধ্যে অত্যন্ত স্পষ্ট বলিয়া 'রাজা ও রাণী'র বিরোধের কারণটিও এখানে খুবই স্পষ্টভাবে অনুভব করা যায়। 'রাজা ও রাণী'তে এই বিরোধের ভাবটি স্পষ্ট নহে। কারণ, সেখানে বিরোধ ছিল একমাত্র অন্তরের, এখানে এই বাহিরের বিরোধের উপর অন্তরের বিরোধকে আনিয়া স্থাপন করা হইয়াছে। অন্তরগত এই বিরোধ প্রকাশ করিতে গিয়াই 'রাজা ও রাণী' এত গীতিধর্মী হইয়া পড়িয়াছে। সেই বিরোধ

বাহিরে প্রকাশ পাইয়া 'তপতী'র গীতিভাব অনেক লাঘব করিয়াছে। 'রাজা ও রাণী'র আরও একটি অস্পষ্টতা 'তপতী'র মধ্যে দূর করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, 'রাজা ও রাণী'তে কাশ্মীরের বিরুদ্ধে বিক্রমের শত্রুতার কারণটি খুব স্পষ্টভাবে অনুভব করা যায় না। 'তপতী'তে এই ত্রুটি দূর করা হইয়াছে। ইহাতে দেখান হইয়াছে যে, পলাতকা রাণীকে সবলে ধরিয়া আনিবার জন্যই বিক্রমের কাশ্মীর অভিযান। কাহিনীর দিক দিয়া 'রাজা ও রাণী'র ত্রুটি এই ভাবে 'তপতী'তে সংশোধন করিবার প্রয়াস দেখা যায়। চরিত্রসৃষ্টির দিক দিয়া বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সুমিত্রার চরিত্রটি সম্পূর্ণ নূতন ভাবে ইহাতে নাট্যকার চিত্রিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। 'রাজা ও রাণী'র কাহিনীর মধ্যে নায়ক-চরিত্র বিক্রমদেবের যথেষ্ট প্রাধান্য ছিল, কিন্তু 'তপতী'তে তাঁহার প্রাধান্য অনেকখানি হ্রাস করিয়া নায়িকা-চরিত্র সুমিত্রার উপর তাহা আরোপ করা হইয়াছে। কঠিন সাধনার ভিতর দিয়া রাণী বিক্রমকে সত্যে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, তাঁহার আত্মত্যাগ ও সাধনার দৃষ্টান্তই 'তপতী'র আকর্ষণ। সেইজন্য 'তপতী' নামকরণও ইহার সার্থক। কিন্তু 'রাজা ও রাণী'র বিক্রম চরিত্রের যে একটি প্রধান ত্রুটির কথা পুর্বে উল্লেখ করিয়াছি, তাহা এই নাটকেও পরিত্যক্ত হয় নাই—তাহা নাটকের নায়ক হিসাবে তাঁহার বিশিষ্ট কোন গুণের অভাব। তিনি বলিয়াছেন, রাণীকে তিনি কাশ্মীর হইতে বন্দিনী করিয়া লইয়া আসিবেন 'যেমন ক'রে দাসীকে নিয়ে আসে'। এই উক্তি তাঁহার চরিত্রের উপযোগী হয় নাই, ইহাতে নীচতা আছে। কিন্তু এ কথাও সত্য যে, নায়ক চরিত্রের প্রাধান্য ইহাতে হ্রাস করিবার ফলে বিক্রম-চরিত্রের এই ত্রুটি 'রাজা ও রাণী'র মত এত দৃষ্টিকটু বলিয়া বোধ হয় না। 'তপতী'তে সুমিত্রা-চরিত্র যতখানি নাট্যকারের লক্ষ্য ছিল, বিক্রমের সত্যোপলব্ধি ততখানি ছিল না। সেইজন্য সুমিত্রার মৃত্যুর পর বিক্রমের সত্যোপলব্ধির ইঙ্গিত থাকিলেও তাহার পুর্ণ পরিচয় নাই।

'রাজা ও রাণী' কিংবা 'তপতী'র ভাষা প্রকৃত নাট্যোপযোগী না হইলেও এ কথা সত্য যে, 'রাজা ও রাণী'র ভাষা অধিকতর চিত্তাকর্ষক। এমন কি, 'রাজা ও রাণী'র ভাষা একমাত্র 'চিত্রাঙ্গদা' ব্যতীত রবীন্দ্রনাথের যে কোন নাট্যকাব্য এমন কি 'বিসর্জন' হইতেও উৎকৃষ্ট। 'তপতী'র ভাষা গদ্য হিসাবেও দুর্বল, প্রকাশ-ভঙ্গির প্রত্যক্ষতা (directness of expression)

প্রায় সর্বত্রই ক্ষুণ্ণ হইয়াছে বলিয়া ইহা গদ্য হইয়াও কাব্যধর্মী হইয়া পড়িয়াছে। এই গদ্য অপেক্ষা কাব্যের আকর্ষণীয় গুণ অধিক।

১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের 'রাজর্ষি' উপন্যাস রচিত হয়। ইহার তিন বৎসর পরে 'রাজর্ষি' উপন্যাসেরই কতক অংশের উপর নির্ভর করিয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'বিসর্জন' নাটক রচনা করেন।

নাটক হিসাবে 'বিসর্জন'ই রবীন্দ্রনাথের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রচনা। তাঁহার অন্যান্য নাটকের তুলনায় ইহার মধ্যেই সর্বাধিক নাট্যিক গুণেরও সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ একটি সমসাময়িক অতি জনপ্রিয় আধ্যাত্মিক বোধের বাহন ছিল বলিয়া ইহা শিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে অতি সহজেই ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করিতে সমর্থ হয়। নাটকের কাহিনী-ভাগ সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া ইহার অন্যান্য বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে।

ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দমাণিক্য একদা পুজায় আসীন, এমন সময় এক ভিখারিণী কন্যা আসিয়া রাজার নিকট অভিযোগ করিল, রাজমন্দিরের বলির জন্য তাহার পালিত ছাগশিশু মন্দিরের অনুচরবর্গ তাহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়াছে। ভিখারিণীর নাম অপর্ণা। রাজা ইহার প্রতিকার করিতে সম্মত হইয়া মন্দিরের সেবক জয়সিংহকে ইহার অনুসন্ধান করিতে আদেশ দিলেন। হাসি ও ধ্রুব দুইটি ছোট ভাইবোন। তাহারা রাজার নিকট প্রতিদিন নিঃসঙ্কোচে যাতায়াত করিত। রাজাও পরম স্নেহে তাহা-দিগের ক্রীড়া-কৌতুকে সর্বদাই যোগদান করিতেন। সেদিন হাসি মন্দিরের সিঁড়িতে রক্তের চিহ্ন দেখিয়া রাজাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'এ কিসের দাগ?' রাজা বলিলেন, 'রক্তের'। শুনিয়া হাসি শিহরিয়া উঠিল, রাজাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, 'এত রক্ত কেন?' শুনিয়া গোবিন্দ-মাণিক্য বিচলিত হইয়া পড়িলেন, কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। জয়সিংহ আসিয়া সংবাদ দিল, অপর্ণার ছাগশিশু ইতিপূর্বেই দেবীর মন্দিরে বলি দেওয়া হইয়াছে। অপর্ণা আসিয়া মন্দিরের সিঁড়িতে রক্তচিহ্ন দেখিল। সে দেব-মন্দিরে এই প্রাণিহত্যার জন্য রাজাকে অনুযোগ দিল, জয়সিংহকে মন্দির ত্যাগ করিয়া তাহার সঙ্গে চলিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিল। রাণী গুণবতী নিঃসন্তানা। সন্তান-কামনায় তিনি দেবীর নিকট পশুবলি দিয়া পুজার উদ্যোগ করিলেন এবং মানসিক করিলেন, সন্তান লাভ করিলে

প্রতি বৎসর তাঁহার নিকট একশত মহিষ ও তিন শত ছাগ বলি দিবেন। হাসি ও ধ্রুব রাজার স্নেহের অধিকারী হইয়াছে বলিয়া তাহাদের প্রতি রাণী একান্ত ঈর্ষ্যাপরায়ণা। মন্দির হইতে সেদিন ফিরিবার পরই হাসি জ্বরে অজ্ঞান হইয়া পড়িল, জ্বরঘোরে প্রলাপ বকিতে লাগিল, প্রলাপের মধ্যে মন্দিরে যে রক্তচিহ্ন দেখিয়া গিয়াছিল, তাহারই বিভীষিকা প্রকাশ করিতে লাগিল; অচৈতন্য অবস্থাতেই হাসির মৃত্যু হইল। ইহাতে রাজা অন্তরে অত্যন্ত ব্যথা অনুভব করিলেন এবং মন্দিরের এই রক্তস্রোত বন্ধ করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। রাজার আদেশে রাণীর পুজোপকরণ লইয়া যাহারা আসিয়াছিল, তাহারা ফিরিয়া গেল। রাজা অচিরেই মন্দিরে পশুবলি নিষেধ করিয়া দিলেন। রাজ্যশুদ্ধ লোক ইহাতে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল। জনসাধারণের ধর্মাচরণের উপর ইহা রাজার অন্যায় হস্তক্ষেপ বলিয়া সকলেই বিবেচনা করিল। মন্দিরের পুরোহিত রঘুপতি ইহাতে ক্রোধে আত্মহারা হইয়া গেলেন। মন্দিরের দুয়ার হইতে পূজা ফিরিয়া আসিয়াছে দেখিয়া রাণীও রাজার উপর নিতান্ত রুষ্ট হইলেন। রাণী রাজার উপর প্রথমে অনুনয়, তারপর অভিমান, পরে বিরক্তি ও সর্বশেষে ক্রোধ প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে সঙ্কল্পচ্যুত করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। রাজা নিজের সঙ্কল্পে অবিচলিত রহিলেন। চাঁদপাল রাজার দেওয়ান ও নয়ন রায় সেনাপতি। ইহাদের মধ্যে ক্ষুদ্র স্বার্থ লইয়া সর্বদা কলহ-বিবাদ লাগিয়াই থাকিত। রঘুপতি নয়ন রায়কে রাজার বিরুদ্ধে সসৈন্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করিবার জন্য প্ররোচিত করিতে লাগিলেন। নয়ন রায় বিশ্বাসঘাতকতা করিতে অস্বীকার করিল। রঘুপতি প্রজাদের রাজদ্রোহী করিয়া তুলিবার জন্য উত্তেজিত করিতে লাগিলেন, প্রজারা ভয়ে সে পথে অগ্রসর হইতে চাহিল না। রঘুপতির সহায়তার আশ্বাস পাইয়া রাণী পুনরায় মন্দিরে তাঁহার পূজা পাঠাইলেন। গোবিন্দমাণিক্য জানিতে পারিয়া সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সৈন্য লইয়া মন্দির পাহারা দিবার জন্য সেনাপতি নয়ন রায়কে আদেশ দিলেন। নয়ন রায় একার্য করিতে অস্বীকার করিয়া সেনাপতির পদ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল; রাজা চাঁদপালকে সৈনাপত্যে বরণ করিলেন। চাঁদপাল মন্দিরের পাহারায় নিযুক্ত রহিল। রাণীর পূজা ফিরিয়া গেল। রাণী এ কথা শুনিয়া ক্রোধে অন্ধ হইয়া গেলেন। তিনি সেনাপতি চাঁদপালকে ও রাজ-ভ্রাতা নক্ষত্রমাণিক্যকে রাজার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন।

রঘুপতিও নক্ষত্র রায়কে সিংহাসনের প্রলোভন দেখাইয়া রাজাকে হত্যা করিবার পরামর্শ দিলেন; বলিলেন, দেবী তাঁহাকে স্বপ্নাদেশ করিয়াছেন, তিনি রাজরক্ত চাহেন, শ্রাবণের শেষ রাত্রে এই রাজরক্ত আনিয়া দেবীর পায়ে উপহার দিতে হইবে, তবেই নক্ষত্র সিংহাসনের অধিকারী হইতে পারিবে। ভীরু নক্ষত্র এই প্রস্তাব শুনিয়া রঘুপতির সম্মুখ হইতে পলাইয়া গেলেন। জয়সিংহও এই ষড়যন্ত্রের কথা শুনিয়া ভয় পাইল। রঘুপতি তাহাকে বুঝাইলেন, দেবীর আদেশ পালনের মধ্যে কোনও অধর্ম নাই। জয়সিংহের সংশয় দূর হইল না। অবশেষে দেবতার নামে রঘুপতি জয়সিংহকেই রাজরক্ত আনিবার কার্যে নিয়োগ করিলেন। অপর্ণা আসিয়া বার বার জয়সিংহকে মন্দির হইতে চলিয়া আসিবার জন্য আহ্বান করিতে লাগিল, রঘুপতি প্রতিবারই তাহাকে তাড়াইয়া দিতে লাগিলেন। সংশয়গ্রস্ত হইয়া জয়সিংহ রাজরক্ত আনিয়া দিতে বিলম্ব করিতে লাগিল, অবশেষে একদিন রঘুপতি জয়সিংহকে দেবীমূর্তি স্পর্শ করাইয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইলেন যে, শ্রাবণের শেষ রাত্রে সে রাজরক্ত আনিয়া দেবীর চরণে উপহার দিবে। চাঁদপাল রাজাকে সংবাদ দিল যে, নক্ষত্র রায় রাজার প্রাণনাশের ষড়যন্ত্র করিতেছেন। শুনিয়া গোবিন্দমাণিক্য একদিন নক্ষত্রকে ডাকিয়া এই বিষয়ের সত্যতা সম্বন্ধে জানিতে চাহিলেন। নক্ষত্র অকপটে তাঁহার দোষ স্বীকার করিয়া ভ্রাতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। রাজা তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন। বালক ধ্রুব রাজার সঙ্গে সঙ্গেই থাকে, সিংহাসনে বসিয়া রাজমুকুট লইয়া খেলা করে। ইহা গুণবতীর অসহ্য হইয়া উঠিল। তিনি ধ্রুবকে লইয়া মন্দিরে দেবীর নিকট বলি দিবার জন্য নক্ষত্রকে পরামর্শ দিলেন। ব্যক্তিত্বহীন নক্ষত্র রায় তাহাতে সম্মত হইলেন। একদিন অর্ধরাত্রে নিদ্রিত ধ্রুবকে কোলে করিয়া লইয়া তিনি মন্দিরে রঘুপতির নিকট উপস্থিত হইলেন, রঘুপতি বলির আয়োজন করিতে লাগিলেন। সংবাদ পাইয়া গোবিন্দমাণিক্য প্রহরিদল সহ মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, রঘুপতি ও নক্ষত্র ধৃত হইলেন। বলি দিবার উদ্যোগ করিবার অপরাধে রাজা রঘুপতিকে আট বৎসরের জন্য নির্বাসন দণ্ড দান করিলেন। রঘুপতি আর দুই দিন সে রাজ্যে বাস করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন, প্রার্থনা পূর্ণ হইল। এইবার নক্ষত্রের বিচারের পালা। তাঁহাকেও রাজা আট বৎসরের জন্য রাজ্য হইতে নির্বাসনের আদেশ দিলেন। প্রহরিগণ নক্ষত্রকে লইয়া গেল, রাজা সজল নেত্রে তাঁহাকে বিদায় দিলেন।

এমন সময় পদচ্যুত সেনাপতি নয়ন রায় আসিয়া সংবাদ দিল, চাঁদপাল বিদ্রোহী হইয়াছে ও আসাম অভিযানকারী মোগল সৈন্যের সঙ্গে যোগদান করিয়া সসৈন্যে ত্রিপুরা অভিমুখে আসিতেছে। রাজা নয়ন রায়কে পুনরায় সৈনাপত্যে বরণ করিলেন এবং চাঁদপালকে প্রতিরোধ করিবার জন্য যুদ্ধসজ্জা করিতে লাগিলেন। এমন সময় চর আসিয়া সংবাদ দিল, নির্বাসনযাত্রার পথ হইতে মোগলেরা নক্ষত্রকে লইয়া গিয়া তাঁহাকে ত্রিপুরার রাজপদে বরণ করিয়াছে এবং বিদ্রোহী সৈন্যের অধিনায়ক হইয়া নক্ষত্র ত্রিপুরার দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছেন। ইহা শুনিয়া গোবিন্দমাণিক্য ভ্রাতার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবার সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন। নিজে সিংহাসন ত্যাগ করিয়া যাইবার সঙ্কল্প করিয়া রক্তপাত বন্ধ করিতে চাহিলেন। শ্রাবণের শেষ রাত্রি। বাহিরে প্রকৃতির বুকে দারুণ দুর্যোগ দেখা দিয়াছে। অধীর আগ্রহে রঘুপতি মন্দিরের দ্বারে দাঁড়াইয়া জয়সিংহের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন। সহসা জয়সিংহ দেবী-মূর্তির সম্মুখে ছুটিয়া আসিল; রাজ-রক্ত আনিয়াছে কি না রঘুপতি ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন। জয়সিংহ নিজের বুকে ছুরিকা বিদ্ধ করিয়া দিল, কহিল, সে রাজপুত, পূর্বপুরুষ রাজত্ব করিতেন, তাহার ধমনীতে রাজ-রক্ত প্রবহমাণ, অতএব তাহার রক্তেই দেবীর তৃপ্তি হউক, বলিয়াই প্রাণত্যাগ করিল। রঘুপতি জয়সিংহের শোকে আকুল হইয়া উঠিলেন, দেবীমূর্তির দিকে চাহিয়া তাহাকে ফিরাইয়া দিবার জন্য কাতর অনুনয় জানাইলেন, অতঃপর দেবীমূর্তি লইয়া দূরে গোমতীর জলে নিক্ষেপ করিলেন। অপর্ণার হাত ধরিয়া রঘুপতি মন্দির-প্রাঙ্গণ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

অতিনাট্যিক ঘটনার সমাবেশে এই বিয়োগান্তক নাট্যকাহিনীর পরিকল্পনা করা হইয়াছে। যে সকল নাট্যকাব্য রবীন্দ্রনাথ ইতিপূর্বে রচনা করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে এই প্রকার অতিনাট্যিক পরিবেশের অভাব না থাকিলেও 'বিসর্জন'-এ তাহা আরও ঘন এবং নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া অনুভব করা যায়। ঘটনার নিবিড়তা নাট্যশিল্পের একটি উৎকৃষ্ট গুণ, তাহার কথা পূর্বেও উল্লেখ করিয়াছি। নিবিড় ঘটনা-প্রবাহের ক্ষিপ্র ও স্বচ্ছন্দ গতি এই নাটকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। দৃশ্যের পর দৃশ্যে ঘটনা-স্রোত এত দ্রুত সঞ্চরণ করিয়াছে যে, ইহার মধ্যে কোথাও কোন গভীর বিচ্ছেদ-রেখা পড়িবার অবকাশ পায় নাই। একমাত্র জয়সিংহ ও গুণবতীর দীর্ঘ স্বগত খেদোক্তিগুলি ইহার কোন কোন স্থানে কাহিনীর প্রবাহ আড়ষ্ট করিয়া দিলেও, সমগ্রভাবে বিচার করিয়া

দেখিলে এই ত্রুটি এই নাটকের পক্ষে সামান্য বলিয়াই বিবেচিত হয়। কাহিনী-পরিকল্পনায় এই নাটকের ত্রুটি সর্বাপেক্ষা অল্প। ইহার মধ্যে অনাবশ্যক চরিত্র, প্রয়োজনাতিরিক্ত দৃশ্যসমাবেশ ও বাগ্‌বাহুল্য প্রায় নাই বলিলেই চলে। ইহার একমাত্র কারণ এই যে, নাট্যোপযোগী এই কাহিনীভাগ কবি বিশেষ সতর্কতার সঙ্গেই ইহার পূর্বতন উপন্যাসরূপের বিস্তৃততর ক্ষেত্র হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। তারপরও ইহার একাধিকবার অভিনয়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থাকিয়া ইহার প্রয়োজনীয় নাট্যিক অংশ বাছিয়া লইবার পরিপূর্ণ সুযোগ তিনি লাভ করিয়াছিলেন। সেইজন্য ইহার কাহিনী-পরিকল্পনার ত্রুটি যথাসম্ভব পরিত্যক্ত হইয়াছে।

পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাদীক্ষার সংস্পর্শে আসিবার পর হইতেই এ দেশের শিক্ষিত জনসাধারণ নিজেদের সামাজিক ব্যবস্থাগুলির সম্বন্ধে সর্বপ্রথম সজাগ হইতে আরম্ভ করিল। আধুনিক সভ্যতার আদর্শে বৃহত্তর সমাজ ও মানবতার কল্যাণের মাপকাঠিতে ইহাদের বিচার ও বিবেচনা আরম্ভ হইল। সংস্কারের জড়ত্ব হইতে মুক্তির সর্বপ্রথম প্রয়াস তখনই এ দেশের সমাজের মধ্যে দেখা দিল, কিন্তু তাহাও নিতান্ত মুষ্টিমেয় শিক্ষিত জনসাধারণের সমাজকে বাহিরের দিক হইতে আশ্রয় করিয়াই সীমাবদ্ধ হইয়া রহিল, সমাজের অন্তরের দিকটা তখনও চিরাচরিত প্রথার দাসত্বে নির্জীব। এই গতিশক্তিহীন নির্জীব সমাজ-ব্যবস্থার অচলায়তনকে রবীন্দ্রনাথ প্রথম হইতেই আঘাত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। সামাজিক সংস্কার-মুক্তির অগ্রদূত হিসাবে সমাজকে সেদিন যাঁহারা নূতন দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথের জীবনের সাধনা তাঁহাদের নিবিড়তম সান্নিধ্যের ভিতর দিয়াই আরম্ভ হইয়াছিল। ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠার ভিতর দিয়া যে নব-প্রবুদ্ধ আধ্যাত্মিক চৈতন্য রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছিল, রবীন্দ্র-সাধনার বিচিত্র রস-চৈতন্যেও তাহারই অভিব্যক্তি প্রথম হইতেই দেখা দিয়াছে। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটকের মধ্যে তিনি নিতান্ত আত্মকেন্দ্রিক সাধনার ব্যর্থতার কাহিনী কীর্তন করিলেন, 'বিসর্জন'-এর মধ্যেও তিনি এই সমাজেরই চিরাচরিত একটি প্রধান নিষ্ঠুরতার স্বরূপ উদ্ঘাটন করিয়া দিলেন। আধুনিক শিক্ষিত মনের সর্বপ্রথম সমাজ-বিদ্রোহের সুর যেমন এ দেশের ব্রাহ্মধর্মের ভিতরেই শুনিতে পাওয়া গিয়াছিল, তেমনই প্রকৃত ব্রাহ্মধর্মের গণ্ডীর বাহিরেও শিক্ষিত সমাজের মধ্যে অলক্ষিতে এই ব্রাহ্মধর্মগত মনোভাব ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতেছিল। প্রত্যক্ষভাবে ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে

সম্পর্ক স্বীকার না করিয়াও, এ দেশের সমাজ-জীবনের প্রথাগুলির যৌক্তিকতা সম্বন্ধে শিক্ষিত মন মাত্রই সেদিন বিচার আরম্ভ করিয়াছিল এবং তাহাদের সেই বিচারবুদ্ধিও স্বভাবতঃই ব্রাহ্মধর্মের অনুকূলেই গড়িয়া উঠিতেছিল। পাশ্চাত্ত্য জীবনের আধ্যাত্মিক আদর্শ হইতে আমরা Love এবং Faith সম্বন্ধে যে নূতন চৈতন্য লাভ করিয়াছিলাম, তাহা আমাদের সমাজের আধ্যাত্মিক সাধনার সম্মুখীন করিয়া লইয়া নূতন ভাবে বিচার আরম্ভ করিবার ফলে আমাদের হৃদয়হীন কুপ্রথাগুলির ভয়াবহ স্বরূপ প্রকট হইয়া উঠিতে লাগিল। 'বিসর্জন'-এর মধ্যে তাহারই একটির পরিচয় দেওয়া হইয়াছে মাত্র। 'বিসর্জন'-এর বিষয়বস্তু এই প্রকার একটি সমসাময়িক ভাবের বাহন বলিয়াও শিক্ষিত সমাজের মধ্যে ইহা ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করিতে পারিযাছে, ইহাই রবীন্দ্রনাথের সর্বাধিক জনপ্রিয় নাটক।

রবীন্দ্রনাথের নাটক মাত্রই এক একটি ভাবের বাহন, 'বিসর্জন'-এর মধ্যেও তাহার কোন ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার ভিতর দিয়া রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত সহজ ভাবেই বলিয়াছেন, 'প্রেমের পথ ও হিংসার পথ এক নয়, প্রেমেই দেবতার পূজা, হিংসায় নয়।' এখন এই নাটকাখ্যানের মধ্য দিয়া বিভিন্ন চরিত্রের সহায়তায় এই ভাব কি ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে, তাহাই আলোচনা করিয়া দেখা যাইতেছে।

এই নাটকের প্রধানতম চরিত্র রঘুপতি ও অন্যতম প্রধান চরিত্র গোবিন্দমাণিক্য। দুইজন দুইটি বিরুদ্ধ শক্তির প্রতীক্। এই উভয়ের পরস্পর-বিরোধী মতের অনমনীয় দৃঢ়তা হইতেই এই নাটকের বিয়োগান্তক পরিণতি সম্ভব হইয়াছে। বিয়োগান্তক নাটকের নায়ক ও প্রতিনায়কের মধ্যে সাধারণতঃ যে-সকল গুণের পরিকল্পনা করা হইয়া থাকে, রঘুপতি ও গোবিন্দমাণিক্যের মধ্যে তাহাদের প্রায় সব কিছুই বর্তমান আছে। তবে পাশ্চাত্ত্য বিয়োগান্তক নাটকের সঙ্গে ইহাদের একটু স্থূল পার্থক্য আছে। যে বিশ্বাস লইয়া ইহাদের উভয়ের দ্বন্দ্ব, তাহার সম্বন্ধে ইহাদের মনে নিজেদের কাহারও কোনও সংশয় নাই। নায়ক কিংবা প্রতিনায়ক কাহারও অন্তর্দ্বন্দ্বের উপর ইহার নাট্যিক পরিণতি নির্ভর করে নাই, এখানে বৃহত্তর সত্যের আদর্শ লইয়া নায়ক ও প্রতিনায়কের মধ্যে বিরোধ নির্দেশ করা হইয়াছে—ব্যক্তিচরিত্রের ক্ষুদ্র স্বার্থবোধ হইতে দ্বন্দ্বের উৎপত্তি বা অবসান নির্দেশ করা হয় নাই। যে নাটক সাধারণতঃ ভাবের বাহন হইয়া থাকে, তাহার মধ্যে ইহা আশাও

করা যায় না ; কারণ, উচ্চতম ভাবপ্রচারের দায়িত্ব গ্রহণের মূলেই ব্যক্তিস্বার্থ লুপ্ত হইয়া যায়, অর্থাৎ এখানে আমরা মানুষ রঘুপতির ব্যক্তি-চৈতন্যবোধ কিংবা মানুষ গোবিন্দমাণিক্যের ব্যক্তিগত সুখদুঃখবোধের কোন পরিচয় পাই নাই, তাঁহারা উভয়েই উচ্চতর এক একটি আদর্শ আশ্রয় করিয়া নিজেদের ব্যক্তি-পরিচয় গোপন করিয়াছেন। ব্যক্তিস্বার্থের সঙ্গে উচ্চতর আদর্শের কোন দ্বন্দ্ব উপস্থিত করিয়া ইহার প্রধান চরিত্র দুইটির পরিকল্পনা করা হয় নাই। সেইজন্য এই নাটকে নায়ক কিংবা প্রতিনায়কের অন্তর্দ্বন্দ্বের কোন অবকাশ নাই। তাঁহারা যাহা বিশ্বাস করেন, তাহার মধ্যে তাঁহাদের ব্যক্তিগত স্বার্থের কোন যোগ নাই, কিংবা সংশয়েরও কোন অবকাশ নাই ; অতএব তাঁহাদের দ্বন্দ্ব কেবল বাহিরের দিক হইতেই নির্দেশ করা হইয়াছে। কিন্তু নায়ক ও প্রতিনায়কের মধ্যে কোন অন্তর্দ্বন্দ্ব না থাকিলেও, এই নাটকের অন্যতম প্রধান চরিত্র জয়সিংহের মধ্যে ইহার অভাব নাই ; সে কথা পরে আলোচনা করিয়াছি।

ভিতরের দিক হইতে নায়ক ও প্রতিনায়কের চরিত্র-পরিকল্পনার এই ত্রুটি সত্ত্বেও, বাহিরের দিক হইতে তাঁহাদিগকে যে বিরুদ্ধ আদর্শের প্রতীক্ হিসাবে উপস্থিত করা হইয়াছে, তাহাদের প্রতি দৃঢ়তা ও আন্তরিকতা দ্বারাই ইহার নাট্যিক সংঘাত সৃষ্টি করা হইয়াছে। এখন বিচার করিয়া দেখিতে হইবে, এই উভয় চরিত্রের মধ্যে তাহাদের পরস্পরের আদর্শগত দৃঢ়তা নাট্যকার কতটুকু রক্ষা করিতে পারিয়াছেন। কারণ, ইহাই নাট্যিক সংঘাতের ভিত্তি এবং ইহার উপরই এই বিয়োগাত্মক নাটকের পরিণতি নির্ভর করিতেছে। অতএব নাটকের সার্থকতার জন্য এই বিষয়টি সম্পর্কে নাট্যকারের অপরিসীম দায়িত্ব রহিয়াছে।

প্রথমে রঘুপতির কথাই ধরা যাউক। রঘুপতি শাক্ত। রবীন্দ্রনাথ নিজেও তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন, 'রঘুপতির দয়ামায়া নেই, সে নিষ্ঠুর প্রথাকে পালন করে এসেছে এবং এমনি ভাবে শক্তিলাভ ক'রে বড় হয়ে উঠেছে। সে দেবীর সেবক ব'লে লোকের কাছে সম্মান ও প্রতিপত্তি পেয়ে এসেছে। সে জয়সিংহকে তার পক্ষে আনতে চায়, মন্দিরের প্রথার গণ্ডীর মধ্যে বাঁধ্‌তে চায়।' এই দয়ামায়াহীনতাই শাক্তের ধর্ম, নিষ্ঠুরতার মধ্য দিয়াই তাঁহার শক্তির সাধনা। দেশাচার আশ্রয় করিয়া তাঁহার ধর্মের সাধনা বলিয়া, বিরাট ও শক্তিশালী জনমতও তাঁহার সহায়ক। অতএব রঘুপতি প্রকৃতই শক্তিমান্। যে প্রথা বা দেশাচারকে তিনি রক্ষা করিতে চাহেন, তাহা যত নিষ্ঠুরই হউক না

কেন, তাহা তাঁহার সাধনার অঙ্গ। এই সাধনায় মধ্যে তাঁহার কোন ফাঁকি থাকিবার কথা নহে ; কারণ, এই সাধনা দিয়াই তাঁহার পরিচয় এবং ইহার উপরই তাঁহার শক্তির নির্ভর। দেবী ও দেবীমূর্তিকে অবলম্বন করিয়া যে সকল প্রথার জন্ম হইয়াছে, তাহাদের প্রতিটি সংস্কারের প্রতি তাঁহার সুদৃঢ় বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাই তাঁহার নিকট আমরা আশা করি। কারণ, তাঁহার এই বিশ্বাসের অন্ধতাই নাট্যিক কাহিনীর বিয়োগাত্মক পরিণতি নির্দেশ করিয়াছে। কিন্তু এ কথা স্বীকার করিতেই হয়, রঘুপতির চরিত্রে বিশ্বাসের এই দৃঢ়তা সর্বত্র রক্ষা পায় নাই। দুই-একটি দৃষ্টান্ত দিলেই কথাটি স্পষ্ট হইবে।

রঘুপতি মিথ্যা করিয়া নক্ষত্রকে বলিলেন যে, দেবী স্বপ্নাদেশ করিয়াছেন, তিনি রাজ-রক্ত চাহেন, নক্ষত্র গোবিন্দমাণিক্যের রক্ত আনিয়া দিলে তিনি রাজা হইবেন। এই উক্তিতে রঘুপতির একান্ত ভক্ত জয়সিংহ পর্যন্ত সন্দেহ প্রকাশ করিল ; রঘুপতিও জয়সিংহের নিকট তাহা অকপটে স্বীকার করিয়া বলিলেন,

আর
কী উপায় আছে বলো ?—(৩।১)

রাজা দেবীমন্দিরের একটি চিরাচরিত প্রথা লোপ করিতে চাহেন বলিয়া রঘুপতির বিশ্বাসে আঘাত লাগিল, কিন্তু যাহা আশ্রয় করিয়া এই প্রথা, তাহার নামে এমন একটি মিথ্যার আশ্রয় লইতে তাঁহার বিন্দুমাত্রও দ্বিধা বোধ হইল না। ইহা কি দেবতা কিংবা তাঁহার সম্পর্কিত কোন প্রথার প্রতি তাঁহার সুদৃঢ় ভক্তি ও বিশ্বাসের পরিচায়ক? রাজ-রক্ত আনিবার মূলে দৈবাদেশ প্রতিপন্ন করিতে গিয়া রঘুপতি পুনরায় মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। গোবিন্দমাণিক্যের সম্মুখে একদিন সংশয়াচ্ছন্ন জয়সিংহ দেবী-মূর্তিকে প্রশ্ন করিল,

বল্, চণ্ডী, সত্যই কি রাজরক্ত চাই ?
এই বেলা বল্—বল নিজ-মুখে, বল্
মানব-ভাষায়, বল্ শীঘ্র, সত্যই কি
রাজরক্ত চাই ?—(৩।৪)

নেপথ্য হইতে উত্তর আসিল, 'চাই'। জয়সিংহ বিশ্বাস করিল, ইহা দেবীরই উত্তর। কিন্তু গোবিন্দমাণিক্য যখন তাহাকে বলিয়া দিলেন,

দেবী নহে, জয়সিংহ,
কহিলেন রঘুপতি অন্তরাল হতে,—
পরিচিত স্বর।—(৩।৪)

তখন জয়সিংহেরও সংশয় উপস্থিত হইল,

কহিলেন রঘুপতি ?
অন্তরাল হতে ?—(৩।৪)

আরও একবার দেখিতে পাই, প্রজাবৃন্দকে রাজার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবার জন্য রঘুপতি নিজেই প্রতিমার মুখ ফিরাইয়া রাখিয়া কহিলেন, 'মা বিমুখ হয়েছেন।' জয়সিংহের সংশয় উপস্থিত হইল, রঘুপতিকে জিজ্ঞাসা করিল, 'সন্দেহের কি কোন কারণ নাই?' রঘুপতি সত্য গোপন করিয়া কহিলেন, 'না।'

শাক্তধর্ম এই প্রকার প্রবঞ্চনা ও মিথ্যার ছলনা মাত্র নহে; এই ধর্মেও বিশ্বাস রক্ষা করিয়া, ইহার সংস্কার ও আচারগুলি পালন করিয়া নিষ্ঠাবান্ সাধকগণ তাঁহাদের নিজেদের দিক হইতে আধ্যাত্মিক সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন; ইহার সংস্কার কুসংস্কার হইলেও, ইহার প্রথা কুপ্রথা হইলেও, এই ধর্মের প্রকৃত সেবকের নিকট তাহা প্রাণ দিয়াও রক্ষণীয়। রঘুপতি এই ধর্মের দেবতাকে লইয়া ছিনিমিনি খেলিয়াছেন, ভণ্ডামি করিয়াছেন, তাঁহার নামে যথেচ্ছ মিথ্যা প্রচার করিয়াছেন, ইহা অবশ্যই আচারনিষ্ঠ প্রকৃত শাক্ত-ধর্মাবলম্বীর কার্য নহে। অবশ্য দেবীমূর্তি-সম্পর্কিত রঘুপতির এই সকল কার্যের মধ্য দিয়াই তাঁহার শেষ দৃশ্যে দেবীমূর্তিকে লইয়া গোমতীর জলে নিক্ষেপ করিবার সম্ভাবনা ব্যক্ত করা হইয়াছে। এই দিক দিয়া বিবেচনা করিলে রঘুপতির কার্যাবলী পরস্পর-বিরোধী বলিতে পারা যায় না।

দেখা গেল, ধর্ম-বিশ্বাস রঘুপতির জীবনে সত্য নহে। তবে তাঁহার জীবনে সত্য কি? দেবীমূর্তি বাদ দিলে মন্দিরে অবশিষ্ট থাকে এক জয়সিংহ। মনে হয়, জয়সিংহের প্রতি স্নেহই তাঁহার জীবনে একমাত্র সত্য, দেবীমূর্তি তাহার উপলক্ষ মাত্র। দেবীমূর্তিকে কেন্দ্র করিয়া মন্দিরে রঘুপতি ও জয়সিংহের জীবন অতিবাহিত হইতেছিল। রঘুপতি দেবীমূর্তিকে উপলক্ষ করিয়া জয়সিংহের প্রতি স্নেহে আবদ্ধ হইয়াছিলেন; অভ্যাস বশতঃ দেবতা সম্পর্কে

তাঁহার একটা সংস্কার জন্মিয়াছিল, কিন্তু তাহা তাঁহার অন্তরের সঙ্গে যোগ-স্থাপন করিতে পারে নাই। সেইজন্যই দেখিতে পাই, মন্দিরের চিরাচরিত প্রথার যেদিন উচ্ছেদ হইল, সেদিন রঘুপতি মন্দির ত্যাগ করিয়া গেলেন না, বিসর্জিত-প্রথা ও বৈশিষ্ট্যবর্জিত মন্দিরের মধ্যে থাকিয়াই কেবল বাহ্য সংস্কারের বশবর্তী হইয়া তাহা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করিতে লাগিলেন; কিন্তু জয়সিংহকে যেদিন হারাইলেন, সেদিন মন্দিরের সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া গেলেন। জয়সিংহের প্রতি স্নেহ তাহার জীবিত কালে যেমন রঘুপতিকে সত্যে আবদ্ধ রাখিয়াছিল, মৃত্যুর মধ্য দিয়াও তাহাই রঘুপতিকে সত্যের সন্ধান দিয়া গেল। বাহিরের দিক দিয়া একটি অতি নিষ্ঠুর প্রথার প্রতিপালক হইয়াও, অন্তরের দিক দিয়া স্নেহ-প্রবৃত্তির এই ফল্গুধারা রঘুপতি প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছিলেন। বাহিরের বস্তুটি ছিল অভ্যাস দ্বারা আয়ত্ত, আর ভিতরের বস্তুটি ছিল সহজাত। সত্যোপলব্ধি যেদিন আসিল, অভ্যাসায়ত্ত বাহিরের বস্তু সেদিন অনায়াসেই পরিত্যক্ত হইল। এই বিষয়ে গোবিন্দমাণিক্যের সঙ্গে রঘুপতির ব্যাপক পার্থক্য সহজেই উপলব্ধি করা যাইবে। গোবিন্দ-মাণিক্যের মনে যে সত্যধর্মের উপলব্ধি হইয়াছে, তাহার মধ্যে এতটুকুও সংশয় কিংবা অবিশ্বাসের স্পর্শ নাই। রঘুপতির ধর্মসংস্কার বাহিরের অভ্যাস দ্বারা আয়ত্ত ছিল, কিন্তু গোবিন্দমাণিক্যের প্রেমধর্মের অনুভূতি তাঁহার একান্ত অন্তর-জাত; একটি বাহ্য সংস্কার, আর একটি অন্তরের ধর্ম। এই দিক দিয়া বিচার করিলে অন্তরের ধর্মের নিকট বাহিরের সংস্কার পরাজয় স্বীকার করিবে, তাহাতে বিস্ময়ের কিছু আছে বলিয়া মনে হইতে পারে না। অতএব দেখিতে পাই, গোবিন্দমাণিক্য যে আদর্শ লইয়া এই নাটকের মধ্যে রঘুপতির প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছেন, তাহার মধ্যেই প্রকৃত দৃঢ়তা আছে, রঘুপতির আদর্শের মধ্যে তাহা নাই। গোবিন্দমাণিক্য তাঁহার এই বিশ্বাস লইয়া কাহারও সহিত কোন কপটতা কিংবা মিথ্যা ছলনা করেন নাই। যাহারা তাঁহার মতে বিশ্বাস করে নাই, তাহাদের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য রঘুপতির ন্যায় তিনি কোন অন্যায় পথ অবলম্বন করেন নাই, অন্তরের সত্যোপলব্ধির শক্তি লইয়াই তিনি সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছেন। তাঁহার প্রতি রাণী বিমুখ হইয়াছেন, ভ্রাতা ষড়যন্ত্র করিয়াছে, প্রজা বিদ্রোহী হইয়াছে, রঘুপতি ছুরি শানাইয়াছে—তিনি অবিচলিত চিত্তে তাঁহার সত্যপথে অগ্রসর হইয়াছেন। রঘুপতির ধর্মবিশ্বাসে শৈথিল্য ছিল বলিয়াই গোবিন্দমাণিক্যের এই অটল বিশ্বাসের

সম্মুখে তাহা পরাজয় স্বীকার করিয়াছে। এই ত' গেল নাট্যিক সংঘাত সৃষ্টির কথা, এখন নাটকের এই প্রধান চরিত্র দুইটি স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করিয়া দেখা যাইতেছে।

রঘুপতিকে নাট্যকার শাক্ত বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু এ কথা স্বীকার করিতেই হয় যে, হিন্দুধর্মের এই শাক্ত মতবাদ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ধারণা এই নাটকে খুব স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই, ইহার মধ্যে পাশ্চাত্ত্য দর্শনের কিছু সংমিশ্রণ হইয়াছে। রঘুপতি জয়সিংহকে শিক্ষা দিতেছেন,

> পাপপুণ্য কিছু নাই। কেবা ভ্রাতা কেবা
> আত্মপর? কে কহিল হত্যাকাণ্ড পাপ?
> এ জগৎ মহাহত্যাশালা। জান না কি
> প্রত্যেক পলকপাতে লক্ষকোটি প্রাণী
> চির আঁখি মুদিতেছে। সে কাহার খেলা?
> হত্যায় খচিত এই ধরণীর ধূলি
> প্রতি পদে চরণে দলিত শত কীট;
> তাহারা কি জীব নহে? রক্তের অক্ষরে
> অবিশ্রাম লিখিতেছে বৃদ্ধ মহাকাল
> বিশ্বপত্রে জীবের ক্ষণিক ইতিহাস।
> হত্যা অরণ্যের মাঝে, হত্যা লোকালয়ে,
> হত্যা বিহঙ্গের নীড়ে, কীটের গহ্বরে,
> অগাধ সাগর জলে, নির্মল আকাশে,
> হত্যা জীবিকার তরে, হত্যা খেলাচ্ছলে,
> হত্যা অকারণে, হত্যা অনিচ্ছার বশে!
> চলেছে নিখিল বিশ্ব হত্যার তাড়নে
> ঊর্ধ্বশ্বাসে প্রাণপণে—ব্যাঘ্রের আক্রমে
> মৃগ সম, মুহূর্ত দাঁড়াতে নাহি পারি।—(৩।১)

বলা বাহুল্য, ইহা শাক্ত মতবাদ নহে; ইহা আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পাশ্চাত্ত্য জড়বাদের উক্তি। দুর্বলের শক্তি সাধনাই শাক্তধর্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য; শাক্ত মতাবলম্বীদিগের বিশ্বাস যে, জগন্মাতার নিকট প্রকৃত বল ও শক্তির অধিকারী হইয়া বাঁচিয়া থাকিতে হইবে, তাঁহার নিকট দুর্বলের স্থান নাই। শাক্ত-মতাবলম্বিগণ নিজেদের ধর্মীয় সাধনার মধ্য দিয়া এই শক্তিরই সাধনা করিয়া থাকেন। 'জগৎ মহাহত্যাশালা'র সঙ্গে এই শক্তিসাধনার কোন যোগ নাই।

এতদ্ব্যতীত আর কোন স্থানেই নাট্যকার রঘুপতির শক্তিসাধনার আর কোন পরিচয় দেন নাই। অতএব রবীন্দ্রনাথ শাক্ত বলিতে রঘুপতিকে শক্তিমান্ দেশপ্রথারই প্রতীকরূপে দেখিয়াছেন, তাঁহার সাধনার পরিচয় তেমন সুস্পষ্ট করিয়া তুলিতে পারেন নাই। এমন কি, তাঁহার রঘুপতি নামটির মধ্যেও শক্তি-সাধকের কোন পরিচয় প্রকাশ পায় নাই।

পূর্বেই বলিয়াছি, রঘুপতির জীবনে একমাত্র সত্য জয়সিংহের প্রতি তাঁহার স্নেহ। ভ্রাতৃহত্যা রোধ করিবার জন্য যখন জয়সিংহ নিজেই রাজ-রক্ত আনিয়া দিবার প্রস্তাব করিল, তখন রঘুপতি বলিলেন,

> সত্য ক'রে বলি বৎস তবে। তোরে আমি
> ভালবাসি প্রাণের অধিক—পালিয়াছি
> শিশুকাল হ'তে তোরে মায়ের অধিক
> স্নেহে, তোরে আমি নারিব হারাতে।—(৩।১)

রঘুপতির এই অকপট বাৎসল্যের মধ্যে সংশয় প্রকাশ করিবার কিছুই নাই। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও আমরা দেখিতে পাই যে, নক্ষত্রকে দিয়া যখন গোবিন্দমাণিক্যকে বধ করা সম্ভব হইল না, তখন রঘুপতি জয়সিংহকেই দেবীর পাদস্পর্শ করাইয়া রাজ-রক্ত আনিয়া দিবার জন্য শপথ করাইলেন। রাজ-রক্ত আনিবার মধ্যে যে বিপদ আছে, সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত থাকিয়াও তাঁহার একান্ত স্নেহের পাত্র জয়সিংহকে রঘুপতি সেই কার্যেই নিয়োজিত করিলেন। যদি জয়সিংহের প্রতি তাঁহার স্নেহই একমাত্র সত্য হইয়া থাকে, তবে ইহা রঘুপতির পক্ষে সম্পূর্ণ অসঙ্গত কার্য বলিয়া বোধ হয়।

এই সকল ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও এ কথা স্বীকার করিতেই হয় যে, রঘুপতির চরিত্র রবীন্দ্রনাথের একটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। পাশ্চাত্ত্য কোন কোন নাটকে রাজশক্তির সহিত পুরোহিত-শক্তির যে বিরোধ দেখিতে পাওয়া যায়, রঘুপতির পরিকল্পনাও সেই শ্রেণীর পুরোহিত-শক্তি হইতেই আসিয়াছে। ইহা যেন আমাদের সমাজে এক অভিনব শক্তি লইয়া আবির্ভূত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। রঘুপতি রাজার রাজ্যে বাস করিয়াও তাঁহার সমান শক্তি লাভের অভিলাষী। আমাদের দেশের সামাজিক ইতিহাসে পুরোহিত-শক্তির এমন ঔদ্ধত্যের পরিচয় খুব সুলভ নহে; সেইজন্য রঘুপতির চরিত্র-পরিকল্পনায় যে পাশ্চাত্ত্য প্রেরণাই কার্যকর হইয়াছে, তাহা অনুমান করিতে কাহারও ভুল হয় না।

রঘুপতির পরই গোবিন্দমাণিক্যের চরিত্রের বিষয় আলোচনা করিতে হয়। গোবিন্দমাণিক্য ত্রিপুরার রাজা। এই নাটকে রঘুপতিকেই শক্তি ও তেজস্বিতার অধিকারী করিয়া অঙ্কিত করা হইয়াছে, কিন্তু গোবিন্দমাণিক্যের মধ্যে এই সকল গুণের অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। সেইজন্য তাঁহার রাজোচিত কোন পরিচয়ই এই নাটকের মধ্যে সার্থক হইয়া উঠিতে পারে নাই। আদর্শ রক্ষায় মানসিক দৃঢ়তা তাঁহার অপরিমেয় সন্দেহ নাই, কিন্তু রাজোচিত আভিজাত্যের পরিচয় তাঁহার চরিত্রের মধ্যে নাই। একবার মাত্র তাঁহাকে দৃঢ়হস্তে রাজদণ্ড ধারণ করিয়া সিংহাসনে উপবিষ্ট দেখি, তাহা রঘুপতি ও নক্ষত্রের বিচার কালে ; অন্যত্র কোথাও তাঁহার এই চরিত্রগত দৃঢ়তার পরিচয় প্রকাশ নাই। তাঁহার সহজ পরিচয় এই যে, তিনি মানব-প্রেমিক, অনেক সময় ইহার বশবর্তী হইয়া তিনি রাজকর্তব্য বলি দিয়াছেন। বিদ্রোহী ভ্রাতা নক্ষত্রকে দমন করিতে অগ্রসর না হইয়া, তিনি যে স্বেচ্ছায় সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া যাইবার সঙ্কল্প করিলেন, ইহার মধ্যে তাঁহার মানব-প্রেমিকতার আদর্শ যত উচ্চ প্রশংসাই লাভ করুক না কেন, তাঁহার রাজকর্তব্য যে শোচনীয়ভাবে অবহেলিত হইয়াছে, তাহা স্বীকার করিতেই হয়। কিন্তু আদর্শ-নিষ্ঠায় তিনি রঘুপতি অপেক্ষাও অবিচলিত ; ইহাই তাঁহার চরিত্রের বিশিষ্ট গুণ।

জয়সিংহের আত্মবিসর্জনেই সত্যের প্রতিষ্ঠা হইল, অতএব জয়সিংহ এই নাটকের একটি প্রধান চরিত্র। জয়সিংহ মন্দিরের সেবক, রঘুপতির পালিত ; মৃত্যুর সময় তাহার নিজের মুখ দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে যে, সে রাজপুত ; তাহার পূর্বপিতামহ রাজা ছিল, মাতামহবংশ তখনও রাজত্ব করে। কিন্তু এই নাটকের কোন স্থানে তাহার কোন কার্য ও চিন্তার ধারায় তাহার এই পরিচয়ের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। রঘুপতিও জয়সিংহের এই পরিচয় সম্বন্ধে কোন সংবাদ রাখিতেন বলিয়া মনে হয় না। তাহা হইলে ধূর্ত রঘুপতি রাজ-রক্ত সম্বন্ধে কোন অস্পষ্টতা রাখিতেন না। জয়সিংহ গুরুর আদেশ ও রাজার প্রতি ভক্তি এই উভয়ের বিরোধ মিটাইবার জন্যই এখানে তাহার বিস্মৃত জীবনের বিলুপ্ত ইতিহাসের শরণাপন্ন হইয়াছে, এতদ্ব্যতীত তাহার চরিত্রের মধ্যে তাহার কুলপরিচয়ের কোন নিদর্শন নাই। রাজপুত ক্ষত্রিয় যুবকের যেমন নিঃসংশয়চিত্ত ও গুরুর আদেশ কিংবা নিজের কর্তব্যবোধ সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ থাকা উচিত, জয়সিংহের মধ্যে তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব সে যে রাজপুত, এই পরিচয় তাহার নিতান্ত বাহিরের পরিচয় ;

ইহা নাট্যিক কাহিনীর অঙ্গীভূত পরিচয় নহে। নাটকের একটি বিশিষ্ট গুণই এই যে, প্রত্যেক চরিত্রেরই প্রকৃত বৈশিষ্ট্য ইহার নাট্যিক ক্রিয়ার ভিতর দিয়া প্রকাশ করিতে হইবে, কেবল মুখের কথার ভিতর দিয়া প্রকাশ করিলে তাহা কার্যকর হইয়া উঠিতে পারে না। সুতরাং জয়সিংহেরও এই পরিচয় অর্থহীন। কেবলমাত্র কাহিনীর প্রয়োজনীয়তার জন্যই লেখক শেষ মুহূর্তে জয়সিংহের এই পরিচয়ের অবতারণা করিয়াছেন। অতএব জয়-সিংহের চরিত্রের আলোচনা সম্পর্কে তাহার এই পরিচয়ের অংশ পরিত্যাগ করিয়াই লইতে হয়।

জয়সিংহের চরিত্রের মধ্যে দৃঢ়তার অভাব সর্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। সে নিজের অন্তরকে বিশ্বাস করিতে পারে না, কেবলই সংশয় হইতে নূতন সংশয়ের তীরে উৎক্ষিপ্ত হয়। গুরুর প্রতিও সে তাহার সন্দেহ গোপন করিয়া চলে না, অথচ নিজের চক্ষে গুরুর ভণ্ডামি দেখিয়াও অভিভূতের মত গুরুর নির্দেশে দেবীর চরণ স্পর্শ করিয়া কঠিন শপথ করে। শপথ করিয়াও শপথ পালন করিবার সময় আবার সে সংশয়ের অধীন হইয়া পড়ে। তারপরও এই শপথ হইতে পরিত্রাণের কৌশল অবলম্বন করে। ইহা দ্বারা তাহার গুরু কিংবা দেবী কাহারও প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ পায় না। কারণ, রাজ-রক্ত বলিতে রঘুপতি কাহার রক্ত মনে করেন, তাহা নিশ্চিত বুঝিয়াও সে গুরুর সম্মুখে আত্মহত্যা করিয়া গুরুর যে উদ্দেশ্যই শুধু ব্যর্থ করে, তাহা নহে—তাঁহাকে কঠিন আঘাতও দেয়।

জয়সিংহের অন্তর্দ্বন্দ্বের ক্রমবিকাশের দিকটা নাটকে সুকৌশলে বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ ইহা নিজেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 'জয়সিংহ রঘুপতিকে পিতার মত ভক্তি করত, সে বাল্যকাল থেকে মন্দিরের সকল অনুষ্ঠান ও পশুবলি দেখে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। তাই, যেখানে ভালোবাসা সেখানে রক্তপাত চলে না—এই উপলব্ধি তার মনে সম্পূর্ণরূপে স্থান পেতে দেরী হয়েছিল। অপর্ণার ক্রন্দনেই প্রথমে তার পূর্ববিশ্বাস সম্বন্ধে সংশয় হতে সুরু হলো।' (ঐ)

নক্ষত্রমাণিক্যের চরিত্র এই নাটকের মধ্যে একটি অপূর্ব সৃষ্টি। অবশ্য এ কথা স্বীকার্য যে, এই চরিত্রটি এই নাটক অপেক্ষা 'রাজর্ষি' উপন্যাসে অধিকতর পরিস্ফুট হইয়াছে। তথাপি নাটকেও ইহার পরিকল্পনা সার্থকই হইয়াছে বলিতে হইবে। নক্ষত্র ব্যক্তিত্বহীন পুরুষ, তাঁহার চরিত্রে কোন দৃঢ়তা নাই ;

সহজেই তিনি অন্যের ক্রীড়া-পুত্তলিকা হইয়া উঠেন। সিংহাসনের প্রতি তাঁহার লোভও দুর্নিবার, অথচ রাজার প্রতি ভক্তিও অসীম। রঘুপতিকে তিনি ভয় করেন, গুণবতীর সান্নিধ্যও তিনি এড়াইয়া চলেন। তিনি প্রকৃত যাহা নহেন, অনেক সময় গোলেমালে তাহাই হইয়া উঠেন। তিনি ভীরু, নিজের ছায়া দেখিয়া নিজেই শিহরিয়া মরেন। নাটকের মধ্যে এই চরিত্রটিই সর্বাপেক্ষা বাস্তব।

গুণবতীকে এই নাটকের মধ্যে একটি তত্ত্বের বাহন হিসাবেই নাট্যকার উপস্থিত করিতে চাহিয়াছেন; সেইজন্য তাঁহার বাস্তবরূপ তত সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারে নাই। তিনি নিঃসন্তানা, তাঁহার সন্তান-কামনার অভিব্যক্তির মধ্যে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি আছে। শুধু একটা তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করিবার জন্যই নাট্যকার এই নারীচরিত্রকে অস্বাভাবিক রকম নিষ্ঠুর প্রকৃতির করিয়া তুলিয়াছেন। এতটুকু ক্ষুদ্র প্রাণের অনিশ্চিত সম্ভাবনায় তিনি অগণিত অসহায় জীবের প্রাণ বলি দিতে চাহেন, অসহায় শিশুকে মন্দিরে লইয়া বলি দিবার জন্য নক্ষত্রকে প্ররোচিত করেন। রাজাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া নক্ষত্রকে সিংহাসন দিবার ষড়যন্ত্রে তিনি লিপ্ত হন। সন্তানকামী মাতৃহৃদয়ের এই নিষ্ঠুর প্রবৃত্তি অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়। তবে তাঁহার চরিত্রের মধ্য দিয়া রবীন্দ্রনাথ যাহা বলিতে চাহেন, তাহা তাঁহার নিজের ভাষাতেই বলি,—'একটুখানি যে প্রাণ, প্রেমের কাছে তার মূল্য কত বেশি! একদিকে রাণী মানত করছেন যে বিশ্বমাতার কাছে ছাগশিশু বলিদান দেবেন, অন্যদিকে তিনি সেই বলির পরিবর্তে একটুকু প্রাণের কণার জন্য তাঁর হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত ভালবাসাটুকু ভোগ করতে চান। একদিকে তিনি প্রাণহানির বিষয়ে সম্পূর্ণ অন্ধ, অন্যদিকে প্রাণের প্রতি প্রাণের মমতা যে কত বড় জিনিস তা বুঝেছেন।' এই বিষয়টির উপর প্রাধান্য দিবার জন্যই গুণবতীর চরিত্রের একটা দিক অতিরিক্ত নিষ্ঠুর করিয়া অঙ্কিত করিতে হইয়াছে।

চাঁদপাল ও নয়নরায় রাজ্যের সেনাপতি ও দেওয়ান, কিন্তু কথাবার্তায় তাহারা ভাঁড়ের অনুরূপ; বরং মন্ত্রীর মধ্যে ধীরতা ও স্থৈর্য দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ইহারা পদমর্যাদা রক্ষা করিতে পারে নাই। নয়ন রায়ের পুনঃ প্রত্যাবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত এই দুইটি চরিত্রের কথাবার্তা ও কার্যাবলীর মধ্যে সুস্পষ্ট নাট্যিক পার্থক্য অনুভব করা যায় না।

তারপর অপর্ণা। অপর্ণা কোন নাট্যিক চরিত্র নহে, ইহা একটি ভাব বা

'আইডিয়া'। সত্য যেন প্রেমের রূপ ধরিয়া অপর্ণার মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। অপর্ণা প্রেমরসাশ্রিত সত্যের রহস্যমূর্তি। সেইজন্য এই চরিত্রটির কোন ক্রমবিকাশ কিংবা কোনও সুস্পষ্ট পরিণতি-নির্দেশ নাই। প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে সে যেমন জয়সিংহকে বলিয়াছিল,

এসো তুমি,
এ' মন্দির ছেড়ে এসো—(১।১)

তেমনই শেষ অঙ্কের শেষ দৃশ্যে সে রঘুপতিকেও বলিল,

পিতা চলে এসো।—(৫।৪)

তাহার আকর্ষণ সত্যের আকর্ষণ বলিয়াই অত্যন্ত প্রবল এবং সত্য বলিয়াই ধ্রুব। অসত্যের অচলায়তনের মধ্যে প্রেমের পথে বালিকার রূপ ধরিয়া সত্যের রসমূর্তি গিয়া প্রবেশ কবিল এবং ইহার ভিতর হইতে বন্দী জীবন দুইটি উদ্ধার করিল। 'প্রকৃতিব প্রতিশোধে'র অনাথা বালিকার সম্পর্কে অপর্ণার উল্লেখ করিয়াছি। উদ্দেশ্যের দিক দিয়া ইহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই; তথাপি অপর্ণার প্রভাব নাট্যকাহিনীর উপর প্রবলতর। সত্যের প্রতিষ্ঠায় অনাথা বালিকা হইতে অপর্ণা অধিকতর সচেষ্ট বলিয়া অনুভূত হয়।

নিতান্ত অবাস্তব একটি কাব্যধর্মী চরিত্রকে এই নাটকের মধ্যে ব্যাপক স্থান দেওয়ার ফলে অনেকস্থলেই নাটকের গতি প্রতিহত হইয়াছে। অপর্ণার বাণীর মধ্যে বৈচিত্র্য নাই, কর্মে ক্ষিপ্রতা নাই, এমন কি দৃশ্যতঃ তাহার কোন সুস্পষ্ট রূপও নাই; সেইজন্য নাটকে তাহার স্থান অধিকতর সংক্ষিপ্ত হইলে ভাল হইত। এই একটি চরিত্রই প্রধানতঃ এই নাটকটিকে গীতিধর্মী করিয়া তুলিয়াছে।

এই নাটকের প্রকৃত ট্র্যাজেডি কি, সে' বিষয়ে একটি কথা স্পষ্ট করিয়া বলিবার প্রয়োজন আছে। পুর্বেও বলিয়াছি যে, রঘুপতির পক্ষে দেবতা সত্য ছিল না, জয়সিংহের প্রতি স্নেহই সত্য ছিল। দেব-মন্দিরের আবহাওয়ার মধ্যে সেই স্নেহ পুষ্টিলাভ করিতেছিল বলিয়া মন্দির সম্বন্ধে রঘুপতির বাহ্য একটা সংস্কার জন্মিয়া গিয়াছিল। জয়সিংহের আত্মহত্যায় রঘুপতির হৃদয় হাহাকার করিয়া উঠিল, সংসারে অবলম্বন করিবার কোন বস্তুই আর তাঁহার অবশিষ্ট রহিল না। পুর্বেই বলিয়াছি, দেবতা তাঁহার কাছে সত্য ছিল না; সেইজন্য দেবতার দিকে চাহিয়া জয়সিংহের শোক বিস্মৃত হইবার তাঁহার কোন

উপায় ছিল না। অতএব জয়সিংহের মৃত্যুতেই রঘুপতি অন্তরের দিক দিয়া একেবারে অবলম্বনহীন হইয়া পড়িলেন। তাঁহার এই উক্তি যথার্থই আন্তরিক—

জয়সিংহ! জয়সিংহ! নির্দয়, নিষ্ঠুর!
এ কী সর্বনাশ করিলি রে? জয়সিংহ
অকৃতজ্ঞ, গুরুদ্রোহী, পিতৃমর্মঘাতী,
স্বেচ্ছাচারী? জয়সিংহ, কুলিশ-কঠিন!
ওরে জয়সিংহ, মোর একমাত্র প্রাণ,
প্রাণাধিক, জীবন-মন্থন-করা ধন
জয়সিংহ, বৎস মোর গুরুবৎসল!
ফিরে আয়, ফিরে আয়, তোরে ছাড়া আর
কিছু নাহি চাহি; অহঙ্কার অভিমান
দেবতা ব্রাহ্মণ সব যাক্। তুই আয়!—(৫।৫)

রঘুপতির অন্তরের একমাত্র অবলম্বন ছিল জয়সিংহের প্রতি স্নেহ। তাঁহার অন্তরের সেই স্থানটা যে মুহূর্তে রিক্ত হইয়া গেল, সেই মুহূর্তেই এই নাটকের ট্র্যাজেডি দেখা দিল। কারণ, রঘুপতির জীবনের মর্মমূল কক্ষচ্যুত হইয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার জীবনের অন্যান্য অলীক বস্তু—যেমন, শক্তির দম্ভ, ব্রাহ্মণের অধিকার, দেবতায় ভক্তি—স্বপ্নের মত অদৃশ্য হইয়া গেল। গোমতীর জলে প্রতিমা বিসর্জন বাহিরের একটা লৌকিক ব্যাপার মাত্র, অন্তরের বেদীতে রঘুপতি কোনদিনই দেবীর প্রতিষ্ঠা করেন নাই। অতএব তাঁহার পক্ষে বিসর্জনের প্রসঙ্গই আসে না। নাটকের মধ্যে এই অংশটি পরিত্যক্ত হইলেও কোন ক্ষতি ছিল না।

রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী নাট্যকাব্য 'চিত্রাঙ্গদা'। ইহা তাঁহার প্রেম-বিষয়ক রচনার অন্তর্গত। কাব্য-রচনার ক্ষেত্রে তাঁহার সবে-মাত্র 'মানসী'র যুগের অবসান হইয়াছে, তথাপি 'মানসী'র বিশিষ্ট কবি-মানসের প্রভাব তখন পর্যন্তও যে সুস্পষ্ট ভাবে তিরোহিত হয় নাই, এই নাট্য-কাব্যটির মধ্যে তাহারই পরিচয় পাওয়া যায়। বরং ইহাকে 'মানসী' যুগের শেষ রচনা বলিয়া নির্দেশ করাই সমীচীন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার পূর্ববর্তী নাট্য-রচনা 'রাজা ও রাণী'র আদর্শগত প্রভাবও ইহার উপর যথেষ্ট অনুভূত হয়। 'রাজা ও রাণী'র সুমিত্রা ও 'চিত্রাঙ্গদা' নাট্যকাব্যের চিত্রাঙ্গদা ইহাদের উভয়ের ভিতর দিয়াই কবি নারীর আত্মবোধের পরিচয় প্রকাশ করিতে

চাহিয়াছেন। তথাপি 'চিত্রাঙ্গদা'র তত্ত্বগত পরিকল্পনা সুমিত্রা হইতে অধিকতর স্পষ্ট ও ইহাতে কবির বক্তব্য বিষয় অধিকতর প্রত্যক্ষ হইয়াছে। ইহার আখ্যান-ভাগ এই প্রকার—

মণিপুরের অপুত্রক রাজা তাঁহার একমাত্র কন্যা চিত্রাঙ্গদাকে পুত্র-নির্বিশেষে পালন করিতেন। চিত্রাঙ্গদাও আশৈশব পুরুষের বিদ্যাই শিক্ষালাভ করিয়াছেন; পুরুষের বেশে পুরুষোচিত শৌর্য-বীর্যের সাধনা করিয়া নিজের নারীত্বের কথা বিস্মৃত হইয়াছেন। মণিপুর রাজ্যের নির্জন অরণ্যে অর্জুন ব্রহ্মচর্য সাধনায় নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিতেছিলেন। মৃগয়ায় বহির্গত হইয়া চিত্রাঙ্গদা একদিন তাঁহার সম্মুখীন হইলেন, তাঁহার মধ্যে প্রকৃত পৌরুষের পরিচয় পাইয়া নিজের কপট পৌরুষের অসারতা উপলব্ধি করিতে পারিলেন। প্রকৃত পুরুষের সম্মুখীন হইয়া তাঁহার অন্তর্লীন শাশ্বত নারী-প্রকৃতি বাহিরে জাগিয়া উঠিল। তিনি অর্জুনের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। কিন্তু এতকাল পৌরুষের সাধনায় চিত্রাঙ্গদার দেহ নারীসুলভ-কোমলতা-বর্জিত; অতএব তিনি কুৎসিত; অর্জুন তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। এই প্রত্যাখ্যানের বেদনা চিত্রাঙ্গদাকে আঘাত করিল। তিনি অর্জুনের দুর্লভ প্রণয়ের অভিলাষে রূপ ও যৌবন লাভ করিবার জন্য মদন ও বসন্তের তপস্যা আরম্ভ করিলেন। তপস্যায় প্রীত হইয়া মদন ও বসন্ত চিত্রাঙ্গদাকে মাত্র এক বৎসরের জন্য অনন্ত রূপ ও যৌবনের অধিকারিণী হইবার বর প্রদান করিলেন। এইবার চিাঙ্গদা ত্রসহজেই অর্জুনের হৃদয় জয় করিলেন। অর্জুন তাঁহার রূপমোহে আকৃষ্ট হইয়া ব্রহ্মচর্যের সাধনায় জলাঞ্জলি দিলেন। চিত্রাঙ্গদার রূপযৌবনে অর্জুন আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইলেন। ক্রমে দৈহিক ভোগে তাঁহার নিবৃত্তি দেখা দিতে লাগিল, তিনি চিত্রাঙ্গদার দেহোত্তীর্ণ অন্তরের পরিচয় পাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। চিত্রাঙ্গদাও ছদ্মবেশ দিয়া অর্জুনকে আর ভুলাইতে চাহিলেন না, প্রকৃত রূপ প্রকাশ করিয়া নিজের পরিচয় দিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। অর্জুনের হৃদয় হইতে ভোগ-লালসা অন্তর্হিত হইয়া গেল, চিত্রাঙ্গদাকে তিনি ভোগোত্তীর্ণলোকে লাভ করিতে চাহিলেন। এক বৎসর অতিক্রান্ত হইয়া গেল, মদন ও বসন্তের বরের অবসান হইল, চিত্রাঙ্গদা নিজের প্রকৃত রূপ লইয়া অর্জুনের সম্মুখীন হইলেন। তাঁহার বাহ্যরূপ অন্তর্হিত হইল, কিন্তু মাতৃত্বের সম্ভাবনায় নারীত্ব সম্পূর্ণতা লাভ করিল। অর্জুন এইবার চিত্রাঙ্গদার প্রকৃত পরিচয় পাইয়া নিজেকে ধন্য মনে করিলেন।

কাহিনীটি বাস্তুতঃ মহাভারত হইতে গৃহীত হইলেও, ইহাতে নাট্যকার নিজস্ব কল্পনার স্পর্শও দান করিয়াছেন। কাহিনীটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, ইহা নাট্য-সম্মত নহে, ইহা কাব্য-সম্মত। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি-জীবনের সুখদুঃখের ঘাত-প্রতিঘাতপূর্ণ চিত্র ইহা নহে, ইহার মধ্যে কোন ব্যক্তি-চরিত্রের বিকাশও দেখিতে পাওয়া যায় না। এইখানেই 'রাজা ও রাণী'র সুমিত্রার সঙ্গে চিত্রাঙ্গদার স্থূল পার্থক্য। সুমিত্রা সুসম্পূর্ণ নাট্যিক চরিত্র, কিন্তু চিত্রাঙ্গদা বিশেষ একটি তত্ত্বের বাহন। শাশ্বত নারীত্বের চিরন্তন আদর্শের প্রতীকরূপে এখানে চিত্রাঙ্গদাকে উপস্থিত করা হইয়াছে। অর্জুনও তাহাই, অর্জুনও শাশ্বত পুরুষের আদর্শ। ইহাদের কাহারও কোন ব্যক্তিরূপ নাই। এই দুইটি আদর্শ চরিত্রের সহায়তায় কবি বিশেষ একটি তত্ত্বকথা ইহার মধ্য দিয়া ব্যক্ত করিতে চাহিয়াছেন। এই দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, 'চিত্রাঙ্গদা' প্রকৃত পক্ষে একটি কাব্য, ইহার নাট্যকাব্য আখ্যানও সমীচীন নহে। এইজন্য 'চিত্রাঙ্গদা'র অনেক সমালোচকই ইহাকে কাব্যের ক্ষেত্রে আনিয়া বিচার করিয়াছেন, নাট্যের ক্ষেত্রে ইহাকে স্থান দেন নাই।

কতকগুলি আদর্শ চরিত্রের সহায়তায় একটি তত্ত্বকথাকে প্রাধান্য দেওয়ার ফলে যে ইহার নাট্যিক মূল্য খর্ব হইয়াছে, তাহা স্বীকার করিয়া লইলেও ইহার প্রধান চরিত্র দুইটির মধ্যে অন্তরের যে সূক্ষ্ম ভাব-বিশ্লেষণের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহার নাট্যিক মূল্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ইহার মধ্যে কামনার উদ্দামতা, আশাভঙ্গের নৈরাশ্য, মিলনের আনন্দ, লালসার তৃপ্তি, ভোগের অবসাদ এবং পরিপূর্ণ আত্মনিমজ্জনেও আত্মসচেতনতার যে মানস-চিত্র পাওয়া যায়, তাহা পাঠকের নাটকীয় ঔৎসুক্য কখনও শিথিল হইতে দেয় না। এই সকল অন্তর্দ্বন্দ্বের বিশ্লেষণে যে মানবীয় অনুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা ইহাকে এক অপরূপ নাট্যিক গৌরব দান করিয়াছে।

এখন 'চিত্রাঙ্গদা'র তত্ত্বগত উদ্দেশ্যের কথা রবীন্দ্রনাথেরই অনহুকরণীয় ভাষায় ব্যক্ত করা যাউক। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, 'অনেক বছর আগে রেলগাড়ীতে যাচ্ছিলুম শান্তিনিকেতন থেকে কল্‌কাতার দিকে। তখন বোধ করি চৈত্র মাস হবে। রেল লাইনের ধারে ধারে আগাছার জঙ্গল। হলদে বেগুনি সাদা রঙের ফুল ফুটেছে অজস্র। দেখ্‌তে দেখ্‌তে এই ভাবনা এল মনে যে আর কিছুকাল পরেই রৌদ্র হবে প্রখর, ফুলগুলি তার রঙের

মরীচিকা নিয়ে যাবে মিলিয়ে—তখন পল্লীপ্রাঙ্গণে আম ধরবে গাছের ডালে ডালে, তরু-প্রকৃতি তার অন্তরের নিগূঢ় রস-সঞ্চয়ের স্থায়ী পরিচয় দেবে আপন অপ্রগল্‌ভ ফল-সম্ভারে। সেই সঙ্গে কেন জানি হঠাৎ আমার মনে হল, সুন্দরী যুবতী যদি অনুভব করে যে সে তার যৌবনের মায়া দিয়ে প্রেমিকের হৃদয় ভুলিয়েছে, তা'হলে সে তার স্বরূপকেই আপন সৌভাগ্যের মুখ্য অংশে ভাগ বসাবার অভিযোগে বাতিল বলে ধিক্কার দিতে পারে। এ যে তার বাইরের জিনিস, এ যেন ঋতুরাজ বসন্তের কাছ থেকে পাওয়া বর, ক্ষণিক মোহ বিস্তারেব দ্বারা জৈব উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্যে। যদি তার অন্তরের মধ্যে যথার্থ চরিত্র-শক্তি থাকে, তবে সেই মোহমুক্ত শক্তির দানই তার প্রেমিকের পক্ষে মহৎ লাভ, যুগল জীবনের জয়যাত্রার সহায়। সেই দানেই আত্মাব স্থায়ী পরিচয়, এর পরিণামে ক্লান্তি নেই, অবসাদ নেই, অভ্যাসের ধূলি-প্রলেপে উজ্জ্বলতাব মালিন্য নেই। এই চরিত্র-শক্তি জীবনের ধ্রুব সম্বল, নির্মম প্রকৃতির আশু প্রয়োজনের প্রতি তার নির্ভর নয়। অর্থাৎ এর মূল্য মানবিক, এ নয় প্রাকৃতিক।' (র-র-৩, 'চিত্রাঙ্গদা', সূচনা)

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সাধনার ভিতব দিয়া সর্বত্র সৌন্দর্যের পরিপূর্ণতারই সন্ধান করিয়াছেন; খণ্ড সৌন্দর্যের মধ্যে তাহার দৃষ্টি কোথাও সীমাবদ্ধ হয় নাই। এই নাট্যকাব্যের মধ্য দিয়াও তিনি নারী-সৌন্দর্যের চরম সার্থকতার কথাই ব্যক্ত কবিয়াছেন; নারীসৌন্দর্যেব স্বরূপ কি, ইহার উদ্দেশ্যই বা কি এবং ইহার সার্থকতাই বা কোথায়—মুখ্যতঃ এই বিষয়ই এই নাট্যকাব্যের বক্তব্য। নারীর সৌন্দর্য ও নারীর অন্তর ইহারা দুইটি পৃথক্ বস্তু। অন্তরের কামনার সার্থকতার পথে তাহার বাহিরের সৌন্দর্য সহায়ক মাত্র; কিন্তু তাহা তাহার নিত্য সম্পদ নহে, প্রয়োজনীয়তার অবসানে এই সৌন্দর্য অনাবশ্যক হইয়া পড়ে। নারী-সৌন্দর্যের বিশেষ জৈব উদ্দেশ্য ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্যই নাই এবং এই জৈব উদ্দেশ্যের ভিতর দিয়াই নারী-জীবনের চরম-সার্থকতা বা মাতৃত্ব প্রকাশ পায়। অতএব নারীর সঙ্গে তাহার সৌন্দর্যের শুধু এই ক্ষণিকের সম্পর্ক; তাহার বহিরঙ্গগত এই ক্ষণ-সৌন্দর্য তাহার অন্তরের কোন পরিচয় প্রকাশ করিতে পারে না, অন্তরের সঙ্গে তাহার কোন যোগই নাই; সেইজন্য তাহার অন্তর ও বাহির দুই স্বতন্ত্র জগৎ হইয়া দাঁড়ায়। অন্তরই চিরন্তন ও সত্য,

বাহিরের রূপ ক্ষণিক বলিয়াই মিথ্যা; অথচ অন্তরের ইহাই চরম দুর্গতির কথা যে, সে সত্য হইয়াও এক অসত্য বস্তুর আবরণে নিজের পরিচয় প্রকাশ করে, নহিলে সে পরিপূর্ণতা লাভ করিতে পারে না, জীবনের আকাঙ্ক্ষিত চরম সার্থকতা অর্জন করিতে সক্ষম হয় না। এই কথাটি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অনতিকাল পূর্বে রচিত 'মানসী' কাব্যগ্রন্থের 'গুপ্তপ্রেম' কবিতাটির ভিতর দিয়াও প্রকাশ করিয়াছেন।

'চিত্রাঙ্গদা'র মধ্যে যে এক নির্ভীক সত্যভাষণের দুঃসাহসিকতা আছে, তাহা একদিন রক্ষণশীল মনোভাবকে আঘাত করিয়াছিল। কেহ কেহ ইহার মধ্যে দুর্নীতির সন্ধান লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু কবিত্বে, কল্পনায়, অনুভূতিতে ও প্রকাশ-ভঙ্গির রস-বৈচিত্র্যে এই নাট্যকাব্যখানি এতই সমৃদ্ধ যে, ইহার সম্পর্কে কোন নৈতিক প্রশ্ন রসগ্রাহী পাঠকের মনে উদিত হইবার অবকাশই পায় না। কারণ, ভাষাগত অশ্লীলতা ত ইহাতে নাই-ই, এমন কি অর্থগত অশ্লীলতা যেখানে যেটুকু আছে, কাব্য হিসাবে তাহা নিন্দনীয় নয় বলিয়াই স্বীকৃত হইয়াছে। অতএব নৈতিক আপত্তির যাহা মুখ্য অর্থাৎ ভাষা ও অর্থগত অশ্লীলতা, তাহা এই নাট্যকাব্যে অনুভূত হয় না। এই নাট্য কাব্যের সমগ্র পরিবেশটি এত রস-পুষ্ট ও কল্পনা-সমৃদ্ধ যে ইহা দ্বারাই রসিকমন গভীরভাবে চরিতার্থ হয়। ইহা তত্ত্বমূলক রচনা হইয়াও রস-প্রধান সৃষ্টি। তবে ইহাও সত্য যে, এই নাটকের বহিরঙ্গগত সুসমৃদ্ধ কাব্যরূপ ইহার অন্তরগত তত্ত্বকথার সহিত সহজ সংযোগ স্থাপন করিতে পারে নাই। যদি তাহা পারিত, তবে ইহার সম্বন্ধে কোন নৈতিক আপত্তির কথা উঠিবার অবকাশ পাইত না; রবীন্দ্র-প্রতিভার ইহা একটি সাধারণ ত্রুটি। কারণ, যেখানেই রবীন্দ্রনাথ কাব্যের পাত্রে তত্ত্ব পরিবেশন করিতে গিয়াছেন, সেখানেই তাঁহার এই ত্রুটি ঘটিয়াছে বলিয়া অনুভব করা যায়। তবে এ কথাও স্বীকার করিতে হয় যে, প্রায় সর্বত্রই তাহাদের কাব্যাংশই মুখ্য হইয়া উঠিয়াছে এবং তত্ত্বাংশ গৌণস্থান অধিকার করিয়া আছে মাত্র। 'চিত্রাঙ্গদা'র কাব্যাংশই মুখ্য, তত্ত্বাংশ গৌণ মাত্র; অতএব ইহাদের মধ্যে সহজ সংযোগ স্থাপিত হইতে পারে নাই বলিয়া অন্ততঃ কাব্য-রসিকের মন অতৃপ্তি বোধ করিতে পারে না।

পূর্বেই বলিয়াছি, 'চিত্রাঙ্গদা'য় নাট্যিক চরিত্র-সৃষ্টির কোন প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায় না। সেই জন্য ইহার কাহিনীর সুসঙ্গত নাট্যিক পরিণতির

অভাব লক্ষ্য করিয়া কেহ কেহ পরিতাপ করিয়াছেন। ইহার নায়ক অর্জুন কোন ব্যক্তি-চরিত্র নহে ; মহাভারত হইতে এই চরিত্রের নামটি গৃহীত হইলেও মহাভারতের বীর অর্জুন চরিত্রের সঙ্গে কোনই সম্পর্ক নাই ; অর্জুন চিরদিনের পুরুষ এবং নারীসুলভ কোমলতা বর্জিত 'আপনাতে আপনি অটলমূর্তি'। পুরুষের মনে নারী-সম্পর্কিত যে ধারণা চিরন্তন, তাহাই অর্জুনের ভিতর দিয়া ব্যক্ত করা হইয়াছে। তাহার মধ্যে ভোগের তৃষ্ণা আছে, কৃত্রিম আদর্শের সাধনা দ্বারা তাহা সাময়িকভাবে রুদ্ধ হইলেও অনুকূল অবসরে তাহা সঞ্জীবিত হইয়া উঠে। নারীর সৌন্দর্যই পুরুষের ভোগতৃষ্ণা জাগ্রত করিয়া দেয়, নারীর অন্তরগত যে নারীত্ব তাহা প্রথম দৃষ্টিতে পুরুষের অগোচরেই থাকিয়া যায়। কিন্তু নারী-সৌন্দর্যভোগই পুরুষের চরম আকাঙ্ক্ষার বস্তু নহে, সুতরাং এই ভোগে তাহার অবসাদ আসে। পৌরুষের সাধনাই তাহার জীবনে সত্য, তবে জৈব ধর্ম পালনের ভিতর দিয়া কল্যাণের পথে সে সেই সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

চিত্রাঙ্গদাও এমনি শাশ্বতী নারী (eternal woman)। নারীর নারীত্ব বিসর্জন দিয়া পুরুষকারের সাধনা বৃথা। প্রকৃত পুরুষের প্রতি তাহার আকর্ষণ দুর্নিবার। তাহার এই আকর্ষণকে সফল করিয়া তুলিবার পথে রূপই তাহার একমাত্র সহায়। পুরুষের সঙ্গে নারীর মিলন মাতৃত্বলাভের ভিতর দিয়া চরম সার্থকতা লাভ করে।

নারী রক্ত-মাংসে গঠিতা সুখদুঃখ আশানৈরাশ্যের অনুভূতিময়ী—সে দেবী নহে। সে পুরুষের শক্তি আয়ত্ত করিতে পারে না সত্য, কিন্তু নিজের স্বভাবজ শক্তি দ্বারা পুরুষের সাধনার পথে সহায়ক হইতে পারে। নারী পুরুষের অবহেলার বস্তু নহে। নারী-সম্পর্কিত রবীন্দ্রনাথের এই ধারণার মূলে পাশ্চাত্ত্য প্রেরণাই যে কার্যকরী হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুভব করা যায়।

দুইটি রূপক চরিত্র এই নাট্যকাব্যের মধ্যে আনিয়া অপরূপ কৌশলে স্থান দেওয়া হইয়াছে—তাহা মদন ও বসন্ত। মদন চিত্রাঙ্গদার মনোভাবের রূপক, প্রকৃতপক্ষে মদন চিত্রাঙ্গদারই অন্তরের প্রসারিত রূপ। বসন্ত বাহিরের লীলা-চঞ্চল সৌন্দর্যের প্রতিনিধি। এই চরিত্র দুইটি এই নাট্যকাব্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধির সহায়ক হইয়াছে

সর্বোপরি উল্লেখযোগ্য এই নাট্যকাব্যের ভাষা। রবীন্দ্রনাথের অমিত্রাক্ষর ছন্দ রচনার ইহা সর্বশ্রেষ্ঠতম নিদর্শন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নাট্যকাব্যে যে

াক্ষর ছন্দের ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা তাঁহার নিজস্ব; তাঁহার এই অমিত্রাক্ষর ছন্দ সৃষ্টির মধ্যে 'চিত্রাঙ্গদা'র ভাষাই সর্বোৎকৃষ্ট। ইহার স্বচ্ছন্দ গতি, সাবলীল ভঙ্গি, ও অপরূপ রসব্যঞ্জনা কাব্যের দিক দিয়া ইহাকে অপূর্ব গৌরব দান করিয়াছে। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' হইতে আরম্ভ করিয়া রবীন্দ্রনাথের নাট্যকাব্যের ভাষা এই 'চিত্রাঙ্গদা'র মধ্যে আসিয়া সার্থক পরিণতি লাভ করিয়াছে। যদিও তাঁহার বহু নাট্যকবিতা ইহার পরও এই অমিত্রাক্ষর ছন্দেই রচিত হয়, তথাপি 'চিত্রাঙ্গদা'র মধ্যেই তাহার সুপরিণত রূপের সন্ধান পাওয়া যায়। কাব্য-রচনার ক্ষেত্রেও এই যুগেই রবীন্দ্র-প্রতিভা ভাষার দিক দিয়া চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল।

'বিসর্জন' নাটকের যে সকল ত্রুটির কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাহা অনতিকাল ব্যবধানে প্রায় অনুরূপ বিষয়বস্তু লইয়া রচিত 'মালিনী' নাটকেই অনেকাংশে সংশোধন করা হইয়াছে। 'বিসর্জন'-এর পর 'মালিনী'ই রবীন্দ্রনাথের পূর্ণাঙ্গ নাট্য রচনা। শুধু তাহাই নহে, 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এর মধ্য দিয়া রবীন্দ্রনাথের নাট্যকাব্য রচনার যে ধারার সূত্রপাত হইয়াছিল, এই 'মালিনী'র ভিতরই তাহার পরিসমাপ্তি হইয়াছে। কবি নিজেও বলিয়াছেন, এই 'মালিনী'র মধ্যে যে ভাবটি বিকাশ লাভ করিয়াছে, তাহার অঙ্কুর আপনা আপনি দেখা দিয়াছিল 'প্রকৃতির প্রতিশোধে'। রবীন্দ্রনাথের নাট্যকাব্য রচনার যুগের একদিকে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' ও আর একদিকে এই 'মালিনী'।

'মালিনী' প্রেম-বিষয়ক নাটক নহে; ইহার মধ্যে প্রেমের কথা থাকিলেও, তাহার সুপরিণত বিকাশের কথা নাই। এমন কি, 'বিসর্জন'-এর মধ্যে অপর্ণা ও জয়সিংহের প্রেম মূল নাট্যকাহিনীর যতটুকু অংশ অধিকার করিয়াছে, 'মালিনী'র প্রেম-বিষয় মূল কাহিনীর মধ্যে ততখানিও অংশ অধিকার করিতে পারে নাই। 'মালিনী'তে প্রেম-বিষয় সুদূর গৌণ, ইহার মুখ্য বিষয়টি স্বতন্ত্র। তাহা পরে আলোচিত হইতেছে। পূর্বে কাহিনীটি বর্ণনা করা যাউক।

রাজকন্যা মালিনী বৌদ্ধ ধর্মগুরু কাশ্যপের নিকট হইতে ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। রাজ্যের ব্রাহ্মণগণ ইহাতে কুপিত হইয়া রাজার নিকট রাজকন্যার নির্বাসন দাবি করিলেন। রাজা মালিনীকে তাঁহার নূতন ধর্মগ্রহণের জন্য ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। মহিষী রাজাকে নিবৃত্ত হইতে বলিলেন, কিন্তু মালিনী নিজে রাজার নিকট নিজের নির্বাসন প্রার্থনা করিলেন। কেবল মহিষী

রাজকন্যাকে রাজা ও প্রজাদের রোষ হইতে আড়াল করিয়া রাখিতে লাগিলেন। একদিন ব্রাহ্মণগণ রাজকন্যার নির্বাসনের দাবি লইয়া রাজপ্রাসাদের দ্বারে আসিয়া সমবেত হইলেন। তাঁহাদের নায়ক দুই ব্রাহ্মণ যুবক—ক্ষেমঙ্কর ও সুপ্রিয়। ক্ষেমঙ্কর দৃঢ়চিত্ত ও আচার-বিশ্বাসী ব্রাহ্মণ এবং প্রকৃত সংস্কারাচ্ছন্ন ব্রাহ্মণদিগের প্রতিনিধি, কিন্তু সুপ্রিয় কল্যাণধর্মে দীক্ষিত—নির্দোষের নির্বাসন তাহার অন্তঃকরণ কিছুতেই সমর্থন করিতে পারিল না। বিদ্রোহী ব্রাহ্মণগণ সুপ্রিয়কে পরিত্যাগ করিতে চাহিলেন; কিন্তু সুপ্রিয় ক্ষেমঙ্করের আশৈশব বন্ধু, ক্ষেমঙ্কর তাঁহাকে ত্যাগ করিতে পারিলেন না। ধর্মরক্ষার জন্য ব্রাহ্মণগণ শক্তিদেবীর উদ্বোধন করিতে লাগিলেন, এমন সময় মালিনী আসিয়া তাঁহাদের সম্মুখে আবির্ভূতা হইলেন; তাঁহার পরিচয় ও তাঁহার নিকট হইতে সদয় ব্যবহার লাভ করিয়া ব্রাহ্মণগণ তাঁহার প্রতি দ্রোহবুদ্ধি পরিত্যাগ করিলেন, মাতৃ-সম্বোধন করিয়া তাঁহার মার্জনা ভিক্ষা করিয়া লইলেন এবং সকলে মিলিয়া তাঁহাকে পুনরায় রাজপ্রাসাদে রাখিয়া আসিলেন। সুপ্রিয় মালিনীকে দেখিয়া তাঁহার প্রতি নিজের অলক্ষ্যেই আকৃষ্ট হইলেন, ক্ষেমঙ্কর তাঁহার মনোভাব বুঝিতে পারিলেন, ব্রাহ্মণগণও যে মালিনীকে দেখা মাত্র তাঁহাদের সঙ্কল্প বিসর্জন দিয়াছেন, তাহাও ক্ষেমঙ্কর বুঝিলেন। তিনি মালিনীকে দমন করিবার উদ্দেশ্যে বিদেশ হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া আনিবার জন্য সুপ্রিয়র নিকট বিদায় লইয়া গেলেন। প্রজারা নিত্য রাজপ্রাসাদে আসিয়া মালিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, তাঁহার শিষ্ট আচরণে নিজেরা কৃতার্থ হয়। সুপ্রিয় মালিনীর সঙ্গে নিত্য সাক্ষাৎ করেন, তাঁহার নিকট হইতে তাঁহার গৃহের কথা, তাঁহার বন্ধু ক্ষেমঙ্করের কথা মালিনী বিস্তৃত করিয়া জানিয়া লন। সুপ্রিয়র সহিত ক্ষেমঙ্করের সম্পর্কের কথা, তাঁহাদের বন্ধুত্বের সকল বৃত্তান্ত, ক্ষেমঙ্করের সঙ্কল্পের কাহিনী সুপ্রিয় সমস্তই মালিনীর কাছে ব্যক্ত করেন। ক্রমে প্রজাগণ বাহির হইতে ফিরিয়া যায়, সুপ্রিয়র সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া মালিনী তাহাদিগকে দর্শন দান করিবার অবসর পান না। সুপ্রিয় ক্ষেমঙ্করের নিকট হইতে গোপনে একদিন সংবাদ পাইলেন যে, তিনি সৈন্য সংগ্রহ করিয়া লইয়া মালিনীর পিতৃরাজ্যের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতেছেন। মালিনীর প্রতি অনুরাগ বশতঃ সুপ্রিয় এই সংবাদ রাজার নিকট প্রকাশ করিয়া দিলেন। রাজা সসৈন্যে অগ্রসর হইয়া গিয়া ক্ষেমঙ্করকে পথিমধ্য হইতে বন্দী করিয়া আনিলেন। রাজা সুপ্রিয়কে এই সংবাদ দানের জন্য পুরস্কার দিতে চাহিলেন। সুপ্রিয় তাঁহার আশৈশব

বন্ধুত্ব বিক্রয় করিয়াছেন, কিন্তু তাহার জন্য পুরস্কার লইতে চাহিলেন না। এমন কি, রাজার ইঙ্গিত সত্ত্বেও মালিনীর পাণিপ্রার্থনা পর্যন্ত করিলেন না। রাজা ক্ষেমঙ্করের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন। মালিনী পিতার নিকট তাঁহার জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। রাজা ভাবিলেন, ক্ষেমঙ্করের জীবন রক্ষা করিয়াই তিনি সুপ্রিয়র কার্যের পুরস্কার দিবেন, কিন্তু তাহার পূর্বে তিনি ক্ষেমঙ্করকে একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চাহিলেন। শৃঙ্খলবদ্ধ বন্দীকে রাজার সম্মুখীন করা হইল। রাজা তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দিতে চাহিলেন, কিন্তু ক্ষেমঙ্কর বিদ্রোহাচরণ পরিত্যাগ করিতে চাহিলেন না। বিশ্বাসঘাতক সুপ্রিয় তাঁহার নিকটবর্তী হইলে তিনি ঘৃণায় তাঁহার আলিঙ্গন প্রত্যাখ্যান করিলেন। সুপ্রিয় এই অপমান নিঃশব্দে সহ্য করিলেন। মালিনীর প্রণয়কেই তিনি ধর্ম বলিয়া জানিয়াছেন, কিন্তু ক্ষেমঙ্কর মৃত্যুকেই ধর্মরাজ বলিয়া জানেন। মৃত্যুর মধ্যেই ধর্মের চরম পরীক্ষা করিয়া লইবার জন্য ক্ষেমঙ্কর বন্ধু সুপ্রিয়কে তাঁহার নিকটে আহ্বান করিলেন। সুপ্রিয় সেই আহ্বান উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। তিনি নিকটবর্তী হইবা মাত্রই ক্ষেমঙ্কর শৃঙ্খল দ্বারা সুপ্রিয়র মস্তকে আঘাত করিলেন, সুপ্রিয় তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। ক্ষেমঙ্কর তাঁহার মৃতদেহের উপর পড়িয়া ঘাতককে আহ্বান করিলেন, রাজাও সিংহাসন ছাড়িয়া উঠিয়া খড়্গ লইয়া আসিবার আদেশ দিলেন। সেই মুহূর্তে মালিনী ক্ষেমঙ্করকে ক্ষমা করিবার জন্য রাজার নিকট আবেদন জানাইয়াই মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন।

কাহিনী ও বক্তব্য বিষয়ের দিক দিয়া এই নাটকখানির 'বিসর্জন'-এর সহিত সাদৃশ্য আছে। 'বিসর্জন'-এর রঘুপতি 'মালিনী'র ক্ষেমঙ্কর, 'বিসর্জন'-এর জয়সিংহ, 'মালিনী'র সুপ্রিয়, 'বিসর্জন'-এর অপর্ণা 'মালিনী'র মালিনীতে রূপান্তরিত হইয়াছে। 'বিসর্জন'-এ নাট্যকাহিনীর পরিণতি যে ভাবে নির্দেশ করা হইয়াছে, 'মালিনী'র মধ্যেও তাহাই করা হইয়াছে। বক্তব্য বিষয়ও উভয় নাটকের মধ্যে অভিন্ন। উভয় নাটকেই চিরাচরিত সামাজিক প্রথা ও আচারের উপর হৃদয়ধর্মকে স্থান দেওয়া হইয়াছে। পূর্বের আলোচনা হইতেও দেখা গিয়াছে যে, সংস্কার-ধর্ম কিংবা ব্যক্তিধর্মের উপর রবীন্দ্রনাথ সর্বত্রই নাট্যকাব্যগুলির মধ্যে কল্যাণধর্মকে স্থান দিয়াছেন।

বাহ্য ও অন্তরগত এই সকল সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও ইহাদের মধ্যে অনৈক্যও নিতান্ত অল্প নহে। 'বিসর্জনে'র কাহিনী-বিন্যাস বিস্তৃততর, 'মালিনী'তে

তাহা অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত। 'মালিনী'র কাহিনীগত এই সংক্ষিপ্ততা ইহার একটি বিশিষ্ট কাব্যগুণ বলিয়াই অনুভূত হয়; নাটক হিসাবে ইহা বিশেষ ত্রুটিমূলক বিবেচিত হইতে পারে। রঘুপতি নাট্যিক ক্রিয়ার মধ্য দিয়া নিজের চরিত্র যে ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, নিষ্ক্রিয় ও বাক্-সর্বস্ব ক্ষেমঙ্কর তাহা সেইভাবে পারেন নাই। সেইজন্য ক্ষেমঙ্কর অপেক্ষা রঘুপতির মধ্যে নাট্যিক গুণ অধিক। অনাবশ্যক ঘটনা, অতিরিক্ত চরিত্র-সমাবেশ 'মালিনী'তে কৌশলে পরিবর্জন করা হইয়াছে। ইহার কাহিনী প্রথম হইতেই যেন ঊর্ধ্বশ্বাসে পরিণতির পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে, কোথাও শ্লথ হইয়া পড়িবার অবকাশ পায় নাই এবং এই ভাবে অগ্রসর হইয়া গিয়া কাহিনীর পরিণতি মুহূর্তটি অপূর্ব নাট্যিক গৌরব লাভ করিয়াছে। অতিভাষণ ও দীর্ঘ স্বগতোভাষণ 'বিসর্জন'-এর একটি বিশিষ্ট ত্রুটি, 'মালিনী' প্রায় এই ত্রুটি-বর্জিত। চরিত্র-সৃষ্টির দিক দিয়াও 'মালিনী' অধিকতর সার্থকতা লাভ করিয়াছে। সংস্কার ধর্মের প্রতিনিধিরূপে কল্পনা করিয়াও 'বিসর্জন'-এর রঘুপতিকে কি ভাবে যে নাট্যকার তাঁহার চরিত্রগত দৃঢ়তা দ্বারা সৃষ্টি করিতে ব্যর্থকাম হইয়াছেন, তাহার কথা আলোচনা করিয়াছি; কিন্তু 'মালিনী'র সম্পর্কে এই কথা বলিতে পারা যায় না। রঘুপতি প্রথম হইতেই তাঁহার আচার-ধর্মের উপর তাঁহার হৃদয়-ধর্মকেই স্থান দিয়াছিলেন, কিন্তু ক্ষেমঙ্করের চরিত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সুপ্রিয়র প্রতি স্নেহ তাঁহার আন্তরিক হইলেও, তাহা তাঁহার ধর্মবিশ্বাসকে জয় করিতে পারে নাই। রঘুপতির জীবনে যেমন তাঁহার ধর্মবিশ্বাস সত্য ছিল না, জয়সিংহের প্রতি স্নেহই সত্য ছিল, ক্ষেমঙ্করের মধ্যে একমাত্র ধর্মবিশ্বাসই সত্যরূপে পরিস্ফুট হইয়াছে। এইজন্য রঘুপতি অপেক্ষাও ক্ষেমঙ্করের মধ্যে চরিত্রসৃষ্টি অধিকতর সার্থকতা লাভ করিয়াছে। কারণ, উভয় নাটকেই আদর্শের বিরোধের ভিতর দিয়া দ্বন্দ্বের অবতারণা করা হইয়াছে। অতএব যে দুইটি আদর্শ লইয়া প্রকৃত দ্বন্দ্বের উৎপত্তি, তাহাদের পারস্পরিক বিরোধ অনমনীয় দৃঢ়তার উপর প্রতিষ্ঠিত না হইলে নাট্যিক বিক্ষোভ তত উচ্চগ্রামে পৌঁছিতে পারে না। কারণ, ইহার মধ্যেই নাট্য-পরিণতির বীজ সমাহিত হইয়া আছে। এই বিচারে রঘুপতি ক্ষেমঙ্কর অপেক্ষা দুর্বল; যে নিঃস্বার্থ আদর্শ-নিষ্ঠা ক্ষেমঙ্করের চরিত্রকে অপূর্ব গৌরব দান করিয়াছে, রঘুপতির তাহার অভাব আছে। রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন নাট্যকাব্যগুলির মধ্যে ক্ষেমঙ্করের পরিকল্পনাই সর্বাপেক্ষা সার্থক।

বাহিরের অটুট গাম্ভীর্যের সঙ্গে অন্তরের অবিচল দৃঢ়তার সংযোগে ক্ষেমঙ্করের চরিত্র এক অপূর্ব বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছে

সুপ্রিয়র চরিত্রও 'বিসর্জন'-এর জয়সিংহ চরিত্র হইতে অধিকতর সার্থক। সুপ্রিয় প্রথম হইতে কল্যাণধর্মে দীক্ষিত। এই দীক্ষা তাঁহার অন্তরের স্বাভাবিক প্রেরণা হইতে জাত, ইহাতে বাহ্যিক কোন প্রভাব নাই। তাঁহার এই বিশ্বাসের মধ্যে কোন সংশয়ও নাই। যে সন্দেহ ও সংশয় জয়সিংহের জীবনকে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, তাহার লেশ মাত্র স্পর্শ সুপ্রিয়র উপর অনুভব করিতে পারা যায় না। তবে তিনি দুর্বল-চিত্ত—নিজের বিশ্বাসকে সত্য বলিয়া জানিলেও, তাহা অবলম্বন করিয়া থাকিবার দৃঢ়তা তাঁহার চরিত্রে নাই। এইজন্য তিনি কল্যাণধর্মে দীক্ষিত হইয়াও তাহাই তাঁহার জীবনের একান্ত ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন নাই। শুভবুদ্ধির প্রেরণা তাঁহার অন্তরের মধ্যে উদিত হইত, কিন্তু তাহা জীবনে কার্যকরী করিয়া লইবার তাঁহার সচেষ্টতার অভাব ছিল। ক্ষেমঙ্করের বিরোধী চরিত্র হিসাবে তাঁহাকে কল্পনা করা হইয়াছে। ক্ষেমঙ্কর আচারধর্মের দাস, সুপ্রিয় হৃদয়ধর্মের অধীন। সাধারণ কল্যাণবুদ্ধি দ্বারাই তিনি মালিনীর প্রতি প্রথম আকৃষ্ট হন, তারপর মালিনীর জন্য তাঁহার স্বাভাবিক অনুরাগের সঞ্চার হয়, মালিনীর প্রতি এই অনুরাগই তাঁহাকে আশৈশব বন্ধুর প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতায় প্ররোচিত করে। তারপর আবার যখন তিনি বন্ধুর সম্মুখীন হইলেন, তখন বন্ধুর হাত হইতে মৃত্যু বরণ করিয়া আত্মকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। অতএব হৃদয়ধর্মবোধ তাঁহার সর্বত্রই অত্যন্ত প্রবল এবং তাহাই তাঁহার জীবনের শোচনীয় পরিণতির একান্ত স্বাভাবিক কারণ। হৃদয়ধর্মের স্রোতোবেগে তিনি যেন এই পরিণতির পথে তাঁহার অজ্ঞাতেই অগ্রসর হইয়া গিয়াছেন। সেইজন্য ক্ষেমঙ্করের হাত হইতে মৃত্যুবরণ তাঁহার এত সহজ বলিয়াই অনুভূত হয়। 'বিসর্জন'-এর জয়সিংহের পরিণতি ও 'মালিনী'র সুপ্রিয়র পরিণতি অভিন্ন। তথাপি সুপ্রিয়র পরিণতি যত সহজ ভাবে দেখান হইয়াছে, জয়সিংহের পরিণতি তত সহজ ভাবে নিষ্পন্ন হয় নাই। গ্রীক্ ট্র্যাজিডির মত এক অলক্ষ্যগোচর নির্মম পরিণতির দিকে সুপ্রিয় সেভাবে অগ্রসর হইতে পারে নাই। তাহার চরিত্রের পরিণতির মধ্যে যে আকস্মিকতা রহিয়াছে, সুপ্রিয়র মধ্যে তাহা নাই। সহস্র শুভ প্রেরণা সত্ত্বেও মানুষ যে-নিয়তিকে কিছুতেই অতিক্রম করিতে পারে না, সুপ্রিয় তাহারই অমোঘ দণ্ড

নিঃশব্দে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার কবল হইতে পরিত্রাণের যেমন কোন উপায়ও ছিল না, তিনি তাহার প্রয়াসও করেন নাই; হৃদয়ধর্মের স্রোতোবেগে তিনি কেবল ভাসিয়াই চলিয়াছেন, ক্ষুদ্রতম তৃণখণ্ড তাঁহার হাতের কাছ দিয়া ভাসিয়া যাইতে দেখিয়াও তাহা অবলম্বন করিবার জন্য তিনি কখনও হস্ত প্রসারণ করেন নাই। ট্র্যাজেডির উপাদান হিসাবে এই চরিত্রের পরিকল্পনাই সমধিক সার্থক।

মালিনীর চরিত্র অপর্ণারই প্রসারিত রূপ। অপর্ণা নাট্যিক চরিত্ররূপে সার্থকতা লাভ করিতে পারে নাই, ইহার ভাব-সর্বস্ব পরিকল্পনা অনেক স্থলেই নাটকের মধ্যে পীড়াদায়ক। কিন্তু মালিনী সার্থক নাট্যিক চরিত্ররূপে বিকাশ লাভ করিয়াছে। কল্যাণধর্মের প্রতীকরূপে মালিনীকে কল্পনা করা হইলেও, তাঁহার মানবিক বিকাশ কোন জায়গাতেই ব্যাহত হয় নাই। তবে মুখ্যতঃ ধর্ম অবলম্বন করিয়া তাঁহার চিত্তের বিকাশ হইয়াছে বলিয়া, তাহাতে সাধারণ মানব-মনের আশাআকাঙ্ক্ষাগুলি অনেকখানি আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। তাঁহার মানবিক চরিত্র-বিকাশ প্রত্যক্ষ না হইলেও, ইহার মধ্যে কোন মৌলিক অসঙ্গতি নাই।

মালিনী কল্যাণধর্মে দীক্ষিতা। আনুষ্ঠানিক ধর্মের উপর যে এই কল্যাণ-ধর্মের স্থান, নাট্যকার তাহা তাঁহার ভিতর দিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার চরিত্রের প্রধান কথা এই যে, বিরোধের মধ্য দিয়া তাঁহার সত্যের প্রতিষ্ঠা হয় নাই, বরং প্রেম ও ক্ষমার মধ্য দিয়াই তাঁহার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। কাহাকেও প্রত্যক্ষভাবে আঘাত করিয়া তাঁহার সত্য প্রচারিত হয় নাই, বরং নিজের দুঃখের দহনে তিনি সত্যের প্রদীপ জ্বালিয়াছেন। কল্যাণমন্ত্রে দীক্ষিত 'বিসর্জন'-এর গোবিন্দমাণিক্যের সঙ্গে মালিনীর ইহাই মৌলিক পার্থক্য। মালিনীর দুঃখের মহিমার মধ্যেই কাব্যরস ব্যক্ত হইয়াছে। লৌকিক বিচারে মালিনীর দুঃখ দুঃখ বলিয়া বিবেচিত হইলেও, এই নাট্যকাহিনীর যে আরও একটা মহত্তর দিক আছে, তাহার বিচারে দেখা যায় যে, এই দুঃখের মধ্য দিয়াই মালিনীর পরম গৌরব ঘোষিত হইয়াছে। মালিনী-চরিত্রের লৌকিক দিকটা নিতান্ত গৌণ বলিয়া লৌকিক দুঃখ অপেক্ষা তাঁহার মহত্তর ক্ষমার গৌরবই এই নাটকের মধ্যে মুখ্য স্থান অধিকার করিয়াছে এবং মনে হয় প্রকৃত কাব্যরস তাহাই।

মালিনী চরিত্রের লৌকিক দিকটার প্রতি অধিকাংশ সমালোচকই অতিরিক্ত

জোর দিয়াছেন বলিয়া শেষ পর্যন্ত তাঁহার চরিত্র অনেকেই ভুল বুঝিয়াছেন, কেহ বা ইহা অস্পষ্ট বলিয়া অনুভব করিয়াছেন। বিষয়টি একটু বিস্তৃত ভাবে আলোচনার যোগ্য। সুপ্রিয়কে চোখের সম্মুখে হত্যা করিতে দেখিয়াও ক্ষেমঙ্করকে কেন যে মালিনী ক্ষমা করিবার জন্য রাজার নিকট প্রার্থনা জানাইলেন, তাহা অধিকাংশ সমালোচকই বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। ইহার একমাত্র কারণ, মালিনীর চরিত্রটি তাঁহারা নিতান্ত লৌকিক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, সাধারণ লৌকিক ধারার অনুবর্তন করিয়া মালিনীর চরিত্রের বিকাশ হয় নাই; গুরু কাশ্যপের নিকট হইতে ত্যাগ ও ক্ষমার যে আদর্শ তিনি জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার অনুভূতিতে কোথাও তাঁহার আন্তরিকতার অভাব ছিল না। তাঁহার জীবনের আদর্শ ও জীবনের আচরণ উভয়ের মধ্যে কোন বিচ্ছেদ নাই। সুপ্রিয়র সান্নিধ্যে তাঁহার কুমারী-হৃদয়ের প্রথম উন্মেষ অনুভূত হইলেও, তাহা কখনই সুপ্রিয়কে একান্তভাবে আশ্রয় করিয়া বিকাশ লাভ করে নাই। সুপ্রিয়র সান্নিধ্য তিনি কামনা করেন সত্য, কিন্তু এই কামনা যেমন কখনও মুখ্য হইয়া উঠে নাই, তেমনই সুপ্রিয়র জন্যই যে বিশেষ ভাবে এই কামনা, তাহাও অনুভব করা যায় না। তাঁহার সেই অনুভূতি তখনও বিশেষ কোনও ব্যক্তিকে অবলম্বন করিতে পারে নাই; প্রেম ও ক্ষমা দ্বারা তিনি বিরুদ্ধ মতকে জয় করিয়াছেন, সুপ্রিয়র বন্ধু ক্ষেমঙ্করের বিরুদ্ধতাকেও স্বভাবতঃই তিনি এই কল্যাণমন্ত্রেই জয় করিতে চাহিলেন; শেষ দৃশ্যে মহত্তর ক্ষমার মধ্য দিয়া তিনি প্রকৃতই ক্ষেমঙ্করকে বা ক্ষেমঙ্করের আদর্শকে জয় করিলেন। তাঁহার মানবিক নারী-মনের যে বিকাশটুকুর প্রতি নাট্যকার ইঙ্গিত করিয়াছিলেন, তাহা শেষ পর্যন্ত অপরিস্ফুটই রহিয়া গেল, তাহা পূর্ণতম বিকাশের সুযোগ পাইল না। অতএব দেখা যাইতেছে, মালিনী সুপ্রিয়কে যে সম্পূর্ণ ভালবাসিয়াছিলেন, তাহা নহে—ক্ষেমঙ্করকেও যে ভালবাসিতেন, তাহা ত নহেই এবং তাঁহার শেষ দৃশ্যের শেষ কথা, 'মহারাজ, ক্ষম ক্ষেমঙ্করে' যে 'অভিভূত চৈতন্যের এক মুহূর্তের অপূর্ব অভিব্যক্তি' তাহাও মনে করিবার কোনও কারণ নাই। এই নাট্যকাহিনীর সূচনা হইতেই তাঁহার যে ক্ষমাগুণে দীক্ষা হইয়াছিল, নির্বাসনকামী প্রজাগণ হইতে আরম্ভ করিয়া সুপ্রিয়র হত্যাকারী ক্ষেমঙ্করের মধ্যে পর্যন্ত তাহারই অভিন্ন অভিব্যক্তি

দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্বেই বলিয়াছি, মালিনীর জীবনের একান্ত মানবিক প্রেমই এই নাটকে মুখ্য নহে, তাহার আদর্শনিষ্ঠাই মুখ্য। সেই জন্ম ইহা মুখ্যত প্রেমবিষয়ক নাটক নহে; মালিনীর অপরিস্ফুট প্রণয়াভাসকে ইহাতে মুখ্যস্থান দিলে ইহার মূল বক্তব্য বিষয় হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন হইবে।

পূর্বেই বলিয়াছি, নাট্যকাব্য রচনার যুগে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নাট্যকে প্রেম অপেক্ষা করুণাকেই অধিকতর প্রাধান্ত দিয়াছেন, প্রেম-বিষয়ক গীতি-নাট্য রচনার যুগ অতিক্রম করিয়াই তিনি করুণা-বিষয়ক নাট্যকাব্য রচনার যুগে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। এই যুগে প্রেমের সংস্কার কতকটা অবশিষ্ট থাকিলেও তাহাই মুখ্য হইয়া উঠিতে পারে নাই—করুণাই প্রাধান্ত লাভ করিয়াছিল। সেইজন্ত মালিনীর জীবনে প্রেমের সংস্কার অপেক্ষা করুণার সংস্কারই অধিকতর শক্তিশালী হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে, তাহারই প্রেরণায় তাঁহার এই সর্বশেষ উক্তি 'ক্ষম ক্ষেমঙ্করে' সম্ভব সঙ্গত এবং স্বাভাবিক হইয়াছে।

নাট্যকবিতা

'চিত্রা' কাব্যগ্রন্থের ভিতর দিয়া রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ সৌন্দর্যের বন্দনা গান গাহিয়া তাহার অব্যবহিত কাল পরেই ভারতের অতীত সৌন্দর্য-লোকের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন। তাহারই ফলে অনতিকাল ব্যবধানেই তাঁহার 'কথা' 'কাহিনী' ও 'কল্পনা' কাব্যগ্রন্থ রচিত হয়। 'কথা' ও 'কল্পনার' ভিতর দিয়া কাব্যাকারে তিনি যে ভারতের ঐশ্বর্যলোকের সন্ধান করিয়াছেন সমসাময়িক কালে রচিত 'কাহিনী'র মধ্য দিয়া তিনি তাহারই কয়েকটি বিষয় বাহ্যতঃ নাট্যাকারে পরিবেশন করিয়াছেন। 'কথা' 'কাহিনী' ও 'কল্পনা' একই বৎসরে (১৯০০খ্রীঃ) প্রকাশিত হয়। কাহিনীর কয়েকটি রচনার বাহ্যতঃ একটু রূপবৈচিত্র্য ছাড়া এই তিনটি গ্রন্থের সমগ্র রচনার মধ্যেই ভাবগত ঐক্য সূত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। 'কাহিনী' গ্রন্থখানি রবীন্দ্রকাব্য-সাধনার সমৃদ্ধতম যুগে রচিত বলিয়া ইহার কয়েকটি কবিতায় বাহ্যতঃ নাট্যের লক্ষণ অনুভূত হইলেও অন্তঃপ্রকৃতির দিক দিয়া ইহারা প্রধানতঃ কবিতাই, নাটক নহে। সেইজন্য ইহাদিগকে নাট্য-কবিতা সংজ্ঞা দেওয়া যায়, ইহাদের নাম 'গান্ধারীর আবেদন', 'সতী', 'নরক-বাস', 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' ও 'কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ'।

নাটকের ধর্ম গতি,—বিচিত্র ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে নাটকীয় বিষয় ক্রমাগত পরিবর্তনের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে থাকিবে, কেবল মাত্র একটি বিষয়কে কেন্দ্র করিয়া ভাবের আবর্ত রচনা করিবে না। কবিতার ধর্ম স্থিতি, ইহাতে একটি মাত্র ভাবকে কেন্দ্র করিয়া একটি স্বপ্নের যাদু-পুরী রচিত হইবে, বাহিরের কোন আঘাতেই ধ্যানাসীন এই ভাববিগ্রহটি বিচলিত হইবে না,—নাটক গতিপ্রবাহে ভাসমান, কবিতা এক অভিন্ন ভাবাশ্রিতা, স্থিতিশীল,—উভয়ের প্রকৃতিগত এই পার্থক্য সহজেই অনুভূত হয়। রবীন্দ্রনাথের নাট্যকবিতাগুলির মধ্যে পরস্পরবিরোধী এই দুইটি ধর্ম কি কৌশলে আসিয়া যে একত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহাই লক্ষ্য করিবার বিষয়। ইহারা কবিতা হইয়াও যে নাটকের ধর্মকে রক্ষা করিয়াছে এবং নাটক হইয়াও যে কবিতার ধর্মকে বিসর্জন দেয় নাই, ইহাই এই

রচনাগুলির বৈশিষ্ট্য। এই দিক দিয়া ইহারা কতখানি সার্থকতা লাভ করিয়াছে, তাহাও বিচার করিয়া দেখিতে হইবে।

কতকগুলি পৌরাণিক ঘটনা অবলম্বন করিয়া এই নাট্যকবিতাগুলি রচিত হইয়াছে; ঘটনার একটি পটভূমিকাকে যখন এখানে স্বীকার করা হইয়াছে, তখন ঘটনামাত্রেরই যে বৈশিষ্ট্য তাহাই কতক পরিমাণে ইহার সহিত সংযুক্ত হইয়া এই রচনাগুলির যে কতকটা নাট্যিক গৌরবদান করিয়াছে, তাহা স্বীকার করিতেই হয়। বাহিরের পরিবর্তনই যে নাটকের একমাত্র লক্ষ্য, তাহা নহে—মানসিক দ্বন্দ্ব বা মানসিক ভাবের উত্থান-পতনও উচ্চাঙ্গ নাট্যিক গুণ সৃষ্টি করিবার অধিকারী। এই নাট্যকবিতাগুলির মধ্যে এই মানসিক দ্বন্দ্ব ও বিচিত্র অবস্থার সম্মুখীন মানব-মানবীর জটিল মানসিক উত্থান-পতনের যে চিত্র দেওয়া হইয়াছে, তাহা দ্বারাও কবিতাগুলি বহুলাংশে নাট্যিক গুণের অধিকারী হইয়াছে। বাহ্যিক ঘটনা অপেক্ষা এই গুণেই ইহারা অধিকতর নাট্যলক্ষণাক্রান্ত, কবিতাগুলির আলোচনা সম্পর্কেই ইহা প্রমাণিত হইবে। এই কবিতাগুলির আর একটি প্রধান নাট্যিক গুণ এই যে, ইহাদের মধ্যে আদর্শের যে বিরোধ সৃষ্টি করা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে পরস্পর শক্তির সমতা রক্ষা করা হইয়াছে। চরিত্রগুলি নিজেদের বিশ্বাসকে সুদৃঢ়ভাবে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে, তাহার ফলেই ইহাদের ভিতর দিয়া যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার শক্তিও খুব প্রবল হইয়া উঠিয়াছে।

এই নাট্যকবিতাগুলির সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য গুণই ইহাদের রচনাগুণ। পূর্বেই বলিয়াছি, রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সাধনার সমৃদ্ধতম যুগের রচনা এই নাট্য-কবিতাগুলি। সেইজন্য ইহাদের মধ্যে রবীন্দ্র-প্রতিভার সমৃদ্ধতম কাব্যরচনার নিদর্শন পাওয়া যায়। নাট্যকাব্য যুগের রচনাগুলির মধ্যে রসের উচ্ছলতা একটু বেশী, কিন্তু নাট্য-কবিতাগুলির মধ্যে ভাবোচ্ছলতার দিক দিয়া রবীন্দ্রকাব্য যে অপূর্ব সংযমগুণ লাভ করিয়াছে তাহা রবীন্দ্ররচনার এক দুর্লভ সম্পদ। রচনার পরিমিতি ও সংযমের ভিতর দিয়া দীপ্ত লাবণ্যের বিকাশ ইহাদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়—ইহা তাঁহার পরবর্তী যুগের রসোজ্জ্বল রচনার কমনীয়তার তুলনায় অনেক হৃদয়গ্রাহী। কিন্তু রচনার দিক দিয়াই এই সংযম-গুণের কথা বলিতেছি, ভাবের দিক দিয়া নহে। এই নাট্যকবিতাগুলির মধ্যে পাত্রপাত্রীর দীর্ঘ সংলাপে যে ভাব-প্রকাশের অসংযম কতকটা প্রকাশ পাইয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তবে তাহাও

তাঁহার পূর্ববর্তী নাট্যরচনাগুলির তুলনায় যে অনেকটা সংযত, তাহাও অনুভূত হইবে। আদ্যোপান্ত মিত্রাক্ষরে রচিত হইলেও একঘেয়ে গীতিসুরের পরিবর্তে ইহাদের মধ্যে ছন্দোগত যে দৃঢ়বদ্ধতার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা বিশেষ ভাবেই লক্ষ্য করিবার মত; নাট্যকাব্যগুলির রচনা ইহাদের অপেক্ষা অধিকতর গীতিসুর-প্রবণ, অথচ নাট্যকাব্যগুলি অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত—কিন্তু মিত্রাক্ষরে রচিত হইয়াও কেবলমাত্র রচনার গুণে এই নাট্যকবিতাগুলি যে বহুলাংশে গীতিসুরবর্জিত হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুভব করা যায়। কেবলমাত্র মিত্রাক্ষর যোজনার দ্বারাই যে কবিতার গীতিসুর বর্ধন করা যায় না এবং অমিত্রাক্ষরের মূল তত্ত্ব যে অন্যত্র নিহিত আছে—রবীন্দ্রনাথের নাট্যকাব্য ও নাট্যকবিতাগুলি পরস্পর তুলনা করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

উল্লিখিত নাট্যকবিতাগুলির মধ্যে একমাত্র 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' ব্যতীত আর বাকি চারখানি রচনাই অভিন্ন প্রকৃতির। সেইজন্য রচনার কালানুসারে ইহার স্থান চতুর্থ হইলেও ইহার বিষয় সর্বশেষে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করা যাইবে।

রবীন্দ্রনাথের নাট্যকবিতাগুলির মধ্যে 'গান্ধারীর আবেদন'ই সর্বপ্রথম রচনা, ইহা ১৩০৪ সালে রচিত হয় এবং একমাত্র 'কর্ণকুন্তী-সংবাদ' ব্যতীত অন্য সকল নাট্যকবিতা এই বৎসরে নিতান্ত অল্পদিনের ব্যবধানেই রচিত হয়; সেইজন্য ইহাদের অধিকাংশের মধ্যেই রচনাগত সুনিবিড় ঐক্য অনুভূত হয়। নাট্যকবিতা রচনার সঙ্গে সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের পদ্যনাট্য রচনা যুগের অবসান হয়—ইহার পর তিনি নাট্যরচনায় এক সম্পূর্ণ নূতন ভঙ্গীর প্রবর্তন করিলেন—তাহার মধ্যে সঙ্গীতের অবকাশ থাকিলেও ইহা আদ্যোপান্ত গদ্যেই রচিত হইত। এই হিসাবে এই নাট্যকবিতাগুলি রবীন্দ্রনাথের নাট্যরচনার একটি বিশেষ প্রান্ত সীমায় অবস্থান করিতেছে।

পূর্বেই বলিয়াছি, 'গান্ধারীর আবেদন' নাট্যকবিতাগুলির মধ্যে সর্বপ্রথম রচনা। ইহার আখ্যানভাগ মহাভারত হইতে গৃহীত হইলেও ইহার খুঁটিনাটি পরিকল্পনা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজস্ব কল্পনার উপর নির্ভর করিয়াছেন—কিন্তু ইহাতে কাহিনীর পৌরাণিক মর্যাদা বিন্দুমাত্র বিনষ্ট হয় নাই, ইহাতে প্রত্যেকটি চরিত্রের বৈশিষ্ট্য নাট্যকার নিজস্ব বুদ্ধির আলোকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, অথচ ইহাদের মধ্যে তাঁহার ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণ প্রচ্ছন্ন থাকিয়া নৈর্ব্যক্তিকতার দাবীও যথার্থই পূরণ করিয়াছে। পূর্ববর্তী নাট্যকাব্যগুলির মধ্যে কোন কোন চরিত্রকে অবলম্বন করিয়া যেমন নাট্যকারের নিজস্ব

ব্যক্তিসত্তা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, নাট্যকবিতাগুলির মধ্যে তেমন হয় নাই; অবশ্য ইহাদের অপরিসর ক্ষেত্রে তাহার যে খুব বেশী অবকাশও ছিল, তাহাও নহে—তথাপি অন্ততঃ রবীন্দ্রনাথের নাট্যরচনার পূর্ববর্তী ধারা অনুসরণ করিয়া ইহাতেও এই ত্রুটি কতকটা বর্তমান থাকিতে পারিত; নাট্যকবিতা রচনার যুগে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নাট্যরচনার কতকগুলি দোষত্রুটি হইতে অনেকাংশে মুক্ত হইতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু এই যুগে তিনি কোন বৃহত্তর পরিকল্পনার উপর কোন পূর্ণাঙ্গ নাট্যরচনায় হস্তক্ষেপ করেন নাই বলিয়া এই বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই।

'গান্ধারীর আবেদন'-এর বিষয়বস্তু সংক্ষেপে এইরূপ: কপট দ্যূত ক্রীড়ায় পাণ্ডবদিগকে পরাজিত করিয়া বিজয়োল্লসিত দুর্যোধন পিতা ধৃতরাষ্ট্রের আশীর্বাদ প্রার্থনা করিতে আসিল। ধৃতরাষ্ট্র তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া কহিলেন, 'অখণ্ড রাজত্ব জয় করিয়াও তোর সুখ কোথায়?' দুর্যোধন বলিল, সে সুখ চাহে নাই, জয় চাহিয়াছে, সে আজ জয়ী—এই তাহার আনন্দ। ধৃতরাষ্ট্র তাহার ভ্রাতৃদ্রোহকে ধিক্কার দিলেন; দুর্যোধন বলিল, এত নিকট আত্মীয় বলিয়াই পাণ্ডবেরা তাহার শত্রু, দূরবর্তী আত্মীয় হইলে উহাদের সম্পর্ক এত তিক্ত হইত না; ধৃতরাষ্ট্র তাহার ঈর্ষ্যাবুদ্ধিকে নিন্দা করিলেন। দুর্যোধন বলিল, 'ঈর্ষ্যা বৃহতের ধর্ম।' অবশেষে ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, দুর্যোধনের আচরণে ধর্ম পরাজিত হইয়াছে। দুর্যোধন তাহারও উত্তরে বলিল যে, লোকধর্ম ও রাজধর্ম এক নহে; রাজধর্মের দিক দিয়া দুর্যোধন কোন অন্যায় করিয়াছে বলিয়া সে মনে করে না; ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, কপট দ্যূতে জয়লাভ করিয়া তাহার আনন্দ প্রকাশ করা লজ্জাহীনতার পরিচায়ক। দুর্যোধন তাহারও উত্তরে বলিল, যার যাহা বল, তাহাই তাহার অস্ত্র; ইহাতে লজ্জার কোন কারণ নাই। ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, আজ সর্বত্র দুর্যোধনের নিন্দা প্রচারিত হইতেছে। দুর্যোধন বলিল, সে রাজশক্তির সাহায্যে নিন্দকের কণ্ঠরোধ করিয়া নিন্দার ধ্বংস করিবে, লোকনিন্দাকে সে ভয় করে না। দুর্যোধন অভিমানহত হইয়া পিতাকে বলিল যে, তাহারা শৈশব হইতে পিতৃস্নেহে বঞ্চিত, তাহাদের পিতার সিংহাসন তাহাদের নিন্দক দলে সর্বদা ঘিরিয়া রাখিয়াছে; এই সঞ্জয়, বিদুর, ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁহার সন্তানদের মধ্যে ব্যবধান রচনা করিয়া রাখিয়াছে, তাহাদিগকে দূর করিয়া দিতে হইবে। ধৃতরাষ্ট্র তাহাকে আশ্বাস দিয়া কহিলেন, ইহাদের কথা শুনিয়া তাহার পুত্রস্নেহ বিন্দুমাত্রও হ্রাস হয়

নাই। এমন সময় একজন চর আসিয়া সংবাদ দিল যে মহিষী গান্ধারী স্বামীর দর্শনপ্রার্থিনী হইয়াছেন; শুনিয়া দুর্যোধন পলাইয়া গেল, ধৃতরাষ্ট্র মহিষীকে আহ্বান করিলেন; গান্ধারী আসিয়া স্বামীর নিকট পুত্র দুর্যোধনকে পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করিলেন। গান্ধারী বলিলেন, দুর্যোধন অপরাধী, তাই সে পরিত্যাজ্য; ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, সে যদি ধর্মের কাছে অপরাধী হইয়া থাকে, তবে ধর্মই তাহাকে শাসন করিবেন, পিতা হইয়া তিনি পুত্রকে পরিত্যাগ করিবেন কি করিয়া? গান্ধারী বলিলেন, তিনি মাতা হইয়াও সমস্ত নারী জাতির নামে পুত্রের বিরুদ্ধে রাজার কাছে বিচার প্রার্থনা করিতেছেন, কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, পাপী পুত্র বিধাতার ত্যাজ্য; তাই তিনি তাহাকে ত্যাগ করিতে পারিতেছেন না। তিনি তাহার সঙ্গে একই পাপে ঝাঁপ দিয়া একসঙ্গে তলাইয়া যাইতেই স্থির করিয়াছেন।

গান্ধারীর আবেদন ব্যর্থ হইল। শত্রু-পরাভব-উৎসব-মত্তা দুর্যোধন-মহিষী ভানুমতী আসিয়া প্রবেশ করিলেন। গান্ধারী তাহাকে উৎসবের পবিবর্তে পতির উদ্ধারের জন্য দেবতার্চন করিবার উপদেশ দিলেন। ভানুমতী সে কথা তাচ্ছিল্য করিয়া উড়াইয়া দিলেন। বনযাত্রার আগে গান্ধারীর আশীর্বাদ প্রার্থনা করিবার জন্য দ্রৌপদীসহ পঞ্চপাণ্ডব আসিয়া প্রবেশ করিলেন। গান্ধারী সকলকে আশীর্বাদ করিলেন।

বর্ণিত কাহিনী হইতে সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, ইহাতে বাহ্য ঘটনার কোন ঘাত-প্রতিঘাত নাই, ইহার মধ্যে যে সকল পরস্পরবিরোধী আদর্শকে আনিয়া সম্মুখীন করা হইয়াছে, তাহা দ্বারাই ইহার প্রকৃত বিক্ষোভ সৃষ্টি হইয়াছে। একমাত্র ধৃতরাষ্ট্রের চরিত্র ব্যতীত অন্য কোন চরিত্রের মধ্যে কোনও অন্তর্দ্বন্দ্বও নাই, দুর্যোধন যাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে, তাহা মনে-প্রাণে সরল ভাবেই করে। তাহার বিশ্বাসের মধ্যে কোন অন্তর্দ্বন্দ্বের অবকাশ নাই। গান্ধারীরও তাহাই—স্নেহবোধ এবং ধর্মবোধের মধ্যে তাঁহার নিজের কোন দ্বন্দ্ব নাই; এই বিষয়ে তিনি নিজে একটা সত্যোপলব্ধিতে পৌঁছিয়াছেন এবং সুদৃঢ় ভাবে তাহাই অবলম্বন করিয়া আছেন। হয়ত তীব্র মানসিক সংগ্রামের ভিতর দিয়াই তিনি সত্যোপলব্ধিতে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন, কিন্তু এই নাট্যকবিতায় গান্ধারীর এই মানসিক সংগ্রামের কোন পরিচয় নাই। ধৃতরাষ্ট্রের মধ্যে এই মানসিক সংগ্রামের পরিচয় আছে। সেইজন্য ধৃতরাষ্ট্রের চরিত্রটি এই নাট্যকবিতার মধ্যে সর্বাপেক্ষা নাট্যধর্মী। গান্ধারী

আদর্শ প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ, তাঁহার আচরণের মধ্যে মানবিক কোন গুণের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায় না; পুত্র দুর্যোধনের সঙ্গে তিনি তাঁহার স্নেহ-সম্পর্কের কথা আবেগপূর্ণ ভাষায় স্মরণ করিলেও তাঁহার এই স্নেহস্মৃতির সঙ্গে তাঁহার নাট্যোল্লিখিত আচরণের এত পার্থক্য যে, তাহা হইতেই তাঁহার সেই স্নেহবোধ যে নিতান্তই আন্তরিক ছিল, তাহা কিছুতেই অনুভূত হয় না। অর্থাৎ মাতা গান্ধারী আর এই পুত্রের নামে বিচারপ্রার্থিনী নারী যে একই চরিত্র তাহা কিছুতেই মনে হয় না।

'গান্ধারীর আবেদন' নাট্যকবিতায় ধৃতরাষ্ট্রের চরিত্রটিই সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য। পূর্বেই বলিয়াছি, ধৃতরাষ্ট্রের চরিত্রের মধ্যে কতকগুলি বিরুদ্ধ অবস্থার সঙ্গে সংগ্রামের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা চরিত্রটিকে অপরূপ নাট্যিক গৌরব দান করিয়াছে। ধৃতরাষ্ট্র রাজা, পিতা ও স্বামী। অদৃষ্টের চক্রান্তে এই তিনটি কর্তব্যবোধ পরস্পরের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল, রাজকর্তব্য পুত্রস্নেহের বিরুদ্ধে দাঁড়াইল—পুত্রস্নেহ পত্নীপ্রেমের বিরুদ্ধে গেল—এই বিরুদ্ধ সংগ্রামে কঠোর কর্তব্যপরায়ণতা ও সুগভীর পত্নীপ্রেম পুত্রস্নেহের কাছে পরাজয় স্বীকার করিল। এই দ্বন্দ্ব নাট্যকার ধৃতরাষ্ট্রের মধ্যে পরম নিপুণতার সঙ্গে বর্ণনা করিয়াছেন। পাপী পুত্রের প্রতি কর্তব্যপরায়ণ রাজার প্রচ্ছন্ন স্নেহবোধের এই জটিল দ্বন্দ্বই কবিতাটির একটি বিশেষ নাট্যিক গুণ। অন্তরের মধ্যে স্নেহবোধকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া বাহিরে তিনি পুত্রকে অধর্মাচারণের জন্য তীব্র ভর্ৎসনা করিতেছেন; অন্তরে কোমল হইলেও বাহিরে তিনি কঠোর। ধৃতরাষ্ট্রের চরিত্র কোন উচ্চ আদর্শে উদ্বুদ্ধ নহে, তাঁহার সুকঠিন রাজকর্তব্যও স্বাভাবিক মানবিক বৃত্তিগুলির উৎসমুখ শুষ্ক করিয়া দিতে পারে নাই। তিনি স্নেহপরবশ হইলেও স্নেহে অন্ধ নহেন, দুর্যোধনের পাপাচরণ সম্পর্কেও তিনি সম্পূর্ণ সচেতন! তথাপি স্নেহকে তিনি জয় করিতে পারিতেছেন না—সুসঙ্গত স্বাভাবিক মানবিক গুণেই তাঁহার চরিত্রটি উদ্ভাসিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের নাট্যকবিতার পুরুষচরিত্রগুলি কতকটা বাস্তব ও জীবন্ত, কিন্তু স্ত্রীচরিত্রগুলি আদর্শপ্রণোদিত বলিয়া নির্জীব।

ধৃতরাষ্ট্রের পরই দুর্যোধন চরিত্রের উল্লেখ করিতে হয়। এই চরিত্রও তাহার নিজের দিক হইতে সুন্দর চিত্রিত হইয়াছে। ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে প্রথম দর্শনের সময় তাহার সর্বাঙ্গ দিয়া যেন বিজয়ের উল্লাস উছলিয়া পড়িতেছে। তৃপ্তি ও আনন্দ যেন আর ধরে না। কিন্তু পিতার কণ্ঠে ভর্ৎসনা শুনিয়া সহসা

তাহার মনে অভিমানের উদয় হইল এবং আশৈশব তাহারা তাহাদের নিন্দক দলের চক্রান্তে পিতৃস্নেহ হইতে যে ভাবে বঞ্চিত হইয়া আসিতেছে তাহার কথা স্মরণ করিয়া কহিল—

অন্ধ হস্তে পিতঃ,
যদি সে নিন্দুক দলে নাহি কর দূর
সিংহাসন পার্শ্ব হতে, সঞ্জয় বিদুর
ভীষ্ম পিতামহ,—যদি তারা বিজ্ঞবেশে
হিতকথা ধর্মকথা সাধু উপদেশে
নিন্দায় ধিক্কারে তর্কে নিমেষে নিমেষে
ছিন্ন ছিন্ন করি দেয় রাজধর্ম ডোর,
ভারাক্রান্ত করি রাখে রাজদণ্ড মোর,
তবে ক্ষমা দাও, পিতৃদেব—নাহি কাজ
সিংহাসন কণ্টক শয়নে—মহারাজ,
বিনিময় করি লই পাণ্ডবের সনে
রাজ্য দিয়ে বনবাস, যাই নির্বাসনে।

উদ্ধত পুত্রের পিতৃস্নেহে অভিযোগের এই চিত্রটি বড়ই মর্মস্পর্শী ; ধৃতরাষ্ট্রও ইহাতে বিচলিত হইয়া পড়িলেন এবং পরবর্তী মুহূর্তেই গান্ধারী আসিয়া পুত্রকে পরিত্যাগ করিবার আবেদন জানাইলেন। তখন তাঁহার আবেদন যে ব্যর্থ হইল, তাহার মূলে পুত্রের এই অভিমান-কম্পিত কণ্ঠস্বরের স্মৃতি যে বিশেষ কার্যকরী হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুভব করা যায়।

পূর্বেই বলিয়াছি, গান্ধারীর চরিত্র আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত, তাহার সঙ্গে রক্তমাংসের কোন সম্পর্ক আছে বলিয়া মনে হয় না ; সেইজন্য গান্ধারীর শত যুক্তির সম্মুখে ধৃতরাষ্ট্রের একমাত্র যুক্তি 'আমি পিতা' যত বেশী সত্য বলিয়া মনে হয়, গান্ধারীর উচ্ছ্বসিত মাতৃস্নেহাভিব্যক্তিও তাহার সম্মুখে নিতান্ত প্রাণহীন অভিনয়ের মত বলিয়া বোধ হয়।

রবীন্দ্রনাথের নাট্যকবিতাগুলির মধ্যে 'কর্ণকুন্তী-সংবাদ' সর্বশেষ (১৩০৬) রচনা হইলেও বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভঙ্গির দিক দিয়া ইহাকে 'গান্ধারীর আবেদনে'র পরই আলোচনা করিতে হয়। 'কর্ণকুন্তী-সংবাদ'ই নাট্যকবিতাগুলির মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট—রচনায় পরিসর ইহার খুব বিস্তৃত না হইলেও, অল্পপরিসরের মধ্যেও ইহা নিবিড় রসঘন হইয়া উঠিয়াছে। বিষয় নির্বাচনে ও অনুভূতির সূক্ষ্মতায় ইহা রবীন্দ্র-নাট্যসাহিত্যের একটি বিশিষ্ট রচনা। ইহার কাহিনীভাগ সংক্ষেপে

এইরূপ :—কুরুক্ষেত্র যুদ্ধারম্ভের পূর্বমুহূর্তে একদিন জাহ্নবীতীরে প্রায়ান্ধকার সন্ধ্যায় সূর্যবন্দনা-রত কর্ণ সম্মুখে অপরিচিতা নারীকে দেখিয়া পরম বিস্মিত হইলেন। তিনি তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে নারী নিজেকে পাণ্ডবজননী কুন্তী বলিয়া পরিচয় দিলেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া কর্ণ তাঁহার প্রতি এক অপূর্ব আকর্ষণ অনুভব করিলেন, এক অনাস্বাদিতপূর্ব অনুভূতি তাঁহার অন্তর স্পর্শ করিয়া গেল। কুন্তী বলিলেন, তিনি তাঁহার নিকট এক প্রার্থনা লইয়া আসিয়াছেন—তিনি তাঁহাকে তাঁহার মাতৃক্রোড়ে ফিরাইয়া লইতে চাহেন। শুনিয়া কর্ণের শৈশবের কথা মনে পড়িল; লোকমুখে শ্রুত জননী কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া সূত অধিরথের গৃহে আশ্রয়লাভের কাহিনী মনে হইল—এবং আজন্ম বঞ্চিত মাতৃস্নেহ লাভের সম্ভাবনায় মন অধীর হইয়া উঠিল। মুহূর্তের আত্মবিস্মৃতিতে মাতৃস্নেহের বন্ধনে তিনি ধরা দিলেন। কিন্তু কুন্তী তাঁহাকে কৌরবদিগের বিরুদ্ধে পাণ্ডবদিগের সহায়তার জন্যই প্রার্থনা করিতেছেন জানিতে পারিয়া তিনি আত্মসংবরণ করিয়া লইলেন। সন্তান পরিত্যাগিনী মাতার প্রতি অভিমানে তাঁহার মন এইবার ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল, মাতৃস্নেহের প্রলোভন দেখাইয়া তিনি যে তাঁহাকে তাঁহার নিজের বীরধর্ম বিসর্জন দিতে বলিতেছেন, সেজন্য তিনি মাতার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া তাঁহাকে বিদায় দিলেন।

একটি অনতিপ্রসব কাহিনীর মধ্যে এত দ্রুত পরিবর্তনশীল মানসিক অবস্থার বিচিত্র উত্থান-পতনের চিত্র এমন নিপুণভাবে আর কোথাও চিত্রিত হইয়াছে বলিয়া জানা যায় না। কাহিনীটি মহাভারত হইতে গৃহীত—এই নাট্যকবিতার পরিকল্পনায় কাহিনীর এই পৌরাণিক মর্যাদা কোন অংশে ত ক্ষুণ্ণ হয়ই নাই বরং তাহা শতগুণ উজ্জ্বল হইয়াছে। মহাভারতে কর্ণের চরিত্র একটি বিস্ময়কর সৃষ্টি, ইহার মধ্যে যে বিচিত্র নাট্যিক উপকরণ রহিয়াছে তাহার বিস্তৃতভাবে সদ্ব্যবহার করিলে যথার্থ উচ্চাঙ্গ নাটক রচিত হইতে পারে। মহাভারত হইতে কর্ণের জীবনের একটি মাত্র স্মরণীয় মুহূর্তকে উদ্ধার করিয়া কবি এখানে যে ভাবে তাহার ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা হইতে ইহাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে।

এই নাট্যকবিতার প্রধান লক্ষ্যের বিষয় এই যে, ইহাতে ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতের কোন পরিচয় নাই—একমাত্র অন্তর্দ্বন্দ্ব দ্বারাই ইহার এই উচ্চ নাট্যিকগুণ সৃষ্টি করা সম্ভব হইয়াছে,—মনে হয়, কয়েকটি কাব্যরসাশ্রিত

বাক্যকে অবলম্বন করিয়া দুইটি হৃদয়ের উপর দিয়া এখানে এক তুমুল ঝঞ্ঝা-বাত্যা প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে, বাহ্য ঘটনার সম্পর্কহীন কেবলমাত্র মনো-জগতের নিষ্ক্রিয় বর্ণনাতেও যে কত শক্তি থাকিতে পারে, এই নাট্যকবিতার কাহিনীটিই তাহার প্রমাণ।

আসন্ন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বিস্তৃত পটভূমিকায় এই কাহিনীটিকে পরিকল্পনা করা হইয়াছে। এই বিশাল পরিবেশটি এই নাট্যকবিতার কাহিনীগত মর্যাদা অনেক পরিমাণে যে বৃদ্ধি করিয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য—রামায়ণ কিংবা মহাভারত হইতে কাহিনী সংগ্রহ করিয়া রচনার একটা খুব বড় সুবিধা এই যে, ইহা দ্বারা ইহাদের পরিচিত পরিবেশটির সদ্ব্যবহার করিবার সুযোগ লাভ করা যায়। শুধু তাহাই নহে, চরিত্রগুলির সঙ্গেও পাঠকের যে মনোভাব প্রায় আজন্ম সংস্কারের মতই গড়িয়া উঠে, তাহারও পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করা যায়। অবশ্য আর একদিক দিয়া ইহার দায়িত্বও অনেক বেশী—নূতন করিয়া ব্যবহারের ফলে চরিত্রগুলি যদি আমাদের চিরকাল পালিত সংস্কারের তিল-মাত্রও বিরোধী হইয়া পড়ে, তাহা হইলেই তাহাদের প্রতি আমাদের মন অতি সহজেই বিরূপ হইয়া যায়। অর্থাৎ 'কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ'-এর কর্ণ এবং কুন্তীর সঙ্গে আমরা কেবলমাত্র এই কবিতার মধ্য দিয়াই পরিচয় স্থাপন করিয়া লইব না, তাঁহাদের সম্পর্কে আমাদের আজন্ম যে একটি সংস্কার পূর্ব হইতেই নির্দিষ্ট হইয়া আছে, এই কবিতার রসগ্রহণ করিবার কালে সেই সংস্কারবুদ্ধিও অলক্ষ্যে সক্রিয় থাকিবে। রবীন্দ্রনাথ 'কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ'-এর ভিতর দিয়া মহাভারতের উদার পরিবেশটি সদ্ব্যবহারের যেমন সুযোগ গ্রহণ করিয়াছেন, আবার তেমনই কাহিনী ও চরিত্র পরিকল্পনায়ও মহাভারতের যোগ্য মর্যাদা রক্ষায় সফলকাম হইয়াছেন।

এই বিস্তৃত পৌরাণিক পটভূমিকার উপরেও যে-অনুভূতিগুলি এই নাট্য কবিতায় প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, তাহা নিতান্তই মর্ত্য ও মানবিক,—ইহাই এই নাট্যকবিতাটির একটি দুর্লভ বৈশিষ্ট্য; ইহার কোন চরিত্রই কোন বাস্তব সম্পর্কহীন আদর্শ প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ নহে। এই গুণেই ইহা কবিতা হইয়াও নাট্যধর্মী হইতে পারিয়াছে। এখানে কুন্তী বীরজননী হইয়াও সাধারণ দোষত্রুটিপূর্ণ মানবী মাত্র; তাঁহার মানবিক দীনতা এখানে এমনভাবে প্রকাশ পাইয়াছে যে, তাঁহার সম্মুখে তাঁহার মহাভারতের পাণ্ডব জননীর উন্নত চিত্র কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে; কুন্তী এখানে অপরাধিনী; তাঁহার লজ্জা,

তাঁহার অপরাধ সন্ধ্যার অন্ধকার দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া যেন এক অস্পষ্ট ছায়া-মূর্তির মত তিনি আসিয়া নম্রশিরে বীরপুত্রের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছেন; জন্মমুহূর্তেই পুত্রকে পরিত্যাগ করিবার মধ্যে তাঁহার যে লজ্জার কাহিনী জড়িত হইয়া আছে, তাহার জন্য তাঁহার সঙ্কোচের অবধি নাই—এই নারী এতদিন তাঁহার এই লজ্জার কথা গোপন করিয়াও আজ এমন এক অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছেন, যাহাতে পুত্রের কাছেও সেই লজ্জা আর গোপন রাখিতে পারিতেছেন না—ইহার অপমান যে কত গভীর—মাতা হইয়া পুত্রের নিকট এই দীনতা স্বীকারের মধ্যে যে কতখানি বেদনা, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা সহজ নয়; কুন্তী এখানে সেই দুঃসহ বেদনা ও অপরিমেয় লজ্জার সবটুকুরই ভার নিজের একার উপরই লইয়া আসিয়াছেন। এই নাট্যকবিতায় কুন্তীর প্রত্যেক কথার ভিতর দিয়া এই চরম অপমান, সুগভীর লজ্জা ও দুঃসহ বেদনার পরিচয় সার্থকভাবে প্রকাশ পাইয়াছে।

ইহার পরই কর্ণের কথা উল্লেখ করিতে হয়। মহাভারতের অদ্বিতীয় এই বীর চরিত্রের গৌরব সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই কবি এখানে তাঁহার পরিকল্পনা করিয়াছেন, কিন্তু তাহা হইলেও কোন উচ্চাদর্শের পরিবর্তে তাঁহার নিতান্ত মানবিক দিকটাই এখানে বিকাশ লাভ করিয়াছে। কুন্তী তাঁহার জননী, এই জননীর সহিত তাঁহার সম্পর্ক জন্মান্তর স্মৃতির মতই ক্ষীণ, তথাপি তাহার মূলে সত্য আছে। আজন্ম মাতৃস্নেহ বঞ্চিত এই হতভাগ্যের সম্মুখে যখন কুন্তী তাঁহার পরিচয় প্রকাশ করিলেন, তখন মাতৃসম্পর্কের মাধুর্যের কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার মুহূর্তে আত্মবিস্মৃতির চিত্রটি সেই সত্যের উপর ভিত্তি করিয়াই পরিকল্পিত। কিন্তু এই জননীর সহিত তাঁহার সম্পর্ক নিতান্তই ক্ষীণ বলিয়া সেই মুহূর্তেই তাহা ছিন্ন হইয়া গিয়া সংস্কারই শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করিল। জননীর দাবী লইয়া কুন্তী আসিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু জননীর শক্তি লইয়া আসেন নাই। কর্ণের উপর সেই শক্তি তাঁহার ছিলও না, সেই জন্যই তাঁহাকে রিক্তহস্তে ফিরিতে হইল। মাতার প্রতি বীর সন্তানের অভিমানের চিত্রটিও বড় সুন্দর।

কেন তবে
আমারে ফেলিয়া দিলে দূরে অগৌরবে
কুলশীলমানহীন মাতৃনেত্রহীন
অন্ধ এ অজ্ঞাত বিশ্বে। কেন চিরদিন

ভাসাইয়া দিলে মোরে অবজ্ঞার স্রোতে,—
কেন দিলে নির্বাসন ভ্রাতৃকুল হতে।

বীরধর্ম রক্ষায় জন্য কর্ণের মাতৃস্নেহকে প্রত্যাখ্যান করিবার যে কথা ইহাতে বলা হইয়াছে, তাহা আপাতদৃষ্টিতে আদর্শ প্রেরণার ফল বলিয়া মনে হইলেও প্রকৃত তাহা নহে। কর্ণেব প্রতি স্নেহে কুন্তীর যে আন্তরিকতা ছিল না, তাহা সহজেই অনুভব করা যায়। কুন্তী আসিয়াছিলেন পাণ্ডবের স্বার্থরক্ষার জন্য, বিশ্ববিজয়ী কর্ণের হাত হইতে অর্জুনকে রক্ষা করিবার জন্য। এই নাট্য-কবিতায় তাহা উল্লেখ থাকিবার কথা নহে, তবে কুন্তীর আচরণের ভিতর দিয়া তাঁহার কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পাণ্ডবের নিরাপত্তার ভাবনা এই নাট্যকবিতার মধ্যে অস্পষ্ট নাই; কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্ব মুহূর্তে নারীহৃদয়ের চরম লজ্জাকেও জলাঞ্জলি দিয়া কুন্তী যে কর্ণের নিকট গিয়া নিজের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে কর্ণের প্রতি তাঁহার সন্তানবাৎসল্য অপেক্ষা পঞ্চপাণ্ডবের মঙ্গল চিন্তাই অধিকতর কার্যকরী হইয়াছিল। যেখানে আন্তরিকতা নাই, সেখানে প্রকৃত শক্তিরও অভাব; সেইজন্যই কর্ণের নিকট কুন্তীর মাতৃস্নেহ কার্যকর হইতে পারিল না। কর্ণ বীরধর্মেই প্রতিষ্ঠিত—এই বীরধর্ম হইতে তাঁহাকে চ্যুত করিবার মত কোন বিরুদ্ধ শক্তিই তাঁহার সম্মুখে ছিল না—সেইজন্যই কর্ণ শেষ পর্যন্ত স্বধর্মেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়া গেলেন। কিন্তু ইহার মধ্যেও তাঁহার এই নিতান্ত মানবিক অভিমানের কম্পিত কণ্ঠস্বরটিও কাহার অশ্রুত থাকিতে পারে না,—

জন্মরাত্রে ফেলে গেছ মোরে ধরাতলে
নামহীন, গৃহহীন—আজিও তেমনি
আমারে নির্মম চিত্তে তেয়াগো জননী
দীপ্তিহীন কীর্তিহীন পরাভব-'পরে।

কর্ণের বীরধর্ম পালনের আগ্রহের জন্য জননীর প্রতি তাঁহার এই দুর্জয় অভিমানবোধ যে কতকটা দায়ী, তাহা অনুমান করা কি খুব কঠিন? এই-খানেই বীরধর্ম পালনের আদর্শবাদ মানবিক অনুভূতির বাস্তবতার নিকট নতি স্বীকার করিতেছে।

রচনা-ভঙ্গি ও বিষয়-বস্তুর দিক দিয়া 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা'র একটু স্বাতন্ত্র্য আছে। অন্যান্য নাট্যকবিতা এক দৃশ্যেই সম্পূর্ণ, ঘটনার দিক দিয়া সুস্পষ্ট বিচ্ছেদ না থাকিলেও ইহার দুইটি স্বতন্ত্র দৃশ্য। অন্যান্য নাট্যকবিতার মত

ইহা অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত নহে—ছয় মাত্রিক দুই পর্বের মিত্রচ্ছন্দে আদ্যোপান্ত রচিত। এই ছন্দের গীতিসুর নাট্যধর্মের অনেকটা বিরোধী, সেইজন্য ইহা আদ্যোপান্ত একটি আখ্যানমূলক গাথা কবিতার মত মনে হয়। একটি দীর্ঘ রচনার মধ্যে এক বৈচিত্র্যহীন ও অভিন্ন ছন্দ ব্যবহারের ফলে ইহাতে একটু একঘেয়েমির সৃষ্টি হইলেও, এই ছন্দরচনার মধ্যে নাট্যকারের যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে,—বাংলা সাহিত্যে একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত এত দীর্ঘ রচনার মধ্যে এমন সুনিপুণ মিত্রাক্ষর ছন্দরচনার কৌশল আর কাহারও আয়ত্ত নাই,—তথাপি স্বীকার করিতেই হয়, ছন্দটি সম্পূর্ণ বিষয়োপযোগী হয় নাই। 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা'ই রবীন্দ্রনাথের নাট্যকবিতাগুলির মধ্যে একমাত্র পুরুষ-ভূমিকা-বর্জিত নাটক। 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা'র আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা 'কাহিনী'র অন্যান্য নাট্যকবিতার মত কোন পৌরাণিক ভিত্তির উপর স্থাপিত নহে,—রবীন্দ্র-কবিমানসের কল্যাণধর্মের আদর্শ এখানে একটি লঘু হাস্যরসোজ্জ্বল প্রত্যক্ষ পরিবেশকে অবলম্বন করিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। কাহিনীটি সংক্ষেপে এইরূপ :—রাণী কল্যাণীর দাসীর নাম ক্ষীরো; তাহার কিছুতেই তৃপ্তি নাই, মেজাজও তাহার বড় খিটখিটে। কেহ কোন কিছুর জন্য ডাকিলেই একেবারে ঝঙ্কার দিয়া উঠে। তাহার মুখের জ্বালায় অন্য ঝি-চাকর টিকিতে পারে না—সকলকে তাড়াইয়া দিয়া নিজের ভাইপো, ভাইঝি, নাতনী ইহাদের লইয়া নিরুপদ্রবে রাণীর আশ্রয়ে বাস করে। রাণী কল্যাণীর মঙ্গল হস্ত দশদিকে প্রসারিত হইয়া আছে—সংসারের যত দীন দুঃখী তাঁহার নিকট আসিয়া তাঁহার করুণা লাভ করে—প্রতিবেশিনীগণ তাঁহার দুর্বলতার সুযোগ লয়; সামনে হাত পাতিয়া তাঁহার নিকট হইতে সাহায্য নেয়, আবার পিছন ফিরিয়াই নিন্দা করে। রাণীর ঐশ্বর্য দেখিয়া ক্ষীরো একদিন মনে মনে কল্পনা করে, যদি লক্ষ্মীর দেখা পাইতাম, তবে পরের বাড়ীতে খাটিয়া মরিবার দুঃখ দূর হইত। সেই রাত্রেই লক্ষ্মী তাহার শিয়রে আবির্ভূত হইলেন; ক্ষীরোকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, তোর এমন মনিবকেও তুই ঠকিয়ে খাস? ক্ষীরো বলিল, আমি দুঃখী, তাই আমি যাহাই করি না কেন, তাহারই মধ্যে দোষ দেখা দেয়, তুমি যদি আমাকে অনুগ্রহ কর, তবে দেখিবে আমার স্বভাবের পরিবর্তন হইয়াছে। লক্ষ্মী বলিলেন, 'আচ্ছা তাহাই করিলাম, দেখি তোকে দিয়া আমার যশ রক্ষা পায় কিনা'—লক্ষ্মী ক্ষীরোকে আশ্রয় করিয়া কল্যাণীকে পরিত্যাগ করিলেন। ক্ষীরো পুরাদস্তুর রাণী হইয়া

বসিল, পরিচারিকাদিগকে নূতন আদব কায়দা শিখাইল, দুঃস্থ দরিদ্রকে তাহার প্রাসাদের চতুঃসীমা হইতে দূর করিয়া দিল। রাজ্যভ্রষ্টা রাণী কল্যাণী আসিয়া তাহার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন—তাঁহাকেও সে তাড়াইয়া দিল। এমন সময় সহসা ঘুম ভাঙ্গিয়া দেখিল, রাণী কল্যাণী তাহাকে ডাকিতেছেন—সে বুঝিল, এতক্ষণ সে স্বপ্ন দেখিতেছিল।

ইতিপুর্বে 'হাস্যকৌতুকে'র মধ্যে রবীন্দ্রনাথ গদ্যরচনায় যে ধরনের হাস্য-রসিকতার অবতারণা করিয়াছিলেন, এই নাট্যকবিতাটির মধ্যেও সেই ধরণের হাস্যরসের সঙ্গেই পরিচিত হওয়া যায়। ইহাতে রবীন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম রসবোধ ও মানবচরিত্র সম্বন্ধে সুগভীর অন্তর্জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। ক্ষীরোর চরিত্রটি আদ্যোপান্ত জীবন্ত বলিয়া অনুভূত হয়। রাণী কল্যাণীর মধ্যে উদার দানশীলতাগুণের সঙ্গে একটি সুচতুর বুদ্ধি-বিচক্ষণতারও যে স্পর্শ আছে, তাহাই তাহার চরিত্রটিকে অপরূপ বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে। সংলাপ একটু একঘেয়ে হইয়া উঠিলেও পরিহাস-রসিকতার গুণে অভিনয়েও ইহা আশাতীত সাফল্য লাভ করিয়া থাকে।

'গান্ধারীর আবেদনে'র পর অতি অল্পদিনের ব্যবধানে রবীন্দ্রনাথের 'সতী' ও 'নরক-বাস' নাট্যকবিতা দুইটি রচিত হয়। এই দুইখানি নাট্যকবিতাই ইহাদের পুর্ববর্তী রচনা 'গান্ধারীর আবেদন' কিংবা পরবর্তী রচনা 'কর্ণকুন্তী সংবাদে'র তুলনায় অনেক নিকৃষ্ট। 'সতী' নাট্যকবিতার বিষয়বস্তু 'মিস্ ম্যানিং সম্পাদিত ন্যাশনাল ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের পত্রিকায় মারাঠি গাথা সম্বন্ধে অ্যাকওয়ার্থ সাহেব রচিত প্রবন্ধ বিশেষ হইতে সংগৃহীত।' ইহার মধ্যে ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাত সৃষ্টির অবকাশ ছিল, কিন্তু তাহার পুর্ণ সদ্ব্যবহার করা হয় নাই; মূলের প্রতি একান্ত আনুগত্যের জন্যই হউক, কিংবা অন্য যে কোন কারণেই হউক, কাব্যাংশও ইহার নিকৃষ্ট হইয়াছে। কাহিনীটি সংক্ষেপে এইরূপ:—অমাবাইকে বিবাহ সভা হইতে জোর করিয়া লইয়া গিয়া বিজাপুর রাজ্যের মুসলমান সভাসদ্ তাহাকে বিবাহ করিয়াছে—অমাবাইও তাহাকে স্বেচ্ছায় পতিরূপে গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু অমার পিতা বিনায়ক রাও এই মুসলমানের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ লইবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন; অমার বাগ্‌দত্ত স্বামীর নাম জীবাজি, জীবাজিকেও তিনি এই কঠিন প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ করিলেন; বহুদিন পর একদিন এই প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ আসিল, জীবাজি এই মুসলমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া এইমাত্র প্রাণত্যাগ করিয়াছে,

বিনায়কও সেই মুসলমানকে বধ করিয়াছেন;. এমন সময় তিনি সেই যুদ্ধ-ক্ষেত্রে তাঁহার কন্যার সম্মুখীন হইলেন। অন্যায় যুদ্ধে স্বামীকে বধ করিয়াছেন বলিয়া অমা তাহার পিতার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিল; কন্যার মুখে এই অভিযোগ শুনিয়া তিনি একেবারে জলিয়া উঠিলেন, তিনি কন্যাকে স্বাতন্ত্র্য-চারিণী বলিয়া গালি দিলেন। অমা তাহার পতিগৃহে পুত্রের নিকট ফিরিয়া যাইতে চাহিল, কিন্তু পিতা তাহাকে তাহার বাগ্‌দত্ত স্বামীর চিতায় সহমরণে যাইবার জন্য আদেশ করিলেন; অমাবাই বলিল, সেই মুসলমানকেই সে পতিত্বে বরণ করিয়াছিল, অন্য পতির কল্পনা করাও তাহাব পাপ। এমন সময় অমাবাইর জননী রমাবাই আসিয়াও কন্যাকে তীব্র ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন এবং জীবাজির চিতায় আরোহণ করিয়া তাহার সঙ্গে অসমাপ্ত বিবাহ আজ সম্পূর্ণ করিতে বলিলেন। অমা অস্বীকৃতা হইল; কিন্তু রমাবাইর আদেশে জীবাজির সৈন্যগণ চিতা সজ্জিত করিয়া তাহাতে জীবাজির দেহের সঙ্গে অমাকেও ভস্মীভূত কবিল, অমা বাগ্‌দত্ত স্বামীর সঙ্গে সহমরণে গেল।

ইহাতে নাট্যকার বিনায়ক রাও'র চবিত্রেব মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করিবার প্রয়াস পাইলেও, সেই দ্বন্দ্ব তেমন উচ্চাঙ্গ নাট্যিক গুণসম্পন্ন হইয়া উঠিতে পারে নাই। মুসলমান কর্তৃক কন্যাপহরণের পর তিনি যেমন অপরাধীর উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে দৃঢ়কল্প হইয়াছিলেন এবং এই দৃঢ়তার গুণেই প্রতিজ্ঞাও রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, যুদ্ধক্ষেত্রে কন্যার সম্মুখীন হইয়াই তাঁহার চরিত্রের সেই দৃঢ়তাগুণ লুপ্ত হইয়া গেল। বাৎসল্য ইহার কারণ হইতে পারে, কিন্তু বাৎসল্য দ্বারা তাঁহার মত চরিত্রের এমন আত্মভ্রষ্টতা জন্মিতে পারে কি না, তাহাও বিচার্য। ধৃতরাষ্ট্রের মনের মধ্যেও এই বাৎসল্যই কার্যকর হইয়াছিল—কিন্তু তাহাও ইহার সুসঙ্গত ধারা কোনদিনই অতিক্রম করিয়া যায় নাই, কিংবা তাহা দ্বারা তাঁহার সমুচিত রাজোচিত মর্যাদাও কোন দিক দিয়া ক্ষুণ্ণ হয় নাই; কিন্তু বিনায়কের কার্যাবলী কোন সুসঙ্গত ধারায়ই অনুবর্তন করে নাই, সমগ্র দৃশ্যটির মধ্যে তাঁহার প্রত্যেকটি কার্য পূর্বাপর সম্পর্কহীন ও পরস্পর বিচ্ছিন্ন বলিয়া মনে হয়,—বহুদিন পর কন্যার সম্মুখীন হইবা মাত্র তাহার পতিকে হত্যা করিবার গ্লানি যেন তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া তাঁহার চরিত্রগত স্থৈর্য নষ্ট করিল। রমাবাইর চরিত্র আদর্শ দ্বারা উদ্বুদ্ধ, কিন্তু তাহার আচরণ পূর্বাপর সম্পর্ক রহিত নহে। সতীত্ব অপেক্ষা নারীর অন্য ধর্ম নাই, বাগ্‌দত্ত স্বামী জীবাজিই অমার পতি, বিধর্মী পতি নহে, এই সকল

বিশ্বাসের মূলে তাহার যে দৃঢ়তা আছে, তাহাই এই চরিত্রটির বিশেষত্ব।

অমার চরিত্র বিশেষত্ব-বর্জিত; মনে হয়, পতিপ্রেম অপেক্ষাও পুত্র-স্নেহ তাহার জীবনে অধিকতর সত্য। পিতার কথায় প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা হিন্দুধর্মের আশ্রয়ে ফিরিয়া আসিতে তাহার কোন আপত্তি ছিল বলিয়া মনে হয় না। একমাত্র বিধর্মীর ঔরসজাত পুত্রই তাহার অন্তরায়। পতি-প্রেম অপেক্ষা পুত্রস্নেহই তাহার মধ্যে বলবত্তর বলিয়া অনুভূত হয়।

'নরক-বাস' নাট্যকবিতাগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা অকিঞ্চিৎকর; কারণ, করুণ-রসের পরিবর্তে ইহাতে বীভৎস রসের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার কাহিনীটি সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া এই বিষয় পরে বিস্তৃত আলোচনা করা যাইবে। 'নরক-বাস'-এর কাহিনীটি এইরূপ—রাজা সোমক রথারোহণ করিয়া স্বর্গে যাইবার পথে নেপথ্য হইতে কাহার আহ্বান শুনিতে পাইলেন, দেবদূতকে রথ থামাইতে বলিয়া চারিদিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু অস্পষ্ট মেঘলোকে কিছুই দেখিতে পাইলেন না; তাঁহার মর্তের পুরোহিত ঋত্বিক নিজের পরিচয় দিয়া কহিলেন যে, বহুকালাবধি তিনি এই নরকে বাস করিতেছেন; রাজা তাঁহাকে তাঁহার এই পাপভোগের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ঋত্বিক বলিলেন, রাজপুত্রকে যজ্ঞে বলি দিবার পাপেই তাহাকে এই নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইতেছে। প্রেতগণ এই কাহিনী শুনিতে চাহিল, তখন রাজা ও ঋত্বিক এই কাহিনী বর্ণনা করিয়া তাহাদিগকে শুনাইলেন—বৃদ্ধ বয়সে সোমকের একমাত্র পুত্রের জন্ম হয়। রাজা পুত্রস্নেহে একদিন রাজকর্তব্য বিস্মৃত হইয়া রাজপুরোহিতকে অবহেলা করেন, কিন্তু পরমুহূর্তেই তাহার জন্য অনুতপ্ত হইয়া ইহার প্রতিবিধান করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। ঋত্বিক পরামর্শ দেন যে রাজা যদি তাঁহার একা-পত্যতার শাপ দূর করিয়া ভবিষ্যতে কর্তব্যকার্যে অবহেলার পথ রোধ করিতে চাহেন, তবে এক যজ্ঞের আয়োজন করিতে হয়। সেই যজ্ঞের অগ্নিতে তাঁহার একমাত্র শিশুপুত্রকে আহুতি দিয়া তাহার ধূম আঘ্রাণ করিলেই মহিষীরা শত পুত্রবতী হইবেন। রাজা তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন, রাজ-পুরোহিত স্বয়ং মাতৃক্রোড় হইতে রাজার শিশুপুত্রকে সবলে আকর্ষণ করিয়া আনিয়া যজ্ঞাগ্নিতে নিক্ষেপ করিলেন। এই কাহিনী স্মরণ হওয়া মাত্র রাজারও আত্মগ্লানি উপস্থিত হইল এবং তিনি নিজেকেও ঋত্বিকের সঙ্গে এই শিশু হত্যার পাপে সমান অংশীদার বলিয়া বিবেচনা করিয়া নরকবাসে তাঁহার

সহচর হইতে প্রার্থনা করিলেন। দেবদূত ও ধর্মরাজের শত অনুরোধেও তিনি স্বর্গের পথে অগ্রসর হইলেন না, নরকেই বাস করিতে লাগিলেন।

নাট্য কাহিনীটি পৌরাণিক হইলেও ইহার মধ্যে কিছু পাশ্চাত্ত্য প্রভাবও আছে। মর্ত্ত্য ও স্বর্গের মধ্যবর্তী স্থানস্থিত যে নরকের পরিকল্পনা ইহাতে করা হইয়াছে, তাহা হিন্দুপুরাণ সম্মত ধারণা নহে, ইহাতে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব বিলক্ষণ অনুভব করা যায়। নরকের বর্ণনায় পাশ্চাত্ত্য ধারণাকে অনুসরণ করিবার রীতি বাংলা সাহিত্যে ইতিপূর্বে মাইকেল মধুসূদন দত্তই প্রবর্তন করিয়াছিলেন, কিন্তু মধুসূদনের বর্ণনা ইহা হইতেও প্রত্যক্ষ।

হিন্দু ধর্মসংস্কারের হৃদয়হীনতা বর্ণনা করিয়া রবীন্দ্রনাথ সমসাময়িক কালেই 'কাহিনী'র অন্তর্গত আরও দুইটি কবিতা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা 'দেবতার গ্রাস' ও 'বিসর্জন'। 'নরক-বাস'ও এই শ্রেণীরই রচনা। হিন্দুধর্মসংস্কারের হৃদয়হীনতা বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথের এই তিনটি রচনাই প্রমান। তবে সংস্কারের বশবর্তী হইয়া অসহায় শিশুহত্যার যে নির্মম চিত্র এই তিনটি রচনার মধ্যে পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যেও বোধ হয় 'নরক-বাসে'র বর্ণনাটিই নিষ্ঠুরতম; এককথায় 'নরক-বাসে'র শিশুহত্যার বর্ণনাটি বীভৎস বলিয়াই সকল শ্রেণীর পাঠকের মনই ইহা হইতে বিমুখ হইতে বাধ্য।

মানুষের অন্তরের সুকুমার বৃত্তিগুলির উপর অহেতুক নির্মম উৎপীড়ন করিলেই প্রকৃত করুণরসের সৃষ্টি হয় না; করুণরসের যে একটা মানবিক আবেদন আছে, বীভৎস রসে তাহা নাই; অসহায় শিশুহত্যার বীভৎসতা বর্ণনায় যে রসের সৃষ্টি হয়, তাহা সাহিত্য-নীতিদ্বারাও সমর্থিত হইবার যোগ্য নহে। অথচ রবীন্দ্রনাথের সংযম ও সৌন্দর্য-সন্ধানী কবিমনও যে কি ভাবে এক এক সময় মানুষের বিকৃতবুদ্ধির প্রতি বিতৃষ্ণায় বিরূপ হইয়া পড়িত, তাহা এই রচনাগুলি হইতেই বুঝিতে পারা যায়। অতএব 'নরক-বাসে'র মত কাহিনী,—যাহার ব্যাপক পৌরাণিক ভিত্তি নাই, এমন কি হিন্দু ধর্ম-সংস্কারের মধ্যেও যাহার স্থান সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হওয়া যায় না, তাহা যে কেবলমাত্র সংস্কারধর্ম পালনের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের অশ্রদ্ধারই অভিব্যক্তি মাত্র, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। হৃদয়ধর্মের বিরুদ্ধে সংস্কারধর্মের যে সংগ্রামের চিত্র তাঁহার পূর্ববর্তী নাট্যকাব্যগুলির মধ্যে পাওয়া যায়, 'কাহিনী'র যুগেও তাহার প্রভাব একেবারে তিরোহিত হয় নাই, বরং এই যুগে ইহাদের ক্ষমতা নষ্ট হইয়াছে। তাহা হইবারও কথা; কারণ, এই যুগের রচনায় নাটক অপেক্ষা

কবিতার গুণ অধিক প্রকাশ পাইয়াছে। সেইজন্যই রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিমন তাহার সংস্কারধর্মের সকল পরিকল্পনাকেই আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। অতএব 'নরক-বাসে'র মধ্যেও শাস্ত্রীয় হিন্দুধর্ম-সংস্কারের যে নির্মমতার চিত্র দেওয়া হইয়াছে, তাহা সংস্কারধর্ম পালনের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথেরই ব্যক্তিগত প্রতিবাদ মাত্র।

বিষয়বস্তু ও আদর্শগত এই সকল ত্রুটি থাকার পরও নরকবাসের চরিত্র পরিকল্পনাও যে উচ্চাঙ্গের হইয়াছে, তাহা বলিতে পারা যায় না। প্রথমেই রাজা সোমকের চরিত্রের কথা বলিতে হয়। কাহিনীর বীভৎসতার সঙ্গে তাহার সম্পর্ক রহিয়াছে বলিয়াই হউক কিংবা নিতান্ত ব্যক্তিত্বের অভাবেই হউক, তাঁহার জীবনের প্রথমাংশ অপরিস্ফুট রহিয়াছে—তাহার চরিত্রের এই অংশে তাহার প্রতিজ্ঞা রক্ষায় যে দৃঢ়তার পরিচয় পাওয়া যায়, অন্যত্র কোন আচরণে তাহার সেই দৃঢ়তার পরিচয় প্রকাশ পায় নাই। প্রেতলোকে ঋত্বিকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পর তাহার চরিত্রগত যে মাহাত্ম্যের পরিচয় দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে, তাহাও অপরিস্ফুট হইয়াছে ; কারণ, ব্রাহ্মণের পাপ ভোগ দেখিয়া তিনি নিজেও উপলব্ধি করিলেন,—

> মত্ত হয়ে ক্ষাত্র অহঙ্কারে
> নিজ কর্তব্যের ত্রুটি করিতে ক্ষালন
> নিষ্পাপ শিশুরে মোর করেছি অর্পণ
> হুতাশনে, পিতা হয়ে। বীর্য আপনার
> নিন্দুক সমাজ মাঝে করিতে প্রচার
> নরধর্ম রাজধর্ম পিতৃধর্ম হায়
> অনলে করেছি ভস্ম।

পুত্রহত্যায় তাহার নিজের দায়িত্বের কথা এইভাবে স্মরণ হইবার ফলেই তাহার আত্মকৃত নরকভোগের গৌরব আপনা হইতে অনেকখানি ম্লান হইয়া যায়। নাট্যকার ঋত্বিকের জন্য পূর্ব হইতেই নরকবাসের ব্যবস্থা করিলেও শেষ পর্যন্ত রাজার উপর এই পাপের দায়িত্ব আরোপ করিয়া তাহাকেও নরকের দ্বার পর্যন্ত টানিয়া আনিয়াছেন—তাহার ফলে স্বর্গ প্রত্যাখ্যান করিয়া স্বেচ্ছায় নরকবাসের প্রার্থনার মধ্যে তাহার যে গৌরব প্রাপ্য ছিল, তাহা হইতেও তাহাকে বহুলাংশে বঞ্চিত করা হইয়াছে।

'কাহিনী' রচনার কয়েক বৎসর পর রবীন্দ্রনাথ আর একখানি নাট্যকবিতা রচনা করেন, তাহার নাম 'বিদায়-অভিশাপ।' ইহা একখানি প্রেম-বিষয়ক

রচনা। দেবগুরু বৃহস্পতির পুত্র কচ দেবতাদিগের আদেশে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের নিকট হইতে সঞ্জীবনী বিদ্যা শিক্ষালাভের জন্য মর্ত্যে আগমন করেন। শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানীর মনস্তুষ্টি বিধান করিয়া কচ শুক্রাচার্যের শিষ্যত্ব লাভ করিতে সমর্থ হন। সহস্র বৎসর কচ দৈত্যগুরুর আশ্রমে অতিবাহিত করেন এবং দেবযানীর সহায়তায় তাঁহার পিতার নিকট হইতে সমগ্র সঞ্জীবনী বিদ্যা উদ্ধার করেন। স্বর্গে প্রত্যাবর্তন করিবার কালে কচ দেবযানীর নিকট হইতে বিদায় লইতে আসিলেন। এই বিদায়ের কাহিনীই নাট্যকবিতাখানিতে বর্ণিত হইয়াছে। কচ দেবযানীর নিকট যখন বিদায় প্রার্থনা করিলেন, তখন দেবযানী কচের অন্তরের অন্তরতম কথাটি জানিতে চাহিলেন। কচ নিজের মনোভাব প্রথমে গোপন করিয়াও, দেবযানীর সুচতুর জিজ্ঞাসায় তাঁহার অন্তরে দেবযানীর প্রতি প্রণয়ানুভূতির কথা প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলেন। দেবযানী কচকে স্বর্গে প্রত্যাবর্তনের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে মিনতি করিলেন; কচ বৃহত্তর কর্তব্যবোধকে ব্যক্তি-অনুভূতির ঊর্ধ্বে স্থান দিয়া তাহাতে অস্বীকৃত হইলেন। অভিমানাহতা হইয়া দেবযানী কচকে অভিশাপ দিলেন যে, যে বিদ্যার জন্য তিনি তাঁহাকে অবহেলা করিলেন, সে বিদ্যা তাঁহার সম্পূর্ণ বশ হইবে না—তিনি অন্যকে তাহা শিখাইতে পারিলেও, নিজে তাহা প্রয়োগ করিতে পারিবেন না। বিনিময়ে কচ তাঁহাকে বর দিলেন যে, দেবযানী সুখী হইবেন।

কাহিনীটি মূলতঃ মহাভারত হইতে গৃহীত হইলেও, কবি ইহার শেষাংশে কচের চরিত্রের উৎকর্ষ নির্দেশ করিবার জন্য সামান্য একটু পরিবর্তিত করিয়াছেন। মহাভারতে আছে কচও দেবযানীকে প্রত্যভিশাপ দিয়াছিলেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এখানে অভিশপ্ত কচকে দিয়া দেবযানীকে বর দেওয়াইয়াছেন।

কাব্যের লক্ষণাক্রান্ত হইয়াও যে এই ক্ষুদ্র রচনাটি নাট্যধর্মী হইয়া উঠিয়াছে, তাহা সহজেই অনুভব করা যায়। কারণ, বিশেষ একটি ভাব ব্যক্ত করাই কাব্যের উদ্দেশ্য, কাব্যের স্থির মানচিত্রের উপর বাহ্য বিক্ষোভের ঘাত-প্রতিঘাত আসিয়া পড়িবার সুযোগ পায় না। 'বিদায়-অভিশাপ'-এর মধ্যে কচের মনোভাব অবগত হইবার জন্য দেবযানীর যে নূতন নূতন জিজ্ঞাসার অবতারণা এবং কচের প্রত্যুত্তরের ভিতর দিয়া দেবযানীর যে সঞ্চারমান ও পরিবর্তিত মনোভাবের অভিব্যক্তি দেখা যায়, তাহা এই ক্ষুদ্র কাব্যখানিকে

নাট্যের মর্যাদা দান করিয়াছে। কৌতূহল, সন্তুষ্টি, আশা, নৈরাশ্য, অভিমান ইত্যাদির ভিতর দিয়া দেবযানীর যে মনোভাব ইহার ভিতর দিয়া ব্যক্ত হইয়াছে, কচের আচরণের বাহ্য আঘাতের প্রতিক্রিয়া রূপেই তাহা সম্ভব হইয়াছে। অতএব ইহার গুণ যে নাট্যিক, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

কাব্যের তৎপর্য ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'পঞ্চভূত' নামক প্রবন্ধ-পুস্তকে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি হইতে এই কবিতাটির নানা প্রকার ব্যাখ্যার উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে যে ব্যাখ্যাটি তাঁহার নিজের সমর্থন লাভ করিয়াছে, তাহা এই—'কচ-দেবযানী সংবাদে মানব-হৃদয়ের এক অতি চিরন্তন এবং সাধারণ বিষাদ-কাহিনী বিবৃত আছে, সেটাকে যাঁহারা অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করেন এবং বিশেষ তত্ত্বকেই প্রাধান্য দেন, তাঁহারা কাব্যরসের অধিকারী নহেন।' (বিচিত্র প্রবন্ধ, ১৩৩৪ ; পৃঃ ২৩১)। প্রকৃত পক্ষে মানবমনের চিরন্তন বৃত্তি প্রেমই এই ক্ষুদ্র নাট্যকাব্যখানির উপজীব্য—ইহাতে কোন তত্ত্বকথা নাই।

অপরিসর ক্ষেত্রের মধ্যেও দেবযানীর চরিত্রটি রবীন্দ্রনাথের এক অনবদ্য সৃষ্টি। দেবযানীর কুমারী-হৃদয়ের আশা-আকাঙ্ক্ষার যে বিচিত্র রূপ কবির দৃষ্টিতে এখানে অনাবৃত হইয়াছে, তাহার অনুভূতি একান্তই মানবিক বলিয়া গভীরভাবে পাঠকের অন্তর স্পর্শ করে। দেবযানীর চরিত্রের এই বাস্তব দিকটাই এই ক্ষুদ্র নাট্যকাব্যখানিকে এক অপরূপ বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে। প্রণয়াস্পদের প্রতি দেবযানীর অভিশাপের বাস্তবমূল্য সম্পর্কে বিচার করিলেও দেখিতে পাই যে, ইহারও অপূর্ব সার্থকতা রহিয়াছে। দেবযানী মানবী, তাঁহার প্রণয়-স্বপ্নজাত সুখ ও প্রণয়-ভঙ্গজাত বেদনা উভয়ই তুল্যরূপে গভীর। যখন তিনি বঞ্চনার আঘাত পাইলেন, তখন তাঁহার নারীহৃদয় স্বভাবতঃই আর্তনাদ করিয়া উঠিল ; ইহার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া রূপেই প্রকাশ পাইল তাঁহার অভিশাপ। কিন্তু কচ-চরিত্রের মধ্যে আদর্শের স্পর্শ রহিয়াছে ; কচ পুরুষের কর্তব্য-নিষ্ঠ জীবনাদর্শের প্রতীক্। পুরুষ যত সহজে স্বভাবকে জয় করিতে পারে, নারী তত সহজে পারে না ; সেইজন্য কচকে আদর্শের প্রতীক্ করাতে ইহার নাট্যিক মূল্যও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। যে মহান্ কর্তব্য সম্পাদন করিবার জন্য কচ মর্ত্যে আগমন করিয়াছিলেন, তাহার সাফল্যের আনন্দে তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ ; সেইজন্য তিনি প্রত্যভিশাপের পরিবর্তে বর প্রদান

করিলেন, আর রিক্তা নারী অন্তরের স্বাভাবিক বেদনায় অভিশাপের অকল্যাণ বর্ষণ করিল। কবিদৃষ্টি লইয়া রবীন্দ্রনাথ মহাভারতোক্ত কাহিনীর এই অংশ এই ভাবে সংশোধন করিয়া লইয়াছেন।

নাট্যকবিতাগুলি আকারে সংক্ষিপ্ত হইলেও অভিনীত হইবার যোগ্য। অনেক ক্ষেত্রে কোন কোন নাট্যকবিতা সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হইয়া থাকে।

রবীন্দ্রনাথের নাট্যকবিতাগুলি তাঁহার 'কাহিনী' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হইলেও ইহাদের মধ্যে কাহিনীগুণ অপেক্ষা কবিতা ও নাটকের গুণই অধিক প্রকাশ পাইয়াছে—প্রকৃত কাহিনী ইহাতে নিতান্ত গৌণ। পুরাণ এবং ইতিহাসাশ্রিত চরিত্রগুলির ঐতিহ্য অনুসরণ করিয়া ইহারা রচিত হইয়াছে বলিয়াই কাহিনীর যে একটি সংস্কার ইহাদের প্রত্যেকটিরই পটভূমিকা আশ্রয় করিয়া ছিল, রবীন্দ্রনাথ এখানে তাহারই সদ্ব্যবহার কবিবার ফলে কাহিনীর ধারা কিংবা ঘটনা বর্ণনা করিবার দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারিয়াছিলেন এবং তাহার স্থলে একান্ত মানসিক দ্বন্দ্ব সংঘাতকেই ভিত্তি করিয়া তিনি ইহাদের রচনা করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন।

'হাস্যকৌতুক' ও 'ব্যঙ্গকৌতুকে'র মধ্যে রবীন্দ্রনাথের যে সকল ক্ষুদ্র কৌতুক-নাট্য সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে 'ব্যঙ্গকৌতুকে'র অন্তর্গত 'বশীকরণ'ই একটি পুর্ণাঙ্গ ক্ষুদ্র নাটিকার মর্যাদা লাভ করিতে পারে। ইহার ঘটনা-সংস্থাপনের মধ্যে উচ্চাঙ্গ হাস্যরসের উপাদান আছে, ব্যক্তি ও সমাজ-বিশেষের প্রতি ইহার মধ্যে বিদ্রূপ ও শ্লেষ প্রকাশ করা হইলেও, তাহা নাটকের মুখ্য বিষয় হইয়া উঠিতে পারে নাই; সেইজন্য কাহিনীর অনাবিল হাস্যরস শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। 'বশীকরণ'-এর কাহিনীটি সংক্ষেপে এই—

অবিবাহিত যুবক আশু তন্ত্রমন্ত্রে বিশ্বাস করে এবং যাহারা ইহার সাধনা করে, তাহাদের নিকট সর্বদা যাতায়াত করিয়া থাকে। অন্নদা ব্রাহ্ম হইয়াছে শুনিয়া তাহার শ্বশুর অন্নদার স্ত্রীকে বিধবার বেশ ধারণ করাইয়া হিন্দুধর্মের বিবিধ আচারপালনের সঙ্গে সঙ্গে তন্ত্রমন্ত্রেও অধিকারিণী করিয়া তুলিলেন। পিতার মৃত্যুর পর অন্নদার স্ত্রী তাঁহার স্বামীর সন্ধান করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন; একবার কলিকাতায় আসিয়া বাইশ নম্বর বাড়ী ভাড়া করিলেন এবং তাঁহার বিদ্যার কথা চারিদিকে প্রচার করিয়া দিলেন—শুনিতে পাইয়া আশু তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে চলিল। বিধবা শ্যামাসুন্দরী তাঁহার কন্যার বিবাহ সন্ধান করিতে কলিকাতায় আসিয়া ৪৯ নম্বর একটি বাড়ীতে উঠিলেন। ঘটকের মধ্যস্থতায় অন্নদার সঙ্গে তাঁহার কন্যার বিবাহের প্রস্তাব হইল, অন্নদা মেয়েটি দেখিতে চলিল। অন্নদার স্ত্রী মাতাজি বলিয়া পরিচিত। ইতিমধ্যে তিনি আকস্মিক সংবাদে ৪৯ নম্বর বাড়ীতে উঠিয়া গেলেন, বাড়ীওয়ালা শ্যামাসুন্দরীকে বাইশ নম্বর বাড়ীতে স্থান দিল। এই আকস্মিক পরিবর্তনের কথা অন্নদা কিংবা আশু কেহই জানিল না। অতএব অন্নদা গিয়া মাতাজির নিকট উঠিল, আশু শ্যামাসুন্দরীর বাড়ী গেল। মাতাজি অন্নদাকে দেখিবামাত্রই চিনিতে পারিল এবং অন্নদাকে বশীকরণের মন্ত্র পড়াইয়া নিজের পরিচয় প্রকাশ করিয়া দিল। অন্নদা স্ত্রীকে আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করিল। এদিকে আশুকেই প্রস্তাবিত পাত্র বিবেচনা করিয়া শ্যামাসুন্দরী তাহার সঙ্গে সেইরূপই ব্যবহার করিলেন, আশু মেয়েটিকেও দেখিল। নিজের ভুল বুঝিতে আশুর দেরি

হইল না, অন্নদার নিকট ছুটিয়া গিয়া এই ভুল সংশোধন করিতে চাহিল ; কিন্তু গিয়া দেখিল, তাহার আর উপায় নাই। মেয়েটিকে দেখিয়া আশু আগেই মুগ্ধ হইয়াছিল, অবশেষে তাহাকে বিবাহ করিতে সে নিজেই আর কোন আপত্তি করিল না।

এই নাটকের মধ্যে যদিও পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি ও তাঁহার শিষ্য চন্দ্রনাথ বসু কৃত হিন্দুধর্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার প্রতি কটাক্ষপাত করা হইয়াছে, তথাপি তাহা নাটকের মধ্যে মুখ্য স্থান অধিকার করিয়া ইহার অনাবিল হাস্যরসের স্রোতে কোন কার্যকরী বাধা সৃষ্টি করিতে পারে নাই। ইহা প্রকৃতপক্ষে একটি মনোরম comedy of error বা ভ্রান্তিবিনোদ। ইহার ভ্রমোৎপাদনের মূলে কোনরূপ পীড়াদায়ক অসঙ্গতি না থাকায় ইহা যেমন সহজেই আকর্ষণীয় হইয়া উঠিয়াছে, আবার ইহার পরিণতিটি পরম সুখকর বলিয়া তাহাও মনের উপর একটি গভীর রসোজ্জ্বল রেখাপাত করিতে সমর্থ হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী প্রহসনগুলির মধ্যেও কাহিনীগুণে ইহার সমকক্ষ আর কোন রচনা নাই। অথচ 'বশীকরণ' রবীন্দ্র-সাহিত্যে সুপরিচিত রচনা নহে।

'বশীকরণ'-এর কথা বাদ দিলে রবীন্দ্রনাথের আর তিনখানি মাত্র রঙ্গনাট্য উল্লেখযোগ্য—'গোড়ায় গলদ', 'বৈকুণ্ঠের খাতা' ও 'চিরকুমার সভা'। অনতি-কাল ব্যবধানেই এই তিনখানি রঙ্গনাট্য রচিত হইয়াছিল। সেইজন্য ইহাদের বিষয় ও ভাবগত অনৈক্য খুব বেশি নাই। তিনখানি নাটকের মধ্যেই বিবাহ-সমস্যাকে প্রধান উপজীব্য করা হইয়াছে। এই বিবাহ সংঘটনের দিক দিয়া 'গোড়ায় গলদে' সামান্য বৈচিত্র্য থাকিলেও, 'বৈকুণ্ঠের খাতা' ও 'চির-কুমার সভা'য় এ বিষয়ে বিশেষ অনৈক্য দেখিতে পাওয়া যায় না,—উভয় ক্ষেত্রেই ভগিনীপতির অবিবাহিতা শ্যালিকার বিবাহ-সমস্যা লইয়াই নাটকের সূত্রপাত হইয়াছে এবং কৌশল অবলম্বন দ্বারা বিবাহ-কার্য শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নাটকের যবনিকা পাত হইয়াছে। এই বিষয়ে 'বশীকরণ'-এর সঙ্গেও এই নাটক তিনখানির বিষয় ও ভাবগত ঐক্য আছে। অতএব দেখা যাইতেছে, রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালী জীবনের বহুবিস্তৃত ক্ষেত্র তাঁহার রঙ্গনাট্যের পটভূমিকারূপে ব্যবহার করিতে পারেন নাই—এই বিষয়ে তাঁহার দৃষ্টি নির্দিষ্ট সমাজের সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যেই আবদ্ধ হইয়া ছিল। এই বিষয়ে বৈচিত্র্যের অভাব যে ইহাদের পাঠকমন ঈষৎ পীড়িত না করে, তাহা বলিতে পারা

যায় না। বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথ যে-সমাজ অবলম্বন করিয়া এই তিনখানি রঙ্গনাট্য রচনা করিয়াছেন, তাহাও এক এবং অভিন্ন—কলিকাতার নাগরিক সভ্যতার এক অভিজাত সমাজ-জীবনই তাঁহার এই রঙ্গনাট্যগুলির উপজীব্য। ইহার কারণ, রবীন্দ্রনাথ প্রধানতঃ জীবন্ত চরিত্র সম্মুখে রাখিয়াই তাঁহার রঙ্গনাট্যের চরিত্রগুলি পরিকল্পনা করিয়াছেন। বৃহত্তর সমাজ-জীবনের সঙ্গে তাঁহার প্রত্যক্ষ পরিচয়ের ক্ষেত্র খুব বিস্তৃত ছিল না, সেইজন্য কেবলমাত্র নিজের পারিবারিক জীবন কেন্দ্র করিয়াই প্রধানতঃ তিনি এই চরিত্রগুলি পরিকল্পনা করিয়াছেন। যাঁহারা বস্তুনিষ্ঠ নাট্যকার, তাঁহারা জীবন্ত চরিত্র সম্মুখে রাখিয়া তাহাদিগকে আদ্যোপান্তই নিখুঁত করিয়া রূপায়িত করিতে পারেন, দীনবন্ধু মিত্রই তাহার প্রমাণ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের একটি প্রধান ত্রুটি এই ছিল যে, কোন প্রত্যক্ষদৃষ্ট জীবন অবলম্বন করিয়া তাঁহার চরিত্র-পরিকল্পনার সূত্রপাত হইলেও, শেষ পর্যন্ত তিনি তাহাদের বাস্তবধর্ম রক্ষা করিতে পারিতেন না—তাঁহার নিজস্ব কল্পনাও আসিয়া তাহাতে যোগ দিত। সেইজন্য দীনবন্ধুর চরিত্রগুলি যেমন কোনটি কে, তাহা অনেক সময় আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিতে পারা যায়, রবীন্দ্রনাথের চরিত্রগুলি তাহা পারা যায় না। দীনবন্ধুর পরিকল্পনা আনুপূর্বিক বাস্তব, রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পনা বাস্তব ও কল্পনা মিশ্রিত। তাঁহার পরিকল্পিত একই চরিত্রের মধ্যে তাঁহার পরিচিত বিভিন্ন চরিত্রের বিবিধ গুণাবলীর সঙ্গে নিজস্ব মতবাদ আসিয়াও সংমিশ্রণ লাভ করে। ইহার ফলে যদিও অনুভব করিতে মোটেই বেগ পাইতে হয় না যে, রবীন্দ্রনাথের রঙ্গ-নাট্যের প্রায় প্রত্যেকটি চরিত্রই জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে একদিন যাতায়াত করিত, তথাপি কোনটি যে কে, তাহা সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা যায় না। 'চিরকুমার সভা'র এক চন্দ্রবাবুর মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ বসু ও নাট্যকারের নিজস্ব কতকটা চরিত্রগুণ আসিয়া মিশিয়াছে, 'নির্মলা'র মধ্যে সরলা দেবীর অস্পষ্ট ছায়া মাত্র অনুভূত হয়, অক্ষয়ের মধ্যে অক্ষয় চৌধুরীর কতকটা গুণ মাত্র অনতিপরিস্ফুট হইয়াছে। কিন্তু ইহাদের কাহারও মধ্য দিয়াই তাঁহার প্রত্যক্ষদৃষ্ট আনুপূর্বিক একটি চরিত্র সম্যক্ বিকাশ লাভ করে নাই।

সর্বপ্রথম আনুপূর্বিক গদ্যে রচিত রবীন্দ্রনাথের পূর্ণাঙ্গ নাটক 'গোড়ায় গলদ'। ইহা একখানি প্রহসন। 'গোড়ায় গলদে'র মধ্যে শ্লেষ বা ব্যঙ্গের কোন লক্ষণ নাই, ইহা অনাবিল হাস্যরসের ধারায় সমুজ্জ্বল। 'মানসী'র প্রায় দুই বৎসর পর

'গোড়ায় গলদ' রচিত হয়, 'মানসী'র ব্যঙ্গাত্মক কবিতাগুলির ঐতিহাসিক ভিত্তি যাহাই থাকুক না কেন, তাহাদের সঙ্গে 'গোড়ায় গলদে'র কোন যোগ নাই। 'গোড়ায় গলদ' কোন উদ্দেশ্যমূলক রচনা নহে, কিংবা রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কোন সামাজিক মনোভাব ইহার মধ্য দিয়াও ব্যক্ত হইবার অবকাশ পায় নাই। ইহার একটি মূল্য এই যে, বাংলার প্রত্যক্ষ সমাজ-জীবন হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া ইহাই রবীন্দ্রনাথের সর্বপ্রথম নাট্যরচনা। এমন কি, কয়েকটি ছোটগল্প বাদ দিলে ইহার পূর্বে রবীন্দ্রনাথ বাংলার সমাজ-বিষয়ক আর কোন রচনা প্রকাশ করেন নাই। ইহার কাহিনীভাগ সংক্ষেপে এই—

বিনোদবিহারী, নলিনাক্ষ, চন্দ্রকান্ত, ললিত, নিমাই ইহারা পরম বন্ধু। ইহাদের মধ্যে কেবলমাত্র চন্দ্রকান্ত বিবাহিত, অন্য সকলেই অবিবাহিত নব-যুবক ; কিন্তু বিবাহ সম্বন্ধে কেহই উদাসীন নহে, এই বিষয় লইয়া তাহাদের মধ্যে আকাশ-কুসুম কল্পনার অন্ত নাই। চন্দ্রকান্তর প্রতিবেশীর নাম নিবারণ। নিবারণের কন্যা ইন্দুমতী ও নিবারণের এক পরলোকগত বন্ধুর কন্যা কমলমুখী উভয়েই নিবারণেব বাড়ীতে থাকিয়া লেখাপড়া গানবাজনা শিখিয়াছে—বয়সের দিক দিয়া উভয়েই একটু বাড়িয়াও গিয়াছে, এখনও তাহাদের বিবাহের কিছু হয় নাই। একদিন চন্দ্রকান্তব বাড়ীতে বসিয়া চারি বন্ধু কল্পিত দাম্পত্য জীবনের স্বপ্নে বিভোর, এমন সময় পাশের বাড়ী হইতে নারীকণ্ঠে অপূর্ব সঙ্গীত শ্রুত হইল। তৎক্ষণাৎ বিনোদবিহারী স্থির করিল, সেই মেয়েটিকেই সে বিবাহ করিবে। বিনোদবিহারী কবি, তাহার প্রকৃতির মধ্যে সংসারের আর দশজনের নিয়মেব ব্যতিক্রম ছিল। সে সকলকে লইয়া গিয়া নিবারণের বন্ধুকন্যা কমলমুখীর সঙ্গে নিজের বিবাহ স্থির করিয়া আসিল। ইতি-পূর্বেই চন্দ্রকান্তর অন্যতম বন্ধু নিমাইর পিতা শিবচরণ পুত্রের অজ্ঞাতেই নিবারণের কন্যা ইন্দুমতীর সঙ্গে নিমাইর বিবাহ স্থির করিয়া গিয়াছেন। চন্দ্রকান্ত তাহার বন্ধুদিগকে লইয়া যখন নিবারণের বাড়ীতে গেল, তখন ইন্দুমতী পাশের ঘর হইতে নিমাইকে দেখিল, দেখিয়া তাহার প্রতি আসক্ত হইল ; কিন্তু সে ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারিল না যে, তাহার সঙ্গেই তাহার বিবাহের সম্পর্ক স্থির হইয়াছে। একদিন নিমাই চন্দ্রকান্তর বাড়ীতে ইন্দুমতীকে দৈবাৎ দেখিতে পাইল, দেখিয়া তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইল ; কিন্তু নিমাই জানিল যে, তাহার নাম কাদম্বিনী এবং সে বাগবাজারের চৌধুরী পরিবারের মেয়ে—তাহার সঙ্গেই যে নিমাইর বিবাহ স্থির হইয়াছে, তাহা

সেও জানিতে পারিল না। যথাসময়ে বিনোদের সঙ্গে কমলের বিবাহ হইয়া গেল। চন্দ্রকান্তর স্ত্রীর নাম কান্তমণি। তাহার সঙ্গে ইন্দুমতীর বড় ভাব। ইন্দুমতী কান্তর নিকট হইতে নিমাইর সন্ধান লইতে লাগিল, কিন্তু ভ্রমক্রমে জানিতে পারিল, তাহার নাম ললিত; নিমাই বলিয়া তাহাকে চিনিল না। নিমাই তাহার পিতার নিকট হইতে শুনিতে পাইল যে, তাহার পিতার বাল্যবন্ধুর কন্যার সঙ্গে তাহার বিবাহ স্থির হইয়াছে; শুনিয়া সে এই বিবাহ সম্বন্ধে অনিচ্ছা প্রকাশ করিল এবং কাদম্বিনীর দর্শনাকাঙ্ক্ষায় বাগবাজার অঞ্চলে ঘোরাঘুরি করিতে লাগিল। পিতা তাহার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া অগত্যা বাগবাজারের চৌধুরী পরিবারের এক মেয়ের সঙ্গেই তাহার বিবাহ স্থির করিলেন। ক্রমে নিমাইর ভুল ভাঙ্গিয়া গেল; সে বুঝিতে পারিল, নিবারণের কন্যা ইন্দুমতীকেই সে বাগবাজারের চৌধুরীদের কাদম্বিনী বলিয়া এতকাল ভুল করিয়া আসিয়াছে, সেইজন্য সে পিতার এই প্রস্তাব অস্বীকার করিল এবং পূর্ব প্রস্তাবে সম্বন্ধেই সম্মতি দিল। শিবচরণবাবু চৌধুরীদের কথা দিয়া আসিয়াছিলেন, তিনি এইবার বড়ই বিপন্ন বোধ করিলেন। বাগবাজারের চৌধুরীরা বিশেষ সঙ্গতিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন, কন্যার রূপের অভাব ধন দ্বারা পূর্ণ করিয়া তাঁহারা ললিতকে জামাতারূপে লাভ করিলেন। শিবচরণবাবু নিষ্কৃতি পাইলেন। ইন্দুমতীও যথাসময়ে তাহার ভুল বুঝিতে পারিয়াছিল। নিমাইর সঙ্গে তাহার মিলনের পথে আর কোন বাধা রহিল না।

মূল নাট্যকাহিনীর মধ্যে আর একটি উপকাহিনী আছে, তাহা বিনোদ ও কমলমুখীর কাহিনী। মূল কাহিনীব সঙ্গে ইহার যোগ খুব নিবিড় বলিয়া অনুভূত না হইলেও, ইহার মধ্যেও হাস্যরসের ধারাটি অব্যাহত রহিয়াছে।

এই নাটক আদ্যোপান্ত একটি comedy of error বা ভ্রান্তিবিনোদ। ইন্দুমতী নিমাইকে চিনিতে ভুল করিল, নিমাইও ইন্দুমতীকে চিনিতে ভুল করিল, এই দুই জনের ভুল করার উপরই সমগ্র নাট্যকাহিনীর ভিত্তি। এই অবস্থায় ভুল করার ব্যাপারটা যতখানি সঙ্গত ও স্বাভাবিক করিয়া সৃষ্টি করা যায়, নাট্যকারের উদ্দেশ্যও ততখানি সফল হইতে পারে।

বাংলায় যে শ্রেণীর রচনাকে প্রহসন বলা হয়, তাহার সঙ্গে যে ইংরেজী comedyর পার্থক্য আছে, তাহা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারা যায়। আর্ট হিসাবে বাংলা প্রহসন ইংরেজী comedy হইতে নিম্নস্তরের। প্রহসনের মধ্যে চরিত্রসৃষ্টির দায়িত্ব অপেক্ষা ঘটনা-বিন্যাসের দায়িত্ব বেশী। দৈনন্দিন জীবনের

ছোটখাট ভুলভ্রান্তি, ব্যক্তি-চরিত্রের ছোটবড় দুর্বলতা, এই সবই প্রহসনের ভিত্তি হইয়া থাকে—এই ভুলভ্রান্তি এবং দুর্বলতাগুলি নিতান্ত স্বাভাবিক পরিবেশের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিতে হয়, কিন্তু তাহা এমন স্তরের হওয়া বাঞ্ছনীয়, যাহার উপর একটা সমগ্র কাহিনীর ভিত্তি সহজেই স্থাপিত হইতে পারে। এই দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে, 'গোড়ায় গলদ'-এর মধ্যে যে ভ্রান্তি উপজীব্য করা হইয়াছে, তাহার উপর একটা পূর্ণাঙ্গ নাট্যকাহিনীর ভিত্তি স্থাপিত হইতে পারে না। নিমাইকে ইন্দুমতীর ললিত বলিয়া ভুল করিবার কারণটি খুব সঙ্গত বলিয়া মনে করা যায় না। কারণ, ললিতের আচারে ব্যবহারে কিছুতেই মনে হইতে পারে না যে, সে চন্দ্রকান্তর একজন নিত্য সঙ্গী। প্রকৃতপক্ষে নাটকের মধ্যেও তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ নাটকের প্রথম অঙ্ক প্রথম দৃশ্যের যে কয়টি বন্ধু বিনোদের বিবাহের প্রস্তাব লইয়া নিবারণের বাড়ী গিয়াছিল, তাহাদের সকলের চেহারা ক্ষান্তমণি চোখে না দেখিলেও, কথাবার্তা কানে শুনিয়াছে। যে ললিত কথায় কথায় এত ইংরেজী বকিয়া থাকে, তাহাকে ক্ষান্তমণির ভুল করিবার কোন সঙ্গত কারণ ছিল না। অথচ এই ক্ষান্তমণির ভুলের উপরই ইন্দুমতীর ভুল হইয়াছে। নিমাইর ইন্দুমতীকে বাগবাজারের কাদম্বিনী বলিয়া ভুল করিবার কারণটি ততোধিক অসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। ইহার কারণ বিস্তৃত করিয়া উল্লেখ করিবারও প্রয়োজন নাই। ইহারা পরস্পর পরস্পরকে চেহারায় চেনে; পরস্পরের সঙ্গে শুধু দেখা সাক্ষাৎই নয়, আলাপ-পরিচয় পর্যন্ত আছে, তথাপি নাম সম্বন্ধে তাহাদের মধ্যে যে একটা ভ্রান্ত ধারণা গোড়াতেই জন্মিয়াছে, তাহা নাট্য-কাহিনীর মধ্যে খুব কার্যকরী বলিয়া মনে হয় না। যেখানে সাধারণ একটা ভুলের উপর সমগ্র কাহিনীর ভিত্তিস্থাপন করা হইয়াছে, সেখানে ভুলের কারণটি যদি খুব সুস্পষ্ট ও সুসঙ্গত না হয়, তবে কাহিনীর উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। এখানেও যে কতকটা তাহাই হইয়াছে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

কাহিনী হিসাবে 'গোড়ায় গলদে'র অন্যতম গুরুতর ত্রুটি বিনোদ ও কমলমুখীর প্রসঙ্গ। মূল কাহিনীর মধ্যে তাহাদের স্থান যে খুব প্রশস্ত তাহা বলিতে পারা যায় না। বিনোদ এম. এ. পাশ করিয়া বি. এল্. পড়িতেছে, একটা ঝোঁকের মাথায় বিবাহ করিয়া ফেলিয়া পরে স্ত্রীকে আর পোষাইতে পারিতেছে না বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছে। তারপর সহসা তাহার স্ত্রী এক বিপুল পিতৃসম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইয়া পড়িয়া এই ঐশ্বর্যদ্বারাই স্বামীকে

পুনরায় আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছে। এই সকল বিষয় কেবল অসম্ভব বলিয়াই অবিশ্বাস্য। একটি দৃশ্যের মধ্যে ইহাদের আচরণ একেবারে অসম্ভাব্যতার চরমে উঠিয়াছে,—দৃশ্যটি চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্য। ঘোম্‌টা পরিয়া কমলমুখী তাহার স্বামী বিনোদের সঙ্গে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা করিল, অথচ বিনোদ তাহাকে চিনিতে পারিল না। ইহা বড়ই বিসদৃশ মনে হয়। ইহা দ্বারা যে হাস্যরসের সৃষ্টি হয়, তাহাও খুব উচ্চাঙ্গের বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। নিবারণ কমলমুখীর পরিচয় দিতে গিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, কমলমুখীর পিতা বিশেষ কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই, সেইজন্য বিবাহে তিনি আশানুরূপ ব্যয় করিতে অক্ষম। নিবারণের সাধুতায় সন্দেহ করিবার কিছুই ছিল না; এই অবস্থায় স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্ত হওয়ার পরই সহসা কমলমুখীর বিপুল পিতৃ-সম্পত্তি লাভ নিতান্ত অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়। পূর্বেই বলিয়াছি যে, ক্ষীণতম ভ্রান্তির উপর নাটকখানির ভিত্তি স্থাপন করা হইয়াছে। কেবলমাত্র ভ্রান্তির অকিঞ্চিৎকরত্বই নহে, ইহার অহেতুকত্বও এই নাট্যকাহিনীর অন্যতম গুরুতর ত্রুটি।

পূর্বেই বলিয়াছি, ইংরেজি comedy ও বাংলা প্রহসন এক বস্তু নহে, ইংরেজি comedy-তে চরিত্রসৃষ্টির যে দাবি আছে, বাংলা প্রহসনে তাহা নাই। তথাপি প্রহসন জাতীয় রচনায় সার্থক ঘটনা-বিন্যাসের সঙ্গে যদি চরিত্রসৃষ্টিরও পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহা রচনার উৎকর্ষেরই কারণ হয়। দীনবন্ধু মিত্রের প্রহসন মাত্রেরই ইহা একটি সাধারণ গুণ।

'গোড়ায় গলদে'র মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য চরিত্র শিবচরণের। শিবচরণ পিতা। তাহার মত ও বিশ্বাসের মধ্যে একটা অনমনীয় দৃঢ়তা আছে, বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্রের উপর তাঁহার অভিভাবকত্বের যে পরিচয়টি প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাও দৃঢ়তাব্যঞ্জক। বিবাহ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ বা অবিবাহিতের কোন মত কিংবা কোন ভালমন্দ বিচারশক্তি থাকিতে পারে, তাহা তিনি বিশ্বাস করেন না; এই বিশ্বাস না করার মধ্যে তাঁহার যে দৃঢ়তা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা পরম কৌতুককর হইয়াছে। তিনি নিজে দীর্ঘ বিবাহিত জীবনের অভিজ্ঞতা দ্বারা এ সম্বন্ধে যে সত্য লাভ করিয়াছেন, তাহাই এ'বিষয়ে একমাত্র সত্য। বিবাহ ব্যাপারটা তাঁহার মতে নিতান্তই সামান্য একটা ব্যাপার। ভিতর হইতে পুত্রের প্রতি তাঁহার স্নেহের দুর্বলতা ও বাহির হইতে

শাসনের কঠোরতা—এই উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া তাঁহার চরিত্রটি সার্থক পরিকল্পিত হইয়াছে।

এই নাটকে আর কোন চরিত্র তেমন সার্থকতা লাভ করিতে পারে নাই। এ সম্পর্কে নিবারণের চরিত্রটির কথা কাহারও মনে হইতে পারে। কিন্তু তাহা খুব স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই; ইহাতে পূর্বাপর সামঞ্জস্যের কিছু অভাব আছে। তাঁহাকে প্রথম দেখিয়া সাধু ও বিষয়জ্ঞানশূন্য বলিয়াই মনে হয়, কিন্তু তাঁহার পরবর্তী আচরণে তাঁহার চরিত্রের এই দিকটা রক্ষা পায় নাই। কমলমুখীকে তিনি আজীবন গরীবের মেয়ে বলিয়া পরিচয় দিয়া আসিয়া স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্ত হওয়ার পর সহসা সাধুতায় উদ্বুদ্ধ হইয়া তিনি তাহার বিপুল পিতৃসম্পত্তি তাহার হাতে তুলিয়া দিলেন। যদিও তিনি বলিয়াছেন যে, কমলের পিতা বলিয়া গিয়াছিলেন, তাহার কুড়ি বৎসর বয়স হইলে তাহার হাতে যেন সম্পত্তির ভার দেওয়া হয়, তথাপি নিতান্ত নিজের প্রয়োজনীয়তার অনুরোধেই যে নাট্যকার এখানে এ'কথার অবতারণা করিয়াছেন, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। এই উক্তি দ্বারা নিবারণের চরিত্রের অসামঞ্জস্য যে কিয়ৎপরিমাণে লাঘব হইয়াছে, তাহাও মনে হইতে পারে না।

স্ত্রীচরিত্রগুলির মধ্যে ক্ষান্তমণির চরিত্রটি সংক্ষিপ্ত হইলেও সার্থক। তাহার চরিত্রের মধ্য দিয়া যে একটি নিখুঁত বাস্তব পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাই ইহার প্রধান গুণ। কিন্তু তাহার চরিত্রের মধ্যে একমাত্র তাহার দাম্পত্য জীবনের অংশটিই উজ্জ্বলতম দেখিতে পাওয়া যায়, অন্যান্য অংশ নিতান্ত নিষ্প্রভ, তবে তাহা নাটকের মধ্যে খুব সংক্ষিপ্ত।

রবীন্দ্রনাথ যখন 'গোড়ায় গলদ' নাটকখানি রচনা করিয়াছিলেন, তখনও স্ত্রীশিক্ষার দিক দিয়া বাংলার সমাজ বিশেষ অগ্রসর হইতে পারে নাই; স্ত্রীসমাজে উচ্চশিক্ষা তখন পর্যন্ত একেবারেই প্রবেশ করে নাই এবং এ'সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ কোন অভিজ্ঞতাও থাকিবার কথা নহে। তাঁহার নিজের পরিবারে যে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত ছিল, তাহার প্রকৃতি স্বতন্ত্র। এই অবস্থায় তিনি ইন্দুমতী ও কমলমুখীকে উচ্চশিক্ষিতা বলিয়া কল্পনা করিয়াও, তাহাদের চরিত্র প্রকৃত উচ্চশিক্ষার আদর্শ দ্বারা গঠন করিতে পারেন নাই। প্রকৃত উচ্চশিক্ষিতা নারী সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ধারণা তখনও স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই। ইন্দুমতীর আচরণে প্রকৃত উচ্চশিক্ষার কোন প্রভাব

দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহার উচ্চশিক্ষার পরিচয় কেবলমাত্র অপরিচিত পুরুষের সহিত অসংযত প্রগল্‌ভতার মধ্য দিয়াই প্রকাশ পাইয়াছে। চাপকান-পরিহিতা ইন্দুমতী প্রথম দর্শনেই অপরিচিত নিমাইর সহিত যে আচরণ করিয়াছে, তাহা কোনমতেই তাহার উচ্চশিক্ষার যোগ্য আচরণ বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে না। অতঃপর নিমাইর কবিতার খাতা লইয়াও ইন্দুমতী নিমাইর সঙ্গে যে আচরণ করিয়াছে, তাহাও তাহার পরিচয়ানুযায়ী হয় নাই। এই হিসাবে কমলমুখীর চরিত্র বরং অনেকটা সংযত ও তাহার পরিচয়ানুযায়ী হইয়াছে; তথাপি তাহার আচরণের মধ্যে কতকগুলি অসম্ভব ঘটনা আরোপ করা হইয়াছে বলিয়া ইহারও সম্যক্ রসস্ফূর্তি হইতে পারে নাই।

'গোড়ায় গলদে'র এই সকল ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও, ইহার বিশেষ কতকগুলি গুণ সম্পর্কেও উদাসীন থাকা যায় না তাহাদের মধ্যে প্রধান এই যে, ইহাই রবীন্দ্রনাথের একমাত্র নির্দোষ হাস্যরসাত্মক রচনা—ইহার মধ্যে ব্যঙ্গবিদ্রূপ বা শ্লেষের কোন পরিচয় নাই, তাঁহার পরবর্তী প্রহসনগুলি এই ত্রুটি হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত নহে। ইংরেজীতে যাহাকে প্রকৃত humour বলে রবীন্দ্রসাহিত্যে তাহার নিদর্শন সন্ধান করিতে হইলে, এই 'গোড়ায় গলদ' ব্যতীত অন্যত্র তাহা খুব সুলভ হইবে না। পূর্বেই বলিয়াছি, রবীন্দ্রনাথের হাস্যরসাত্মক রচনা ইংরেজি সংজ্ঞায় wit ও satire-এরই অন্তর্ভুক্ত, humour-এর অন্তর্ভুক্ত নহে—'গোড়ায় গলদ'ই রবীন্দ্রসাহিত্যে নির্দোষ হাস্যরসাত্মক বা humour জাতীয় রচনার একটি দুর্লভ নিদর্শন। যদিও ইহার সংলাপের মধ্যে অনেক স্থলেই চরিত্রসমূহের অপরিসীম উপস্থিতবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়, তথাপি এ'কথা সত্য যে, এইগুণে ইহা তাঁহার পরবর্তী প্রহসন 'বৈকুণ্ঠের খাতা' ও 'চিরকুমার সভা'র মত এতদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই; বাগবৈদগ্ধ্য ইহার মধ্যে থাকিলেও, তাহা তখনও 'হিউমরে'র পর্যায় ছাড়াইয়া 'wit'-এর পর্যায়ে উঠিতে পারে নাই; ইহার সংলাপের মধ্যে প্রধানতঃ প্রত্যক্ষোক্তিরই (directness of expression) পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষতঃ একমাত্র সংলাপের মধ্যেই নাটকের সকল রস সংহত হইয়া নাই, ঘটনারাশির মধ্যেই তাহা প্রধানতঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। ইহা বিবেচনা করিয়া রবীন্দ্রনাথের অন্ততঃ এই রচনাটিকে তাঁহার পরবর্তী হাস্যরসাত্মক রচনার সমধর্মী বলিয়া নির্দেশ করা যায় না। শাণিত ক্ষুরধারের মত বুদ্ধিদীপ্ত রসচৈতন্যের তখনও

তাঁহার মধ্যে উদ্ভব হয় নাই, সেইজন্যই ইহা 'হিউমারে'র পর্যায়ে উত্তীর্ণ হইয়া যাইতে পারে নাই। রবীন্দ্রনাথের মনে তখনও সমাজ ও ব্যক্তিচরিত্র সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট আদর্শবোধ গড়িয়া উঠে নাই বলিয়াই ইহার পরিকল্পনাটি তখনও তিনি তাঁহার ব্যক্তিচৈতন্যের প্রভাব হইতে মুক্ত রাখিতে পারিয়াছিলেন, সেইজন্যই ইহা ব্যঙ্গাত্মক হইয়া উঠিতে পারে নাই। কিন্তু সেই যুগে প্রবেশ করিতে রবীন্দ্রনাথের আর অধিক বিলম্বও নাই।

'গোড়ায় গলদে'র যেসকল ত্রুটির কথা উল্লেখ করা গেল, তাহাদের কতক সংশোধন করিয়া চত্রিশ বৎসর পর রবীন্দ্রনাথ ইহার একটি সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশ করেন, তাহার নাম দেওয়া হয় 'শেষ রক্ষা'। 'গোড়ায় গলদে'র গোড়াকার ভুলের অকিঞ্চিৎকরত্ব উপলব্ধি করিতে পারিয়াই বোধহয় রবীন্দ্রনাথ 'শেষ রক্ষা'য় নাট্যকাহিনীর সর্বশেষ পরিণতির উপর জোর দিয়াছেন। 'গোড়ায় গলদে'র নিমাইয়ের নামটি পরিবর্তিত করিয়া 'শেষ রক্ষা'য় গদাই রাখা হইয়াছে। ভূমিকা-লিপির দিক হইতে আর বিশেষ কোন পরিবর্তন করা হয় নাই। 'শেষ রক্ষা' 'গোড়ায় গলদ' হইতে অধিকতর অভিনয়-সাফল্য লাভ করিয়াছে। কারণ, ইহাতে ঘটনাবিন্যাস অধিকতর সংহত, সংলাপ সংক্ষিপ্ত ও অধিকতর প্রত্যক্ষগুণ-সম্পন্ন করা হইয়াছে। কিন্তু ঘটনা-বিন্যাসের দিক দিয়া ইহার উন্নতি সাধিত হইলেও চরিত্র-পরিকল্পনায় মৌলিক ত্রুটিগুলির কোন সংশোধন করিবার প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায় না।

'গোড়ায় গলদে'র পরই রবীন্দ্রনাথের 'বৈকুণ্ঠের খাতা' প্রকাশিত হয়। ইহা রবীন্দ্রনাথের গদ্যগ্রন্থাবলীতে 'প্রহসন' শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। কিন্তু 'বৈকুণ্ঠের খাতা' 'গোড়ায় গলদে'র মত অবিমিশ্র প্রহসন নহে, ইহার মধ্যে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত যে একটি প্রচ্ছন্ন করুণ রসের আবেদন আছে, তাহা এই ক্ষুদ্র রঙ্গনাট্যখানিকে এক অপূর্ব স্বাতন্ত্র্য দান করিয়াছে। 'গোড়ায় গলদ' ও 'বৈকুণ্ঠের খাতা'র মধ্যে বাহিরের দিক হইতে কতকটা ঐক্য অনুভব করা গেলেও, ইহাদের অন্তরগত পরিচয়ে সুদূর পার্থক্যও লক্ষ্য করিবার বিষয়। আলোচনার সুবিধার জন্য ইহাদিগকে এক অধ্যায়ভুক্ত করা হইলেও, বিস্তৃত বিশ্লেষণ দ্বারা ইহাদের পার্থক্য অনুভব করা যাইতে পারে। 'বৈকুণ্ঠের খাতা'র কাহিনীটি সংক্ষেপে এই—

বৈকুণ্ঠ বিষয়বুদ্ধিহীন লোক, জীবনে তাঁহার একমাত্র নেশা লেখা, ভারতীয় প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্র সম্বন্ধে তিনি একখানি বই লিখিতেছেন এবং তাহা লইয়াই

দিবারাত্র মত্ত হইয়া আছেন। বিপত্নীক জীবনে তাঁহার বিধবা কন্যা নীরু বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার সেবাযত্নের ভার লইয়াছে। ভাই অবিনাশও দাদাকে বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তি করিয়া থাকে। অবিনাশের বয়স হইয়াছে, সংসার-বুদ্ধিহীন বৈকুণ্ঠ এখনও তাহার বিবাহ দেন নাই। সে চাকুরি করিয়া অর্থও যথেষ্ট উপার্জন করে; তাহারও একটি নেশা আছে—তাহা গাছের নেশা; রাজ্যের যত উড়ে মালী লইয়া বাগানে নানা জাতীয় গাছপালা লাগাইয়া সে অবসর সময় কাটায়। তাহাদের পুরাতন ভৃত্য ঈশানই প্রকৃতপক্ষে এই সংসারটির অভিভাবক। কেদার এক অতি ধূর্ত লোক। সে এক বিবাহ-যোগ্যা শ্যালিকা লইয়া বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। অবিনাশের হাতে তাহাকে কোন রকমে সমর্পণ করিবার আশায়, সে বৈকুণ্ঠের নিকট যাতায়াত করিতে লাগিল এবং বৈকুণ্ঠের দুর্বলতাটুকুর সদ্ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিল। সে বৈকুণ্ঠের লেখার প্রশংসা করে, বৈকুণ্ঠও ইহাতে উৎসাহিত হইয়া তাহাকে যৎপরোনাস্তি প্রশ্রয় দিয়া থাকেন। কেদারের অভিসন্ধি সফল হইল, অবিনাশকে বৈকুণ্ঠ কেদারের শ্যালিকাকে বিবাহ করিতে বলিলেন; অবিনাশ কেদারের শ্যালিকাকে দেখিয়া তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য নিজেও ব্যগ্র হইয়া পড়িল। বিবাহে বেশি বিলম্ব হইল না। বিবাহের পর কেদার ও তাহার দূর সম্পর্কীয় যত দুঃস্থ আত্মীয়স্বজন ছিল, তাহারা সকলে নূতন আত্মীয়তার সূত্র ধরিয়া বৈকুণ্ঠের বাড়ীতে আসিয়া বসবাস করিতে লাগিল। ক্রমে তাহাদের উৎপীড়ন আরম্ভ হইল, কেদারের এক পিসী বৈকুণ্ঠের বিধবা কন্যাকে অপমানিত করিল, অন্য একজন আত্মীয় বিপিন বৈকুণ্ঠকে তাঁহার এতকালের ব্যবহৃত লেখার ঘরটি ছাড়িয়া যাইবার জন্য উপদ্রব আরম্ভ করিল। অবিনাশ কিছু মনে করিতে পারে ভাবিয়া বৈকুণ্ঠও মুখ ফুটিয়া তাহাদিগকে কিছু বলিলেন না, বরং নিজেই তাঁহার গৃহাবাস পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইতে মনস্থ করিলেন। ইহাদের উপদ্রব যখন একেবারে চরমে পৌঁছিল, তখন একদিন অবিনাশ নিজেই তাহাদের সকলকে অপমানিত করিয়া তাড়াইয়া দিল। কেদারকেও বাড়ীর বাহির হইয়া যাইতে হইল। বৈকুণ্ঠ নিজের ঘরটি ফিরিয়া পাইলেন।

'বৈকুণ্ঠের খাতা'র কাহিনীটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের নিজ পারিবারিক জীবনের কিছু ছায়াপাত হইয়াছে। বৈকুণ্ঠের চরিত্রটি বিশেষভাবেই তাঁহার কোন নিকট আত্মীয়কে সম্মুখে রাখিয়া রচিত, এতদ্ব্যতীতও কাহিনীর সমগ্র পরিবেশটির মধ্যে তাঁহার নিজ পারিবারিক জীবনের চালচলন ও সামাজিকতাই

উপজীব্য করা হইয়াছে। সেইজন্য তাঁহার পূর্ববর্তী রচনা 'গোড়ায় গলদে'র তুলনায় ইহার বাস্তবগুণ অধিকতর প্রত্যক্ষ, রচনার দিক দিয়াও সেইজন্য ইহা অধিকতর শক্তিশালী।

'বৈকুণ্ঠের খাতা' স্ত্রীভূমিকা-বর্জিত স্বল্পায়তন (মাত্র তিন দৃশ্যে সমাপ্ত) ক্ষুদ্র নাটক হইলেও, ইহার শিল্পগুণ রবীন্দ্রনাথের যে কোন হাস্যরসাত্মক নাট্য-রচনা অপেক্ষা অধিক। ঘটনা-বিন্যাস ব্যতীতও ইহার মধ্যে চরিত্র-সৃষ্টির যে কৃতিত্ব দেখা যায়, তাহা রবীন্দ্রনাথের এই শ্রেণীর আর কোন নাটকের মধ্যে পাওয়া যায় না। ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে চরিত্রগুলি সর্বত্রই অভিনব বৈশিষ্ট্য লইয়া বিকাশ লাভ করিয়াছে। ইহার বহিরঙ্গগত হাস্যচটুল রসাভিব্যক্তি ইহার অন্তরগত ভাবঘন পরিচয়টির সঙ্গে সহজ সম্পর্ক স্থাপন করিয়া ইহার উপর সৌন্দর্য ও সংযমের একটি অপূর্ব রূপরেখা টানিয়াছে। ইহা কেবলমাত্র রসোচ্ছল যেমন নহে, তেমনই আবার কেবলমাত্র অন্তর্মুখীন ভাবাশ্রয়ীও নহে—উভয়ের মিলনেই ইহা যথার্থ সার্থক। এই হিসাবেই ইহাকে অবিমিশ্র হাস্যরসাত্মক প্রহসনের পর্যায়ভুক্ত করা যায় না।

বৈকুণ্ঠের চরিত্র এই নাটকের এক অনবদ্য সৃষ্টি। অবশ্য পূর্বেই বলিয়াছি, এই চরিত্র-পরিকল্পনায় রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষদৃষ্ট অভিজ্ঞতা বিশেষ কার্যকরী হইয়াছিল; তথাপি ইহার মধ্যে নাট্যকারের সৃজনী-প্রতিভার স্পর্শও অনুভব করা যায়। বৈকুণ্ঠ বিষয়-নিস্পৃহ সংসার-অনভিজ্ঞ ব্যক্তি, তিনি সর্বদা নিজের খেয়াল লইয়াই মত্ত আছেন; কিন্তু তাঁহার একটি দুর্বলতা এই যে, তিনি নিজের লেখা একজনকে শুনাইতে ভালবাসেন। তাঁহার লেখার পাঠক, কিংবা শ্রোতা বড় জোটে না, কেবলমাত্র নিজের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে কেদার আসিয়া জুটিয়াছে; তিনি তাহাকেই অবলম্বন করিয়া তাঁহার খেয়াল চরিতার্থ করিতে অগ্রসর হইলেন। বৈকুণ্ঠ নিরীহ প্রকৃতির লোক, সংসারের লোক তিনি চেনেন না। নিজের খেয়াল সম্পর্কে দুর্বলতা থাকিলেও তিনি নিতান্তই যে অচেতন, তাহাও নহে। এইখানেই বৈকুণ্ঠের চরিত্রের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাইয়াছে। কেদার যখন বৈকুণ্ঠের লেখার কপট প্রশংসা জানাইয়া বলিল,—'লেখা যা' হয়েছে সে পড়তে পড়তে ওর নাম কী—শরীর রোমাঞ্চ হয়ে উঠে।'

ইহা যে উপহাস মাত্র বৈকুণ্ঠের তাহা বুঝিতে বাকি রহিল না, তখনই অভিমানাহত হইয়া তিনি বলিলেন, 'হা হা হা হা! রোমাঞ্চ! আপনি ঠাট্টা

করছেন।…ঠাট্টার বিষয় বটে, ও' আমার পাগ্‌লামি। হা হা হা হা! সঙ্গীতের উৎপত্তি ও ইতিহাস—মাথা আর মুণ্ডু। দিন খাতাটা। বুড়ো মানুষকে পরিহাস করবেন না, কেদারবাবু।'

খেয়ালী বৃদ্ধের এই নিদারুণ অভিমানাহত কণ্ঠস্বর যেন চকিতে দর্শকের হৃদয় গভীর ভাবে স্পর্শ করিয়া যায়।) কিন্তু কেদারের ধূর্ততার নিকট বৈকুণ্ঠের মত ব্যক্তির পরাজয় অতি সহজ। আবার সে বৈকুণ্ঠের মন ভুলাইয়া লইয়া তাঁহার আত্মসচেতনতাকে কিছুক্ষণের জন্য বিলুপ্ত করিয়া দিল।

বৈকুণ্ঠ খেয়ালী হইলেও সম্পূর্ণ যে আত্মনির্লিপ্ত, তাহা বলিতে পারা যায় না। আত্মস্থ হইয়া মধ্যে মধ্যে যখন তিনি ভাবিতে বসেন, তখন সবই স্পষ্ট বুঝিতে পারেন। তবে সংসারের কঠিন হৃদয়হীনতা প্রত্যক্ষভাবে তিনি সহ্য করিতে পারেন না।) অপ্রিয়-সত্যবাদী ভৃত্য ঈশানকে তিনি বলিতেছেন, 'দেখ্ ঈশেন, তোর কথাগুলো বড় অসহ্য। তুই একটা মিষ্টি কথা বানিয়েও বল্‌তে পারিস্ নে?'

বৈকুণ্ঠ তাঁহার আচরণের ভিতর দিয়া পাঠকের নিকট হইতে আন্তরিক সহানুভূতি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। শেষ দৃশ্যে যখন অবিনাশের আত্মীয়বর্গ কর্তৃক তাঁহাকে নানাভাবে লাঞ্ছিত হইতে দেখা যায়, তখন এই অসহায় বৃদ্ধের প্রতি দর্শকের মমতাবোধ দুর্নিবার হইয়া উঠে। বৈকুণ্ঠের প্রতি দর্শকের এই সহানুভূতি হইতেই শেষ দৃশ্যে তাঁহার উপর অন্যায় অবিচারকারী কেদার, বিপিন ও নেপথ্যবাসিনী কেদারের পিসির উপর বিরক্তি জন্মিয়া থাকে।] শেষ দৃশ্যে অসহায় বৃদ্ধের এই চিত্রটি কি করুণ!

বৈকুণ্ঠ। আমি একটা উপায় ঠাউরেছি। এখানে জায়গাতেও আর কুলোচ্ছে না—এঁদের সকলেরই অসুবিধে হচ্ছে দেখ্‌তে পাচ্ছি—তা ছাড়া অবিনাশের এখন ঘর-সংসার হল—তার টাকাকড়ির দরকার, তার উপরে ভার চাপাতে আমার আর ইচ্ছে নেই—আমি এখান থেকে যেতে চাই।

ঈশান। সে তো মন্দ কথা নয়, কিন্তু—

বৈকুণ্ঠ। ওর আর কিন্তু-টিন্তু নেই ঈশেন। সময় উপস্থিত হলেই প্রস্তুত হতে হয়।

ঈশান। তোমার লেখাপড়ার কি হবে?

বৈকুণ্ঠ। (হাসিয়া) আমার লেখা! সে আবার একটা জিনিস! সবাই হাসে, আমি কি তা জানি নে ঈশেন! ওসব রইল পড়ে। সংসারে লেখার কারও কোনও দরকার নেই— (৩য় দৃশ্য)

(বৈকুণ্ঠের মধ্যে দুইটি পরিচয় আছে—একটি তাঁহার আত্মভোলা স্বরূপ,

আর একটি আত্মসচেতন স্বরূপ। বার্ধক্যের অলস খেয়ালের মধ্য দিয়া তাঁহার আত্মভোলা স্বরূপ যখন জাগিয়া থাকে, তখন তাঁহার আত্মসচেতনতা লুপ্ত হইয়া যায়; আবার কঠিন সংসারের নির্মম আঘাতে যখন তাঁহার আত্মসচেতনতা ফিরিয়া আসে, তখন তাঁহাকে আর কেহ বিষয়-বুদ্ধিহীনতার জন্য ধিক্কার দিতে পারে না। তাঁহার উপরি-উদ্ধৃত শেষ কথাটি স্মরণ করিলেই এ কথা বুঝিতে পারা যাইবে,—'আমার লেখা, সে আবার একটা জিনিস! সবাই হাসে, আমি কি তা জানিনে, ঈশেন?' স্বপ্ন ও সত্যের মিশ্র উপাদানে গঠিত বৈকুণ্ঠের এই চরিত্রটি রবীন্দ্র-প্রতিভার একটি সার্থক সৃষ্টি।

চরিত্র হিসাবে বৈকুণ্ঠের পরই নাম করিতে হয় তিনকড়ির। তিনকড়ি কেদারের সহচর, কিন্তু কেদারের সহধর্মী নহে। কেদার ধূর্ত, কিন্তু তাহার ধূর্ততার উপর একটা আবরণ আছে, তিনকড়ির তাহা নাই। সে যাহা চায়, তাহা সহজ ভাবেই লোকের নিকট হইতে হাত পাতিয়া চাহিয়া লয়। তাহার প্রবৃত্তি ও শিক্ষা কেদার হইতে স্বতন্ত্র, অথচ কি ভাবে যে ইহারা একত্র মিলিত হইয়াছে, তাহা নাটকের মধ্যে খুব স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারা যায় না। অবিনাশের চরিত্রটিও সুচিত্রিত হইয়াছে। নাট্যকাহিনীটি শেষ পর্যন্ত ট্রাজিডির পথ হইতে তাহারই গুণে রক্ষা পাইয়াছে। চরিত্রটির আনুপূর্বিক কোথাও অসঙ্গতি নাই। এই নাটকের মধ্যে কোনও স্ত্রীচরিত্র নাই, কিন্তু একটি নেপথ্যচারিণী নারী এই নাট্যকাহিনীর মধ্যে অদৃশ্য থাকিয়াও যেন দর্শকের দৃষ্টির সম্মুখে সর্বদা আবির্ভূত রহিয়াছে—তাহা বৈকুণ্ঠের বিধবা কন্যা নীরুর চরিত্র। এই কুণ্ঠিতা বাল-বিধবা দৃশ্যপটের অন্তরালে থাকিয়াই বরং তাহার উদ্দেশ্য অধিকতর সিদ্ধ করিয়াছে বলিয়া অনুভূত হইবে। 'বৈকুণ্ঠের খাতা'র হাস্যরসাত্মক পরিবেশটি এই ভাগ্যহীনা নারীর প্রচ্ছন্ন মর্মবেদনা দ্বারা কিয়ৎ পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে কি না, তাহাও বিবেচনার বিষয়। একদিন বৈকুণ্ঠ তাঁহার লেখার মত্ততায় যখন কেদার ও তিনকড়ির মধ্যাহ্ন-ভোজনের সত্ত্ব ব্যবস্থা করিবার জন্য ভৃত্য ঈশানকে আদেশ করিলেন, তখন ঈশান বলিল,—'তা জানি, তাঁকে বল্‌লেই তিনি ছুটে যাবেন—কিন্তু আজ সমস্ত দিন একাদশী ক'রে আছেন। বাবু, আজকের মতো তোমরা ঘরে গিয়ে খাও গে।' এই কথাটির ভিতর দিয়া দৃশ্যপটের অন্তরালচারিণী এই নারীর যে মর্মান্তিক দৈনন্দিন জীবন-চরিত্রের আভাস পাওয়া গেল, তাহা অলক্ষিতে দর্শককে আঘাত না করিয়া পারে না। এই হাস্যরসাত্মক নাটকের ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে নাট্যকার

এই বাল-বিধবার করুণ জীবন-চিত্র আনিয়া সংযুক্ত না করিলেই ভাল করিতেন ; ইহার প্রচ্ছন্ন করুণ রসের প্রবাহ এই নেপথ্যচারিণী নারীর অদৃশ্য মর্মবেদনায় ছায়াচ্ছন্ন হইয়া আছে।

রবীন্দ্রনাথ ১৩০৭ সালের গোড়ার দিকে যখন শিলাইদহে বাস করিতে-ছিলেন, তখন 'ভারতী' পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদিকা স্বর্গীয়া সরলা দেবী তাঁহাকে একটি 'কৌতুকময় সামাজিক প্রহসন' লিখিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করেন। কাব্য-জীবনে তখন তাঁহার 'ক্ষণিকা'র যুগ। তিনি প্রধানতঃ এই 'ক্ষণিকা'র কাব্য-মনোভাবের পটভূমিকার উপর 'চিরকুমার সভা'র ভিত্তি স্থাপন করেন। 'ক্ষণিকা'র একটি কবিতায় তিনি ইতিপূর্বেই লিখিয়াছিলেন,

> আমি হবো না তাপস, হবো না হবো না
> যেমনি বলুন যিনি,
> আমি হবো না তাপস নিশ্চয় যদি
> না মেলে তপস্বিনী।

একটি পরম কৌতুককর পরিবেশের মধ্য দিয়া প্রধানতঃ এই ভাবটি অবলম্বন করিয়া তিনি 'চিরকুমার সভা' নামক রঙ্গোপন্যাস রচনা করিয়া 'ভারতী'তে প্রকাশ করেন। ইহা যখন পুনরায় পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়, তখন ইহার নামকরণ করা হয় 'প্রজাপতির নির্বন্ধ।' অতঃপর রবীন্দ্রনাথ ইহা নাট্যাকারে পরিবর্তিত করেন। তখন পুনরায় ইহার নামকরণ করা হয় 'চিরকুমার সভা'। ইহার এই নাট্যরূপই জনসাধারণের নিকট অধিকতর পরিচিত। ইহার কাহিনীটি সংক্ষেপে এইরূপ—

অক্ষয়কুমারের দুইটি অবিবাহিতা শ্যালিকার নাম নৃপবালা ও নীরবালা। 'নৃপ শান্ত স্নিগ্ধ, নীর তাহার বিপরীত, কৌতুকে এবং চাঞ্চল্যে সে সর্বদাই আন্দোলিত।' অক্ষয়ের আর একটি বিধবা শ্যালিকা আছে, নাম শৈল। অক্ষয়ের স্ত্রীর নাম পুরবালা, পুরবালা ভগিনীদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠা। পিতৃ ও ভ্রাতৃহীনা বালিকাদিগের জামাতা অক্ষয়ই একমাত্র অভিভাবক। নৃপ ও নীরর বিবাহের বয়স হইয়াছে, কিন্তু পাত্র জুটিতেছে না ; জননী জগত্তারিণী সে জন্য বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। চিরকুমার সভা আজীবন কৌমার্য-ব্রতধারীদিগের একটি প্রতিষ্ঠান—চিরকৌমার্য ও সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিয়া নিঃস্বার্থভাবে সমাজ ও দেশের সেবা করা ইহার সভ্যদিগের উদ্দেশ্য। অধ্যাপক চন্দ্রমাধববাবু চিরকুমার সভার সভাপতি—শ্রীশ, বিপিন ও পূর্ণ ইহার সভ্য।

চন্দ্রবাবুর বাড়ীতে সভার অধিবেশন বসিয়া থাকে। অক্ষয়ের চেষ্টায় চিরকুমার সভার অধিবেশন-স্থান চন্দ্রমাধববাবুর বাড়ী হইতে অক্ষয়ের বাড়ীতে স্থানান্তরিত হইয়া আসিল; বিধবা শৈল পুরুষের বেশে অবলাকান্ত এই ছদ্মনাম গ্রহণ করিয়া সভার সভ্য হইল, এক অবিবাহিত বৃদ্ধ রসিকও সভার সভ্যশ্রেণি-ভুক্ত হইল। পূর্ণর চিরকুমার সভার সভ্য হইবার একটু ইতিহাস ছিল—সে চন্দ্রবাবুর ছাত্র, চন্দ্রবাবুর এক বিবাহ-যোগ্যা ভাগিনেয়ী ছিল, নাম নির্মলা। একদিন চন্দ্রবাবুর বাড়ীতে নির্মলাকে দেখিয়া পূর্ণর চিত্তচাঞ্চল্য ঘটিল, সেই হইতেই সে সভার সভ্য হইল। সভা অক্ষয়ের বাড়ীতে স্থানান্তরিত হওয়াতে তাহার আপত্তি ছিল। নির্মলাও সভার সভ্যা হইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। চন্দ্রবাবু সভার সম্মতি গ্রহণ করিয়া সভায় স্ত্রীসভ্যও গ্রহণ করা স্থির করিলেন এবং নির্মলাকে সভ্য করিয়া লইলেন। নির্মলা প্রকাশ্য সভায় যোগদান করিতে লাগিল।

অক্ষয়ের গৃহে চকিতে একদিন নৃপকে দেখিয়া শ্রীশ ও নীরকে দেখিয়া বিপিন মুগ্ধ হইয়া গেল। নৃপ একটি রুমাল অক্ষয়ের বৈঠকখানায় ফেলিয়া গেল, শ্রীশ তাহা কুড়াইয়া পাইল, বিপিনও একদিন অক্ষয়ের গৃহে নীরর একখানি গানের খাতা খুঁজিয়া পাইল। দুইজনই ইহা লইয়া মাতিয়া উঠিল। শৈল ও রসিক তাহাতে ইন্ধন জোগাইতে লাগিল। একদিন পূর্ণ চন্দ্রবাবুর কাছে নির্মলাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিয়া পাঠাইল। চন্দ্রবাবু মহাবিব্রত হইয়া পড়িলেন, চিরকুমার সভায় যাতায়াতের ফলে নির্মলার অবলাকান্তবাবুর প্রতি একটু আকর্ষণ জন্মিয়াছিল, তবে পূর্ণর জন্য তাহার যে কোনও আকর্ষণ ছিল না, তাহা নহে। চন্দ্রবাবু চিরকুমার সভায় সভ্যদিগের কৌমার্যব্রত গ্রহণ করিবার বাধ্যবাধকতা উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব করিতে চাহিলেন, সভ্যগণ সাগ্রহে তাহাতে সম্মতি দিল। উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়ায় শৈল পুরুষের ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিয়া নিজ বেশ ধারণ করিল। নির্মলার সহিত পূর্ণর, নৃপর সহিত শ্রীশের এবং নীরর সহিত বিপিনের বিবাহ হইবার আর কোনও বাধা রহিল না।

প্রায় সমসাময়িক কালে প্রবর্তিত স্বামী বিবেকানন্দের সন্ন্যাস-জীবনের আদর্শকে ব্যঙ্গ করাই মুখ্যতঃ এই নাট্যকাহিনীর উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া এই নাটকের অনেক সমালোচকই রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়াছেন। এ কথা সত্য যে, ব্যক্তিজীবনে সন্ন্যাসধর্ম পালনের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কোন

শ্রদ্ধা না থাকিলেও, স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ের জীবন ও সমাজ-সেবার আদর্শের প্রতি তিনি শ্রদ্ধাহীন ছিলেন না। বিবেকানন্দের প্রতি রবীন্দ্রনাথের গভীর শ্রদ্ধা-বোধ অন্যত্রও প্রকাশ পাইয়াছে। 'চিরকুমার সভা'য় যে জীবনকে ব্যঙ্গ করা হইয়াছে, তাহা নিষ্ঠাবান্ প্রকৃত সন্ন্যাসীর জীবন নহে, বরং তাহার বিপরীত। শক্তিহীনের মূঢ়তাই এখানে ব্যঙ্গের বিষয়, প্রকৃত শক্তিমানের আদর্শ-সেবা এখানে ব্যঙ্গের লক্ষ্য নহে। চিরকুমার সভার সভ্যদিগের কৌমার্য ও সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণের যে প্রকৃত সামর্থ্য নাই, তাহা তাহাদিগের চরিত্রের একেবারে প্রথম হইতেই নির্দেশ পাওয়া যায়। পূর্ণ, শ্রীশ, বিপিন ইহারা কেহই সন্ন্যাসী নহে, সন্ন্যাসী হইবার শক্তিও নাই,—ডন্ কুইক্সটের বীরত্ব অর্থাৎ শক্তিহীনের ব্যর্থ আস্ফালনই এই নাটকে ব্যঙ্গের বিষয় এবং ইহা দ্বারাই ইহাতে হাস্যরসের সৃষ্টি করা হইয়াছে। ইহা উচ্চাঙ্গ হাস্যরসেরই বিষয়, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় 'চিরকুমার সভা'র একজন সমালোচক এই কথাটাকেই ভুল করিয়াছেন,—তিনি লিখিয়াছেন, 'যে-চিরকুমারদের ব্রত ভঙ্গ করিবার জন্য রমণীর দরকার হয় না, শুধু গানের খাতা বা রুমাল হইলেই চলে, তাহাদের পরাজয়ে যে হাস্যরসের সঞ্চার হয়, উহা উচ্চাঙ্গের নহে।' এই সমালোচকের মতে মনে হয়, নিষ্ঠাবান্ সন্ন্যাসীর ব্রতভঙ্গে উচ্চাঙ্গের হাস্যরসের সৃষ্টি হইত, ইহাদের নিষ্ঠাও যেমন কম, সেই পরিমাণে ইহাদিগের দ্বারা হাস্যরসেরও সৃষ্টি যাহা হইয়াছে, তাহাও অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু একথা সত্য নহে, প্রকৃত নিষ্ঠাবান্ সন্ন্যাসীর ব্রতভঙ্গের বিষয় হাস্যরসের বিষয় নহে। এ কথা কেহই স্বীকার করিবেন না যে, 'চিত্রাঙ্গদা'য় অর্জুনের ব্রতভঙ্গে খুব উচ্চাঙ্গের হাস্যরসের সৃষ্টি হইয়াছে। তাহার মধ্যে বরং জীবন-দর্শনের একটা গভীরতর ইঙ্গিত প্রকাশ পায়। ব্যক্তিচরিত্রের মানবিক দুর্বলতাই প্রকৃত উচ্চাঙ্গ হাস্যরসের উপজীব্য। চরিত্রের মধ্যে কোন উচ্চাদর্শ পালনের অনমনীয় দৃঢ়তা-গুণ থাকিলে তাহা দ্বারা হাস্যরস সৃষ্টি সম্ভব নহে ; এইজন্যই চিরকুমার সভার সভ্যদিগের মধ্যে যে মানবিক দৌর্বল্যগুলির সন্ধান করা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যেই নাটকের প্রকৃত হাস্যরসের সৃষ্টি সার্থক হইয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়কে ব্যঙ্গ করাই যদি রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে তিনি বিবেকানন্দের সম্প্রদায়ভুক্ত প্রকৃত সন্ন্যাসীর মধ্য হইতেই এই নাটকের নায়ক সংগ্রহ করিতেন। কিন্তু চিরকুমার সভার সভ্যগণ সাধারণ মানুষ হইতে স্বতন্ত্র নহে—তাহারা কেহ গৃহও ত্যাগ করে নাই, সন্ন্যাসও গ্রহণ করে নাই, সমাজ

সেবার ক্ষেত্রে কেহ পদার্পণও করে নাই, নূতন সমাজ-প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া আত্মত্যাগ ও স্বার্থবিসর্জনের কথা মুখে বলিয়া থাকে সত্য, কিন্তু কেহই তাহা কর্মের ভিতর দিয়া গ্রহণ করে নাই। সেইজন্য ইহাদের কাহিনী পড়িতে বসিয়া বিবেকানন্দের স্বার্থত্যাগী শিষ্য-সম্প্রদায়ের কথা মনেই হইতে পারে না। অতএব 'চিরকুমার সভা'র ভিত্তিভূমিতে যাঁহারা স্বামী বিবেকানন্দের সুমহান্ আদর্শের প্রতি রবীন্দ্রনাথের অশ্রদ্ধার সন্ধান করিয়াছেন, তাঁহারা রবীন্দ্রনাথের প্রতি সুবিচার করেন নাই।

'চিরকুমার সভা'য় হাস্যরসের সৃষ্টি হইয়াছে প্রধানতঃ ইহার অপুর্ব বাগ্‌বৈদগ্ধ্য দ্বারা, ঘটনা-সংস্থাপনা দ্বারা নহে। ঘটনা-সংস্থাপনা বিষয়ে ইহার পূর্ববর্তী প্রহসনগুলির যে গুণ ছিল, ইহার তাহাও নাই। কিন্তু বুদ্ধিদীপ্ত সমৃদ্ধ সংলাপের গুণে ইহার সেই অভাব অনেকটা পুর্ণ হইয়াছে। তথাপি এ কথা সত্য যে, নাটকের মধ্যে কাহিনীর ক্রিয়া (effect) কাহিনীই সৃষ্টি করিতে পারে, সংলাপের ক্রিয়া সংলাপ দ্বারাই সৃষ্ট হয়—একের দৈন্য অন্যের দ্বারা কিছুতেই ঘুচে না। এই দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যায় যে, 'চিরকুমার সভা'র সংলাপ যতই রস-সমৃদ্ধ হউক না কেন, একটি কেন্দ্রগত সক্রিয় কাহিনীর অভাবে এই সংলাপ যেন অনেকটা নিরবলম্ব ও ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে—ইহার আভ্যন্তরিক শক্তি তেমন অনুভূত হয় না। ইহার সংলাপের সৌন্দর্য যেন মুহূর্তোদ্ভাসিত ক্ষীণায়ু বিদ্যুদ্দীপ্তির মত কিংবা বুদ্‌বুদগাত্রে প্রতিভাত সূর্যরশ্মির মত— মুহূর্তে মুহূর্তেই মিলাইয়া যায়। ইহার আকস্মিক দীপ্তিতে চক্ষু ঝল্‌সাইয়া যায়, কিন্তু পর মুহূর্তেই ইহার আর কোন ক্রিয়া অনুভূত হয় না।

এই নাটকের মধ্যে চন্দ্রমাধব বাবুর চরিত্রে একটু বৈশিষ্ট্য আছে ; চরিত্র-সৃষ্টির দিক দিয়া ইহা কতকটা সার্থকতা লাভ করিয়াছে বলিয়া অনুভূত হইবে। 'গোড়ায় গলদে'র অনতিপরিস্ফুট নিবারণ, 'বৈকুণ্ঠের খাতা'র বৈকুণ্ঠ 'চিরকুমার সভা'য় চন্দ্রমাধববাবুর রূপ লাভ করিয়াছে। এই চরিত্রটির পরিকল্পনায় রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সহায়তা লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। তাঁহার 'জীবন-স্মৃতি'তে বর্ণিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের যে উল্লেখ রহিয়াছে, তাহা চন্দ্রবাবুর চরিত্রের সম্পূর্ণ অনুকূল। মনে হয়, তাঁহাকেই সম্মুখে রাখিয়া এই চরিত্রটি চিত্রিত হইয়াছে। উহা ছাড়াও দেশের সেবা সম্বন্ধে চন্দ্রবাবুর মুখে যে সকল কথা দেওয়া হইয়াছে, তাহাদের অধিকাংশই

রবীন্দ্রনাথের নিজের কথা। চিরকুমার সভায় কৌমার্য-ব্রতধারী সভ্যদিগের কর্তব্য সম্বন্ধে চন্দ্রবাবু যে দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহার অধিকাংশ কথাই রবীন্দ্রনাথ নিজের কথা বলিয়াই সমসাময়িক কালে রচিত কতকগুলি প্রবন্ধের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। চন্দ্রবাবুর বক্তৃতার সঙ্গে ১৩১২ সালে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ' নামক প্রবন্ধ তুলনা করিয়া পাঠ করিলেই এ কথা হৃদয়ঙ্গম হইবে। চন্দ্রবাবুর কথায় যদি সত্যই এমন একটা ব্যবহারিক মূল্য থাকে, তবে তাহা দ্বারা প্রকৃত হাস্যরস সৃষ্টির কোন বাধা হইয়াছে কি না, তাহাও বিবেচনা করিয়া দেখা প্রয়োজন। কারণ, এ কথা সত্য যে, অসঙ্গতি ও অসম্ভাব্যতা দ্বারাই হাস্যরসের সৃষ্টি হইয়া থাকে, সঙ্গতি এবং যাথার্থ্যের মধ্যে প্রকৃত হাস্যরসের উপাদান নাই। সেইজন্য দেখিতে পাওয়া যায় যে, চন্দ্রবাবু দেশহিতের উৎসাহ-প্রাবল্যে এমন সব অকিঞ্চিৎকর বস্তু লইয়া এমন অসম্ভব পরিকল্পনাও করিয়াছেন, যাহা সহজেই হাস্যরসের সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছে। বলাই বাহুল্য যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার উক্ত প্রবন্ধে চন্দ্রবাবুর মত ব্যবহারিক বুদ্ধির অভাবের পরিচয় দেন নাই। তথাপি এ কথা স্বীকার করিতেই হয় যে, চন্দ্রবাবু হাস্যরসের সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহার বাক্য দ্বারা নয়, কার্য দ্বারা। তাঁহার চরিত্রের মধ্যে কোন দৃঢ়তা নাই—কুমারসভায় স্ত্রীসভ্য গ্রহণ করিতে তাঁহার কোন আপত্তি ছিল না, শেষ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানের মূল বৈশিষ্ট্য বিসর্জন দিতেও তিনি বিশেষ বিলম্ব করিলেন না। এই বৃদ্ধের জীবনে কি সত্য ছিল, তাহা সহজে বুঝিতে পারা যায় না। এই কথাটি নাটকে খুব স্পষ্ট করিয়া অনুভব করা না গেলেও, একটু গভীর ভাবে লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, নির্মলার প্রতি স্নেহই তাঁহার জীবনে সত্য ছিল। এই বৃদ্ধ একমাত্র নির্মলার জন্যই বার বার নিজের আদর্শকে বিসর্জন দিয়াছেন, কিন্তু নাটকের মধ্যে এই বিষয়টি একটু গৌণ হইয়া পড়িয়াছে।

ইহার পরই শৈলর চরিত্রটি সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলিতে হয়। এই নাটকের মধ্যে যেসকল চরিত্র কাহিনীর দিক দিয়া নিতান্তই অবান্তর বলিয়া মনে হইবে, শৈল তাহাদের অন্যতম। শৈলর কাজ প্রধানতঃ রসিকই করিয়াছে, শৈলকে দিয়া তাহাদের পুনরভ্যাস করিবার কোনও সঙ্গত কারণ ছিল না। বিশেষতঃ এই হাস্যরসাত্মক নাটকের মধ্যে বাল-বিধবা শৈলর স্থান নিতান্ত সঙ্কুচিত হওয়াই স্বাভাবিক। মুখের কথায় ও বাহিরের আচরণে

তাহার জীবনের কারুণ্যের দিকটা সে যতই গোপন করুক না কেন, দর্শকের সম্মুখে তাহার উপস্থিতি নাটকের নিরবচ্ছিন্ন হাস্যরসোপভোগের পক্ষে যে কতকটা বাধার সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই নাট্যকাহিনীর সর্বত্র তাহার অবাধ গতি রহিয়াছে, সে অক্ষয়ের সঙ্গে আর দুইজন অবিবাহিত শ্যালিকার মতই মিশিয়াছে, অপরিচিত যুবকের সঙ্গে পুরুষের ছদ্মবেশ ধরিয়া বন্ধুর মত মিশিয়াছে, বৃদ্ধ রসিকের সঙ্গে অবাধ রসিকতার রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে, বিধবার কোন আচারই সে স্বীকার করিয়া নিজের আচরণকে কোন দিক দিয়া সংযত করে নাই; অর্থাৎ তাহার পরিচয়ে সে বিধবা, কিন্তু আচরণে সে বিধবা নহে। যদি তাহাই হয়, তবে নাট্যকাহিনীর দিক হইতে তাহার বিধবা বলিয়া পরিচয় দিবার কোন কারণ ছিল না। এই নাটকের পরম হাস্যোজ্জ্বল রস-চিত্রের মধ্যে তাহার অকাল-বৈধব্যের এই সকরুণ পরিচয়টি গোপন থাকিলেই বোধ হয় ভাল হইত। এই নাটকের শেষ দৃশ্যে তাহার চিত্রটি কি করুণ! পরিপুর্ণ মিলনের আনন্দোৎসবের মাঝখানে বিধবাবেশিনী শৈল আসিয়া চন্দ্রবাবুকে প্রণাম করিয়া বলিল, 'আমাকে ক্ষমা করবেন।' তাহাকে দেখিয়া সকলে চমকিয়া উঠিল। অক্ষয় তাহার প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ করিল। সেই মুহূর্তেই নাটকের যবনিকা পড়িয়া গেল; কিন্তু সেই আনন্দোজ্জ্বল মিলন-চিত্রখানির মাঝখানে যে একটি কালির দাগ পড়িয়া গেল নাট্যকার তাহা লক্ষ্য করিলেন না। অথচ ইহার কি প্রয়োজন ছিল?

নৃপ ও নীরর চরিত্র দুইটি সুচিত্রিত হইয়াছে। ইহারা ছোটবড় ভগিনীর মত নহে, বরং সমবয়সী সখীর মত পরস্পর একটি মধুর সম্পর্ক রচনা করিয়াছিল। নৃপ একটু 'স্নিগ্ধ শান্ত' হইলেও নীরস কৌতুকরসের হিল্লোলে সেও যে আন্দোলিত না হইত, তাহা নহে। কথায়, হাস্যে, সঙ্গীতে ইহারাই কাহিনীটি সর্বত্র সরস ও জীবন্ত করিয়া রাখিয়াছে।

পুর্বেও বলিয়াছি, 'চিরকুমার সভা'র হাস্যরস বাক্-চাতুর্যের মধ্যেই অধিকতর নিহিত, এই হিসাবে ইহা ইংরেজি wit শ্রেণীর রচনার অন্তর্গত, খাঁটি হাস্য বা humour শ্রেণীর রচনার অন্তর্গত নহে। বিচ্ছিন্ন দৃশ্যের অন্তর্গত এক একটি চরিত্রের মুখে যে সকল রসবাক্য উচ্চারিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্য হইতে প্রধানতঃ ইহার হাস্যরস উৎসারিত হইয়াছে। ইহার বাগ্‌বৈদগ্ধ্য সৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ যে শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা রবীন্দ্র-সাহিত্যে এক

দুর্লভ সম্পদ। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহার কাহিনীগত দৈন্যের জন্য ইহাকে সমগ্রভাবে একখানি উচ্চাঙ্গের প্রহসন বলা যায় না।

শেষ বয়সে রচিত রবীন্দ্রনাথের একটি প্রহসনের নাম 'মুক্তির উপায়'। ইহা 'গল্পগুচ্ছে'র একটি গল্প অবলম্বনে রচিত, গল্পটির নামও 'মুক্তির উপায়'। একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ ইহার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে নিজেই এই পরিচয় দিয়াছেন—

'ফকির স্বামী অচ্যুতানন্দের চেলা। গোঁপদাড়িতে মুখের বারো আনা অনাবিষ্কৃত। ফকিরের স্ত্রী হৈমবতী। বাপের আদরের মেয়ে। তিনি টাকা রেখে গেছেন ওর জন্যে। ফকিরের বাপ বিশ্বেশ্বর পুত্রবধূকে স্নেহ করেন, পুত্রের অপরিমিত গুরুভক্তিতে তিনি উৎকণ্ঠিত। পুষ্পমালা এম. এ. পরীক্ষায় সংস্কৃতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হওয়া মেয়ে। দূর সম্পর্কে হৈমর দিদি। কলেজি খাঁচা থেকে ছাড়া পেয়ে পাড়াগাঁয়ে বোনের বাড়ীতে সংসারটাকে প্রত্যক্ষ দেখতে এসেছে। কৌতূহলের সীমা নেই। কৌতুকের জিনিসকে নানা রকমে পরখ ক'রে দেখ্‌ছে কখনো নেপথ্যে কখনো রঙ্গভূমিতে। ভারি মজা লাগ্‌ছে। সকল পাড়ায় তার গতিবিধি, সকলেই তাকে ভালবাসে। * * পাশের পাড়ার মোড়ল ষষ্ঠীচরণ। তার নাতি মাখন দুই স্ত্রীর তাড়ায় সাত বছর দেশ ছাড়া। ষষ্ঠীচরণের বিশ্বাস, পুষ্পর অসামান্য বশীকরণের শক্তি; সেই পারবে মাখনকে ফিরিয়ে আনতে। পুষ্প শুনে হাসে আর ভাবে, যদি সম্ভব হয় তবে প্রহসনকে সে সম্পূর্ণ করে দেবে। এই নিয়ে রবি ঠাকুর নামক একজন লেখকের সঙ্গে সে পত্র ব্যবহার করেছে।' রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি দ্বারা এই প্রহসনেব ভিতর তাঁহার নিজের কি বক্তব্য ছিল, তাহা পরিস্ফুট হইলেও, যাহা ইহার ভিতর দিয়া প্রকৃতই প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা একটু স্বতন্ত্র। সেইজন্য কাহিনীটি সংক্ষেপে পুনরাবৃত্তি করিতেছি।

ফকির সর্বদা গুরুনাম জপ করে, বৃদ্ধ পিতা বিশ্বেশ্বর তাঁহার পেন্‌সনের টাকায় সংসার চালান। স্ত্রী হৈমবতী তাহার নিজের পিতৃদত্ত ধন দিয়া স্বামীর খেয়াল মিটায়। একদিন বিশ্বেশ্বর পুত্রবধূকে এমনভাবে ফকিরকে টাকা দিতে নিষেধ করিয়া তাহার অলসতাকে প্রশ্রয় দিতে নিষেধ করিলেন। শিষ্যদিগের কাঞ্চনের প্রতি আসক্তি দূর করিবার ছলনায় গুরু তাহাদের নিকট হইতে নিজে সোনার মোহর ও গয়না আদায় করে, তাহাদের সঙ্গে কেহ কেহ নোটও আনিয়া তাহার ঝোলায় ফেলিয়া দেয়। পুষ্পমালা কলেজে

সংস্কৃত-পড়া মেয়ে, সে তাহার দিদির বাড়ীতে আসিয়া ফকিরকে এই ভ্রান্ত পথ হইতে ফিরাইয়া আনিতে সঙ্কল্প করিল। তারপর নিজে একদিন তাহার গুরুর নিকট গিয়া তাহাকে পুলিশের ভয় দেখাইল। ভয়ে গুরু ঝোলা ফেলিয়া পলাইয়া গেল, শিষ্যগণ তাহাদের সোনাদানা ফিরিয়া পাইল, কিন্তু গুরুর সঙ্গে ফকিরও পলাইল। হৈমবতী তাহার স্বামীকে গৃহে ফিরাইয়া আনিবার জন্য পুষ্পকে ধরিল, পুষ্প তাহাকে আশ্বাস দিল। প্রতিবেশী ষষ্ঠী-চরণের নাতি মাখন দুই স্ত্রীর জ্বালায় বাড়ী হইতে বহুকাল নিরুদ্দেশ। ষষ্ঠী তাহার নাতিকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য পুষ্পকে ধরিল; পুষ্প তাহাকেও আশ্বাস দিল। মাখনের চেহারার বর্ণনা শুনিয়া পুষ্পমালা তাহার আকৃতির বর্ণনা করিয়া এক বিজ্ঞাপন প্রচার করিল যে, সখের থিয়েটারে হনুমান সাজিবার জন্য তাহার এই প্রকার একটি লোক চাই। মাখন আসিয়া ধরা দিল, কিন্তু তাহাকে তাহার আত্মীয়-স্বজনের নিকট উপস্থিত করিবার পূর্বেই এক গোল বাধিল। মাখনের দুই স্ত্রী তাহাদের স্বামী ফিরিয়াছে এই কথা মাত্র শুনিয়া স্বামী মনে করিয়া যে এক ব্যক্তিকে নিজেদের বাড়ী লইয়া যাইবার জন্য টানাটানি করিতে লাগিল, সে প্রকৃতপক্ষে পলাতক ফকির। যাই হোক, পুষ্পর মধ্যস্থতায় অবশেষে হৈম আসিয়া নিজের স্বামীকে চিনিয়া নিজের ঘরে লইয়া গেল, মাখনের দুই স্ত্রীও মাখনকে লইয়া নিজেদের ঘরে গেল।

রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের নাটকগুলির মধ্যে যেমন বৃষ্টির ধারা অপেক্ষা বিদ্যুতের দীপ্তিই অধিকতর প্রকাশ পাইয়াছে, ইহার মধ্যেও তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম দেখা যায় না। শাণিত ক্ষুরধারের মত ইহার ভাষা, অথচ ইহার প্রধান ত্রুটি এই যে, যে-সমাজটি তাঁহার এই প্রহসনের ক্ষেত্ররূপে নির্বাচিত হইয়াছে, তাহা এই ভাষার সম্পূর্ণ অনুপযোগী। 'শেষের কবিতা' ও 'বাঁশরী'র ভাষার সঙ্গে যেমন তাহাদের পরিবেশের নিবিড় যোগ স্থাপিত হইয়াছে, ইহার মধ্যে তাহা হয় নাই। মাখনের দুই স্ত্রীর মুখে যে গালিগালাজের ভাষা রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতেও তিনি দক্ষ ছিলেন না বলিয়া তাহাও যেন প্রাণহীন বলিয়া বোধ হয়। বহুকাল পূর্বে দীনবন্ধু মিত্র তাঁহার 'জামাই-বারিকে'র দুই সপত্নীর কোন্দলের মধ্য দিয়া যে জীবন্ত ভাষায় ব্যবহার করিয়াছিলেন, ইহার মধ্যে তাহারই অত্যন্ত ক্ষীণ প্রতিধ্বনি মাত্র শোনা যায়। ভণ্ড সন্ন্যাসীর বৃত্তান্ত লইয়া রবীন্দ্রনাথ ইতিপূর্বে যে সকল

ছোটগল্প ও প্রহসন রচনা করিয়াছিলেন, ইহা তাহাদের মত এত শক্তিশালী রচনা নহে। ছোটগল্পের আকারে এই কাহিনীটির মধ্যে যে রসস্ফূর্তি হইয়াছে, প্রহসনের মধ্য দিয়া তাহা হয় নাই, ছোটগল্পটির রস জমাট বাঁধিয়াছিল, প্রহসনের মধ্যে তাহা যেন কেমন বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে।

ইহার প্রধান চরিত্র পুষ্পমালা। ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ চরিত্রটির যে পরিচয় দিয়াছেন, কাহিনীর ভিতর দিয়া ইহার সেই পরিচয় প্রকাশ পায় নাই। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, 'এই প্রহসনের বাইরে' পুষ্পমালার জীবনের আর একটি প্রহসন আছে। তাহা এই প্রহসনের বাহিরে বলিয়াই বোধ হয় তাহার চরিত্রটি সমগ্রভাবে এখানে সুপরিস্ফুট হয় নাই। ছোটগল্পের মধ্য দিয়া তাহার যে পরিচয়টি প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা ইহার মত এত অসম্পূর্ণ বলিয়া বোধ হইবে না। যে সকল ছোটগল্প রবীন্দ্রনাথ তাঁহার পরবর্তী জীবনে নাটক-প্রহসনের আসরে নামাইয়া তাহাদের রসের হানি করিয়াছেন, ইহা তাহাদের অন্যতম।

ঋতু-নাট্য

বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যে একটি চিরসঞ্চরণশীল গতি-প্রবাহ অনুভব করিয়াছেন, তাহাই তিনি তাঁহার ঋতু-বিষয়ক নাটকগুলির মধ্য দিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। বাহিরের দিক হইতে নিত্য পরিবর্তমান হইয়াও, অন্তরের দিক হইতে বিশ্বপ্রকৃতির অপরিবর্তনীয় যে এক নিত্যরূপ কবির ধ্যান-দৃষ্টির লক্ষ্য-গোচর হইয়াছিল, তাহাও তাঁহার এই শ্রেণীর নাটকের উপজীব্য হইয়াছে। প্রকৃতিকে রবীন্দ্রনাথ কাব্য ও নাটক উভয় ক্ষেত্রেই প্রাণবান্ ও সরস বলিয়া অনুভব করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহার প্রকৃতি-বিষয়ক গীতি-কাব্যগুলি হইতে প্রকৃতি-বিষয়ক নাটকগুলি এক স্বতন্ত্র গৌরব লাভ করিয়াছে। কারণ, নাটকের ধর্ম গতি এবং প্রকৃতির মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ সেই গতির স্পন্দন অনুভব করিয়াছেন; প্রকৃতির এই গতির অনুভূতি হইতে রবীন্দ্রনাথ প্রধানতঃ তাঁহাব ঋতুবিষয়ক নাটকগুলির প্রেরণা লাভ করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের মতে জীব-জগতের মত প্রকৃতি-জগতও সুসম্পূর্ণ। মানব-জীবনের অন্তর্লীন এক অখণ্ড রস-প্রবাহ যেমন তাহার বাহ্যরূপের বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিতেছে, তেমনই প্রকৃতি-জগতেও রসপ্রবাহের এক অখণ্ড ধারা প্রকৃতির চিরপরিবর্তমান বহিঃসৌন্দর্যের ভিতর দিয়া নিত্য অভিব্যক্তি লাভ করিতেছে। একদিকে মানব, আর একদিকে প্রকৃতি—উভয়ে মিলিয়া বিশ্বসৌন্দর্যের অখণ্ডতা রক্ষা করিতেছে। এই প্রকৃতি-বোধ হইতেই রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি-বিষয়ক নাটকগুলির প্রেরণা আসিয়াছে।

এই শ্রেণীর অতীন্দ্রিয় অনুভূতিজাত কাব্য-ধর্মী পরিকল্পনার স্থূল নাট্যিক আদর্শ ক্ষুণ্ণ হইবার কথা। কারণ, নাটক যদি বাস্তব জীবনের সজীব আলেখ্য বলিয়াই বিবেচনা করি, তাহা হইলে এই শ্রেণীর রোমান্টিক পরিকল্পনার স্থান তাহাতে একেবারে নাই বলিলেই চলে। অতএব রবীন্দ্রনাথের এই শ্রেণীর নাটককে স্থূল নাট্যিক আদর্শ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া ইহাদের নিজস্ব গণ্ডির মধ্যে আনিয়া বিচার করাই সঙ্গত।' ইহাদের নাট্যিক মূল্য অকিঞ্চিৎকর, কিন্তু প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যস্থতায় কবির যে সত্যোপলব্ধি ইহাদের ভিতর দিয়া

ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা অকিঞ্চিৎকর নহে। এক দিক দিয়া ইহাদের সাহিত্যিক মূল্য অবিসংবাদিত।

পূর্বেই বলিয়াছি, প্রকৃতিকে রবীন্দ্রনাথ সরস, প্রাণবান্ ও গতিশীল বলিয়া অনুভব করিয়া থাকেন। মানব জীবনেরও ইহাই ধর্ম। এই ভাবে রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের মিলন অতি সহজ ভাবেই সম্ভব করিয়াছেন। এই জন্ম তাঁহার প্রায়ই কোন প্রকার রূপক-সঙ্কেতের সাহায্য গ্রহণ করিবারও প্রয়োজন হয় নাই। কিন্তু সর্বত্রই যে তিনি এই বিষয়ক নাটক রচনায় রূপক কিংবা সঙ্কেতকে পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছেন, তাহাও নহে। মাত্র দুই একখানি নাটকের মধ্যে ইহাদের আশ্রয়েও তাঁহার বক্তব্য প্রকাশ করিতে হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি-বিষয়ক নাটকগুলির মধ্যে বিষয়গত বৈচিত্র্য খুব অধিক নাই—থাকিবার কথাও নহে। কিন্তু বিষয়গত বৈচিত্র্যের মধ্যে ইহাদের সৌন্দর্য প্রকাশ পায় নাই, ইহাদের সৌন্দর্য প্রকাশ পাইয়াছে ইহাদের বর্ণনার ভঙ্গির মধ্যে। বিষয়বস্তু ইহাদের মধ্যে অত্যন্ত দীন; অনেক সময় একই পটভূমিকার উপর প্রায় অভিন্ন প্রকৃতির চরিত্র আনিয়া সংস্থাপন করা হইয়াছে, একমাত্র বিষয়ের ঈষৎ অনৈক্যই ইহাদের পরস্পর স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছে। এই দিক দিয়া বিচার করিলেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, সাধারণ নাট্যিক আদর্শ হইতে ইহারা বহু দূরবর্তী—যেমন বাহিরের দিক দিয়া, তেমনই অন্তরের দিক দিয়াও ইহারা গীতিকাব্যেরই সধর্মী। এমন কি, এই শ্রেণীর অনেক রচনা নাটক বলিয়া উল্লিখিত হইয়া অভিনীত হইলেও, ইহারা বিচ্ছিন্ন প্রকৃতি-বিষয়ক গীতিকবিতার সমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে।

রবীন্দ্রনাথের ঋতু-বিষয়ক নাটক বা গীতিনাট্যের মধ্যে এই কয়টির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে—'শেষ বর্ষণ', 'শারদোৎসব', 'বসন্ত', 'সুন্দর', 'ফাল্গুনী', 'ঋতু-চক্র', 'নটরাজ-ঋতুরঙ্গশালা'; ইহাদের 'ঋতু-চক্র' তাঁহার 'প্রবাহিণী'র অন্তর্গত কয়েকটি বিচ্ছিন্ন গানের সমষ্টি। যদিও ভাবগত আদর্শের দিক দিয়া 'ঋতুচক্র' তাঁহার অন্যান্য খণ্ডবিষয়ক নাটকের সঙ্গে অভিন্ন, তথাপি বাহিরের দিক হইতে ইহার নাট্যিক কোন পরিচয় নাই। 'নটরাজ-ঋতুরঙ্গশালা' নৃত্যগীত-আবৃত্তিযোগে অভিনীত হইয়া থাকিলেও, ইহা অভিনয়যোগ্য নাটক নহে, রবীন্দ্রনাথ নিজেও ইঁহাকে পালাগান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে কোন পালা নাই, কেবল গানই আছে। অতএব তাহাও গীতিকাব্যের মধ্যে আনিয়া বিচার করাই যুক্তিসঙ্গত। এতদ্ব্যতীত ইহাদের

মধ্যে 'ফাল্গুনী' নাটকখানির প্রকৃতি একটু স্বতন্ত্র, তদ্ভিন্ন অন্যান্য নাটকগুলির প্রকৃতিগত কিছু কিছু স্বাতন্ত্র্য থাকিলেও, ইহাদের বাহ্য পরিচয়ের মধ্যে পরস্পর কোন পার্থক্য নাই; ইহাদের পটভূমিকার পরিকল্পনাও সম্পূর্ণ অভিন্ন। সংস্কৃত নাটকের prelude বা সূচনা-ভাগ অনুযায়ী ইহাদের মধ্যেও সূত্রধার-নটের অনুরূপ চরিত্রের মধ্য দিয়া নাটকাখ্যানগুলির সূচনা হইয়াছে। নাট্যিক বিষয়ের সঙ্গে দর্শক-সাধারণের পরিচয় করাইয়া দিবার যে রীতিটি সংস্কৃত নাটকের মধ্যে আমরা দেখিতে পাই এই সকল নাটকের মধ্যেও তাহা অনুসৃত হইয়াছে। সংস্কৃত নাটক যেমন বিশেষ কোন ঋতু, বিশেষতঃ বসন্ত ঋতুর উৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হইত, রবীন্দ্রনাথের এই নাটকগুলিও শান্তি-নিকেতনের বিভিন্ন ঋতুকালীন উৎসব উপলক্ষে অভিনীত হইবার জন্য রচিত হইত। এই সমস্ত ঋতু-উৎসব বিষয়ক নাটক রচনাকালে রবীন্দ্রনাথকে শান্তি-নিকেতনের বিশিষ্ট নৃত্য, গীত ও অভিনয় ব্যবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইত। রবীন্দ্রনাথের অন্য কোন নাট্যরচনার বিশেষ কোন মঞ্চব্যবস্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হইলেও, তাঁহার ঋতুবিষয়ক নাটকগুলি সাধারণতঃ শান্তিনিকেতনের ছাত্র-ছাত্রীদিগের অভিনয়-বৈশিষ্ট্য ও তথাকার নৃত্যগীতের প্রচলিত আদর্শ দ্বারা সর্বদাই নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। কারণ, এই সকল নাটকের প্রথম অভিনয়-স্থান শান্তিনিকেতন কিংবা রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব কলিকাতার বসতবাটী এবং ইহাদের প্রধান দর্শক থাকিতেন তিনিই নিজে; শুধু তাহাই নহে, সম্ভব হইলে তিনি অন্যের সঙ্গে অভিনয়ে যোগদান করিতেন।

বাহিরের উৎসব উপলক্ষ করিয়া এই শ্রেণীর নাটক রচিত হইত বলিয়া সাধারণতঃ ইহাদের বাহিরের দিকটা যতখানি রস-সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ, ইহাদের অন্তরের দিকটা ততখানিই দীন। ইহাদের মধ্যে মানব-জীবনকে প্রকৃতির সান্নিধ্যে আসিয়া গভীরভাবে বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা করা হয় নাই; শুধু তাহাই নহে, মানব-মনের উপর প্রকৃতির যে গভীর প্রভাব কবি অন্যত্র অনুভব করিয়াছেন, তাহারও নির্দেশ ইহাতে অত্যন্ত গৌণ। এমন কি, কালিদাস-রচিত সংস্কৃত নাটক 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলা'র চতুর্থ অঙ্কে পতিগৃহ-গমনোন্মুখা শকুন্তলার সঙ্গে আশ্রম-প্রকৃতির যে নিবিড় যোগ কবি অনুভব করিয়াছেন তাহাও ইহাদের মধ্যে নাই। মনে হয়, উৎসবের রং বাহির হইতে ইহাদের গায়ে লাগিয়াছে এবং তাহারই ঔজ্জ্বল্যে তাহারা চিক্‌চিক্ করিতেছে, অন্তরতল পর্যন্ত তাহার কোন প্রেরণা সঞ্চারিত হইতে পারে নাই। প্রকৃতির রাজ্যে

বিচিত্র উৎসবের অনুষ্ঠান চলিতেছে, মানুষ দূরে দাঁড়াইয়া তাহাই নিরীক্ষণ করিতেছে মাত্র।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, ইহাদের মধ্যে 'ফাল্গুনী' নাটকখানির প্রকৃতি একটু স্বতন্ত্র। ইহা ঋতু-উৎসব বিষয়ক নাটক হইলেও ইহার মধ্যে প্রকৃতি-দর্শন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট একটি বক্তব্য বিষয় আছে এবং তাহা তিনি ইহাদের মধ্যে অন্যান্য নাটকের মত সহজ ও প্রত্যক্ষ করিয়া বলেন নাই—একটি রূপকের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার ঋতুবিষয়ক আর কোন নাটকের মধ্যে কোন রূপক বা অপ্রত্যক্ষোক্তি নাই। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, 'ফাল্গুনী' প্রকৃতি-বিষয়ক নাটক হইলেও, ইহা রবীন্দ্রনাথের রূপক ও সাঙ্কেতিক নাট্যরচনার যুগের রচনা। 'ফাল্গুনী' রচনার পূর্ববর্তী মাত্র ছয় বৎসরের মধ্যে তিনি একাদিক্রমে তাঁহার তিনখানি প্রসিদ্ধ রূপক ও সাঙ্কেতিক নাটক যথা, 'রাজা', 'অচলায়তন', 'ডাকঘর' রচনা করেন এবং ইহাদের পরই তাঁহার 'ফাল্গুনী' রচিত হয়। অতএব 'ফাল্গুনী'র মধ্যে স্বভাবতঃই এই রূপকের প্রভাব আসিয়া গিয়াছে, নতুবা অন্যান্য ঋতুবিষয়ক নাটকগুলির মতই ইহাও তিনি রূপক-সঙ্কেতের ভাব-মুক্ত করিয়া সহজ ও প্রত্যক্ষভাবেই রচনা করিতেন। কিন্তু তাহা হইলেও 'ফাল্গুনী'র রূপক নিতান্ত সাধারণ। এমন কি, ইহা এতই সাধাবণ যে, রূপকের মধ্য দিয়া প্রকাশ না করিলে বক্তব্য বিষয়টির সৌন্দর্য একেবারেই নষ্ট হইত। বসন্ত ঋতুর বহিরঙ্গগত সৌন্দর্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া যে রূপকের অকিঞ্চিৎকর তত্ত্বকথাটি 'ফাল্গুনী'র মধ্য দিয়া ব্যক্ত করা হইয়াছে, তাহা নাটকের সৌন্দর্যবৃদ্ধিরই কারণ হইয়াছে।

এক হিসাবে বিচার করিয়া দেখিতে গেলে মনে হইবে, রবীন্দ্রনাথের ঋতু-বিষয়ক নাটকগুলি একটি অখণ্ড গীতি-নাট্যের মালিকা, একটি হইতে অপরটি বিচ্ছিন্ন করিবার উপায় নাই। তাঁহার 'শেষ-বর্ষণ'-এর নটরাজ নিজেও বলিয়াছেন, 'বর্ষাকে না জান্‌লে শরৎকে চেনা যায় না', তেমনই 'ফাল্গুনী'র মধ্যেও তিনি বলিয়াছেন, 'ঋতুর নাট্যে বৎসরে বৎসরে শীত-বুড়োটার ছদ্মবেশ খসিয়ে তা'র বসন্ত-রূপ প্রকাশ করা হয়, দেখি পুরাতনটাই নূতন'। ঋতুচক্রের নিত্য আবর্তনের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির অখণ্ডতা অনুভব করিয়াছেন, মানবের জীবন-মৃত্যুর মধ্যে সেই অখণ্ডতারই প্রতিরূপ তিনি দেখিতে পাইয়াছেন। প্রকৃতিকে কোন খণ্ডরূপে তিনি প্রত্যক্ষ করেন নাই, ইহাকে কোন সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করিয়া লইয়া তাহার স্বতন্ত্র কোন

রূপের সার্থকতাও তিনি স্বীকার করেন নাই। রবীন্দ্রনাথের ঋতুবিষয়ক নাটকগুলির মধ্য দিয়া এই কথাই সর্বত্র ব্যক্ত হইয়াছে।

এই ঋতুবিষয়ক নাটকগুলির মধ্যে যে সকল মানব-চরিত্রের পরিকল্পনা করা হইয়াছে, তাহাদের কোনটিই নাট্যিক চরিত্র হিসাবে স্ফূর্তিলাভ করিতে পারে নাই। তাহাদের অধিকাংশই 'টাইপ' বা ছাঁচ প্রকৃতির, তাহারা প্রায়শঃই এক একটি তত্ত্বের বাহন ; এতদ্ব্যতীত তাহাদের আর কোন মানবীয় পরিচয় নাই। তাহারা রাজা, কবি, ঠাকুরদাদা ইত্যাদি বলিয়া পরিচিত, তাহাদিগকে প্রত্যেক নাটকের মধ্যেই পাওয়া যায়, ইহারা সর্বত্র একই তত্ত্বেরই যে বাহন মাত্র, তাহা নহে—একই স্বরের ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি মাত্র। এই দিক দিয়া এই শ্রেণীর নাটকের মধ্যে যে একটু বৈচিত্র্যের অভাব আছে, তাহা স্বীকার করিতেই হয়। ঠাকুরদাদার মত ভাবসর্বস্ব, কবির মত আদর্শগত-প্রাণ ও রাজার মত জীবনজিজ্ঞাসুর সর্বত্র অবতারণা না করিয়াও যে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ঋতু-দর্শনের বিশিষ্ট মতবাদ ব্যক্ত করিতে না পারিতেন, তাহা কখনই নহে ; অথচ একই প্রকৃতির চরিত্রের সর্বত্র অবতারণার জন্য নাটকগুলির মধ্যে বৈচিত্র্যসৃষ্টি সম্ভবপর হয় নাই। ইহা এই শ্রেণীর নাটকগুলির একটি গুরুতর ত্রুটি। কিন্তু কি প্রকৃতির রাজ্যে, কি মানুষের রাজ্যে রবীন্দ্রনাথ বাহ্য খণ্ড বৈচিত্র্য সৃষ্টি অপেক্ষা ইহাদের অন্তরের গভীরতম ঐক্যটির সন্ধান করিয়াছেন, প্রকৃতি-উৎসবের বাহ্য বৈচিত্র্য অপেক্ষা অখণ্ড প্রকৃতি-রূপের চির-স্থির বাণীরূপটির তিনি সন্ধান করিয়াছেন, সেইজন্য সম্ভবতঃ তিনি ইহাদের বহিঃসৌন্দর্যের বৈচিত্র্যসৃষ্টিতে তত মনোযোগী হইতে পারেন নাই।

রবীন্দ্রনাথের ঋতুনাট্যগুলির মধ্যে 'শেষ-বর্ষণ'-ই সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য। এই বিষয়ক নাট্যগুলির মধ্যে রচনার দিক দিয়া যে ইহা সর্বপ্রথম, তাহা নহে—ঋতুনাট্যগুলির বিষয়-পারম্পর্য বিবেচনা করিলে ইহাকে সর্বপ্রথমই স্থান দিতে হয়। গ্রীষ্মঋতু বিষয়ক রবীন্দ্রনাথের কোন নাট্যরচনা নাই। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, এই ঋতুনাট্যগুলি শান্তিনিকেতন আশ্রমে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন ঋতু-উৎসবে অভিনীত হইবার জন্যই রচিত হইত। গ্রীষ্মের জন্য শান্তিনিকেতনের শিক্ষা-ভবন ও বিদ্যালয়-বিভাগ বন্ধ থাকিত, সেইজন্য গ্রীষ্মকালে কোনও উৎসব অনুষ্ঠিত হইত না। এইজন্যই হউক, কিংবা রবীন্দ্র-কবিমানসের বিশিষ্ট আদর্শ বিরোধী বলিয়াই হউক, গ্রীষ্ম সম্বন্ধে তাঁহার কোন নাট্যরচনা দেখিতে পাওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথ হেমন্ত ঋতু

বিষয়কও কোন নাটক রচনা করেন নাই। স্বর্গত চারু চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত কথোপকথনে রবীন্দ্রনাথ একবার বলিয়াছিলেন, 'আমাদের দেশের হেমন্তের কোন রূপ নেই। অন্য ঋতুগুলির নিজস্ব রূপ বা তাৎপর্য আছে, অন্তরের অর্থ আছে, হেমন্তের তেমন কিছু নেই' (রবি-রশ্মি ২, পৃঃ ৮৪)। ইহার পর তিনি হেমন্তের একটা তাৎপর্য বাহির করিলেও এবং ছয়ঋতু সম্বন্ধেই নাটক রচনার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াও (দ্রষ্টব্য, ঐ) তিনি গ্রীষ্ম ও হেমন্তকে অবলম্বন করিয়া কোন নাট্যরচনায় হস্তক্ষেপ করেন নাই।

'শেষ-বর্ষণ' বর্ষাঋতু-বিষয়ক রচনা। কিন্তু ইহা বর্ষার বোধন-নাট্য নহে, বর্ষার বিদায়-নাট্য। বর্ষা-সৌন্দর্যের ঐশ্বর্য অপেক্ষা অন্য একটি গূঢ়তর তাৎপর্য ইহার ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, ঋতুচক্রের নিরবচ্ছিন্ন নিত্য আবর্তনের অনুভূতিই রবীন্দ্রনাথের ঋতু-নাট্যগুলির ভিতর দিয়া ব্যক্ত হইয়াছে। 'শেষ-বর্ষণ'-এর ভিতর দিয়া এই কথাই প্রকাশ করা হইয়াছে। 'ফাল্গুনী' নাটকেরও ইহাই বিষয়। এই সম্পর্কে তাঁহার বক্তব্য এই যে, যে-রূপে আমরা ঋতুকে প্রত্যক্ষ করি, তাহা ইহার নিত্যরূপ নহে, ছদ্মরূপ মাত্র। ঋতুতে ঋতুতে এক একটা ছদ্মরূপ খসিয়া গিয়া তাহার নূতন আর একটা ছদ্মরূপ প্রকাশ পায় মাত্র। তিনি 'শেষ-বর্ষণ'-এ বলিয়াছেন, '...বাদল লক্ষ্মীর অবগুণ্ঠন খুলে দেখো। চিন্‌তে পার্‌বে সেই ছদ্মবেশিনীই শরৎ-প্রতিমা। বর্ষার ধারায় যাঁর কণ্ঠ গদগদ, শিউলি বনে তাঁরই গান, মালতী বিতানে তাঁরই বাঁশির ধ্বনি।' 'ফাল্গুনী'র মধ্যেও দেখিতে পাই, শীতের জড়তার মধ্যেই তিনি বসন্তের নবজীবনের উদ্বোধন করিয়াছেন। কিন্তু 'শেষ-বর্ষণে'র বৈশিষ্ট্য এই যে, এই তত্ত্বকথাটি ইহার মধ্যে খুব প্রাধান্য লাভ করিয়া উঠিতে পারে নাই। প্রকৃত পক্ষে ইহার মধ্যে বর্ষার রস-সৌন্দর্যের বিস্তারই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের ঋতুনাট্যগুলির মধ্যে ইহার বিশিষ্ট স্থান রহিয়াছে।

'শেষ-বর্ষণ' ক্ষুদ্রায়তন একটি গীতি-নাট্য। ইহা ভাব-সমৃদ্ধ না হইলেও রস-সমৃদ্ধ বটে। ঋতুনাট্যগুলির মধ্যে ভাব অপেক্ষা রসই অধিকতর প্রয়োজনীয়; এই দিক দিয়া ইহার সার্থকতা অবিসংবাদিত। ইহার কাহিনী-ভাগ খুব সংক্ষিপ্ত। কাহিনীটি নাট্যের উপযোগী নহে, কাব্যেরই উপযোগী। তাহা এই প্রকার—আশ্বিন মাসে রাজা ঋতু-উৎসব করিবার জন্য দেশান্তর হইতে নটরাজ, নাট্যাচার্য ও গায়ক-গায়িকার দলকে আহ্বান

করিয়া আনিয়াছেন। কবিশেখর-রচিত একটি পালাগান এই উপলক্ষে অভিনীত হইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। বর্ষাকে আহ্বান করিয়া নটরাজ উৎসবের সূচনা করিল। নটরাজের গানের দলের সঙ্গীতে অন্তরের আকাশে বর্ষা যখন ঘনাইয়া আসিল, তখনই বর্ষার বিদায়ের পালা সুরু হইল। বর্ষার অন্ধকারের প্রান্তে শরৎ-প্রত্যূষের শুকতারা দেখা দিল। শরতের মাধুরী বাতাসে বাতাসে আভাসে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল, তাহারই ছায়ারূপ কবির গানের মধ্যে ধরা দিল। বর্ষার অবগুণ্ঠন ঘুচিয়া গেল, শরতের রূপ মূর্ত হইয়া উঠিল; কিন্তু তাহার মধ্যেও এই যাই-যাই ভাব। নটরাজ বলেন, এই যাওয়া আসায় স্বর্গমর্ত্যের মিলন-পথ বিরহের ভিতর দিয়া খুলিয়া যায়। এইখানেই কবির বাঁশী নীরব হইল।

ভাষণ ও সঙ্গীতের রচনা-কুশলতায় এই অপরিসর গীতিনাট্যটি নিবিড় রসঘন হইয়া উঠিয়াছে। যে-প্রকৃতি-বন্দনা এই শ্রেণীর নাটকের মুখ্য উদ্দেশ্য, তাহা ইহার মধ্যে অপূর্ব সার্থক হইয়াছে। মানব-মনের উপর প্রকৃতির প্রভাবের চিত্রটি ইহাতে এত নিপুণভাবে দেখান হইয়াছে যে, ইহার পরিকল্পনায় প্রকৃতি ও মানুষের পার্থক্য ঘুচিয়া গিয়াছে, ইহার কথা ও সঙ্গীতের অনবদ্য ধ্বনি-তরঙ্গে মানবের অন্তরের আকাশ ও বাহিরের আকাশ একাকার হইয়া গিয়াছে বলিয়া অনুভূত হয়।

ইহার বিষয়বস্তু যেমন বৈচিত্র্যহীন গীতিকাব্যের অনুকূল, তেমনই ইহার রচনা-ভঙ্গিও সম্পূর্ণ গীতিকাব্যেরই বিধান-সম্মত। তবে ইহার মধ্যে কোন তত্ত্বকথার জটিলতা নাই, ইহার সহজ সৌন্দর্য-বন্দনার দিকটা অনায়াসেই সকলকে মুগ্ধ করে। রবীন্দ্রনাথের ঋতুবিষয়ক উৎকৃষ্ট কতকগুলি সঙ্গীত ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত 'কল্পনা' কাব্যের বর্ষামঙ্গল কবিতাটিও ইহার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের ঋতু-বিষয়ক নাটকগুলির মধ্যে 'শারদোৎসব'ই সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ রচনা। 'শেষ-বর্ষণ' নামক ক্ষুদ্র গীতিনাট্যখানিকে 'শারদোৎসবে'রই prelude বা প্রস্তাবনা বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়। ইহা সামান্য পরিবর্তিত আকারে 'ঋণ-শোধ' নামে প্রচারিত হয়। 'ঋণ-শোধের' কাহিনী সংক্ষেপে এই—

শরৎকাল উপস্থিত। সম্রাট্ বিজয়াদিত্যের মন্ত্রী তাঁহাকে তাঁহার কৌলিক প্রথানুযায়ী সসৈন্যে নূতন রাজ্য জয় করিতে বাহির হইবার জন্য

অনুরোধ জ্ঞাপন করিলেন। সম্রাট্ শরতের এই আমন্ত্রণকে উপেক্ষা করিতে চাহিলেন না, কিন্তু সৈন্যবল পরিত্যাগ করিয়া বিনা আড়ম্বরে একাকী বাহির হইতে চাহিলেন। মন্ত্রী ও সেনাপতি ইহার কোন অর্থ খুঁজিয়া পাইলেন না। তারপর সম্রাট্ এক সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া তাঁহার সভাকবি শেখরকে মাত্র সঙ্গে লইয়া পথে বাহির হইয়া পড়িলেন। বেতসিনী নদীর তীরে বালকগণ শরৎকালের বন্দনা-গান গাহিতেছিল, নিকটবর্তী গৃহ হইতে এক শ্রেষ্ঠী বাহির হইয়া আসিয়া তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিল। শ্রেষ্ঠীর নাম লক্ষেশ্বর। ঠাকুরদাদা আসিয়া বালকদিগের সঙ্গে মিশিলেন এবং তাহাদিগের আনন্দের সঙ্গী হইলেন। উৎসব-মত্ত বালকগণ ঠাকুরদাদাকে লইয়া অন্যত্র চলিয়া গেল। বীণাকার স্বরসেন শ্রেষ্ঠী লক্ষেশ্বরের নিকট কিছু টাকা ধার করিয়াছিলেন। এই ঋণ শোধ করিবার পুর্বেই তাঁহার মৃত্যু হইল। তাঁহার এক বালক শিষ্য ছিল, নাম উপনন্দ। উপনন্দকে নিরাশ্রয় অবস্থা হইতে আশ্রয় দিয়া স্বরসেন তাহার জীবিকা-সংস্থানের উপায়-স্বরূপ চিত্র-বিচিত্র করিয়া পুঁথি নকল করিবার বিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন। এই কার্য দ্বারাই উপনন্দ গুরুর ঋণ-শোধ করিবার ভার স্বেচ্ছায় নিজের উপর গ্রহণ করিল। শারদ প্রকৃতির রাজ্যে বালকগণ ঠাকুরদাদাকে লইয়া যখন উৎসব আনন্দে মত্ত, তখন উপনন্দ এক কোণে বসিয়া নিজের মনে পুঁথি নকল করিয়া যাইতেছিল। সন্ন্যাসি-বেশী সম্রাট্ বিজয়াদিত্য আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন ; বালকগণ এই ছদ্মবেশী সন্ন্যাসীর চেলা সাজিল এবং উপনন্দকেও গিয়া তাঁহার চেলা সাজিয়া খেলা করিবার জন্য বারবার মিনতি করিতে লাগিল। কিন্তু উপনন্দ তাহার হাতের কাজ অসম্পূর্ণ রাখিয়া কিছুতেই উঠিতে চাহিল না। রাজ-সন্ন্যাসী তাহার পাশে আসিয়া সস্নেহে তাহার কাজের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন ; উপনন্দ তাহার ঋণের কথা বলিল। শুনিয়া তিনি মুগ্ধ হইলেন, তাহার কার্যে তিনি তাহাকে সাহায্য করিতে চাহিলেন, তাহা দেখিয়া বালকের দল আসিয়া উপনন্দর পুঁথি লেখার কার্যে লাগিয়া গেল. কিন্তু তাহারা অল্পক্ষণেই শ্রান্ত হইয়া পড়িল। উপনন্দ তাহার কাজ করিয়া চলিল। বিজয়াদিত্যের একজন সামন্ত রাজা ছিলেন, নাম সোমপাল। তিনি ছদ্মবেশী সন্ন্যাসীর নিকট আসিয়া বিজয়াদিত্যের বিরুদ্ধে বিজয়-লাভের আশীর্বাদ প্রার্থনা করিলেন ; শ্রেষ্ঠী লক্ষেশ্বরও তাঁহার নিকট আসিয়া অর্থ-লাভের জন্য বর প্রার্থনা করিল। উভয়ের নিকটই পরিচয় গোপন রাখিয়া

নিজের সম্বন্ধে আলোচনা দ্বারা সন্ন্যাসী পরম কৌতুকের সৃষ্টি করিলেন। উপনন্দ এক প্রান্তে বসিয়া পুঁথি নকল করিয়া যায়। লক্ষেশ্বর তাহাকে আসিয়া একবার অকারণে অপমান করিল; সে মনে করিল, লক্ষেশ্বরের এই অপমান দিয়াই তাহার প্রভুর ঋণ চুকাইয়া দিবে, কিন্তু আবার তাহার মনে গ্লানির সঞ্চার হইল; আবার পুঁথি নকল করিয়া ঋণশোধের আয়োজন করিতে লাগিল। বিশ্বের প্রকৃতিতে শারদার আবির্ভাব হইয়াছে; কবিশেখর বালকদিগকে লইয়া আনন্দে মত্ত। বিজয়াদিত্যের অনুচরবর্গ তাহাদের সম্রাটের সন্ধানে বাহির হইয়াছে। তাহাদিগকে দেখিয়া ভীত লক্ষেশ্বর রাজ-সন্ন্যাসীর আশ্রয়ে তাহার সমস্ত সম্পদ আনিয়া রক্ষা করিল। অবশেষে সন্ন্যাসীর পরিচয় জানিতে পারিয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া সামন্ত রাজা সোমপাল সর্বতোভাবে তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন, লক্ষেশ্বরও একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। উপনন্দ এই কয়দিন পুঁথি লিখিয়া তিন কাহন অর্জন করিয়াছে, কিন্তু লক্ষেশ্বরের নিকট তাহার প্রভুর সহস্র কার্ষাপণ ঋণ। সম্রাট্ উপনন্দর নিকট হইতে তাহার অর্জিত তিন কাহন মুদ্রা চাহিয়া লইলেন এবং লক্ষেশ্বরকে সহস্র কার্ষাপণ গুণিয়া দিবার আদেশ করিলেন; উপায়ান্তর না দেখিয়া লক্ষেশ্বর তাহাই করিল, এই অর্থ দ্বারা উপনন্দকে ঋণমুক্ত করিয়া নিঃসন্তান সম্রাট্ তাহাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিলেন, সোমপালকেও ক্ষমা করিলেন। তারপব সোমপালের বাজ্যের প্রজা ঠাকুরদাদাকে সঙ্গে লইয়া নিজের রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

এই নাটকের বিষয়-বিন্যাস ও রচনা-ভঙ্গি যদিও রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য সাঙ্কেতিক ও রূপকনাট্যের সম্পূর্ণ অনুরূপ, তাহা হইলেও ইহা মুখ্যতঃ সকল প্রকার রূপক ও সঙ্কেত-বর্জিত নাটক। ইহার কোন অংশে রবীন্দ্রনাথের আসন্ন সাঙ্কেতিক নাটক রচনার যুগের পূর্বগামী আভাস অনুভব করা গেলেও, সমগ্রভাবে ইহার মধ্যে তেমন কোন ভাবেরই অস্তিত্ব নাই। এমন কি, পূর্বাপর সুসঙ্গত কোন ভাব-প্রকাশের দায়িত্ব এই নাটকাখ্যানের মধ্যে কবি নিজেও গ্রহণ করিতে যান নাই। এই সম্বন্ধে 'শারদোৎসবে'র ভূমিকায় তিনি রাজমন্ত্রীর মুখ দিয়া যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বিশেষভাবেই লক্ষ্য করিবাব যোগ্য। এই 'শারদোৎসবে'র বিষয়-বস্তু সম্পর্কে মন্ত্রী রাজাকে বলিতেছেন যে, 'সেটা গানেতে গন্ধেতে রঙেতে রসেতে মিশিয়ে একটা কিছুই-না-গোছের জিনিস। ......তা' শরৎকালের উপযোগী খুব হাল্কা

রকমের ব্যাপার। তা'র মধ্যে ভার এতটুকুও নেই।......শরৎকালের মেঘ যে হাল্কা, তা'র কোন প্রয়োজন নেই, তা'র জলভার নেই, সে নিঃসম্বল সন্ন্যাসী'।

হয়ত 'শারদোৎসব' রচনায় রবীন্দ্রনাথের মূলতঃ ইহাই উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু যখন তিনি ইহাকে 'ঋণ-শোধ' নামে পরিবর্তিত করিলেন, তখনই ইহাতে লঘুভার শরৎ-মেঘের কিছুই-না-গোছের এই হাল্কা ভাবটুকুর স্থানে একটি তত্ত্বকথার প্রাধান্য দিতে চাহিলেন। 'শারদোৎসবে'র মধ্যে যাহা নিতান্ত প্রচ্ছন্ন ভাবে ছিল, তাহাই 'ঋণ-শোধে'র মধ্যে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। 'ঋণ-শোধে'র মধ্যে যে তত্ত্বকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে, তাহা 'কিছুই-না-গোছের' বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না; ইহার মধ্যে প্রকৃতি-প্রেমিক রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতি-সৌন্দর্যের মর্ম-কথাটি এই ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন,—'যদি তাকিয়ে দেখ, তবে দেখবে, সব সুন্দরই দুঃখের শোভায় সুন্দর। এই যে ধানের ক্ষেত আজ সবুজ ঐশ্বর্যে ভ'রে উঠেছে, এ'র শিকড়ে শিকড়ে পাতায় পাতায় ত্যাগ। মাটি থেকে জল থেকে হাওয়া থেকে যা কিছু ও পেয়েচে সমস্তই আপন প্রাণের ভিতর দিয়ে একেবারে নিংড়ে নিয়ে মঞ্জরীতে মঞ্জরীতে উৎসর্গ ক'রে দিলে। তাই ত চোখ জুড়িয়ে গেল।' প্রকৃতি-রাজ্যে এই ঋণ-শোধের প্রচ্ছন্নলীলা অনবরত চলিতেছে, সেইজন্য প্রকৃতি এত সুন্দরী। প্রকৃতি-রাজ্যের এই তত্ত্বটিই রবীন্দ্রনাথ শারদোৎসবের উপনন্দ চরিত্রের ভিতর দিয়া রূপ দিয়াছেন। এই সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজেও লিখিয়াছেন,—'রাজা বেরিয়েছেন সকলের সঙ্গে মিলে শারদোৎসব করবার জন্যে। তিনি খুঁজছেন তাঁ'র সাথী। পথে দেখ্‌লেন ছেলেরা শরৎ প্রকৃতির আনন্দে যোগ দে'বার জন্যে উৎসব কর্‌তে বেরিয়েছে। কিন্তু একটি ছেলে ছিল—উপনন্দ—সমস্ত খেলাধূলো ছেড়ে সে তা'র প্রভুর ঋণশোধ কর্‌বার জন্যে নিভৃতে ব'সে একমনে কাজ কর্‌ছিল। রাজা বল্‌লেন, তাঁর সত্যকার সাথী মিলেছে, কেন না ঐ ছেলেটির সঙ্গেই শরৎ প্রকৃতির সত্যকার আনন্দের যোগ—ঐ ছেলেটি দুঃখের সাধনা দিয়ে আনন্দের ঋণ-শোধ কর্‌ছে, সেই দুঃখেরই রূপ মধুরতম।' (—প্রবাসী, ১৩২৪, পৃঃ ২৯৭)

মানব-জীবনের দুঃখকে রবীন্দ্রনাথ চিরকালই মহান্ বলিয়া অনুভব করিয়াছেন, এই দুঃখকেই তিনি এইখানে সুন্দরের রূপে অনুভব করিলেন; কারণ, রবীন্দ্রনাথের মতে যাহা মহান্, তাহাই সুন্দর, তাহাই পরিপূর্ণ।

প্রকৃতির রাজ্যে আনন্দ-মিলনের ক্ষণ-মুহূর্তে উপনন্দ প্রেমের ঋণশোধের দুঃখকেই একান্ত করিয়া লইয়াছিল, রবীন্দ্রনাথ শারদ প্রকৃতির সমগ্র সৌন্দর্যের মধ্যে বালকের এই দুঃখকেই বড় করিয়া দেখিলেন ; তিনি অনুভব করিলেন, প্রেমের ঋণ-শোধের দুঃখেই শারদ প্রকৃতি সৌন্দর্যের পরিপুর্ণতা লাভ করিয়াছে—'শারদোৎসবের ছুটির মাঝখানে বসে উপনন্দ তা'র প্রভুর ঋণ-শোধ করছে। রাজ-সন্ন্যাসী এই প্রেম-ঋণ শোধের, এই অক্লান্ত আত্মোৎসর্গের সৌন্দর্যটি দেখ্‌তে পেলেন। তাঁর তখনি মনে হলো শারদোৎসবের মূল অর্থটি এই ঋণশোধের সৌন্দর্য।......উপনন্দ তার প্রভুর নিকট হতে প্রেম পেয়েছিল, ত্যাগ স্বীকারের দ্বারা প্রতিদানের পথ বেয়ে সে যতই সেই প্রেম-দানের সমান ক্ষেত্রে উঠ্‌ছে, ততই সে মুক্তির আনন্দ উপলব্ধি করছে। দুঃখই তাকে এই আনন্দের অধিকারী করে। ঋণের সঙ্গে ঋণশোধের বৈষম্যই বন্ধন এবং তাই কুশ্রীতা।' (—বিচিত্রা, ১৩৩৬, পৃঃ ৪৯১)

এখন এই তত্ত্ব কি ভাবে নাটকের ভিতর দিয়া ব্যক্ত হইয়াছে, তাহাই দেখিতে হইবে। এ' কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয় যে, সৌন্দর্য সম্বন্ধীয় রবীন্দ্রনাথের এই বিশিষ্ট তত্ত্ব-দৃষ্টি এই নাট্যকাহিনী কিংবা নাট্যিক কোন চরিত্রের গভীরতম স্তরে গিয়া পৌছিতে পারে নাই। মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ যখন 'শারদোৎসব' রচনা করেন, তখন তাঁহার মনে এই তত্ত্ব-কথার উদয় হয় নাই। ইহাতে শারদ আকাশের বিচ্ছিন্ন মেঘখণ্ডের ন্যায় নাট্যিক খণ্ড চিত্রগুলি অসংলগ্নরূপে যদৃচ্ছ ভাসমান করিয়া অঙ্কিত করা হইয়াছে। অতঃপর রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁহার 'ফাল্গুনী'র রচনার ভিতর দিয়া রূপক ও সঙ্কেতের সহায়তায় নানা তত্ত্বকথার অবতারণ করিলেন, তখন তাঁহার পুর্ব-রচিত রূপক ও সঙ্কেত-বর্জিত এই সাধারণ নাটকটির ভিতর হইতেও ঋণ-শোধের এই তত্ত্ব-কথাটি উদ্ধার করিলেন। ইহাই 'শারদোৎসবে'র 'ঋণ-শোধে' পরিণতির ইতিহাস। সেইজন্য এই নাটকের এই তত্ত্বগত উদ্দেশ্য নাট্যিক চিত্র এবং চরিত্রগুলির সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কে জড়িত নহে। অতএব এই নাটকের সৌন্দর্য উপভোগ করিতে হইলে, এই তত্ত্বকথা বাদ দিয়া ইহার বহিঃসৌন্দর্যই উপভোগ করিতে হয়। নাটকের এই বহিঃসৌন্দর্যকেই 'শারদোৎসবে'র 'ভূমিকা'য় গানেতে গন্ধেতে রঙেতে রসেতে মিশিয়ে একটা কিছুই-না-গোছের জিনিস বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে এবং ইহার উপরই নাটকের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু এই নাটক যখন ঋণ-শোধে পরিবর্তিত হয়, তখন

ইহার বহিঃসৌন্দর্যের এই গুরুত্ব নির্দেশের অংশ বা এই 'ভূমিকা' পরিত্যক্ত হয়। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহার তথাকথিত আভ্যন্তরীণ তত্ত্ব-কথা কোন ভাবেই গুরুত্ব লাভ করিতে পারে নাই।

তত্ত্বের কথা বাদ দিয়া কেবল যদি ইহা বহিঃসৌন্দর্যের দিক হইতেও বিচার করা যায়, তাহা হইলেও এই নাটকের একটি গুরুতর ত্রুটি চোখে পড়ে। ইহাতে বহিঃপ্রকৃতি নাট্যোক্ত কোন চরিত্রেরই মনের উপর গভীর ভাবে কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই; ইহাতে উৎসবের তাগিদটি মানবের অন্তর হইতে আসে নাই, সম্পূর্ণ বাহির হইতে আসিয়াছে। গীতিকাব্যের মধ্যে এই পরিকল্পনা একেবারে ব্যর্থ না হইলেও, নাটকের মধ্যে ইহার খুব উচ্চ স্থান দেওয়া যাইতে পারে না। কারণ, প্রকৃতি এখানে যখন একটি প্রধান অংশ অভিনয় করিয়াছে, তখন নাট্যোক্ত অন্যান্য চরিত্রের উপর তাহার গভীর প্রভাব নির্দেশ করা প্রয়োজন ছিল; তাহা না হইলে প্রকৃতি ও মানব ইহাদের পৃথক্ অস্তিত্ব অর্থহীন হইয়া পড়ে। 'ঋণ-শোধে'র তত্ত্বকথা এই নাটকের সঙ্গে যেমন অতি ক্ষীণতম যোগসূত্রে আবদ্ধ করা হইয়াছে, তেমনই শারদোৎসবের আনন্দও মানুষের অন্তঃপ্রকৃতির প্রেরণা হইতে জাত বলিয়া নির্দেশ করা হয় নাই। তবে এ' কথাও অবশ্য স্বীকার করিতে হয় যে, রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি-বিষয়ক নাটকগুলিকে সাধারণ নাট্যিক আদর্শের মাপকাঠিতে বিচার করা সমীচীন হয় না; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইহাদের মূল্য গীতিকাব্যগত, নাট্যিক নহে; ইহাদের মধ্যে নাট্যিক চরিত্র-সৃষ্টির যেমন প্রয়াস নাই, তেমনই নাট্যগত ঘটনা সংস্থাপনারও কোন পরিচয় পাওয়া যায় না; অতএব রবীন্দ্রনাথের এই শ্রেণীর নাটককে স্বতন্ত্র আদর্শে তাহাদের নিজেদের পরিবেশের মধ্যেই বিচার করা সমীচীন।

অতএব বাহিরের প্রকৃতি-উৎসবের দিক হইতেই ইহার বিচার করা যাইতেছে। এই হিসাবেও নাটকটির ত্রুটি নিতান্ত অল্প নহে। 'শারদোৎসব'কে যদি এইভাবে বিচার করি, তাহা হইলে দেখিতে পাই, উৎসবের বর্ণনাও ইহার মধ্যে প্রধান কোন অংশ অধিকার করিয়া নাই; প্রারম্ভেই সুসজ্জিত উৎসব-মণ্ডপে আসিয়া আমরা প্রবেশ করি, কিন্তু তাহার পর মুহূর্তেই আমাদিগকে এই উৎসব-ক্ষেত্র হইতে বহুক্ষণের জন্য সরিয়া দাঁড়াইতে হয়; তারপর এই নাটকের একেবারে শেষ অংশে আবার উৎসবের সঙ্গে সামান্য একটু পরিচয়ের পরই নাটকের যবনিকা-পাত হইয়া যায়। ইহার মধ্যবর্তী

অংশে কোন কোন স্থানে কাহারো কাহারো মুখে এই উৎসব সম্পর্কে দুই একবার উল্লেখ থাকিলেও তাহার প্রকৃত অনুষ্ঠানের কোন পরিচয় নাই।

পূর্বেই বলিয়াছি, রবীন্দ্রনাথের অন্যতম ঋতুবিষয়ক গীতিনাট্য 'শেষ-বর্ষণ'কে এই 'শারদোৎসবে'র প্রবেশক বা prelude হিসাবে ধরা যায়। 'শেষ-বর্ষণে'ও এই সম্বন্ধে এই প্রকার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। নাটকের সূচনায় রাজা নটরাজকে 'শেষ-বর্ষণ'-এর বিষয়-বস্তু সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—

রাজা। * * পালাটা আরম্ভ হ'বে কী দিয়ে?

নটরাজ। বর্ষাকে আহ্বান? এই আশ্বিন মাসে?

রাজ-কবি। ঋতু উৎসবের শব-সাধনা? কবিশেখর ভূত কালকে খাড়া ক'রে তুল্‌বেন! অদ্ভুত রসের কীর্তন।

নটরাজ। কবি বলেন, বর্ষাকে না জান্‌লে শরৎকে চেনা যায় না। আগে আবরণ তারপরে আলো।

অতএব দেখা যাইতেছে, 'শারদোৎসবে'র স্বতন্ত্র কোন মূল্য আছে বলিয়া রবীন্দ্রনাথ নিজেও দাবি করেন না। রবীন্দ্রনাথের গীতিকাব্যের মূল ধারাটি যেমন অখণ্ডনীয়, তেমনই এই গীতিকাব্যের সমপর্যায়ভুক্ত ঋতু-নাট্যগুলিও এক অখণ্ড যোগসূত্রে আবদ্ধ; অনেক সময়ই স্বতন্ত্র করিয়া বিচার করিলে ইহাদের কোন অর্থ উদ্ধার করিতে পারা যায় না।

এই নাটকের মধ্যে বিজয়াদিত্য (সন্ন্যাসী), লক্ষেশ্বর, উপনন্দ, ইহারাই উল্লেখযোগ্য চরিত্র। এতদ্ব্যতীত কবিশেখর ও ঠাকুরদাদা নাটকের মধ্যে বিস্তৃত অংশ অধিকার করিয়া থাকিলেও চরিত্র হিসাবে নাটকের মধ্যে ইঁহাদের কোন প্রাধান্য নাই। বিজয়াদিত্যের মধ্যে প্রকৃতির সরল সৌন্দর্য-বোধ অপেক্ষা মানব-চরিত্র-বিষয়ক সূক্ষ্ম কৌতুক-বোধই অধিক বলিয়া অনুভব করা যায়। শারদ-প্রকৃতির উদার আহ্বানে তিনি প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসীর বেশে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছেন বলিয়া কিছুতেই মনে করা যায় না। তাঁহার পূর্বপুরুষেরা এই শরৎকালেই দিগ্বিজয়ে বাহির হইতেন, রাজ-মন্ত্রী এই কথা বিশেষভাবে স্মরণ করাইয়া দেওয়াতেই তিনি প্রেম দিয়া বিশ্বের প্রেমের ঋণ শোধ করিবার জন্যই বহির্গত হইয়াছেন। মন্ত্রী তাঁহাকে তাঁহার 'রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম সীমানায় যে মানিকপুর আছে সেইটে জয় ক'রে নেবার' পরামর্শ দিয়াছিলেন, এই জয়ে বাহুবল প্রকাশের ঔদ্ধত্য ছিল; তিনিও জয় করিলেন সত্য, কিন্তু মানুষের হৃদয়ের রাজ্য জয় করিলেন; ক্ষমা ও উদারতা দ্বারা

গোপন-বিদ্রোহী সামন্ত রাজা সোমপালকে ও কুসীদজীবী শ্রেষ্ঠী লক্ষেশ্বরকে জয় করিলেন। এই নিতান্ত সাধারণ কথাটিই তাঁহার চরিত্রের ভিতর দিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে; অতএব তিনি এই নাটকে উৎসবানন্দের নায়ক নহেন, অত্যন্ত সাধারণ একটি তত্ত্বের পরিবেশক। রবীন্দ্রনাথ যে তাঁহাকে উৎসবের পুরোহিত বলিয়া নির্দেশ করিতে চাহেন, তাহা এই জন্যই সমর্থনযোগ্য নহে।

ইহার পরই লক্ষেশ্বরের কথা বলিতে হয়। রবীন্দ্রনাথ নিজে এই লক্ষেশ্বরকেও একটি তত্ত্ব হিসাবে উপস্থিত করিতে চাহিয়াছেন। তিনি বলিতে চাহেন, 'নাটকের পাত্রগণের মধ্যে এই উৎসবে বাধা কে? লক্ষেশ্বর, সেই বণিক আপনার স্বার্থ নিয়ে টাকা উপার্জন নিযে সকলকে সন্দেহ ক'রে ভয় ক'রে ঈর্ষা ক'রে সকলের কাছ থেকে আপনার সমস্ত সম্পদ গোপন ক'রে বেড়াচ্ছে ('বিচিত্রা'—ঐ)।' এই নাটকে উৎসবের আয়োজন যেমন ক্ষীণ, ইহার বাধাও তেমনই দুর্বল। উৎসবের যে দীনতম আয়োজনের ইঙ্গিতটিও এই নাটকের মধ্যে আছে, তাহারও বিরোধিতা করিয়া প্রবল নাট্যিক সংঘাত সৃষ্টি করিবার শক্তি এই চরিত্রটির নাই। তবে নাটকের লঘু পরিবেশের মধ্যে তাহার সংস্থান একেবারে উপেক্ষণীয় নহে। প্রকৃতির রাজ্য হইতে নির্বাসিত হইয়া সে যে নীচ ব্যবহারিক জীবনের স্বার্থপরতার মধ্যে আত্ম-নিমজ্জিত হইয়া আছে, তাহা সার্থকভাবেই দেখান হইয়াছে। কিন্তু নাট্যিক চরিত্রসৃষ্টির সার্থকতা ত' কেবল এইখানেই নহে, বিরোধী প্রবৃত্তির সম্মুখীন হইয়া নাট্যিক বিক্ষোভ যে তাহা দ্বারা কত উচ্চ গ্রামে উন্নীত হইতে পারে, এই শ্রেণীর নাট্যিক চরিত্রের মধ্যে তাহারই সন্ধান করিতে হয়। সেই দিক দিয়া এই চরিত্রের ক্রটি অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়।

তাবপর উপনন্দ। এই চরিত্র-পরিকল্পনার মূলে রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বগত কি উদ্দেশ্য ছিল, তাহা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। উৎসবের দিনে প্রভুর প্রেমের ঋণ শোধ করিবার দুঃখকে জীবনে বরণ করিয়া সে প্রকৃত সৌন্দর্য ও আনন্দের অধিকারী হইয়াছে। কেহ আবার মনে করেন, উপনন্দের আত্মদান নিঃশেষিত হয় নাই বলিয়া ইহা নিবিড় ভাবে আমাদের অন্তর স্পর্শ করিতে পারে নাই। কিন্তু উপনন্দর আত্মদান 'নিঃশেষিত' হয় নাই বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই। কারণ, উৎসবের দিনে দুঃখের সঞ্চয় তিন কাহন মুদ্রা কুসীদজীবী শ্রেষ্ঠীর অলস সঞ্চয় সহস্র কার্ষাপণের সমান, রবীন্দ্রনাথ

উপনন্দর সঙ্গে বিজয়াদিত্যের অর্থ বিনিময়ের ভিতর দিয়া তাহাই বলিতে চাহিয়াছেন। উপনন্দ এখানে নিজেকে নিজের দুঃখের সাধনা দিয়াই মুক্ত করিয়াছে। এই চরিত্রটি এখানে একটি বিশেষ তত্ত্বের বাহন বলিয়া ইহার নাট্যিক পরিকল্পনা সার্থকতা লাভ করিতে পারে নাই। রাজা সোমপালের চরিত্রটি নাটকে ক্ষুদ্র হইলেও সুপরিস্ফুট। ঠাকুরদাদা ও কবিশেখরের চরিত্রের ভিতর দিয়া লেখক রূপ ও ভাবের যে আনন্দ-মিলনের চিত্র পরিবেশন করিয়াছেন, তাহা অনাবিল শারদ সৌন্দর্যের মতই স্নিগ্ধ ও পবিত্র।

ইহার পর 'বসন্ত' নামক একখানি ক্ষুদ্র গীতি-নাট্য উল্লেখযোগ্য। ইহার রচনাকাল 'শেষ-বর্ষণ'-এর পূর্ববর্তী। ইহা আয়তনে 'শেষ-বর্ষণ' হইতেও ক্ষুদ্র। বিশেষতঃ 'শেষ-বর্ষণ'-এর মধ্যে যেমন কথায় সঙ্গীতে বর্ষার রূপ ফুটাইয়া তুলিবার প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায়—ইহার মধ্যে কথার ভাগ নগণ্য, সঙ্গীতই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। অতএব ইহা প্রকৃতপক্ষে গীতি-কবিতা, তবে বাহ্যতঃ নাটকের রীতিতে রচিত। ইহার বক্তব্যবিষয় সংক্ষেপে এই প্রকার—

বসন্ত-উৎসবের দিন রাজা মন্ত্রণা-সভা হইতে কবির নিকট পলাইয়া আসিয়াছেন। উৎসব উপলক্ষে কবি কি পালাগান রচনা করিয়াছেন, তাহা কবি রাজাকে শুনাইতে লাগিলেন—ঋতুরাজ আসিবেন, তাই আকাশে একটা ডাক পড়িয়াছে—নিজেকে পূর্ণ করিয়া সব কিছুই ত্যাগ করিতে হইবে। বনভূমি, আম্রকুঞ্জ, করবী ইহারা সকলেই এই ডাকে সাড়া দিল। দখিনা হাওয়া জাগিয়া উঠিল, বাহিরের বেণুবন উতলা হইয়া উঠিল, কেবল ঘরের কোণে দীপশিখাটি সঙ্কিত হইয়া রহিল। চাঁপা ও করবীর ডালপালা ফুলে ভরিয়া উঠিল, পূর্ণচন্দ্র উদিত হইল; মাধবী, শালবন, বকুলবীথি আকুল হইয়া উঠিল। এমন সময় শুকনা পাতা ঝরাইয়া উদাসীন বৈরাগীর বেশে ঋতুরাজের আবির্ভাব হইল। ঋতুরাজের চিরপথিক বেশ, নূতন-পুরাতনের মাঝখান দিয়া নিত্য যাতায়াতের পথ। ইনি বাস্তুছাড়ার দলপতি। অন্তরে ও বাহিরে উৎসব যখন পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, তখনই ঋতুরাজের যাইবার সময় উপস্থিত হইল। 'পূর্ণ থেকে রিক্ত, রিক্ত থেকে পূর্ণ, এরই মধ্যে ওঁর আনাগোনা।' প্রকৃতির মধ্যে বিদায়ের সুর বাজিয়া উঠিল। রাজবেশ খসাইয়া দিয়া বৈরাগীর বেশে ঋতুরাজ বাহির হইয়া গেল।

'শেষ-বর্ষণ'-এর অনুরূপ ভঙ্গিতে ইহা রচিত হইলেও, ইহার রস 'শেষ-বর্ষণ'-এর মত এত নিবিড় হইয়া উঠে নাই। ইহার বক্তব্যবিষয়ের মধ্যেও বৈচিত্র্যের অভাব আছে। 'শেষ-বর্ষণ' ও 'ঋণ-শোধে' মুখ্যতঃ কবি যাহা বলিতে চাহিয়াছেন, তাহাই প্রায় ইহারও বক্তব্য। ইহার মধ্যে প্রকৃতিই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, মানবাত্মার সঙ্গে প্রকৃতির নিবিড় সম্পর্কের নির্দেশ ইহাতে নাই—প্রকৃতির রাজ্যে যে উৎসবায়োজন চলিতেছে, মানুষ যেন তাহা মুগ্ধ-বিস্ময়ে দূর হইতে নিরীক্ষণ করিতেছে মাত্র। ইহার সঙ্গীত-ভাগের রচনা অনবদ্য।

রবীন্দ্রনাথের ঋতু-বিষয়ক নাটকগুলির মধ্যে 'ফাল্গুনী'ই সর্বোৎকৃষ্ট। এই নাটকের রচনা-কাল রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য সাঙ্কেতিক ও রূপক নাটক রচনা-কালের মধ্যবর্তী। ১৩২১ সালে এই নাটকখানি রচিত হয় এবং ইহার কিছুদিন পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ ইউরোপ ভ্রমণ শেষ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থখানি এই নাটকের সমসাময়িক রচনা এবং 'ফাল্গুনী' ও 'বলাকার' মধ্যে ভাবগত সম্পূর্ণ ঐক্যও দেখিতে পাওয়া যায়। এই দুইখানি গ্রন্থ রচনাতেই রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সদ্য পাশ্চাত্য ভ্রমণের অভিজ্ঞতালব্ধ আদর্শ দ্বারা অনেকখানি উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। সে কথা পরে আলোচনা করা যাইতেছে। 'ফাল্গুনী'-নাটকের আখ্যানভাগ যথাসম্ভব সংক্ষেপে বর্ণনা করা যাইতেছে :—রাজার মন বিষণ্ণ; কারণ, গত রাত্রিতে মহিষী তাঁহার কণ্ঠে মল্লিকার মালা পরাইতে আসিয়া তাঁহার কানের কাছে দুইটি পাকা চুল দেখিয়া শিহরিয়া উঠেন। রাজা বুঝিতে পারেন, ইহা দ্বারাই যমরাজ তাঁহার কানের কাছে নিমন্ত্রণ পত্র ঝুলাইয়া রাখিয়া দিয়াছেন। উপস্থিত রাজকর্তব্য পরিত্যাগ করিয়া তিনি পণ্ডিত শ্রুতিভূষণের সাহচর্যে বৈরাগ্য সাধনায় মনোনিবেশ করিলেন। এমন সময় কবি শেখর আসিয়া উপস্থিত হইলেন; কবি রাজাকে বলিলেন, 'চলার মধ্যেই প্রকৃত বৈরাগ্যের সাধনা, খালি খালি আঁকড়ে বসে থাকবার মধ্যে নয়।' কবি রাজাকে এই 'প্রাণের সদর রাস্তায়' বাহির হইয়া পড়িয়া 'যৌবনের বৈরাগীর দলে' যোগ দিবার জন্য আহ্বান করিলেন। চলিষ্ণুতার চির-অনাসক্তির মধ্যে তিনি রাজাকে চির-যৌবনের সৌন্দর্যের সন্ধান দিলেন। তিনি রাজাকে বুঝাইয়া বলিলেন, গতিশীলতাই জীবনের নিত্যত্ব রক্ষা করিতেছে, জীবনের মধ্যে এই গতিবেগকে যে অনুভব করে না, সে-ই মৃত্যু দ্বারা পীড়িত। রাজা কবির এই বাণীতে জড়তা হইতে

মুক্ত হইলেন এবং চির-যৌবনের জয়গান করিয়া একটা কিছু রচনা তাঁহাকে শুনাইবার জন্য কবিকে অনুরোধ করিলেন। কবি তাঁহাকে 'ফাল্গুনী' নাটক উপহার দিলেন। 'ফাল্গুনী' নাটকের মধ্যে কবি দেখাইলেন—বিশ্ব-প্রকৃতি বসন্তের প্রথম-শিহরণ অনুভব করিবার সঙ্গে সঙ্গেই আনন্দ-চঞ্চল একদল যুবক পথে বাহির হইয়া আসিল। তাহারা নিজেদের মধ্যেই যে শুধু চঞ্চল জীবনের প্রবাহ অনুভব করিল, তাহা নহে—তাহারা জলে স্থলে সর্বত্রই এই জীবনের চাঞ্চল্য অনুভব করিল। যুক্তিতর্ক দ্বারা জটিল ও স্থূলবুদ্ধি দ্বারা ভারাক্রান্ত দাদাকেও তাহারা পথে বাহির করিল, কিন্তু কিছুতেই তাহার সংস্কার দূর করিতে পারিল না। যুবদলের কোলাহল শুনিয়া সর্দারও বাহির হইয়া আসিল; সর্দার তাহাদিগকে একটা নূতন খেলা খেলিবার পরামর্শ দিল—খেলাটা আব কিছুই নহে, কেবল একটা বুড়োকে খুঁজিয়া বাহির করা। বুড়োটাকে কেহই চোখে দেখে নাই, সে কোথায় থাকে তাহাও কেহ জানে না, তাহাকেই খুঁজিয়া বাহিব করিবার খেলা খেলিবার জন্য সর্দার যুবদলকে বলিল। যুবদল বুড়ার সন্ধানে বাহির হইল। ঘাটের মাঝি, গাঁয়ের কোটাল ইহাদের নিকট যুবকেরা বুড়ার খোঁজ লইল, কিন্তু তাহার কোন সন্ধান পাইল না। অবশেষে এক অন্ধ বাউলের সঙ্গে তাহাদের সাক্ষাৎ হইল, বাউল তাহাদিগকে বুড়ার পথের পবিচয় বলিয়া দিল। অন্ধ বাউলের প্রদর্শিত পথে গিয়া যুবকদলের নায়ক চন্দ্রহাস এক অন্ধকার গুহার মধ্যে প্রবেশ কবিল। বাউল বলিল, 'এই গুহার মধ্যেই বুড়ো বাস করে।' যুবকদল বাহিরে থাকিয়া অধীর আগ্রহে চন্দ্রহাসেব জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। চন্দ্রহাস গুহা হইতে বাহির হইয়া আসিয়া সংবাদ দিল, সে বুড়াকে ধরিয়াছে, বুড়া আসিতেছে; কিন্তু সকলে দেখিয়া বিস্মিত হইল, গুহা হইতে বাহির হইয়া আসিল সর্দার। এই সর্দারই চিরকালের। কেহই তাহার সম্মুখ হইতে সবখানি দেখিতে পায় না, সেইজন্য তাহার পরিপূর্ণ পরিচয় জানিতে পারে না, পিছন হইতে খানিকটা মাত্র দেখিয়া তাহার রূপ এক একজন এক এক রকম অনুমান করে মাত্র। দাদা যুবকদলের সঙ্গে তাল রাখিয়া এতদূর এক সঙ্গে আসিতে পারে নাই, এতক্ষণে পশ্চাৎ হইতে আসিয়া তাহাদের সঙ্গ লইল, যুবকদল তাহাদের মনের রঙে দাদাকেও আজ রাঙাইয়া তুলিল; তারপর সর্দারকে লইয়া সকলে উৎসবে মত্ত হইল।

এই নাট্যাখ্যানকে রবীন্দ্রনাথ তিনটি প্রধান অংশে বিভক্ত করিয়াছেন।

প্রথম অংশ স্পষ্টতঃই 'ফাল্গুনী'র মূল নাটকাখ্যান হইতে স্বতন্ত্র—ইহার নাম 'সূচনা'। রাজার বৈরাগ্য-সাধনার কথা ইহার মধ্যে ব্যক্ত হইয়াছে বলিয়া এই অংশের অন্য নাম 'বৈরাগ্য-সাধন'। ইহার কাহিনী ও পরিকল্পনা 'শারদোৎসব' নাটকের প্রস্তাবনার সম্পূর্ণ অনুরূপ। এই অংশের সঙ্গে 'ফাল্গুনী'র মূল নাটকাখ্যানের কোন সম্পর্ক না থাকিলেও 'ফাল্গুনী'র বক্তব্য বিষয়ের ভূমিকা হিসাবে ইহার প্রযোজনা অত্যন্ত সার্থক হইয়াছে বলিতে হইবে; বিশেষতঃ 'ফাল্গুনী'র অলোক-পথে পদার্পণ করিবার পূর্বে কবিশেখরের মুখে তাহার যে প্রথম নির্দেশটি ইহাতে পাওয়া যায়, তাহা এই অস্পষ্ট কুয়াসা-লোকের মধ্যে অনেকখানি দিঙ্‌নির্দেশ করিতে সমর্থ হইয়াছে। বিশেষতঃ এই সামান্য কাহিনীভাগের মধ্যে নাট্যকার যে চঞ্চল প্রাণ-বেগের সঞ্চার করিয়াছেন, তাহা 'ফাল্গুনী'র গতিবাদের মর্মকথার প্রত্যক্ষ উদাহরণ বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। মূল নাটকাখ্যানের মধ্যে যে অলোক-জগতের কথা রহিয়াছে, এই অংশে তাহা একেবারেই নাই বলিয়া ইহা সাধারণ পাঠকমাত্রেরই অতি সহজে চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারে। ইহার বাস্তব পবিবেশের মধ্যে নাট্যকার যে তত্ত্বের সন্ধান পাইয়াছেন, তাহাই পরবর্তী নাট্যাংশে রূপকের সাহায্যে প্রকাশ করিয়াছেন। এই সকল বিষয় বিচার করিয়া দেখিলে এই অংশও এই নাটকের একটি বিশিষ্ট অংশ বলিয়া মনে হইবে।

দ্বিতীয় অংশকে এই নাটকের গীতি-ভাগ বলা যাইতে পারে। ইহা মূল নাটকের অন্তর্ভুক্ত হইয়াও মূল নাটকের অলোক-পরিবেশ হইতে স্বতন্ত্র। এই অংশের নায়ক-নায়িকা ও পাত্র-পাত্রী সকলেই প্রকৃতি-লোকের অন্তর্ভুক্ত। 'বেণুবন', 'পাখীর নীড়', 'ফুলন্ত গাছ' কি ভাবে বসন্তের প্রথম শিহরণ অনুভব করিল, সঙ্গীতের ভাষায় তাহাই প্রথম দৃশ্যের গীতি-ভাগে ব্যক্ত হইয়াছে। প্রকৃতির বিচিত্র চৈতন্যানুভূতির কথা সঙ্গীতেব মধ্য দিয়া কবি এখানে ব্যক্ত করিয়াছেন—এই প্রকৃতি-লোকের সঙ্গে পরবর্তী নাট্যাংশে উল্লেখিত মানব মনের মিলন যে খুব নিবিড় হইয়াছে, তাহা কিছুতেই স্বীকার করা যায় না। ইহার প্রকৃতি-লোক তাহার সুখদুঃখের সমগ্র চৈতন্য লইয়া যেন এই নাটকের অলোক-বিহারী চরিত্রসমূহের সান্নিধ্য হইতে দূরে রহিয়াছে। ইহা প্রথমতঃ রবীন্দ্রনাথের এই শ্রেণীর প্রকৃতি-বিষয়ক নাটকের একটি গুরুতর ত্রুটি বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। কিন্তু এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই নাটকের মধ্যে প্রকৃতিকে রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ সত্য বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন; ইহার

মানব-চরিত্রগুলি রূপক, কিন্তু ইহার প্রকৃতি-জগৎ প্রত্যক্ষ—প্রত্যক্ষ লোকের সঙ্গে অপ্রত্যক্ষ লোকের সংমিশ্রণ ঘটিতে দেন নাই, এইজন্যই প্রকৃতি-লোককে 'ফাল্গুনী'র অলোক-জগতের পটভূমিকায় রক্ষা করা হইয়াছে।

ইহার তৃতীয় অংশই প্রকৃত নাট্যাংশ; ইহাকে নাট্যভাগ বলা যাইতে পারে। ইহার আবার চারিটি দৃশ্য চারিটি ভাগ—পথ, সন্ধানে, সন্দেহ ও প্রকাশ। এই চারিভাগ অবশ্য কাহিনীর ক্রমপরিণতির ধারারই অন্তর্ভুক্ত এবং ইহাদের মধ্যে কোন গভীর বিরাম নাই। 'ফাল্গুনী'র কেবলমাত্র এই নাট্য-ভাগই অলোক-সংজ্ঞা বা রূপকের সহায়তায় প্রকাশ করা হইয়াছে।

'ফাল্গুনী' রূপক ও সঙ্কেতমিশ্র নাটক, ইহা আদ্যোপান্ত রূপক নাট্য কিংবা সাঙ্কেতিক নাট্য নহে, ইহার বক্তব্য বিষয় প্রকাশ করিবার জন্য রূপক ও সঙ্কেত উভয়েরই সহায়তা গ্রহণ করা হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ এই নাটকের মধ্যে এই কথাই বলিয়াছেন যে, জরার কোন রূপ নাই, কোন পরিচয় নাই; মৃত্যুও তেমনি, মৃত্যুরও কোন রূপ নাই, কোন পরিচয় নাই, কোন স্বাতন্ত্র্য নাই। জীবনের প্রকৃত পরিচয়ের অজ্ঞতার মধ্যেই জরার জন্ম, জীবনের অপরিচিত অংশেই মৃত্যুর গুহা সংস্থাপিত। যাহাকে জরা বলিয়া ভুল করি, তাহা চিরনবীন জীবনেরই এক পরিবর্তিত রূপ, যাহার মধ্যে মৃত্যুর আতঙ্ক অনুভব করি, তাহা জীবনেরই এক অপরিচিত অধ্যায়। জীবনের চিরনবীনতা ভোগ করিবার প্রকৃত অধিকারী কে? মৃত্যুর অন্ধকার গুহাদ্বার পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া গিয়া তাহার রূপ যে নিরীক্ষণ করিবার দুঃসাহস রাখে সে-ই! তাহারাই এই 'ফাল্গুনী'র চিরনবীনের দল। তাহাদেরই স্পন্দিত জীবনের উন্মত্ত চরণাঘাতে জরার জীর্ণতা নিষ্ফল কুয়াসার মত ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়।

সদ্য ইউরোপ-ভ্রমণের অভিজ্ঞতা দ্বারা রবীন্দ্রনাথ তথাকার সমাজ-জীবনের মধ্যে যে প্রাণ-শক্তির প্রাচুর্য লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছিলেন, তাহাই এই নাটকের মধ্যে ব্যক্ত করিয়াছেন। পাশ্চাত্ত্য জীবনের তুলনায় আমাদের সমাজ-জীবনের মধ্যে পদে পদে যে বাধা, জড়তার যে তামসিক অবসাদ, উদ্দেশ্যের লক্ষ্যহীনতা ইহার সম্মুখপথ অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, 'ফাল্গুনী' তাহারই বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের বিদ্রোহের অন্যতম অভিব্যক্তি মাত্র। পাশ্চাত্ত্য সমালোচকের নিকট 'ফাল্গুনী' যে প্রকৃত সমাদর লাভ করিতে পারে নাই, ইহার একমাত্র কারণও এই যে, যে-জীবনকে আদর্শ বলিয়া রবীন্দ্রনাথ এই

নাটকে কীর্তন করিয়াছেন, সেই জীবনেই নিত্য প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া আমাদের সমাজ-জীবনের জড়ত্বের পরিমাপও পাশ্চাত্ত্য সমালোচকেরা করিতে পারেন নাই; এইজন্য এই নাটকের প্রকৃত গুরুত্ব তাঁহারা অনুমান করিতে সমর্থ হন নাই। রবীন্দ্রনাথের 'অচলায়তন'-এ যেমন একটা দুর্জয় শক্তিদ্বারা এই জড়ত্ব হইতে মুক্তির কথা রহিয়াছে, ইহার মধ্যেও জীবনের সেই দুর্জয় শক্তির জয়গান রহিয়াছে। ইহার প্রেরণা সম্পূর্ণ পাশ্চাত্ত্য; আমাদের জড়-ধর্মী সমাজ-জীবনের উপর পাশ্চাত্ত্যের প্রাণধর্মী শক্তির আঘাত এই নাটকের বিষয়-বস্তুকে যে অপূর্ব গৌরবদান করিয়াছে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সমাজ-জীবনের এই আদর্শগত বৈপরীত্যের সংঘর্ষের দিকটা যাঁহারা গভীরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখেন নাই, তাঁহারাই ইহার নাট্যিক পরিকল্পনা বৈশিষ্ট্যহীন বলিয়া পরিতাপ করিয়াছেন।

এই পরিকল্পনা নাটকের বিভিন্ন চরিত্রের মধ্য দিয়া যে কি ভাবে রূপায়িত হইয়াছে, তাহাই এখন বিচার করিয়া দেখা যাইতেছে। প্রথমেই সর্দার চরিত্রের উল্লেখ করিতে হয়। সর্দারের চরিত্র নাটকের মধ্যে কোন ব্যাপক অংশ অধিকার করিয়া নাই সত্য, তথাপি উদ্দেশ্যের দিক দিয়া ইহা নাটকের সর্বপ্রধান চরিত্র। সর্দার একটি রূপক চরিত্র। তাহাকে যৌবনের জীবনীশক্তির রূপক বলিয়া নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। জীবনের উচ্ছৃঙ্খল প্রাণশক্তি তাহার নির্দেশে নিজের আনন্দের সন্ধানে আত্মনিয়োগ করিতে শিখে। প্রাণশক্তির অসংহত প্রাচুর্যের অনুভূতির মধ্যে জীবনের কল্যাণ নিহিত নাই, তাহাকে প্রকৃত আনন্দের সন্ধানে নিয়োজিত করার মধ্যেই প্রকৃত কল্যাণ, সর্দারের মধ্যে যৌবনের এই জীবনীশক্তি নিয়মিত. এই সর্দার নিত্যকালের; জীব ও প্রকৃতি-লোকে যে অনন্ত প্রাণশক্তির নিত্যলীলা অভিনীত হইতেছে, তাহার যেমন কোন বিরাম কিংবা বিকার নাই, সর্দারও তেমনই নিত্যকাল ব্যাপিয়া বিরাম ও বিকারহীন; যাহাকে জরা ও মৃত্যু বলিয়া ভ্রম করি, তাহাতে এই সর্দারেরই জীবনীশক্তির আনন্দময় নিত্য-রূপ প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। জড়তার অবসাদ এবং মৃত্যুর বিভীষিকা হইতে মুক্ত হইয়া এই অনন্ত প্রাণধারার সম্মুখীন হইতে পারিলে জীবনের সত্যকার পরিচয় লাভ করিতে পারা যায়। ইহার পরই দাদা চরিত্রটি উল্লেখযোগ্য। 'ফাল্গুনী'র লঘুভার আনন্দ-পরিবেশের মধ্যে দাদাই গুরুভার বস্তুতান্ত্রিকতার রূপক। নাটকের মূল উদ্দেশ্যের সঙ্গে এই চরিত্রটি সকল দিক দিয়াই সুন্দর

বৈপরীত্য সৃষ্টি করিয়া ইহার নাট্যিক মূল্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। তাহার স্থিতি স্থূল, গতি মন্থর; তাহার মতে জীবনের আনন্দের অংশ অনাবশ্যক, ব্যবহারিক জীবনে যাহা অপ্রয়োজনীয়, তাহা অর্থহীন। নাটকের উদ্দেশ্য সুপরিস্ফুট করিবার জন্য এই প্রকার বিপরীতধর্মী চরিত্রের পরিকল্পনা রবীন্দ্রনাথে নূতন নহে। এই শ্রেণীরই বৈপরীত্যমূলক চরিত্র কতকটা 'শারদোৎসব'-এর লক্ষেশ্বরও বটে। কিন্তু দাদার মধ্যে একটু পার্থক্য এই দেখিতে পাওয়া যায় যে, শেষ পর্যন্ত সে তাহার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে পারিল না, উৎসবের দিনে নবপল্লবের মুকুট পরিয়া তাহাকে যুবদলের আনন্দ কলরবে আসিয়া যোগদান করিতে হইল।

ইহার পরই 'ফাল্গুনী'র যুবকদলের কথা বলিতে হয়। এই যুবকদল জরামৃত্যুর ভয়হীন চিরযৌবনের প্রতীক্। জীবনের মধ্যে যে যৌবন-শক্তিকে আমরা অভ্যাস ও সংস্কারের দাসত্বে শৃঙ্খলিত রাখিয়া চক্ষু বুজিয়া মৃত্যুমন্ত্র জপ করিতেছি, এই যুবকদলের মধ্যে সেই যৌবন-শক্তিকে উদ্বোধন করা হইয়াছে। নাট্যকার বলিতে চাহেন, এই শক্তি মানুষের জীবনে আদিঅন্তহীন বা নিত্য; অতএব জীবনের মধ্যে যৌবনের কোনদিন অবসান হইতে পারে না, মানুষ চিরযৌবনের অধিকারী। জড়ত্ব মনের এক ব্যাধি, তাহা ক্রমে অভ্যাস ও সংস্কারে পরিণত হইয়া জীবনের যৌবন-শক্তি আচ্ছন্ন করিয়া দেয়, কিন্তু এই যুবকদলের সর্দারের নির্দেশে তাহারা এই জড়ত্বের দাসত্ব হইতে মুক্ত হইয়া প্রকৃত জীবনের অধিকারী হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে এই যুবকদলের মধ্য দিয়াই নাটকের মূল বক্তব্যবিষয় প্রকাশ করা হইয়াছে।

অন্ধ বাউলের চরিত্রটিও একটি রূপক চরিত্র। বাউল অন্ধ অর্থাৎ তাহার ইন্দ্রিয়ের দৃষ্টি লুপ্ত হইয়াছে বলিয়াই সে অতীন্দ্রিয় লোকের সন্ধান দিতে পারিল। যুবকদল যে বস্তুর সন্ধানে বাহির হইয়াছিল, তাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, তাহা অনুভূতি-সাপেক্ষ। জরা ও মৃত্যুর রূপ তাহারা নিরীক্ষণ করিতে গিয়াছিল, কিন্তু ইন্দ্রিয় দ্বারা তাহা নিরীক্ষণ করিবার বস্তু নহে। কারণ, দেহেন্দ্রিয়কে অতিক্রম করিয়া মৃত্যুর অবস্থিতি। অতএব বাহিরের দিক হইতে দেহের ইন্দ্রিয় যে যত বেশী নিরুদ্ধ করিয়া অন্তরেন্দ্রিয়ের সাধনা করিতে পারিয়াছে, সেই এই পথের সন্ধান দিতে তত বেশি সক্ষম। অন্ধ বাউলের মধ্য দিয়া নাট্যকার ইহাই নির্দেশ করিতে চাহেন। অন্ধ বাউলের চরিত্রগত কোন পরিচয় নাই, সে এই তত্ত্বের বাহন মাত্র।

পূর্বেই বলিয়াছি, রবীন্দ্রনাথের নাটক ‘ফাল্গুনী’ ও কাব্যগ্রন্থ ‘বলাকা’ শুধু যে সমসাময়িক রচনা, তাহাই নহে—উভয়ের মধ্যে একই সমাজ-চৈতন্যের অভিব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। উভয়ের মধ্যে আমাদের এতদ্দেশের তামসিক জড়ত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বাণী ঘোষিত হইয়াছে। উভয় ক্ষেত্রেই প্রধানতঃ প্রকৃতির সহায়তায়ই রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বক্তব্য বিষয় রূপায়িত করিয়া তুলিয়াছেন। এই নাটকের ঘটনার দৈন্য বিষয়ের গৌরব দ্বারা অনেকখানি পূরণ করা হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের সর্বশেষ ঋতুনাট্য ‘শ্রাবণ-গাথা’ তাঁহার অন্যান্য ঋতুনাট্যগুলির রচনার যুগ অবসান হইবার বহু পরবর্তী কালে রচিত বলিয়া তাঁহার এই বিষয়ক অন্যান্য নাটকের সঙ্গে কোন প্রকার যোগসূত্রে আবদ্ধ নহে। ইহা ১৩৪১ সালে শ্রাবণ মাসে রচিত হয় এবং সেই মাসেই নৃত্যগীত সহযোগে শান্তিনিকেতনে প্রথম অভিনীত হয়। শান্তিনিকেতনে নৃত্যাভিনয় করিবার মুখ্য উদ্দেশ্যেই ইহা রচিত হইয়াছিল। ইহার নৃত্যাভিনয়ের ভিতর দিয়াই রবীন্দ্রনাথ পূর্ণাঙ্গ নৃত্যনাট্যের যুগে উত্তীর্ণ হন; কারণ, ‘শ্রাবণ-গাথা’ রচনার দুই বৎসর পরই তিনি নৃত্যনাট্য ‘চিত্রাঙ্গদা’ রচনা করেন; ইহার মধ্যবর্তী সময়ে তিনি আর কোন নাটক রচনা করেন নাই। অতএব ‘শ্রাবণ-গাথা’ ঋতুনাট্যই রবীন্দ্রনাথের পূর্ববর্তী নাটকগুলির সঙ্গে পরবর্তী যুগের নৃত্যনাট্য-গুলির যোগসূত্র রচনা করিয়াছে—অতএব ইহাতে তাঁহার পূর্ববর্তী নাটিকা ও পরবর্তী নৃত্যনাট্য ইহাদের উভয়েরই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যাইবে।

‘শ্রাবণ-গাথা’ রসপ্রধান রচনা—ইহার মধ্যে তত্ত্বের লেশমাত্র নাই। শ্রাবণের রসপুষ্ট রূপটির প্রত্যক্ষ বন্দনাগীতিই এখানে শুনিতে পাওয়া যায়, এই বন্দনাও কোনও নির্দিষ্ট ধরাবাঁধা পথ ধরিয়া অগ্রসর হয় নাই, ইহা শ্রাবণ-হাওয়ার মতই এলোমেলো। শ্রাবণের যে রূপটির পরিচয় এখানে প্রকাশ পাইয়াছে তাহা তাহার ধারাবর্ষণের রূপ নহে—শ্রাবণের অশ্রান্ত ধারাবর্ষণের ভিতরও একটা বৈচিত্র্যহীন একঘেয়েমির সুর আছে, কিন্তু শ্রাবণের যে রূপ কবি এখানে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা রসৈশ্বর্যময়—ইহা কখনও ভৈরব, কখনও স্নিগ্ধ; কখনও মিলনের আনন্দে ইহা অন্তর পূর্ণ করিয়া দেয়, কখনও আবার বিরহের আভাস জাগাইয়া দিয়া অন্তরের মধ্যে বেদনার স্পর্শ দান করে; তাহার সুরে কখনও বজ্রনাদ, আবার কখনও বংশীনাদ। ইহার মধ্যে যেমন প্রশান্তি, স্তব্ধতা ও ‘জীবন-মরণের সম্মিলন’ গান শুনিতে পাই, আবার তেমনই

ইহার মধ্যে ব্যাকুলতা, মুখরতা ও বিচ্ছেদের কথাও আছে। সন্ধ্যারাত্রির ভৈরবানন্দের ভিতর দিয়া ইহার সূচনা, শেষরাত্রির 'রসদান-যজ্ঞের' পূর্ণাহুতির রিক্ততায় ইহার সমাপ্তি, অকিঞ্চিৎকর নাট্যকাহিনীর মধ্যে ইহাই ইহার এক-মাত্র নাট্যিক গতির নিদর্শন।

সংস্কৃত নাটকের প্রস্তাবনার ভিত্তির উপর এই নাটকটি রচিত হইয়াছে ; ইহার চরিত্রের মধ্যে কেবল নটরাজ, রাজা ও সভাকবি ; অন্যান্য চরিত্র কেবল নৃত্য ও সঙ্গীতের রূপ দিয়াছে। শ্রাবণের ভিতর দিয়া গ্রীষ্মের রিক্ত তপস্যা যে কি ভাবে শরতের পুর্ণতার মধ্যে উত্তীর্ণ হইয়া যায়, রবীন্দ্রনাথ এই নাটকের ভিতর দিয়া তাহাই দেখাইয়াছেন, কিন্তু ইহা তত্ত্বদর্শন নহে, ইহা রসোপলব্ধি মাত্র। রসোপলব্ধির অভিব্যক্তি হিসাবে এই নাটকখানি সার্থক হইয়াছে বলিয়া অনুভূত হইবে।

রূপক ও সাঙ্কেতিক নাট্য

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রথম জীবনে রচিত ঐতিহাসিক উপন্যাস 'বৌঠাকুরাণীর হাট' অবলম্বন করিয়া 'প্রায়শ্চিত্ত' নামক একখানি নাটক রচনা করেন। ইহার মধ্যে তিনি নূতন একটি চরিত্র সংযোগ করিয়া মহাত্মা গান্ধীর দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহ আন্দোলনকে রূপ দিবার প্রয়াস পান। ইতি-পুর্বেই রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রথম জীবনে রচিত অন্যতম ঐতিহাসিক উপন্যাস 'রাজর্ষি' অবলম্বন করিয়া তাঁহার 'বিসর্জন' নাটক রচনা করিয়াছিলেন। রচনার দিক দিয়া 'রাজর্ষি' হইতে 'বিসর্জন' অনেক বিষয়েই উন্নততর হইয়া-ছিল ; কিন্তু 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকে 'বৌঠাকুরাণীর হাটে'র বিষয়-বস্তু অবলম্বন করা সত্ত্বেও ইহা স্বতন্ত্র প্রকৃতির রচনা বলিয়া অনুভূত হইবে। ইহার মধ্যে একটি নূতন যুগোপযোগী ভাবের অবতারণা করিয়া ইহাকে ঐতিহাসিক নাটকের পরিবর্তে রোমান্টিক নাটকের রূপ দেওয়া হইয়াছে। ইহার কাহিনী সংক্ষেপে এই প্রকার—যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্য যুবরাজ উদয়াদিত্যকে মাধবপুর পরগণার ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। পরদুঃখকাতর যুবরাজ দুর্গত প্রজাদিগের নিকট হইতে খাজনা আদায় করিতে অসমর্থ বলিয়া প্রতাপাদিত্য তাঁহার নিকট হইতে উক্ত পরগণার ভার নিজের হাতে গ্রহণ করিলেন। ধনঞ্জয় বৈরাগীর নেতৃত্বে মাধবপুরের প্রজাগণ যশোরে আসিয়া যুবরাজকে ফিরাইয়া লইতে চাহিল। প্রতাপ ধনঞ্জয়কে কারাগারে বন্দী করিলেন। প্রতাপাদিত্য তাঁহার বৃদ্ধ খুল্লতাত বসন্ত রায়কে বধ করিবার জন্য দুইজন পাঠান নিযুক্ত করিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কার্য উদ্ধার হইল না, সরল হৃদয় বৃদ্ধকে বধ করিতে পাঠান অস্বীকৃত হইল। প্রতাপাদিত্যের কন্যার নাম বিভা, চন্দ্রদ্বীপের রাজা রামচন্দ্রের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল, রামচন্দ্র অপদার্থ লোক ছিলেন, জামাতা রামচন্দ্রের উপর প্রতাপাদিত্যের বিদ্বেষ ছিল, কন্যাকেও পতিগৃহে যাইতে দিতেন না। বসন্ত রায়ের ইচ্ছায় রামচন্দ্র যশোরে নিমন্ত্রিত হইলেন, রামচন্দ্রের এক ভাঁড় প্রতাপের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া প্রতাপের পত্নীর সঙ্গে রসিকতা করিবার অপরাধে প্রতাপ রামচন্দ্রকে বধ করিবার জন্য লোক নিযুক্ত করিলেন। যুবরাজের কৌশলে যশোরের প্রাসাদ হইতে রাম-চন্দ্র কোনমতে পলাইয়া গিয়া প্রাণরক্ষা করিলেন। যুবরাজের পত্নীর নাম

সুরমা, সুরমাও স্বামীর মত দয়াধর্মে দীক্ষিতা ছিলেন। এইজন্য প্রতাপ তাঁহার প্রতিও বিদ্বেষ-পরায়ণ হইয়া উঠিলেন এবং তাঁহাকে প্রাসাদ হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য রাজমহিষীকে আদেশ দিলেন, রাজমহিষী তাঁহার এক পরিচারিকার সহায়তায় বিষ প্রয়োগ করিয়া সুরমার প্রাণনাশ করিলেন। মাধবপুরের প্রজাগণ প্রতাপের বিরুদ্ধে দিল্লীশ্বরের নিকট নালিশ করিতে গিয়া ধরা পড়িল। প্রজারা প্রতাপের পরিবর্তে উদয়কে রাজা করিতে চায় এইজন্য প্রতাপ উদয়কে এই কার্যের জন্য দায়ী করিয়া তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিলেন। বসন্ত কৌশলে উদয়কে কারাগার হইতে উদ্ধার করিলেন, ধনঞ্জয়ও এই সঙ্গে কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিল। বসন্ত রায়ের উপর প্রতাপের ক্রোধ এইবার একেবারে দুর্জয় হইয়া উঠিল, তিনি এক অতি কৃতঘ্ন লোক নিযুক্ত করিয়া এইবার সহজেই বৃদ্ধকে বধ করাইলেন। যুবরাজ পুনরায় বন্দী হইলেন। রাজার নিকট বিচারের জন্য নীত হইলে তিনি সিংহাসনের অধিকার পরিত্যাগ করিয়া কাশী যাত্রার অনুমতি ভিক্ষা করিলেন, তৎপুর্বে ভগিনী বিভাকে তাঁহার শ্বশুরবাড়ী পৌছাইয়া দিতে চাহিলেন। রাজা সম্মত হইলেন, কিন্তু বিভা যেদিন যুবরাজের সঙ্গে শ্বশুরবাড়ীর দ্বারে আসিয়া পৌছিল, সেইদিন রামচন্দ্র পুনরায় দারপরিগ্রহ করিবার জন্য যাত্রা করিয়াছেন। উদয় ও বিভা লক্ষ্যহীন হইয়া পথিমধ্যে আসিয়া দাঁড়াইলেন, ধনঞ্জয় বৈরাগীও আসিয়া পথে তাঁহাদের সঙ্গে মিলিত হইল।

ঐতিহাসিক উপন্যাস 'বৌঠাকুরাণীর হাট'-এর নাট্যরূপ এই 'প্রায়শ্চিত্ত'কে ঐতিহাসিক নাটক বলিয়া নির্দেশ করিবার উপায় নাই। নাটকখানির বিজ্ঞাপনে রবীন্দ্রনাথও উল্লেখ করিয়াছেন, 'মূল উপন্যাসখানির অনেক পরিবর্তন হওয়াতে এই নাটকটি প্রায় নূতন গ্রন্থের মতই হইয়াছে।' ঐতিহাসিক তথ্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এই পরিবর্তন সাধিত হয় নাই, বরং তাহার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমই হইয়াছে, সেইজন্য যদিও নাট্যকার ইহাকে 'ঐতিহাসিক নাটক' বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, তথাপি আদর্শতঃ ইহা তাঁহার এই যুগের অন্যান্য রোমান্টিক নাটক বা নাট্যকাব্যগুলিরই সহধর্মী, কিন্তু রচনার দিক দিয়া ইহা অন্যান্য নাট্যকাব্য হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

'প্রায়শ্চিত্ত' নাটক রচনার সময় রবীন্দ্রনাথের নাট্যকাব্য রচনার যুগ শেষ হইয়া সবে মাত্র রূপক ও সাঙ্কেতিক নাট্যরচনার যুগের সূত্রপাত হইতেছে। ইহার এক বৎসর পুর্বেই তাঁহার 'শারদোৎসব' নাটক রচিত হইয়াছে ; যদিও

'শারদোৎসব' নাটক তাঁহার রূপক কিংবা সাঙ্কেতিক নাটক নহে, তথাপি ইহার মধ্যে দুই একটি এমন চরিত্রের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা তাঁহার পরবর্তী নাট্যরচনার যুগেই পূর্ণাঙ্গ রূপক-পরিচয় লাভ করিয়াছে। 'প্রায়শ্চিত্তে'র দুই একটি চরিত্রের মধ্যেও 'শারদোৎসব' নাটকের কোন কোন চরিত্রের প্রভাব আসিয়া পড়িয়াছে, তাহা ধনঞ্জয় বৈরাগী ও বসন্ত রায়। ধনঞ্জয় বৈরাগী 'শারদোৎসব'-এর ঠাকুরদাদার স্বদেশী সংস্করণ মাত্র, বসন্ত রায়ের মধ্যেও ঠাকুরদাদা ও কবিশেখর উভয়েরই মিশ্র প্রভাব অনুভব করা যায়। 'প্রায়শ্চিত্ত' রূপক ও সাঙ্কেতিকতা বর্জিত সাধারণ বস্তুধর্মী নাটক মাত্র নহে। কেহ কেহ ইহার মধ্যেও অলোক-ধর্ম (mysticism) ও সাঙ্কেতিকতার (symbolism) সন্ধান পাইয়াছেন। ইহা রবীন্দ্রনাথের সাঙ্কেতিক ও রূপক নাট্যরচনার যুগের ভূমিকারূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। ১৩১৬ সাল অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্ত নাটক রচনার বৎসর 'গীতাঞ্জলি'র অর্ধেকের কিছু বেশী গান রচিত হয়। ১৩১৭ সাল অর্থাৎ 'প্রায়শ্চিত্ত নাটক' রচনার পরের বৎসর 'গীতাঞ্জলি' রচনা সম্পূর্ণ হয়। অতএব ইহার অন্যতম চরিত্র ধনঞ্জয় বৈরাগীর সঙ্গীতগুলি 'গীতাঞ্জলি'রই গান বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়। 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের রূপ 'গীতাঞ্জলি'র সুর ও ভাবের আবহ মধ্যে পরিকল্পিত হইয়াছে।

এই নাটকের প্রধান ত্রুটি যেমন ইহার চরিত্র-পরিকল্পনায়, তেমনই ঘটনা-বিন্যাসেও ইহার ত্রুটি তাহার সংক্ষিপ্ততায়। এই দুইটি বিষয়ই একটু আলোচনা করিয়া দেখা যাইতেছে। অত্যাচারী শাসকের প্রতিনিধিরূপে প্রতাপাদিত্যকে নাট্যকার চিত্রিত করিয়াছেন। এই চরিত্র-পরিকল্পনায় ইতিহাসের মর্যাদাই যে শুধু ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, তাহা নহে—ইহার মধ্যে সর্বপ্রকার সঙ্গতি ও স্বাভাবিকতাও নির্মমভাবে বলি দেওয়া হইয়াছে। 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের প্রতাপাদিত্য রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী রচনা 'মুক্তধারা' ও 'রক্তকরবী' নাটকের রাজা চরিত্রের পূর্বাভাস, ইহারাও নিষ্ঠুর, কিন্তু সত্যসন্ধানী ; প্রতাপ তাহা নয়, তাহাদের মধ্যে যে মানবিক পরিচয় আছে, প্রতাপাদিত্যে তাহার অভাব দেখা যায়। প্রতাপ যেন অত্যাচারের একটি প্রাণহীন যন্ত্রস্বরূপ, তাঁহার মধ্যে কোন প্রকার মানবিক অনুভূতি নাই, বিশেষতঃ নাটকের নিতান্ত অনতিপ্রসর ক্ষেত্রে অধিকাংশ অত্যাচারের কারণগুলিই অস্পষ্ট রহিয়াছে বলিয়া তাহার প্রভাব পাঠকদের উপর কার্যকর হইতে পারে না। পুত্রবধূ সরমার সঙ্গে ব্যবহারে প্রতাপ যে আচরণ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার রাজোচিত

আভিজাত্যের অনুকূল নহে, বরং নিতান্ত নীচতার পরিচায়ক। এই নীচতা একেবারে গ্রাম্য স্তরের। ইংরেজি নাটকোক্ত অত্যাচারী স্বৈর-শাসকের চরিত্র অনুকরণ করিতে গিয়া নাট্যকার এখানে সম্পূর্ণই ব্যর্থ হইয়াছেন। তাঁহার কথায় কথায় 'ছিন্ন মুণ্ড চাই' নাটকের সমগ্র পরিবেশের মধ্যে নিবিড় যোগ স্থাপন করিয়া উঠিতে পারে নাই। তবে প্রতাপের সঙ্গে তাঁহার মহিষীর সম্পর্কের পরিচয়টি অত্যন্ত বাস্তব হইয়াছে। ইঁহাদের পরস্পরের মধ্যে চরিত্রগত যে বৈপরীত্য প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা উচ্চ নাটকীয় গুণ সৃষ্টি করিতে ব্যর্থ হয় নাই। রাজা সম্পর্কিত রবীন্দ্রনাথের অলোক-বিশ্বাসের মধ্যে যে দুইটি শক্তি আছে, তাহাদের একটি অবিমিশ্রভাবে প্রতাপের চরিত্রের মধ্যে রূপ লাভ করিয়াছে—তাহা তাঁহার নিষ্ঠুরতার শক্তি। রবীন্দ্রনাথের 'রাজা'র মধ্যে যে শক্তি আছে, তাহা যখন স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠে, তখন নিষ্ঠুরতার পরিচয় লাভ করে, সেই শক্তিই পুনরায় করুণার প্রেরণায় অমৃতের সন্ধান দেয়। প্রতাপ রাজার সেই নিষ্ঠুর শক্তির প্রতিনিধি। ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ প্রতাপাদিত্য সম্পর্কে পিতৃব্য বসন্ত রায়ের হত্যা সম্পর্কিত যে তথ্যের সন্ধান পাইয়াছিলেন, কেবলমাত্র তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই প্রতাপকে তিনি নিষ্ঠুর রূপে চিত্রিত করিয়াছেন। এই নাটকের অন্যান্য বিষয় অনৈতিহাসিক ও রোমান্টিক ধর্মী।

তবে ধনঞ্জয় বৈরাগীর চরিত্রটির মধ্যে একটু বৈশিষ্ট্য আছে। এই চরিত্রটি উপন্যাসে নাই, নাটকে নূতন। ধনঞ্জয় বিদ্রোহী প্রজাদিগের নায়ক। অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাহার নির্ভীক অভিযান, অত্যাচারীর মুখের সম্মুখে সত্য ভাষণের দুঃসাহস, নির্যাতনের মধ্যেও তাহার অনির্বাণ সত্যনিষ্ঠা, তাহার চরিত্রকে এক অপূর্ব গৌরব দান করিয়াছে। তবে তাহার চরিত্র আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত, সেইজন্য ইহা নাট্যকাহিনীর বাস্তব পরিবেশের মধ্যে সহজ সংযোগ স্থাপন করিয়া উঠিতে পারে নাই—সমগ্র পরিবেশের মধ্যে ইহা যেন একটি বিচ্ছিন্ন সৃষ্টি বলিয়া বোধ হয়। এই ধনঞ্জনই মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহ আন্দোলনের প্রতিমূর্তি। 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের বসন্ত রায়ের চরিত্রটিই রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী রূপক ও সাঙ্কেতিক নাটকে ঠাকুরদা চরিত্রের রূপ লাভ করিয়াছে। ধনঞ্জয় চরিত্র অনুরূপ প্রায় সকল নাটকের মধ্যেই স্থান লাভ করিয়াছে।

এই নাটকে রাজকন্যা বিভা ও রাজ-জামাতা রামচন্দ্রের যে দুইটি চরিত্র

আছে, তাহা রবীন্দ্রনাথের সুচতুর শিল্পদৃষ্টির গুণে অপূর্ব সার্থকতা লাভ করিয়াছে। ইহাদের পরিকল্পনায় রবীন্দ্রনাথ তাঁহার রোমাণ্টিক দৃষ্টিভঙ্গি সংযত রাখিয়া বাস্তব দৃষ্টি প্রয়োগ করিয়াছেন, সেইজন্যই ইহাদের মধ্য দিয়া নাটকীয় গুণের বিকাশ সম্ভব হইয়াছে। প্রতাপাদিত্যের কন্যা বিভা চন্দ্রদ্বীপের রাজা রামচন্দ্রের বিবাহিতা, কিন্তু প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে রামচন্দ্রের রাজ্য-সংক্রান্ত বিবাদ সৃষ্টির ফলে সে পিতৃগৃহেই বাস করিতেছে, পতিগৃহে যাইতে পারে নাই। রামচন্দ্র নিজের অপমান স্বীকার করিয়া প্রতাপাদিত্যের গৃহ হইতে নিজের পত্নীকে লইতে আসিতে পারেন নাই। কিন্তু বিভার প্রতি তাঁহার যথার্থ প্রেমের কোনদিনই অভাব ছিল না। বিভাও স্বামিপ্রেমে বিশ্বাসিনী ছিলেন, সেই জন্য স্বামীকে অপমান স্বীকার করিয়া তাহার পিতৃগৃহ হইতে লইয়া যাইবার পক্ষপাতী ছিলেন না। বিভা বসন্ত রায়ের নিকট বলিতেছেন, 'তিনি যে মানী, তাঁর অপমান কেন হবে?' স্বামীর প্রেমে বিশ্বাসিনী বলিয়াই তাঁহার অমর্যাদা তিনি সহ্য করিতে পারেন না। কিন্তু বসন্ত রায়ের আমন্ত্রণে রামচন্দ্র শ্বশুর প্রতাপাদিত্যের গৃহে আসিতে সম্মত হইলেন, বিভার প্রতি সুগভীর প্রেমবশতঃই তিনি প্রতিদ্বন্দ্বী রাজার প্রতি এই নতি স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইলেন, বিভার প্রেমের নিকট আত্মমর্যাদা জলাঞ্জলি দিলেন। নিষ্ঠুর প্রতাপ যেন রামচন্দ্রের উপর তাঁহার আক্রোশের প্রতিশোধ লইবার একটি পরম সুযোগ পাইলেন। রামচন্দ্রের এক ভাঁড় তাঁহার মহিষীর অপমান করিয়াছে এই বলিয়া রামচন্দ্রের ছিন্নমুণ্ড আনিবার আদেশ দিলেন। রামচন্দ্র পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করিলেন, কিন্তু ইহাতেও বিভার প্রতি তাঁহার প্রেম অক্ষুণ্ণ রহিল। বিভা তাঁহার বিরুদ্ধে সুকঠিন অন্তর্দ্বন্দ্ব আরম্ভ করিলেন, স্বামীর অমর্যাদা ও পিতার নিষ্ঠুরতায় তাহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল।—বুঝি জীবনের সকল শক্তি হারাইয়া ফেলে। তাঁহার অনাশ্রিত জীবনে ভ্রাতা উদয়াদিত্য এবং তাঁহার পত্নী সুরমার স্নেহই ছিল তাঁহার একমাত্র অবলম্বন। নিষ্ঠুর পিতা উদয়াদিত্যকে বন্দী করিলেন, বিষপ্রয়োগে প্ররোচিত করিয়া সুরমাকেও হত্যা করিলেন। বন্দী রাজপুত্রের সেবাশুশ্রূষার মধ্যে বিভা তাঁহার জীবনের সকল দুঃখ ভুলিয়া থাকিতে চাহিলেন। রামচন্দ্রের নিকট হইতে তাঁহার আবার ডাক আসিল। বন্দী রাজপুত্রকে সেই মুহূর্তেই পরিত্যাগ করিয়া গিয়া নীচ স্বার্থপরের মত তিনি সেদিন স্বামীর ডাকে সাড়া দিতে পারিলেন না। চন্দ্রদ্বীপের লোক তাঁহাকে ভুল বুঝিল, কিন্তু রামচন্দ্রের বিশ্বাস শিথিল হইল

না; তিনি তথাপি বিভার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি ব্যক্তিত্বহীন পুরুষ, সামান্য ভাঁড়ের সম্মুখেও নিজের চক্ষুলজ্জা রক্ষা করিতে সতর্ক হইয়া পড়েন, সুতরাং কেবলমাত্র পারিষদদিগের কথায় শেষ পর্যন্ত তিনি পুনরায় বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন। এমন কি, বরবেশে যাত্রা করিবার মুহূর্তেও বিভার কথাই বারবার ভাবিতেছিলেন, যদি সে এখনও ফিরিয়া আসে, তবু তাঁহার জীবন সার্থক হয়! সেনাপতির নিকট মনের কথা খুলিয়া বলিতে গিয়া তিনি বলেন, 'ভাঁড় রমাইয়ের হাসি আমার ভাল লাগছে না,...আমার ইচ্ছা হচ্ছিল উঠে চলে যাই, গান বাজনা ভালো জমছে না ফার্ণাণ্ডিজ!'

কারাগার হইতে মুক্ত হইয়া উদয়াদিত্য বিভাকে চন্দ্রদ্বীপে তাঁহার স্বামিগৃহে পৌছাইয়া দিবার জন্য যাত্রা করিলেন, রামচন্দ্র তাহা জানিতেন না, তবে রাজ্যে এ বিষয়ে গুজব রটিল, রাজ্যের রাণী এবার নিজেই আসিতেছেন। রামচন্দ্রও গুজবটা শুনিলেন। তিনি আশা করিলেন, 'গুজবটা কি সত্যি?' সেনাপতি অগ্রসর হইয়া তাহাদিগকে আনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, নিজের দিক হইতে রামচন্দ্রের এই বিষয়ে কোন আপত্তি ছিল না, কিন্তু ব্যক্তিত্বহীন রাজা আশঙ্কা করিতে লাগিলেন, 'তা হলে কিন্তু, মন্ত্রী রমাই সবাই হাসবে।' কিন্তু তিনি এ' কথাও সেনাপতির নিকট অকপটে স্বীকার করিতেছেন, 'আমি তোমাকে গোপনে বলছি, কাউকে বলো না, আমি তাকে কিছুতে ভুলতে পাচ্ছিনে। কালই রাত্রে আমি তাকে স্বপ্নে দেখেছি।' রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সকল নাটকেই ইতিহাসের রাজার পরিবর্তে মনের রাজা গড়িয়াছেন, সেইজন্য তাঁহারা রাজার পরিচয় লইয়াও সাধারণ মানুষ। সুকঠিন ব্যক্তিত্ব বিকাশ লাভ করিবার পরিবর্তে তাহাদের চরিত্রের ভিতর দিয়া সংশয়, দ্বন্দ্ব ও অবিশ্বাসই প্রকাশ পায়। প্রতাপাদিত্য তাহার একটি ব্যতিক্রম হইলেও রামচন্দ্রই তাহার সাধারণ প্রতিনিধি। মিতভাষণ ও সংযত আচরণের ভিতর দিয়া রামচন্দ্রের চরিত্রটি অপূর্ব সার্থকতা লাভ করিয়াছে।

'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকটির সর্বপ্রধান বিশেষত্ব ইহার সংক্ষিপ্ততা। এইগুণে ইহা তাঁহার অন্যান্য রূপক ও সাঙ্কেতিক নাটকের সমধর্মী। তবে ইহা অতি-নাট্যের লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া ইহার এই সংক্ষিপ্ততা একটি বিশেষত্রুটি বলিয়া মনে হয়। ইহা হত্যা, বিষপ্রয়োগ, ষড়যন্ত্র, অগ্নিদাহ, দুঃসাহসিক পলায়ন ইত্যাদি

বহু লোমহর্ষক ঘটনা-সঙ্কুল হইলেও, রচনার ক্ষেত্র এত অপরিসর যে, ঘটনাগুলির সম্যক্ বিকাশ ইহাতে সম্ভব হয় নাই। নাটকটি পাঁচ অঙ্কে সম্পূর্ণ, তথাপি প্রত্যেক অঙ্কের অন্তর্গত ইহার দৃশ্যগুলি এত সংক্ষিপ্ত যে, ইহা দ্বারা অভিনয় কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইতে পারে না। নাটকটির 'প্রায়শ্চিত্ত' নামকরণেও বিশেষ কোন সার্থকতা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ইহার ভাষাও নাট্যোপযোগী নহে। ইহা গদ্যে রচিত। নাট্যকাব্য রচনার যুগে ইহার পুর্ববর্তী নাট্যরচনা 'শারদোৎসব' এবং 'মুকুট'ও গদ্যেই রচিত হইয়াছিল, সমসাময়িক কাল রবীন্দ্রনাথের প্রধানতঃ গদ্য রচনারই কাল ; কিন্তু 'প্রায়শ্চিত্ত'-র ভাষা সমসাময়িক অন্যান্য গদ্যরচনা অপেক্ষা অনেক শক্তিহীন। রবীন্দ্রসাহিত্যে এত নিকৃষ্ট গদ্যরচনার নিদর্শন বোধহয় আর নাই। ভাব'ও ভাষায় এই নাটকের মধ্যে যে দৈন্য দেখা দিয়াছে, তাহার মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের সেই যুগের নাট্য-প্রতিভার অবসান হইয়াছে এবং এক সম্পূর্ণ নূতন আদর্শের মধ্য দিয়া পরবর্তী যুগের নবজন্ম সূচিত হইয়াছে। এই নাটকখানির ত্রুটি বোধ হয় রবীন্দ্রনাথকেই সর্বাপেক্ষা পীড়া দিয়াছিল ; সেইজন্য দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা অবলম্বন করিয়া তিনি ইহার পরবর্তী কালে ক্রমান্বয়ে দুইখানি নাটক রচনা করেন, একখানি রূপক ও সাঙ্কেতিক নাট্য রচনার যুগের 'মুক্তধারা' ও অপরখানি তাহারও পরবর্তী যুগের 'পরিত্রাণ' (১৯২৯)। রচনা ও ভাবগত বৈশিষ্ট্য আছে বলিয়া 'মুক্তধারা'র যথাস্থানে স্বতন্ত্র আলোচনাও করা হইয়াছে।

পূর্বেই বলিয়াছি, 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটক রচনার পরই রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সাধনায় 'গীতাঞ্জলি'র যুগের সূচনা হয়। এই যুগেই তাঁহার দুইখানি পূর্ণাঙ্গ সাঙ্কেতিক নাটক রচিত হয়—তাহা 'রাজা' ও 'ডাকঘর'। সাঙ্কেতিক নাটক ও রূপক নাটকের মধ্যে যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে, তাহা অনেকেই অনুভব করিতে না পারিয়া রবীন্দ্রনাথের এই নাটক দুইখানিকেও অনেক সময় রূপক নাটক বলিয়াই ভুল করিয়া থাকেন। সে'জন্য রূপক ও সাঙ্কেতিক নাটকের পার্থক্য সম্বন্ধে প্রথমেই দুই একটি কথা এখানে বলিয়া লওয়া প্রয়োজন বলিয়া বিবেচনা করি। এই দুই শ্রেণীর নাটকের সুস্পষ্ট পার্থক্য সম্বন্ধে W.B. Yeats তাঁহার *Ideas of Good and Evil* নামক গ্রন্থে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা এখানে উদ্ধৃত করিতে পারা যায় ; তিনি লিখিয়াছেন, 'A symbol is indeed the possible expression of some invisible essence, a transparent

lamp about a spiritual flame, while allegory is one of many possible representations of an embodied thing, or familiar principle, and belongs to fancy, and not to imagination; the one is revelation, the other an amusement.' Symbolic কথাটিকেই বাংলায় সাঙ্কেতিক বলিয়া অনুবাদ করা হয়। যাহার কোন রূপ নাই, কেবল মাত্র অনুভূতিতেই যাহার অবস্থান, তাহার রস নিজে অনুভব করা সম্ভব হইলেও অন্যকে যখন তাহা অনুভব করাইবার প্রয়োজন হয়, তখনই সঙ্কেত বা ইঙ্গিতের সাহায্য গ্রহণ করিবার প্রয়োজন হয়। সাঙ্কেতিক নাটকের ইহাই উদ্দেশ্য। ইহার মূল চরিত্রগুলি নিরবয়ব অনুভূতি-সাপেক্ষ, কোনও রূপের ভিতর দিয়া ইহাদিগকে প্রকাশ করা যায় না, করিলে ইহাদের গৌরব রক্ষা পায় না; সেইজন্য কেবল মাত্র আভাস, ইঙ্গিত ও সঙ্কেতের সাহায্যে তাহাদের পরিচয় দিতে হয়। 'রাজা' ও 'ডাকঘরে'র মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য পূর্ণ-মাত্রায় রক্ষা পাইয়াছে। কিন্তু রূপক নাটকের পরিচয় স্বতন্ত্র। কোন বস্তু কিংবা ভাব যখন স্বতন্ত্র কোন বস্তু বা রূপ অবলম্বন করিয়া প্রকাশ পায়, তখনই তাহা রূপক বা allegory-র সংজ্ঞা লাভ করে। এই অনুসারে যে-কোন প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট বস্তু যেমন যে-কোন রূপ লাভ করিতে পারে, তেমনই যে-কোন নৈর্ব্যক্তিক ভাবও—যেমন ভক্তি, দয়া, বিবেক, ধর্ম প্রভৃতিও—ব্যক্তিরূপ লাভ করিতে পারে। অতএব দেখা যাইবে, যদিও সাঙ্কেতিক নাটক এ'দেশে রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম রচনা করেন, রূপক নাটক রবীন্দ্রনাথের পূর্বেও বাংলা সাহিত্যে রচিত হইয়াছে। তবে রবীন্দ্রনাথের রূপক নাটকের রস তাঁহার অন্যান্য রচনার মতই তাঁহারই নিজস্ব সৃষ্টি।

'গীতাঞ্জলি'র যুগের সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ সাঙ্কেতিক নাট্যই 'রাজা'। ১৩১৭ সালের শ্রাবণ মাসে 'গীতাঞ্জলি' প্রকাশিত হয়, সেই বৎসরই পৌষমাসে 'রাজা' প্রকাশিত হয়। 'রাজা' প্রকৃতপক্ষে 'গীতাঞ্জলি'রই নাট্যরূপ মাত্র। 'গীতাঞ্জলি'র মধ্যে যে আধ্যাত্মিকতার বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, 'রাজা'র মধ্যেও তাহারই পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার কাহিনীভাগ একটি বৌদ্ধ আখ্যান হইতে গৃহীত হইলেও, রবীন্দ্রনাথ নিজস্ব কল্পনার স্পর্শদান করিয়া ইহাকে সম্পূর্ণ নূতন রূপে গড়িয়া লইয়াছেন। নাটকের কাহিনীটি সংক্ষেপে এইরূপ,—

রাজ্যে সেদিন বসন্তোৎসব। প্রজারা উৎসব দেখিতে আসিয়াছে, দেশান্তরের রাজগণও নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছেন; কিন্তু যে-রাজ্যে তাহারা অতিথি, সে

রাজ্যের রাজারই দেখা নাই। তিনি প্রকাশ্যে কখনও দেখা দেন না। এই লইয়া অভ্যাগতেরা নানা প্রকার জল্পনা কল্পনা করিতে লাগিল। সুযোগ বুঝিয়া এক ব্যক্তি বহুমূল্য রাজপোষাক ও স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত হইয়া নিজেকে রাজা বলিয়া প্রচার করিল। তাহার সুন্দর কান্তি ও ভূষণের ঐশ্বর্য দেখিয়া জনসাধারণ তাহাকেই রাজা বলিয়া মনে করিল; কাঞ্চীরাজ তাহার কপটতা ধরিয়া ফেলিলেন, তবে তাহাকে দিয়া অন্য উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে ভাবিয়া তাহাকে হাতে রাখিলেন। রাণী সুদর্শনা রাজাকে চোখে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন; অন্ধকার ঘরে তাঁহার সঙ্গে রাজার নিত্য সাক্ষাৎ হয়, অন্ধকারের মধ্যে তিনি তাঁহার রূপ প্রত্যক্ষ করিতে পারেন না, সেইজন্য তাঁহাকে বাহিরে দশজনের মধ্যে দেখিতে চাহিলেন। রাজার কাছে সুদর্শনা এই প্রার্থনা জানাইলেন, রাজা অগত্যা তাহাতেই সম্মতি দিলেন; কিন্তু বলিয়া দিলেন, উৎসবের মধ্যে বহু লোকের মাঝখান হইতে তাঁহাকে চিনিয়া লইতে হইবে, কেহ তাঁহার পরিচয় তাহাকে বলিয়া দিবে না। প্রাসাদ-শিখর হইতে উৎসব-ক্ষেত্রে সুদর্শনা ভণ্ড রাজাকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলেন এবং তাহাকেই রাজা বলিয়া মনে করিলেন। সহচরীর হাত দিয়া তিনি তাহার নিকট উপহার পাঠাইলেন, কাঞ্চীরাজ ভণ্ড রাজার কণ্ঠ হইতে মুক্তার মালা খুলিয়া সেই সহচরীর হস্তেই সুদর্শনার নিকট প্রত্যুপহার পাঠাইলেন। সুদর্শনা সেই মালা লইয়া গলায় পরিলেন। কাঞ্চীরাজ রাজবেশীর সহায়তায় সুদর্শনার দর্শন লাভ করিতে চাহেন, এই উদ্দেশ্যে উভয়ে রাণীর অন্তঃপুরের উপবনে প্রবেশ করিলেন। সুদর্শনাকে প্রাসাদ হইতে বাহিরে আনিবার জন্য তিনি প্রাসাদের এক কোণে আগুন লাগাইয়া দিলেন, দেখিতে দেখিতে আগুন চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল, লোকজন ভয়ে চারিদিকে পলাইতে লাগিল। কাঞ্চীরাজ এবং ভণ্ডরাজও প্রাণরক্ষার জন্য পলায়নের পথ খুঁজিতে লাগিলেন; এমন সময় বিপন্না রাণী আসিয়া ভণ্ড রাজাকেই তাঁহার রাজা মনে করিয়া তাঁহাকে বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন; ভণ্ড রাজা নিজের পরিচয় দিয়া কহিল, সে রাজা নহে এবং তাহার নিজেকেই রক্ষা করিবার সাধ্য নাই। শুনিয়া রাণী লজ্জায় মরিয়া গেলেন। সুদর্শনা অন্ধকার ঘরে গিয়া আশ্রয় লইলেন, তাঁহার রাজা তাঁহাকে রক্ষা করিলেন; কিন্তু মিথ্যাকে সত্য বলিয়া ভ্রম করিয়াছিলেন বলিয়া অনুতাপে তিনি দগ্ধ হইতে লাগিলেন। এই অনুশোচনায় তিনি নিজে প্রাসাদ

পরিত্যাগ করিয়া পিতৃগৃহে চলিয়া আসিলেন। ক্রুদ্ধ পিতা তাঁহাকে দিয়া দাসীবৃত্তি করাইতে লাগিলেন। তাঁহার অসহায় অবস্থা বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য দেশান্তরের রাজগণ আসিয়া তাঁহার পিতৃরাজ্য আক্রমণ করিলেন। সুদর্শনার পিতা বন্দী হইলেন। আক্রমণকারী রাজগণ স্থির করিলেন, সুদর্শনা স্বয়ংবরা হইবেন, তাঁহাদের মধ্য হইতে যাঁহাকে ইচ্ছা বরণ করিয়া লইবেন। স্বয়ংবর সভায় রাজগণ সমবেত হইয়াছেন, এমন সময় রাজা সসৈন্যে আসিয়া তাহাদিগকে যুদ্ধক্ষেত্রে আহ্বান করিলেন। সকলে পলাইল, এক কাঞ্চীরাজ যুদ্ধ করিয়া পরাজিত হইলেন। কাঞ্চীরাজ পরাজয় স্বীকার করিয়া পথে পথে তাঁহার বিজয়ীর সন্ধান করিতে বাহির হইলেন। সুদর্শনাও রাজাকে ফিরিয়া পাইবার জন্য ব্যাকুল হইলেন, দীর্ঘকাল দুঃসহ প্রতীক্ষার পর তাঁহাকে সন্ধান করিয়া লইবার জন্য পথে বাহির হইলেন। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়া পুনরায় নিজের প্রাসাদের অন্ধকার ঘরে প্রবেশ করিলেন। রাজা এইবার অন্ধকার ঘরের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়া বাহিরের আলোকের রাজ্যে তাঁহাকে পরিপূর্ণ রূপে গ্রহণ করিলেন।

পরবর্তী কালে এই নাটকটির একটি অভিনয়যোগ্য সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশ করিবার সময় রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ভূমিকায় ইহার তাৎপর্য সম্বন্ধে যাহা নিজে উল্লেখ করিয়াছিলেন, তাহা এখানে উদ্ধৃত করা যাইতেছে—তিনি এই সংক্ষিপ্ত সংস্করণের নাম দিয়াছিলেন 'অরূপ রতন'। তিনি ইহার ভূমিকায় লিখিয়াছেন—'সুদর্শনা রাজাকে বাহিরে খুঁজিয়াছিল। যেখানে বস্তুকে চোখে দেখা যায়, হাতে ছোঁয়া যায়, ভাণ্ডারে সঞ্চয় করা যায়, যেখানে ধনজনখ্যাতি, সেইখানেই সে বরমাল্য পাঠাইয়াছিল। বুদ্ধির অভিমানে সে নিশ্চয় স্থির করিয়াছিল যে, বুদ্ধির জোরে সে বাহিরেই জীবনের সার্থকতা লাভ করিবে। তাহার সঙ্গিনী সুরঙ্গমা তাহাকে নিষেধ করিয়াছিল। বলিয়াছিল, অন্তরের নিভৃত কক্ষে যেখানে প্রভু স্বয়ং আসিয়া আশ্রয় করেন, সেখানে তাঁহাকে চিনিয়া লইলে তবেই বাহিরে সর্বত্র তাঁহাকে চিনিয়া লইতে ভুল হইবে না; নহিলে যাহারা মায়ার দ্বারা চোখ ভোলায়, তাহাদিগকে রাজা বলিয়া ভুল হইবে। সুদর্শনা এ' কথা মানিল না, সে সুবর্ণের রূপ দেখিয়া তাহার কাছে মনে মনে আত্মসমর্পণ করিল। তখন কেমন করিয়া তাহার চারিদিকে আগুন লাগিল, অন্তরের রাজাকে ছাড়িতেই কেমন করিয়া তাহাকে লইয়া বাহিরের নানা মিথ্যা রাজার দলে লড়াই বাধিয়া গেল,—সেই অগ্নি-

দাহের ভিতর দিয়া কেমন করিয়া আপন রাজার সহিত তাহার পরিচয় ঘটিল, কেমন করিয়া দুঃখের আঘাতে তাহার অভিমান ক্ষয় হইল এবং অবশেষে কেমন করিয়া হার মানিয়া প্রাসাদ ছাড়িয়া পথে দাঁড়াইয়া তবে সে তাহার সেই প্রভুর সঙ্গলাভ করিল, যে-প্রভু কোনো বিশেষ রূপে, বিশেষ স্থানে, বিশেষ দ্রব্যে নাই, যে-প্রভু সকল দেশে, সকল কালে; আপন অন্তরের আনন্দরসে যাঁহাকে উপলব্ধি করা যায়, এ নাটকে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।'

'গীতাঞ্জলি'র পূর্ববর্তী কাব্যগ্রন্থ 'খেয়া'-(১৩১৩)-র যুগ হইতেই রবীন্দ্রনাথের মধ্যে 'রাজা' সম্পর্কিত একটি অলোক-বিশ্বাস (mystic conception) জন্ম লাভ করে। 'গীতাঞ্জলি'র মধ্য দিয়া নানা ভাবে তাহারই পরিচয় পাওয়া যায়, অতঃপর 'রাজা' নাটকের মধ্যে তাহার পূর্ণতর বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার ধারা এখানেই শেষ হয় নাই, নাটকের মধ্য দিয়া ইহা সাঙ্কেতিক নাটক 'ডাকঘর' অতিক্রম করিয়া পরবর্তী নাটক 'মুক্তধারা' ও 'রক্তকরবী' পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া গিয়াছে এবং কাব্যের ক্ষেত্রে 'গীতিমাল্য' ও 'গীতালি'র ভিতর দিয়া তাহা 'বলাকা'র পূর্ববর্তী যুগে আসিয়া একেবারে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। 'খেয়া' হইতে আরম্ভ করিয়া 'গীতালি' পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাধনার মধ্যে যে অলোক-ধর্মের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা তাঁহার এই যুগের নাটকগুলির মধ্যেও পরিপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। 'খেয়া'র 'শুভক্ষণ' কবিতার এই শেষ পংক্তিটিই 'রাজা' নাটকের মূল প্রেরণা দান করিয়াছে বলিয়া অনুভূত হইবে,

> ওরে, দুয়ার খুলে দে রে, বাজা শঙ্খ বাজা,
> গভীর রাতে এসেছে আজ আঁধার ঘরের রাজা!
> বজ্র ডাকে শূন্যতলে বিদ্যুতেরি ঝিলিক ঝলে,
> ছিন্ন শয়ন টেনে এনে আঙিনা তোর সাজা,
> ঝড়ের সাথে হঠাৎ এ'লো দুঃখ দিনের রাজা।

'খেয়া' কাব্যগ্রন্থের মধ্যে 'রাজা' কথাটিকে তিনি যে বিশেষ অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন, এই নাটকের মধ্যেও তাহার সেই অর্থ ও তাৎপর্য সম্পূর্ণ রক্ষিত হইয়াছে; এই 'রাজা' শব্দটির তিনি নিজে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, প্রভু। এই 'প্রভু'ই 'গীতাঞ্জলি'র এক অদ্বিতীয় সত্যস্বরূপ ভগবান্। দুঃখের মধ্য দিয়া তাঁহার সঙ্গে অন্তরের পরিচয় নিবিড়তম হইয়া উঠে। বহির্জগতের সব কিছুর মধ্য দিয়াই তাঁহার প্রকাশ, তিনি দেশে কালে ও রূপে অখণ্ডনীয়, তাঁহার

উপলব্ধি সত্যের উপলব্ধি, তাঁহার আশ্রয় সত্যের আশ্রয়, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলে নানা মিথ্যার জঞ্জাল চারিদিক দিয়া জড়াইয়া ধরে, বিশেষ কোন রূপের মধ্যে তাঁহাকে সন্ধান করিতে গেলে তাঁহাকে ত পাওয়া যায়ই না, বরং সংসারের নানা চোখ-ভুলানো জিনিসে অসত্যের পথে বিভ্রান্ত হইতে হয়। অতএব তাঁহার লক্ষ্যই জীবনে একমাত্র সত্যের লক্ষ্য, আর সব কিছুই মিথ্যার ছলনা। 'গীতাঞ্জলি'তে এই ভগবানের প্রতি বিশ্বাস ও নির্ভরশীলতার মধ্যে যে তৃপ্তি ও আনন্দের পরিচয় আছে, এই নাটকের দুইটি চরিত্রের মধ্য দিয়াও তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে—চরিত্র দুইটি সুরঙ্গমা ও ঠাকুরদাদা।

'রাজা' সম্পর্কিত এই সঙ্কেতটি এই নাটকের মধ্য দিয়া কতদূর সার্থকতার সঙ্গে প্রকাশ করা হইয়াছে, এখন তাহাই দেখিতে হইবে। 'রাজা' নাট্যরচনার ভিতর দিয়া রবীন্দ্রনাথ ভাবলোকে সম্পূর্ণ এক নূতন যুগে প্রবেশ করিলেও, ইহার মধ্যে তাহার পুর্ববর্তী দুইখানি নাটকের বহিরঙ্গগত প্রভাব একেবারে পরিত্যক্ত হইতে পারে নাই। তাঁহার পুর্বরচিত নাটক 'শারদোৎসব'-এর ঠাকুরদাদা ও 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের ধনঞ্জয় বৈরাগী এই দুইটি চরিত্রের প্রভাব এই নূতন যুগের সম্পূর্ণ নূতন ভাব-বস্তু লইয়া রচিত নাটকখানির মধ্যেও আসিয়া পড়িয়াছে। বিশেষতঃ 'শারদোৎসব'-এর ঠাকুরদাদার চরিত্র ব্যতীতও তাহার উৎসবায়োজনের বাহ্য পরিচয়টিও এই 'রাজা' নাটকের মধ্যে আসিয়া কতকটা স্থানলাভ করিয়াছে। যদিও 'রাজা' নাটকের মধ্যে বসন্তোৎসবের কথা আছে, তথাপি উৎসবের বহিরঙ্গগত পরিচয় এখানে পরিস্ফুট হইবার অবকাশ পায় নাই; 'শারদোৎসব' নাটকের তাহাই লক্ষ্য ছিল, কিন্তু 'রাজা' নাটকের তাহা লক্ষ্য নহে; সেইজন্য 'রাজা' নাটকের মধ্যে তাহা যে-পরিমাণে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, সেই পরিমাণেই তাহা এই নাটকের উদ্দেশ্যকেও ব্যাহত করিয়াছে। সাঙ্কেতিক নাটকের বাহ্য ঘটনা যত সংযত হয়, ততই সমগ্র পরিবেশটি নিবিড়তা লাভ করিতে পারে—রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী সাঙ্কেতিক নাটক 'ডাকঘর'ই ইহার প্রমাণ। অতএব এই নাটকে বাহ্যিক ঘটনা প্রাধান্য লাভ করায় ইহার অন্তর্নিহিত সত্যানুভূতির নিবিড়তা অনেকাংশে বিনষ্ট হইয়াছে। এই নাটকের মধ্যে এই প্রকার অনাবশ্যক ঘটনাবাহুল্য সৃষ্টি করিয়াছে প্রথমতঃ সঙ্গীতকারী বালকদল, দ্বিতীয়তঃ, 'রাজ'-ভক্ত সুরঙ্গমা ও তারপর ঠাকুরদাদা স্বয়ং। রাণী সুদর্শনার সত্যদর্শনের কাহিনী লইয়াই এই নাটক রচিত। চারিদিকের অসত্য জয় করিয়া সত্যের

পথে তাঁহার যাত্রাই ইহার বর্ণিতব্য বিষয়। অসত্যের মধ্যে যে দুঃখ আছে, তাহার অভিজ্ঞতা হইতেই এই সত্যদর্শন আসিয়াছে, অন্য কোনদিক হইতে আসে নাই। অতএব সত্যপ্রতিষ্ঠ ঠাকুরদাদা কিংবা তাঁহার অনুচর বালকদল ও সুরঙ্গমা তাহাদের নিজস্ব সত্যচৈতন্য দ্বারা সুদর্শনাকে কিংবা কাহাকেও কোনরূপে সহায়তা করিতে পারে না। সেইজন্য এই সকল চরিত্র এই নাটকের সাঙ্কেতিক কাহিনীর কোন উদ্দেশ্যই সিদ্ধ করিতে পারে নাই, অথচ ইহাদের বক্তৃতায়, গানে, নাটকের প্রচ্ছন্ন সঙ্কেত কাহিনী পরিসমাপ্তির পূর্বেই উদ্‌ঘাটিত হইয়া গিয়া ইহার রস বিনষ্ট করিয়া দিয়াছে। 'শারদোৎসব' ও অন্যান্য ঋতু-নাট্যে ঠাকুরদা ও তাঁহার অনুচর বালকদলের সার্থকতা থাকিলেও, এই সাঙ্কেতিক নাটকে তাহারা সম্পূর্ণই অবান্তর ও পীড়াদায়ক। জ্ঞান অন্যের নিকট হইতে লাভ করা যাইতে পারে, কিন্তু অনুভূতি অন্যের নিকট হইতে লাভ করা যাইতে পারে না, তাহা নিজস্ব। রাজার পরিচয় জ্ঞান দ্বারা লভ্য নহে, বরং অনুভূতির দ্বারা উপলব্ধির বিষয়; সুরঙ্গমা ও ঠাকুরদা সুদর্শনাকে রাজা সম্পর্কে জ্ঞান দান করিবার প্রয়াস পাইয়াছে, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত সুদর্শনা নিজের অন্তরের অনুভূতির ভিতর দিয়া তাঁহার প্রকৃত পরিচয় লাভ করিতে না পারিয়াছে, ততদিন পর্যন্ত সুরঙ্গমা ও ঠাকুরদার কথায় তাঁহার কোন কাজই হয় নাই। অতএব নাটকের মধ্যে এই চরিত্র দুইটির বিশেষ কোনও সার্থকতা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

এই নাটকের কাঞ্চীরাজের চরিত্র-পরিকল্পনাটি বড় সুন্দর ও তাৎপর্যমূলক। ইহার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাট্যের কোন সমালোচকই বিশেষ কিছু উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু এই চরিত্রটির মধ্যে এই নাটকের সঙ্কেতটি সুদর্শনার চরিত্র অপেক্ষাও গভীর ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। সুদর্শনা ভণ্ডরাজের রাজবেশ দেখিয়া ভুলিয়াছেন; কিন্তু কাঞ্চীরাজ ভুলেন নাই, তিনি তাহাকে দর্শন মাত্রই তাহার কপটতা ধরিয়া ফেলিয়াছেন। সত্যের সোনা তাহার মনের মধ্যে সঞ্চিত আছে, কিন্তু দুঃখের দহনে তাহা তখন পর্যন্তও উজ্জ্বলতা লাভ করে নাই। তারপর পরাজয়ের মধ্য দিয়া সেই দুঃখ যখন দেখা দিল, তখন সত্যদর্শনে তাহার আর কোন বাধা রহিল না। রাজা নাটকের শেষ দৃশ্যটি বিশেষ তাৎপর্যমূলক। বাহিরের পথ হইতে উঠিয়া আসিয়া ঘরের সেই পরিচিত অন্ধকারে, যে-অন্ধকার হইতে পরিদৃশ্যমান জগতের সকল বস্তুভেদ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, সেখানে যখন সুদর্শনা রাজার অনুভূতি লাভ করিল, তাঁহার

সেবার অধিকার চাহিল, নিজেকে নিঃশেষে দান করিয়া দিয়া তাঁহার কাছে সম্পূর্ণ আত্মবিলোপ করিয়া দিল, তখন এই অন্ধকার ঘরের দ্বার চিরতরে খুলিয়া গেল, মহান মৃত্যুর মধ্য দিয়া চির আলোকের রাজ্যে তাঁহার অন্তরতম রাজার সঙ্গে চিরমিলন সার্থক হইল।

রাজা নাটকের বিষয়-বস্তু অবলম্বন করিয়া রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে আর একখানি সংক্ষিপ্ত রূপক নাট্য রচনা করেন—তাহার নাম 'শাপমোচন'। প্রকৃত পক্ষে ইহা রাজা নাটকের নৃত্যগীত সম্বলিত সংক্ষিপ্ত অভিনয়োপযোগী রূপ। ইহার গানগুলি রবীন্দ্রনাথের পুর্বরচিত অন্যান্য গীতি সম্বলিত নাটক হইতে গৃহীত হইয়াছে।

১৯৩১ সনে ইহার প্রথম প্রকাশের পর ১৯৩৩ সনে ইহা কয়েকবার পরিমার্জনা লাভ করিয়া সর্বশেষ রূপ লাভ করে। প্রতিবারেই ইহাতে নূতন সঙ্গীত সংযোজিত ও পুর্ববর্তী সঙ্গীতের কোন কোনটি পরিত্যক্ত হয়। নাট্যকাহিনীর সঙ্গে ইহার সঙ্গীতগুলি একসঙ্গে রচিত না হওয়ার ফলে ইহার সঙ্গীতাংশ ইহার সংলাপাংশের সহিত সহজ সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া উঠিতে পারে নাই। সেইজন্যই বারবার ইহার পরিমার্জনার প্রয়োজন হইয়াছে; অবশ্য এই পরিমার্জনা কেবলমাত্র ইহার সঙ্গীতাংশের উপর দিয়া যতখানি হইয়াছে সংলাপাংশের উপর দিয়া তত হয় নাই।

'শাপমোচন'-এর কাহিনীর সূচনাংশ রাজা নাটক হইতে সামান্য স্বতন্ত্র, কিন্তু ইহার মর্মাংশ রাজা নাটকের সঙ্গে অভিন্ন। এখানে কাহিনীটি সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতেছে। সুরসভার গীতনায়ক সৌরসেন প্রেয়সী বিরহোৎকণ্ঠিতার জন্য সুরসভায় গীতকালে তালভঙ্গ করিলেন। এই অপরাধ অমার্জনীয় বলিয়া ধার্য হইল। ইন্দ্রাণীর শাপে বিকৃত দেহশ্রী লইয়া সৌরসেন মর্ত্যলোকে গান্ধার রাজগৃহে জন্মগ্রহণ করিলেন। তীর্থ-প্রত্যাগতা পত্নীও স্বামীর অনুগমন করিয়া মদ্ররাজকুমারী রূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। কালক্রমে গান্ধার রাজের প্রতিনিধি রূপে একটি বীণা মদ্ররাজগৃহে প্রেরিত হইল; রাজকুমারী বীণাটিকে বরণ করিয়া বধূরূপে গান্ধার রাজগৃহে আসিলেন। কিন্তু রাজগৃহ অন্ধকার, সেই অন্ধকার গৃহে রাজার সঙ্গে তাঁহার বধূসমাগম হইয়া থাকে। বধূ বারবার রাজাকে দিনের আলোকে দেখিতে চাহেন, কিন্তু রাজা দেখা দেন না। তারপর একদিন উৎসবের মধ্যে অন্যান্য সহচরদিগের মধ্য হইতে রাজা তাঁহাকে চিনিয়া লইতে বলিলেন। বধূ

চিনিতে পারিলেন না, একটি কুৎসিত লোক দেখিয়া তাহার নিন্দা করিলেন। বধূ সুন্দরের পূজারিণী, তিনি কুশ্রীকে সহ্য করিতে পারেন না। অন্ধকারের রাজা ইহাতে দুঃখিত হইয়া বলিলেন, 'একদিন সইতে পারবে আপনারই আন্তরিক রসের দাক্ষিণ্যে।' অবশেষে একদিন রাজাকে দেখা দিতে হইল। রাণী দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন—এ ত সেই উৎসবের দিনের কুৎসিত লোকটি। ঘৃণায় রাণী প্রাসাদ ছাড়িয়া অরণ্যে পলাইয়া গেলেন। সেই অরণ্যের বুকে তাঁহার পূর্বজীবনের পরিচিত বীণাধ্বনির আর্তস্বর শুনিতে পাইয়া তিনি চমকিয়া উঠিলেন। কী এক হতাশের বিরহ তাঁহার অন্তর তলে জাগিয়া উঠিল। পরিচিত বীণার রাগিণী যেন জন্মান্তর হইতে ভাসিয়া আসিয়া তাঁহার অন্তর স্পর্শ করিতে লাগিল। তিনি আর সহ্য করিতে পারিলেন না, সেই রাগিণী লক্ষ্য করিয়া নির্ভয়ে অন্ধকারের মধ্যে বাহির হইয়া গেলেন। কাছে যাইতেই বীণা থামিল। অন্ধকারের ভিতর হইতে রাজা তাহাকে অভয় দিলেন। রাণী ধীরে ধীরে প্রদীপ বাহির করিয়া তাহার মুখের সম্মুখে ধরিলেন—তাহার অনিন্দ্য রূপ দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইয়া গেলেন।

'রাজা' নাটকের মধ্যে আধ্যাত্মিক সুরটি প্রবলতর, কিন্তু 'শাপমোচন' অধিকতর মানবিক অনুভূতি সমৃদ্ধ। 'রাজা' নাটকের রাজা পূর্ণাঙ্গ অলোকধর্মী চরিত্র, কিন্তু শাপমোচনের রাজা অন্ধকার দ্বারা তাঁহার মানবিক পরিচয়টি আচ্ছন্ন করিয়া দিয়া তাঁহার চারিপাশ ঘিরিয়া একটি সাময়িক কুহেলিকা সৃষ্টি করিয়াছেন মাত্র। 'রাজা' নাটক রচনার সময় রবীন্দ্রনাথ অলোকরাজ্যেই বিচরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু 'শাপমোচন' রচনাকালে তিনি মর্ত্যের ধূলিমাটিতে নামিয়া আসিয়াছিলেন, সেই জন্য ইহা সংক্ষিপ্ত ও ভাবের দিক দিয়া কতকটা দীন হইলেও অধিকতর রসসমৃদ্ধ বলিয়া অনুভূত হইবে।

'গীতাঞ্জলি'র যুগে রবীন্দ্রনাথের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যরচনাই 'ডাকঘর'। ইহা সাঙ্কেতিক নাটক; ইহা 'রাজা'র দুই বৎসর পর প্রকাশিত হয়। অনেকের মতে ইহা রবীন্দ্রসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি। নাটকখানি 'গীতাঞ্জলি'র মতই এদেশীয় পাঠকসমাজ অপেক্ষা পাশ্চাত্ত্য পাঠকসমাজেই অধিকতর প্রীতি লাভ করিয়াছে, প্রায় প্রত্যেক ইউরোপীয় ভাষাতেই ইহা অনূদিত হইয়া অভিনীত হইয়াছে এবং সর্বত্রই ইহার অভিনয় আশাতীত সমাদর লাভ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের আর কোন নাটক পাশ্চাত্ত্য সুধীসমাজে ইহার মত

এত অধিক আলোচিত হয় নাই। এই সমস্ত দিক দিয়া নাটকখানির একটু বিস্তৃত আলোচনার দাবী আছে।

ভাবের দিক দিয়া 'ডাকঘর' 'রাজা'র পরিপূরক; কিন্তু কাহিনী পরিকল্পনার দিক দিয়া 'ডাকঘর'-এর বৈশিষ্ট্য আছে। ইহার কাহিনীটি সংক্ষেপে এই: মাধব দত্ত বৈষয়িক লোক; তিনি নিঃসন্তান—তাঁহার সঞ্চিত অর্থ ভোগ করিবার কেহ নাই, পত্নীর পরামর্শে পত্নীর পিতৃমাতৃহীন ভ্রাতুষ্পুত্রকে আনিয়া পুত্রনির্বিশেষে পালন করিতে লাগিলেন, অল্পদিনের মধ্যেই তাহার প্রতি তাঁহার পরম মমতা জন্মিয়া গেল, তিনি নিজের এ যাবৎকাল উদ্দেশ্যহীন সঞ্চয়ের মধ্যে একটা অর্থ খুঁজিয়া পাইলেন,—তাঁহার সঞ্চয় এই বালকটি ভোগ করিবে, ইহা ভাবিয়া তাঁহার জীবনের আনন্দ বাড়িয়া গেল, সংসারের প্রতি অধিকতর আকর্ষণ জন্মিল। কিন্তু বালক অমল সংসারের কোন বন্ধনই স্বীকার করিতে চাহে না—সে উন্মুক্ত জানালার পার্শ্বে বসিয়া বাহিরের চঞ্চল জগতের রূপ দেখিয়া তাহার প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ অনুভব করে; জানালার পাশ দিয়া গ্রামান্তরের দইওয়ালা হাঁকিয়া যায়, পথে প্রহরী পায়চারী করিয়া বেড়ায়, গাঁয়ের মোড়ল নিজের গায়ে-পড়া কর্তব্য পালন করিয়া যায়, মালীদের মেয়ে সুধা পায়ের মল ঝম্ ঝম্ করিয়া নিত্য ফুল তুলিতে যায়, ছেলেরা দল বাঁধিয়া খেলিতে বাহির হয়—রুগ্ন বালক অমল রুদ্ধ ঘরের মুক্ত জানালাটুকু দিয়া তাহাদিগকে ডাকিয়া তাহাদের সঙ্গে আলাপ করে। তাহার জানালার সাম্‌নে রাজার ডাকঘর বসিয়াছে, বিচিত্র রং-এর তকমা-পরা ডাক-হরকরারা চারিদিকে রাজার চিঠি বিলি করিয়া বেড়াইতেছে; অমল শুনিল, তাহার নামেও রাজার চিঠি আসিবে, সে উদ্‌গ্রীব হইয়া তাহার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল।

অমল আরও অসুস্থ হইয়া পড়ে। জানালার কাছটি হইতে আসিয়া শয্যা আশ্রয় করে; অভিজ্ঞ কবিরাজ তাহাকে শরতের আলো-বাতাস হইতে দূরে সরাইয়া রাখিতে পরামর্শ দেন। সতর্ক মাধব দত্ত আদেশ পালন করিয়া যান। রাজার ডাকঘর হইতে চিঠি পাইবার উৎকণ্ঠায় অমলের অধীর মুহূর্তগুলি কাটিতে থাকে। গাঁয়ের মোড়ল তাহার ধৃষ্টতা দেখিয়া তাহাকে উপহাস করিয়া যায়; ঠাকুর্দা তাহার শিয়রে বসিয়া তাহাকে আশ্বাস দিয়া উৎসাহ দেন। তারপর এক রাত্রে বাড়ীর রুদ্ধ সদর দরজা ভাঙ্গিয়া রাজদূত অমলের ঘরে প্রবেশ করিল, জানাইল, রাজা স্বয়ং আসিতেছেন, রাত্রি দ্বিপ্রহরে তিনি

আসিবেন, তার আগে তাঁহার বালক বন্ধুটিকে দেখিবার জন্য তাঁহার সকলের চেয়ে বড় কবিরাজকে পাঠাইয়াছেন। রাজ-কবিরাজ প্রবেশ করিলেন, তিনি সেই মুহূর্তেই ঘরের সমস্ত দরজা জানালা খুলিয়া দিলেন, বাহিরের মুক্ত হাওয়া ভিতরে প্রবেশ করিল ; প্রদীপের আলোক নিভিয়া গেল, সুদূর আকাশ হইতে ঘরের ভিতর কেবল তারার আলোক জ্বলিতে লাগিল। অমল ঘুমাইয়া পড়িল, সুধা কয়টি ফুল হাতে করিয়া আসিয়া তাহাকে ডাকিল, কিন্তু তাহার ঘুম আর ভাঙ্গিল না।

'রাজা'র মধ্যে যেমন একটি রোমাণ্টিক পরিবেশের ভিতর দিয়া উদ্দিষ্ট সঙ্কেতের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, তেমনই 'ডাকঘর'-এর মধ্যে দৈনন্দিন জীবনের নিতান্ত পরিচিত বাস্তব পরিবেশ অবলম্বন করিয়া এই সঙ্কেত ব্যক্ত করা হইয়াছে—ইহাই এই নাটকের সর্বপ্রধান আকর্ষণীয় গুণ। যদিও অতীন্দ্রিয়-গ্রাহ্য অরূপ ও অসীমই এই নাটকেরও লক্ষ্য, তথাপি ইহার সমগ্র পরিবেশটি এমন প্রত্যক্ষ ও বাস্তব যে ইহার সুদূর লক্ষ্যগত ভাব-স্বপ্ন অপেক্ষা ইহার প্রত্যক্ষ পরিচয়টি পাঠককে অধিকতর মুগ্ধ করে। বিশেষতঃ ইহার মধ্যে মানব-মনের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষাগুলি এমনই সাধারণ মানবিক উপায়ে বিকাশ করা হইয়াছে যে, ইহাতে ইহার নাট্যিক মূল্যও বৃদ্ধি পাইয়াছে। 'রাজা'র সঙ্গে 'ডাকঘর'-এর ইহাই মূল পার্থক্য। একটি রোমাণ্টিক পরিবেশ আশ্রয় করিয়াছিল বলিয়া 'রাজা'য় রাণী সুদর্শনার আকাঙ্ক্ষা যতখানি অস্পষ্ট রহিয়া গিয়াছে, নিতান্ত পরিচিত বাস্তব পরিবেশকে অবলম্বন করিয়া 'ডাকঘর'-এ অমলের আকাঙ্ক্ষা রূপ পাইয়াছে বলিয়া তাহা তত অস্পষ্ট থাকিতে পারে নাই। এই নাটকের একটি প্রধান গুণ এই যে, যদিও ইহার লক্ষ্য ভাব-লোক, তথাপি ইহার মর্ত্যমুখীনতাও অবিসংবাদিতরূপে রক্ষা পাইয়াছে। 'সোনার তরী' ও 'চিত্রা'র যুগ অতিক্রম করিয়া রবীন্দ্রনাথ 'ডাকঘর'-এর মত এমন সুগভীর মর্ত্যমমতা আর কোন রচনায় দেখাইতে পারেন নাই। উঠানে বসিয়া জাঁতা দিয়া পিসিমার ডাল-ভাঙ্গা, পুরানো নাগ্‌রা জুতা-পরা বাঁশের লাঠি কাঁধে কর্মসন্ধানী বিদেশী পথিক, দূর পাহাড়ের কোলে ঝরণার বাঁকা রেখা, পাঁচমুড়া পাহাড়ের তলায় শামলী নদীতীরের দইওয়ালা, মাথায় কলসী পরণে লাল শাড়ি নদীর পথে গাঁয়ের গয়লার মেয়ে,—এই সমস্ত চিত্রের ভিতর দিয়া রবীন্দ্রনাথের যে সুগভীর মানবপ্রীতির পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা এই সাঙ্কেতিক নাট্যকাহিনীর অলোক-নির্দেশ অপেক্ষা অধিকতর চিত্তাকর্ষক

হইয়া উঠিয়াছে। অতএব 'ডাকঘর'-এর সার্থকতা তাহার সঙ্কেত-নির্দেশের গুরুত্ব কিংবা সার্থকতার উপরও নির্ভর করে নাই, ইহার মধ্যে বাস্তব জীবন-দর্শনের যে নৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাই নাটক-খানিকে সার্থকতা দান করিয়াছে। ইহার আর একটি প্রমাণ এই যে, এই নাটকের মধ্য দিয়া যে ভাবটি প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহা রবীন্দ্রসাহিত্যে কোন নূতন কথা নহে। পূর্ববর্তী সাঙ্কেতিক নাটক 'রাজা'র কথা বাদ দিলেও তাঁহার পূর্ববর্তী কাব্যগ্রন্থ, এমন কি ছোটগল্পের মধ্য দিয়াও এই ভাবটি বহু পূর্বেই প্রকাশ পাইয়াছে, সে'কথা পরে আলোচনা করিতেছি। অতএব ভাবের অভিনবত্বও ইহার মধ্যে কিছুমাত্র নাই—ইহার মধ্যে যাহা আছে, তাহা একমাত্র ভাব-প্রকাশের বৈচিত্র্য, ইহা ছাড়া আর কিছুই নহে।

রসের নিবিড়তার দিক দিয়া 'ডাকঘর' নাটকটি অতুলনীয় বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না; প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত ইহা একটিমাত্র দীর্ঘনিঃশ্বাসের মত বহিয়া গিয়াছে। কাহিনীর ধারায় কোথাও এতটুকু ছেদ পড়ে নাই; কাহিনীর নিবিড়তা ইহার একটি প্রধান গুণ। ইহা আয়তনে নিতান্তই ক্ষুদ্র, রবীন্দ্রনাথের এই শ্রেণীর নাটকগুলির মধ্যে ইহা ক্ষুদ্রতম, তিনটি মাত্র ক্ষুদ্র দৃশ্যে ইহা সম্পূর্ণ—আদ্যোপান্ত রবীন্দ্রনাথের অনন্যকরণীয় সহজ গদ্যে রচিত। 'রাজা' নাটকের মধ্যে ঘন ঘন সঙ্গীতের সন্নিবেশ কাহিনীর নিবিড়তা বিনষ্ট করিয়াছে, কিন্তু 'ডাকঘর'-এ নাট্যকার কোন সঙ্গীতের সন্নিবেশ করেন নাই; কাহিনীর নিবিড়তা রক্ষা করিতে ইহা পরম সহায়ক হইয়াছে। নাটকের প্রারম্ভেই ইহার মধ্যে যে একটি বিষাদের সুর বাজিয়াছে, তাহা শেষ পর্যন্ত একটি সুগভীর কালো ছায়ার মত সমগ্র নাট্যকাহিনীটিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। এই নাটকের ঘন বিষাদের সুর কোথাও কাহারও কোন অযথা অসংযত আচরণের দ্বারা বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে নাই; বাক্য ও কার্যের সুকঠিন সংযম এই নাটকটির একটি বিশিষ্ট গুণ। যে ঠাকুরদার বাচালতা রবীন্দ্রনাথের অন্যতম সাঙ্কেতিক নাটক 'রাজা'র অনেকখানি সৌন্দর্যহানি করিয়াছে, সেই ঠাকুরদাও এখানে সম্পূর্ণ সংযতবাক্। এখানেও ঠাকুরদা সত্যদর্শী পুরুষ, কিন্তু সত্য-প্রচারে তাঁহার প্রগল্‌ভতা এখানে প্রকাশ পায় নাই; অতএব তাঁহার চরিত্রটি এখানে অন্যান্য নাটকের ঠাকুরদা চরিত্রের মত নাট্যকাহিনীর অন্তর্গূঢ় রহস্য ব্যক্ত করিয়া না দিয়া বরং তাহা রক্ষা করিতেই সহায়ক হইয়াছে। কিন্তু 'ডাকঘর' নাটকের সংযমের কথা আলোচনা করিতে গিয়া একটি চরিত্রের

কথা কিছুতেই বিস্মৃত হইতে পারা যায় না, তাহা কবিরাজের চরিত্র। কবিরাজ একটু অসংযতবাক্ সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহার বাক্যের এই অসংযম তাঁহার চরিত্রের বাস্তব পরিচয়ই ব্যক্ত করিয়াছে; নাট্যকাহিনীর সমগ্র পরিবেশটির যে একটি অপূর্ব বাস্তব মূল্য প্রকাশ পাইয়াছে, তাহারই একান্ত অপরিহার্য অঙ্গরূপেই কবিরাজের চরিত্রটিও পরিকল্পিত হইয়াছে, তথাপি তাঁহার অসংযম এবং তাঁহার ভিতর দিয়া নাট্যকার যে ব্যঙ্গাত্মক মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা কতক পরিমাণে যে নাটকের গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশকে আঘাত করে নাই, তাহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায় না।

এই নাটকের অন্যতম প্রধান গুণ এই যে, ইহার কোন সাঙ্কেতিক চরিত্র বিশিষ্ট কোন চরিত্র হিসাবে এই নাট্যকাহিনীর মধ্যে স্থান পায় নাই। 'রাজা' নাটকের প্রধান সাঙ্কেতিক চরিত্র রাজা নাটকের মধ্যে অদৃশ্য থাকিয়াও একটি বিশিষ্ট চরিত্র হিসাবে নাট্যকাহিনীর সর্বত্র বিচরণ করিয়াছে। তাঁহার রূপ প্রত্যক্ষ করি না সত্য, কিন্তু তাঁহার মুখের কথা শুনিতে পাই—ইহার মধ্যে কল্পনার অসঙ্গতি আছে, কিন্তু 'ডাকঘর' নাটকের সাঙ্কেতিক চরিত্র রাজা নাট্যকাহিনীর কোন অংশেই কোন স্থানই অধিকার করে নাই, নাটকের শেষ মুহূর্তে তাঁহার জন্য সকলের উৎসুক প্রতীক্ষার ভিতর দিয়া কাহিনীর যবনিকাপাত হইয়া গিয়াছে—ইহার মধ্যে সঙ্কেতেরও কোন অস্পষ্টতা নাই, অথচ কল্পনারও সঙ্গতি রক্ষা পাইয়াছে। অব্যক্ত অরূপ ও অসীমের প্রতি সঙ্কেতমাত্রই সাঙ্কেতিক নাটকের লক্ষ্য, কোন রূপক চরিত্রের মধ্য দিয়া তাহার কোন প্রত্যক্ষ পরিচয় ব্যক্ত হইতে পারে না। ইহাদের অনুভূতি ইন্দ্রিয়গোচর নহে, মনোগোচর মাত্র, অতএব তাহাদের পরিচয় চোখের ভিতর দিয়াই পাই, কিংবা কানের ভিতর দিয়াই লাভ করি—ইহাদের মূল্য একই হইয়া দাঁড়ায়। এই দিক দিয়া 'রাজা' নাটক অপেক্ষাও 'ডাকঘর' সুপরিকল্পিত এবং এই ভাবে বিচার করিতে গেলে ইহাই রবীন্দ্রনাথের একমাত্র সাঙ্কেতিক নাটক বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। ইহাতে কোন সাঙ্কেতিক চরিত্র প্রাধান্য লাভ করিতে না পারায় ইহার আর একটি গুণ প্রকাশ পাইয়াছে—তাহা এই যে, ইহা 'রাজা' নাটকের মত তত্ত্ব-প্রধান না হইয়া রস-প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। ইংরেজ সমালোচক এড্ওয়ার্ড টম্সনও যথার্থই ইহার রসোপলব্ধি করিয়া ইহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, 'it is beautiful, touching, of one texture of simplicity throughout and within its limits an almost perfect

piece of art.' রাজার অলোক-সংজ্ঞা কিংবা তাঁহার সঙ্গে মিলনের মধ্যে যে অতীন্দ্রিয়গোচর ভূমানন্দ আছে, তাহার কথা দ্বারা 'ডাকঘর' ভারাক্রান্ত নহে, বরং ইহার কাহিনীর মধ্যে ইন্দ্রিয়গোচর প্রত্যক্ষলোকের যে মর্মস্পর্শী পরিচয় আছে, তাহাই ইহাকে যথার্থ আর্টের পর্যায়ে উন্নীত করিয়াছে। অতএব ইহা সাঙ্কেতিক রচনা হইলেও ইহা রবীন্দ্রনাথের এই শ্রেণীর অন্যান্য রচনার মত তত্ত্বধর্মী নহে, বরং কাব্যধর্মী।

পূর্বেই বলিয়াছি, ভাবের দিক দিয়া এই নাটকে রবীন্দ্রনাথের কোন অভিনবত্ব নাই—ইহার যাহা কিছু অভিনবত্ব, তাহা ইহার ভাব-প্রকাশের মধ্যে। অমলের চরিত্রে সুদূরের জন্য আকুতি ও বন্ধনের মধ্যে যে বেদনার পরিচয় তিনি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ইহার পূর্ববর্তী কাব্যসমূহেও তিনি নানাভাবেই ব্যক্ত করিয়াছেন। 'প্রভাত-সঙ্গীত' হইতে আরম্ভ করিয়া 'খেয়া'র পূর্ববর্তী যুগে 'উৎসর্গ' রচনার কাল পর্যন্ত তিনি নানাভাবেই বিশ্বব্যাপ্তি ও বন্ধন-মুক্তির জয়গান গাহিয়া আসিতেছেন। কাব্যের ভিতর দিয়াও তিনি প্রকৃতির সঙ্গে মানবমনের যে নিবিড় যোগ অনুভব করিতেন, 'ডাকঘর'-এর মধ্য দিয়া তাহারও পরিচয় মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। 'ডাকঘর' রবীন্দ্র কবি-মানসের আত্মকেন্দ্রিক ভাবানুভূতির রূপায়ণ মাত্র; তাঁহার শৈশব জীবনের-অবরুদ্ধতার বেদনা বালক অমলের অবরোধ-জীবনের ভিতর দিয়া ব্যক্ত হইয়াছে, তাঁহার পরিণত জীবনের আধ্যাত্মিক চেতনারও আভাস তাহারই রাজার চিঠি পাইবার আকুতির মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে; সেইজন্য বালক অমল একাধারে শৈশব জীবনের অবরুদ্ধতার বেদনাভারে যেমন পীড়িত, তেমনই আবার পরিণত মনের সুদূরের আকাঙ্ক্ষায় উদ্বুদ্ধ; সে শৈশব-সুলভ কৌতূহল বশতঃ প্রত্যক্ষ বস্তুকেও লাভ করিতে চায়, আবার পরিণত মনের দার্শনিক দৃষ্টি লইয়া অপ্রত্যক্ষের জন্যও ব্যাকুল হইয়া উঠে। এইজন্যই অমলের মনের উপর দুইটি শক্তিই সক্রিয় দেখিতে পাওয়া যায়।

'প্রভাত-সঙ্গীত'-এর মধ্যে ভগ্ন-স্বপ্ন নির্ঝরের কলকণ্ঠে যে মুক্তির আনন্দ গান ধ্বনিত হইয়াছিল, কিংবা 'সোনার তরী'র 'বসুন্ধরা'য় বিশ্বব্যাপ্তির মধ্যে কবি যে আনন্দানুভূতির পরিচয় পাইয়াছিলেন, তাহাই 'খেয়া'র পূর্ববর্তী যুগে 'উৎসর্গে' আসিয়া 'সুদূর' 'প্রবাসী' ইত্যাদি কবিতায় নূতন রূপ লাভ করিয়াছে মাত্র। পরবর্তী রচনা 'ডাকঘর'-এর মধ্য দিয়াও 'সুদূর' কবিতার এই সুরটিই ধ্বনিত হইয়াছে—

আমি উন্মনা হে,
হে সুদূর, আমি উদাসী ।
রৌদ্র-মাখানো অলস বেলায়,
তরু-মর্মরে, ছায়ার খেলায়,
কী মুরতি তব নীলাকাশশায়ী
নয়নে উঠে গো আভাসি' ।
ওগো সুদূর, বিপুল সুদূর, তুমি যে
বাজাও ব্যাকুল বাঁশরী,
কক্ষে আমার রুদ্ধ দুয়ার
সে কথা যে যাই পাশরি' ।

রবীন্দ্রনাথের 'খেয়া' বা 'গীতাঞ্জলি'র যুগের প্রায় সমগ্র ভাব-কল্পনাই যেমন তাঁহার পূর্ববর্তী সমৃদ্ধতর 'সাধনা' বা 'সোনার তরী'র যুগ হইতেই গৃহীত, তেমনই 'ডাকঘর'-এর পরিকল্পনাটিও তাঁহার পূর্ববর্তী এই 'সাধনা'র যুগেরই 'গল্পগুচ্ছে'র একটি গল্পের মধ্যে নিহিত আছে বলিয়া মনে হয়। গল্পটির নাম 'অতিথি'। রবীন্দ্রনাথের ইহা একটি অতি সুপরিচিত ছোট গল্প। ইহার মধ্যে বালক তারাপদর যে চরিত্রটির পরিকল্পনা করা হইয়াছে, তাহার সঙ্গে 'ডাকঘর'-এর অমলের চরিত্রের মৌলিক সম্পর্ক আছে। রবীন্দ্র-সাহিত্যে তখনও আধ্যাত্মিকতার বিকাশ হয় নাই বলিয়া গল্পটির মধ্যে গভীরতর কোন সঙ্কেতের নির্দেশ তেমন প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতে পারে নাই, তবে তাহার আভাস যে না পাওয়া যায়, তাহাও নহে। বালক তারাপদর জীবনে বন্ধন যখনই একান্ত হইয়া উঠে, তখনই সে সেই বন্ধন হইতে মুক্তির সন্ধান করে, প্রকৃতির ভিতর দিয়া এই মুক্তির আহ্বান তাহার কানে আসিয়া পৌঁছায়, এই আহ্বানে সাড়া দিতে গিয়া সে 'স্নেহ-প্রেম-বন্ধুত্বের ষড়যন্ত্র-বন্ধন তাহাকে চারিদিক হইতে সম্পূর্ণরূপে ঘিরিবার পূর্বেই সমস্ত গ্রামের হৃদয়খানি চুরি করিয়া একদা বর্ষায় মেঘান্ধকার রাত্রে আসক্তিবিহীন উদাসীন জননী বিশ্ব-পৃথিবীর নিকট চলিয়া যায়।' বলাই বাহুল্য যে, 'সাধনা' বা 'সোনার তরী'র যুগের এই উদাসীন জননী বিশ্ব-পৃথিবীই 'গীতাঞ্জলি'র আধ্যাত্মিক যুগের রাজা।

'রাজা' নাটকের মধ্যে যেমন একটি অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিক আকুতির অভিব্যক্তি দেখা যায়, 'ডাকঘর' নাটকের মধ্যে তাহার কতকটা ব্যতিক্রম আছে। 'ডাকঘর'-এ অমলের মধ্য দিয়া মানব মনের সুদূরের জন্য আকাঙ্ক্ষার

যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা 'রাজা'র 'সুদর্শনা চরিত্রের অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিক আকৃতির সমধর্মী বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে না ; কারণ রাণী সুদর্শনার লক্ষ্য সম্পূর্ণ ই নিরবলম্ব, বিশ্ব-বস্তুতে অনাশ্রিত ; কিন্তু অমলের লক্ষ্য তাহা নহে—সে প্রত্যক্ষলোক অতিক্রম করিয়াই অপ্রত্যক্ষলোকের অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে। সে পৃথিবীর প্রতি প্রত্যক্ষ অণুপরমাণুতে রাজার ডাকঘরের মোহর আঁকা দেখিয়াছে, প্রত্যক্ষ বস্তুর অন্তরালে যে অপ্রত্যক্ষ মহান্ শক্তির অস্তিত্ব রহিয়াছে, তাহার জন্য অমলের বিশেষ কোন আকাঙ্ক্ষা দেখা যায় নাই। রাজার মোহর-আঁকা চিঠির জন্যই সে অপেক্ষা করিয়াছে, রাজার জন্য অপেক্ষা করে নাই। কিন্তু সুদর্শনা রাজাকেই চাহিয়াছেন, এমন কি, অদৃশ্য রাজা যখন তাঁহাকে বলিয়াছেন, 'এত বিচিত্র রূপ দেখছ, তবে কেন সব বাদ দিয়ে কেবল একটি বিশেষ মূর্তি দেখ্‌তে চাচ্ছ ?' তখনও সুদর্শনা সন্তুষ্ট হন নাই। কিন্তু রাজার এই 'বিচিত্র রূপ' প্রত্যক্ষ করার মধ্যেই অমলের কৌতূহল নিবদ্ধ ছিল, 'অরূপরতন'-কে প্রত্যক্ষ করিবার তাহার কোনই কামনা ছিল না। এই জন্যই সুদর্শনার যে ভ্রান্তি জন্মিয়াছিল, কিংবা সেই ভ্রান্তি-জনিত যে দুঃখ তাহাকে বরণ করিতে হইয়াছিল, অমল তাহা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল। প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত অমল সত্যাশ্রিত। অমলের মনে যে আকাঙ্ক্ষার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা মানবমনের একটি সহজ প্রবৃত্তি মাত্র। আমরা সংস্কার দ্বারা এই প্রবৃত্তি দমন করিয়া রাখি, কিন্তু যে বালক—বাহ্যসংস্কার এখনও যাহার অন্তরের স্বাভাবিকতা বিনষ্ট করিতে পারে নাই—তাহার নিকট এই প্রবৃত্তি দুর্নিবার হইয়া উঠে। সেইজন্য কৌতূহলী বালকের মধ্য দিয়াই নাট্যকার এই ভাবটি সার্থকভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। 'গল্পগুচ্ছে'র 'অতিথি' গল্পের তারাপদর ন্যায়, 'ডাকঘর'-এর অমলও মানবাত্মার প্রতীক্। বন্ধনই আত্মার পীড়া। অমলের পীড়া শারীরিক কোন বিকার মাত্র নহে, ইহা মনের অস্বস্তি-অবস্থা ; চারিদিকের বন্ধন হইতেই এই অস্বস্তির জন্ম। এই বন্ধন হইতে মুক্তিই আত্মার চিরন্তন কাম্য ; একমাত্র মৃত্যুর মধ্য দিয়াই এ মুক্তি সম্ভব হইয়া থাকে।

এই সাঙ্কেতিক নাট্যকাহিনীর পরিণতিটি অত্যন্ত করুণ ও মর্মস্পর্শী। 'রাজা'র পরিণতিটি এত প্রত্যক্ষ ও স্পষ্ট নহে বলিয়া ইহার মত এত গভীর ভাবে অন্তর স্পর্শ করিতে পারে না। চারিদিকের জীবন-কোলাহলের মধ্যে একটি মানবাত্মা চিরসুষুপ্তিমগ্ন হইয়া পড়িল—স্নেহ তাহাকে ধরিয়া রাখিতে

পারিল না, একমাত্র অবিনাশী প্রেম তাহার স্মৃতির শিয়রে জাগিয়া রহিল। মর্ত্যে প্রেমই সুধা, সেইজন্য সুধা তাহাকে ভুলিতে পারিল না। একটি রহস্য-ঘন নিথর-নিস্তব্ধ জীবনলোকের উপর ধীরে ধীরে যেন মৃত্যুর নীল যবনিকা পড়িয়া গেল।

রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভুক্ত থাকিলেও এ যাবৎ কাল কোনদিনই ব্রাহ্মধর্মের সাক্ষাৎ সম্পর্কে আসেন নাই। তাঁহার সাহিত্যের মধ্য দিয়াও এ পর্যন্ত ব্রাহ্মধর্মের মূল আদর্শের প্রতি তাঁহার কোন প্রকার গোঁড়ামি কিংবা নিষ্ঠার পরিচয়ও প্রকাশ পায় নাই। 'গীতাঞ্জলি'র যুগে প্রবেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার যে আধ্যাত্মিক দৃষ্টির বিকাশ হয়, তাহার সঙ্গে ব্রাহ্মধর্মের ব্রহ্মবাদের আদর্শগত ঐক্য ছিল। এই সময় হইতেই তিনি ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজের প্রতি নানাভাবে সক্রিয় সহানুভূতি দেখাইতে থাকেন। এই সময়েই তিনি মাঘোৎসবে কলিকাতায় সর্বপ্রথম আদি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য-রূপে ব্রাহ্মধর্ম-বিষয়ে বক্তৃতা করেন এবং ক্রমান্বয়ে কিছুকাল পর্যন্ত বক্তৃতায় ও প্রবন্ধে ব্রাহ্মধর্মের মূল আদর্শ ব্যাখ্যা করিতে থাকেন। এই সময় বক্তৃতা ও প্রবন্ধের ভিতর দিয়া ব্রাহ্মধর্মের প্রতি তাঁহার এই প্রবল সহানুভূতি প্রকাশ পায়। স্বধর্ম ও সমাজের প্রতি তাঁহার এই প্রবল সহানুভূতির যুগে হিন্দু-সমাজের আচার-জীবনকে প্রচ্ছন্ন ভাবে ব্যঙ্গ করিয়া তিনি এক রূপক নাট্য রচনা করেন, তাহার নাম 'অচলায়তন'। ইহা কলিকাতা আদি ব্রাহ্ম-সমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। ইহার বিষয়-বস্তু সংক্ষেপে এইরূপ:

'অচলায়তন' একটি আবাসিক শিক্ষাভবনের নাম; সেখানে প্রাচীন সনাতন ধর্মীয় আচারসমূহ শিক্ষা দেওয়া হয়, চারদিক ঘিরিয়া উচ্চ প্রাচীর তুলিয়া জগতের সঙ্গে ইহার বিচ্ছেদ সৃষ্টি করা হইয়াছে, হাজার হাজার বছরের মধ্যেও ইহাতে বাহিরের সূর্যালোক প্রবেশ করে নাই, বাহিরের চঞ্চল জগতের সঙ্গে ইহার কোন যোগ নাই। ইহাতে আচার্য আছেন, উপাচার্য আছেন, উপাধ্যায় আছেন এবং বিবিধ আচার-নিষ্ঠ প্রবীণ ব্যক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া সুকুমারবয়স্ক শিক্ষার্থী বালক পর্যন্ত আছে। তাহারা প্রত্যেকেই উপাধ্যায়ের নির্দেশ মত প্রাত্যহিক বাঁধা মন্ত্র পাঠ ও নির্দিষ্ট আচারসমূহ পালন করিয়া থাকে। মহাপঞ্চক ও পঞ্চক দুই ভ্রাতা, জ্যেষ্ঠ মহাপঞ্চক আচারনিষ্ঠ প্রবীণ ব্যক্তি, কনিষ্ঠ পঞ্চক আচার-বিদ্রোহী নবাগত। মহাপঞ্চক কনিষ্ঠকে আচার-ধর্মে দীক্ষিত করিয়া লইতে চাহেন, কিন্তু সে কিছুতেই নিয়মের বশে

আসিতে চাহে না। 'অচলায়তন'-এর আচার্য তাহাকে স্নেহ করেন। এই আচার্য নিয়মভঙ্গকারী এক বালককে যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত হইতে মুক্তি দিয়া 'অচলায়তনে'র অন্যান্য অধিবাসীর অপ্রীতিভাজন হইয়া উঠিলেন—তাহারা পঞ্চক ও আচার্যকে অন্ত্যজ জাতির পল্লীতে নির্বাসিত করিলেন। শোনা গেল, 'অচলায়তন'-এ গুরু আসিবেন; এই গুরুকে আচার্যই চিনিতেন, তিনি নির্বাসিত, অতএব কে তাঁহার অভ্যর্থনার ভার লয়? অবশেষে গুরু আসিলেন, কিন্তু 'অচলায়তন'-এর দ্বারপথ দিয়া প্রবেশ করিলেন না, তিনি তাঁহার সহচর অন্ত্যজ জাতি শোণপাংশুদিগের সহায়তায় 'অচলায়তন'-এর প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। 'অচলায়তনে'র বহুদিনের অবরুদ্ধ অন্ধকার ঘুচিয়া গেল; সকলে দেখিল, এই গুরু আর কেহই নহেন, তিনি সকলের দাদাঠাকুর।

বৌদ্ধ সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত 'দিব্যাবদানমালা' নামক গ্রন্থে 'পঞ্চকাবদান' নামে একটি অবদান বা নীতিমূলক কাহিনী আছে। কাহিনীটি সংক্ষেপে এই :

এক ব্রাহ্মণ নিতান্ত বিষণ্ণভাবে একদিন এক পথের ধারে বসিয়াছিলেন। সেইখান দিয়া এক বৃদ্ধা যাইতেছিলেন, ব্রাহ্মণকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বাছা, তুমি এমনভাবে বসিয়া কি ভাবিতেছ?' ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'আমার স্ত্রী সন্তান-সম্ভবা, প্রসব-কাল আসন্ন হইয়াছে; কিন্তু এ পর্যন্ত তাঁহার একটি সন্তান হইয়াও বাঁচে নাই, এইটিও বাঁচিবে এমন ভরসা নাই।' বৃদ্ধা বলিলেন, 'আচ্ছা, যখন সময় হইবে, তখন আমাকে সংবাদ দিও।' যখন সময় হইল, তখন ব্রাহ্মণ তাঁহাকে সংবাদ পাঠাইলেন, বৃদ্ধা আসিয়া প্রসূতির সেবা-শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন, নির্বিঘ্নে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। বৃদ্ধা শিশুকে কোলে তুলিয়া লইয়া মুখে ননী ছোঁয়াইলেন। তারপর পরিষ্কার কাপড়ে আচ্ছাদিত করিয়া শিশুকে পিতার হাতে তুলিয়া দিলেন। বলিলেন, ইহাকে লইয়া নগরের চতুষ্পথে যাও, পথ দিয়া যে ব্রাহ্মণ কিংবা শ্রমণ যাইবে তাহাকেই উদ্দেশ্য করিয়া বলিও, 'ভদন্ত, এই শিশু আপনাকে প্রণাম করিতেছে।' 'সারাদিনের পর ইহাকে লইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিও।' ব্রাহ্মণ তাহাই করিলেন। শিশু মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইল। শিশুর নাম হইল মহাপঞ্চক। তারপর এই ব্রাহ্মণের আর একটি পুত্র হইল, এইভাবেই তাহারও প্রাণ রক্ষা পাইল। তাহার নাম হইল পঞ্চক। পিতার মৃত্যুর পর মহাপঞ্চক বৈরাগ্য অবলম্বন করিলেন, অল্পদিনের মধ্যেই অর্হৎ হইলেন। পঞ্চক তাহার কিছুই করিতে

পারিল না, সে হইল একজন মহামূর্খ ; কোন বিদ্যাই সে লাভ করিতে পারিল না। মহাপঞ্চক একদিন বিরক্ত হইয়া তাহাকে মঠ হইতে দূর করিয়া দিলেন। মঠ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া পঞ্চক পথের ধারে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল। তখন ভগবান বুদ্ধ তাহার প্রতি করুণাপরবশ হইয়া একজন ভিক্ষুকে তাহার জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে আদেশ দিলেন। তারপর পঞ্চকও একদিন অর্হৎ পদে উন্নীত হইল। এই বিষয়ে পূর্বজন্মের সুকৃতি তাহাকে সাহায্য করিল।

'এই নাটক প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ইহার বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন আরম্ভ হয়। অক্ষয়চন্দ্র সরকার, ললিতচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সমালোচক-গণ অভিযোগ করেন যে, ইহাদ্বারা হিন্দুধর্মের আচারানুষ্ঠানকে ব্যঙ্গ করা হইয়াছে, ইহা রবীন্দ্রনাথের সাম্প্রদায়িক মনোভাব মূলক রচনা। রবীন্দ্রনাথ আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়া এই প্রতিবাদের উত্তর দিয়াছিলেন; তিনি বলিয়াছিলেন, তিনি ইহাতে অর্থহীন আচারকে ধর্ম বলিয়া স্বীকার করেন না, এ কথাই এই নাটকের মধ্য দিয়া বলিয়াছেন। এ কথা তিনি তাঁহার পূর্ববর্তী নাট্যকাব্য 'বিসর্জনে'র মধ্য দিয়াও বলিয়াছিলেন ; হিন্দুধর্মের উপর আঘাত তাহাতেও ছিল, কিন্তু তাহা ইহার মত এত প্রত্যক্ষ ও নির্মম হইয়া উঠিতে পারে নাই।

রাজেন্দ্রলাল মিত্রের The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal নামক গ্রন্থ হইতে রবীন্দ্রনাথ এই নাটকের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন। নাটকে উল্লেখিত ধারণী মন্ত্রগুলি এবং বিভিন্ন চরিত্রের নাম তিনি এই গ্রন্থ হইতে লইয়াছিলেন। তবে এ বিষয়ে তিনি কিছু কিছু স্বাধীনতাও গ্রহণ করিয়াছিলেন। 'অচলায়তনে' অদীনপুণ্য নামক যে একটি চরিত্র আছে, তাহা রবীন্দ্রনাথের এখানে নূতন যোজনা। তবে এই নামটিও বৌদ্ধসাহিত্য হইতে গৃহীত। 'বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতা'য় এই নামে একটি কাহিনী আছে।

মূল বৌদ্ধ কাহিনীর পঞ্চক মূর্খ ; কিছুই সে শিখিতে পারে নাই। রবীন্দ্রনাথ পঞ্চকের মূর্খতাকে ভিন্ন অর্থে গ্রহণ করিয়া তাহাকে রসিকরূপে আঁকিয়াছেন। অচলায়তনের আচার অনুষ্ঠানের বিদ্যাকে যে সে গ্রহণ করিতে পারে নাই, সে তাহার অক্ষমতাবশত নহে ; আসলে সে এই কৃত্রিম বিদ্যার ভার বহন করিতে চাহে নাই। এই বিদ্যা মানুষকে বিকাশ পাইতে দেয় নাই, আচারের গণ্ডীতে তাহাকে বলয়িত করিয়াছে। পঞ্চক সুযোগ পাইলেই অচলায়তন হইতে

বাহির হইয়া শোণপাংশুদের সঙ্গে মিশিত। শোণপাংশু আর দর্ভকেরা থাকে অচলায়তনের বাহিরে। শোণপাংশুরা কর্মচঞ্চল জাতি। একটা কিছু করিতে পারিলেই তাহারা খুসী। তাহাদের অফুরন্ত প্রাণাবেগে কোনো নীতিতেই তাহারা বাঁধা থাকিতে পারে না। শোণপাংশুদের মধ্যে পঞ্চক দেখিয়াছে মুক্তি। এই মুক্তিও অবশ্য যথার্থ মুক্তি নয়; কারণ, ইহাদের কর্মস্পৃহা কোন লক্ষ্যে তাহাদিগকে লইয়া যায় নাই। এ যেন কাজের জন্যই কাজ করা, অচলায়তনের মত ইহারাও লক্ষ্যচ্যুত। তবু শোণপাংশুরা মুক্তির পথ রচনা করিয়াছে, পঞ্চক সেই পথেরই পথিক হইতে চাহে। দর্ভকেরা অন্ত্যজ জাতি। কিন্তু ইহারা রসের সাধনা করিয়াছে। তাহারা ভক্তিপথের পথিক। এই সাধনাতেও অন্ধতা আছে। এই অন্ধতা যুক্তিহীন বিশ্বাসের, কর্মহীন শান্তির। তবু ইহাদের মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে আত্মনিবেদনের পরম চরিতার্থতা।

পঞ্চক যতক্ষণ পর্যন্ত ইহাদের সান্নিধ্যে আসে নাই, ততক্ষণ তাহার প্রাণ যে কি চায়, বুঝিতে পারে নাই। সে চাহিয়াছে মুক্তি। নিয়মবদ্ধ মানুষের মুক্তি পিপাসার প্রতীক্ সে। দর্ভক আর শোণপাংশুদের মাঝখানে যখন সে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন তাহার অস্ফুট পিপাসাও ধীরে ধীরে আকার গ্রহণ করিল। পঞ্চক শোণপাংশুদের কর্মময় জীবন লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা করিল, আবার দর্ভকদের সারল্যও তাহাকে মুগ্ধ করিল। যেন সব মিলিয়াই সে পুর্ণ হইয়া উঠিবে। গুরু আসিয়া তাহাকে যে আয়তনের আচার্য করিয়া দিলেন, সে আয়তন দর্ভক এবং শোণপাংশুদের লইয়া সরস হইয়া উঠিল। জ্ঞান-ভক্তি-কর্মের সমন্বিত পুর্ণতারই আয়তন সে। পঞ্চক পুর্ণ জীবন-সাধনার আচার্য।

অস্পষ্ট হইলেও পঞ্চক চরিত্রে এই ভাবের অভিব্যক্তি আছে। নাটকীয় চরিত্রে আমরা যে প্রকৃতির দ্বন্দ্ব-সংঘাত এবং ক্রমবিকাশ আশা করি, পঞ্চকের চরিত্রে অবশ্য তাহা নাই। রক্তমাংসের মানুষের অটল বিশ্বাস কিংবা তাহার পরিণাম, ব্যক্তিজীবনের বাস্তব প্রবৃত্তি কিংবা ক্ষুধা—এই চরিত্রে দেখান হয় নাই। এই ধরণের মানবীয় চরিত্র পঞ্চক নয়। সমালোচকগণ এই চরিত্রকে বলিবেন রূপক। কবিপ্রাণের বিশেষ ভাবের বিগ্রহ হইতেছে পঞ্চক। এই রূপকচরিত্রে আকাঙ্ক্ষা ক্রমবিকশিত হইয়া রূপ লইয়াছে বিশ্বাসে। গানের সুরে এই সূক্ষ্ম মানসিক পরিণতি সূচিত হইয়াছে। অচলায়তনের বন্দিদশায় প্রাণ যখন মুক্তির জন্য অধীর, তখন সে গাহিল—

তুমি ডাক দিয়েছ কোন সকালে
কেউ তা জানে না,
আমার মন যে কাঁদে আপন মনে
কেউ তা মানে না।

সুভদ্র উত্তর দিকের জানালা খুলিয়া দেখিয়াছিল, নীল পাহাড় আর প্রসারিত প্রান্তর। শুনিয়া পঞ্চক আরও ব্যাকুল হইয়া উঠিল। এই গানে পঞ্চকের ব্যাকুলতা বড় করুণ। কিন্তু এই ব্যাকুলতার কোনো রূপ নাই। তাহার আকাঙ্ক্ষিতকে সে চেনে না, জানেও না। তারপর সে দেখিল, শোণপাংশুদের কর্মমুখর জীবন। দেখিয়া তাহাদের উদ্দাম সচলতায় মুগ্ধ হইল। পঞ্চক অনুভব করিল, সে চাহে এই গতিবেগ। তখন তাহার কণ্ঠে বাজিল এই গান—

হারে রে রে রে রে—
আমায় রাখবে ধরে কেরে।
দাবানলের নাচন যেমন
সকল কানন ঘেরে।
বজ্র যেমন বেগে
গর্জে ঝড়ের মেঘে
অট্টহাস্যে সকল বিঘ্নবাধার বক্ষ চেরে।

দাবানলের প্রচণ্ড নৃত্যলীলায় যেমন গতির উন্মাদনা আছে, বজ্রের বেগেও আছে তেমনি সচল মত্ততা, আবার ঝড়েও তো সেই গতির সঙ্গীত! এই গানটিতে বন্ধনহীন গতিধর্মের জন্য আকুলতা প্রকাশ পাইয়াছে। এই গতির সাধনা সে প্রত্যক্ষ করিল শোণপাংশুদের মধ্যে। তাহাদিগকে দেখিয়া তাহার মনে হইল, সে বুঝি এমনি মত্ততাই চায়; কিন্তু তাহা নয়। 'এই শোণপাংশু-গুলো বাইরে থাকে বটে, কিন্তু দিনরাত্রি এমনি পাক খেয়ে বেড়ায় যে বাহিরটাকে দেখতেই পায় না।' কর্মকেই সে চায়, মত্ততাকে নয়। দর্ভকদের আবার শোণপাংশুদের বিপরীত ধর্ম। ইহাদের বিনম্র প্রশান্তিটুকু লোভনীয়। এই সহজ আত্মনিবেদনে সৌন্দর্য আছে। কোন ক্ষোভ, কোন জিজ্ঞাসা না রাখিয়া ইহারা জীবনকে পরিণত করিয়াছে মধুস্থলীতে—

যে মধুটি লুটিয়ে আছে
দেয় না ধরা কারো কাছে
ওদের সেই মধুতে কেমনে মন ভরেছে রে।

পঞ্চক এই মধুর কাঙাল। দর্ভকদের মধ্যে তাহার অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা জীবনের আর একটি দিক লাভ করিল। তাহার কাম্য বস্তু তাহার কাছে ক্রমেই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। সেই জন্য তাহার মনে আকুলতা আসিয়াছিল, তাহা যে এই জীবনকে লইয়াই পর্বে পর্বে তাহাই যেন তাহার কাছে আভাসিত হইয়াছে।

কিন্তু শোণপাংশুই হোক, আর দর্ভকই হোক, কেহই পুর্ণ জীবনের সন্ধান পায় নাই। কাহাকেও স্বতন্ত্র করিয়া পুর্ণতা লাভ করা যায় না। অচলায়তন, শোণপাংশু আর দর্ভকের তিন সাধনার ধারা যখন মিলিত হইল পঞ্চকে, তখন তাহার হৃদয়ের ত্রিবেণীসঙ্গমেই রচিত হইল মহামানবের মিলন-তীর্থের আদর্শ, অখণ্ড পুর্ণায়ত জীবন। পঞ্চকের এই গানটিতে আছে তাহারই বাণী—

আমি যে সব নিতে চাই, সব নিতে ধাই রে।
আমি আপনাকে ভাই মেলব যে বাইরে।

অচলায়তনের বিদ্রোহী এইবার ফিরিয়া পাইল নিজেকে। ফিরিয়া দেওয়ার যিনি বিধাতা, তিনি অচলায়তনের গুরু, শোণপাংশুদের দাদাঠাকুর আর দর্ভকদের গোঁসাই।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে বিচিত্রভাবে অরূপের জন্য পিপাসা প্রকাশ পাইয়াছে। 'অচলায়তন' নাটককে সেই পিপাসা মহাজীবনের কল্পনায় দীপ্ত হইয়াছে। পঞ্চক-চরিত্র তারই রূপক। এই পঞ্চকও রবীন্দ্রনাথের রোমাণ্টিক কবিপ্রকৃতির প্রতীক্। 'রক্তকরবী'তে যে প্রাণ যন্ত্রজীবনেও উচ্ছ্বসিত হইয়াছিল, রঞ্জন ছিল তাহারই প্রতীক্। রক্তকরবীর যন্ত্র এখানে স্থান লইয়াছে ধর্মের অবরোধরূপে। 'ডাকঘর' নাটকে কবি তাহাকে আরো বিশ্বাশ্রয়ী অর্থ দান করিয়াছেন। অমল সেখানে মুক্তিপিপাসু মানবাত্মারই প্রতীক্। এই মুক্তি সীমাবদ্ধ দেহজীবন হইতে মুক্তি। 'ফাল্গুনী' নাটকেও মৃত্যুর সীমাকে অতিক্রম করিয়া পাওয়ার আবেগ প্রকাশ পাইয়াছে। সমাজে হোক, ধর্মে হোক, বিশ্বাসে হোক, জীবন সাধনাতেই হোক, যেখানে যা কিছু অচল অবরোধ সৃষ্টি করে, কবি তাহা হইতেই মুক্তি চাহিয়াছেন। কাব্য কল্পনার দিক হইতে কবি যেমন সুদূরের যাত্রী—'ওগো সুদূর, বিপুল সুদূর, তুমি যে বাজাও ব্যাকুল বাঁশরী, কক্ষে আমার রুদ্ধ দুয়ার সে কথা যে যাই পাসরি'—জীবনের দিক হইতেও তেমনই তিনি নিরবচ্ছিন্ন গতিরই পিপাসু। যাহা দীর্ঘকাল বাঁধিয়া রাখে বিকাশকে

তাহাই শুরু করে। চলাই হইতেছে বিশ্বের নিয়ম। সুদূরের স্বপ্ন-রচনা করিয়া সীমাকে অতিক্রম করিয়া যাইবার ইচ্ছাই রোমান্টিকতা। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার রোমান্টিক কবিধর্ম বলে বিচিত্র ভাবে কাব্যে নাটকে বন্ধনকে অতিক্রম করিবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়াছেন। এই আকাঙ্ক্ষার বশেই তিনি 'অচলায়তন' নাটকেও ধর্মজিজ্ঞাসু। যে ধর্ম বাঁধে, সেই ধর্ম বিকাশে সহায়তা করে না। পঞ্চক সেইজন্য এই ধর্ম হইতে মুক্তি চাহিয়াছে, বিশ্বমানবের সচল ধর্মে সে চরিতার্থতা সন্ধান করিয়াছে। মূল কাহিনীর বৌদ্ধ আদর্শের সঙ্গেও সেইজন্যই ইহার নিগূঢ় ঐক্য।

'দিব্যাবদানমালা'র কাহিনীতে বুদ্ধ পঞ্চককে যথার্থ জ্ঞানের আলো দান করিয়াছিলেন। 'অচলায়তনে'ও পঞ্চককে গুরু যথার্থ জ্ঞানের সম্পদ দিয়াছেন। প্রাচীন কাহিনীর বীজটি আধুনিক কবির চিত্তক্ষেত্রে নতুন অর্থে অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হইয়াছে। ইহাতে যেমন আছে কবির রোমান্টিক পিপাসা, তেমনি তাহার সঙ্গে মিশ্রিত হইয়াছে আধুনিক সমাজ-জিজ্ঞাসা। জিজ্ঞাসা এবং বিচার এই যুগেরই বৈশিষ্ট্য। আচার-শৃঙ্খলিত সমাজের সার্থকতা লইয়া তিনি প্রশ্ন তুলিলেন। এই উভয়ে মিলিয়া কবি প্রাচীন 'পঞ্চকাবদান'কে নতুন অর্থে অর্থবান করিলেন। (ভবতোষ দত্ত, 'জগজ্জ্যোতিঃ', ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, পৃষ্ঠা ৭-১০-এ প্রকাশিত 'পঞ্চক' নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।)

১৩০০ সালে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' নামক কাব্য-গ্রন্থে 'দেউল' নামক একটি কবিতায় এই নাটকের ভাবটি সর্বপ্রথম প্রকাশ পায়। তারপর সমসাময়িক 'গীতাঞ্জলি'র যুগে এই ভাবটির স্পষ্টতর বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। 'ভজন পূজন সাধন আরাধনা সমস্ত থাক পড়ে' কিংবা 'যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হ'তে দীন'—প্রভৃতি গানের মধ্য দিয়াও এই ভাবটিই প্রকাশ করা হইয়াছে। কিন্তু 'অচলায়তনে' এই ভাবটি প্রকাশ করিবার মধ্যে বিশেষ একটি সামাজিক পরিবেশকে প্রত্যক্ষ ভাবে অবলম্বন করিয়া তাহার মধ্য দিয়া অন্য একটি বিশেষ সমাজ-জীবনের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। 'গীতাঞ্জলি'র গানের মধ্য দিয়া যে-ভাবটি সম্পূর্ণ নিরবলম্ব হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে, নাটকের মধ্য দিয়া সেই ভাবটি একটি বিশিষ্ট সমাজ-রূপকে লক্ষ্য করিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে এবং যে-সমাজকে লক্ষ্য করিয়া এই ভাবটি প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহার প্রতি রবীন্দ্রনাথের যে-মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা তীব্র ব্যঙ্গাত্মক। ব্যঙ্গাত্মক রচনার মধ্যে চিত্রগত

অতিরঞ্জনের দোষ অপরিহার্য হইয়া উঠে, এই নাটকের মধ্যেও তাহাই হইয়াছে। এই ব্যঙ্গাত্মক মনোভাব সর্বত্রই নাটকের সৌন্দর্যে আঘাত করিয়াছে ; একটি উদার ভাব-স্বপ্ন একদেশদর্শিতার ত্রুটিতে কদর্য বস্তুর জঞ্জালে জড়াইয়া পড়িয়া ইহার অনাবিল মহনীয়তা বিসর্জন দিয়াছে।

রবীন্দ্র-সাধনার প্রধান সুর বন্ধন হইতে মুক্তি ; তাঁহার 'প্রভাত-সঙ্গীত'-এর যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় সমগ্র জীবন ব্যাপিয়াই তিনি এই মুক্তির জয়গান গাহিয়াছেন। সংস্কার বা আচার ইহারাও বন্ধন ; অতএব ইহাদের ভিতর হইতেও তিনি সর্বদাই মুক্তির পথ সন্ধান করিয়াছেন। 'অচলায়তনে'ও তিনি আচারের শৃঙ্খলে বন্দী জীবনের মধ্যে মুক্তির আলোকপাত করিতে চাহিয়াছেন ; কিন্তু কতকগুলি রচনাগত ত্রুটির জন্য এই ভাবটি নাটকে সুপরিস্ফুট হইতে পারে নাই।

ইহার প্রধান ত্রুটি এই যে, এই নাটকের লক্ষ্য একটি 'আইডিয়া' বা ভাব-স্বপ্ন মাত্র ; কিন্তু এই ভাবটি প্রকাশ করিতে গিয়া বস্তুগত পরিবেশের উপর এত বেশি জোর দেওয়া হইয়াছে যে, নাটকের লক্ষ্যগত ভাব বা 'আইডিয়া'র পরিবর্তে ইহার বহিরঙ্গ পরিচয়টিই প্রাধান্য লাভ করিয়া গিয়াছে। অর্থাৎ প্রত্যেকটি বৌদ্ধ-তান্ত্রিক দেবদেবীর নাম, তাহাদের সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকটি মন্ত্রোচ্চারণ, কিংবা তৎসম্পর্কিত আচারানুষ্ঠানের বিস্তৃত তালিকাগত পরিচয় ইত্যাদি এই নাটকের মূল উদ্দেশ্যকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করিয়াছে। সাঙ্কেতিক বা রূপক নাটক ভাব-প্রধান, বস্তু-প্রধান নহে ; কিন্তু এই নাটকে রচনার ত্রুটিতে ভাবের উপর বস্তু প্রাধান্য লাভ করিয়া গিয়াছে।

এই নাটকের দাদাঠাকুর চরিত্রটি রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য নাটকের দাদাঠাকুর চরিত্র হইতে স্বতন্ত্র। দাদাঠাকুর এই নাটকে সত্যের রূপক। কিন্তু তাহার পরিচয় এখানে সুপরিস্ফুট নহে। তিনি এখানে অন্ত্যজের সহচর—যাহারা সহজ স্বচ্ছন্দ জীবনের অধিকারী, তাহারা তাঁহার সঙ্গ লাভ করিতে পারে। সহজ এবং স্বচ্ছন্দ জীবন দিয়া তিনি কৃত্রিম সংস্কার-রুদ্ধ জীবন জয় করিলেন—অন্ত্যজ শোণপাংশুদিগের সহায়তায় অচলায়তনের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করিবার ইহাই তাৎপর্য। অন্ত্যজ জাতি দর্ভকদিগের পল্লীতেও তাঁহার যাতায়াত আছে, রবীন্দ্রনাথের মতে এই অন্ত্যজ জাতির পল্লীই প্রকৃত সত্যপীঠ ; সত্যাশ্রয়ী আচার্য ও পঞ্চক অচলায়তন হইতে এখানেই নির্বাসিত হইলেন, সত্যস্বরূপ দাদাঠাকুরও এখানেই নিত্য যাতায়াত করিয়া থাকেন। এই অন্ত্যজ

জাতির আঘাতেই অচলায়তনের মিথ্যার প্রাচীর ধ্বংস হইয়া গেল। অচলায়তনের নিশ্ছিদ্র সংস্কারান্ধতার বৈপরীত্য কল্পে অনাচারী অন্ত্যজ জাতির মধ্যে সত্যপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস এই নাটকে খুব সার্থকতা লাভ করিতে পারে নাই। অন্ত্যজ জাতিগুলির পরিকল্পনাও এখানে খুবই অস্পষ্ট। একজন সমালোচক ইহারা যে কিসের প্রতীক তাহাই বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। রবীন্দ্রনাথ সহজ ও স্বচ্ছন্দ জীবনের মধ্যে সত্যের সন্ধান করিতে গিয়া ইহাদিগকে সত্যের প্রতীকরূপেই পরিকল্পনা করিতে চাহিয়াছেন ; কিন্তু এই ভাবটি নাটকের মধ্যে প্রকৃতই অত্যন্ত অস্পষ্ট রহিয়া গিয়াছে।

দাদাঠাকুরকেও সত্যের প্রতীকরূপেই এই নাটকে উপস্থিত করা হইয়াছে। তাঁহার চরিত্রের মধ্যে এখানে সাঙ্কেতিকতার আভাস পড়িয়াছে, কিন্তু তাহার মধ্যে 'গীতাঞ্জলি'র ভগবানোচিত সত্যের সেই মহান্ ও উদার পরিচয় নাই। নাটকের পরিবেশের মধ্যে তাঁহার সংস্থান সর্বত্রই খাপছাড়া হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয়। এমন কি, তাঁহার নিত্য অনুচর শোণপাংশু-দিগের সঙ্গেও তাঁহার যে যোগ, তাহাও নিবিড় বলিয়া অনুভূত হয় না। যদিও এই নাটকে দাদাঠাকুরকে স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য লইয়া পরিকল্পনা করা হইয়াছে, তথাপি অন্যান্য নাটকের দাদাঠাকুরের ন্যায় তাঁহার প্রকৃতিটি এখানে অতি-ভাষণ ও আত্মসচেতনতার দোষে দূষিতই রহিয়া গিয়াছে। তাঁহার ভাষণ ও আচরণ সর্বত্রই অত্যন্ত প্রত্যক্ষ, তাহাতে 'অগ্নিগর্ভ মেঘের ন্যায় কোন গোপন মহিমার বিদ্যুৎ বিকাশ দেখা যায় না।' সেইজন্যই চরিত্রটির দ্বারা নাট্য-কারের প্রকৃত উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হইতে পারে নাই। আচার্য অদীনপুণ্যের সংশয় ও বালক সুভদ্রের কৌতূহল এই নাটকের মধ্যে উচ্চাঙ্গ কাব্যরসের আভাস-টুকু মাত্র দেয়, কিন্তু পঞ্চকের অকালপক্বতা দাদাঠাকুরের বাচালতার মতই সর্বত্র রসভঙ্গ করে। কোন সমালোচক কাব্যের দিক দিয়া বিচার না করিয়া পঞ্চকের চরিত্রকে তত্ত্বের দিক দিয়া বিচার করিয়া ইহার মধ্যে অপূর্ব সার্থকতার সন্ধান পাইয়াছেন ; ইহার সম্বন্ধে কোন আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

এই নাটকের মধ্যে হিন্দুধর্মের উপর যে আক্রমণমূলক মনোভাব রহিয়াছে, তাহার জন্য ইহার বিরুদ্ধে এদেশে একদা প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে ইহারই 'অভিনয়যোগ্য সংস্করণ' 'গুরু' প্রকাশিত হয়।

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্ত্য-ভ্রমণ হইতে যে অভিজ্ঞতা লইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন, তাঁহার পূর্ববর্তী পাশ্চাত্ত্য ভ্রমণের অভিজ্ঞতা হইতে তাহা

সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। পূর্ববর্তী ভ্রমণের অভিজ্ঞতা দ্বারা তিনি সাহিত্যিক জীবনে নূতন নূতন আদর্শের প্রেরণা লাভ করিয়াছেন এবং তাঁহার সাহিত্যের মধ্য দিয়াও তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার পূর্ববর্তী পাশ্চাত্ত্য ভ্রমণের প্রত্যক্ষ ফল যে কি ভাবে 'ফাল্গুনী' নাটক ও 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার কথা যথাস্থানে উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু এইবার পরিণত বয়সের (তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স ৬০ বৎসর) গভীরতর দৃষ্টি দ্বারা পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার যে স্বরূপ তিনি প্রত্যক্ষ করিলেন, তাহা আশা ও আশ্বাসের পরিবর্তে তাঁহার মনে গভীর নিরাশা ও আশঙ্কার সৃষ্টি করিল। তিনি এই অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়া কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট হলে 'জাতীয় শিক্ষা পরিষদ'-এর সম্বর্ধনার উত্তরে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে 'শিক্ষার মিলন' বিষয়ক এক প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং এই সম্পর্কে পাশ্চাত্ত্য জাতীয়তার স্বরূপ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে পাশ্চাত্ত্য যন্ত্রসভ্যতার প্রকৃতি উদ্‌ঘাটন করেন।

যন্ত্রের ভয়াবহ স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়া রবীন্দ্রনাথ সেই সময়েই 'মুক্তধারা' নাটকখানি রচনা করিলেন। 'মুক্তধারা' রূপক নাট্য। রোমাণ্টিক নাটক রচনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের মৌলিক প্রতিভা ইতিপূর্বেই নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছিল; 'ফাল্গুনী' (১৯১৬)-র পর তিনি আর কোন মৌলিক নাটক রচনা করেন নাই, কাব্যের ক্ষেত্রেও তখন তাহা 'বলাকা'র পরবর্তী যুগ, তাহাতেও তখন তাঁহার নূতন কোনও বিশিষ্ট দান নাই। এই যুগে তিনি পূর্ববর্তী নাটকগুলিকে নূতন আকারে প্রকাশ করিতেই যত্নবান্ ছিলেন। 'মুক্তধারা'ও তাঁহার পূর্ববর্তী একখানি নাটকের নূতন রূপ মাত্র। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে 'অচলায়তন'-এর অভিনয়যোগ্য সংস্করণ 'গুরু', ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে 'রাজা'র অভিনয়যোগ্য সংস্করণ 'অরূপরতন', ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে 'শারদোৎসবে'র অভিনয়যোগ্য সংস্করণ 'ঋণ-শোধ' ও ইহার পরবর্তী বৎসরই তাঁহার 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের নূতন রূপ 'মুক্তধারা' প্রকাশিত হয়। তিনি 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের বিষয়-বস্তু 'মুক্তধারা'য় নূতন পরিবেশের মধ্যে স্থাপন করেন এবং সদ্য পাশ্চাত্ত্য-ভ্রমণ-লব্ধ যন্ত্রের স্বরূপ সম্পর্কিত অভিজ্ঞতাকে ইহার মধ্যে আনিয়া নূতন যোগ করেন; এতদ্ব্যতীত ইহাতে মহাত্মা গান্ধীর সমসাময়িক অসহযোগ আন্দোলনের আদর্শটি স্পষ্টতর করিয়া তুলেন। ইহার কাহিনীভাগ সংক্ষেপে এই প্রকার:

উত্তরকূট পার্বত্য রাজ্য, তাহার রাজার নাম রণজিৎ; রাজ্যের একটা অংশের নাম শিবতরাই; শিবতরাইয়ে নিত্য দুর্ভিক্ষ; প্রজারা খাজনা দিতে

পারে না ; এই আক্রোশে রাজা যন্ত্ররাজ বিভূতির সহায়তায় এক বিরাট লৌহ-যন্ত্র নির্মাণ করাইয়া মুক্তধারার ঝর্ণার পথ রুদ্ধ করিয়া দিলেন, তাহাতে শিবতরাইর পানীয় জলের পথ রুদ্ধ হইল। মুক্তধারার বাঁধের নীচে একটি শিশুকে কুড়াইয়া পাইয়া রাজা তাঁহাকে পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন করিয়াছিলেন। তাঁহার দেহে রাজলক্ষণ দেখিয়া তাঁহাকেই যুবরাজরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম অভিজিৎ। রাজা অভিজিৎকে শিবতরাইয়ে পাঠাইলেন, কিন্তু অভিজিৎ দুর্ভিক্ষ-পীড়িত প্রজাদিগের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা দূরে থাকুক, বরং তাহাদের বহুদিনের এক রুদ্ধ গিরিসঙ্কট খুলিয়া দিয়া তাহাদের দেশান্তরে স্বাধীন বাণিজ্যের সুবিধা করিয়া দিলেন, ইহাতে উত্তরকূটের লোকদিগের ক্ষতি হইল ; রাজা তাঁহাকে সেখান হইতে ডাকিয়া লইয়া সেখানে রাজশ্যালককে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু শিবতরাইর প্রজাগণ ধনঞ্জয় বৈরাগীর নেতৃত্বে যুবরাজ ও অভিজিৎকে ফিরাইয়া লইবার জন্য উত্তরকূটে আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজা ধনঞ্জয় ও যুবরাজ উভয়কেই বন্দী করিলেন। কিন্তু খুড়া মহারাজ বিশ্বজিতের কৌশলে অভিজিৎ ও ধনঞ্জয় উভয়েই কারাগার হইতে মুক্ত হইল। লোকজন পুনরায় যুবরাজের সন্ধান করিতে লাগিল। এদিকে মুক্তধারার রুদ্ধ পথে জলস্রোতের কলধ্বনি শোনা যাইতে লাগিল ; সকলে গিয়া দেখিল, অভিজিৎ মুক্তধারার পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়া তাহার প্রবল স্রোতের মুখে কোথায় ভাসিয়া গিয়াছেন।

পূর্বেই বলিয়াছি, ‘প্রায়শ্চিত্ত’ নাটকের ঐতিহাসিক কাহিনীটিই এখানে আনিয়া রোমান্টিক পরিবেশের মধ্যে স্থাপন করা হইয়াছে। ‘প্রায়শ্চিত্তে’র প্রতাপাদিত্য ‘মুক্তধারা’য় রণজিৎ, উদয়াদিত্য অভিজিৎ ও বসন্তরায় বিশ্বজিতের রূপ লাভ করিয়াছে। ‘প্রায়শ্চিত্তে’র রাজকুমারী বিভা মুক্তধারায় রাজপুত্র সঞ্জয়ের প্রতিরূপ মাত্র। ‘প্রায়শ্চিত্তে’র ধনঞ্জয় বৈরাগী সম্পূর্ণ অভিন্ন পরিচয় এবং প্রায় অভিন্ন সংলাপ ও সঙ্গীতের সহযোগেই ‘মুক্তধারা’য়ও অবতীর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীতও রবীন্দ্রনাথের যন্ত্র-সম্পর্কিত সদ্য ইউরোপ-ভ্রমণের অভিজ্ঞতা ও সমসাময়িক ভারতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনের কতকগুলি বিষয় স্পষ্টতর করিয়া তুলিবার জন্য ইহার মধ্যে নূতন দুই একটি চরিত্রেরও সংযোগ করা হইয়াছে। ‘প্রায়শ্চিত্তে’র প্রতাপের চরিত্র অপেক্ষা ‘মুক্তধারা’র রণজিৎ চরিত্র অনেক উন্নত ও স্বাভাবিক হইয়াছে। প্রতাপাদিত্যের মধ্যে যে সহজ মানবিক অনুভূতির অভাব বোধ হইয়াছিল,

রণজিতের মধ্যে তাহা নাই। রণজিৎ প্রজাপীড়ক হইয়াও নিজে মানুষ। অপরের পরিত্যক্ত সন্তানকে নিজের জ্ঞানে মানুষ করিতেছেন, প্রতাপ নিজের সন্তানকেও পরিত্যাগ করিয়াছেন। উত্তরকূটের প্রজাবর্গ যখন অভিজিতের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল, তখন সর্বোপরি তাঁহার নিরাপত্তার কথাও রণজিৎ সশঙ্ক চিত্তে এমনই ভাবে চিন্তা করিয়াছেন—'শাস্তি দিতে হয়, আমি শাস্তি দেব। কিন্তু এইসব উন্মত্ত প্রজাদের হাত থেকে—আমার অভিজিৎ দেবতার প্রিয়, দেবতারা তাকে রক্ষা করুন।' প্রতাপাদিত্যের প্রধান ত্রুটিগুলি এইভাবে রণজিতের মধ্যে খণ্ডন করা হইয়াছে। 'মুক্তধারা'র নূতন চরিত্রের মধ্যে যন্ত্ররাজ বিভূতির রূপক চরিত্রটি উল্লেখযোগ্য। নির্মম যন্ত্রদানবের পূর্ণ পরিচয়টি তাহার চরিত্রের ভিতর দিয়া রূপ পাইয়াছে। প্রাণহীনতার ভিত্তিভূমির উপর তাহার স্পর্দ্ধিত শক্তির সমুচ্চ কীর্তি প্রতিষ্ঠিত, মানবিক দৃষ্টিতে সেইজন্য সে যন্ত্রের মতই অন্ধ; অতএব তাহার মুখে শুনি, 'জলের বেগে আমার বাঁধ ভাঙে না, কান্নার জোরে আমার যন্ত্র টলে না। মায়ের অভিশাপের উপর আমার যন্ত্র জয়ী হ'য়েছে।' আধুনিক সভ্যতার দান এই যন্ত্রের নির্মম প্রাণহীনতার স্বরূপটি তাহার চরিত্রে সুন্দর প্রকাশ পাইয়াছে। যুবরাজ অভিজিতের চরিত্র ইহার পরই উল্লেখযোগ্য। অভিজিতের চরিত্র রূপকমাত্র নহে, ইহার মধ্যে একটু সঙ্কেতের আভাসও আছে। ঝর্ণার চলার পথে অজ্ঞাত জননী তাঁহাকে জন্মদান করিয়াছে, পথে তাঁহার জন্ম; অতএব জন্মমুহূর্ত হইতেই তিনি গৃহছাড়া ও মুক্ত। শুধু তাহাই নহে, তাঁহার জীবন ঝরণা-ধারার অবিরাম সম্মুখগতির প্রবাহ-সূত্রে আবদ্ধ, সেইজন্য তিনি রুদ্ধ গিরিসঙ্কট উন্মুক্ত করিয়া দিলেন, মুক্তধারার বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিয়া তাহার প্রবাহের টানে নিজেও ভাসিয়া গেলেন, রাজপ্রাসাদের বন্ধন তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। রবীন্দ্রনাথ ইহাকেই ত প্রকৃত 'রাজ'-লক্ষণ বলিয়া মনে করেন—যে কোন বন্ধন স্বীকার করে না, যে বিশেষ বস্তুতে স্থির কোন রূপ গ্রহণ করে না, বিশ্বজগতের নিত্য প্রবহমাণ অখণ্ড প্রাণধারার সঙ্গে যাঁহার অবিচ্ছিন্ন সংযোগ সে-ই রবীন্দ্রনাথের 'রাজা'—যুবরাজ অভিজিৎ তাহারই প্রতীক। এই নাটকের অম্বা চরিত্রের মধ্য দিয়া যন্ত্রের হৃদয়হীনতার দিকটা স্পষ্টতর করিয়া তোলা হইয়াছে। অম্বার যুবক পুত্র মুক্তধারায় বাঁধ বাঁধিবার কাজে আসিয়া প্রাণ দিয়াছে, উন্মাদিনী জননী তাহাকে পথে পথে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে, যন্ত্রদানবের নির্দয় মুঠিতলে নিষ্পেষিত জীবনগুলি যেন তাহার মুখে ভাষা পাইয়াছে।

উত্তরকূটের গুরু মহাশয়ের চরিত্র ও কার্যাবলীর মধ্য দিয়া পরাধীন দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থায় বিজেতা রাজশক্তির প্রতি ভক্তি শিক্ষা দিবার হাস্যকর প্রচেষ্টাকে ব্যঙ্গ করা হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের ভিতর দিয়া বিজেতা জাতি-ব্যবস্থিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বর্জনের যে নীতি গ্রহণ করা হইয়াছিল, তাহার উপর লক্ষ্য করিয়া ইহা পরিকল্পিত হইয়াছে।

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে মহাত্মা গান্ধীর ভারতব্যাপী অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। তাহার পরের বৎসরই এই নাটকের রচনাকাল। প্রথম উত্তেজনার মুখে তখন সমগ্র ভারতবর্ষ এই আন্দোলনে প্রবলভাবে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। এই নাটকের মধ্যেও বিজিত জাতি শিবতরাইর অধিবাসীদিগের উপর বিজেতা উত্তরকূটের অধিবাসীদিগের আচরণের যে সকল কাহিনী বর্ণিত আছে, তাহাদের মধ্যে পরাধীন ভারতবর্ষের সর্বপ্রথম এই অভিনব অহিংস মুক্তি-আন্দোলনের কতকটা স্বরূপও প্রকাশ পাইয়াছে। দুর্বল প্রজাকে রাজশক্তির পীড়ন হইতে মুক্তি দিবার ধর্মে দীক্ষিত ধনঞ্জয় বৈরাগীর মুখে মহাত্মা গান্ধীরই অহিংসনীতির ব্যাখ্যা শুনিতে পাওয়া যায়। একমাত্র ধনঞ্জয় বৈরাগীর আত্মসচেতনতা ও অতিভাষণ জনিত ত্রুটির কথা বাদ দিলে এই নাটক ভাবে, ভাষায়, ঘটনা-বিন্যাসে ও চরিত্র-পরিকল্পনায় রবীন্দ্রনাথের রূপক নাট্যগুলির মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে।

বর্তমান পাশ্চাত্ত্য যন্ত্রসভ্যতা ও আধুনিক ধনতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদ 'মুক্তধারা'র অনতিকাল ব্যবধানে রচিত 'রক্তকরবী'র মধ্য দিয়াই অধিকতর শিল্পকৌশলের সঙ্গে ব্যক্ত হইয়াছে। ইহার মধ্যে মানব-মনের সঙ্গে প্রকৃতির যে একটি সহজ সংযোগ নির্দেশ করা হইয়াছে, তাহা কবিত্ব ও সৌন্দর্য-পরিকল্পনার দিক দিয়া ইহাকে একটি অপরূপ শিল্পগৌরব দান করিয়াছে।

'রক্তকরবী' 'মুক্তধারা' রচনার এক বৎসর পর রচিত হয়। রবীন্দ্রনাথ তখন শান্তিনিকেতনের গ্রীষ্মাবকাশ উপলক্ষে শিলং পাহাড়ে বাস করিতেছিলেন। রচনাকালে কবি ইহার নাম দিয়াছিলেন 'যক্ষপুরী'; অতঃপর সংশোধন করিয়া ইহার নূতন নামকরণ করেন 'নন্দিনী'। তারপর দেড় বৎসর পর যখন ইহা প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন ইহাকে পুনরায় সংশোধন করিয়া ইহার 'রক্তকরবী' নামকরণ করেন। তখন হইতে ইহা এই নামেই পরিচিত হইয়া আসিতেছে। 'রক্তকরবী'র কাহিনীভাগ সংক্ষেপে এই—যক্ষপুরীর রাজা পাতালে এক রহস্যাবৃত

জালের অন্তরালে বাস করেন। তাঁহার খোদাইকরেরা সেই পাতালের সুরঙ্গ হইতে সোনার তাল খুঁড়িয়া বাহির করে, বাহিরের জগতের সঙ্গে তাহাদের কোন সম্পর্ক নাই ; একদিন সেই যক্ষপুরীতে আসিয়া উপস্থিত হইল নন্দিনী, রাজাই তাহাকে সেখানে আনাইলেন। নন্দিনী পৃথিবীর উপরিতলের মুক্তজীবন ও সৌন্দর্যের বাণী লইয়া পাতালে গেল , রক্তকরবী তাহার প্রিয় অলঙ্কার। তাহাকে পাইয়া খোদাইকরদিগের একটানা জীবন-স্রোতে বাধা পড়িল। খোদাইকর কিশোর তাহার নিত্যকর্মের মধ্যেও তাহাকে ফুল আনিয়া জোগায়, যক্ষপুরীর অধ্যাপক পুঁথির গর্ত হইতে মাথা তুলিয়া তাহার সঙ্গে দুই দণ্ড সময় নষ্ট করিয়া গল্প করে। যে তাহাকে বোঝে, সে তাহার সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করে, যে বোঝে না, সে ভয়ে তাহার পথ হইতে সরিয়া দাঁড়ায় , কিন্তু যক্ষপুরীর সকলেই তাহার সম্বন্ধে ভাবে। কেবল রাজা তাহার নিজের তৈরী দুর্ভেদ্য জালের অন্তরালে নির্বিকারভাবে অবস্থান করে। নন্দিনী আসিয়া রাজার ঘরে প্রবেশ করিতে চায়, রাজা তাহাকে বাহির হইতে ফিরিয়া যাইতে বলে, নন্দিনী তাহাকে জালের অন্তবাল হইতে বাহির হইয়া আসিতে বলে। কিন্তু রাজা বাহিরে আসিতে চাহে না। পৃথিবী তাহার সহজ আনন্দের ফুলে ফলে নিত্য চারিদিক ভরিয়া দিতেছে, কিন্তু বাজা নিজের শক্তিতে পৃথিবীর বুক হইতে 'মরা ধন' দিনরাত ছিনাইয়া লইতেছে। নন্দিনী বাজার বিপুল শক্তি দেখিয়া মুগ্ধ হয়, কিন্তু সে রাজাকে ভয় করে না। রাজা তাহার বিপুল শক্তি দিয়া নন্দিনীকেও জয় করিতে চায়, কিন্তু পারে না। শক্তির নিকট নন্দিনী ধরা দেয় না, কিন্তু রঞ্জনের কাছে সে অতি সহজেই ধরা দেয় , সেইজন্য রঞ্জনের প্রতি রাজার ঈর্ষ্যা। যক্ষপুরীর নীরন্ধ্র অন্ধকারে নন্দিনী রঞ্জনের অপেক্ষায় দিন যাপন করিতে থাকে। যক্ষপুবীর খোদাইকরেরা কাজের অবসরে মদ খাইয়া বাহিরের জগৎ ভুলিয়া যায়। মন ভুলাইয়া রাখিবার জন্য মদ ছাড়াও যক্ষ-পুরীতে অন্য ব্যবস্থা আছে, তাহা ধর্ম। যাহাদের মন এক-আধটু বিচলিত হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যায়, তাহাদিগকে ধর্মোপদেশ দিয়া ভুলাইয়া রাখিবার জন্য গোঁসাইজী পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া বেড়ান। যক্ষপুরীতে কেহ মানুষ নাই, প্রত্যেকে এক একটা সংখ্যা মাত্র। সংখ্যার পরিচয়ে তাহাদের পরিচয়। তবু নন্দিনীর সাহায্যে যক্ষপুরীতে যে দুই একজন নিজেদের প্রাণের পরিচয় উদ্ধার করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে বিশু পাগ্‌লা একজন।

একদিন নন্দিনী অনুভব করিল, রঞ্জন আসিবে। কিন্তু ইতিপূর্বেই সর্দার

রঞ্জনের পরিচয় পাইয়াছে, সে আসিয়া নন্দিনীর সঙ্গে মিলিত হইলে যক্ষপুরীর আইন কানুন আর টিকিবে না, এই মনে করিয়া সর্দার রঞ্জনকে এই পথে আসিতে দিল না, বিশু পাগ্‌লাকেও ধরিয়া লইয়া গেল। নন্দিনী পথের ধারে বসিয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কিশোর তাহাকে খুঁজিতে গেল। নন্দিনী তাহার অলক হইতে রক্তকরবীর গুচ্ছ তাহার হাতে দিয়া রঞ্জনকে তাহা দিতে বলিল। কিন্তু কেহ তাহাকে খুঁজিয়া পাইল না। নন্দিনী নিজেই খুঁজিতে বাহির হইল; বিশু পাগ্‌লাকে খুঁজিল, রঞ্জনকে খুঁজিল, কাহাকেও পাইল না। যাহাকে পথে পাইল, তাহার নিকট তাহাদের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু কেহই কিছু বলিতে পারিল না। অবশেষে নন্দিনী রাজার জানালায় আসিয়া ঘা দিতে লাগিল। রাজা বিরক্ত হইল, কিন্তু নন্দিনী বিচলিত হইল না। রাজা দ্বার খুলিয়া দিল, নন্দিনী দেখিল, সেই কক্ষে রঞ্জনের মৃতদেহ মাটিতে পড়িয়া আছে, তখনও তাহার হাতে সেই রক্তকরবীর মঞ্জরী। রাজা নিজের ভুল বুঝিতে পারিল এবং 'এতদিন পরে চরম প্রাণের সন্ধান' পাইয়া বাহির হইয়া পড়িল। বিশু পাগ্‌লাকেও কারিগরেরা বন্দীশালা ভাঙ্গিয়া বাহির করিয়া আনিল। বিশু আসিয়া শুনিল, ইহার পূর্বেই নন্দিনী 'শেষ মুক্তি'তে সকলের আগে বাহির হইয়া গিয়াছে, রক্তকরবীর মঞ্জরীটি তাহার ডান হাত হইতে খসিয়া ধূলায় লুটাইতেছে, বিশু নন্দিনীর রিক্ত হস্তের শেষ দানটি কুড়াইয়া লইল।

এই কাহিনী সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, ইহা 'সত্যমূলক'। এই সত্য বলিতে অবশ্য কাব্যেরই সত্য বলিয়া মনে করা হইয়াছে, বাস্তব জগতের সত্য বলিয়া মনে করা হয় নাই। কারণ, তিনি আবার বলিয়াছেন, 'এর ঘটনাটি কোথাও ঘটেছে কি না, ঐতিহাসিকের 'পরে তার প্রমাণ সংগ্রহের ভার দিলে পাঠকদের বঞ্চিত হতে হ'বে। এইটুকু বললেই যথেষ্ট যে, কবির জ্ঞানবিশ্বাস-মতে এটি সম্পূর্ণ সত্য।' (নাট্যপরিচয়, 'রক্তকরবী')। তথাপি এই কথাটি নাট্যকারের বিশেষভাবে বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, সাধারণ কাব্যের সত্য অপেক্ষাও ইহার কতকটা বাস্তব মূল্য আছে, শুধুই কাব্যের কোন ভাবমূলক সত্যপ্রতিষ্ঠা এখানে নাট্যকারের উদ্দেশ্য নহে। ইহার মধ্যে যে সত্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার ব্যবহারিক (practical) মূল্য অবিসংবাদিত। রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য রূপক নাট্য হইতে ইহার বাস্তব মূল্য অধিকতর প্রত্যক্ষ। কারণ, রবীন্দ্রনাথ সাধারণতঃ এই শ্রেণীর নাটকের মং

দিয়া এক একটা 'আইডিয়া' বা ভাবই প্রকাশ করিয়া থাকেন, সেই সকল 'আইডিয়া' বা ভাবের সঙ্গে প্রত্যক্ষ জীবনের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ অনেক সময়ই খুব নিবিড় বলিয়া অনুভূত হয় না। 'মুক্তধারা'র কথাই ধরা যাউক, ইহার মধ্যে প্রকৃতির রাজ্যে যন্ত্রের যে অনধিকার ও অকল্যাণকর হস্তক্ষেপের কথা নির্দেশ করা হইয়াছে, তাহা একটি উত্তম ভাব-স্বপ্ন মাত্র; তাহার তুলনায় 'রক্তকরবী'র বক্তব্য বিষয় অধিকতর স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ এবং ইহার ব্যবহারিক মূল্যও অধিক। এই হিসাবেই নাট্যকার ইহাকে 'সত্যমূলক' বলিয়াছেন। যন্ত্রদানব সহজ ও স্বচ্ছন্দ জীবনের প্রাণশক্তি কি ভাবে নিঃশেষে শোষণ করিয়া লইতেছে, তাহাই এই নাটকের বক্তব্য বিষয়। যন্ত্রের বিবিধ উপকারের কথা স্বীকার করিয়া লইলেও ইহার সংস্পর্শে আসিয়া ব্যষ্টি ও সমষ্টি-জীবনের সহজ আনন্দগুলি যে বিনষ্ট হইতেছে, তাহা কিছুতেই অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই বিষয় বিচার করিলে এই রূপক-প্রধান নাটকের একটি প্রত্যক্ষ মূল্যও অনুভূত হয়।

কাহিনীর ঘটনাস্থলটির কথা ইহার পরই উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথ ইহার নাম দিয়াছেন যক্ষপুরী এবং ইহার স্থান নির্দেশ করিয়াছেন পাতাল। মানুষ এখানে তাহার প্রাণশক্তি নিঃশেষ করিয়া যে কঠিন সম্পদ আহরণ করিতেছে, তাহা কুবেরের অদৃশ্য যক্ষপুরীতে গিয়া সঞ্চয় লাভ করিতেছে ; রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র বলিয়াছেন, 'লক্ষ্মী হলেন এক, আর কুবের হোলো আর—অনেক তফাৎ। লক্ষ্মীর অন্তরের কথাটি হচ্চে কল্যাণ, সেই কল্যাণের দ্বারা ধন শ্রীলাভ করে ; কুবেরের অন্তরের কথাটি হচ্চে সংগ্রহ, সেই সংগ্রহের দ্বারা ধন বহুলত্ব লাভ করে। বহুলত্বের কোন চরম অর্থ নেই।'

এই অর্থহীন সঞ্চয়ের দ্বারা ধন যেখানে অকারণ বহুলত্ব লাভ করিয়া কল্যাণের পথ চির অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তাহাই এই যক্ষপুরী। জাগতিক জীবনের সঙ্গে ইহার কোন যোগ নাই বলিয়াই ইহার অবস্থান জাগতিক জীবন-সম্পর্ক হইতে বহুদূরবর্তী এই পাতাল-লোকে। রূপক ও সাঙ্কেতিক নাট্যের পরিবেশ হিসাবে সূর্যালোক-সম্পর্কহীন পাতালের এই যক্ষপুরীর পরিকল্পনা খুবই সার্থক বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। রবীন্দ্রনাথের একটি পূর্ববর্তী রচনা 'গল্পগুচ্ছ'-এর অন্তর্গত 'গুপ্তধন' নামক রূপক গল্পেও এই পাতালের স্বর্ণ-পুরীর এক রূপক বর্ণনা রহিয়াছে। তাহাতে স্তম্ভিত স্বর্ণস্তূপ ভেদ করিয়া মানবাত্মার যে মুক্তির ক্রন্দন ধ্বনিত হইয়াছিল, তাহা এই নাটকের যক্ষপুরীর অধিবাসীদিগের বেদনাবোধ হইতেও তীব্র। তথাপি এই যক্ষপুরীর

পরিকল্পনায় রবীন্দ্রনাথের সদ্য পাশ্চাত্ত্য-ভ্রমণের অভিজ্ঞতাই যে সর্বাপেক্ষা কার্যকরী হইয়াছিল, তাহাও স্বীকার করিতে হয়। এই সময় পাশ্চাত্ত্য-ভ্রমণ হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়াই যান্ত্রিক সভ্যতার ভয়াবহ স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়া তিনি 'শিক্ষার মিলন' নামক যে প্রবন্ধ রচনা করেন, তাহার কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। তাহাতেই এইভাবে তিনি এই নাটকের যক্ষপুরীর স্বরূপ উপলব্ধি করেন, 'পশ্চিমের যে শক্তিরূপ দেখে এলেম, তাতে কি তৃপ্তি পেয়েছি? না, পাইনি। সেখানে ভোগের চেহারা দেখেছি, আনন্দের না। অবিচ্ছিন্ন সাত মাস আমেরিকায় ঐশ্বর্যের দানব-পুরীতে ছিলেম। দানব মন্দ অর্থে বলছিনে —ইংরেজীতে বল্‌তে হোলে হয়ত বলতেম, 'titanic wealth', অর্থাৎ যে ঐশ্বর্যের শক্তি প্রবল, আয়তন বিপুল।' পাশ্চাত্ত্য যান্ত্রিক সভ্যতা সম্পর্কিত এই মনোভাবই তাঁহার অনতিকাল ব্যবধানে রচিত 'রক্তকরবী'র এই যক্ষপুরীর পরিকল্পনার মধ্য দিয়া রূপ লাভ করিয়াছে। তাঁহার অভিজ্ঞতা-লব্ধ এই দানব-পুরীই 'রক্তকরবী'র যক্ষপুরী। 'মুক্তধারা'র মধ্যে প্রকৃতির সঙ্গে যন্ত্রের বিরোধ ও 'রক্তকরবী'র মধ্যে যন্ত্রের সঙ্গে জীবনের বিরোধ নির্দেশ করা হইয়াছে। 'মুক্তধারা'র মধ্যে পাশ্চাত্ত্য যান্ত্রিক সভ্যতা সম্পর্কিত রবীন্দ্রনাথের যে বিশ্বাস অব্যক্ত রহিয়াছে, 'রক্তকরবী'র মধ্য দিয়া তাহাই ব্যক্ত করা হইয়াছে, এই দিক দিয়া 'রক্তকরবী' 'মুক্তধারা'রই পরিপূরক মাত্র।

তারপর যক্ষপুরীর রাজা। এই রাজা পাশ্চাত্ত্য যন্ত্রসভ্যতারই প্রতীক। যে যান্ত্রিকতার উপর আধুনিক পাশ্চাত্ত্য ধনতান্ত্রিকতার প্রতিষ্ঠা, যক্ষপুরীর রাজার চরিত্রের ভিতর দিয়া তাহারই পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। যন্ত্রনিয়ন্ত্রিত জীবনাদর্শের সঙ্গে ভারতীয় সহজ জীবনাদর্শের যে বিরোধ আছে, তাহাই ইহার রাজার চরিত্রের মূল বিরোধ বা দ্বন্দ্ব বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। এই রাজা প্রবল শক্তির প্রতীক; কিন্তু শক্তির মধ্যে শান্তি নাই, তাঁহার অন্তস্তলভেদী ক্ষুব্ধ অশান্তির হাহাকার মধ্যে মধ্যে বাহিরেও ভাসিয়া আসে। অপরিমিত শক্তির উদ্ধত বাহু মেলিয়া সহস্র সুন্দর জীবন সে তাহার কবলগ্রস্ত করিয়া লইতেছে; যৌবনকে সে গ্রাস করিয়াছে এবং এই শক্তি দিয়াই সে সৌন্দর্য ও আনন্দকে অধিকার করিতে চায়। কিন্তু শক্তির দ্বারা আর যে কোন জিনিস লাভ করা গেলেও, সৌন্দর্য বা আনন্দ লাভ করা যাইতে পারে না; আনন্দ অন্তর দিয়া লাভ করিতে হয়, বাহু দিয়া নয়। সেইজন্য জালের

বেড়ার জানালার ভিতর দিয়া সে যখন তাহার শুধুমাত্র হাতখানি বাহির করিয়া দেয়, তখন তাহা দেখিয়া নন্দিনী ভয় পাইয়া দূরে সরিয়া যায়। এই যান্ত্রিক সভ্যতার অন্তরের দিকটা যে একেবারেই রিক্ত এবং এই রিক্ততার বেদনাই যে সমগ্র যক্ষপুরীর ভিত্তিমূল অনবরত শিথিল করিয়া দিতেছে, তাহা রাজার মধ্য দিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। প্রকৃতির আনন্দ-আহ্বান তাহার রুদ্ধ দ্বারের প্রান্ত হইতে ফিরিয়া যাইতেছে, যক্ষপুরীর রুদ্ধ ভাণ্ডারের স্বর্ণসঞ্চয় অপেক্ষাও মূল্যবান্ সম্পদ প্রকৃতির আনন্দের দান তাহার দৃষ্টিতে উপেক্ষিত হইতেছে। যে সোনা প্রাণের বিনিময়ে সংগ্রহ করিতে হয় না, কৃপণের মত আঁকড়াইয়া ধরিয়া সঞ্চয় করিয়া রাখিবারও প্রয়োজন হয় না, প্রকৃতির সেই অযাচিত অজস্র ঐশ্বর্যের দান উপেক্ষা করিয়া সে নিজের চারিদিকে এক স্বেচ্ছা-কারাগার রচনা করিয়া তাহাতে নির্বাসিত জীবন যাপন করিতেছে; ইহার অন্তর্বেদনার পরিচয়ে রাজাব চরিত্রটি করুণ হইয়া উঠিয়াছে। তবে এই নাটকে রাজার চরিত্রের ভয়াবহ পরিচযটি অধিকতব পরিস্ফুট হওয়া প্রয়োজনীয় ছিল। তাহা হইলে ইহার বক্তব্য বিষয় অধিকতর স্পষ্ট হইত। নন্দিনীর সঙ্গে সংলাপের ভিতর দিয়া তাহার আদর্শগত দৃঢ়তার পরিচয় পাওয়া যায় না, বরং নিজের অবস্থার সঙ্গে সে যে অনবরত সংগ্রাম করিয়া চলিয়াছে, তাহাই অনুভূত হয় এবং শেষ পর্যন্ত দেখিতেও পাওয়া যায় যে, এই সংগ্রামই তাহাকে মুক্তির পথে টানিয়া আনিয়াছে। তবে রবীন্দ্রনাথ এই সম্পর্কে নিজে বলিয়াছেন যে, 'আমার স্বল্পায়তন নাটকে রাবণের বর্তমান প্রতিনিধিটি এক দেহেই রাবণ ও বিভীষণ; সে আপনাকেই আপনি পরাস্ত করে।'

যক্ষপুরীর রাজা এক দুর্ভেদ্য জালের অন্তরালে বাস করেন। ইহার তাৎপর্যও অতি সহজ। যে জগতের উপর দিয়া স্বচ্ছন্দ জীবনস্রোত নিত্য প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে, তাহার সঙ্গে যান্ত্রিকতার যোগ যে সকল দিক হইতেই বিচ্ছিন্ন, তাহাই এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। প্রাণপূর্ণ আনন্দময় জগতের মধ্যে বাস করিয়াও কৃত্রিমতা দ্বারা এই ধনস্ফীত যান্ত্রিক সভ্যতা নিজের চারিদিকে এক দুর্ভেদ্য রহস্যজাল রচনা করিয়া তাহার মধ্যে প্রাণহীন নিরানন্দ জীবন যাপন করিতেছে; জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণধারার সঙ্গে কোনমতেই ইহার যোগ স্থাপিত হইতে পারিতেছে না; অথচ জালের রন্ধ্রপথ দিয়া বিশ্বব্যাপী জীবনলীলার আনন্দ কলধ্বনি ইহার কানে আসিয়া পৌছিতেছে। মানুষ এই সভ্যতা নিজেই গড়িয়াছে, কিন্তু ইহা আনন্দের পরিবর্তে শক্তি দিয়া

গড়িয়াছে বলিয়া অন্তরের দিক দিয়া ইহার সঙ্গে তাহার ব্যবধান রচিত হইয়াছে, এই অন্তরের ব্যবধানই জালের ব্যবধান।

ইহার পরই নন্দিনীর চরিত্র উল্লেখযোগ্য। নন্দিনী সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "রক্তকরবীর সমস্ত পালাটি 'নন্দিনী' ব'লে একটি মানবীর ছবি। চারিদিকে পীড়নের ভিতর দিয়ে তার আত্মপ্রকাশ। ফোয়ারা যেমন সঙ্কীর্ণতার পীডনে হাসিতে অশ্রুতে কলধ্বনিতে উর্ধ্বে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে তেমনি। মাটি খুঁড়ে যে পাতালে খনিজ ধন খোঁজা হয় নন্দিনী সেখানকার নয়,—মাটির উপরিতলে যেখানে প্রাণের যেখানে রূপের নৃত্য, যেখানে প্রেমের লীলা, নন্দিনী সেই সহজ সুখের, সেই সহজ সৌন্দর্যের।" নন্দিনীকে মানবী অর্থাৎ রক্তমাংসের দেহাশ্রিতা নারীরূপে প্রতিষ্ঠিত করাই রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য থাকিলেও এই নাটকে তাহাও সম্ভব হইয়া উঠে নাই। এমন কি, একজন সমালোচক ইহার সম্পর্কে এমনও অনুভব করিয়াছেন যে, 'সে তো মানবী নয়—রক্তমাংসের নারী নয়; তাহাকে নারীপ্রকৃতির একটি ধ্যান-কল্পিত ভাব-মূর্তি বলা যায়।' এই নাটকের অন্যতম চরিত্র অধ্যাপকও নন্দিনী সম্পর্কে অনুভব করিয়াছে, 'সুন্দরী, তুমি যে সোনা সে তো ধুলোর নয়, সে যে আলোর।' সুতরাং নন্দিনীকে রবীন্দ্রনাথ মানবী বলিয়া যে দাবী করিয়াছেন, তাহা সমর্থন করা যায় না। তবে একথা সত্য, এই নাটকে কোন কোন স্থানে তাহার মানবী-সত্তারও বিকাশ হইয়াছে। সেইজন্যই তাহার সম্পর্কে এই কথাই বলা যায় যে, সে 'কখনো বা ভাবময় কখনো মূরতি।' নারী সম্পর্কিত রবীন্দ্রনাথের ধারণার একটি পরিণত পরিচয় তাহার মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। সৌন্দয ও কল্যাণ নারীর দুইটি গুণ—নন্দিনীর মধ্যে সৌন্দর্যের গুণই অধিকতর প্রকাশ পাইয়াছে। সৌন্দর্যের মধ্যেই আনন্দ, সেইজন্যই নন্দিনী আনন্দের প্রতীক। এই আনন্দ জীবনের দ্বারে আশ্রয় মাগিয়া বেড়ায়, সৌন্দযের মধ্য দিয়া এই আনন্দেরই অভিব্যক্তি হইয়া থাকে; পীড়নের ভিতর দিয়া নন্দিনীর পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া রক্তকরবী তাহার অলঙ্কার; আনন্দ অন্তরের পরিচয়, সৌন্দর্য তাহার বাহিরের পরিচয়; নন্দিনীর মধ্যেও এই দুইটি পরিচয়ই নির্দেশ করা হইয়াছে, তাহারও একটি নিজস্ব অন্তরের পরিচয় ও স্বতন্ত্র বাহিরের পরিচয় আছে। অতীন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভাবানুভূতি মাত্রের উপর ভিত্তি করিয়া এই চরিত্রটির পরিকল্পনা করা হইয়াছে বলিয়া ইহা সাঙ্কেতিক চরিত্রের লক্ষণাক্রান্ত।

এই নাটকের অন্যতম সাঙ্কেতিক চরিত্র রঞ্জন। রঞ্জন নিখিল-যৌবনের

প্রতীক, যৌবন জীবনেরই এক রূপ—জীবনের সর্বাঙ্গীণ শ্রেষ্ঠ পরিচয়। অতএব রঞ্জন জীবনের সৌন্দর্যের অভিব্যক্তি মাত্র। যক্ষপুরীর রাজা এই যৌবনের শত্রু, যৌবনের শক্তি নিঃশেষে শোষণ করিয়া লইয়া যক্ষপুরীর রাজা নিজে শক্তিমান্ হইয়া উঠিতেছে, সেইজন্য যক্ষপুরীতে যৌবনের প্রবেশ নিষিদ্ধ। রঞ্জনও সেইজন্য সর্বত্রই নাট্য-দৃশ্যের বাহিরে রহিয়াছে, কখনও ভিতরে আসিতে পারে নাই। আনন্দ ও সৌন্দর্য যৌবনেরই নিত্যসঙ্গী, সেইজন্য নন্দিনী রঞ্জনের জন্য সর্বদা প্রতীক্ষমাণা। কিন্তু যক্ষপুরীর পরিবেশের মধ্যে তাহাদের মিলনের উপায় ছিল না। কারণ, এখানে আনন্দময় যৌবনের বিকাশ অসম্ভব। রাজার কক্ষ উন্মুক্ত হইলে নন্দিনী তাহার মধ্যে রঞ্জনের মৃতদেহ দেখিতে পাইল। যক্ষপুরীর রাজা তাহার প্রবল শক্তির দুর্নিবার আকর্ষণে যৌবনকে নিজের কবলগ্রস্ত করিয়া তাহার প্রাণশক্তি ধীরে ধীরে নিঃশেষে শুষিয়া লইয়াছে। মনে হয়, রঞ্জনের আখ্যানের ভিতর দিয়া নাট্যকারের ইহাই বক্তব্য বিষয়, ইহার মধ্যে কোন অস্পষ্টতা আছে বলিয়া মনে হয় না। তবে ইন্দ্রিয়স্পর্শাতীত এই সাঙ্কেতিক চরিত্রটির মৃতদেহের পরিকল্পনা একটু বিসদৃশ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। তবে আবার ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, যৌবনের প্রত্যক্ষ মৃত্যুর নির্মমতা অলোক-পথে নির্দেশ না করিয়া এই ভাবে নির্দেশ করায় নাটকের দিক দিয়া ইহা অধিকতর কার্যকরী (effective) হইয়াছে। তবে এখানে এই প্রশ্নও হইতে পারে, যে রঞ্জন নিখিল-যৌবনের প্রতীক, তাহার কি মৃত্যু আছে? যৌবনাশ্রিত দেহের ধ্বংস হইতে পারে, কিন্তু শাশ্বত যৌবনের মৃত্যু নাই ; যাহার দেহ নাই, তাহার মৃত্যুও নাই। রঞ্জন এই নাটকের সর্বত্রই বিদেহী-ভাব-স্বপ্ন মাত্র, সুতরাং তাহার কিরূপে মৃত্যু হইবে? সাঙ্কেতিক চরিত্রের মৃত্যু নাই, সুতরাং যাহার মৃত্যু হইয়াছে, সে রঞ্জন নহে, তাহার দেহ মাত্র, তাহার ভাব-মূর্তি অমর।

কৈশোর যৌবনের অগ্রগামিনী পদধ্বনি ; এই নাটকের কিশোর চরিত্রটিও এই হিসাবে রঞ্জনের পূর্বগামিনী ছায়া; সেইজন্যই নন্দিনীর প্রভাব তাহার জীবনকে স্পর্শ করিয়াছে, কিন্তু যে দুর্বার শক্তির চক্রতলে রঞ্জন নিষ্পেষিত হইয়া গেল, তাহা হইতে তাহারও পরিত্রাণের কোন উপায় রহিল না। এই নাটকের নেপথ্যচারী চরিত্র রঞ্জনের অভাব কিশোরের দ্বারাই অনেকটা পূর্ণ হইয়াছে; কিন্তু একথাও সত্য, কিশোর এখানে তাহার বাস্তব পরিচয় রক্ষা করিতে পারে নাই, মেরুদণ্ডহীন ভাব-পুত্তলি মাত্র হইয়া রহিয়াছে। তাহার আচরণ স্বভাব

সরল বিমুগ্ধ কিশোরের আচরণ নহে, পরিণত যৌবনের আচরণ। এই নাটকের অন্যতম উল্লেখযোগ্য চরিত্র বিশু পাগ্‌লা। সে অন্য দশজন হিসাবী লোকের মত বাঁধা চালে চলে না, সেইজন্য সে খাপছাড়া বা পাগল। নন্দিনীর প্রভাব তাহার মধ্যেও প্রবেশ করিয়াছে সত্য, কিন্তু বাজপক্ষী যেমন অজগরের নিশ্বাসের আকর্ষণে কেবল তাহাকে ঘুরিয়া ঘুরিয়াই উড়িতে উড়িতে পরিণামে তাহার মুখগহ্বরে প্রবেশ করে, সেও তেমনই যন্ত্রদানবের দুর্নিবার আকর্ষণে কেবলই তাহার চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে ; ইহার সংস্পর্শে যে একবার আসিয়াছে, সে যে কোন ভাবেই নিষ্কৃতি পাইতে পারে না, তাহার চরিত্রের মধ্য দিয়া তাহাই দেখান হইয়াছে। এই নাটকের অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে মোড়ল চরিত্রটি একটু জটিল প্রকৃতির। নন্দিনীর প্রভাব তাহার মধ্যেও প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু বাহিরে তাহা সে কোন ভাবেই স্বীকার করিতে চাহে না। নন্দিনীর সঙ্গে বিরোধিতা দ্বারাই সে তাহার অন্তরের সেই প্রভাবের ফল প্রকাশ করিয়া থাকে। এই ভাবে অন্যান্য বিভিন্ন চরিত্রের উপর একদিক দিয়া যান্ত্রিকতার প্রভাব ও অপর দিকে নন্দিনীর প্রভাব যে কি ভাবে বিস্তৃত হইয়াছে, নাট্যকার তাহা অতি কৌশলের সঙ্গে নির্দেশ করিয়াছেন। মোড়ল ও সর্দারের চরিত্রের মধ্যে তাহাদের বিষয়-বুদ্ধির যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা রবীন্দ্রনাথের লোক-চরিত্রে গভীর জ্ঞানেরই পরিচায়ক।

'রক্তকরবী'র মধ্যে একটি অধ্যাপকের চরিত্র আছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে, এই নাটকে যক্ষপুরীর যে পরিচয় আছে, তাহার মধ্যে জ্ঞান-তপস্বী অধ্যাপকের স্থান কোথায়? অধ্যাপককে রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্ত্যশিক্ষিত বিদ্বান্ সমাজের প্রতিনিধি বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা 'শুষ্ক বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলনে আপনাকে দুর্ধর্ষ করিতে চায়।' ইহারা প্রত্যক্ষ জীবন হইতে জ্ঞানের বিষয় আহরণ করিয়া তাহা জীবনে আচরণ করিবার পরিবর্তে পুঁথির মধ্য হইতে জ্ঞান আহরণ করিয়া মগজের কোটরে তাহা সঞ্চয় করিয়া রাখে। এই শ্রেণীর মেরুদণ্ডহীন বিদ্বান সমাজের প্রতি রবীন্দ্রনাথের ঘৃণা এই চরিত্রটির মধ্য দিয়া দুর্জয় হইয়া দেখা দিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের পূর্ববর্তী সাঙ্কেতিক নাটক 'ডাকঘরে'র অমল বলিয়াছে, 'আমি দেখ্‌ব আর শিখ্‌ব, পুঁথি প'ড়ে পণ্ডিত হব না।' রবীন্দ্রনাথের মতে দেখা ও শেখাই হইল প্রকৃত শিক্ষা। 'দিনরাত্ত পুঁথির মধ্যে গর্ত খুঁড়ে' প্রকৃত শিক্ষা হয় না। রবীন্দ্রনাথ অধ্যাপকের মধ্য দিয়া পাশ্চাত্ত্য-শিক্ষার এই ত্রুটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। এখন

অধ্যাপক চরিত্র কোন সূত্রে এই নাটকে আসিল, তাহা বিচার করিলে দেখা যায় পাশ্চাত্ত্য ধনতন্ত্র বা যন্ত্রবাদ যে 'অবিদ্যা' দ্বারা পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যক্ষপুরীর সেই তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিবার জন্যই এই নাটকে অধ্যাপক-চরিত্রের আবির্ভাব হইয়াছে। কিন্তু এই অধ্যাপক নিজের আদর্শে অচল নিষ্ঠাবান্ নহে, জীবনে নন্দিনীর প্রভাব অনুভব করে ; তাহার নিভৃত মানস-আলাপনের ভিতর দিয়া তাহার পরিচয় বাহিরে প্রকাশ পায়।

এই নাটকের গোঁসাইজীর চরিত্রের মধ্য দিয়া আচার-ধর্ম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের পরিণত বয়সের অভিমত ব্যক্ত হইয়াছে। ইহার মধ্যে কেহ কেহ মার্ক্সবাদের প্রভাব অনুভব করিয়াছেন। কিন্তু ইহা কতদূর সত্য, তাহা বিচার করিয়া দেখা প্রয়োজন। আচার-ধর্ম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ সর্বত্র যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাতে তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম দেখা যায় না। আত্মসচেতনতার অনুভূতিই জীবনে আনন্দের মূল, শ্রেণীর মধ্যে ব্যক্তিকে বিসর্জন দেওয়ার তিনি বিরোধী। এই নাটকে সেই কথাই আছে। ইহা উপরোক্ত মতবাদের বিরোধী।

'রক্তকরবী'র ভাষা সহজ গদ্য, তাঁহার অন্যান্য এই শ্রেণীর নাটকের মত গীতিধর্মী নহে। সঙ্গীতের অংশও ইহাতে অল্প, সেইজন্যই ভাষার দিক দিয়া ইহার নাট্যিক ধর্ম অনেকটা রক্ষা পাইয়াছে। 'রক্তকরবী' রচনার সঙ্গে সঙ্গেই প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের রূপক ও সাঙ্কেতিক নাটক রচনার যুগের অবসান হয়। যদিও তিনি ইহার পরও আরও দুই একখানি এই শ্রেণীর নাটক রচনা করেন, তথাপি তাহাদের মধ্যে পূর্ববর্তী ভাবধারারই অনুবর্তন করিয়াছেন, নূতন মৌলিক কোন ভাব অবলম্বন করিয়া আর কোন রূপক নাট্যরচনায় হস্তক্ষেপ করেন নাই।

রূপক নাট্যরচনার যুগ অতিক্রম করিয়াও রবীন্দ্রনাথ আরও যে দুই একখানি এই শ্রেণীর নাটক রচনা করেন, তাহাদের মধ্যে 'তাসের দেশ'ই কতকটা তাঁহার পূর্ববর্তী রূপক নাট্যগুলির সমধর্মী বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। পূর্বেই বলিয়াছি, রূপক নাট্যরচনার মৌলিক প্রেরণা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ইতিপূর্বেই নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল। সেইজন্য এই যুগে পুরাতন ভাব-বস্তুকেই নবকলেবরে প্রকাশ করা ব্যতীত তিনি ইহাতেও আর কোন মৌলিক কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। ইহা প্রধানতঃ তাঁহার নৃত্যনাট্যগুলি রচিত হইবার যুগেই রচিত হইয়াছিল বলিয়া ইহার বহিরঙ্গগত পরিচয়ে তাঁহার নৃত্য-

নাট্যের লক্ষণই সমধিক প্রকাশ পাইয়াছে। 'তাসের দেশ' ১৩৪০ সালে প্রকাশিত হয়। কিন্তু ইহার কাহিনী-পরিকল্পনা ইহার বহুপূর্ববর্তী। রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগে রচিত ছোটগল্পগুলির মধ্যে একটি গল্প আছে, তাহার নাম 'একটা আষাঢ়ে গল্প'। তিনি ইহারই কাহিনীটি অবলম্বন করিয়া তাঁহার নৃত্যনাট্যরচনার যুগে ইহাকে একটি নৃত্যনাট্যরূপ দান করেন। অতএব রূপক নাট্যরচনার যুগ অতিক্রান্ত হইয়া ইহা নাট্যরূপ লাভ করিলেও, প্রকৃতপক্ষে ইহার ভাবগত প্রেরণা তাঁহার রূপকনাট্য রচনার যুগ-সূচনারও বহু পূর্ববর্তী। এইজন্যই ইহা তাঁহার রূপক নাট্যরচনার যুগের শেষ প্রান্তে রচিত হইলেও ইহার মধ্যে পূর্ববর্তী নাটকগুলির ভাবগত লক্ষণ কতকটা প্রকাশ পাইয়াছে। ইহার কাহিনীটি সংক্ষেপে এইরূপ—এক রাজপুত্র ও এক সদাগর পুত্র 'নবীনা'র সন্ধানে সমুদ্রপথে নিরুদ্দেশ যাত্রা করিয়াছে। সমুদ্রে ঝড় উঠিল, ঝড়ে জাহাজ ডুবিল; রাজপুত্র ও সদাগরপুত্র এক অপরিচিত দ্বীপে আসিয়া কূল পাইল। তাহা তাসের দেশ। সেখানকার লোকেরা নিয়মানুবর্তিতার দাস; সকলেই বাঁধা চালে চলে—সমাজে প্রত্যেকের স্থান নির্দিষ্ট এবং যথানির্দিষ্ট স্থানে প্রাত্যহিক আচার পালনের মধ্য দিয়াই তাহাদের নিষ্ক্রিয় জীবন নিরুপদ্রবভাবে অতিবাহিত হইয়া যাইতেছে। রাজপুত্র ও সদাগরপুত্র আসিয়া তাহাদের মধ্যে উপস্থিত হইল। তাহারা নিরুদ্দেশের যাত্রী; নিয়মানুবর্তিতার বিরুদ্ধেই তাহাদের বিদ্রোহ। তাহাদের সংস্পর্শে আসার ফলে তাসের দেশের তামসিক জীবনের মধ্যেও চাঞ্চল্য দেখা দিল। তাসের দেশ আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়িল, বুঝি বা এই অচল নিগড় ভাঙ্গিয়া পড়ে, রাজার বাধ্যতামূলক আইন অবমানিত হয়। কিন্তু তাহাকে আর রক্ষা করা গেল না; 'নবীনা'র স্পর্শ ও নিরুদ্দেশের ডাক তাহাদিগকে 'অলসের বেড়া' ও 'নির্জীবের গণ্ডী' হইতে পরিত্রাণ করিয়া বাহিরে লইয়া গেল, তামসিক জড়তার জাল ছিন্ন করিয়া তাসের দেশের উপর দিয়া জীবনের বন্যা বহিয়া গেল।

এই কাহিনীর রূপক আবরণ অত্যন্ত ক্ষীণ। ইহার বক্তব্য বিষয় সর্বত্র এতই স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে যে, ইহা প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের পূর্ববর্তী রূপক নাট্যগুলির সমপর্যায়ভুক্ত বলিয়া বিবেচনা করা সঙ্গত হয় না। রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কবিমনোভাবেরই পরিচয় ইহার মধ্যে অধিকতর ব্যক্ত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ তখন মূলতঃ প্রত্যক্ষবাদী, রূপকোক্তির অপ্রত্যক্ষ পথ তিনি ইতিপূর্বেই পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন; তবে পূর্বরচিত একটি

কাহিনীর উপর ভিত্তি করিয়া ইহা সেই সময়ে রচিত হইয়াছিল বলিয়া ইহার এই রূপকাংশ একেবারে পরিত্যক্ত হইতে পারে নাই। এই রূপকাভাসটুকু ইহার মধ্যে না থাকিলে ইহাকে স্বচ্ছন্দে রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক অন্যান্য নাটকের সমপর্যায়ভুক্ত করা যাইত। রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক গদ্য রচনার আদর্শে ইহার নাট্যভাষা বা সংলাপ গঠিত হইয়াছে। পূর্ববর্তী রূপক নাটকগুলির ন্যায় ইঙ্গিত ও অর্থপূর্ণ সংক্ষিপ্ত পরোক্ষভাষণ ইহার মধ্যেও লক্ষ্য করিবার বিষয়।

আমাদের তামসিক জড়তাগ্রস্ত দেশকেই তিনি এখানে তাসের দেশ বলিয়াছেন। তাসের দেশ, নিয়মের দেশ। 'তাসের দেশ' ও 'অচলায়তনে'র মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই। 'দিগ্‌বিজয় করিয়া বেড়ানো' যে রাজপুত্রের ধর্ম ও বাণিজ্যের জন্য নিত্য অপরিচিত দেশের দিকে নিরুদ্দেশ যাত্রা যে সদাগরপুত্রের বৃত্তি তাহারাই এই জড়ত্বের দেশে 'নবীনা'র বাণী বহন করিয়া আনিল। রবীন্দ্রনাথের ঠাকুরদাদা, দাদা, ধনঞ্জয় বৈরাগী, কবি—ইহারাই এখানে রাজপুত্র ও সদাগরপুত্রের রূপ লাভ করিয়াছে। নীরন্ধ্র 'অচলায়তনে'র মধ্যে একদিন বাহিরের আলো প্রবেশ করিয়া যেমন ইহার সমগ্র ভিত্তিমূল শিথিল করিয়া দিয়াছিল, তেমনই বৃহত্তর জাগতিক জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন এই তাসের দেশও বৃহত্তর জীবনের দূত রাজপুত্র এবং সদাগরপুত্রের আবির্ভাবে সমস্ত কৃত্রিম নিয়মের বেড়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া বিশ্বের অখণ্ড জীবনধারার সঙ্গে যোগস্থাপন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িল। এই নিয়ম বাহিরের অভ্যাস দ্বারা আয়ত্ত বলিয়াই সত্যের আহ্বানে ইহা সহজেই পরিত্যক্ত হইল।

এই নাটিকায় রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য-বিষয়ে কোনও বৈচিত্র্য নাই, নিতান্ত পরিমিত রচনা-ক্ষেত্রে ইহার ভাবটি প্রকাশ করিতে হইয়াছে বলিয়া ইহার রচনায়ও কোন উচ্চ শিল্পগুণ প্রকাশ পায় নাই। ইহার অনেকগুলি গানই তাঁহার অন্য রচনা হইতে সংগৃহীত; যেগুলি নূতন করিয়া ইহার জন্য রচিত, তাহাও রচনার দিক দিয়া উল্লেখযোগ্য নহে; নৃত্যনাট্যরচনার বাহিরের তাগিদ হইতেই এই নাটকখানি রচিত হইয়াছিল, সেইজন্য ইহার মধ্যে রবীন্দ্র-প্রতিভার নূতনতর কোন বিস্ময়কর দিকের সঙ্গে পরিচয় লাভ করা যায় না। রূপক নাট্যরচনার মৌলিক প্রেরণা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বহুদিন পূর্বেই নিঃশেষিত হইয়া গেলেও এবং এই রূপকনাট্য বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের নূতন কোন বক্তব্যের সন্ধান ইহাতে পাওয়া না গেলেও, রচনার দিক দিয়া 'তাসের দেশ'ই

রবীন্দ্রনাথের সর্বশেষ রূপক নাট্যরচনা। ইহা রবীন্দ্রনাথের রূপক নাট্য-রচনার যুগ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়া কতকটা জনসাধারণের দৃষ্টির অন্তরালে পড়িয়া গিয়াছে।

১৩৩০ সালে 'রথযাত্রা' নামে রবীন্দ্রনাথের একখানি ক্ষুদ্র নাটিকা 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। মূলতঃ ইহারই বিষয়বস্তু ভিত্তি করিয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'কালের যাত্রা' বা 'রথের রশি' নামক নাটিকা রচনা করেন। ইহার আদ্যোপান্ত নূতন করিয়া লিখিত মাত্র—বিষয়-বস্তুর দিক হইতে কোন পার্থক্য নাই। 'কালের যাত্রা' ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ৫৭ বৎসর বয়সের জন্মোৎসব উপলক্ষে 'কবির সস্নেহ উপহার' রূপে অর্পিত হয়। এই প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের নিকট লিখিত এক পত্রে রবীন্দ্রনাথ নাটিকাটির বিষয় ও তাহার তাৎপর্য সম্বন্ধে এই প্রকার উল্লেখ করিয়াছেন,—'রথযাত্রার উৎসবে নরনারী সবাই হঠাৎ দেখ্‌তে পেলে, মহাকালের রথ অচল। মানব সমাজের সকলের চেয়ে বড়ো দুর্গতি, কালের এই গতিহীনতা। মানুষে মানুষে যে সম্বন্ধ-বন্ধন দেশে দেশে যুগে যুগে প্রসারিত, সেই বন্ধনই এই রথ টানবার রশি। সেই বন্ধনে অনেক গ্রন্থি পড়ে গিয়ে মানব-সম্বন্ধ অসত্য ও অসমান হয়ে গেছে, তাই চল্‌ছে না রথ। এই সম্বন্ধের অসত্য এতকাল যাদের বিশেষভাবে পীড়িত করেছে, অবমানিত করেছে, মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে, আজ মহাকাল তাদেরই আহ্বান করেছেন তাঁর রথের বাহনরূপে; তাদের অসম্মান ঘুচ্‌লে তবে সম্বন্ধের অসাম্য দূর হয়ে রথ সম্মুখের দিকে চল্‌বে' (বিচিত্রা, ১৩৩৯, কার্তিক, পৃঃ ৪৯২)। অতএব দেখা যাইতেছে, নাটকটি তত্ত্বমূলক, রসমূলক নহে। ইহার তত্ত্বকথাটি আরও সহজ ভাষায় 'রথযাত্রা' নামক নাটিকায় রাজমন্ত্রীর ভাষায় এই ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল,—'রথযাত্রাটা আমাদের একটা পরীক্ষা। কাদের শক্তিতে সংসারটা সত্যিই চল্‌ছে, রথচক্র ঘোরার দ্বারা সেইটেই প্রমাণ হয়ে যাবে।' একদিন পুরোহিতের শক্তিতে সংসার চলিত, সেইজন্য পুরোহিতের স্পর্শমাত্র সে দিন রথ আপনা হইতে চলিয়াছিল। এখন দেখা যাইতেছে, শূদ্রের শক্তিতে সংসার চলে, সেইজন্য শূদ্রের স্পর্শ না পাওয়া পর্যন্ত রথ অচল হইয়া রহিল; রাজশক্তি কিংবা বণিক-শক্তি তাঁহাকে নড়াইতে পারিল না। এই কথাটি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার আরও কয়েকখানি রূপক ও সাঙ্কেতিক নাটকের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন।

'রক্তকরবী' রচনার সঙ্গে সঙ্গেই প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের রূপক-নাট্য রচনার যুগ শেষ হয়। তারপর কয়েক বৎসর তিনি তাঁহার পূর্বরচিত কয়েক-খানি নাটকের ত্রুটি সংশোধন করিয়া তাহাদিগকে নূতন নামে প্রকাশ করিতে থাকেন। ইহা হইতে স্বভাবতঃই অনুমিত হইয়াছিল যে, রবীন্দ্রনাথের মৌলিক নাট্যপ্রতিভা নিঃশেষিত হইয়াছে। কিন্তু সত্তর বৎসর অতিক্রম করিয়া 'বাঁশরী' নাটক রচনার ভিতর দিয়া কবি তাঁহার অন্তর্নিহিত যে সংহত সৃষ্টি-শক্তির পরিচয় প্রদান করিলেন, তাহা রবীন্দ্র-প্রতিভার অন্যতম বিস্ময়।

সামাজিক নাট্য

'বাঁশরী' একখানি সামাজিক নাটক। কিন্তু যে সমাজ হইতে নাট্যকার তাঁহার নাট্যিক উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা সাধারণের সমাজ নহে। এ'দেশের অতি-উচ্চশিক্ষিত ও অভিজাত সমাজের একটি প্রণয়-কাহিনীই এই নাটকের উপজীব্য। 'বাঁশরী' রচনার চারি বৎসর পুর্বে রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'শেষের কবিতা' রচিত হয়। আদর্শের দিক দিয়া স্বতন্ত্র হইলেও ব্যবহৃত উপকরণের দিক দিয়া এই দুইখানি রচনায় যথেষ্ট ঐক্য আছে —'শেষের কবিতা' যে-শ্রেণীর সামাজিক উপন্যাস, 'বাঁশরী'ও সেই শ্রেণীরই সামাজিক নাটক। 'শেষের কবিতা'য় রবীন্দ্রনাথ রক্ষণশীল ও প্রগতিশীল সমাজের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু 'বাঁশরী'তে তিনি একমাত্র প্রগতিশীল সমাজের পথেই অগ্রসর হইয়াছেন। আদর্শগত এই সামান্য পার্থক্য ছাড়া উভয়ের মধ্যে আব বিশেষ কোন পার্থক্য নাই; অতএব 'শেষের কবিতা'র প্রভাবিত যুগেই 'বাঁশরী' রচিত হয় বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। এইজন্যই ইহাদের চরিত্রে ও চিত্রে প্রায় সর্বত্রই ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়।

এই নাটকের নায়িকা বাঁশরী 'বিলিতি য়ুনিভার্সিটিতে পাশ করা মেয়ে। তার প্রকৃতিটা বৈদ্যুত-শক্তিতে সমুজ্জ্বল, তার আকৃতিটাতে শান্‌-দেওয়া ইস্পাতের চাক্‌চিক্য।' সুষমা সেন বাঁশরীর একজন বান্ধবী। 'সুষমাকে দেখ্‌বা মাত্র বিস্ময় লাগে। চেহারা সতেজ সবল সমুন্নত। রং যাকে বলে কনক-গৌর, ফিকে চাঁপার মতো, কপাল নাক চিবুক যেন কুঁদে তোলা। এই সুষমার সঙ্গে শম্ভুগড়ের রাজাবাহাদুর সোমশঙ্করের বিবাহ স্থির হইয়াছে। তাহারই এন্‌গেজ্‌মেণ্ট্‌ উপলক্ষে সুষমাদের বাগানে পার্টি জমিয়াছে। তাহাতে বাঁশরী তাহার একজন অতি-আধুনিক সাহিত্যিক বন্ধু ক্ষিতীশ ভৌমিককে লইয়া উপস্থিত হইয়াছে। ক্ষিতীশ বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্যিক; সে তাহার লেখায় আধুনিক শিক্ষিত সমাজকে ব্যঙ্গ করে; অথচ তাহার সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ ভাবে কিছুই জানে না। এই সমাজের সঙ্গে মুখোমুখী পরিচয়

করাইবার জন্যই বাঁশরী তাহাকে এখানে লইয়া আসিয়াছে। সোমশঙ্করের সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয় বাঁশরীরই। বাঁশরীর সংস্পর্শে আসিয়াই তাহার রূপ ও রুচি আধুনিকতায় মার্জিত হয়। তাহাদের ঘনিষ্ঠতা দেখিয়া সকলেই একদিন মনে করিয়াছিল, অচিরেই ইহারা বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হইবে। কিন্তু এমন সময় সোমশঙ্করের পিতা পুত্রের মতিগতির পরিবর্তন দেখিয়া তাহাকে নিজের কাছে লইয়া গেলেন। বাঁশরী ও সোমশঙ্করের মধ্যে বিচ্ছেদ পড়িয়া গেল। সুষমা পুরন্দর নামক একজন সন্ন্যাসীর ছাত্রী। পুরন্দরের চরিত্র ছিল অদ্ভুত। 'কেউ দেখেছে তা'কে কুম্ভমেলায়, কেউ দেখেছে গারো পাহাড়ে ভালুক শিকারে। কেউ বলে ও য়ুরোপে অনেক কাল ছিল। সুষমাকে কলেজের পড়া পড়িয়েছে আপন ইচ্ছায়।' তারপর রাজা সোমশঙ্করকে বশ করিয়া তাহার সঙ্গে সুষমার বিবাহের সম্বন্ধ সেই স্থির করিয়াছে। পুরন্দরের মধ্যে এক অপূর্ব আকর্ষণী শক্তি ছিল; তাহারই বলে সে পুরুষ ও নারীকে সহজেই নিজের বশে আনিতে পারিত। সুষমা পুরন্দরকে ভালবাসিত। কিন্তু তাহাকে পাইবার উপায় ছিল না, সেইজন্য তাহারই নির্দেশ পালন করিয়া সে সোমশঙ্করকে বিবাহ করিতে সম্মত হইল। বাঁশরী সোমশঙ্করকে ভালবাসিত। কিন্তু তাহাদের মিলনের পথে দাঁড়াইল পুরন্দর। তাহার বিশ্বাস ছিল, ভালবাসা স্বার্থপরতায় অন্ধ। 'তা'তে একজন মানুষকেই আসক্তির দ্বারা ঘিরে নিবিড় স্বাতন্ত্র্যে অতিবৃত করা হয়।' কিন্তু প্রেমে মানুষের মুক্তি সর্বত্র। 'নির্বিশেষ প্রেম, নির্বিকার আনন্দ, নিরাসক্ত আত্মনিবেদন—এই ছিল পুরন্দরের দীক্ষামন্ত্র। এই বিশ্বাসেই সে তাহার শিষ্য-শিষ্যাদের ভালবাসার মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করিয়া দিয়াছে। এই নির্বিশেষ প্রেমের ব্রত গ্রহণ করিয়া সুষমা যাহাকে ভালবাসিল, তাহাকে বিবাহ করিতে পারিল না; সোমশঙ্করও যাহাকে ভালবাসিল, তাহাকেও পাইল না। পরস্পর অনাসক্ত দুই নরনারী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইল। সোমশঙ্করকে না-পাওয়ার দুঃখ বাঁশরীর জীবন দুঃসহ করিয়া তুলিল। এমন কি, নিজের উপর অভিমানে সে রিয়ালিস্ট সাহিত্যিক ক্ষিতীশকে বিবাহ করিতে চাহিল। কিন্তু যে-মুহূর্তে সোমশঙ্করের মুখ হইতে শুনিতে পাইল যে, সুষমাকে বিবাহ করিতে যাইয়াও সে বাঁশরীকেই ভালোবাসে, তখনই তাহার সকল দুঃখের অবসান হইল। সোমশঙ্করের নিকট হইতে সুষমা যাহা পায় নাই বা কোনদিন পাইবে না, বাঁশরী তাহা পাইয়াছে ও চিরদিন পাইতে থাকিবে—ইহাই

তাহার বঞ্চিত জীবনের পরম সান্ত্বনা হইয়া রহিল। ক্ষিতীশকে সে প্রত্যাখ্যান করিয়া ফিরাইয়া দিল।

কতকটা বিংশতি শতাব্দীর পাশ্চাত্ত্য নাটকের আদর্শে এই নাটক রচিত হইয়াছে। পূর্বেই বলিয়াছি, আধুনিক ইউরোপীয় নাটকের প্রধান লক্ষণ এই যে, তাহাতে কোনও ঘটনার স্থান নাই; নাট্যলোকের বহিরাঙ্গিনায় যে-সকল ঘটনা সংঘটিত হইবে, নাটকে তাহারই পর্যালোচনা চলিবে মঞ্চে। অবশ্য এই আদর্শের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে এখানে নূতন করিয়া আর কোন প্রশ্ন তুলিতে চাহি না। প্রথম জীবনে রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্ত্য আদর্শে ঘটনা-বহুল নাটক রচনার যে ধারা অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিলেন, তাহা ক্রমে নিশ্চিহ্ন হইয়া আসিতে থাকিলেও, 'বাঁশরী' রচনার পূর্ব পর্যন্ত একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই। এমন কি, তাঁহার কোন রূপক নাটকও অতি-নাট্যিক কাহিনীতে পূর্ণ। তাঁহার শেষ-জীবনের অন্যতম প্রসিদ্ধ নাটক 'নটীর পূজা'ও ইহা হইতে মুক্ত নহে। কিন্তু 'বাঁশরী'তে রবীন্দ্রনাথ নাট্যিক ঘটনাগুলি এমন ভাবে সংযত করিয়াছেন যে, ইহা এই বিষয়ে তাঁহার পূর্ববর্তী কোন নাটকেরই সগোত্র বলিয়া দাবী করিতে পারে না। মনে হয়, এই সময় রবীন্দ্রনাথ জর্জীয় যুগের পাশ্চাত্ত্য নাটকসমূহ দ্বারা কিয়ৎ পরিমাণে প্রভাবিত হইয়াছিলেন। 'বাঁশরী' নাটকের মধ্যে কোন ঘটনারই সংঘটন দেখিতে পাওয়া যায় না; আধুনিক পাশ্চাত্ত্য নাটকের আদর্শে ইহা পাঠোপযোগী করিয়া রচিত হইয়াছে, অভিনয়োপযোগী করিয়া রচিত হয় নাই। ইহার ভাব অর্থসমৃদ্ধ ও ভাষা শাণিত ক্ষুরের মত তীক্ষ্ণ—অতি সতর্ক সঞ্চরণ ব্যতীত অগ্রসর হইবার উপায় নাই।

ঘটনার দিক দিয়া বৈচিত্র্যহীন নাটক রচনার দায়িত্ব অপরিসীম। কারণ, বাহ্য সংঘাত সৃষ্টি করা যত সহজ, অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করা তত সহজ নহে। উপন্যাসের অনিয়মিত পরিসরের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব ফুটাইয়া তুলিবার যত অবকাশ পাওয়া যায়, নাটকের সুনির্দিষ্ট পরিসরের মধ্যে তাহা তত পাওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথ 'বাঁশরী'তে অন্তর্দ্বন্দ্ব দ্বারা নাট্যিক সংঘাত সৃষ্টি করিবার দুরূহ পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং তাহাতে যে পরিমাণ সার্থকতা লাভ করিয়াছেন, তাহা বিচার করিয়া দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়।

বাঁশরী চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্বই ইহার নাট্যিক ক্রিয়া সৃষ্টি করিয়াছে। নাট্যকার এই দ্বন্দ্বকেই এত তীব্র ও সুস্পষ্ট করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ইহার পর নাটকে আর কোনরূপ ঘটনাসমাবেশ বাহুল্য বলিয়াই মনে হইত। এইখানেই

লেখকের সত্যকারের কৃতিত্ব। বাহির হইতে বাঁশরীর ভিতরের পরিচয় পাইবার উপায় নাই। মানুষের মনে যখন একটা বিষয়ে দ্বন্দ্ব জাগিয়া উঠে, তখন সে প্রতিনিয়তই তাহার বিরুদ্ধভাবের সম্মুখীন হইয়া তাহার মূল্য যাচাই করিতে যায়। বাঁশরী বস্তুতান্ত্রিকতায় শ্রদ্ধা করে না; তাহার শিক্ষা ও রুচি সর্বতোভাবেই ইহার বিরোধী। অথচ যখন সে সোমশঙ্করকে নিজের কাছ হইতে হারাইল, তখন সে এক 'রিয়ালিস্ট্' সাহিত্যিককে সঙ্গী করিয়া লইল। ইহা তাহার আত্মপ্রবঞ্চনার অভিনয় মাত্র। শেষ পর্যন্ত এই মুখোস অবশ্য খুলিয়া পড়িয়া গেল। 'রিয়ালিস্ট্' সাহিত্যিক বিদায় হইল, আদর্শের সেবাতেই তাহার জীবন উৎসর্গীকৃত হইল।

যে চরিত্রটির অঙ্গুলি-সঙ্কেতে এই নাটকের সমগ্র কাহিনী নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, তাহার নাম পুরন্দর। পুরন্দরের চরিত্র নাটকের মধ্যে একটু অপরিস্ফুট রহিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু এই নাটকে পুরন্দরকে ইহার বেশী প্রাধান্য দিবার ইচ্ছা লেখকের ছিল বলিযা মনে হয় না। বাঁশরীর অন্তর্দ্বন্দ্ব লইয়াই এই নাটকের সৃষ্টি। পুরন্দরই বাঁশরীব জীবনে এই সকল নাট্যিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত সৃষ্টি করিয়াছে, কিন্তু পুরন্দর নিজে ইহার কাহিনীর বিশেষ কোনও অংশ অধিকার করিয়া লইতে পারে না; তাহা হইলে ঘটনার পরিণতি অন্য রকম গিয়া দাঁড়ায়। পুরন্দরের চরিত্র একটু রহস্যাচ্ছন্ন এবং এই রহস্যই ইহার একমাত্র আকর্ষণ। অতএব ইহাকে অধিকতর পরিস্ফুট করিতে গেলে ইহার এই আকর্ষণ বিনষ্ট হইতে পারিত। বাঁশরী ব্যতীত অন্যান্য চরিত্রের সংক্ষিপ্ততা এই নাটকের বিশিষ্ট গুণ। এই সংক্ষিপ্ততার মধ্যেও চরিত্রগুলির পরিপূর্ণতার যে কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হইবে, তাহা নহে। সতীশ ও শৈল'র আর একটি নেহাৎ বাস্তব প্রণয়-কাহিনী নাটকের মূল কাহিনীটির এক পার্শ্বে অবস্থান করিয়াছে। তাহাও সংক্ষিপ্ত; কিন্তু তথাপি আভাসে ইঙ্গিতে ইহার ভিতরকার যে কমনীয়তাটুকু উদ্ঘাটিত করিয়া দেখান হইয়াছে, তাহা পরম উপভোগ্য হইয়াছে।

অতি-আধুনিক বাংলা বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মত এই নাটকের একটি চরিত্রকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা 'রিয়ালিস্ট্' সাহিত্যিক ক্ষিতীশ ভৌমিকের চরিত্র। যে সমাজের কাহিনী লইয়া 'বাঁশরী' নাটক রচিত হইয়াছে, সেই সমাজের অন্তরের সঙ্গে ক্ষিতীশের কোন যোগ নাই। তাহার আকৃতি যেমন কুৎসিৎ, অন্তঃকরণও তেমনি কদর্য।

বাঁশরীর সমাজ তাহাকে লইয়া প্রকাশ্যেই উপহাস করে; বাঁশরী তাহাকে প্রশ্রয় দেয়, তাহার ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধায় নহে, তাহার প্রতি ব্যঙ্গ-মিশ্রিত করুণায়। ক্ষিতীশের সাহিত্যকে নোংরা বলিয়া বিদ্রূপ করিয়া রিয়ালিজ্‌ম সম্বন্ধে তাহার নিজের মত প্রকাশ করিয়া বলে,—'সীতা ভাবলেন, দেব-চরিত্র রামচন্দ্র তাঁকে উদ্ধার করবেন রাবণের হাত থেকে, শেষকালে মানব-প্রকৃতি রামচন্দ্র চাইলেন তাঁকে আগুনে পোড়াতে। একেই বলে রিয়ালিজ্‌ম, নোঙ্‌রামিকে নয় (২য় অঙ্ক, ১ম দৃশ্য)।' সাহিত্যে বাস্তবতা সম্বন্ধে ইহাই রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট ধারণা। এই বিষয়ে বাঁশরীর মুখ দিয়া তিনি রিয়ালিস্ট্‌ ক্ষিতীশকে আরও উপদেশ দিয়াছেন,—'যখন কলেজে পড়া মুখস্থ করতে তখন শিখেছিলে রসাত্মক বাক্যই কাব্য; এখন সাবালক হয়েছ, তবু ঐ কথাটা পুরিয়ে নিতে পারলে না যে, সত্যাত্মক বাক্য রসাত্মক হলেই তাকে বলে সাহিত্য' (১ম অঙ্ক, ১ম দৃশ্য)। অতি-আধুনিক বাংলা বস্তুতান্ত্রিকতার ভিত্তি অজ্ঞতার উপর—জীবন ও জগতের সঙ্গে যাহাদের ব্যক্তিগত ও বাস্তব পরিচয় নাই, তাহারাই বঙ্গসাহিত্যের বস্তুতান্ত্রিকতার ধ্বজাধারী—ক্ষিতীশের চরিত্রের ভিতর দিয়া লেখক এই কথা সুস্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন। নাট্যকার ক্ষিতীশকে সহানুভূতি দিয়া সৃষ্টি করেন নাই; তাহাকে লইয়া কেবল ব্যঙ্গ করিবার উদ্দেশ্যেই তাহার চরিত্রের পরিকল্পনা করিয়াছেন, সেইজন্য তাহার চরিত্র জীবন্ত হইয়া উঠিতে পারে নাই। এই নাটকের একটি গুণ,—ইহার প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত ঘটনাগুলি এত ঘনসন্নিবিষ্ট যে ইহাদের মধ্যে এতটুকুও ফাঁক পড়ে নাই। সর্বোপরি উল্লেখযোগ্য এই নাটকের ভাষা। নাট্যকার যে সমাজের চিত্র ইহাতে পরিবেশন করিয়াছেন, ভাষা যে তাহারই সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য। শাণিত ক্ষুরের মত এই ভাষা অলক্ষ্যে মর্মে প্রবেশ করে, গীতি-প্রবণতা যে লেখকের বৈশিষ্ট্য, তাঁহার ভাষায় এমন সুমার্জিত ও পরিচ্ছন্ন গীতিভাববর্জিত রূপ পূর্বে কখনও দেখা যায় নাই; 'শেষের কবিতা'র ভাষাও কবিতার লক্ষণাক্রান্ত; কিন্তু 'বাঁশরী'র ভাষায় গীতি কিংবা কাব্যের স্পর্শ মাত্র নাই। ইহার অভিব্যক্তি অত্যন্ত প্রত্যক্ষ ও সহজ; রবীন্দ্রনাথের পরিণত জীবনের গদ্য রচনার ইহা একটি বিশিষ্ট নিদর্শন-স্বরূপ।

এই শ্রেণীর গুরু-বিষয়ক সামাজিক নাটক রবীন্দ্রনাথ খুব বেশি রচনা করেন নাই। তাঁহার সামাজিক নাটক মাত্রই লঘুবিষয়ক প্রহসন শ্রেণীর। আধুনিক

উচ্চশিক্ষিত অভিজাত সমাজের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু লইয়া তিনি ইহার কিছু পূর্বে মাত্র দুই একখানি নাটক রচনা করিয়াছিলেন, যেমন 'গৃহ-প্রবেশ' ও 'শোধবোধ।' কিন্তু ইহাদের প্রত্যেকটিই তাঁহার পূর্ব রচিত এক একটি ছোট গল্পের নাট্যরূপ মাত্র। বাঁশরীর সমাজ 'গৃহ-প্রবেশ' ও 'শোধবোধে'র সমাজের অপেক্ষা আভিজাত্যে আরও অগ্রসর এবং ইহার বিষয়বস্তুও 'শোধবোধ' হইতে অধিকতর ভাব-সমৃদ্ধ।

নৃত্য-নাট্য

বিভিন্ন নাটকীয় চরিত্রের আনুপূর্বিক নৃত্যানুষ্ঠানের ভিতর দিয়া একটি অখণ্ড ভাব প্রকাশ করাই রবীন্দ্রনাথের নৃত্য-নাট্যগুলির উদ্দেশ্য ছিল। শান্তিনিকেতনের কলাভবনে তখন নৃত্যকলার প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে দেখিয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁহার শেষ বয়সে তাঁহার পূর্বরচিত কয়েকখানি নাট্যকাব্য ও পদ্যকাহিনী নৃত্য-নাট্যের রূপ দিয়া পুনঃপ্রকাশিত করেন। ইহাদের কাহিনী নির্বাচন ও চরিত্রগুলির পরিকল্পনায় তদানীন্তন শান্তিনিকেতনের কলাভবনের ছাত্রছাত্রীদিগের বিশিষ্ট নৃত্যগুণের উপর যে লক্ষ্য রাখা হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। ইহাও প্রথমে শান্তিনিকেতনেই সর্বপ্রথম অভিনীত হইয়া রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশাতেই শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীগণ কর্তৃক ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের সাধারণ রঙ্গমঞ্চেও অভিনীত হইয়াছিল। সঙ্গীত ও সংলাপ ইহাদের মুখ্য না হইয়া নৃত্যই ইহাদের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিবার ফলে অন্যান্য প্রদেশের অধিবাসিগণও অতি সহজেই ইহাদের রস গ্রহণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

নৃত্য-নাট্য ও সাধারণ নাটকের পার্থক্য বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের পুত্রবধূ শ্রীপ্রতিমা দেবী লিখিয়াছেন, 'নৃত্যনাট্যে কলাকৌশল কথার ভাষা নিয়ে কারবার করে না, তার ভাষা হ'ল সুর্ ও তাল ; ভাব খেলে তার দেহরেখায়। এই রেখার খেলামাত্রেই ছবির বিষয় এসে পড়ে, তাই তার জন্য পটভূমির দরকার হয় রঙ ও আলো। এই রঙ্ আলো ছাড়া নৃত্যকলার পরিপ্রেক্ষিতে ফুটিয়ে তোলা শক্ত, বিশেষতঃ যখন সে নাটকীয় রাজ্যে গিয়ে পৌঁছয়। নাচেতে দেহের রেখা খুব নিখুঁত হওয়া চাই, কোথাও তার কোনো অবান্তর ভঙ্গী তালের সঙ্গে ভঙ্গীর সঙ্গতি রক্ষা করা দুরূহ হয়ে পড়ে। রেখা ও তালের মিলন ছাড়া নৃত্যকলা পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। কবিতা ও গদ্যে যে তফাৎ, নৃত্যনাট্যের সঙ্গে বিশুদ্ধ নাটকের সেই রকম পার্থক্য' (প্রবাসী, ১৩৪৩ চৈত্র, ৭৯২)। উপরোক্ত কথাগুলি একটু বিচার করিয়া দেখা প্রয়োজন।

নৃত্যনাট্যে সুর ও তাল এবং ভাষা ও দেহভঙ্গির, ভিতর দিয়া ভাব প্রকাশ পাইয়া থাকে—এই উভয়ের যথার্থ মিলনের ভিতর দিয়াই নৃত্যনাট্যের

সার্থকতা। ইহাই উদ্ধৃত অংশের মূল তাৎপর্য। গদ্যের সঙ্গে পদ্যের যে তফাৎ, 'নৃত্যনাট্যের সঙ্গে বিশুদ্ধ নাটকের সেই রকম পার্থক্য', একথা অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু এখন কথা হইতেছে, সুর তাল ও দেহভঙ্গি আশ্রয় করিয়া যে রস ও ভাবের বিকাশ হইয়া থাকে, তাহাতে প্রকৃত নাট্যিক উপাদান কতটুকু থাকিতে পারে? নাটকের প্রধান লক্ষ্য যে বিপরীতধর্মী আদর্শের সংঘাতের ভিতর দিয়া সুকঠিন দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করা তাহা কি সুর, তাল ও নৃত্যের ভিতর দিয়া যথার্থ প্রকাশ পাইতে পারে? নাট্যিক ক্রিয়ার (dramatic action) অংশটি কি এখানে ক্ষুণ্ণ হয় না? যদি তাহাই হয়, তবে ইহাদিগকে নৃত্য-'নাট্য' বলা কতদূর সঙ্গত হয়?

একথা অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, নৃত্যনাট্যের মধ্যে সুরই প্রাধান্য লাভ করে, এই সুরকে অনুসরণ করিয়াই নৃত্য-ক্রিয়া। নৃত্য-ক্রিয়া ও নাট্য-ক্রিয়া এক নহে, একটি বিশেষ পথ করিয়া অগ্রসর হয়, অপরটি স্বাধীন। অতএব নৃত্য-ক্রিয়া দ্বারা নাট্যক্রিয়া (dramatic action)-কে রূপ দেওয়া যাইতে পারে না। অতএব নৃত্যনাট্যগুলিকে নৃত্যগীতিকা বলাই সঙ্গত হয়।

রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যগুলি সম্পর্কে আর একটি প্রধান কথা এই যে, তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কাব্যের বিষয়কে নাট্যের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন। কাব্যের মধ্যে একটি ভাব থাকে, তাহা কাব্যের ভাষায় ব্যাখ্যা করা অসম্ভব না হইলেও, দেহের ভঙ্গি বা নৃত্যের ভিতর দিয়া প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। সেইজন্য এই সকল ক্ষেত্রে ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করা অপরিহার্য হইয়া উঠে। নৃত্যের ভিতব দিয়া রস ও আনন্দের ভাবটি যত সহজে প্রকাশ পায়, কোন তত্ত্বকথা তত সহজে প্রকাশ পাইতে পারে না। সেইজন্য রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যগুলির অভিনয়কালে দেখিতে পাওয়া যায় যে, নৃত্যের পটভূমিকায় অনেক ক্ষেত্রেই ভাষা আশ্রয় করা হইয়াছে। নৃত্যের সঙ্গে কতকটা সঙ্গতি রক্ষা করিবার জন্য সে ভাষা পদ্যের ভাষা হইতে পারে, কিন্তু তথাপি কেবলমাত্র তাল ও নৃত্যের ভিতর দিয়া উদ্দিষ্ট ভাবটি প্রকাশ পায় না বলিয়াই যে এই সকল ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ভাষার সহায়তা গ্রহণ করিতে হয়, তাহা সহজেই অনুমেয়। যদিও এ কথা বলা হইয়াছে যে, নৃত্যনাট্য দৃশ্য এবং শ্রাব্য, কিন্তু পাঠ্য নয়, তথাপি ইহার কোন কোন ভাব প্রকাশ করিবার জন্য পাঠ্য অংশও অবলম্বন করা হইয়াছে।

নৃত্যনাট্যগুলির ভিতর দিয়া রবীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র যদি তত্ত্বহীন আনন্দরস

পরিবেশন করিতেন, তাহা হইলে ইহাদের রচনা অধিকতর সার্থকতা লাভ করিতে পারিত। কারণ, পূর্বেই বলিয়াছি, নৃত্যের ভিতর দিয়া আনন্দ যত সহজে প্রকাশ পায়, তত্ত্ব তত সহজে প্রকাশ পায় না। এই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের 'শেষ বর্ষণ' কিংবা 'শ্রাবণ-ধারা' নামক গীতিনাট্য দুইটির উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহাদের মধ্যে গভীর কোন তত্ত্ব নাই, যাহা আছে তাহা অনাবিল রস। অতএব 'শেষ বর্ষণে'র নৃত্যনাট্যরূপ যত সহজে অন্তর অধিকার করে, 'চিত্রাঙ্গদা'র মত তত্ত্বমূলক নাটক তত সহজে তাহা পারে না। রবীন্দ্রনাথ যে বয়সে নৃত্যনাট্যগুলি রচনা করেন, সেই বয়সে মৌলিক নাট্যরচনার প্রতিভা তাঁহার নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল। যদি তাহা না হইত, তবে তাঁহার মত রসশিল্পী অতি সহজেই এই কথাটি নিজেই ধরিতে পারিতেন এবং সেই অনুযায়ী সার্থক মৌলিক নৃত্যনাট্য রচনা করিতে পারিতেন। প্রয়োজনের অনুরোধে কাব্যের বিষয়কে নৃত্যনাট্যে রূপান্তরিত করিবার ফলে যে ত্রুটি এখানে দেখা দিয়াছে, তাহা ইহাদের মধ্যে থাকিত না।

নৃত্যনাট্যগুলির ভাষা রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের গদ্য কবিতার ভাষা। মধ্যে মধ্যে পূর্বরচিত সঙ্গীত এবং কোন কোন স্থানে কালোপযোগী নূতন সঙ্গীতও ইহাদের মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু নূতন রচিত সঙ্গীতের মধ্যেও তাঁহার পূর্বরচিত সঙ্গীতের ভাব ও সুরেরই অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনুসরণ করা হইয়াছে। এক কথায় বলিতে গেলে নৃত্যনাট্যগুলি রবীন্দ্র-প্রতিভার অন্তযুগে (decadent period) রচিত, সেইজন্য মৌলিক সাহিত্যিক আবেদন ইহাদের ভিতর প্রায় কিছুই নাই,—শান্তিনিকেতন-কলাভবনের বিশিষ্ট নাট্য-কৌশল ইহাদের ভিতর দিয়া রূপ লাভ করিয়াছে বলিয়াই ইহাদের মূল্য। পূর্বেই বলিয়াছি, ইহারা 'দৃশ্য এবং শ্রাব্য' বলিয়া স্বীকৃত হইলেও, 'পাঠ্য' বলিয়া কেহই স্বীকার করেন না, এমন কি রবীন্দ্রনাথ নিজেও নহেন।

'চিত্রাঙ্গদা'র বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়া রবীন্দ্রনাথ যে একখানি নাট্যকাব্য রচনা করিয়াছিলেন, সে কথা পূর্বে যথাস্থানে উল্লেখ করিয়াছি। অতঃপর এই নাট্যকাব্যখানিকেই নৃত্যনাট্যরূপে পুনরায় প্রকাশ করেন, তখন ইহার নূতন নামকরণ হয় 'নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা'। ইহাই রবীন্দ্রনাথের সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ নৃত্যনাট্য। ইহার অধিকাংশই গানের উদ্দেশ্যে রচিত এবং সামান্য কিছু অংশ মাত্র 'কাব্য-আবৃত্তির আদর্শে' রচিত। নৃত্যের

পটভূমিকায় সঙ্গীত ও আবৃত্তির সহায়তা গ্রহণ করিয়া কাহিনীটিকে রূপ দেওয়াই ইহার উদ্দেশ্য। ইহার 'কাব্য-আবৃত্তির আদর্শে' রচিত ছোট ছোট কবিতাগুলির তাৎপর্য সম্পর্কে বলা হইয়াছে, 'তারা মাঝে মাঝে সূত্র ধরিয়ে দিয়েছে মূল ঘটনার, গান ও নাচ বন্ধ করে দর্শকের চিত্তকে বিশ্রাম দেওয়ার সঙ্গে নাটকের ঘটনাসূত্রের যোগ রাখাই হল তাদের কাজ, এই কবিতাগুলির ছন্দ দেহের নৃত্যলীলাকে বাঁচিয়ে রাখে। পরবর্তী নৃত্য যে আবার সেই ভঙ্গীর মধ্যে সাড়া দিয়ে উঠ্‌বে এ যেন তারই ভূমিকা' (প্রবাসী, ১৩৪৩ চৈত্র, ৭৯২)। এই উক্তি রবীন্দ্রনাথের অনুমোদিত। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, আনুপূর্বিক নৃত্য ও তাহার পটভূমিকাস্থিত সঙ্গীত দ্বারা যে কাহিনীর প্রবাহ অব্যাহত থাকিতে পারে না, নৃত্যনাট্যের এই আঙ্গিক-ত্রুটি সম্পর্কে নাট্যকার নিজেও সজাগ ছিলেন। গান ও নাচ বন্ধ করিয়া যেখানে কথার আশ্রয় লইতে হইয়াছে, সেখানেই 'চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যে'র দুর্বলতা প্রকাশ পাইয়াছে। ইহা চিত্রাঙ্গদার বিষয়বস্তুর ত্রুটি, নৃত্যনাট্য মাত্রেরই ত্রুটি নহে। পূর্বেই বলিয়াছি, চিত্রাঙ্গদার মধ্যে একটি তত্ত্বই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, নৃত্যের যাহা প্রধান উপজীব্য অর্থাৎ রস তাহা এখানে প্রাধান্য লাভ করিতে পারে নাই। যদি তাহা পারিত, তবে আবৃত্তির উদ্দেশ্যে রচিত ছোট কবিতার সাহায্য ইহাতে গ্রহণ না করিলেও চলিত; কারণ, তত্ত্বকথা নৃত্যদ্বারা প্রকাশ করা যায় না, সেখানে প্রত্যক্ষ ভাষারই সাহায্য লইতে হয়।

'নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা' রচনার দুই বৎসর পর রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'চণ্ডালিকা' নাটিকাটির একটি নৃত্যনাট্যরূপ প্রকাশিত করেন। ঐ বৎসরই কলিকাতার সাধারণ রঙ্গমঞ্চে ইহা সর্বপ্রথম অভিনীত হয়। ইহার পরবর্তী বৎসর যখন পুনরায় ইহার সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়, তখন রবীন্দ্রনাথ ইহাকে আগাগোড়া নূতন করিয়া পরিমার্জনা করেন। তাহাতে নূতন নূতন সঙ্গীত ও কথা সংযোজিত হয় এবং পুরাতন বহু অংশ পরিত্যক্ত হয়। 'চণ্ডালিকা' নাটিকা হইতে 'নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা'র কাহিনীটি একটু স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে। পরিমার্জিত-সংস্করণ নৃত্যনাট্যের কাহিনীটি এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতেছে।

একদল ফুলওয়ালী ফুল বিক্রয় করিতে চলিয়াছে, চণ্ডাল-কন্যা প্রকৃতি তাহাদের নিকট ফুল চাহিতেই তাহারা ঘৃণাভরে চলিয়া গেল। দইওয়ালা দই বিক্রয় করিতে আসিল; প্রকৃতি দই কিনিতে চাহিল, সকলে তাহাকে

প্রকৃতিকে ছুঁইতে নিষেধ করিল। এক চুড়িওয়ালাও তাহার প্রতি এই আচরণ করিল। দুঃখে ও গ্লানিতে চণ্ডালিকার মন ভরিয়া উঠিল, সে ভগবানকে ধিক্কার দিল। প্রকৃতির মা আসিয়া তাহাকে গৃহকর্মে অমনোযোগিতার অনুযোগ দিল, সে মাকেও তিরস্কার করিয়া বিদায় দিল। বুদ্ধশিষ্য আনন্দ আসিয়া চণ্ডালিকার নিকট জল চাহিলেন, চণ্ডালিকা তাঁহাকে জল দিতে সঙ্কোচ বোধ করিল, কিন্তু আনন্দ নিঃসঙ্কোচে তাহার হাত হইতে জল পান করিলেন। জল পান করিয়া আনন্দ চলিয়া গেলেন, তাঁহার রূপ ও করুণায় তাহার মন ভরিয়া গেল, তাঁহাকে সে ভুলিতে পারিল না। প্রকৃতির মা ঐন্দ্রজালিক মন্ত্র জানিত। প্রকৃতি মাকে গিয়া ধরিয়া পড়িল,—মন্ত্র পড়িয়া ভিক্ষুকে এখানে লইয়া আইস, আমি তাঁহার নিকট আত্মনিবেদন করিব। প্রকৃতির মা তাহাতে সম্মত হইল। সে মন্ত্র পড়িতে আরম্ভ করিল—প্রকৃতি মায়া-দর্পণের মধ্যে দেখিল, মন্ত্রের আকর্ষণীগুণে আনন্দের মধ্যে সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে, শেষ পর্যন্ত পরাভূত আনন্দ প্রকৃতির সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; প্রকৃতি তাঁহার নিকট ক্ষমা চাহিল। আনন্দ প্রকৃতিকে আশীর্বাদ করিলেন।

নৃত্যনাট্যের পক্ষে 'চণ্ডালিকা'র বিষয়বস্তু 'চিত্রাঙ্গদা' হইতে অধিকতর উপযোগী। 'চিত্রাঙ্গদা'র কাহিনী কাব্যের কাহিনী, কিন্তু 'চণ্ডালিকা'র কাহিনী যথার্থই নাটকের কাহিনী, ইহার মধ্যে অন্তর ও বহির্মুখী দ্বন্দ্ব আছে। এই দ্বন্দ্ব যে উচ্চতর নাটকেরও অবলম্বন হইতে পারে—নৃত্যনাট্যের অপরিসর ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ তাহা অতি কৌশলে দেখাইয়াছেন।

চণ্ডালিকার জীবনের মধ্যে মানবজীবনেরই একটি সহজ অনুভূতির সুন্দর বিকাশ হইয়াছে। জীবনের সহজ পথে চলিতে চলিতে স্বাভাবিকভাবেই তাহার মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিল, সেই দ্বন্দ্ব তাহার দেহের দুই কূল ছাপাইয়া তাহার নিভৃত অন্তরকেও গিয়া স্পর্শ করিল। বুদ্ধশিষ্য আনন্দের করুণায় প্রকৃতির অন্তর ভরিয়া উঠিয়াছে, রূপে চক্ষু ভরিয়াছে। এই ভাবে মন ও দেহের আকর্ষণের ভিতর দিয়া প্রকৃতি নিজেকে লইয়া অগ্রসর হইয়াছে। এখানে নৈর্ব্যক্তিক কোন তত্ত্বকথা নাই, যাহা আছে তাহা একান্তভাবে ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়াই আছে, সেইজন্য দেহের ভঙ্গিতে তাহার অভিব্যক্তিও সহজ। আনন্দের সংস্পর্শে আসিয়া প্রকৃতির মধ্যে প্রেম দেখা দিয়াছে, সেই প্রেম নৈর্ব্যক্তিক বা প্ল্যাটোনিক প্রেম নহে; কারণ, তাহার সম্মুখে রহিয়াছে

আনন্দের রূপ, এই প্রেম রূপজ প্রেম, অতএব ইহার মধ্যে রক্ত-মাংসের কামনা-বাসনা প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে, সুতরাং তাহারই আকুলতা নৃত্যের ভিতর দিয়া সহজে প্রকাশ পাইয়াছে।

এই নৃত্যনাট্যের আর একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র আনন্দ। নাট্যকার সংসারত্যাগী ভিক্ষু আনন্দের মনেও অনুরূপ দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু সেই দ্বন্দ্বকে তাহার প্রকাশ্য নৃত্যের ভিতর দিয়া প্রকাশ না করিয়া তাহার ছায়া-অভিনয়ের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এখানে রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট সংযমবোধের পরিচয়টি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। একটি সুগভীর সত্যকে রবীন্দ্রনাথ এখানে কেবল মাত্র আভাস ও ইঙ্গিতের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। প্রকৃতির নিকট জল চাহিবার মধ্যে ভিক্ষু আনন্দের কি কেবল অহৈতুকী করুণাই প্রকাশ পাইয়াছিল, না তাঁহার অন্তরের কোন অজ্ঞানিত কক্ষ হইতে চিরন্তন কোন মানবিক তৃষ্ণা হাহাকার করিয়া উঠিয়াছিল? যদি তাহা না হইবে, তবে আনন্দের মধ্যে এই সংগ্রাম কিসের? শ্রীমতী প্রতিমা দেবী লিখিয়াছেন, 'দেহের অনুপম ভঙ্গিমার মধ্যে দিয়ে মনোজগতের ইতি-কথাকে নয়নগোচর ক'রে তোলাই ছিল চণ্ডালিকার আদর্শ।' 'চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্য' এই আদর্শ রক্ষায় সার্থক রচনা। রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যগুলির মধ্যে ইহা সর্বাপেক্ষা সার্থক রচনা বলা যাইতে পারে।

'মহাবস্তুবদান' অবলম্বন করিয়া রবীন্দ্রনাথ 'কথা ও কাহিনী'তে 'পরিশোধ' নামক একটি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। কিছুকাল পর তিনি ইহাকে গীতিনাট্যের রূপদান করিয়া শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীদিগের সহায়তায় কলিকাতায় আসিয়া মঞ্চস্থ করেন। এই নাট্যগীতি অবলম্বন করিয়াই রবীন্দ্রনাথ 'শ্যামা' নৃত্যনাট্য রচনা করেন। ইহাই রবীন্দ্রনাথের সর্বশেষ নৃত্যনাট্য রচনা।

'পরিশোধ' বা 'শ্যামা'র কাহিনী 'মহাবস্তুবদান' হইতে রবীন্দ্রনাথ সামান্য পরিবর্তিত করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার পরিকল্পিত কাহিনীটি এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতেছে;—বজ্রসেন নামক এক বণিক বহু সন্ধানে ইন্দ্রমণির একটি হার সংগ্রহ করিল। সে ভাবিল, এই হার সে বিক্রয় না করিয়া যাহাকে বিনামূল্যে দিতে পারে তাহাকেই দিবে। কিন্তু সে জানিতে পারিল, ইহার উপর রাজার চরের দৃষ্টি পড়িয়াছে। বজ্রসেন হারটি লইয়া রাজ্য ছাড়িয়া পলাইয়া গেল। কিন্তু বিদেশের কোটাল

তাহাকে চোর অপবাদ দিয়া ধরিল। রাজনটী শ্যামা কোটালের সঙ্গে বজ্রসেনকে দেখিতে পাইল, দেখিয়া তাহার রূপে মুগ্ধ হইল। বজ্রসেনের প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল, শ্যামা তাহার সহচরীকে প্রহরীর নিকট পাঠাইয়া দুইদিনের জন্য তাহার প্রাণদণ্ড স্থগিত রাখিল। শ্যামা তাহার নৃত্যসভায় সমবেত লোকদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল, তোমাদের মধ্যে এমন কেহ কি নাই যে এই বিদেশীকে মিথ্যা অপবাদ হইতে রক্ষা করিতে পারে? বালক উত্তীয় শ্যামার প্রেমে পাগল, কিন্তু শ্যামা কোন দিন তাহার দিকে মুখ তুলিয়াও তাকায় নাই। সে শ্যামার কথায় নিজের মাথায় অপবাদ লইয়া বণিককে মুক্ত করিল। বজ্রসেন মুক্তিলাভ করিল, পরিবর্তে উত্তীয়র প্রাণ-দণ্ড হইল বজ্রসেনের সঙ্গে শ্যামার মিলন হইল। দুইজনে একত্র দেশত্যাগ করিয়া গেল। বজ্রসেন শ্যামার নিকট বারবার জানিতে চাহিল কি করিয়া সে তাহার মুক্তি সাধন করিয়াছে। অবশেষে শ্যামার মুখ হইতেই উত্তীয়ের আত্মদানের কথা জানিতে পারিল। বজ্রসেন ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া শ্যামাকে আঘাত করিয়া চলিয়া গেল। শ্যামা পুনরায় বজ্রসেনকে সন্ধান করিয়া বাহির করিল। পুনরায় বজ্রসেন তাহাকে ধিক্কার দিয়া বিদায় করিয়া দিল।

লঘু সঙ্গীত ও নৃত্যের ভিতর দিয়া রূপদানের উদ্দেশ্যে এই কাহিনী রচিত হইলেও স্বীকার করিতেই হইবে যে, ইহা একটু অতিরিক্ত বস্তুভারাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজেও সচেতন ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, 'গানে আমি রচনা ক'রেছি শ্যামা, রচনা করেছি চণ্ডালিকা। তার বিষয়টা বিশুদ্ধ স্বপ্নবস্তু নয়। তীব্র তার সুখদুঃখ ভালো-মন্দ। তার বাস্তবতা অকৃত্রিম এবং নিবিড়।' (প্রবাসী ১৩৪৫, চৈত্র, পৃঃ ৭৮২) কিন্তু এই বাস্তবতা সম্পর্কে 'চণ্ডালিকা'র সঙ্গে 'শ্যামা'র কতকগুলি স্থূল পার্থক্য আছে। প্রথমতঃ চণ্ডালিকার সুখ-দুঃখ ও ভালো-মন্দের তীব্রতা একান্তভাবে নাট্যিক চরিত্রগুলির মনোজগৎ আশ্রয় করিয়াই প্রকাশ পাইয়াছে, বাহিরের বাস্তব জগতে তাহাদের কোন প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া দেখা যায় নাই; কিন্তু শ্যামা সম্বন্ধে একথা বলা চলে না। ইহার সুখ-দুঃখ ও ভালো-মন্দের তীব্রতা বাহিরের জগৎকেও প্রত্যক্ষভাবে স্পর্শ করিয়াছে। সেইজন্য ইহা অধিকতর বস্তু-ভারাক্রান্ত। নৃত্য ও সঙ্গীতের ভিতর দিয়া এই ভার সম্পূর্ণ কাটিয়া গিয়া ইহা কাহিনীটিকে একটি স্বচ্ছ গতিদান করিতে পারে নাই। শ্যামা নৃত্য-

নাট্যের ইহা একটি কাহিনীগত ত্রুটি বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ কাহিনীর এই বস্তুভার সম্পর্কে নিজেই বলিয়াছেন, 'কিন্তু এগুলোকে পুলিস কেসের রিপোর্টরূপে বানানো হয় নি—গানে তার বাধা দিয়েছে—চারিদিকে যে দূরত্ব বিস্তার করেছে তাকে পার হয়ে পৌঁছতে পারেনি যা কিছু অবান্তর, যা অসংলগ্ন, যা অনাহূত, আকস্মিক। অথচ জগতের সব কিছুর সঙ্গেই আছে অসংলগ্ন, অর্থহীন আবর্জনা; তাদের সাক্ষ্য নিয়ে তবেই প্রমাণ করতে হবে সাহিত্যের সত্যতা, এমন বে-আইনী বিধি মানাতে মন বাধ্‌ছে। অন্তত গানে একথা ভাবতেই পারিনে।' (ঐ) কিন্তু প্রকৃত পক্ষে 'শ্যামা'র গানের ভিতর দিয়া বস্তুর এই আবর্জনা সম্পূর্ণ দূর হইয়া যাইতে পারে নাই।

রোমান্টিক-ধর্মী গীতিনাট্য-রচনার ভিতর দিয়া রবীন্দ্রনাথের যে নাট্যকার জীবনের সূত্রপাত হইয়াছিল, সেই রোমান্টিক-ধর্মী নাট্যরচনার ভিতর দিয়াই তাহার অবসান হইয়া গেল; কিন্তু সুদীর্ঘকালের ব্যবধানে রচিত তাঁহার জীবনের দুই প্রান্তবর্তী নাট্যরচনায় কেবলমাত্র একটি বহির্মুখী সামান্য পার্থক্য সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা আঙ্গিকগত—তাঁহার প্রথম জীবনের নাটকগুলি ছিল গীতিনাট্য, কিন্তু শেষ জীবনের নাটকগুলি হইল নৃত্যনাট্য। বিষয়বস্তু ব্যবহারের দিক হইতে এই উভয় শ্রেণীর নাটকে যে খুব বেশি পার্থক্য আছে, তাহা নহে। তাঁহার প্রথম জীবনের গীতিনাট্যগুলি যেমন গীতিনাট্য হওয়া সত্ত্বেও অতিরিক্ত ঘটনাভারাক্রান্ত, তেমনই তাঁহার শেষজীবনের নৃত্যনাট্যগুলিও ঘটনার দিক দিয়া অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হইয়া আছে। গীতিনাট্য কিংবা নৃত্য-নাট্য ঘটনার দিক দিয়া লঘুভার হইলে ইহাদের অন্তর্নিহিত ভাব কিংবা রসের অভিব্যক্তি যেমন সার্থক হইতে পারে, রবীন্দ্রনাথের নাটকগুাল তাহা হয় নাই। রবীন্দ্রনাথেব নাট্যরচনার সংস্কারের মধ্যে অতিনাটকীয়তা (melo-drama)-র একটি ত্রুটি প্রায় সর্বত্রই প্রকাশ পাইয়াছে। শেষ জীবন পর্যন্ত সেই সংস্কার তিনি কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। তাঁহার সর্বশেষ নাট্য-রচনা 'শ্যামা' নৃত্যনাট্য অতিনাটকীয় ঘটনায় পরিপূর্ণ; কিন্তু ঘটনাগুলি তাহাতে অভিনয়ের ভিতর দিয়া প্রকাশ না করিয়া সঙ্গীত ও নৃত্যের ভিতর দিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। প্রথম জীবনের গীতিনাট্যগুলির মধ্যেও যে অতিনাটকীয় ঘটনা রাশীকৃত হইয়া রহিয়াছে, তাহাও নাট্যিক ক্রিয়ার ভিতর দিয়া প্রকাশ না পাইয়া কেবলমাত্র গীতি-সংলাপের ভিতর দিয়াই প্রকাশ করা হইয়াছে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের নৃত্যনাট্যগুলির মধ্যে নাটকের

অন্তর্মুখী কোনও নূতন প্রেরণা নাই। একটি বিশিষ্ট আঙ্গিককে রূপায়িত করিবার জন্য তিনি নৃত্যনাট্যই সেদিন অবলম্বন করিয়াছিলেন মাত্র।

একথা মনে হইতে পারে যে, বাংলা নাট্য-সাহিত্যের সমগ্র মধ্যযুগ ব্যাপিয়া ব্যবসায়ী রঙ্গমঞ্চ যেমন বাংলা নাটক রচনা নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে, রবীন্দ্রনাথ কোনও ব্যবসায়ী রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে জড়িত ছিলেন না বলিয়া তিনি স্বাধীনভাবে নাটক রচনা করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের নাটকগুলি সম্পর্কে ঐ কথা বলিতে পারা গেলেও, শেষ জীবনের নাটকগুলি সম্পর্কে একথা বলিতে পারা যায় না। শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপিত হইবার পর হইতেই রবীন্দ্রনাথ ব্যবসায়ী রঙ্গমঞ্চ কর্তৃক প্রভাবিত না হইলেও একটি বিশেষ মঞ্চব্যবস্থা ও অভিনেতৃগোষ্ঠীকে লক্ষ্য করিয়াই নাটক রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন—স্বাধীনভাবে নাটক রচনার প্রেরণা তখন হইতেই তাঁহার মধ্যে লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। প্রথম যুগে দীনবন্ধু মিত্র এবং শেষ যুগে দ্বিজেন্দ্রলাল ব্যতীত ব্যবসায়ীই হউক কিংবা সৌখীনই হউক, রঙ্গমঞ্চের সম্পর্ক নিরপেক্ষ হইয়া কোনও উল্লেখযোগ্য নাট্যকারই বাংলাদেশে নাটক রচনা করিতে পারেন নাই। গিরিশচন্দ্র যেমন একান্ত মঞ্চনির্ভর নাটক রচনা করিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথও তেমনই তাঁহার মধ্য বয়স হইতেই তাঁহার শান্তিনিকেতনের সুনির্দিষ্ট শিল্পিগোষ্ঠীকে একান্তভাবে লক্ষ্য করিয়াই তাঁহার নিজস্ব আদর্শ অনুযায়ী গঠিত মঞ্চনির্ভর নাটক করিয়াছিলেন। উভয় ক্ষেত্রেই স্বাধীনতার একান্ত অভাব ছিল। তবে ইঁহাদের মধ্যে পার্থক্য এই—গিরিশচন্দ্র যে ব্যবসায়ী রঙ্গমঞ্চকে একান্তভাবে নির্ভর করিয়াছিলেন, তাহার ভিতর দিয়া তিনি সে যুগের গণ-চিত্তের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তাহা করেন নাই। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রবল ব্যক্তিত্ব দ্বারা রঙ্গমঞ্চকে নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে টানিয়া আনিয়াছিলেন এবং কেবলমাত্র সেই আদর্শটি সম্মুখে রাখিয়া নাটকগুলি রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম জীবনের নাটকে এই ত্রুটি প্রকাশ না পাইলেও, তাঁহার শেষ জীবনের নাটকগুলি এই ত্রুটি হইতে মুক্ত নহে।

শান্তিনিকেতনের কলা-ভবনে নৃত্যশিক্ষা প্রবর্তিত হইবার পরই রবীন্দ্রনাথের নাট্যরচনা বিশেষ একটি ধারা অনুসরণ করিতে আরম্ভ করে। নৃত্যই তখন হইতে তাঁহার লক্ষ্য হইয়া উঠিয়াছিল, নাট্য তাহা হইতে বিদায় লইয়া গেল। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কাব্য-সাধনায় জীবনের অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত যেমন

একটি স্বাধীন ও স্বতঃস্ফূর্ত ধারা অনুসরণ করিয়াছেন, বহির্মুখী কোন আদর্শ তাঁহার দৃষ্টি ও সৃষ্টিকে আবিল করিয়া তুলিতে পারে নাই, নাটক রচনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ তাহা সফল করিয়া তুলিতে পারেন নাই। তিনি ব্যবসায়ী কিংবা সৌখীন সকল শ্রেণীর রঙ্গমঞ্চ হইতে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে তাঁহার নাট্যরচনার সূত্রপাত করিলেও, শেষ পর্যন্ত যেমন একটি অভিনেতৃগোষ্ঠীকে লক্ষ্য করিয়াই তাঁহার নাটক রচিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল, তেমনই একটি বিশিষ্ট আঙ্গিকও ইহার অবলম্বন হইয়া উঠিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের নাটক যে কোনও উত্তরাধিকার সৃষ্টি করিতে পারে নাই, কিংবা বৃহত্তর দর্শকগোষ্ঠীর সঙ্গে যে কোন যোগ স্থাপন করিতে পারে নাই, ইহার তাহাই কারণ।

রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের নাটকগুলিব আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাদের মধ্যে এক দিক দিয়া যেমন সমসাময়িক কালের বহির্মুখী বিষয়ের অবতারণা আছে, তেমনই ইহাদের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত মনোভাবও অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। প্রথম জীবনের নাটকগুলির বিষয় ছিল প্রেম, মধ্যজীবনেব নাটকগুলির বিষয় প্রধানতঃ মানব-প্রীতি, কিন্তু তাঁহার শেষ জীবনের নাটকগুলির বিষয় সমাজ ও তাহার বিবিধ সমস্যা। ১৯২৬ সন হইতেই প্রকৃত পক্ষে তাঁহার নাট্যকার জীবনের শেষ অধ্যায়ের সূচনা দেখা যায়। সেই বৎসরই তাঁহার 'নটীর পূজা' ও 'রক্তকরবী' প্রকাশিত হয় এবং ইহার পর হইতেই তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট কয়েক বৎসর ধরিয়া তাঁহার যে কয়খানি নাটক রচিত হয়, তাহাদের প্রায় প্রত্যেকটির মধ্যে সমাজের বহির্মুখী বিষয়কে ভিত্তি করা হইয়াছে। এই যুগে যে তাঁহার আজন্ম সাধনালব্ধ অনুভূতি মানব-প্রীতি কিংবা প্রকৃতি-প্রেম সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়াছিলেন, তাহা নহে— কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সেদিন তাঁহার নিকট সমাজের বহির্মুখী এবং সাময়িক সমস্যাগুলিই প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। এই যুগে রবীন্দ্রনাথ একখানি মাত্র পূর্ণাঙ্গ সামাজিক নাটক রচনা করিয়াছিলেন, তাহার নাম 'বাঁশরী'। ইহা রবীন্দ্রনাথের পূর্ববর্তী সামাজিক নাটক এবং এমন কি, বিষয়বস্তুর দিক দিয়া সামাজিক উপন্যাসগুলি হইতেও পৃথক্। বহির্মুখী বিষয়ের দিকে লক্ষ্য করিলে ইহাকে সামাজিক মনে হইলেও ইহার প্রাণধর্ম রোমান্টিক। সমসাময়িক কালে বাংলা সাহিত্যে 'রিয়ালিজমে'র নামে যে ব্যভিচার সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব ইহার ভিতর দিয়া ব্যক্ত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ যে কথা তাঁহার 'সাহিত্য' বা 'সাহিত্যের

কথা' প্রবন্ধগ্রন্থের ভিতর দিয়া বলিয়াছেন, এই নাটকের মধ্যে সেই প্রবন্ধের ভাষা অনুসরণ করিয়াই লিখিয়াছেন, 'যখন কলেজে পড়া মুখস্থ করতে তখন শিখেছিলে রসাত্মক বাক্যই কাব্য, এখন সাবালক হয়েছ, তবু এই কথাটা পুরিয়ে নিতে পারলে না যে, সত্যাত্মক বাক্য রসাত্মক হলেই তাকে বলে সাহিত্য।' দেখা যাইতেছে, ইহা সাহিত্য-তত্ত্বমূলক প্রবন্ধের বিষয়, জীবন-রস-ভিত্তিক নাটকের বিষয় নহে। 'রক্তকরবী' নাটকের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ যন্ত্রসভ্যতা, বুরোক্রাটিক শাসন-পদ্ধতি, ধনতন্ত্রবাদ, মার্কস্‌বাদ ইত্যাদি সম্পর্কিত আলোচনা স্থান দিয়াছেন। সেইজন্য কবি-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার বলিয়াছেন যে, প্রবন্ধের বিষয়কেই রবীন্দ্রনাথ এখানে নাটক রচনার ভিত্তি করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ এই বিষয় লইয়া যে প্রবন্ধ না লিখিয়াছিলেন তাহা নহে, তাঁহার 'শিক্ষার মিলন' নামক প্রবন্ধের মধ্যে যে কথা বলিয়াছেন, কিংবা ইহারও পূর্ববর্তী রচনা 'পঞ্চভূত' প্রবন্ধগ্রন্থেও যে কথা আছে, 'রক্তকরবী' নাটকেও সেই কথাই আছে। রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনে রচিত 'চণ্ডালিকা' ও তারপর 'চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্যে'র মধ্যেও মহাত্মা গান্ধীর হরিজন আন্দোলন বা ছুৎমার্গ পরিহার আন্দোলনের কথাই বর্ণিত হইয়াছে।

ধনতন্ত্রবাদ, বস্তুতন্ত্রবাদ, ছুঁৎমার্গ পরিহার ইত্যাদি বহির্মুখী সামাজিক, সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক বিষয়ই প্রধানতঃ রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের নাটকগুলির উপজীব্য হইয়াছিল বলিয়া ইহাদের মধ্যে বলিষ্ঠ জীবন-রসের অভিব্যক্তি স্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারে নাই। এমন কি, রবীন্দ্রনাথের যে মানব-প্রীতি তাঁহার মধ্যবয়সের নাটকগুলির মধ্যে একটি বিশেষ শক্তি সঞ্চার করিয়াছিল, তাহাও উক্ত সমস্যাগুলির অন্তরালে পড়িয়া গিয়া অস্পষ্ট হইয়া গেল। যদিও এ কথা সত্য যে, মুখ্যত মানব-প্রীতিই রবীন্দ্রনাথকে উক্ত সমস্যামূলক নাটকগুলি রচনার প্রেরণা যোগাইয়াছিল, তথাপি ইহাদের মধ্যে বহির্মুখী সমস্যার কথাগুলি নিতান্ত প্রকট হইয়া পড়িয়া ইহাদের মৌলিক প্রেরণাকে অনেকখানি প্রচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছিল।

শেষ জীবনের নাটকগুলির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বিষয়বস্তুর দিক হইতেও কোন নূতনত্ব দেখাইতে পারেন নাই। তাঁহার মধ্যবয়সের নাটকগুলির মধ্যে কাহিনীগত যে দৃঢ়সংবদ্ধতা ছিল, শেষ জীবনের নাটকগুলির মধ্যে তাহা ছিল না। তাঁহার শেষ জীবনের নাটকগুলির মধ্যে বিশেষতঃ নৃত্যনাট্যগুলির মধ্যে ঘটনার সমারোহ ছিল, কিন্তু তাহা নাটকীয় প্রয়োজনে সুগ্রথিত হইতে

পারে নাই। তবে 'বাঁশরী' নাটকখানির মধ্যে বহির্মুখী নাট্যিক ক্রিয়া (dramatic action)-র পরিবর্তে মনস্তত্ত্বকেই যে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে, তাহা রবীন্দ্রনাটকের একটি বিস্ময়। কারণ, এ কথা সত্য, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রায় সকল শ্রেণীর নাটকেই বহির্মুখী সংগ্রামকে প্রাধান্য দিয়াছেন; এমন কি, তাঁহার সাঙ্কেতিক কিংবা রূপক নাটকও ইহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম নহে। একমাত্র 'ডাকঘর' অবশ্য ইহার একটি সুদুর্লভ ব্যতিক্রম। কিন্তু তাঁহার শেষ জীবনের 'বাঁশরী' নামক নাটকটি ইহার একটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম সৃষ্টি করিয়াছে। সেই যুগে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি যে একান্ত অন্তর্মুখী হইয়া পড়িয়াছিল, সমসাময়িক কালে রচিত তাঁহার 'শেষের কবিতা' উপন্যাসও তাহার প্রমাণ। রবীন্দ্রনাথেব নিজস্ব সাধনার ধারা অনুসরণ করিয়া সে যুগে তাঁহার যে সকল রচনা প্রকাশিত হইতেছিল, তাহা প্রধানতঃ তাঁহার অন্তর্মুখী ধ্যানলোকেরই সৃষ্টি ছিল। নাটক রচনার ক্ষেত্রে তিনি কেবলমাত্র 'বাঁশরী'র মধ্য দিয়াই সেই অন্তর্মুখী ধ্যান-চেতনার অভিব্যক্তি দিতে সক্ষম হইয়াছিলেন বলিয়াই ইহা তাঁহার শেষ জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যরচনা বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য। কিন্তু একান্ত ধ্যান-চেতনার ফল বলিয়া বাস্তব জীবন হইতে ইহার সম্পর্ক অনেকটা বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। সেই জন্য নাটকের শক্তি ইহাতেও যথাযথ প্রকাশ পাইতে পারে নাই।

'বাঁশরী' ব্যতীত তাঁহার শেষজীবনের আর কোনও নাটকে তিনি মৌলিক বিষয়-বস্তুর সন্ধান দিতে পারেন নাই। তাঁহার 'রক্তকরবী' নাটক পূর্ববর্তী যুগের 'প্রায়শ্চিত্ত' 'মুক্তধারা' অনুসরণ করিয়া রচিত, ১৯২৮ সনে রচিত 'শেষরক্ষা' পূর্ববর্তী রচনা 'গোড়ায় গলদে'র 'অভিনয়-যোগ্য সংস্করণ', ১৯২৯ সনে রচিত 'পরিত্রাণ' পূর্ববর্তী নাটক 'প্রায়শ্চিত্তে'র নূতন পরিবর্তিত সংস্করণ, 'তপতী' পূর্ববর্তী 'রাজা ও রাণী' নাটকের নূতন নাট্যীকরণ এবং ১৯৩৩ সনে রচিত 'তাসের দেশ' তাঁহার পূর্ববর্তী একটি ছোট গল্পের নাট্যীকরণ। 'বাঁশরী' ব্যতীত আর একখানি মৌলিক নাটক যে রচিত হইয়াছিল, তাহার নাম 'চণ্ডালিকা'। পূর্বেই বলিয়াছি, তাহাও সমসাময়িক সমস্যা-ভিত্তিক রচনা।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, সংখ্যার দিক দিয়া রবীন্দ্রনাথের নাটক প্রায় চল্লিশ খানি হইলেও, তাঁহার বিশিষ্ট মনোভাবের অভিব্যক্তি যাহাতে দেখা যায়, তাহার সংখ্যা খুব বেশী নহে। তাঁহার শেষ জীবনের নাটকগুলি

পূর্ববর্তী নাটকগুলির পুনরাবৃত্তি মাত্র। তাঁহার নিজস্ব মঞ্চব্যবস্থায় অভিনয়ের ভিতর দিয়া যখন যে ত্রুটি তাঁহার চোখে ধরা পড়িয়াছে, কেবল মাত্র তাহাই দূর করিয়া তিনি তাহাদের নূতন রূপ দিয়াছেন মাত্র। সুতরাং দেখা যায় যে, একান্ত মঞ্চমুখীনতার জন্য বাংলা নাটক ইহার মধ্যযুগে স্বাধীনভাবে বিকাশলাভ করিতে পারে নাই। রবীন্দ্রনাথের নাটকও প্রধানতঃ এই জন্যই একদিক দিয়া যেমন বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিতে সক্ষম হয় নাই, অন্য দিক দিয়া তেমনই সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে বিকাশলাভ করিতে পারে নাই। নাটক রচনার দিক দিয়া দীনবন্ধু মিত্র যে স্বাধীনতাটুকু লাভ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার শেষ জীবনের নাটকগুলিতে তাহা পান নাই।

রবীন্দ্রনাথের নাটক রচনার সূত্রপাতের সময়েই জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীতে নাটক অভিনীত হইত; এমন কি, রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের নাটক 'বাল্মীকি-প্রতিভা' প্রথম তাহাতেই অভিনীত হইয়াছিল। এই ভাবে রঙ্গমঞ্চ এবং অভিনেতৃগোষ্ঠির একটি আদর্শ বরাবরই তাঁহার চোখের সম্মুখে ছিল। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও প্রথম জীবনে তিনি সেই আদর্শ দ্বারা নিজের নাটকগুলিকে যে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিলেন, তাহা মনে হইতে পারে না, কারণ, তখন তাঁহার প্রতিভা-উন্মেষের যুগ, অন্তরে তখন তাঁহার সৃষ্টির প্রেরণা, তাহার বশবর্তী হইয়া তিনি যে নাটক তখন রচনা করিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার নিজস্ব মঞ্চ ও অভিনয়াঙ্গিক গড়িয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু কালক্রমে মৌলিক সৃষ্টির প্রেরণা যখন তাঁহার মধ্যে নিঃশেষ হইয়া গেল, তখন তিনি তাঁহার নিজস্ব মঞ্চব্যবস্থা ও অভিনয়াঙ্গিকের উপরই একান্ত নির্ভর করিয়া অগ্রসর হইলেন। তখন নাটক রচনা করিবার জন্য বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়াছেন, বিষয়ের ভিতর হইতে নাটকের প্রেরণা আসে নাই। সেইজন্য শেষ জীবনে উত্তীর্ণ হইবার পূর্বেই রবীন্দ্রনাথের নাট্যকার জীবনের অবসান হইয়াছিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ

১৮৯৪-১৯২৬

উনবিংশতি শতাব্দীর শেষ দশকের মধ্যভাগ হইতে ক্ষীরোদপ্রসাদের নাট্যকার-জীবনের সূত্রপাত হইলেও, বিংশতি শতাব্দীর প্রথমভাগেই তিনি তাঁহার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যানুযায়ী নাটক রচনা করিয়া বাঙ্গালী নাট্যামোদীদিগের চিত্তবিনোদন করিয়াছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে তিনি যে সামান্য কয়খানি মাত্র নাটক রচনা করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে তাঁহার ভবিষ্যৎ পূর্ণতর সার্থকতারই সম্ভাবনা নিহিত ছিল। একদিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিতে গেলে ক্ষীরোদপ্রসাদকে বাংলা নাট্যসাহিত্যের মধ্য ও আধুনিক যুগের মধ্যে যোগরক্ষাকারী বলিয়াও নির্দেশ করিতে পারা যায়। মধ্যযুগের পৌরাণিক বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়া নাটক রচনার ধারাটি যেমন তিনি আধুনিক যুগ পর্যন্ত অগ্রসর করিয়া দিয়াছিলেন, তেমনই আধুনিক যুগের আত্মসচেতনতা দ্বারাও তিনি তাঁহার পৌরাণিক নাটকগুলিকে একটি বিশেষত্ব দান করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐতিহাসিক নাট্যরচনাতেই তাঁহার প্রতিভার সর্বাধিক বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা বিংশতি শতাব্দীর প্রথম ভাগে রচিত বাংলা নাট্যসাহিত্যের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই যুগ প্রধানতঃ ঐতিহাসিক নাট্যরচনারই যুগ। কিন্তু এই যুগের বাংলা ঐতিহাসিক নাটকের একটি প্রধান বিশেষত্ব এই যে, ইহার বস্তুধর্ম বিসর্জিত হইয়া তাহার পরিবর্তে ইহা বাংলার সমসাময়িক যুগচৈতন্যেরই বাহন হইয়াছিল। অর্থাৎ এই যুগে ঐতিহাসিক তথ্যসমূহ যুগচৈতন্যেরই অনুগামী করিয়া পরিবেশন করা হইয়াছে; যে সকল তথ্য ইহার অনুকূল নহে, তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে। ক্ষীরোদপ্রসাদের মধ্যেও তাহার কোনই ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায় না। কোন কোন সময় তিনি ইহা হইতেও আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছেন। ঐতিহাসিক বিষয়বস্তুর মধ্য হইতে তিনি অনেক সময় নূতন তাৎপর্য উদ্ধার করিয়া তাহা নাটকের মধ্য দিয়া পরিবেশন করিয়াছেন। সূচনাতেই উল্লেখ

করিয়াছি যে, আধুনিক যুগের ঐতিহাসিক এবং পৌরাণিক নাটকসমূহ অনেক সময় নাট্যকারের নিজস্ব মতবাদেরই বাহন হইয়াছে—অবিমিশ্র ঐতিহাসিক কিংবা নিরপেক্ষ পৌরাণিক তথ্যের ইহাদের মধ্য হইতে সন্ধান পাইবার কোন উপায় নাই। ক্ষীরোদপ্রসাদ এই শ্রেণীর নাটক রচনার অগ্রদূত; এইজন্য তাঁহার ঐতিহাসিক নাটকমাত্রই অতিরিক্ত রোমান্টিকধর্মী। ক্ষীরোদ-প্রসাদ নাটকের বহির্ঘটনাগত বিস্তার অপেক্ষা অন্তর্মুখীন দ্বন্দ্ব সৃষ্টির উপরই অধিকতর জোর দিয়াছেন, ইহা বিংশতি শতাব্দীর বাংলা নাট্য সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট ধর্ম। কিন্তু তথাপি তিনি উনবিংশতি শতাব্দীর প্রভাব একেবারে কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই বলিয়া বহির্ঘটনাগত বিস্তারও পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। উনবিংশতি শতাব্দীর প্রভাব এবং বিংশতি শতাব্দীর প্রেরণা ইহাদের মধ্যে তিনি সামঞ্জস্য স্থাপন করিতেও ব্যর্থকাম হইয়াছেন। সেইজন্য তাঁহার নাটকে ঘটনার সমারোহের সঙ্গে অন্ত-র্বিশ্লেষণেরও জটিলতা দেখিতে পাওয়া যায়।

ক্ষীরোদপ্রসাদের নাট্য রচনা তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়—রোমান্টিক, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক। মধ্যযুগের আদর্শে তিনি সামান্য কয়েকখানি গীতিনাট্যও রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু রচনার দিক দিয়া ইহারা এতই বৈশিষ্ট্য-বর্জিত যে, ইহাদের জন্য স্বতন্ত্র কোন বিভাগ নির্দেশ করিতে পারা যায় না। ইহাদের অধিকাংশই গিরিশচন্দ্রেরই প্রতিধ্বনি মাত্র।

ক্ষীরোদপ্রসাদের রোমান্টিক নাটকগুলি প্রধানতঃ গিরিশচন্দ্রের অনুরূপ নাটকের অনুকরণে রচিত হইলেও, ইহাদের রোমান্টিক ধর্ম প্রবলতর। একদিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিতে গেলে ক্ষীরোদপ্রসাদের অধিকাংশ নাটকই রোমান্টিক; কারণ, তিনি ঐতিহাসিক পটভূমিকার উপর যেমন নিরঙ্কুশ কল্পনাবিলাসিতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তেমনই পৌরাণিক পটভূমিকায়ও তাঁহার নিজস্ব কল্পনাকে স্বাধীন বিহার করিবার সুযোগ দিয়াছেন। অতএব তাঁহার ঐতিহাসিক এবং পৌরাণিক নাটকও প্রধানতঃ রোমান্টিকধর্মী।

ভাবাবেগ-প্রবণতা উনবিংশতি শতাব্দীর বাংলা নাট্যসাহিত্যের ধর্ম ছিল, কিন্তু বিংশতি শতাব্দীর প্রথম হইতেই সেই ভাব হ্রাস পাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। ক্ষীরোদপ্রসাদের মধ্যে উনবিংশ শতাব্দীর ভাবাবেগ-প্রবণতার পরিবর্তে বিংশতি শতাব্দীর বুদ্ধিবাদের বিকাশ দেখা গিয়াছিল, যুক্তি দ্বারা

তিনি সত্য প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছেন, তিনি প্রধানতঃ ভাবমার্গ পরিহার করিয়াছেন। সেইজন্য ভাবাবেগের সংযমই তাঁহার নাটকের বৈশিষ্ট্য'।

আনুপূর্বিক অমিত্রাক্ষর ছন্দে ক্ষীরোদপ্রসাদ তাঁহার প্রথম নাটক 'ফুলশয্যা' রচনা করেন। পৃথ্বীরাজ ও সঙ্গরাজের ভ্রাতৃবিরোধ ও পরিণামে তাহাদের মিলনের বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া ইহা রচিত।' ঘটনার অনাবশ্যক জটিলতা এবং চিত্রগুলির অস্পষ্টতা এই রোমান্টিক নাটকখানির প্রধান ত্রুটি। অধিকাংশ চরিত্রেরই নির্বিশেষ রূপ ইহার নাটকীয় রসস্ফূর্তির বাধা সৃষ্টি করিয়াছে'।

''বিধাতার বিধানে যেদিন কঠোরতা ঘুচিয়া প্রাণে রস প্রবিষ্ট হইল, সেই দিন থেকেই নারীর সৃষ্টি ও সংসার আনন্দময় হইয়াছে'—এই কথা প্রতিপন্ন করিয়া ক্ষীরোদপ্রসাদ তাঁহার 'প্রেমাঞ্জলি' নাটক রচনা করেন। মহাভারতের শান্তিপর্ব হইতে ইহার মূল আখ্যায়িকা গৃহীত হইলেও, নাট্যকার ইহার বস্তুধর্ম বিনষ্ট করিয়া একটি স্বেচ্ছাকৃত রোমান্টিক রূপ দিয়াছেন; সেইজন্য ইহা পৌরাণিক নাটকের অন্তর্ভুক্ত না হইয়া রোমান্টিক নাটকেরই অন্তর্ভুক্ত হইবার যোগ্য।' পর্বত মুনি ও নারদ মুনির মর্ত্যনারীর পদতলে প্রেমাঞ্জলি দানের কাহিনী ইহার উপজীব্য। ইহাতে নূতন যুগের মানবিকতাবোধের অস্পষ্ট বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়।

ক্ষীরোদপ্রসাদের প্রসিদ্ধ রঙ্গনাট্য 'আলিবাবা' এককালে বাঙ্গালী সমাজে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল। এই নাটকটির প্রধান আকর্ষণ ইহার হাস্যচটুল নৃত্যগীত। চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, বিশ্লেষণে নৈপুণ্য কিংবা কোন সূক্ষ্ম রস-পরিচয় না থাকিলেও, কেবল হাস্যতরল আনন্দসৃষ্টির জন্যই ইহা এত জনপ্রিয় হইয়াছিল। ইহা ইংরেজি 'অপেরা' শ্রেণীভুক্ত নাটক। কাহিনীটি মৌলিক নহে। আরব্য ও পারস্যের রূপকথা লইয়া গিরিশচন্দ্র বাঙ্গালায় যে লঘু বিষয়ক গীতিনাট্য রচনা করিবার রীতি প্রবর্তিত করিয়াছিলেন, ইহাও বিষয়-বস্তু ও রচনাগত আদর্শের দিক দিয়া তাহারই অন্তর্গত। রূপকথার কাহিনীটি নাটকীয় রূপে পরিবর্তন করিতে গিয়া দুই একটি চরিত্র নূতন করিয়া সৃষ্টি করিতে হইয়াছে এবং নবসৃষ্ট চরিত্রগুলিই বেশি সজীব ও নাটকীয় হইয়া উঠিয়াছে'।

কাসেম ও আলি দুই ভাই। কাসেম ধনীর কন্যা সাকিনাকে বিবাহ করিয়া প্রচুর ধনসম্পত্তির অধিকারী, গণ্যমান্য ওম্‌রাহ; আলি দরিদ্র কাঠুরিয়া। ধনীর কন্যা ও ধনীর পত্নী সাকিনা কেবল হিংসার বশেই আলির স্ত্রী ফতেমাকে নানা প্রকার প্রবঞ্চনা করিয়া সস্তায় কাঠ কিনিয়া লয়, অথচ স্বামী-

স্ত্রী উভয়েই আলি ও ফতেমাকে আত্মীয় বলিয়া স্বীকার করিতেও প্রস্তুত নহে। আলি আর ফতেমা ধর্মভীরু লোক। তাহারা বড়লোক কাসেমের কৃপার প্রত্যাশী না হইলেও সাকিনার অবহেলাটুকু নীরবে সহ্য করিয়া যায়। কিন্তু মর্জিনা নাম্নী বাঁদী সাকিনার এই অন্যায় অত্যাচারের সমর্থন করিতে পারে না। সে গোপনে ফতেমাকে সমবেদনা জানায়, সাবধান করিয়া দেয়। একদিন আলি কাঠ সংগ্রহ করিতে গিয়া এক দস্যু-দলের আশ্রয়স্থলের নিকট উপস্থিত হইল। দস্যুদল লুক্কায়িত আলিবাবার সম্মুখেই মন্ত্রশক্তিবলে একটি গুহার রুদ্ধদ্বার খুলিয়া প্রবেশ করিল এবং কিছুক্ষণ পরই বাহির হইয়া গেল। আলিবাবা তাহাদের মন্ত্রটি শুনিয়াছিল। সেও দ্বার খুলিয়া প্রচুর ধনরত্ন লইয়া প্রস্থান করিল। এই অপ্রত্যাশিত ধনাগমে আত্মবিস্মৃতা ফতেমা কি করিবে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না; সে সাকিনার নিকট হইতে ধান মাপিবার একটি 'কুন্‌কে' চাহিয়া আনিল, হিংসা-পরায়ণা সাকিনা কৌতূহলের বশে 'কুন্‌কে'র নীচে আঠা লাগাইয়া দিল। বুদ্ধিমতী মর্জিনা ফতেমার কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা বুঝিয়া তাহাকে সাহায্য করিতে আলির বাড়ীতে আসিল। এমন সময় কুন্‌কে সংলগ্ন একটি স্বর্ণমুদ্রার সাহায্যে আলির আকস্মিক ধনলাভের কারণ নির্ধারণের জন্য কাসেম আসিয়া উপস্থিত হইল। কাসেমের এই আকস্মিক উপস্থিতিতে মর্জিনা নিতান্ত বিপন্ন হইল—আলির পরিবারের সহিত এই ঘনিষ্ঠতার শাস্তি স্বরূপ কাসেম কোড়ার আঘাতে তাহার দেহ রক্তাক্ত না করিয়া ছাড়িবে না। অথচ এই মর্জিনাই কিছুক্ষণ পূর্বে আলির পুত্র হোসেনকে দারোগার হাত হইতে ছাড়াইয়া আনিয়াছে। হঠাৎ এত অর্থ লাভ করিয়া দরিদ্র সরলমতি হোসেন তাল সামলাইতে পারে নাই, পাগলের মত রাস্তায় গোলমালের সৃষ্টি করিয়া দারোগার হাতে পড়ে; বুদ্ধিমতী মর্জিনা তাহাকে স্বামী বলিয়া পরিচয় দিয়া মুক্ত করিয়া আনিয়াছে। সুতরাং হোসেন কাসেমের অত্যাচার হইতে মর্জিনাকে রক্ষা করিবার জন্য মাতাপিতাকে অনুরোধ করিতে লাগিল। কাসেম আলিকে নানাপ্রকার ভয় দেখাইয়া ধনের সন্ধান করিতে চাহিল। সরল-হৃদয় আলি তাহাকে কোথায় ধন আছে ও কি ভাবে তাহা সংগ্রহ করা যায়, অকপটে তাহা বলিয়া দিল এবং নিজের সমস্ত ধনের বিনিময়ে ক্রীতদাসী মর্জিনাকে মুক্ত করিয়া আনিয়া প্রত্যুপকারের আনন্দে ও ধনের বোঝা বহন করিবার দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল। লালসামত্ত

কাসেম দস্যুদের ধনাগারে গিয়া উপস্থিত হইল। পুঞ্জীকৃত ঐশ্বর্য-সম্ভার দেখিয়া তাহার আত্মবিস্মৃতি হইল। কি ফেলিয়া কি লইবে সে বুঝিতেই পারিল না। এই ধনলোভই তাহার মৃত্যুর কারণ হইল। ধনের তীব্রনেশায় সে গুহা হইতে নিষ্ক্রমণের মন্ত্রটি ভুলিয়া দস্যুহস্তে প্রাণ হারাইল। সাকিনার ব্যাকুলতায় আলি কাসেমের সন্ধানে গিয়া তাহার খণ্ড বিখণ্ডিত মৃতদেহটি লইয়া আসিল। কাসেম গণ্যমান্য লোক। তাহার মৃত্যু এরূপে রহস্যাবৃত থাকিলে চলে না, প্রকাশ্যভাবে তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হওয়া আবশ্যক, অথচ তাহার মৃত্যুর প্রকৃত তথ্য বাহির হইয়া গেলে দস্যুদের প্রতিহিংসার ফলে আলিকে প্রাণ হারাইতে হইবে। বুদ্ধিমতী মর্জিনা কৌশলে বাবা মুস্তাফা নামক এক বৃদ্ধ চর্মকারকে চক্ষু বাঁধিয়া আনিয়া কাসেমের দেহ সেলাই করাইয়া লইল। পরে কাসেমের সৎকার করা হইল। দস্যুগণ কাসেমকে কাটিয়া গুহার দরজার নিকট মৃতদেহের খণ্ডগুলি ঝুলাইয়া রাখিয়াছিল। সেগুলি অন্তর্হিত হইয়াছে দেখিয়া সন্দেহের বশে সন্ধান করিতে করিতে একজন দস্যু মুস্তাফাব নিকট উপস্থিত হইল। অর্থ দ্বাবা তাহাকে বশীভূত করিয়া কাসেমের বাড়ীতে পৌছিয়া দরজায় একটি চিহ্ন রাখিয়া সে চলিয়া গেল। কিন্তু মর্জিনার দৃষ্টি ঐ চিহ্নটির উপর পড়ায় সে পাশাপাশি কয়েকটি বাড়ীতেই ঐরূপ একই চিহ্ন আঁকিয়া দিয়া দস্যুর উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিয়া দিল। কাসেমের মৃত্যুর পর আলি সাকিনাকে বিবাহ করিয়া তাহার সম্পত্তিরও মালিক হইল। দস্যুসর্দাব আলির বাড়ীর সন্ধান জানিতে পারিয়া সওদাগরের বেশে আলির আতিথ্য গ্রহণ করিল। তাহার সঙ্গে অনেকগুলি তৈলের জালা, তাহার প্রত্যেকটিতেই এক একজন দস্যু—রাত্রিতে সর্দারেব সঙ্কেত পাইলেই তাহারা বাহির হইয়া আসিয়া আলিবাবাকে সংহার করিয়া ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়া লইবে। কিন্তু মর্জিনা তৈলের জালা হইতে তৈল লইতে আসিয়া ব্যাপার বুঝিতে পারিল এবং তপ্ত তৈল ঢালিয়া দস্যুদিগকে সংহার করিল। এই মহোপকারের পুরস্কার স্বরূপ আলি মর্জিনাকে ক্রীতদাসীত্ব হইতে মুক্তি দিল এবং তাহাকে পুত্রবধূ বলিয়া গ্রহণ করিতে উৎসুক হইয়া উঠিল। দস্যুসর্দারের প্রতিহিংসা-স্পৃহা তখনও মিটে নাই, সে দরবেশের ছদ্মবেশে হোসেনের সঙ্গে মর্জিনার নৃত্যগীত উপভোগ করিতে আসিল। উদ্দেশ্য আলিকে নিকটে পাইলেই হত্যা করা; কিন্তু এবারও তাহার চরম পরাজয় ঘটিল। মর্জিনা তাহার সঙ্গীত-সহচর ক্রীতদাস আব্দালার সঙ্গে দ্বৈত

নৃত্যগীত করিতেছিল। হঠাৎ সে সর্দারের বুকে ছুরি বসাইয়া তাহার জীবনান্ত ঘটাইয়া দিল। সর্দার নিজ মুখে সমস্ত স্বীকার করিয়া মর্জিনাকে পুত্রবধূ করিয়া লইতে আলিকে অনুরোধ করিয়া সংসার হইতে বিদায় লইল। ইহার পর হোসেন ও মর্জিনার মিলন হইল।

নাটকীয় চরিত্রগুলির ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য তেমন সূক্ষ্ম ভাবে ফোটে নাই। তবে এ জাতীয় রূপকথা বা গ্রাম্য কাহিনীর চরিত্রসৃষ্টিতে ইহা অপেক্ষা সূক্ষ্মতার সন্ধান করাও ভুল। মর্জিনার তরল নৃত্যগীতাচ্ছন্ন চঞ্চল জীবন প্রবাহে তাহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পার্শ্বে পরাধীনতার বেদনার পরোক্ষ ইঙ্গিতটি সহজেই সহানুভূতির সঞ্চার করে। তাহার বুদ্ধির মহিমা আতিশয্য-দুষ্ট হইলেও ঠিক রসভঙ্গ করে না। তবে মর্জিনার দীর্ঘ স্বগতোক্তিগুলি চরিত্রটিকে বিকশিত না করিয়া বরঞ্চ ভারাক্রান্তই করিয়া তুলিয়াছে। অন্যান্য চরিত্র নিতান্তই সাধারণ; নিজের গুণে নিজে জীবন্ত হইয়া উঠিবার অবকাশ পায় নাই।

সাকিনার শোকের সঙ্গে সঙ্গে আলির সহিত মিলনের ইঙ্গিতটি নিতান্তই রসবিরোধী। চরিত্রসৃষ্টির দিক দিয়া সার্থক হইয়া না উঠিলেও নাটকটির বিষয়বস্তু এবং নাটকীয় ঘটনা-প্রবাহ বেশ স্বচ্ছন্দ গতিতে অগ্রসর হইয়াছে। এই দুইটি বৈশিষ্ট্য ও বিশেষতঃ ইহার নৃত্যগীত নাটকটির সফলতার কারণ। বিষয়বস্তু নাট্যকারের নিজের নহে—তিনি প্রচলিত কাহিনীর উপর রং ফলাইয়াছেন মাত্র। ঘটনা-প্রবাহ নিয়ন্ত্রিত করিবার কৃতিত্ব লেখকের, উহা কখনও আড়ষ্ট হয় নাই। তবে সংক্ষিপ্ত করিতে গিয়া কার্য-কারণ সম্বন্ধের সম্যক্ স্ফূর্তি হয় নাই। যেমন দস্যুসর্দার কি ভাবে দ্বিতীয় বার আলির বাড়ীর সন্ধান পাইল, তাহা অজ্ঞাত, একই ব্যক্তি বারংবার কি ভাবে আলি ও হোসেনকে প্রতারিত করিতে পারিল, তাহার ছলনা সঙ্গত কি অসঙ্গত তাহাও ঠিক বুঝা যায় না। সেইজন্য পাঠকের মনে গভীর অনুভূতির সঞ্চার হইতে পারেনা। অবশ্য গভীর অনুভূতির সঞ্চার করা লেখকের অভিপ্রায়ও নহে। ক্ষণিক আনন্দসৃষ্টি তাঁহার উদ্দেশ্য। কিন্তু এই দিক দিয়াও হাস্যরস কোথাও জমাট বাঁধিয়া উঠিতে পারে নাই। ফাঁকা ফাঁকা তরল হাস্যোচ্ছ্বাসই ইহার বৈশিষ্ট্য—হাস্যের কার্য-কারণ সম্পর্কও খুব স্পষ্ট নহে—অনেকটা জোর করিয়া, ভাঁড়ামি করিয়া হাসানো হইয়াছে; উচ্চস্তরের সহানুভূতিমূলক হাস্যরসের নামগন্ধও নাই। নাটকটির প্রধান আকর্ষণ গানগুলির অধিকাংশই গিরিশচন্দ্রের

রচনা। এই গান ও মর্জিনা-আবদালার দ্বৈত নৃত্যগীত নাটিকটির প্রকৃত আকর্ষণ।

নাটকের ভাষাটি বিশেষ লক্ষ্য করিবার মত ; চরিত্রগুলির সুসঙ্গতি রক্ষা করিয়া লেখক আরবী-ফারসী-উর্দু প্রভৃতি ভাষার বহু শব্দ বেশ নিপুণতার সহিত প্রয়োগ করিয়াছেন। দরিদ্র আলিবাবার প্রচুর অর্থলাভ আনন্দে উচ্ছ্বসিত হওয়ার অতি সাধাবণ ভাবটি উপেক্ষা করিয়া লেখক তাহার মধ্যে 'অর্থমনর্থম্' বা ধনের প্রতি অবহেলার ভাবটি ফুটাইয়া প্রকৃত রসিক পদবাচ্য হইয়াছেন। আলিবাবা সরল দরিদ্র জীবনে অভ্যস্ত—সে তাহাই ভালবাসে, হঠাৎ আবুহোসেনের মত বডলোক হওয়া তাহার ভাল লাগে না—সে ধনের বোঝা বহিতে চায় না—অতএব এই বিরাগ। কিন্তু দুঃখের বিষয় শেষ পর্যন্ত এই ভাবটির সঙ্গতি রক্ষা পায় না। মিলনান্তক নাটকের গতানুগতিক ধারাটিই বজায় রহিল। কাসেমের উন্মত্ততা, কুবেরের ভাণ্ডারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহার লালসামত্ত হৃদয়ের বিকট আত্মপ্রকাশ ও তাহার ভয়াবহ পবিণতি আমাদিগকে সেই সনাতন উপদেশের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়—লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। পূর্বেই বলিয়াছি, রবীন্দ্রনাথের 'গুপ্তধন' গল্পে মৃত্যুঞ্জয়ের উন্মত্ত উচ্ছ্বাসের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে। উপসংহারে বক্তব্য এই, নাটকটি যুগোচিত রসরুচি-অনুসারী বলিয়া নাট্যামোদীদের যথেষ্ট আনন্দ বিতরণ করিয়াছে। ইহাতে সাহিত্যিক সার্থকতা প্রবল না হইলেও অভিনয়ের উপযোগিতা ও সফলতা সম্বন্ধে কৃতিত্ব অবিসংবাদিত।

'প্রমোদ-রঞ্জন' ক্ষীরোদপ্রসাদের একটি ক্ষুদ্র নাটিকা। লেখক ইহাকে 'রঙ্গ-নাট্য' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তবে ইহা রঙ্গ-সর্বস্ব বা প্রহসন শ্রেণীর নাটিকা নহে, 'রঙ্গে'র ভাব ইহাতে থাকিলেও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ই ইহার বক্তব্য। অর্থাৎ একটু লঘু কৌতুকের আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়া তাহার মধ্য দিয়া একটি তথ্যের প্রতিষ্ঠাই এই ক্ষুদ্র নাটিকার উদ্দেশ্য।' এই দিক দিয়া বিচার করিলে ইহাতে একটু রূপকের আভাস পাওয়া যায় ; কিন্তু তাহা তেমন সূক্ষ্ম কিছুই নহে। প্রমোদ কোন দেশের এক রাজপুত্র। একবার মানুষের বিশ্বাসঘাতকতায় তাহার মন পীড়িত হইয়া উঠিলে সে মানুষের সমাজ ত্যাগ করিয়া হিমালয়ের নির্জন অরণ্যপ্রদেশে আসিয়া আশ্রয় লইল। কিন্তু তাহার চিরসহায় ও অভিন্নহৃদয় বন্ধু রঞ্জন তাহার সঙ্গ ত্যাগ করিল না। একদিন নিদ্রিত রঞ্জনকে পরিত্যাগ করিয়া প্রমোদ গভীরতর অরণ্যে প্রবিষ্ট হইল। তাহা হইতেই

প্রমোদ পাইল 'শাস্তি' ও রঞ্জন পাইল 'মুক্তি'। বক্তব্য বিষয় ইহার অতিরিক্ত আর কিছুই নহে। ইহাতে কতকগুলি রূপক চরিত্র আছে—যেমন, জয়ন্তী, শাস্তি, মুক্তি প্রভৃতি। জয়ন্তী হিমালয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, শান্তি তাহার কন্যা, মুক্তি তাহার সহচরী। ইহার ইঙ্গিত অত্যন্ত স্পষ্ট। হিমালয় প্রকৃতির নির্জন ক্রোড়েই জন্ম হয় শান্তির, এই শান্তির সহচরীই মুক্তি। নাট্যাকারে লেখক এই কথাই প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন। স্থূল তথ্যবাদী ক্ষীরোদ-প্রসাদের পক্ষে এই দৃষ্টিভঙ্গি অভিনব সন্দেহ নাই; তবে বস্তুবাদীর দৃষ্টিভঙ্গি লইয়াই তিনি এই নাটক রচনা করিয়াছেন, আদর্শবাদীর দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া নহে।

হিন্দুসমাজের কুসংস্কার, জাত্যভিমান, প্রায়শ্চিত্ত-বিধান, তদ্দ্বারা সামাজিক অনিষ্টসাধন ইত্যাদি বিষয় অবলম্বন করিয়া ক্ষীরোদপ্রসাদ তাঁহার 'কুমারী' নাটকখানি রচনা করেন। যোগশাস্ত্রকার পতঞ্জলির মতবাদ দ্বারা এই সকল সমস্যার মীমাংসা করিবার প্রয়াস করা হইয়াছে। ইহা সামাজিক সমস্যামূলক নাটক হইলেও রোমাণ্টিক-ধর্মী রচনা, তত্ত্ব ও সমস্যার জটিলতা ভেদ করিয়া ইহার রসস্ফূর্তি সম্ভব হয় নাই।

আরব্য ও পারস্য উপকথা অবলম্বন করিয়া গিরিশচন্দ্র যে বাংলা নাটক রচনার সূত্রপাত করিয়াছিলেন, তাহারই ধারা অনুসরণ করিয়া ক্ষীরোদপ্রসাদ 'আলিবাবা' রচনা করিয়াছিলেন, ইহা রঙ্গমঞ্চে যে বিপুল সাফল্যলাভ করিয়াছিল, তাহার কথা যথাস্থানে উল্লেখ করিয়াছি; তাহারই ধারা অনুবর্তন করিয়া ক্ষীরোদপ্রসাদ 'জুলিয়া' নামক একখানি নাটক রচনা করেন। বাগদাদের খলিফ হারুণ-অল-রসীদের অপত্যনির্বিশেষে প্রজাপালনের বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া ইহা রচিত। ইহার কাহিনীর জন্য নাট্যকারের কোন মৌলিক কৃতিত্ব না থাকিলেও, ইহার বহিরঙ্গগত রসরূপ দিবার তিনি যে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহা একবারে ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়া মনে হইবে না।

আরব্য উপন্যাসের কাহিনী অবলম্বন করিয়া ক্ষীরোদপ্রসাদ 'বেদৌরা' নামক একখানি রোমাণ্টিক লক্ষণাক্রান্ত গীতিনাট্য রচনা করেন। বিবাহ না করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এক রাজকুমার ও চীন দেশের এক রাজকুমারীর বিবাহ-প্রসঙ্গ লইয়া ইহা রচিত। অলৌকিকতা দ্বারা নাট্যরস ক্ষুণ্ণ হইলেও ইহার কোন কোন চিত্র সরস বলিয়া মনে হইবে।

একটি অলৌকিক স্বপ্নবৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া ক্ষীরোদপ্রসাদের 'সপ্তম

প্রতিমা' নাটক রচিত। কাশ্মীরের শ্রেষ্ঠীপুত্র মিহির এবং মন্দুরার শ্রেষ্ঠীকন্যা ছায়ার এক কল্পিত বিবরণ ইহার অবলম্বন। অতিরিক্ত কল্পনা-প্রবণতার জন্য ইহার নাট্যধর্ম প্রায় সর্বত্রই ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। ইহার কয়েকটি প্রধান চরিত্র দৈবশক্তিসম্পন্ন করিয়া চিত্রিত হইয়াছে এবং তাহাদের দৈবশক্তি দ্বারাই কাহিনীর গতি নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। ইহা যে নাটকীয় ধর্মের প্রতিকূল, তাহা বিস্তৃত করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। কিছুকাল পর 'দৌলতে দুনিয়া' নামে ইহার একটি পরিবর্তিত রূপ প্রকাশিত হয়।

বাংলা নাট্যসাহিত্যের মধ্যযুগের ধারা অনুবর্তন করিয়া ক্ষীরোদপ্রসাদ বাস্তব জগতের মানবচরিত্র ও কল্পজগতের অপ্সরাচরিত্র অবলম্বন করিয়া তাঁহার 'বাসন্তী' নামক নাটকখানি রচনা করেন। আঙ্গিকে ও ভাবে গিরিশ-চন্দ্রের প্রভাব এই নাটকখানির উপর অত্যন্ত প্রবল।

অসম্ভব ঘটনা ও কৃত্রিম পরিবেশের ভিতর দিয়া ক্ষীরোদপ্রসাদ 'পলিন' নামক একখানি রোমান্টিক নাটক পরিবেশন করিয়াছেন। পুরুষের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া নায়িকা কর্তৃক ভ্রমোৎপাদন ইহার বিষয়। বাস্তব জগতের সকল সম্পর্কমুক্ত উদ্ভট কল্পনা-বিলাসিতার জন্য ইহার রসসৃষ্টি সম্ভব হয় নাই।

এক অলৌকিক বিষয় অবলম্বন করিয়া ক্ষীরোদপ্রসাদের 'বাদ্‌শাজাদী' নাটক রচিত। নাটক রচনার মৌলিক প্রেরণা নিঃশেষ হইয়া যাইবার পরও ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটক রচনার বিরাম হয় নাই, তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপই তাঁহার এইরূপ কয়েকখানি রোমান্টিক নাটক রচিত হয়।

'রক্ষঃরমণী' ক্ষীরোদপ্রসাদের একটি ক্ষুদ্র রোমান্টিক নাটিকা। ইহার কাহিনীর মধ্যে সেক্সপীয়রের 'টেম্পেষ্ট' ও কালিদাসের 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্'এর প্রভাব অনুভব করা যায়। মালদ্বীপের রাজপুত্র শৈলেশ্বর সৌরাষ্ট্রের এক অরণ্যাঞ্চলে মৃগয়া করিতে আসিয়া পথভ্রষ্ট হইলেন। পথশ্রমে পিপাসা-কাতর হইয়া তিনি এক ঋষির আশ্রমে গিয়া প্রবেশ করিলেন। ঋষির নাম যোগানন্দ। তাঁহার আশ্রমে এক শ্রেষ্ঠী-দুহিতা প্রতিপালিত হইতেছিল। তাহার নাম সর্বাণী। সর্বাণীর পিতা কেশব তাঁহার ভ্রষ্ট ঐশ্বর্যের সন্ধানে মালদ্বীপে যাইবার কালে মাতৃহীনা কন্যাটিকে ঋষির তত্ত্বাবধানে রাখিয়া গিয়াছিলেন। সর্বাণী যৌবনে পদার্পণ করিলেও এ'পর্যন্ত কোন যুবকের মুখদর্শন করে নাই। তাহার চারিধারে কেবল বৃদ্ধ, বৃদ্ধা ও স্থবিরের দলই বাস করিত। যাহাতে কোন যুবকের প্রতি তাহার আসক্তি জন্মিতে না

পারে, সে জন্য যোগানন্দ সর্বদা তাহার সম্মুখে বিভীষিকাময় দৃশ্য আনিয়া স্থাপন করিতেন। রাজপুত্র শৈলেশ্বর আশ্রমে প্রবেশ করিয়া সর্বাণীর নিকট পিপাসার জল প্রার্থনা করিল, সর্বাণী তাহাকে না দেখিয়াই ভয়ে দূরে পলাইয়া গেল। ইহাতে শৈলেশ্বর ক্রুদ্ধ হইয়া সর্বাণীকে অপমানিত করিল। যোগানন্দ শৈলেশ্বরকে অভিশাপ দিলেন যে, যেহেতু সে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া আশ্রমবাসীর অপমান করিয়াছে, সেইজন্য সে রাবণের অনুরূপ পাপকারী হইয়াছে; অতএব সে রাক্ষসত্ব প্রাপ্ত হইবে। অনেক অনুনয় বিনয়ের পর যোগানন্দ শাপমুক্তির উপায় বলিয়া দিলেন যে, যে-নারী তাহা কর্তৃক অপমানিত হইয়াছে, সে যদি তাহাকে আত্মদান করে, তবেই তাহার শাপমুক্তি হইবে। শৈলেশ্বর কদাকার রাক্ষসে পরিণত হইয়া দেশে ফিরিয়া গেল; গিয়া দেখিল, তাহার প্রজাবর্গও রাক্ষস-জীবন যাপন করিতেছে। সর্বাণীর পিতা কেশব মালদ্বীপে গিয়া অকস্মাৎ রাক্ষস-বেষ্টিত হইয়া পড়িলেন এবং এক অজ্ঞাত অপরাধে রাজা শৈলেশ্বর কর্তৃক গুরু দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন। দণ্ড গ্রহণ করিবার পুর্বে কেশব একমাস সময় প্রার্থনা পুর্বক দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া কন্যার সহিত মিলিত হইলেন। পিতার দণ্ডের কথা শুনিয়া সর্বাণীও পিতার সঙ্গে মালদ্বীপে চলিল। রাজা শৈলেশ্বর সর্বাণীকে চিনিতে পারিলেন এবং তাহার পিতাকে দণ্ড হইতে মুক্ত করিয়া দিলেন। শৈলেশ্বরের মহানুভবতায় আকৃষ্ট হইয়া সর্বাণী তাহাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে শৈলেশ্বরেরও শাপমুক্তি হইল।

পুর্বেই বলিয়াছি, এই নাটকখানির উপর বাহ্যপ্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। যে সূক্ষ্ম ভাবানুভূতি দ্বারা প্রণয়াখ্যানের অন্তর্বিশ্লেষণ সার্থক হইতে পারে, বর্তমান লেখকের তাহা ছিলনা; সেইজন্য সর্বাণীর মধ্যে সেক্সপীয়রের মিরাণ্ডার ছায়াটুকু মাত্র আমরা পাই। তবু সর্বাণীই এই নাটিকার মধ্যে একমাত্র উল্লেখ-যোগ্য চরিত্র। তাহার বিমুগ্ধ সরলতা তাহার চরিত্র অপরূপ মাধুর্য-মণ্ডিত করিয়াছে। মিরাণ্ডার পিতাও রাজ্যচ্যুত ডিউক, মিরাণ্ডাও সমুদ্রের অপর তীরবর্তী দেশের এক পথভ্রষ্ট যুবকের সঙ্গে প্রণয়াবদ্ধ হইয়াছিল, সর্বাণীর পিতাও ঐশ্বর্যহারা শ্রেষ্ঠী, সর্বাণী সমুদ্রের অপরতীরবর্তী দেশের পথভ্রষ্ট এক রাজপুত্রের প্রণয়ভাগিনী হইয়াছিল; তথাপি ইহাদের চরিত্রে পার্থক্যও যথেষ্ট রহিয়াছে। মিরাণ্ডার মনে মনে ভালবাসার অঙ্কুরোদ্গম হইয়াছিল, কিন্তু সর্বাণী তাহা তখনও জানে না। একমাত্র শৈলেশ্বরের মহানুভবতায় আকৃষ্ট

হইয়া তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতায় তাহারই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার জন্য নিজেকে তাহার পায়ে অর্পণ করিয়াছে। ঋষির অভিশাপ ত একটা রূপক মাত্র। যাহাকে কদাকার রাক্ষসের মত বলিয়া ভ্রম করি, তাহারও অন্তরের পরিচয় পাইলে তাহার বাহিরের সৌন্দর্যহীনতা কোথায় দূর হইয়া যায়। অন্তরের প্রকৃত সৌন্দর্যই বাহিরের সৌন্দর্যহীনতার পাপমুক্তি আনে। সেইজন্য সর্বাণী যখন শৈলেশ্বরের অন্তরের পরিচয় পাইয়া আত্মদান করিল, তখনই তাহার চক্ষুতে শৈলেশ্বরের রাক্ষস-মূর্তি অন্তর্হিত হইয়া তাহার পরিবর্তে অপূর্ব সুন্দর এক মূর্তি ফুটিয়া উঠিল। ইহার কোন চরিত্র পরিকল্পনায় নাট্যকার যেমন মৌলিক কোন কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই, তেমনই ইহার চিত্র-পরিবেশনও সুনিপুণ নহে। তবে ইহার চিত্রগুলির যথেষ্ট বৈচিত্র্য আছে, সেইজন্যই রঙ্গমঞ্চে ইহার অভিনয় দেখিয়া চক্ষু সার্থক হইতে পারে।

'রূপের ডালি' ক্ষীরোদপ্রসাদের একটি রঙ্গসর্বস্ব ক্ষুদ্র নাটিকা। ইহা প্রহসন শ্রেণীরও অন্তর্গত নহে; কারণ, প্রহসনের মধ্যে যে সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে ব্যঙ্গ করিবার প্রবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার মধ্যে তাহার লেশ মাত্র আভাসও পাওয়া যায় না। ইহা একটি পূর্ণাঙ্গ কৌতুক-নাট্য। লঘু হাস্য পরিহাসের মধ্য দিয়া যখন কাহিনী পরিণতিতে আসিয়া পৌছিয়া যায়, তখন ইহার দাগটুকু পর্যন্তও মনের উপর হইতে মিলাইয়া যায়। 'আলিবাবা'র মধ্যে লেখক যেমন একটি প্রচলিত কাহিনীকে নাট্যরূপ দিয়াছেন, ইহাতে নাট্যকার অবশ্য তাহার সুযোগ পান নাই; তথাপি 'আলিবাবা'র আবহাওয়া হইতেই তিনি এই ক্ষুদ্র নাটিকাটিরও বিষয়-বস্তু আহরণ করিয়াছেন। ইহার চিত্র পরিবেশন 'আলিবাবা'র মত উচ্চ শিল্পগুণের পরিচায়ক না হইলেও, স্থানে স্থানে অত্যন্ত মনোরম হইয়াছে। নাটিকাটি কয়েকটি রঙ্গচিত্রের সমষ্টি; রঙ্গ ও চিত্রের চাকচিক্যেই ইহার পরিসমাপ্তি। ইহার আর কোন মূল্য নাই। কাহিনীটি সংক্ষেপে এইরূপ—বোখারার নবাব খাঞ্জা খাঁ সমরখন্দের ছদ্মবেশী সুলতান আসগর আলি মির্জার কন্যা সেলিমাকে পারস্যের সর্বাপেক্ষা সুন্দরী রমণী বিবেচনা করিয়া একটি মহামূল্য ওড়না উপহার দেন, তাহাতে তাঁহার বেগম রোশেনা তাঁহাকে তিরস্কার করেন। আসগর আলি বোখারার এক বণিক-পুত্র ওস্‌মানকে অপমানিত করেন; কিন্তু ওস্‌মানের হাতেই তাঁহার নিজের ও তাঁহার কন্যার প্রাণ রক্ষা পায়। রোসেনা ঈর্ষ্যাবশতঃ সেলিমাকে অপদস্থ করিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু ওস্‌মান অদ্ভুত

কৌশলে এক তালপাতার তলোয়ার দ্বারা তাহার চক্রান্ত ব্যর্থ করে। আসগর আলি পরিতুষ্ট হইয়া ওস্‌মানের নিকট কন্যা সেলিমার বিবাহ দেন।

'আলিবাবা'র মর্জিনা চরিত্রের অনুকূল ইহাতে একটি বাঁদী চরিত্র আছে, তাহার নাম মানিয়া। এই রঙ্গনাটিকার সমগ্র আবহাওয়াই 'আলিবাবা'র অনুরূপ। অমৃতলাল বসু ইতিপূর্বে এই শ্রেণীর কয়েকখানি রঙ্গসর্বস্ব নাটক রচনা করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তথাপি চিত্র পরিবেশনের নিপুণতায় ক্ষীরোদ-প্রসাদের এই রচনাটি বৈশিষ্ট্য-বর্জিত নহে। তবে বিষয়বস্তু অতিরিক্ত লঘু হওয়ার ফলে চিত্রগুলি কাহিনীর সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত হইতে পারে নাই; মনে হয়, প্রত্যেকটি চরিত্রই হাওয়ায় উড়িতেছে; অতএব সমগ্রভাবে বিচার করিলে কাহিনীর দিক দিয়া ইহা দোষমুক্ত নহে। ওস্‌মানের বান্দা গফুরের অতিরিক্ত ও অর্থহীন ভাঁড়ামি অনেক সময় বিরক্তির উৎপাদন করে। সেলিমার চরিত্রটি নিপুণভাবে চিত্রিত হইয়াছে। নিজের দৈহিক রূপের সম্বন্ধে তাহার অতিরিক্ত সতর্কতা কেবল যে নিরর্থক কৌতুকেরই সৃষ্টি করে তাহা নহে, নারীচরিত্রের একটা বাস্তব দিক সুস্পষ্ট করিয়া দেয়। এই বিষয়ে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বিনী রোসেনার চরিত্রও তাহারই মত অনেকটা বাস্তবধর্মী হইয়া উঠিয়াছে। এই দুই নারীর দৈহিক রূপের প্রতিযোগিতা লইয়াই মুখ্যতঃ এই নাটক, এই চরিত্র দুইটি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষম বলিয়াই নাটকের উদ্দেশ্যও একেবারে ব্যর্থ হয় নাই। বিষয়-বস্তুর মর্যাদা রক্ষায় ইহার ভাষাও সার্থক হইয়াছে; যেমন লঘু ইহার বিষয়-বস্তু, ইহার ভাষাও সম্পূর্ণই তদনুরূপ কাহিনীর মধ্যে সর্বত্র তাল রাখিয়া চলিয়াছে। ক্ষীরোদপ্রসাদের নাট্যপ্রতিভার একটি বিশিষ্ট দিক নির্দেশ করিলেও, এই নাটকখানি নাট্যকারের গৌরব বৃদ্ধি করিতে পারে নাই। ইহার কাহিনীর মধ্যেও মধুসূদন দত্তের 'পদ্মাবতী' নাটকখানির প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়।

মানবজীবনে নিয়তির প্রভাব বর্ণনা করিয়া ক্ষীরোদপ্রসাদ 'নিয়তি' নামক একখানি মিলনান্তক নাটক রচনা করেন। ঘটনার বাহুল্য ও অতি-নাট্যিক পরিবেশ ইহার অবলম্বন হইলেও, ইহার একটি কৃপণ চরিত্র অত্যন্ত বাস্তবধর্মী হইয়া উঠিয়াছে।

রোমান্টিক নাটকের মধ্যে ক্ষীরোদপ্রসাদের 'কিন্নরী' বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল। মর্ত্যলোক ও কিন্নরলোকের একটি প্রেমকাহিনী অবলম্বন করিয়া ইহা রচিত। ইহাতে মর্ত্যের প্রতি কিন্নরলোকের যে আকর্ষণের কথা

বর্ণিত হইয়াছে, তাহা ইহাকে একটি পরম উপভোগ্য রসরূপ দিয়াছে। স্বপ্ন ও বাস্তবের রসমধুর যুগলরূপ পরিকল্পনাতেই ইহার সার্থকতা। ইহাতে নাটকের ধর্ম অপেক্ষা কাব্যের ধর্মই অধিকতর প্রকাশ পাইয়াছে।

বৌদ্ধ আখ্যায়িকা হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া ক্ষীরোদপ্রসাদ একখানি রোমান্টিক-ধর্মী নাটক রচনা করেন; ইহার নাম 'বিদুরথ।' কাহিনীর অলৌকিকতা এবং তত্ত্বকথার প্রাধান্য ইহার গুরুতর ত্রুটি।

মহাভারতের সুপরিচিত অর্জুন-চিত্রাঙ্গদা ও বভ্রুবাহনের কাহিনী অবলম্বন করিয়া ক্ষীরোদপ্রসাদ তাঁহার প্রথম পৌরাণিক নাটক 'বভ্রুবাহন' রচনা করেন। ইহা তিন অঙ্কে সম্পূর্ণ। ইহার চরিত্র-সৃষ্টি যেমন সার্থকতা লাভ করিতে পারে নাই, তেমনই চিত্রগুলি অলৌকিকতায় ভারাক্রান্ত হইয়াছে। কোন নাটকীয় গৌরব ইহার ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইবার সুযোগ পায় নাই। গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকগুলির প্রভাব ইহার মধ্যে অত্যন্ত প্রকট।

সাবিত্রী ও সত্যবানের সুপরিচিত পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বন করিয়া ক্ষীরোদপ্রসাদ 'সাবিত্রী' নাটক রচনা করেন। কিন্তু ইহাতে নাট্যকারের সংস্কৃত পাণ্ডিত্য সর্বত্র অত্যন্ত প্রকট হইয়া উঠিয়া নাটকের রসভঙ্গ করিয়াছে। পৌরাণিক নাটক রচনায় ইহা ক্ষীরোদপ্রসাদের ব্যর্থতার অন্যতম শোচনীয় নিদর্শন মাত্র।

মধ্যযুগের বাংলা মঙ্গলকাব্যের কোন কোন বিষয় অবলম্বন করিয়া গিরিশচন্দ্র যে বাংলা নাটক রচনার প্রবর্তন করিয়াছিলেন, তাহারই ধারা অনুসরণ করিয়া ক্ষীরোদপ্রসাদ 'রঞ্জাবতী' নাটক রচনা করেন। ইহা ধর্ম-মঙ্গলের সুপরিচিত কাহিনী অবলম্বন করিয়া রচিত হইলেও, ইহাতে বিষ্ণুপুর রাজ বীরমল্লের প্রসঙ্গও অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। নানা অলৌকিক বিষয়ে ভারাক্রান্ত বলিয়া ইহার নাট্যরস স্ফুর্তিলাভ করিতে পারে নাই।

গ্রীক্ পুরাণের একটি কাহিনীর সঙ্গে আধুনিক বৈজ্ঞানিক মনোভাব সংযুক্ত করিয়া ক্ষীরোদপ্রসাদ 'মিডিয়া' নামক নাটক রচনা করেন। নাটক হিসাবে রচিত হইলেও ইহার বিশেষ সার্থকতা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

'উলুপী' ক্ষীরোদপ্রসাদের একটি পৌরাণিক নাটক। ইহার কাহিনী মহাভারতের অশ্বমেধ পর্বের এক সুপরিচিত অংশ হইতে গৃহীত হইয়াছে। এই বিষয় লইয়া ইতিপূর্বেও বাংলায় দুই একখানি নাটক ও গীতাভিনয় রচিত হইয়াছে, তাহাদের কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি; কিন্তু ক্ষীরোদপ্রসাদ ইহার

মধ্যে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আরোপ করিয়া ইহাকে অনুরূপ কাহিনী লইয়া রচিত অন্যান্য নাটকের মধ্যে এক অপরূপ স্বাতন্ত্র্য দান করিয়াছেন।*

উলূপী নাগরাজের দুহিতা। অজ্ঞাতবাসকালে অর্জুন এই নাগরাজত্বে আসিয়া পদার্পণ করিয়াছিলেন, তখনই তিনি নাগারাজকন্যা উলূপীর প্রতি আকৃষ্ট হন এবং তাহাকে শাস্ত্রমতে বিবাহ করেন। অর্জুনের ঔরসে উলূপীর গর্ভে এক পুত্র-সন্তান জন্মগ্রহণ করে; তাহার নাম ইলাবন্ত। শিশু-পুত্র ও তাহার জননীকে পরিত্যাগ করিয়া অর্জুন হস্তিনায় প্রত্যাবর্তন করেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক্‌কালে একদিন নারদ নাগারাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হন। উলূপীর পাতিব্রত্যধর্ম পরীক্ষা করিবার জন্য তাহাকে তিনি এক অপূর্ব সঞ্জীবনী মণি উপহার দিয়া বলেন, আপৎকালে ইহার দ্বারা মাত্র একজনের প্রাণরক্ষা পাইবে। একদিন গণকবেশে এই নারদই উলূপীকে জানাইল যে, সেই তাহার স্বামীর মৃত্যুর কারণ হইবে। শুনিয়া উলূপী উন্মাদিনীর মত হইয়া জাহ্নবীজলে আত্মবিসর্জন করিতে গেল। ইতিমধ্যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জুনের কৌশলে ভীষ্ম শরশয্যায় পতিত হইয়াছেন শুনিয়া ভীষ্ম-জননী জাহ্নবী অর্জুনকে অভিশাপ দিলেন যে, অর্জুন এই পাপে রৌরব নামক নরকে পতিত হইবে। উলূপী তাহা শুনিতে পাইল; স্বামীর শাপমুক্তির জন্য সে জাহ্নবীর কৃপা ভিক্ষা করিল। জাহ্নবী বলিলেন, যদি অর্জুন পুত্রের হস্তে নিহত হয়, তাহা হইলে নরক হইতে ত্রাণ পাইতে পারিবে। উলূপী স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিল। অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্বরক্ষী হইয়া অর্জুন মণিপুর রাজ্যের প্রান্তদেশে আসিয়া উপস্থিত হইল। উলূপীর পিতৃরাজ্য মণিপুর রাজ্যের সংলগ্ন। উলূপী নিজের পুত্র ইলাবন্তকে পিতৃবধে প্ররোচিত করিল, কিন্তু ইলাবন্ত পরম পিতৃভক্ত; সে ইহাতে অস্বীকৃত হইল। মণিপুর রাজদুহিতা চিত্রাঙ্গদা অর্জুনের পরিণীতা অন্যতমা পত্নী, তাহার পুত্রের নাম বভ্রুবাহন। সেও জন্মাবধি পিতৃপরিত্যক্ত। উলূপী তাহাকে গিয়া অর্জুনের অশ্ব ধারণ করিয়া পিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে উৎসাহিত করিল। বভ্রুবাহন যজ্ঞাশ্ব ধরিয়া লইল; মাতার পরামর্শে বভ্রুবাহন অশ্ব প্রত্যর্পণ করিতে গিয়া অর্জুনের নিকট অপমানিত হইল। অপমানিত বভ্রুবাহন পিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেই মনস্থ করিল। যুদ্ধে বভ্রুবাহনের হস্তে পার্থ পরাজিত ও নিহত হইল। পিতার পক্ষ সমর্থন করিতে গিয়া ইলাবন্তও এই যুদ্ধে নিহত হইল। উলূপী নারদ প্রদত্ত সঞ্জীবনী মণি দ্বারা স্বামীকেই পুনর্জীবন দান করিল।

পূর্বেই বলিয়াছি, পৌরাণিক নাটক রচনায় ক্ষীরোদপ্রসাদের মৌলিক দক্ষতা ছিল না—ঐতিহাসিক নাটকের ক্ষেত্রেই তাঁহার সমধিক দক্ষতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। তথাপি 'উলূপী' নাটকের মধ্যে তাঁহার যে প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা একেবারে নগণ্য নহে। 'উলূপী'র বিষয়-বস্তু অতি-নাট্যিক ঘটনায় পরিপূর্ণ। ঐতিহাসিক নাট্যরচনায় ক্ষীরোদপ্রসাদ যে স্তরের প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহার এই বিশেষ পৌরাণিক নাটকটির মধ্যেও সেই একই স্তরের প্রতিভা-বিকাশের ক্ষেত্র ছিল; সেইজন্য ইহা পৌরাণিক নাটক হইয়াও ঐতিহাসিক রচনারই লক্ষণাক্রান্ত। ইহা চিত্রের দিক দিয়া বলিতেছি, আদর্শের দিক দিয়া নহে। কারণ, পৌরাণিক নাটক সাধারণতঃ যে সকল আদর্শ লইয়া রচিত হয়, ইহার মধ্যেও সেই সকল আদর্শ সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ আছে। পাতিব্রত্য, মাতৃপিতৃভক্তি, ক্ষত্রিয়োচিত কর্তব্যবুদ্ধি ইহাদের প্রত্যেকটিরই ইহাতে কীর্তন করা হইয়াছে; পৌরাণিক আদর্শের প্রতি লক্ষ্য স্থির থাকিলেও ঘটনাপ্রবাহ সঙ্গত ও স্বাভাবিক হইয়াছে। তথাপি বলিতে পারা যায় যে, এই নাটকের কাহিনী কতকগুলি অলৌকিক ব্যাপার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। যেমন, উলূপী সম্বন্ধে নারদের ভবিষ্যদ্বাণী, তৎপ্রদত্ত সঞ্জীবনী মণি, জাহ্নবীর অভিশাপ ইত্যাদি বিষয়ই মূল ঘটনাস্রোতকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। এই সকলই পৌরাণিক লক্ষণ; কেবল পুরাণ হইতে কাহিনী সংগ্রহ করিলেই পৌরাণিক নাটক হয় না। যেমন পৌরাণিক কাহিনী লইয়া লিখিত হইলেও রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা' কিংবা 'কচ ও দেবযানী'-কে পৌরাণিক নাটক বলা যায় না; ইহারা বিশেষ এক শ্রেণীর নাটকের অন্তর্গত। ইহাদের বিষয় যথাস্থানে আলোচিত হইয়াছে। উচ্চশ্রেণীর নাট্যশিল্পিগণ এই সকল পৌরাণিক লক্ষণ এমন ভাবে তাঁহাদের নাটকে ব্যবহার করেন যে তাহা নাট্যকাহিনীর অলঙ্কার বৃদ্ধি করিলেও মূল কাহিনীর গতি ও পরিণতি নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে না। অবশ্য 'উলূপী'র নাট্যকার তেমন কোন শিল্পগুণের পরিচয় দিয়াছেন, সে কথা বলিতেছি না। তবে গিরিশচন্দ্রের আমল হইতে পৌরাণিক নাটকের মধ্যে যে সকল গতানুগতিকতা কাহিনীর অনাবশ্যক ভার হইয়া পড়িয়াছিল, ঐতিহাসিক নাট্য রচনার দৃষ্টিভঙ্গি দিয়া ক্ষীরোদপ্রসাদ তাহা বর্তমান নাটকখানি হইতে দূর করিয়া দিয়াছেন। সেইজন্য ইহার কাহিনী শেষ পর্যন্ত অত্যন্ত লঘু গতিতে অগ্রসর হইয়া গিয়াছে।

'উলূপী'র মধ্যে গিরিশচন্দ্রের প্রভাব বিশেষ অনুভূত হয় না। একমাত্র 'উলূপী'র নারদ চরিত্রটি গিরিশচন্দ্রের কোন কোন পৌরাণিক নাটকের নারদ চরিত্রের ছায়া অবলম্বনে রচিত। তবে তাহাও ভাবের দিক দিয়া মাত্র। ক্ষীরোদপ্রসাদের ভাষার বৈশিষ্ট্য এই চরিত্রটির মধ্যে সম্পূর্ণ রক্ষা পাইয়াছে। বিষয়-বিচারে ভাষার প্রয়োগ সম্বন্ধে সতর্কতা ক্ষীরোদপ্রসাদের একটি বিশিষ্ট গুণ। 'আলমগীর', 'বাংলার মস্‌নদ্', 'আলিবাবা', 'রূপের ডালি'র লেখক ক্ষীরোদপ্রসাদ 'উলূপী'র বিষয়-গত মর্যাদা রক্ষা করিয়া ইহার সর্বত্র যে ভাষার প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। বিশেষতঃ গৈরিশ ছন্দের প্রভাব হইতে তিনি যে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকিয়াও গিরিশচন্দ্রের যুগে সার্থক পৌরাণিক নাটক রচনা করিতে পারিয়াছিলেন, তাহাও তাঁহার পক্ষে কম কৃতিত্বের কথা নহে। 'উলূপী'র ভাষা সহজ-বোধ্য কথ্য বাঙ্গালা গদ্য ; কিন্তু তাহা গিরিশচন্দ্রের গদ্যের মত হাল্কা নহে। গিরিশচন্দ্রের যুগ উত্তীর্ণ হইয়াও তিনি ভাষার দিক দিয়া তাঁহার যে কোনই ঋণ গ্রহণ করেন নাই, এই নাটক-খানিই তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ।

এই নাটকখানির নায়িকা উলূপী। তাহারই অপূর্ব পাতিব্রত্যের কাহিনী ইহার বর্ণিতব্য বিষয়। পৌরাণিক চরিত্রের কার্যাবলী মাত্রই আদর্শ-সেবায় নিয়োজিত হইয়া থাকে, এখানেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। অতএব নাট্যিক চরিত্র বিশ্লেষণের এখানেও অবকাশ নাই। উলূপী চরিত্রের অতি-পৌরুষের ভাব গিরিশচন্দ্রের জনা চরিত্রের প্রভাব-জাত বলিয়া মনে হয়। তথাপি উলূপী স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ। পুত্রের জন্মের পর হইতেই যে স্বামীর সঙ্গে তাহার সম্পর্ক লোপ হইয়া গিয়াছিল, আজন্মপালিত যুবক পুত্রের প্রাণের পরিবর্তে সেই স্বামীর প্রাণই সে রক্ষা করিল—ভারতীয় পাতিব্রত্যের আদর্শের ইহা এক অভিনব দিক। ইহার আর একটি চরিত্রের কথা উল্লেখ করিব। তাহা অনন্তের চরিত্র। অনন্ত উলূপীর পিতা নাগরাজ। তাহার চরিত্রের সরলতা ও স্নেহ-প্রবণতার মধ্যে মানবীয়তার সহজ মধুর স্পর্শ আছে। সমগ্র নাটকের মধ্যে এই চরিত্রটি একটু বাস্তবধর্মী।

পৌরাণিক নাটকের মধ্যে ক্ষীরোদপ্রসাদের 'ভীষ্ম' বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। ইহাতে অষ্টবসুর জন্মবৃত্তান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে শরশয্যায় ভীষ্মের ইচ্ছামৃত্যুর কাহিনী পর্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। ভীষ্মের সুদীর্ঘ জীবনকালের পরিবর্তে তাঁহার জীবনের বিশেষ কোন নাটকীয়

অংশ অবলম্বন করিয়া যদি ইহা রচিত হইত, তাহা হইলে ইহা রসঘন হইতে পারিত। ভীষ্মের সুদীর্ঘ জীবনকালে সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে যে সময়ের ব্যবধান রহিয়াছে, কিংবা তিনি তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনের কোনও কোনও অংশে যে সকল বিভিন্নমুখী চরিত্রের সম্মুখীন হইয়াছেন, তাহাদিগকে অবলম্বন করিয়া একাধিক নাটক রচিত হইবার যোগ্য। নাট্যকার তাহা বুঝিতে পারেন নাই।

গিরিশচন্দ্র ভীষ্মের চরিত্র লইয়া কোনও আনুপূর্বিক পৌরাণিক নাটক রচনা করেন নাই, ক্ষীরোদপ্রসাদ এবং দ্বিজেন্দ্রলাল সেই অভাব পূর্ণ করিয়াছেন। ভীষ্ম সম্পর্কিত আনুপূর্বিক নাটক রচনায় যে কতকগুলি প্রাথমিক অসুবিধা ছিল, সম্ভবতঃ গিরিশচন্দ্র তাহাই স্মরণ করিয়া এই বিষয়ে কোন প্রয়াস পান নাই। বিশেষতঃ ভক্তি অপেক্ষা বীরত্ব এবং আত্মত্যাগ এই দুইটি গুণই ভীষ্ম চরিত্রের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। পূর্বেই বলিয়াছি, পৌরাণিক নাটকে বাঙ্গালী ভক্তির উপর আর কোন বিষয় স্থান দেয় নাই; ক্ষাত্র বীরত্বই হউক কিংবা আত্মত্যাগ কিংবা আজীবন কৌমার্যের আদর্শই হউক, তাহা বাঙ্গালীকে আকর্ষণ করিতে পারে নাই। যে জাতি মাতৃ-সাধক কিংবা ভগবানের রাধা বা সখী ভাবের উপাসক, তাহার নিকট বীরত্ব কিংবা ত্যাগ খুব বড় কিছু বিষয় নহে। সেইজন্য মনে হয়, গিরিশচন্দ্র এই পথে অগ্রসর হন নাই, এমন কি, ক্ষীরোদপ্রসাদই হউন, কিংবা দ্বিজেন্দ্রলালই হউন, তাঁহাদের রচিত ভীষ্ম-চরিত্র-ভিত্তিক নাটকও তাঁহাদের গৌরব বৃদ্ধির সহায়ক হইতে পারে নাই।

ভীষ্মের আনুপূর্বিক জীবন-বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া নাটক রচনা করিবার প্রধান অসুবিধা এই যে, ভীষ্ম ইচ্ছামৃত্যুর শক্তিতে তাঁহার জীবনকে তিন পুরুষের মধ্যে ব্যাপ্ত করিয়াছিলেন; ভীষ্ম নাম লাভ করা হইতে শরশয্যায় শয়ন পর্যন্ত তাঁহার তিন পুরুষের ব্যবধান। যে সকল চরিত্রের সান্নিধ্যে তাঁহার জীবনের প্রথম অংশ বিকাশ লাভ করিয়াছে, এক পুরুষ পর্যন্ত আসিয়া তাহারা স্বভাবতই বিদায় লইয়া গিয়াছে, তারপর নূতন আর এক দল চরিত্রের সঙ্গে তাঁহার নূতন করিয়া সম্পর্ক রচনা করিতে হইয়াছে। এই ভাবে তাঁহার জীবন প্রধানতঃ দুইটি খণ্ডে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং তাঁহার জীবনের এই দুইটি স্বতন্ত্র খণ্ডের উপর ভিত্তি করিয়া দুইটি স্বয়ংসম্পূর্ণ নাটক রচিত হইতে পারিলেও একটি নাটকেই তাঁহার আনুপূর্বিক জীবন অবলম্বন করিবার

সুযোগ নাই। কিন্তু ক্ষীরোদপ্রসাদ এবং দ্বিজেন্দ্রলাল উভয়েই এই ভুল করিয়াছেন। তাঁহাদের ইহা ছাড়া অন্য উপায়ও ছিল না; কারণ, ভীষ্ম চরিত্রটি নিতান্ত দ্বন্দ্বহীন। অন্ধভাবে আদর্শের অনুসরণ করিয়া যাওয়াই ইহার ধর্ম। যৌবনে তিনি জীবনের যে আদর্শকে ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাই জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি অন্ধভাবে অনুসরণ করিয়াছেন—এই বিষয়ে কোন অন্তর্দ্বন্দ্ব তাঁহাকে আশ্রয় করিতে পারে নাই। সুতরাং এই শ্রেণীর চরিত্র লইয়া মহাভারতের 'শান্তিপর্ব' রঁচিত হইতে পারিলেও নাটক রচিত হইতে পারে না। অথচ ভীষ্মের চরিত্র মহাভারতে যে একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র, তাহা ত অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সেইজন্য কোন কোন নাট্যকার পৌরাণিক নাটক রচনার মধ্য দিয়া তাঁহার মহত্ত্বের পরিচয় প্রকাশ করিবার কৌতূহল দমন করিতে পারেন নাই। বিশেষতঃ ক্ষীরোদপ্রসাদ তাঁহার পরিণত বয়সে কৃষ্ণ সম্পর্কিত কতকগুলি তত্ত্বকথা প্রকাশ করিবার বাহনরূপে ভীষ্মের জীবন অবলম্বন করিয়াছিলেন, যথার্থ নাটকীয় প্রেরণায় এই নাটক রচনা করেন নাই, তাহা হইলে এই বিষয়-বস্তু নাটক রচনার জন্য নির্বাচিত করিতেন না। নাটকের মধ্যে আমরা সর্বদাই রক্তমাংসের মানুষেরই সাক্ষাৎকার লাভ করিতে চাই—আদর্শপুত্তলির তাহাতে স্থান নাই। ব্রহ্মচর্য নৈতিক জীবনের একটি সুমহান্ ও উচ্চ আদর্শ হইতে পারে; কিন্তু নাটকীয় চরিত্ররূপে ব্রহ্মচারী নিষ্ক্রিয় (rigid)। সাংসারিক সুখ-দুঃখ কামনা-বাসনার আঘাত হইতে যে অন্তর মুক্ত, তাহা পাষাণ-প্রতিমা—ইহাকে ভক্তি করা যায়, কিন্তু ইহার মধ্যে জৈব অনুভূতির স্পন্দন নাই বলিয়া আত্মীয় বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। সুতরাং যাহা নিজের বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না, নাটকেও তাহার স্থান নিতান্ত সীমাবদ্ধ। গিরিশচন্দ্র দেবতাকে মানুষের আত্মীয় করিয়া তুলিবার মন্ত্র জানিতেন, সেইজন্য তাঁহার পৌরাণিক নাটকে স্বর্গ আমাদের ঘরের মধ্যে নামিয়া আসিয়াছে, কিন্তু তাঁহার অনুকরণকারিগণ সেই মন্ত্রটি জানিতেন না বলিয়া ঘরকে স্বর্গের দিকে ঠেলিয়া তুলিয়া দিতে গিয়া ঘরকেও পর করিয়াছেন। বিংশ শতাব্দীর সকল পৌরাণিক নাটকের মধ্যেই যে সাধারণ ত্রুটি দেখা যায়, ক্ষীরোদপ্রসাদের 'ভীষ্ম' নাটকখানিও তাহা হইতে মুক্ত নহে।

ভীষ্মের জন্মের পূর্ব হইতেই অষ্টবসুর অভিশাপের কথা লইয়া এই নাটকের কাহিনীর সূত্রপাত হইয়াছে এবং ভীষ্মের শরশয্যায় শয়নের পর

ইহার যবনিকাপাত হইয়াছে। ইহার মধ্যে তিন পুরুষ কাল অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। নাটকীয় চরিত্রের ক্রমবিকাশের যে মানবিক ধারা আছে, তাহা ভীষ্ম চরিত্রের উপর প্রযোজ্য হইতে পারে নাই। কারণ, তাঁহার জীবন এক স্থানে আসিয়া স্থির (rigid) হইয়া রহিয়াছে—ক্রমবিকাশের ধারা অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইতে পারে নাই। সুতরাং এই দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে ভীষ্মের আনুপুর্বিক জীবনকে নাটকীয় চরিত্র বলিয়া গণ্য করাই সঙ্গত হয় না। তথাপি এই নাটকের মধ্যে যে ভাবে তাঁহার ও তাঁহার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য চরিত্রের রূপায়ণ দেখা যায়, তাহাই এখানে সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করা যাইবে।

ভীষ্ম এই নাটকের নায়ক। কিন্তু পুর্বেই বলিয়াছি, তাঁহার মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নাই। তিনি পিতৃভক্তির আদর্শের প্রেরণায় ব্যক্তিগত জীবনের সকল মানবিক আশা-আকাঙ্ক্ষা কামনা-বাসনা পরিত্যাগ করিলেন, তারপর হইতে অন্ধভাবে সেই আদর্শ অনুসরণ করিয়া জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া গেলেন—একদিন এক মুহূর্তের জন্যও তাঁহার সেই উচ্চ আদর্শ হইতে বিচলিত হইলেন না। নিজের বিক্রম দ্বারা কাশীরাজ-গৃহ হইতে তিন রাজকুমারীকে অধিকার করিয়া আনিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে উপহার দিলেন—অম্বা বার বার তাঁহার রূপ যৌবনের ঐশ্বর্য ও কামনার গভীরতা লইয়া তাঁহাকে আকর্ষণ করিবার চেষ্টায় ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়াছে, অবশেষে তাঁহার সেই বাসনা প্রতিহিংসায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে, তথাপি তিনি নির্বিকার ও নির্বিকল্প রহিয়াছেন। বিশ্ব-সংসারের উন্মত্ত তরঙ্গরাশি তাঁহার পাষাণ দেহে বার বার প্রহত হইয়া ফিরিয়া গিয়াছে। নিজের ব্যক্তিগত চরিত্রের উচ্চ নৈতিক আদর্শের কথা বাদ দিলেও দেখা যায় যে, তিনি তাঁহার শেষ জীবনের 'অন্নদাতা' দুর্যোধনের ব্যক্তিত্বের মূলে নিজের সকল নীতি ও ধর্মবোধ বিসর্জন দিয়াছিলেন। মুখে ধর্ম ও নীতির কথা বার বার উচ্চারণ করিয়াও ব্যবহারতঃ তাহা নিজে পালন করিতে পারেন নাই, সুতরাং তাঁহার উচ্চ নীতিবোধও দর্শকের যথার্থ শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সার্থক হইতে পারে নাই। অলৌকিক বরলাভের কথা বাদ দিয়া আজীবন ব্রহ্মচর্য দ্বারা তিনি দীর্ঘ আয়ু ও বীরত্ব অর্জন করিয়াছিলেন বলিয়া ধরিয়া লইলেও আনুপূর্বিক তাঁহার জীবনের সঙ্গে মানবিক অনুভূতির যে কোন সম্পর্ক ছিল না, তাহার জন্যই তাঁহাকে নিষ্প্রাণ পাষাণের তুল্য বলিয়া মনে হইবে।

তাঁহার মৃত্যুও অলৌকিক উপায়ে সিদ্ধ হইয়াছে। শিখণ্ডীকে সম্মুখে দেখিয়া তিনি ধনুর্বাণ ত্যাগ করিয়া যুদ্ধ হইতে বিরত হন, তাহা পুরাণের কথা হইলেও নাটকের কথা হইতে পারে না। তাঁহার এই নিতান্ত খেয়ালী আচরণ তাঁহার সুকঠিন কর্তব্য-পরায়ণতাব অন্তরায়, ইহা তাঁহার নাটকীয় চরিত্রের অন্যতম ত্রুটি। ক্ষীরোদপ্রসাদ ভীষ্মকে একজন সত্যনিষ্ঠ, কর্তব্যপরায়ণ ক্ষত্রিয় এবং কৃষ্ণভক্ত রূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন ; এই নাটকের প্রথম অঙ্কেই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রায় শতাব্দীকাল পূর্বেই ভীষ্ম তাঁহার জীবনের পরিণতি সম্পর্কে এই ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছেন—'আমি নর-নারায়ণের আগমন-প্রতীক্ষায় এই সুদীর্ঘ ব্রহ্মচর্যব্রত অবলম্বন করে বসে আছি। আমি সেই উভয় মূর্তিকে এক রথে দেখ্‌ব—এবং আমার একমাত্র পূজোপকরণ শস্ত্র-পুষ্প তাঁদের চরণে অঞ্জলি দিব। সত্যের পথ রুদ্ধ হলে আর ত তাঁরা এখানে আস্‌তে পারতেন না, আমি দিবারাত্র বিনিদ্র হয়ে সেই পথের দ্বার রক্ষা করছি (১।৭)'। ভীষ্মের এই প্রকার উচ্চ নৈতিক আদর্শমূলক তত্ত্বকথা দ্বারা এই নাটক সর্বত্র ভারাক্রান্ত হইয়া রহিয়াছে।

কাশীরাজের জ্যেষ্ঠা দুহিতা অম্বার চরিত্র এই নাটকের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জটিল। শাল্বরাজ যখন তাঁহার পিতৃগৃহে অতিথি হইলেন, তখন পিতার নিকট হইতে তিনি অতিথি সৎকারের ভার পাইলেন, সেই কর্তব্য পালন করিতে গিয়া তিনি প্রথম দর্শনেই অতিথিকে পিতার অজ্ঞাতেই আত্মদান করিলেন। পিতা যখন তাঁহাদের মিলনের বিরোধী হইয়া স্বয়ম্বরসভার আহ্বান করিলেন, তখন তাহাতে ভীষ্মের বীরত্ব দেখিয়া তাঁহার প্রতি আসক্ত হইলেন ; কিন্তু যখন ভীষ্ম তাঁহাকে তাহার বালক ভ্রাতা বিচিত্রবীর্যকে উপহার দিতে গেলেন, তখন শাল্বরাজের সঙ্গে তাঁহার প্রথম প্রণয়ের কথা উল্লেখ করিয়া সে কার্য প্রতিরোধ করিলেন। ভীষ্ম যখন তাঁহাকে শাল্বরাজের নিকট প্রেরণ করিলেন, তখন তাঁহাকে গ্রহণ করিবার জন্য তিনি শাল্বরাজকে কাতর অনুনয় জানাইলেন, শাল্বরাজ তাহাতে অস্বীকৃত হওয়াতে তাহার প্রতি সকল আক্রোশ ভুলিয়া গিয়া ভীষ্মের সর্বনাশ করিবার জন্য একদিকে পরশুরামকে প্ররোচিত করিতে লাগিলেন এবং অপর দিকে নিজেও দুশ্চর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। একান্ত মানবিক অনুভূতির দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে অম্বার এই সকল আচরণের মধ্য দিয়া কতকগুলি পরস্পরবিরোধী ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। এই বিরোধগুলি এতই স্পষ্ট যে, ইহাদের প্রত্যেকটিকে

বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। অম্বার মধ্যে প্রতিহিংসা গ্রহণ করিবার ভাব যত তীব্র বলিয়া বোধ হয়, তাঁহার প্রেমের অনুভূতি তত গভীর ছিল বলিয়া বোধ হয় না। যথার্থ প্রেমের মধ্যে এই প্রলয়ঙ্করী প্রতিহিংসার বীজ থাকিতে পারে না। অম্বার মধ্য দিয়া একটি সুস্থ স্বাভাবিক নারী-প্রকৃতি বিকাশ লাভ করিতে পারে নাই; ভীষ্মের চরিত্র যেমন আদর্শ-প্রণোদিত সৃষ্টি, অম্বার মধ্যেও রক্তমাংসের অনুভূতির স্পর্শ নাই। এই নাটকের নায়ক ও নায়িকার চরিত্র একান্ত আদর্শমূলক রচনা বলিয়া ইহার ঘটনাবলীও নিতান্ত প্রাণহীন বলিয়া বোধ হয়।

তৃতীয় অঙ্ক পর্যন্ত এই নাটকের প্রথম ভাগ; যে সকল চরিত্র লইয়া ভীষ্ম নাটকের সূত্রপাত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে একমাত্র ভীষ্ম ব্যতীত অন্যান্য সকলেই এখান পর্যন্ত আসিয়া বিদায় লইয়াছে, অতঃপর সম্পূর্ণ নূতন একদল (set) চরিত্রের সঙ্গে পরিচয় স্থাপন করিয়া তাহাদিগকে লইয়াই নাটকের অবশিষ্ট দুই অঙ্কের কাহিনী শেষ পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। পরশুরামের চরিত্রটি কাহিনীর প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত আছে সত্য, কিন্তু কাহিনীর অনিবার্য পরিণতি সূত্রে তাঁহার দ্বিতীয় বারের আবির্ভাব হয় নাই, তাঁহার চরিত্র নাটকের শেষাংশে একেবারে অপরিহার্যও নহে। সুতরাং তাহা দ্বারা কাহিনীর পূর্বাপর সংযোগ-সূত্র রক্ষায় কোন সাহায্য হইতে পারে নাই। কাহিনীর মধ্যে কালগত এই সুদীর্ঘ ব্যবধান সৃষ্টি নাটকীয় ঘটনার একটি অখণ্ড ঐক্য সৃষ্টির যে কত অন্তরায়, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। নাটকের এই মধ্যভাগে আসিয়া নূতন কতকগুলি চরিত্রের সঙ্গে পরিচয় লাভ করিতে হয়—ইহারা কেহই যে অপ্রধান চরিত্র তাহা নহে,—কর্ণ, দুর্যোধন, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, দ্রৌপদী, শ্রীকৃষ্ণ ইহারাই কাহিনীর শেষাংশ অধিকার করিয়া রহিয়াছেন, বরং ভীষ্ম তাঁহাদেরই সঙ্গে একাকার হইয়া আছেন।

চতুর্থ অঙ্ক হইতেই পূর্ববর্তী নায়িকা-চরিত্র অম্বা পুনর্জন্ম লাভ করিয়া শিখণ্ডীরূপে জন্মগ্রহণ করিল, পূর্বজন্মে সে ভীষ্মের উপর প্রতিহিংসা গ্রহণ করিতে পারিল না বলিয়া পরবর্তী জন্মে প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার সঙ্কল্প লইয়া সে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল, পূর্বজন্মবৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া এই জন্মে সেই প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার উপায় সন্ধান করিতে লাগিল। এই সকল কাহিনী পুরাণের উপযোগী, নাটকের উপযোগী নহে। পুরাণের কোন প্রসঙ্গ মূল নাট্য-কাহিনীর ধারা যদি নিয়ন্ত্রিত না করে, তবে নাটকে তাহার স্থান থাকিতে

পারে ; কিন্তু এখানে ভীষ্মের পতনের মূলে এই পৌরাণিক চরিত্রটির অলৌকিক আচরণই দায়ী। সুতরাং ইহা দ্বারা যে নাট্যগুণ ব্যাহত হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এমন কি, শিখণ্ডীকে নিয়তির রূপক হিসাবেও নাট্যকার এখানে উপস্থিত করিতে পারেন নাই, তাহা হইলেও ভীষ্মের পতন গ্রীক ট্র্যাজিডির নায়কের পতনের তুল্য মর্যাদা লাভ করিতে পারিত এবং 'ভীষ্ম' নাটক উচ্চাঙ্গের ট্র্যাজিডি হইত। ক্ষীরোদপ্রসাদ নিয়তি-বাদে বিশ্বাসী ছিলেন না ; এমন কি, তাঁহার পরবর্তী নাটক 'নর-নারায়ণে'র নায়ক চরিত্র কর্ণের জীবনেও নিয়তির প্রভাবকে ফুটাইয়া তুলিতে পারেন নাই।

'ভীষ্ম' নাটককে সার্থক ট্র্যাজিডি বলিয়া গণ্য করিবারও উপায় নাই ; কারণ, একদিক দিয়া ভীষ্মের মধ্যে যেমন অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার কোন শক্তির অস্তিত্বের অনুভব করা যায় না, তেমনই কৃষ্ণভক্তি দ্বারা তাঁহার জীবনের পরিণতির অংশটুকুও তরলায়িত হইয়াছে। ব্যক্তিস্বার্থ বলিয়া ভীষ্মের কিছু ছিল না, পারিবারিক সম্পর্কেও তিনি কাহারও সঙ্গে জড়িত ছিলেন না—সুতরাং তাঁহার মৃত্যু দ্বারা তাঁহার নিজের জীবনেরও যেমন কোন অভাব কিংবা বঞ্চনা যেমন প্রকাশ পায় নাই, তেমনই অন্য কাহারও ব্যক্তিগত স্বার্থেও আঘাত লাগিতে পারে নাই। মৃত্যুর মুহূর্তেও তিনি কৃষ্ণভক্তির মধ্যে জীবনের পরমা সান্ত্বনা লাভ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার পতন আর যে ভাবেরই সৃষ্টি করুক, যথার্থ ট্র্যাজিডির সৃষ্টি করিতে পারে নাই।

রক্তমাংসের সম্পর্কহীন আদর্শ চরিত্র লইয়া যে কোন নাটকের নায়ক চরিত্র সৃষ্টি হইতে পারে না, ভীষ্মই তাহার প্রমাণ। একথা গিরিশচন্দ্র বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই পৌরাণিক বিষয় লইয়া এতগুলি নাটক রচনা করা সত্ত্বেও, ভীষ্মের চরিত্র অবলম্বন করিয়া কোন নাটক লেখেন নাই। ক্ষীরোদ-প্রসাদ তাঁহার পরিণত জীবনের তত্ত্বকথা প্রচারের বাহনরূপেই ভীষ্ম চরিত্র অবলম্বন করিয়াছিলেন, কোন নাটকীয় প্রেরণায় তাঁহার চরিত্র রূপায়িত করেন নাই।

কেবল মাত্র ভীষ্ম চরিত্রের মধ্য দিয়াই যে তত্ত্বকথা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা নহে, অন্যান্য চরিত্রের মধ্য দিয়াও কৃষ্ণতত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। বলরাম বলিতেছেন—

'আমি হলধর, আমি বলদেব—আমি সঙ্কর্ষণ—আমি আছি, তাই তোদের কেশব আছে। কেশবের ওই দেহ কি মাটিতে গড়ারে হতভাগা! তার পায়ের নখটি থেকে আরম্ভ করে মাথায় চূড়ার শিখিপুচ্ছটি পর্যন্ত সমস্তই চিন্ময়! চিন্ময় নাম, চিন্ময় ধাম। আমি হলধর। চিন্ময় বাসুদেবের চিত্তক্ষেত্রে দিবারাত্র নিদ্রাশূন্য হয়ে হলচালনা করছি। সেইজন্যই না তোর কেশব লীলা করছে!'

এই প্রকার তত্ত্বকথায় নাটকের গতি সর্বত্র ব্যাহত হইয়াছে। সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে যে এই তত্ত্ব জ্ঞানানুশীলন দ্বারা লব্ধ, জ্ঞান-নিঃসম্পর্কিত অহৈতুকী ভক্তির অনুভূতি দ্বারা উপলব্ধ নহে—গিরিশচন্দ্র তাঁহার পৌরাণিক নাটকে নিতান্ত সহজ ভাবে ভক্তির যে কথা প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা তাহা নহে। বরং গিরিশচন্দ্র তাঁহার শেষ জীবনে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সান্নিধ্যে আসিবার পর তাঁহার নাটকে যে ভাবে তত্ত্বকথার অবতারণা করিতেন, ইহা তাহারই অনুরূপ। ইহার কারণ, গিরিশচন্দ্র তাঁহার শেষ জীবনে যেমন মূর্তিমান বেদান্ত পরমহংসদেবের সান্নিধ্য লাভ করিয়াছিলেন, ক্ষীরোদপ্রসাদও তাঁহার জীবনে রামকৃষ্ণ-সহধর্মিণী শ্রীশ্রীমা সারদা দেবীর সাক্ষাৎ সম্পর্ক লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারই প্রভাব ক্ষীরোদপ্রসাদের জীবনে সক্রিয় ছিল। বিশেষতঃ পূর্বেই বলিয়াছি, উনবিংশ শতাব্দী উত্তীর্ণ হইয়া বিংশতি শতাব্দীতে পদার্পণ করিবার পর ভক্তিবাদের পরিবর্তে বাঙ্গালীর চেতনায় যে মুক্তিবাদ দেখা দিয়াছিল, তাহাই অনুসরণ করিয়া ক্ষীরোদ-প্রসাদের মধ্যে ধর্মভাবের বিকাশ হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার পৌরাণিক নাটকের মধ্যেও জ্ঞানানুশীলন-সাপেক্ষ এই তত্ত্বকথার অবতারণা করা হইয়াছে। সেইজন্য কৃষ্ণভক্তি অপেক্ষা কৃষ্ণতত্ত্বই এই নাটকে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।

এই কৃষ্ণতত্ত্ব স্মরণ করিয়াই ভীষ্ম মন হইতে সকল মানবিক অভিমান, অহঙ্কার, প্রতিহিংসা ইত্যাদির ভাব বিসর্জন দিয়াছেন। কৃষ্ণ ছলনা করিয়া তাঁহার পঞ্চপাণ্ডবের পঞ্চ মৃত্যুবাণ হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে জানিয়াও শ্রীকৃষ্ণকে তিনি বলিয়াছেন,—'তুমি যে আমার সব বাসুদেব। আমার সত্য, আমার ধর্ম, আমার জয় পরাজয়, মান অপমান, সমস্তই তুমি। পঞ্চবাণ উত্তোলনের সঙ্গে সঙ্গেই আমি তোমার ওই শ্যামরূপ স্মরণ করেছি, নইলে তোমার সাধ্য কি দেবকী-নন্দন তুমি আজ আমার শিবিরে প্রবেশ কর।' যেখানে শত্রুর প্রতি এই মনোভাব দেখা যায়, সেখানে নাটকীয় সংঘাত সৃষ্টি

হইবার অবকাশ লুপ্ত হইয়া যায়। সুতরাং ইহা লইয়া ধর্মগ্রন্থ রচিত হইলেও নাটক রচিত হয় না।

মহাভারতের মধ্যে যে ভীষ্ম চরিত্র আমরা পাই, তাহার মধ্যে মানবিক অনুভূতির সর্বত্রই যে অভাব দেখা যায়, তাহা নহে। ভীষ্ম শ্রীকৃষ্ণকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করাইবেন এই প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিবার মধ্যে তাঁহার কৃষ্ণ-ভক্তি যে তাঁহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার মানবিক অনুভূতি অতিক্রম করিয়া গিয়াছে, তাহা কিছুতেই মনে হইতে পারে না। কিন্তু ক্ষীরোদপ্রসাদ ভীষ্ম চরিত্রের মানবিক দিকটির কোন সন্ধানই পান নাই, তাহার ফলেই ইহার মধ্যে নাটকীয় রসস্ফূর্তিও সার্থক করিয়া তুলিতে পারেন নাই।

গিরিশচন্দ্র তাঁহার পৌরাণিক নাটকের মধ্য দিয়া যে ভাবেই কৃষ্ণভক্তি প্রচার করুন না কেন, তিনি কৃষ্ণচরিত্রের মধ্যে যে মানবিকতার সন্ধান দিতেন, তাহার ফলেই তাঁহার পৌরাণিক নাটকগুলি একটি বিশেষ মর্যাদা লাভ করিত। কিন্তু ক্ষীরোদপ্রসাদ কৃষ্ণপ্রসঙ্গভিত্তিক কোন নাটকেই তাহার সন্ধান দিতে পারেন নাই, তাহার ফলে ক্ষীরোদপ্রসাদের পৌরাণিক নাটকগুলি গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকের মর্যাদা লাভ করিতে পারে নাই।

নাটকের বীর নায়ক ভীষ্ম চরিত্রের পতনের মধ্যে যে অলৌকিকতার ভাব রহিয়াছে, তাহার ফলেই ইহা যেমন ট্র্যাজিডি রূপে স্ফূর্তি লাভ করিতে পারে নাই, তেমনই ভীষ্ম চরিত্রের বীরত্ব শেষ পর্যন্ত দর্শকের মনের উপর কোনও কার্যকর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। সেনাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াও যুদ্ধক্ষেত্রে শিখণ্ডীকে দেখিয়া কেন যে ভীষ্ম ধনুর্বাণ ত্যাগ করিয়া উপস্থিত কর্তব্যবিমুখ হইয়া পড়িলেন, তাহার মধ্যে পুরাণের যে কথাই থাকুক না কেন, লৌকিক কিংবা বিবেক-সম্মত ব্যাখ্যা না থাকিলে ইহা দ্বারা দর্শকদিগের নাটক দেখিবার পিপাসা নিবৃত্ত হইতে পারে না। তিনি বলিয়াছেন,

> যদি নারী হ'য়ে হয় নর—
> শুনিছ বিদুর, মৃত্যুশর সে আমার।

ইহা অলৌকিক, অথচ এই ঘটনার উপরই ট্র্যাজিডি নির্ভর করিয়াছে। শিখণ্ডীকে দেখিবামাত্র ভীষ্মের পূর্ব জীবন-বৃত্তান্ত স্মরণ হইয়াছে—ইচ্ছামৃত্যু ভীষ্মের মনেও তাহাকে দেখিয়া মৃত্যুভয় জাগিয়া উঠিয়াছে—

স্বজীবনে ইচ্ছা যদি করেছে সন্ধান
তবেই গাঙ্গেয় হত হইবে সমরে।
তথাপি বালক দেখে হয়েছি চিন্তিত, (৪।৫)

এই নাটকের মূল বক্তব্য যেমন ভীষ্মের বীরত্বও নহে, তেমনই তাঁহার আদর্শনিষ্ঠাও নহে—নারীর প্রতিহিংসাই ইহার ভিতর দিয়া নাট্যকারের প্রধান বক্তব্য বিষয় হইয়াছে।—

রমণীর প্রতিহিংসা প্রচণ্ড বাসনা,
পার হ'য়ে বৈতরণী এ'সেছে হেথায়।
ত্রিভুবনে একাকিনী
পরিত্যক্তা রাজার নন্দিনী
যাতনার তীব্র শরে
সর্ব অঙ্গে পাইয়াছে যে প্রচণ্ড জ্বালা,
হে কৌরব, সেই জ্বালা
সর্ব অঙ্গে তোমারে করা'ব আজি পান।

কিন্তু এই নাটকের মধ্যে এমন প্রতিহিংসা গ্রহণ করিবার মূল কারণটি যেমন নগণ্য, তেমনই প্রতিহিংসা-গ্রহণকারী স্ত্রীচরিত্রটি এক জন্ম অতিক্রম করিয়া আর এক জন্মে আর এক নূতন রূপ গ্রহণ করিয়া আবির্ভূত হইবার জন্য নিতান্ত শক্তিহীন হইয়া রহিয়াছে। নারীর প্রতিহিংসা গ্রহণ করিবার মধ্যে যেমন একটি মানবিক অনুভূতি বিকাশের সুযোগ ছিল, চরিত্রটিকে অলৌকিক করিয়া তুলিবার ফলে তাহা ব্যাহত হইয়াছে।

ক্ষীরোদপ্রসাদের 'ভীষ্ম' নাটক প্রকাশিত হইবার পরের বৎসরই দ্বিজেন্দ্রলাল তাহারই অনুকরণে 'ভীষ্ম' নামক একখানি নাটক রচনা করেন। কিন্তু তাহার মধ্যেও তিনি মৌলিক প্রতিভার বিকাশ দেখাইতে পারেন নাই। ক্ষীরোদপ্রসাদের অধিকাংশ ক্রটিই তাহাতে তিনি অনুকরণ করিয়াছেন, কিন্তু তাহা তত্ত্বভার হইতে অনেকখানি মুক্ত।

ক্ষীরোদপ্রসাদের সর্বাধিক জনপ্রিয় পৌরাণিক নাটক 'নর-নারায়ণ।' ইহাতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সূচনা হইতে কর্ণের পতন পর্যন্ত মহাভারত কাহিনীর কোন কোন অংশ গৃহীত হইয়াছে। নাট্যকারের মৃত্যুর পর এই নাটকখানির নূতন সংস্করণ প্রকাশ করিবার সময় নাট্যকারের পুত্র শ্রীসতীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই নাটকখানি রচনার একটি 'ইতিহাস' বিবৃত করিয়াছেন। নানা কারণে ইহা আদ্যোপান্ত উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন,—

'নাট্যকার মহাভারত হইতে পাঁচটি চরিত্র বাছিয়া লইয়াছিলেন ও ঐ পাঁচটি চরিত্রের নাটকীয় ব্যক্তিত্বও ঘাত-প্রতিঘাতের উপর কেন্দ্র করিয়া নিজের মনোমত নাটক লিখিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। চরিত্রগুলি এই :— ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ ও কৃষ্ণ। ১৯১২।১৩ সালে ৺কাশীধামে তিনি "ভীষ্ম" নাটক লেখা শেষ করেন, এবং তাহা নাট্যামোদিগণের নিকট বিশেষ সমাদর লাভ করে। তাহার পর তিনি "দ্রোণ" ও "কৃপ" লেখা আরম্ভ করেন। কিন্তু বিভিন্ন রঙ্গালয়ের তাগিদে "কিন্নরী" প্রভৃতি ২।৩ খানি নাটক লিখিবার জন্য "কর্ণ" লেখা বন্ধ হয়। পরে যখন পুনরায় লেখা আরম্ভ করেন, তখন নবগঠিত "আর্ট থিয়েটার লিমিটেড্" কর্তৃক সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার স্বর্গীয় অপরেশচন্দ্রের "কর্ণার্জুন" নাটক অভিনয়ের আয়োজন-সংবাদে "কর্ণ" লেখা বন্ধ করিয়া "আলমগীর" প্রভৃতি অন্যান্য নাটক লিখিতে বাধ্য হয়েন ; কারণ, কর্ণ অভিনয় করিবার জন্য অন্যান্য রঙ্গালয়ের চাহিদা কমিয়া যায়।

'পরে তিনি বুঝিয়াছিলেন যে—নিজের মনোমত নাটক লিখিতে হইলে রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষের মুখ চাহিয়া বা তত্রস্থ অভিনেতা ও অভিনেত্রীর দিকে লক্ষ্য করিয়া লিখিতে গেলে চলিবে না। অথচ এইরূপ সর্বপ্রকার প্রভাবমুক্ত হইয়া একখানি নিজ মনোমত যথার্থ নাটক লিখিবার ইচ্ছা তাঁহার প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল।

'এই সময় তাঁহার সোদর প্রতিম অকৃত্রিম সুহৃদ নিমতিতার নাট্যকলা ও সাহিত্যানুরাগী জমিদার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী মহোদয়ের সাগ্রহ অনুরোধে ও অর্থানুকূল্যে ১৯২৪ সালে তিনি পুনরায় একাগ্রভাবে "কর্ণ" লেখা আরম্ভ করেন।

'গ্রন্থকার ১৭।১০।২৪ তারিখে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে কিছু অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম ; ইহা হইতেই নাট্যরসিকগণ নাট্যকারের নিজের উক্তিতেই "কর্ণ" নাটক লেখার ইতিহাস বুঝিতে পারিবেন।

"প্রিয় মহেন্দ্র ভাই,...তোমার কথামত সেই দৃশ্যগুলা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছি। তৃতীয় অঙ্ক সত্বর শেষ করিয়া পাঠাইতেছি।...আমি পুস্তক শেষ না করিয়া এখন কোথাও যাইতে পারিতেছি না। আমি এ'বার নিজের মনোমত করিয়া এই পুস্তক লিখিতেছি। অভিনয় হউক বা না হউক, কাহারও কোন suggestion লইতে ইচ্ছা নাই। এই পুস্তকই মনে

হইতেছে, আমার শেষ। দেহ স্বাভাবিক ভাবেই দিন দিন দুর্বল হইতেছে। এখন বিশেষ দুর্বল।

"কর্ণ" সম্বন্ধে বহুদিন হইতে যে একটা ধারণা পোষণ করিয়া আসিতে-ছিলাম, সেইটাই পরিস্ফুটরূপে প্রকাশ করিবার বাসনা। এক দৈব-নিগৃহীত পূর্ণ শক্তিধর মহাপুরুষের জীবন-কাহিনী। পয়সার জন্য তাহা কুণ্ঠিত করিতে ইচ্ছা নাই। কতকগুলা অর্বাচীনের মতের তলায় নিজের চিরপোষিত কল্পনাকে বিধ্বস্ত করিতে পারিব না। কেহ না লয়, তুমি কাছে রাখিও, তোমার ষ্টেজে (বাড়ীর) নিশ্চয়ই তা উপাদেয় হইবে। এই তৃতীয় অঙ্ক পাইলেই আমার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিবে। যখন বই ধরিয়াছি, এবার ইহাকে শেষ না করিয়া আমি অন্য বই লিখিতেছি না। কর্ণের মত আমিও এখন নিজেকে দৈব-নিগৃহীত বোধ করিতেছি। সুতরাং ভাই, তার চরিত্র-রহস্যই আমার এখন প্রিয় বোধ হইতেছে।"

'১৯২৫ সনে 'কর্ণ' নামেই এই নাটক রচনা সম্পূর্ণ হয়। ১৯২৬ সনে ইহার 'নর-নারায়ণ' নামকরণ করিয়া শিশিরকুমার ভাদুড়ীর প্রযোজনায় নাট্যমন্দির কর্তৃক তাহা সর্বপ্রথম অভিনীত হয়—শিশিরকুমার ইহাতে কর্ণের ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'ন।

'এই নাটক রচনার অব্যহিত পরই ক্ষীরোদপ্রসাদ "কৃষ্ণ" নামক একখানি নাটক রচনার সূত্রপাত করেন, কিন্তু আকস্মিক শোকাহত হইয়া তাহার রচনা পরিত্যাগ করেন এবং "নর-নারায়ণ" প্রথম অভিনীত হইবার ছয় মাসের মধ্যেই তিনি নিজেও পরলোক-গমন করেন। সুতরাং "নর-নারায়ণ"ই তাঁহার সর্বশেষ নাট্যরচনা।'

উপরে যে দীর্ঘ উদ্ধৃতিটি ব্যবহার করা হইল তাহার মধ্য হইতে কয়েকটি বিষয় বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট থাকিবার ফলে নাট্যকারকে যে তাঁহার স্বাধীনতা কি ভাবে বিসর্জন দিতে হয়, ক্ষীরোদপ্রসাদ তাঁহার জীবনের অন্তিম মুহূর্তে তাহা মর্মান্তিক ভাবে অনুভব করিয়াছিলেন। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে, ইতিপূর্বে স্বাধীন ভাবে তিনি কোন নাটক রচনা করিতে পারেন নাই, তাঁহার সকল নাটকই 'রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষের মুখ চাহিয়া তত্রস্থ অভিনেতা ও অভিনেত্রীর দিকে লক্ষ্য করিয়া' লিখিত হইয়াছে। তিনি এখানে অনুভব করিয়াছেন, যে 'পয়সার জন্য' 'কতকগুলা অর্বাচীনের মতের তলায় নিজের চিরপোষিত

কল্পনাকে বিধ্বস্ত' করা অসঙ্গত। ইহা তাঁহার জীবনের অন্তিম মুহূর্তের এক অকপট স্বীকারোক্তি। সুতরাং 'নর-নারায়ণ' নাটকখানি তাঁহার স্বাধীন ইচ্ছা প্রণোদিত রচনা বলিয়া ইহার মধ্যেই ক্ষীরোদপ্রসাদের পৌরাণিক নাটক রচনার সর্ববিষয়ক মৌলিক বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে।

কিন্তু এই সঙ্গে এ'কথাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ইহা তাঁহার জীবনের সর্বশেষ রচনা। ইহার মধ্য দিয়া তাঁহার স্বাধীন মনোভাবের অভিব্যক্তি যত স্পষ্ট হইয়াই উঠুক না কেন, ইহা তাঁহার সৃষ্টি-প্রতিভার মধ্যাহ্ন-দীপ্তিতে ভাস্বর হইয়া উঠিবার সুযোগ পায় নাই—ইহা তাঁহার জীবন ও প্রতিভার নিতান্ত অস্তমিত মুহূর্তের পরিচায়ক। সুতরাং ইহার মধ্যে তাঁহার একটি স্বাধীন বক্তব্য বিষয় হয়ত প্রকাশ পাইয়াছে, কিন্তু তাহা প্রকাশ করিবার ভঙ্গির মধ্যে প্রৌঢ় প্রতিভার বলিষ্ঠতা এবং রস-পরিচয়ের যে অভাব আছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

এ'কথা স্মরণ করিতে হইবে যে, 'নর-নারায়ণ' রচনা শেষ হইবার অব্যবহিত পরই ক্ষীরোদপ্রসাদ 'কৃষ্ণ' নামক নাটক রচনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহা আর সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। ইহার অর্থ এই যে, 'নর-নারায়ণ' রচনাকালেও কৃষ্ণ-ভাবে তাঁহার মন পরিপূর্ণ ছিল। কৃষ্ণ সম্পর্কে যে বক্তব্য তাঁহার এই নাটকে অবশিষ্ট ছিল, তাহাই তিনি তাঁহার নূতন নাটকে বলিতে চাহিয়াছিলেন। সুতরাং 'নর-নারায়ণ' নাটক কৃষ্ণভক্তিমূলক। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর পৌরাণিক নাটকের কৃষ্ণভক্তি প্রকাশের ধারা ও বিংশ শতাব্দীর পৌরাণিক নাটকের কৃষ্ণভক্তি প্রকাশের ধারা অভিন্ন ছিল না—সেইজন্য গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকের সঙ্গে ক্ষীরোদপ্রসাদের পৌরাণিক নাটকের কৃষ্ণভক্তির পার্থক্য দেখা যায়। ক্ষীরোদপ্রসাদের মধ্যে যুক্তিকে অনুসরণ করিয়া ভক্তির বিকাশ হইয়াছে, গিরিশচন্দ্রের মধ্যে অহৈতুকী ভক্তির বিকাশ দেখা যায়। 'নর-নারায়ণে'র মধ্যেও যে ভক্তির কথা আছে, তাহা যুক্তি-অনুসারিণী মাত্র, অহৈতুকী ভক্তির কথা এখানে স্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারে নাই। সেইজন্য নিতান্ত সহজ ভাবে অন্তর স্পর্শ করিতেও তাহা সার্থক হয় না। এই নাটকের প্রথমে কর্ণ নিরাকার ব্রহ্মবাদী। তাপস যখন কর্ণকে তাঁহার গোহত্যার জন্য অভিশাপ দিতে উদ্যত হইয়া বলিলেন যে, যাঁহার 'রক্ষিরূপে দেহধারী ভ্রমে নারায়ণ' তাঁহাকে বধ করিবার জন্য তিনি পরশুরামকে ছলনা করিয়া

অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিতে আসিয়াছেন, তখন কর্ণ তাঁহাকে ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন,—

বলে কি না, নারায়ণ নরদেহধারী!
দেহরক্ষী গাণ্ডীবীর! সর্বত্রগ,
অনির্দেশ্য কূটস্থ অচল যেই ব্রহ্ম—
আচ্ছাদন ক'রে আছে, অনন্ত ভুবন,
বলে কি না—
সে পশেছে চৌদ্দ পোয়া পঞ্জর-পিঞ্জরে।
মূর্খ—মুগ্ধ—ক্ষিপ্ত সে ব্রাহ্মণ!

কর্ণের এই নিরাকার ব্রহ্মবাদ যে কি ভাবে পরিণামে সাকার কৃষ্ণভক্তিতে পরিণত হইয়া গেল, তাহাই এই নাটকের বক্তব্য বিষয় ছিল, কারণ কর্ণ তাঁহার অন্তিম মুহূর্তে এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন—

বাসুদেব—বাসুদেব
একবার সম্মুখে দাঁড়াও নর!
সম্মুখে দাঁড়াও নারায়ণ!

পূর্বেই বলিয়াছি, ক্ষীরোদপ্রসাদ পরমহংসদেবের সহধর্মিণী শ্রীশ্রীসারদা দেবীর সাক্ষাৎ শিষ্য ছিলেন। এই সূত্রেই তিনি পরমহংসদেবের সাকার ব্রহ্মানুভূতির প্রেরণা অনুভব করিয়াছিলেন। এই নাটকের মধ্য দিয়া ইহাই তাঁহার নিজস্ব ও স্বাধীন কথা। গিরিশচন্দ্রের শেষ জীবনের পৌরাণিক নাটকগুলির মধ্যেও এই কথা নানা ভাবে বলা হইয়াছে। রামকৃষ্ণদেবের মতবাদ এ'দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার পর এই উক্তির মধ্যে নূতনত্ব কিছুই ছিল না। তবে ক্ষীরোদপ্রসাদ তাঁহার আর কোন পৌরাণিক নাটকের ভিতর দিয়া ইতিপূর্বে এই কথা বলেন নাই, ইহা তাঁহার পক্ষে নূতন কথা এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এই নাটকের দ্বন্দ্বটি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারে নাই; কারণ, ইহার মধ্যে প্রায় সকলেই একভাবে না একভাবে কৃষ্ণভক্ত—কেহ কৃষ্ণের নিরাকার ভাবে, কেহ বা সাকার ভাবে। যে দুইটি বিরোধী পক্ষ এখানে পরস্পর স্বার্থ লইয়া সংগ্রামে লিপ্ত, তাহাদের উভয়েরই মধ্যে কৃষ্ণভক্তির প্রকাশ দেখা যায়। সুতরাং কৃষ্ণ মাত্র পাণ্ডবের সখা নহে, কৌরবপক্ষীয় কেবলমাত্র

দুর্যোধন-দুঃশাসন ব্যতীত অন্যান্য সকলেরই ভক্তির পাত্র; এমন কি, শকুনিও কৃষ্ণভক্তি গোপন করিতে পারেন নাই। এই সার্বজনীন কৃষ্ণভক্তির মধ্যে স্বভাবতঃই নাটকীয় দ্বন্দ্বটি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবার সুযোগ পায় নাই; সেইজন্য ইহার ফলও কার্যকর বলিয়া অনুভূত হইতে পারে নাই। বিষয়টি একটি দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়া দিতে পারিলে আরও স্পষ্ট হইতে পারে।

ভীষ্ম এই নাটকে কেবলমাত্র কৃষ্ণভক্তই নহেন, অর্জুন এবং কৃষ্ণের অভিন্নত্বে বিশ্বাসী, তিনি বলিতেছেন—

শুন দুর্যোধন, আমার রহস্যকথা—
ধনঞ্জয়-বাসুদেব, মায়াতিমানব।
পূর্বদেহে দুই ঋষি নর-নারায়ণ।
এক-আত্মা—দ্বিধাভূত ভিন্নরূপে।
দুষ্কৃতের ধ্বংস তরে, ধর্মের রক্ষণে—
যুগে যুগে হন তাঁরা অবতার।
আমি শুনিয়াছি বেদবিৎ নারদের মুখে। ১।১

দ্রোণাচার্যও ভীষ্মের সকল বাক্যেরই সমর্থনকারী, এখানেও এ বিষয়ে তাঁহার ব্যক্তিত্বের কোন প্রকাশ দেখা যায় না। এমন কি, শকুনিও এই নাটকে তাঁহার কৃষ্ণভক্তি গোপন করিতে পারেন নাই। দুর্যোধন ও দুঃশাসন যখন শ্রীকৃষ্ণকে বন্ধন করিবার উদ্যোগ করিলেন, তখন তিনিও ভক্তি-বিগলিতচিত্তে বলিয়া উঠিলেন,—

ধীরে,—অতি ধীরে—
ওরে, নবনীত হ'তে
অতি যে কোমল-অঙ্গ তার।

পার্থ-সারথি কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে রথাশ্বের বল্গাধারী শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ যে বৃন্দাবনের যশোদা-দুলাল-সুলভ নবনীত-কোমল হইতে পারে না, তাহা বিস্মৃত হইয়াই শকুনি তাঁহার বাঙ্গালী বৈষ্ণব-সুলভ কৃষ্ণভক্তির প্রেরণায় এই কথা উচ্চারণ করিলেন। ইহার পর ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও বিদুরের কৃষ্ণভক্তির কথা উল্লেখ না করিলেও চলে।

একদিকে কৃষ্ণার্জুন ও অপরদিকে কর্ণ ইঁহাদেরই স্বার্থগত বিরোধের উপর এই নাটকের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করিবার যে অবকাশ ছিল, তাহাও কর্ণকে প্রায় প্রথম হইতেই কৃষ্ণানুরাগী বলিয়া কল্পনা করিবার ফলে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে। উপরিউদ্ধৃত কর্ণের কৃষ্ণসম্পর্কিত প্রথম উক্তিটি বাদ দিলে এই নাটকের

অন্যত্র প্রায় সর্বদাই কর্ণকে কোন না কোন ভাবে কৃষ্ণবিদ্বেষী অপেক্ষা কৃষ্ণ-ভক্তরূপেই চিত্রিত করা হইয়াছে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। এই নাটকের প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যেই বিশ্রাম কক্ষে বসিয়া কর্ণ এই প্রকার কৃষ্ণধ্যানে মগ্ন হইয়াছেন—

অন্তর্যামী বিভু নারায়ণ! বাসুদেব!
তুমি যদি সেই নারায়ণ, যদি এই
অসম্ভব সত্যই সম্ভব হয়—ওই
ক্ষুদ্র দেহের ভিতরে সত্যই যদি হে
বিরাট পশিয়া করে লীলা, এ অন্তরে
কি আছে আমার, সমস্ত অবশ্য জ্ঞান
তুমি। এই যে আমার দেহ-আবরণ—
এই বর্ম সহজাত, দেবের (ও) অচ্ছেদ্য—
এ ত পারিবে না—কোন মতে পারিবে না,
এ' হৃদয়ে তোমার দর্শনে দিতে বাধা!

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রারম্ভেও কর্ণ একদিন নিশীথশয্যায় শায়িত হইয়া নক্ষত্রা-লোকিত আকাশে কৃষ্ণরূপ প্রত্যক্ষ করিতেছেন—

ও কি ও সুন্দর, ও কি মধু-রূপ-রেখা!
ও কি বর্ণ নবীন নীরদ! ও কি আঁখি ও—
আয়ত মুখর! বাসুদেব—বাসুদেব—
এমন কিশোর তুমি?

কাহিনী যতই চরম সঙ্কটের শেষ মুহূর্তের পথে অগ্রসর হইয়া গিয়াছে, কর্ণের কৃষ্ণভক্তি ও কৃষ্ণবিশ্বাস ক্রমাগত ততই বাড়িয়াছে। সুতরাং নাট্যকার তাঁহার এই গ্রন্থখানি রচনা সম্পর্কেও যে উল্লেখ করিয়াছেন, 'কর্ণের মত আমিও এখন নিজেকে দৈব-নিগৃহীত বোধ করিতেছি'—এই কথাটি এখানে বিশেষ ভাবে স্মরণ করা যাইতে পারে। কর্ণচরিত্র আশ্রয় করিয়া নাট্য-কারের নিজস্ব জীবনের আধ্যাত্মিক উপলব্ধির পরিচয় যে এখানে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাই স্বীকার করিতে হয়। নাট্যকার এখানে সম্পূর্ণ আত্ম-নির্লিপ্ত হইয়া কর্ণচরিত্র সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। পরিণত জীবনের নিজস্ব আধ্যাত্মিক বোধ দিয়াই তাহা সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার ফলে চরিত্রটি নাট্যকারের মনোভাবের বাহন হইলেও মহাভারতের কর্ণচরিত্রের বিশিষ্ট মর্যাদা রক্ষায় ব্যর্থ হইয়াছে।

কৃষ্ণভক্ত ব্যতীত এই নাটকে কর্ণের অন্যান্য পরিচয়গুলির আভাস মাত্র থাকিলেও, তাহা খুব স্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারে নাই। ঘটোৎকচ বধে তাঁহার বীরত্বের একটি বর্ণনা আছে, তাহার প্রত্যক্ষ পরিচয় নাই—বিশেষতঃ ঘটোৎকচের মত যোদ্ধাকে পরাজিত করিয়া তাঁহার বীরত্ব কোন দিক দিয়াই যে গৌরবান্বিত হইতে পারে না, তাহাও বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং ইহার বর্ণনা যত ভয়ঙ্করই হউক, ইহাতে কর্ণের উপর শ্রদ্ধা বিশেষ বৃদ্ধি পাইবার কোন কারণ নাই। তবে কৃষ্ণ যখন কর্ণকে পাণ্ডবশিবিরে ফিরাইয়া লইয়া যাইবার জন্য চাহিলেন, তাহা প্রত্যাখ্যান করিবার পর শ্রীকৃষ্ণ এই বলিয়া তাঁহাকে সাধুবাদ দিয়াছেন—

> সদাব্রত, দানব্রত
> আদিত্য-নন্দন, রাধার বাৎসল্য স্মরি'
> এই যে করিলে তুমি ত্যাগ—পৃথিবীর আধিপত্য,
> আভিজাত্য—অস্তিত্ব তোমার এই যে হে
> নিক্ষেপ করিলে তুমি চির-অন্ধকারে—
> হে আর্য প্রণতি কবি বলি আপনারে,
> আজি হ'তে দান বাক্য
> চিরদিন সংযুক্ত রহিবে তব নামে।

রবীন্দ্রনাথ-রচিত কর্ণ-কুন্তী-সংবাদে যে বিস্তৃত মানবিক পটভূমিকার উপর কর্ণের এই সুমহান্ ত্যাগের কথা কীর্তিত হইয়াছে, এখানে তাহার সম্পূর্ণ অভাব বলিয়া কর্ণ-সম্পর্কিত শ্রীকৃষ্ণের এই কেবলমাত্র সাধুবাদ পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে না। কর্ণ-চরিত্রের মধ্যে নায়কোচিত ধীরতার অভাবও লক্ষিত হয়। তিনি নিজেই নিজের সম্পর্কে একস্থানে বলিয়াছেন—

> 'হীন, হীন' ব'লে নিত্য,
> ক'রেছিল বৃদ্ধ মোর মস্তিষ্ক চঞ্চল!
> কি এক অশুভক্ষণে আত্ম হারাইয়া
> করিনু প্রতিজ্ঞা—অস্ত্রত্যাগ রণস্থলে।

ক্রোধে আত্মহারা 'চঞ্চল মস্তিষ্ক' কর্ণ এই নাটকে তাঁহার মহাভারতোচিত পরিচয় বিসর্জন দিয়াছেন। কর্ণ এই নাটকে তত্ত্বসন্ধানী। নররূপী শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণ কি না, তাহাই এই নাটকের মধ্যে তিনি সন্ধান করিয়া শেষ পর্যন্ত তাহাই জানিতে পারিয়াছেন। সুতরাং তত্ত্বের দিকে স্থির লক্ষ্য থাকিবার

ফলে তত্ত্বাতিরিক্ত কোন পরিচয় তাহার মধ্যে স্ফূর্তি লাভ করিতে পারে নাই।

এই নাটকে কর্ণের বালক-পুত্র বৃষকেতুও পরম কৃষ্ণভক্ত। প্রথম দর্শনেই তাহার মুখে শুনিতে পাই—

হে গোবিন্দ, চারিদিকে লোকমুখে শুনি,
তুমি নাকি আসিতেছ হস্তিনা নগরে,
বড় ইচ্ছা দেখিব তোমারে। হে গোবিন্দ,
কেমনে দেখিব।

দুর্যোধন কৃষ্ণকে বন্ধন করিতে চাহেন শুনিয়া বৃষকেতু দ্রুতবেগে জননী পদ্মাবতীর নিকট ছুটিয়া গিয়াছে এবং পিতাকে এ কার্যে সাহায্য করিতে নিষেধ করিতেছে—

শুনিলাম বৃষকেতু মুখে,
বন্ধনের কথা শুনে, বালক ব্যাকুল
হ'য়ে ছুটে গেছে আমার নিকটে। বলে—
"মা, তুমি সত্বর যাও—পিতারে নিষেধ
কর।"—১।৪

পদ্মাবতীর কৃষ্ণভক্তির নিদর্শন এখানে উল্লেখ না করিলেও চলিতে পারে। এমন কি, কর্ণের তিরোধানেও তাঁহার মধ্যে যে আঘাতের বেদনা তীব্রতম হওয়াই স্বাভাবিক, তাহাও তাঁহার অন্ধ কৃষ্ণভক্তির জন্য হ্রাস পাইয়া গিয়াছে। শক্রসৈন্যের বিজয়োল্লাস শুনিতে পাইয়াও তিনি পুত্রকে এই বলিয়া অভয় দিতেছেন—

ভয় কি—ভয় কি—পাণ্ডব-উল্লাস রঙ্গে
উল্লাসে উঠুক নেচে হৃদয় তোমার।
ওরে বৎস, পিতা তব ত্রিজগত মাঝে
যেখানে যা ছিল তার, সমস্ত করিয়া
গেছে দান। অবশিষ্ট এক মাত্র তুমি।
আমি তোরে আগে হ'তে করিয়াছি কৃষ্ণে
সমর্পণ। উঠুক উঠুক ধ্বনি। কার
জয়—কার পরাজয়? আয় দেখে আসি—
মৃত্যু যেথা জীবনে করিছে আলিঙ্গন।

সুতরাং কর্ণের মত বীর চরিত্রের পতনে এই নাটকে যে ট্র্যাজিডি সৃষ্টি

হইবার অবকাশ ছিল, তাঁহার নিধন কার্যের সহায়ক শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহার স্ত্রীপুত্রের ঐকান্তিকী অন্ধভক্তির জন্য তাহা সম্ভব হইয়া উঠিতে পারে নাই। নরে নারায়ণ-বোধ ইহার ট্র্যাজিক রস নিবিড় হইয়া উঠিবার পথে দুরপনেয় বাধা সৃষ্টি করিয়াছে।

ক্ষীরোদপ্রসাদ ভীষ্ম সম্পর্কে একখানি স্বতন্ত্র নাটক রচনা করা সত্ত্বেও এই নাটকে ভীষ্মের চরিত্র যেমন যথাযোগ্য স্থান লাভ করিতে পারে নাই, তেমনই ইহা উচ্চ মর্যাদা লাভ করিতেও ব্যর্থকাম হইয়াছে। মহাভারতীয় চরিত্রের মধ্যে কর্ণের তুলনায় ভীষ্ম কোন অংশেই ন্যূন নহে। সুতরাং যে নাটকে কর্ণ এবং ভীষ্ম উভয় চরিত্রই বর্তমান, তাহাতে একজনকে বড় করিতে গিয়া আর একজনকে নীচু করিলে মহাভারতের মর্যাদা রক্ষা পায় না। ভীষ্ম বীর, স্বার্থত্যাগী, চিরকুমার, বৃদ্ধ পিতামহ,—তাঁহার মধ্যে যে হৃদয়ের ঔদার্য স্বাভাবিক, নাট্যকার তাহা হইতে তাঁহাকে এই নাটকে বঞ্চিত করিয়াছেন। কর্ণের সম্বন্ধে একটি কথাই ভীষ্ম সর্বদা বলিয়াছেন, দ্বিতীয় কোন কথা বলেন নাই, তাহা 'ও রে হীন সুতপুত্র।' যে নিজের পৌরুষের উপর নির্ভর করিয়া ক্ষাত্রগৌরব লাভ করিয়াছে, তাহাকে জন্ম কিংবা জাত তুলিয়া গালি দেওয়া যে নিতান্ত হীনতার পরিচায়ক, তাহা অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায়। ইহা যেন অমৃতলাল বসুর নাটকে নাপিত জজ হইয়াছে দেখিয়া তাহাকে জজ-নাপিত বলিয়া পরিহাস করিবার মত শুনায়। নাট্যকার ভীষ্মের মত চরিত্রকে এই নীচতা হইতে রক্ষা করিলেই ভাল করিতেন। এই নাটকে ভীষ্মের আর কোন মহত্ত্বের পবিচয় প্রকাশ পায় নাই।

এইবার কৃষ্ণের চরিত্রটি সম্পর্কে উল্লেখ করিতে হয়। এই নাটকে কৃষ্ণের নরত্ব অপেক্ষা নারায়ণত্বই অধিক প্রকাশ পাইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের নর-পরিচয় প্রকাশ করিবার গিরিশচন্দ্রের যে শক্তি ছিল, ক্ষীবোদপ্রসাদের তাহা ছিল না; বিশেষতঃ পরিণত বয়সে ক্ষীরোদপ্রসাদ কৃষ্ণের নারায়ণ রূপই ধ্যান করিয়াছেন, নর-রূপ প্রত্যক্ষ করিতে পারেন নাই। এই নাটকে তাহারই অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। 'গীতা'য় কুরুক্ষেত্রে অর্জুনকে বিশ্বরূপ দেখাইবার পুর্বেই এখানে শ্রীকৃষ্ণ হস্তিনা রাজসভায় দুর্যোধনকে বিশ্বরূপ দেখাইয়া ভয় দেখাইয়াছেন। এমন কি, নিজের সম্পর্কে এই তত্ত্ব-কথাও বলিয়াছিলেন—

আমি একা, চিরস্থিতি, আপনারে ঘেরে'
আমি বহু, মুক্তিরূপ, জগতের বন্ধন
ভিতরে। আমি অণু—
বন্ধন আমারে কভু খুঁজিয়া না পায়,
আমি মহৎ—ব'সে আছি বন্ধন সীমায়।
যেখানে র'য়েছি আমি, রয়েছে সেখানে
পাণ্ডব, অশ্বক, বৃষ্ণি—রয়েছে সেখানে
রবি, রুদ্র, বসু, ঋষিগণ,
র'য়েছে সেখানে ব্রহ্মা—ইত্যাদি ২।৩

মহাভারতের ঘটনা পারম্পর্যের বিচারে এখানে যেমন শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ প্রদর্শন অসঙ্গত, তেমনই এই নাটকে কৃষ্ণের এই আচরণ তাঁহার নরত্ব বিকাশেরও অন্তরায়। সেইজন্যই বলিয়াছি, এই নাটকে নারায়ণের যত প্রভাব, নরের প্রভাব তত অনুভব করা যায় না। এমন কি, দুই একটি ক্ষেত্রে এই অলৌকিক পরিবেশের মধ্যেও কৃষ্ণকে যে 'ননীচোর' (৩।১), 'নবনীত কোমল অঙ্গ' (২।২), 'বৃন্দাবন'-চারী, 'যশোদা-দুলাল' (২।৪), বলিয়াও উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা যেন স্থানকালের বিচারে নিতান্ত ঔচিত্যহীন বলিয়া বোধ হইবে। কিন্তু একটি স্থলে একটি মাত্র কথায় কৃষ্ণের মানবিকতার ক্ষীণতম একটু বিকাশ দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণকে সন্ধি হইতে নিবৃত্ত হইতে বলিতে গিয়া দ্রৌপদী নিজের অপমানের কথা স্মরণ করিয়া যখন কাঁদিয়া ফেলিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিলেন,

অনুরোধ করজোড়ে—কেঁদোনা কেঁদোনা
তুমি—ওগো প্রিয়তম-প্রিয়া!
এনো না আমারও চোখে জল।—১।২

এইখানেই শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে সামান্য একটুকু মানবিকতার বিকাশ দেখা যায়। কিন্তু এই নাটকে অনুরূপ নিদর্শন আর দ্বিতীয় নাই।

এই নাটকে একমাত্র উল্লেখযোগ্য স্ত্রীচরিত্র দ্রৌপদী। ইহাতে পাণ্ডবজননী কুন্তী একেবারেই অনুপস্থিত, গান্ধারী বৈশিষ্ট্যহীনা এবং পদ্মাবতী কৃষ্ণভক্ত, কৃষ্ণে সমর্পিত-প্রাণা। সুতরাং ইহাদের মধ্যে কোন নাটকীয় গুণ বিকাশ লাভ করিবার সুযোগ হয় নাই। কেবলমাত্র দ্রৌপদীর মধ্যেই একটু বিশেষত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। দ্রৌপদী চরিত্রের মহাভারতোচিত উচ্চ মর্যাদা রক্ষা পাইয়াছে। নিজের অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার

সংকল্প পরিত্যাগ করিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিতে তিনি অসম্মত। যুক্তি তর্ক তেজ বীর্য যখন তাঁহার নিঃশেষ হইল, তখন তিনি চোখের জলে শ্রীকৃষ্ণকে সন্ধি হইতে বিরত হইতে মিনতি করিলেন। ইহার ভিতর দিয়া তাঁহার অপমানের জ্বালা যে তাঁহার প্রতি মুহূর্তের জীবনকে কি প্রকার দুঃসহ করিয়া রাখিয়াছিল, তাহার কথাই ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। নাট্যকারের এই চেষ্টা যে ব্যর্থ হইয়াছে, তাহা বলা যায় না।

'কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ' প্রসঙ্গ নাট্যকার এই নাটক হইতে বাদ দিয়া তাহার পরিবর্তে তিনি 'কর্ণ-কৃষ্ণ-সংবাদ' ভিত্তি করিয়া বিষয়টি প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা এই নাটকের একটি গুরুতর ত্রুটি। রবীন্দ্রনাথের 'কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ' নাট্যকবিতা রচনার পর কর্ণের জীবন-ভিত্তিক যত নাটকই রচিত হইয়াছে, তাহাতে এই প্রসঙ্গ অনুসরণ করা হইয়াছে। হয়ত ক্ষীরোদপ্রসাদ তাঁহার পরিণত জীবনে শ্রীশ্রীমা সারদা দেবীর যে প্রসাদ লাভ করিয়াছেন, তাহার ফলে নারীচরিত্র সম্পর্কিত বিশেষ একটি আদর্শবোধ তাঁহার মধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছিল। সেইজন্য কুন্তীকে এই লজ্জার মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে আনিয়া উপস্থিত করেন নাই—কৃষ্ণ দ্বারা সেই কাজটি সম্পূর্ণ করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা যে কত বড় ভ্রান্তি, তাহা নাট্যকার বুঝিতে পারেন নাই। সকল লজ্জা সম্ভ্রম বিসর্জন দিয়া সন্তানের নিকট এইভাবে আত্মপরিচয় প্রকাশ করিবার মধ্যে গর্ভজাত সন্তানের প্রতি পাণ্ডব-জননীর যে স্বাভাবিক মাতৃস্নেহের প্রকাশ দেখা যায়, কৃষ্ণের মুখে সেই বৃত্তান্ত প্রকাশ করিবার মধ্যে তাহার শতাংশের একাংশও প্রকাশ পাইতে পারে নাই। বিশেষতঃ ইহাতে নাটকীয় চরিত্রের একটি বিশিষ্ট মানবিক গুণ বিকাশের যে সুযোগ পাওয়া যায়, তাহা কোন নাট্যকারের পক্ষেই পরিত্যাজ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। কিন্তু ইহার মধ্যেও রবীন্দ্রনাথের 'কর্ণ-কুন্তী-সংবাদে'র ভাষার প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়—

> কৃষ্ণ। নহে আর্য, লইতে এসেছি আপনারে।
> কর্ণ। কোথায় কোথায় কৃষ্ণ ?
> কৃষ্ণ। যেই স্থানে অনুতপ্তা জননী তোমার,
> ব'সে আছে তোমার মিলন প্রতীক্ষায়।
> হে আর্য, মিনতি মোর—
> ফিরে এ'সো নিজ গৃহে। অধিকার কর

তব—হে জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব, ধর্মানুমোদিত
সিংহাসন। যুধিষ্ঠির হ'ন যুবরাজ।
ভীমসেন শ্বেতছত্র ধরুন মস্তকে।
হ'ক ধনঞ্জয় তব রথের সারথি।
প্রতিদিবসের ষষ্ঠভাগে
আসুন দ্রৌপদী তব করিতে অর্চনা।
দুটি মাদ্রীসুত তব হোক্ অনুচর।

কৃষ্ণের মাধ্যমে এই কথা প্রকাশ করিবার সঙ্গে কুন্তীর নিজমুখে কর্ণের নিকট এ'কথা প্রকাশ করিবার কত পার্থক্য! পূর্বেই বলিয়াছি, পুত্রের নিকট জননীর এই কথা প্রত্যক্ষ প্রকাশ করিবার লজ্জা হইতে কুন্তীকে নাট্যকার এখানে পরিত্রাণ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু ইহা দ্বারা একটি বিশিষ্ট নাট্যগুণ বিসর্জিত হইয়াছে।

এই নাটকের মধ্যে যুধিষ্ঠির এবং অর্জুন উভয় চরিত্রই একটি বিষয়ের জন্য বিশেষ ভাবেই ক্ষুণ্ণ হইয়াছে—তাহা এই যে, নাট্যকার ইহাদের দুইজনের একটি কলহের বর্ণনা করিয়াছেন। এই কলহে উভয়েই উভয়কে নিন্দাবাদ করিয়াছেন। যে উদ্দেশ্যেই নাট্যকার এই নাটকে ইহার সংযোজন করিয়া থাকুন না কেন, ইহা দ্বারা দুইটি চরিত্রই ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। বিশেষতঃ ইহা মহাভারতীয় ঐতিহ্যের অনুসারী নহে বলিয়াও পাঠক মনকে আঘাত করে। তত্ত্বকথাকে প্রাধান্য দিতে গিয়া নাট্যকার একদিক দিয়া ঐতিহ্য এবং অন্যদিক দিয়া চরিত্রগুলির স্বাভাবিক মানবিক গুণের কথা বিস্মৃত হইয়াছেন। অর্জুন যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে বিবাদ করিয়া তাঁহার সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য 'স্বগুণ-কীর্তন' করিলেন,—কারণ, 'স্বগুণকীর্তন আত্মহত্যা হতে ভিন্ন নহে'—এই সকল নানা শাস্ত্রীয় কথায় এই নাটকের কোন কোন অংশ ভারাক্রান্ত হইয়া আছে। কর্ণের নিকট নরদেহধারী শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণত্বের প্রতিষ্ঠাই এই নাটকের উদ্দেশ্য ছিল। নাটকের প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে কর্ণ বলিয়াছেন,

পদ্মাবতী! আমিও শুনেছি ঋষিমুখে
ধনঞ্জয় বাসুদেব নর-নারায়ণ!
বিশ্বাস না করি,......

অবিশ্বাসী কর্ণের বিশ্বাস উৎপাদনই এই নাটকের লক্ষ্য। পরিপূর্ণ অবিশ্বাসকে জয় করিয়া এই বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠা হইলে ইহার যে শক্তি প্রকাশ

পাইত, কর্ণকে প্রথম হইতেই এই বিষয়ে সংশয়াচ্ছন্ন করিবার ফলে তাহার সেই শক্তি প্রকাশ পাইতে পারে নাই। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত তিনি যে শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণত্বে বিশ্বাস লাভ করিলেন, তাহা কৃষ্ণের কি আচরণ দেখিয়া করিলেন, তাহাও এই নাটকে খুব স্পষ্ট নহে। এই নাটকে কৃষ্ণের একটি মাত্র আচরণ যাহা প্রত্যক্ষ দেখা গিয়াছে, তাহা তাঁহার বিশ্বরূপ প্রদর্শন, তাহা অলৌকিক, কর্ণ তাহা নিজে দেখেন নাই, শুনিয়াছেন মাত্র। কর্ণের কথায় জানিতে পারা যায়, আর একটি যে আচরণের জন্য কৃষ্ণের নারায়ণত্বকে তাঁহার বিশ্বাস হইয়াছে, তাহা এই নাটকের নেপথ্যে ঘটিয়াছে। চতুর্থ অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে কর্ণ বলিতেছেন—

> 'কেন মরিল না, কেন মরিল না, কেন
> মরিল না ধনঞ্জয়? মিথ্যা কি আমার
> শিক্ষা? মিথ্যা কি ঋষির বাক্য? মৃত্যু নিজে
> পরশিতে ধনঞ্জয়ে হ'ল কি শঙ্কিত?
> না—না—ওকি দৃশ্য—অদ্ভুত, অচিন্ত্য!
> আর ত মানব বলা চলে না তোমায়
> বাসুদেব! দেবের (ও) যা সাধ্য বহির্ভূত,
> বাঁচাতে সখাতে তুমি, সে কার্য করিলে!

কিন্তু সেই কার্যটি যে যথার্থ কি, তাহা সম্পূর্ণই নেপথ্যে ঘটিয়াছে বলিয়া কেবলমাত্র কর্ণের মুখের এই বর্ণনা দ্বারা দর্শকগণ সম্যক বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। সুতরাং তাহার প্রভাবও কার্যকর হয় না। কর্ণের সঙ্গে সঙ্গে দর্শকেরও এই বিশ্বাস উৎপাদনের প্রয়োজন যে শ্রীকৃষ্ণ যথার্থই নরদেহধারী নারায়ণ। কিন্তু এই নাটক অনুসরণ করিয়া দর্শক নিজে ইহা যেমন সম্যক বুঝিতে পারে না, কর্ণেরও বিশ্বাস কি ভাবে যে উৎপন্ন হইল, তাহাও সুস্পষ্ট অনুভব করিতে পারে না। পৃথিবীর ধূলিমাটির উপর দিয়াই যে বৈকুণ্ঠের পথ, মানুষের পদানুসরণ করিয়াই যে দেবতার সন্ধান পাওয়া যায়, এই নাটকে তাহা স্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারিলে ইহার নাটকীয় আবেদন অধিকতর সার্থক হইত। 'নর-নারায়ণ' নাটকে 'নর' নাই, 'নারায়ণ'ই আছেন।

উপরের আলোচনা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, গীতিনাট্য, কিংবা রোমান্টিক নাট্য, এমন কি, ঐতিহাসিক নাটক রচনায়ও ক্ষীরোদপ্রসাদের

যে প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, পৌরাণিক নাটকে তাহা পাওয়া যায় না। 'নর-নারায়ণ' নাটক তাঁহার 'স্বাধীন' প্রেরণা অনুযায়ী রচনা করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াও ইহাকে সার্থক করিয়া তুলিতে পারেন নাই। সুতরাং অনেক সময় দেখা যায়, মঞ্চনির্দেশ অনুযায়ী রচিত নাটকও যেমন সার্থক হইতে পারে, তেমনই স্বাধীন রচনাও ব্যর্থ হইতে পারে। অন্ততঃ ক্ষীরোদপ্রসাদের 'নর-নারায়ণে'র ক্ষেত্রে তাহাই প্রমাণিত হয়। নাটকখানি রচনায় যে অমিত্র পদ্য ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাও শক্তিহীন। দুই একটি সঙ্গীত স্বরচিত।

অবিবাহিত হস্তিনাধিপতি শান্তনু সস্ত্রীক অতিথি-সৎকার করিবার উদ্দেশ্যে যে কি ভাবে বিবাহ করিয়াছেন, তাহার কাহিনী অবলম্বন করিয়া ক্ষীরোদ-প্রসাদের 'মন্দাকিনী' নাটক রচিত হয়। ইহা পৌরাণিক বৃত্তান্তের বর্ণনা মাত্র, নাটকের বিশিষ্ট কোন গুণ ইহাতে নাই।

বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের প্রারম্ভ হইতেই বাংলার ঐতিহাসিক বীর-চরিত্র অবলম্বন করিয়া নাটক রচনার যে প্রেরণা দেখা দিয়াছিল, 'প্রতাপাদিত্য' নাটক ক্ষীরোদপ্রসাদের এই বিষয়ক সর্বপ্রথম প্রয়াস। যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্য, খুল্লতাত বসন্তরায়ের সঙ্গে তাঁহার বিবাদ ইত্যাদি ঘটনা অবলম্বন করিয়া ইহা রচিত। ইহার বিশ বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ প্রতাপাদিত্যের বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া তাঁহার 'বৌঠাকুরাণীর হাট' নামক উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন, তবে রবীন্দ্রনাথের এই বিষয়ক নাটক 'প্রায়শ্চিত্ত' ইহার আরও অনেক পরে প্রকাশিত হয়। অতএব প্রতাপাদিত্যের কাহিনীর প্রথম নাট্যরূপ দিবার গৌরব ক্ষীরোদপ্রসাদেরই প্রাপ্য। নাটকখানি ঘটনা-ভারাক্রান্ত, কোন কোন স্থানে দৈব প্রভাবেরও পরিচয় পাওয়া যায়। প্রতাপাদিত্য-সম্পর্কিত কিংবদন্তীই ইহার অবলম্বন, তাঁহার সম্পর্কিত ঐতিহাসিক তথ্য তখন পর্যন্ত সুধীসমাজে অজ্ঞাত ছিল; অতএব ইহার ঐতিহাসিক মূল্য বিশেষ নাই।

ক্ষীরোদপ্রসাদের জনপ্রিয় নাটকগুলির মধ্যে 'রঘুবীর' অন্যতম। যদিও ইহার কাহিনী ইতিহাসের সঙ্গে ক্ষীণতম যোগসূত্রে আবদ্ধ, তথাপি ইহা ঐতিহাসিক নাটক বলিয়া নির্দেশ করা যায় না। ঐতিহাসিক নাটকের যাহা আদর্শ হওয়া উচিত, তাহা ইহাতে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। ইহার পরিকল্পনার মধ্যে নাট্যকার উচ্চশ্রেণীর কোন শিল্পচাতুর্যই দেখাইতে পারেন নাই। একটি

বৈচিত্র্যহীন কাহিনী যেন জোর করিয়া অতি-নাট্যিক পরিবেশের মধ্যে লইয়া স্থাপন করা হইয়াছে ; অতিরিক্ত রোমাঞ্চকর ঘটনার সমাবেশে ইহার কাহিনী ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। ১

গুজরাটের নবাব মামুদ শাহ জাফর নামক তাঁহার একজন পারিষদের হস্তে নিহত হন। জাফর অতঃপর গুজরাটের সিংহাসন অধিকার করিয়া লয়। জাফর একজন ফল ব্যবসায়ী রূপে এই রাজ্যে পদার্পণ করিয়াছিল।, একদিন নৌকাযোগে সে নর্মদা দিয়া যাইতেছিল, এমন সময় নদীতে ঝড় উঠিয়া তরণী নিমজ্জিত হয়। রঘুবীর একজন ভীল যুবক। সে জাফরকে মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করে। জাফর ক্রমে মামুদ শাহের বিশ্বাসভাজন হয় ও তাহারই সুযোগ লইয়া তাহাকে হত্যা করে। জাফর সিংহাসন অধিকার করিয়া মামুদ শাহের কন্যা পরিবানুকে লাভ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠে। পরিবানু তাহার পিতার একজন বিশ্বস্ত অনুচরের সঙ্গে পলাইয়া গিয়া অরণ্যে আশ্রয় লয় ; রঘুবীর তাহাকে আশ্রয় দেয়। রঘুবীরের ভগিনী শ্যামলীর সঙ্গে অরণ্যে পরিবানুর দিন কাটিতে থাকে। জাফর পরিবানুর সন্ধান পাইয়া তাহার সৈন্যবল লইয়া অরণ্য আক্রমণ করে। ভীলগণ প্রবল বিক্রমের সঙ্গে বাধাদান করিয়াও পরাজিত হইয়া আত্মসমর্পণ করে। জাফর পরিবানুকে ধরিয়া লইয়া যায়। রঘুবীরও বন্দী হয়। একদিন জাফর রঘুবীরের সম্মুখেই পরিবানুকে অপমানিত করিতে যাইতেছে দেখিয়া রঘুবীর অপূর্ব বীরত্ব দেখাইয়া নিজে মুক্ত হয় ও পরিবানুকে জাফরের কবল হইতে উদ্ধার করে। জাফর ক্রোধান্ধ হইয়া রঘুবীরের কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচরকে বন্দী অবস্থায় হত্যা করে। রঘুবীর জাফরকে বধ করিয়া তাহার প্রতিশোধ গ্রহণ করে। নিজের দুর্ভাগ্যের অন্তহীনতার কথা স্মরণ করিয়া পরিবানুও বিষপানে আত্মহত্যা করে।

এই নাটকের উদ্দেশ্য খুব সুস্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট হয় নাই। জাফর কর্তৃক পরিবানুকে লাভ করিবার দুরাকাঙ্ক্ষা-পোষণকে রূপ দেওয়াই যদি এই নাটকের উদ্দেশ্য হইয়া থাকে, তবে তাহাও বর্ণনার ত্রুটিতে কাহিনীর মধ্যে অত্যন্ত গৌণ হইয়া পড়িয়াছে। সেইজন্য কোন চরিত্রসৃষ্টিই ইহাতে পরিণতি লাভ করিতে পারে নাই। ইহার কাহিনী ইংরেজি '*Robinhood*' শ্রেণীর অ্যাড্‌ভেঞ্চারাস্‌ বা রোমাঞ্চকর উপন্যাসের অনুরূপ। নানা স্থান হইতে ইহার উপকরণ সংগ্রহ করা হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহা কাহিনীর মধ্যে পরিপাক

লাভ করে নাই। রঘুবীর নিজে ইংরেজি বটতলা উপন্যাসের নায়কের মত, তাহার ভগিনী শ্যামলী বঙ্কিমচন্দ্রের রচিত 'সীতারাম' উপন্যাসের শ্রী-চরিত্রের অনুকরণে রচিত, পরিবানুর বনবাস-জীবনের চিত্রও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের রাণা প্রতাপের বনবাস-জীবনেরই অনুরূপ। এই সমস্ত বিভিন্ন স্থান হইতে সংগৃহীত উপাদানগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপিত হয় নাই বলিয়াই রচনার দিক দিয়া ইহার কাহিনী অত্যন্ত শিথিল হইয়া পড়িয়াছে।

ইহার মধ্যে একমাত্র উল্লেখযোগ্য চরিত্র রঘুবীরের। তাহার মধ্যে একটি দ্বন্দ্ব ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। রঘুর পিতা ছিল একজন ভীল দস্যু। দস্যুবৃত্তি করিয়া সে প্রভূত অর্থ উপার্জন করিয়াছিল। কিন্তু একদিন মামুদ শাহর দেওয়ান অনন্ত রাও নামক একজন ব্রাহ্মণের সান্নিধ্যে আসিয়া তাহার চরিত্রের আকস্মিক পরিবর্তন হইয়া গেল ; সে ধর্মপথ অবলম্বন করিল। তাহার মৃত্যুর পর তাহার পুত্র রঘুবীরকে অনন্তরাও নিজের আদর্শেই মানুষ করিয়া তুলিল। দস্যুবৃত্তির পরিবর্তে তাহার মধ্যে পরোপকারবৃত্তি দেখা দিল। প্রতিহিংসা গ্রহণ করিবার প্রবৃত্তির পরিবর্তে তাহার মধ্যে ক্ষমাগুণ বিকশিত হইয়া উঠিল। জন্মগত সংস্কার ও শিক্ষাগত সংস্কারের মধ্যে তাহার যে দ্বন্দ্ব প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাই এই নাটকের একমাত্র গুণ। পরিণামে দেখা গেল, শিক্ষাগত সংস্কারের উপর জন্মগত সংস্কারই জয়ী হইয়াছে। কিন্তু কাহিনীর শেষাংশ প্রথমাংশের তুলনায় অপরিসর হওয়ার জন্য এই দ্বন্দ্বের পরিণতির দিকটা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারে নাই।

ইহা অতিনাট্যিক ঘটনায় পরিপূর্ণ এক বিয়োগান্তক নাটক হইলেও ইহার করুণ রস নিবিড় হইয়া উঠিবার সুযোগ পায় নাই। ইংরেজি এলিজাবেথীয় যুগের কোন কোন ঐতিহাসিক নাটকের মত ইহাতেও গুপ্ত ষড়যন্ত্র, হত্যার মন্ত্রণা, ঘাতক-চরিত্রের সমাবেশ ইত্যাদি সবই দেখিতে পাওয়া যাইবে, কিন্তু তথাপি ইহার ঘটনাগুলি একলক্ষ্যমুখীন না হওয়ার ফলে ইহাতে ঘটনার ঐক্য (unity of action) বিনষ্ট হইয়াছে। রঘুবীরের বীরত্ব অধিকাংশই একমাত্র বক্তৃতা ও ঐন্দ্রজালিক কৌশলদ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে, সেইজন্য নাটকের নায়ক চরিত্রই পাঠকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সমর্থ নহে। ইহার মধ্যে আর একটি চরিত্র ছিল, তাহার উপর পাঠকের সহানুভূতির উদ্রেক করা যাইত—তাহা পরিবানুর চরিত্র। কিন্তু তাহাকে রক্তমাংসে গঠিত চরিত্র বলিয়াই মনে হয় না। অতিরোম্যান্স-প্রিয়তা এই নাটকের একটি গুরুতর ত্রুটি।

এই নাটকের ভাষায় ক্ষীরোদপ্রসাদের পরিণত প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় না। ইহাতে গিরিশচন্দ্রের ভাঙ্গা ছন্দ, দ্বিজেন্দ্রলালের সতেজ গদ্য এবং কোন কোন স্থানে দুর্বল অমিত্র পয়ারের সঙ্গেও সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়; কিন্তু কোথাও লেখক কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। অতি-নাট্যিক ঘটনার সমাবেশ ও বিচিত্র দৃশ্য পরিকল্পনার গুণে ইহা সুলভ জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

সুপরিচিত পদ্মিনী উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া ক্ষীরোদপ্রসাদ 'পদ্মিনী' নামক একখানি নাটক রচনা করেন। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিপূর্বে এই বিষয় অবলম্বন করিয়া যে কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যেই দেশাত্ম-বোধের অঙ্কুর দেখা দিয়াছিল, ইহার মধ্যে তাহা আশানুরূপ বিকাশ লাভ করিতে পারে নাই। এমন কি, পদ্মিনীর বিষয়-বস্তু লইয়া ইতিপূর্বে দুই একখানি নাটকও রচিত হইয়াছিল, ক্ষীরোদপ্রসাদের 'পদ্মিনী' তাহা হইতে অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছে বলিয়া মনে হইবে না।

বাংলায় স্বদেশী আন্দোলন যখন তুমুলভাবে আত্মপ্রকাশ করিল, তখন বাঙ্গালীর দেশাত্মবোধের উপর ভিত্তি করিয়া ক্ষীরোদপ্রসাদ 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত' নামক একখানি ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেন। ইহা প্রকৃতপক্ষে পলাশীর যুদ্ধের পরিশিষ্ট মাত্র। ইহার ঘটনায় ও সংলাপে জাতীয়তাবোধক নানা তথ্য পরিবেশন করিবার দুঃসাধ্য প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায়।

রাজা নন্দকুমারের বিবরণ অবলম্বন করিয়া ক্ষীরোদপ্রসাদ একখানি দেশাত্ম-বোধক ঐতিহাসিক নাটক রচনা করিয়াছিলেন, ইহার নাম 'নন্দকুমার'। নন্দকুমারের চরিত্রের ভিতর দিয়া নাট্যকার বাঙ্গালীর সৎসাহস ও সত্যের মর্যাদারক্ষার জন্য আত্মবিসর্জনের সমুন্নত আদর্শ প্রচার করিয়াছেন। ঐতিহাসিক তথ্যনিষ্ঠা অপেক্ষা সে যুগে যে-কোন সূত্র অবলম্বন করিয়াই জাতীয়তাবোধ প্রচারের যে প্রবণতা দেখা গিয়াছিল, এই নাটকখানি তাহারই প্রমাণ। অতএব ইহা নন্দকুমার সম্পর্কিত কোন ঐতিহাসিক তথ্যের আকর বলিয়া মনে করা ভুল হইবে। ব্রিটিশ সরকার নাটকখানির প্রচার বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন।

ক্ষীরোদপ্রসাদের পরবর্তী ঐতিহাসিক নাটক 'অশোক'। গিরিশচন্দ্রের এই বিষয়ক নাটক প্রকাশিত হইবার দুই বৎসর পুর্বেই ইহা প্রকাশিত হইয়াছিল। অশোকের জীবন হইতে যথার্থ নাটকীয় অংশ উদ্ধার

করিয়া তাহার নাট্যরূপ দিবার প্রয়াস ক্ষীরোদপ্রসাদেরও সার্থক হয় নাই।

'চাঁদবিবি' ক্ষীরোদপ্রসাদের একখানি পূর্ণাঙ্গ ঐতিহাসিক নাটক। ইতিহাসের প্রতি ঐকান্তিক অনুরক্তির জন্যই 'চাঁদবিবি' নাটক হিসাবে নিকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। বিক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি অনেক স্থলেই নাট্য-কাহিনীর সঙ্গে অন্তরের যোগ স্থাপন করিতে পারে নাই; কতকগুলি বিচ্ছিন্ন ঐতিহাসিক তথ্য একটি কাহিনীর মধ্যে ঐক্যসূত্রে বন্ধন করিবার প্রয়াস এখানে সফল হয় নাই। আহমদনগরের সুলতান-কন্যা চাঁদ সুলতানার নাম ভারতে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। তাঁহার বীরত্ব ও অসম-সাহসিকতার কাহিনীই এই নাটকের উপজীব্য। মধ্যযুগের ভারতীয় ইতিহাস হইতে নারীর বীরত্বপূর্ণ কাহিনী অবলম্বন করিয়া ইতিপূর্বেই দ্বিজেন্দ্রলাল 'তারাবাই' নামক নাটক রচনা করিয়াছিলেন। 'তারাবাই' ও 'চাঁদবিবি' একই আদর্শ-প্রণোদিত। ফরাসী বীর-রমণী জোয়ান অব্ আর্কের কীর্তি ও তাঁহার জীবনের শোচনীয় পরিণতির সঙ্গে চাঁদবিবির কাহিনীর সামঞ্জস্য আছে। ক্ষীরোদপ্রসাদ দ্বিজেন্দ্রলালের 'তারাবাই' ও ফরাসী ইতিহাসের জোয়ান অব্ আর্কের চরিত্র অবলম্বন করিয়া তাঁহার 'চাঁদবিবি' নাটক রচনা করিয়াছিলেন। ঘটনার সমারোহে ইহার কাহিনীর মূলসূত্র কোথায় হারাইয়া গিয়াছে, তথাপি যথাসম্ভব তাহা উদ্ধার করা যাইতেছে—

আহমদনগরের সুলতান ইব্রাহিম শাহ্ বিলাসে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইয়া রাজকার্যে উদাসীন। তাঁহার উজীর মিয়ানমঞ্জু ও সর্দার এখ্লাস খাঁ পরস্পর আত্মকলহে মগ্ন। তাহাদের প্রতিবেশী রাজ্য বিজাপুরের সুলতানের নাম আদিল শাহ্। আদিল শাহ্ও বিলাসী ব্যক্তি। বিজাপুরের মৃত সুলতানের পত্নী চাঁদবিবিই প্রকৃতপক্ষে রাজ্যের রক্ষয়িত্রী। আহমেদনগর ও বিজাপুরের মধ্যেও আন্তরিক সদ্ভাব নাই। ইব্রাহিম শাহর উজীর মিয়ানমঞ্জু মোগলের বাধ্য হইয়া আহমদনগর মোগলের হাতে তুলিয়া দিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। সর্দার এখ্লাস খাঁর বিরুদ্ধতায় তাহা সম্ভব হইয়া উঠিতেছিল না। কোন কারণে আহমদনগর ও বিজাপুরের মধ্যে যুদ্ধ বাধিবার উপক্রম হইল। এই সুযোগে মোগলও আসিয়া আহমদনগর আক্রমণ করিল। প্রতিবেশী রাজ্য দুইটি নিজেদের দুর্বুদ্ধিতা বুঝিতে পারিয়া পরস্পর সৌহার্দ্য-সূত্রে আবদ্ধ হইল এবং উভয়েই সমবেতভাবে মোগল আক্রমণ প্রতিহত

করিবার চেষ্টা করিল। চাঁদবিবি মোগলের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে অসম্ভব বীরত্ব প্রদর্শন করিলেন, কিন্তু বিশ্বাসঘাতক মিয়ানমঞ্জুর অস্ত্রাঘাতে আহত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। ইব্রাহিম শাহ্‌ও যুদ্ধে নিহত হইলেন। তাঁহার বালক পুত্র বাহাদুরকে সিংহাসনে স্থাপন করিয়া মোগলেরা আহমদনগরের সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইল।

বিক্ষিপ্ত কতকগুলি ঐতিহাসিক তথ্যকে এই কাহিনীর মধ্যে আনিয়া সন্নিবিষ্ট করিবার ঔৎসুক্যে লেখক অনেকস্থলেই ইহার স্বচ্ছন্দ গতি রুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন, তথাপি মোটের উপর ঐতিহাসিক নাটক হিসাবে ইহার ক্রটি সামান্যই বলিতে হইবে। ঘটনার গতিশীলতা ও ঘটনা-সংঘটনের কাল-গত ঐক্যরক্ষায় ইহা ক্ষীরোদপ্রসাদের অন্যতম সার্থক নাটক। চাঁদবিবির চরিত্রই এই নাটকের নায়িকা চরিত্র বলিয়া কল্পিত হইয়াছে, তবে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, কাহিনীর মধ্যে চাঁদবিবির চরিত্রকে যতখানি প্রাধান্য দেওয়া উচিত ছিল, ততখানি প্রাধান্য ইহাতে দেওয়া হয় নাই। ইহার কারণ, পারি-পার্শ্বিক ঐতিহাসিক তথ্যগুলি গুছাইয়া লইতে নাট্যকারের সময় ব্যয়িত হইয়া গিয়াছে, তারপর যখন চাঁদবিবিকে আনিয়া রঙ্গমঞ্চে উপস্থাপিত করা হইয়াছে, তাহার পূর্বেই অন্যান্য চরিত্র দর্শকদিগের নিকট প্রাধান্য লাভ করিয়া গিয়াছে। অসংলগ্ন কতকগুলি ঐতিহাসিক ঘটনা দ্বারা চাঁদবিবির কার্যাবলী নিয়ন্ত্রিত হইবার জন্য তাঁহার চরিত্র স্ফূর্তিলাভ করিতে পারে নাই। তাঁহার চরিত্রের একমাত্র পৌরুষের দিকটা ইতিহাসে কীর্তিত হইয়াছে এবং তাহাই এই নাটকেও প্রতিফলিত হইয়াছে; কিন্তু চাঁদের স্বভাব-সুলভ নারীত্বের দিকটাও নাট্যকার ইচ্ছা করিলেও পরিস্ফুট করিয়া তুলিতে পারিতেন।

'চাঁদবিবি' নাটক স্ত্রীচরিত্র-প্রধান। কেবল যে চাঁদবিবি ইহার নায়িকা বলিয়াই এ কথা বলিতেছি, তাহা নহে; চাঁদবিবি ব্যতীতও যশোদা, মরিয়ম প্রভৃতি স্ত্রী-চরিত্রও ইহাতে অন্য যে-কোন পুরুষ-চরিত্র অপেক্ষাই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। ইহাতে কেন্দ্রীয় কোন পুরুষ-চরিত্র নাই, স্ত্রী-চরিত্রগুলিই ইহার ঘটনা-প্রবাহ নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে—পুরুষ-চরিত্রসমূহ তাহাদেরই ইঙ্গিতে পরিচালিত হইয়াছে মাত্র। নারীজীবনের সম্মুখে কর্মের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিবার পক্ষে এই নাটকখানি পরম সহায়ক হইতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহে'র প্রভাব ইহার উপরও সুস্পষ্ট অনুভব করা যায়। ইহার যশোদা চরিত্রটি 'রাজসিংহে'র নির্মলা চরিত্রের সম্পূর্ণ অনুরূপ।

'বাঙ্গালার মস্‌নদ' ক্ষীরোদপ্রসাদের অন্যতম প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক নাটক। স্বর্গীয় নিখিলনাথ রায় ও স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়দ্বয় লিখিত বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধীয় আলোচনা হইতে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে তথ্য সংগ্রহ করিয়া এই নাটকখানি রচিত হয়। বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস অবলম্বন করিয়া ইতিপূর্বেই গিরিশচন্দ্র ঘোষ 'মীরকাশিম' ও 'সিরাজুদ্দৌল্লা' নাটক প্রণয়ন করিয়াছিলেন, ক্ষীরোদপ্রসাদের 'বাংলার মস্‌নদ' বাংলার তৎপূর্ববর্তী ইতিহাস অর্থাৎ আলিবর্দীর বাংলা অধিকারের কাহিনী লইয়া রচিত হয়। ঘটনা-বিন্যাসের বৈচিত্র্যে, চরিত্র-সৃষ্টির কৌশলে, চিত্র-পরিবেশনের নিপুণতায় 'বাংলার মস্‌নদ' একটি উল্লেখযোগ্য রচনা। ইহার প্রথম সংস্করণের কতকগুলি ঐতিহাসিক ত্রুটি ইহার পরবর্তী সংস্করণেই লেখক কর্তৃক সংশোধিত হয়, ইহা কলিকাতার কয়েকটি রঙ্গমঞ্চে কিছুকাল নিয়মিত অভিনীত হয়।

মুর্শিদকুলি খাঁর দৌহিত্র সরফরাজ্‌ খাঁ। পিতা সুজা খাঁর মৃত্যুর পর মুর্শিদাবাদের নবাব হ'ন। কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আরম্ভ হয়। এই ষড়যন্ত্রের নেতা নবাবের উজির আহম্মদ ও আহম্মদের ভ্রাতা পাটনার নায়েব সুবেদার আলিবর্দী। এই ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্য আলিবর্দীকে বাঙ্গালার মস্‌নদে অধিষ্ঠিত করা। সরফরাজ খাঁ অত্যন্ত সত্যনিষ্ঠ ও চরিত্রবান্‌ নবাব ছিলেন। সেইজন্য ষড়যন্ত্রকারীদিগের কোন প্রকার প্রলোভনে তাঁহাকে বশীভূত করিবার চেষ্টা ব্যর্থ হইল। আলিবর্দীর কন্যা ঘেসেটি পিতৃব্যের নিকট মুর্শিদাবাদেই বাস করিত। সে নবাব-পত্নী রাবেয়ার উপর হিংসা-পরবশ হইয়া নবাবের চরিত্রে অন্যায় দোষারোপ করিল। কতকগুলি টাকার দায় হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য নবাবের হিন্দু ওমরাও ফতেচাঁদ জগৎশেঠও নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইল। আলিবর্দী পাটনায় বহু সংখ্যক সৈন্য হস্তগত করিলেন এবং মুর্শিদাবাদ হইতে ভ্রাতার প্ররোচনায় ঐ সৈন্য লইয়া নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। নবাব যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না; যুদ্ধের জন্য তাঁহার ইচ্ছাও ছিল না। তিনি সুদৃঢ়ভাবে কর্তব্য পালন করিতে অক্ষম ছিলেন। অতি সহজেই তাঁহার প্রধান উজির আহম্মদের বিশ্বাসঘাতকতায় আলিবর্দীর সৈন্য নবাবের সৈন্যকে পরাজিত করিল। নবাব যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিলেন। বাংলার মস্‌নদ আলিবর্দীর অধিকারে আসিল।

আলিবর্দীর দুরভিসন্ধি-সফলতার কাহিনী লইয়াই যদিও এই নাটক রচিত হইয়াছে, তথাপি ইহার নায়ক আলিবর্দী নহেন, সরফরাজ খাঁই ইহার নায়ক। আলিবর্দীর সাফল্যে তাঁহার ব্যক্তিগত বুদ্ধিচাতুর্য ও ষড়যন্ত্রকারিতা বিশেষ সক্রিয় করিয়া তুলিবার চেষ্টা হয় নাই। তাহার সাফল্য যেমন একদিকে সরফরাজের দৌর্বল্যের উপর নির্ভর করিয়াছে, তেমনই অন্যদিকে তাহা দৈব-প্রেরিত বলিয়াও মনে হইবে। সেইজন্য এই নাটকে আলিবর্দীর ব্যক্তিত্ব তেমন ফুটিয়া উঠিবার অবকাশ পায় নাই। কিন্তু ইহাতে প্রতিনায়কের অংশ গ্রহণ করিয়াছে আলিবর্দীর ভ্রাতা আহম্মদ। আহম্মদই এই শোচনীয় বিয়োগান্তক নাট্যকাহিনীর খল-চরিত্র (villain)। আলিবর্দী এই ভ্রাতার হাতের ক্রীড়নক মাত্র।

এই নাটকের নায়ক নবাব সরফরাজ খাঁ। তাঁহার চরিত্রসৃষ্টিতে লেখককে নিষ্ঠার সঙ্গে ঐতিহাসিক আদর্শই অবলম্বন করিতে হইয়াছে; এই সম্বন্ধে ব্যক্তিগত কোন ধারণা লইয়া তিনি অগ্রসর হইয়া যান নাই। তাহার ফলে নাট্যকার সরফরাজের চরিত্রে বাহিরের দিক হইতে সংগৃহীত স্বতন্ত্র উপাদানের সহযোগিতায় নাট্যিক দ্বন্দ্ব সুস্পষ্টভাবে ফুটাইয়া তুলিবার অবকাশ পান নাই। ঐতিহাসিক নাটক রচনা করিবার এই বিশেষ একটি দায়িত্ব সম্বন্ধে অবহিত হইতে গিয়া লেখককে এই চরিত্রটির বৈচিত্র্য বিনষ্ট করিতে হইয়াছে। সরফরাজ খাঁ নিজের বিরুদ্ধে সকল ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে অবহিত থাকিয়াও তাহাদের প্রতিকারকল্পে কোন সুদৃঢ় ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন না। কর্তব্যপালনের দায়িত্ব সম্বন্ধে দৃঢ়চিত্ততার অভাবই তাঁহার চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য ছিল। অথচ সরফরাজ খাঁ নির্বোধ ও বিলাস-প্রিয় নবাব নহেন। তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও সদভিপ্রায় তাঁহার জীবনে কোন ভাবেই কার্যকর হইয়া উঠিতে পারিল না, ইহাই এই করুণ বিয়োগান্তক নাটকের বক্তব্য হইয়া রহিল।

ইহার পরই এই নাটকের আর একটি চরিত্র উল্লেখযোগ্য। তাহা ভাগ্য-বিড়ম্বিতা নবাব-পত্নী রাবেয়ার চরিত্র। বঙ্কিমচন্দ্র-রচিত 'চন্দ্রশেখরে'র দলনী বেগমের চরিত্রের উপর নির্ভর করিয়া এই চরিত্রটি পরিকল্পিত হইয়াছে বলিয়া সুস্পষ্ট অনুভূত হয়। কিন্তু এই অনুকরণ সার্থক হয় নাই। স্বামীর প্রেম ও বিশ্বাস দলনীর জীবনে শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ন ছিল, একমাত্র নিয়তি তাঁহাদের জীবনের মধ্যে দুরপনেয় বাধার সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু সরফরাজের উদারতা হইতে বেগম রাবেয়া সর্বদা বঞ্চিত হইয়াছে; এমন কি, যে-ক্রোধ

নবাব সরফরাজের অন্যত্র সর্বদাই নিষ্ক্রিয়, কেবল বেগমের সম্পর্কে আসিয়াই তাহা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে। নিজের সন্তানের জননীকে তিনি অন্যের বাধাদান সত্ত্বেও প্রাসাদ হইতে সাধারণ অপরাধিনীর মত নিরাশ্রয়ে বিসর্জন দিলেন। রাবেয়ার প্রতি নবাবের ব্যবহার অস্বাভাবিক ও অসঙ্গত হইয়াছে বলিয়াই চরিত্রটি সহজ স্ফূর্তি লাভ করিতে পারে নাই। এই নাটকের অন্যতম প্রধান স্ত্রী-চরিত্র মালেকা। কিন্তু এই চরিত্রটির উদ্দেশ্য সুপরিস্ফুট হয় নাই। ঐতিহাসিক কাহিনীর মধ্যে এই শ্রেণীর চরিত্র-পরিকল্পনার বিশেষ কোন সার্থকতাও নাই। মালেকা আদ্যোপান্ত রহস্যাবৃত; এই রহস্যের উচ্ছেদও সহজ-সাধ্য নহে।

এই নাটকের নিবিড় ঐতিহাসিক অতি-নাট্যিক ঘটনারাশির এক ক্ষুদ্র অবসরে নাট্যকার তদানীন্তন সমাজের শান্তি ও সমৃদ্ধির যে একটি চিত্রের ইঙ্গিত দিয়াছেন, তাহা এই ঘটনা-ভারাক্রান্ত নাটকের মধ্যে একটি পরম রমণীয় অবকাশ (relief) রচনা করিয়াছে। ছদ্মবেশী নবাব একদিন ভাগীরথী-তীরে ভ্রমণ করিতে করিতে পল্লী-রমণী-কণ্ঠনিঃসৃত এই অপূর্ব সঙ্গীত শুনিতে পাইলেন—

> এস সোনার বরণী রাণী গো শঙ্খ কমল করে।
> এস মা লক্ষ্মী, বস মা লক্ষ্মী, থাক মা লক্ষ্মী ঘরে॥
> গাছে গাছে দেছ ভারে ভারে ফল, মাঠে মাঠে দেছ ধান।
> গোষ্ঠে গোষ্ঠে সুশীলা কপিলা দুধের নদীতে তুলেছে বান॥
> টলমল করে নদীর জল, ধুয়ে নেছ জ্বর-জ্বালা।
> তোমারই যতনে সাজান রতনে পরেছো ডিঙ্গার মালা॥
> সদা দুধে ভাতে রাখগো, অচলা হইয়ে থাকগো;
> তোমারই অন্ন অন্নপূর্ণা দিব মা তোমারি করে,
> সাজাব তোমার সোনার অঙ্গ সোনারি কমল হারে॥—১ম অঙ্ক, ৬ষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

এই নাটকের মধ্যে চরিত্রের বড় আধিক্য দেখিতে পাওয়া যাইবে। কাহিনী কোন রকম খর্ব না করিয়াও ইহা হইতে স্বচ্ছন্দে কতকগুলি চরিত্র বর্জন করা যাইত। কতকগুলি ঘটনারও বিশেষ কোন সার্থকতা নাই। কোন কোন স্থানে দীর্ঘ বর্ণনামূলক স্বগতোক্তি বিরক্তির উৎপাদন করিলেও 'বাংলার মসনদে'র ভাষা নির্দোষ ও বিষয়বস্তুর গৌরব-রক্ষায় সার্থক। কেবল ঐতিহাসিক ঘটনা-পরম্পরা বর্ণনা করিয়া নবাবের পরাজয় নির্দেশ করাই এই নাটকের উদ্দেশ্য নহে। বাংলার মসনদের উপর ভগবানের অভিশাপ যে

চির-সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে, এই মর্মান্তিক সত্যনির্দেশই এই নাটকের উদ্দেশ্য। ভারতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ প্রদেশ এই বাংলার মস্‌নদের প্রতি লোভও সকলেরই দুর্নিবার। যে বাংলার মসনদ একবার স্পর্শ করিয়াছে, সেই যেন কার অভিশাপে বিনষ্ট হইয়াছে ; যে ইহার প্রতি লোভ করিয়াছে, সে ইহা লাভ করিয়াও শান্তি পায় নাই। এই বাংলার মস্‌নদকে ঘিরিয়া ষড়যন্ত্র ও অবিশ্বাস যেন আপনা হইতেই গড়িয়া উঠে। সেইজন্য বাংলার মস্‌নদের অধিকারী অপেক্ষা পর্ণকুটীরবাসী ভিক্ষুকেরও জীবন অধিকতর শান্তিপূর্ণ। নিষ্পাপ সরল সত্যনিষ্ঠ নবাব সরফরাজের পরিণতিও এই মর্মান্তিক সত্যেরই নির্দেশ দেয় ; সুতরাং এই নাটকের কাহিনী এত করুণ ও মর্মস্পর্শী।

মধ্যযুগের ঐতিহাসিক পটভূমিকায় এক কল্পিত বিবরণ অবলম্বন করিয়া ক্ষীরোদপ্রসাদের 'খাঁ জাহান' নাটক রচনা করেন। ইহাতে খাঁ জাহানের আত্মাভিমান, সোফিয়ার সৌন্দর্যের অভিমান এবং নারায়ণের জাত্যভিমান অবলম্বন করিয়া দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করা হইয়াছে। সোফিয়া ও নারায়ণের প্রেমের করুণ পরিণতি বর্ণনা ইহার বিষয়। ইহাদের চারিত্রিক দৃঢ়তা নাটকটির একটি বিশিষ্ট গুণ।

রাজপুত ইতিবৃত্তের এক ক্ষীণ চিত্র অবলম্বন করিয়া ক্ষীরোদপ্রসাদ 'আহেরিকা' নামক একখানি নাটক রচনা করেন। রাজপুতদিগের মধ্যে আত্মকলহ ও পরিণামে তাহাদের মিলনের বৃত্তান্তই ইহার অবলম্বন। ইহা অতিরিক্ত রোমাণ্টিক ঘটনায় ভারাক্রান্ত।

গিরিশচন্দ্র বাংলা নাট্যসাহিত্যের মধ্যযুগে মহাপুরুষের জীবন-চরিত অবলম্বনে যে চরিত-নাটক রচনার ধারা প্রবর্তিত করেন তাহা অবলম্বন করিয়া ক্ষীরোদপ্রসাদ 'রামানুজ' নাটক রচনা করেন। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রবর্তক ও শ্রীসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা দক্ষিণাপথের বৈষ্ণবাচার্য রামানুজ-চরিত্রই ইহার অবলম্বন। ইহার মধ্যে তত্ত্বকথা থাকিলেও রসের অভাব আছে।

রাঠোর বংশের বৈষ্ণবগণ বাংলাদেশে বসবাস করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন, তাহারই কাল্পনিক বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া ক্ষীরোদপ্রসাদ তাঁহার 'বঙ্গে রাঠোর' নাটক রচনা করেন। ঐতিহাসিক পটভূমিকায় ইহা রোমাণ্টিক রচনা। পূর্বেই বলিয়াছি, ক্ষীরোদপ্রসাদের অধিকাংশ ঐতিহাসিক নাটকই এই শ্রেণীর। তবে ইহার মধ্যে ঐতিহাসিক ঘটনা অপেক্ষা অন্তর্মুখী ভাবই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।

ক্ষীরোদপ্রসাদের 'আলমগীর' ঐতিহাসিক পটভূমিকায় রচিত কল্পনার এক অপূর্ব রূপমহল। ইহাতে মোগল সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের জীবনের যে চিত্র পরিবেশন করা হইয়াছে, তাহা অন্তরের দিক দিয়া যেমন সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব-মূলক, তেমনই বাহিরের দিক দিয়াও অনুপম রসোজ্জ্বল। তবে আওরঙ্গজেবের অন্তর্মুখী জীবনই ইহার মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে ; তাহার ফলে মনে হয়, যেন নাটকের আঙ্গিক দ্বারা এখানে উপন্যাস রচিত হইয়াছে। আওরঙ্গজেবের চরিত্রের এই দিকটি বাঙ্গালী দর্শকমনকে সহজেই আকৃষ্ট করিয়াছিল। ইহার মধ্যে ঘটনার জটিলতা থাকিলেও তাহাতে মূল কাহিনী কোথাও লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া যায় নাই। ইহার উদিপুরী বেগমের চরিত্রটি আলমগীর চরিত্রের অন্তর্বিশ্লেষণের অবলম্বন মাত্র—কোন স্বাধীন নাটকীয় চরিত্র নহে। ইহা আশ্রয় করিয়াই আওরঙ্গজেবের অন্তর্দ্বন্দ্বের পরিচয়টি বাহিরে প্রকাশ পাইয়াছে। এই চরিত্রটির পরিকল্পনায় নাট্যকারের উচ্চাঙ্গের কল্পনা-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। আলমগীরের অন্তর্দ্বন্দ্বের নাটকীয় পরিচয়ের কথা বাদ দিলে ইহার অন্যান্য অংশে উল্লেখযোগ্য নাটকীয় গুণ বিশেষ কিছু নাই। ইহার মধ্যে ঘটনার অসম্ভাব্যতা একটি প্রধান ত্রুটি।

রত্নেশ্বরের মন্দিরকে কেন্দ্র করিয়া স্থানীয় ভূম্যধিকারীদিগের মধ্যে কলহ হয়, তাহারই কিংবদন্তী অবলম্বন করিয়া ক্ষীরোদপ্রসাদ 'রত্নেশ্বরের মন্দির' নাটক রচনা করেন। দুই একটি চরিত্র-সৃষ্টিতে ইহাতে সামান্য কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া গেলেও ইহা বিশেষত্ব-বর্জিত রচনা।[১]

———

তৃতীয় অধ্যায়

১৮৯৫—১৯১৩

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের মধ্যেই নাট্যসাহিত্যের আধুনিক যুগের সকল বৈশিষ্ট্য পরিপূর্ণ মাত্রায় প্রকাশ পাইয়াছে। রচনার আঙ্গিক, ভাষা ও ভাবের দিক হইতে তিনি বাংলা নাটকের মধ্যে সম্পূর্ণ নূতনত্বের সৃষ্টি করিলেন, বাংলা নাট্যসাহিত্যের মধ্যযুগের ধারার সঙ্গে তিনিই সুস্পষ্ট বিচ্ছেদ স্থাপন করিলেন। এ'কথা সত্য যে ক্ষীরোদপ্রসাদের মত তিনিও উনবিংশতি শতাব্দীর শেষ দশকের মধ্যভাগ হইতেই নাটক রচনার সূত্রপাত করিয়াছিলেন, কিন্তু যে কয়খানি মাত্র তাঁহার অকিঞ্চিৎকর প্রহসন সে সময় রচিত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্য দিয়া নাট্যকার হিসাবে দ্বিজেন্দ্রলালের কোন পরিচয়ই প্রকাশ পাইতে পারে নাই। দ্বিজেন্দ্রলাল 'হাসির গানের রাজা' হওয়া সত্ত্বেও প্রহসন রচনায় কোনও মৌলিক কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই; সেইজন্য প্রহসনগুলির মধ্যে তাঁহার প্রকৃত কোন পরিচয় প্রকাশ পায় নাই। যে সকল নাটকের ভিতর দিয়া তাঁহার মৌলিক প্রতিভার প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের মধ্যে রচিত হইয়াছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার এই যুগের কোন রচনায় পূর্ববর্তী যুগের সঙ্গে যোগ রক্ষা করিতে যান নাই; অতএব বাংলা নাট্যসাহিত্যের আধুনিক যুগ সুস্পষ্ট ভাবে তাঁহাকে অবলম্বন করিয়াই সূত্রপাত হইয়াছিল বলিয়া ধরিয়া লইতে পারা যায়।

দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যরচনা প্রধানতঃ চারিটি ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে; যেমন প্রহসন, নাট্যকাব্য, ঐতিহাসিক নাটক এবং সামাজিক নাটক। ইহাদের মধ্যে ঐতিহাসিক নাটক রচনাতেই তাঁহার সর্বাধিক কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। পূর্বে বলিয়াছি, বিংশতি শতাব্দীর প্রথম দশক ঐতিহাসিক নাটক রচনারই যুগ। দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার রচনায় এই যুগ-বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণরূপে অবলম্বন করিয়াই যশোলাভ করিয়াছেন। বাংলার সমসাময়িক স্বদেশী

আন্দোলনের ভাবাদর্শ তাঁহার নাটকের মত আর কাহারও নাটকে এমন তীব্র ও প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশ পায় নাই। সমসাময়িক কালে দ্বিজেন্দ্রলালের ব্যাপক লোকপ্রিয়তার ইহাই অন্যতম কারণ।

কিন্তু যে প্রহসন-রচনার মধ্য দিয়া দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যরচনার সূত্রপাত হইয়াছিল, তাহার ভিতরে তিনি কোনও কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। তাঁহার প্রহসনের একমাত্র আকর্ষণ তাঁহার স্বরচিত হাসির গানগুলি—ইহাদের ঘটনা-সংস্থাপনাও নহে, কিংবা বিষয়বস্তুও নহে। তদানীন্তন বাংলার নাগরিক সমাজের অবস্থা অবলম্বন করিয়াই তাঁহার প্রহসন কয়খানি রচিত, কিন্তু ইহাদের রচনায় তাঁহার যেমন কোন উচ্চ শিল্পগুণের পরিচয় পাওয়া যায় না, তেমনই ইহাদের মধ্য দিয়া তাঁহার বিশিষ্ট কোন জীবনবোধও প্রকাশ পায় নাই। ব্যঙ্গই ইহার লক্ষ্য। তিনি নিজের জীবনে রক্ষণশীল সমাজ কর্তৃক লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন, তাঁহার অধিকাংশ প্রহসনের মধ্যেই সেইজন্য রক্ষণশীল মনোভাবের উপর অসহিষ্ণু আক্রমণের পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। নিজেকে বাদ দিয়া তিনি সমাজকে ভাবিতে পারিতেন না। যে আত্মচেতনা তাঁহার অধিকাংশ নাটকেরই বৈশিষ্ট্য, প্রহসনগুলিও তাহার প্রভাব হইতে মুক্ত নহে। নিম্নের আলোচনা হইতেই ইহাদের কয়েকটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যাইবে।

দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম প্রহসন 'কল্কি-অবতার'; ইহার সম্পূর্ণ নাম 'সমাজ-বিভ্রাট ও কল্কি-অবতার।' ইহার বিষয়-বস্তু সম্পর্কে নাট্যকার ভূমিকায় উল্লেখ করিয়াছেন, 'বর্তমান সমাজের চিত্র সম্পূর্ণ করিবার জন্য সমাজের সর্বশ্রেণীর অর্থাৎ পণ্ডিত, গোঁড়া, নব্যহিন্দু, ব্রাহ্ম, বিলেতফেরত এই পঞ্চসম্প্রদায়ের চিত্রই অপক্ষপাতিতার সহিত এই প্রহসনের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।' ইহার মধ্যে আনুপূর্বিক একটি সুসংবদ্ধ কাহিনী নাই, কতকগুলি বিচ্ছিন্ন ও অতিরঞ্জিত চিত্রের সমাবেশেই ইহা রচিত। ইহার শিথিলবদ্ধ কাহিনীটি অনুসরণ করিতে পাঠকের যাহাতে কোনও বেগ পাইতে না হয়, সেজন্য নাট্যকার ইহার ভূমিকায় কাহিনীটির একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়াছেন। ইহার হাস্যরস সম্পর্কে দ্বিজেন্দ্রলাল নিজেই প্রস্তাবনায় উল্লেখ করিয়াছেন,

> হাস্‌তে গেলে ভাই,
> (এ নাটকের উদ্দেশ্যটা অনেকটা তাই)
> 'এটা বাচালতা,' 'ও'টা মিছে কথা,'

এ'রকম 'বাছবিচার' কর্তে কিছু নাই ;
দরকার হয়ত একটু রং দেওয়াও চাই।

দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার সকল প্রহসনেই অক্ষরে অক্ষরে এই কথা কয়টি পালন করিয়াছেন। এই প্রহসন সম্পর্কে দ্বিজেন্দ্রলাল যদিও ভূমিকায় উল্লেখ করিয়াছেন যে, 'কোন চরিত্র কাহাকেও লক্ষ্য করিয়া রচিত হয় নাই,' তথাপি পঞ্চম দৃশ্যে শশধর অর্থাৎ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত-সমাজের প্রতিনিধি শশধর তর্কচূড়ামণির নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

এই প্রহসনখানির ভিতর দিয়া নাট্যকার তৎকালীন কলিকাতার নাগরিক সমাজের একটি নিরপেক্ষ চিত্র পরিবেশন করিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও কোন কোন গোষ্ঠীর প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ তিনি গোপন রাখিতে পারেন নাই। এই প্রহসনের ভাষায় একটু বৈচিত্র্য আছে ; ইহা পদ্য, কিন্তু নাট্যকার ভূমিকায় উল্লেখ করিয়াছেন, 'পদ্যগুলি অবিকল গদ্যের মত করিয়া পড়িতে হইবে। যদিও ছত্রে ছত্রে মিল আছে, সে মিলের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া পড়িয়া যাইতে হইবে।' পাঠকের পক্ষে ইহা এক নূতন অভিজ্ঞতা সন্দেহ নাই।

'বিরহ' দ্বিজেন্দ্রলালের সুসংবদ্ধ কাহিনীযুক্ত প্রহসন—ইহা কেবলমাত্র কতকগুলি বিচ্ছিন্ন চিত্রের সমাবেশে রচিত নহে। যদিও ইহার কাহিনীর মধ্যে বিশেষত্ব কিছুমাত্র নাই—এক প্রৌঢ় ও তাহার তৃতীয় পক্ষের পত্নীর দাম্পত্য জীবন অবলম্বন করিয়া ইহা রচিত—তথাপি ইহার মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলালের আনুপূর্বিক একটি কাহিনী-পরিকল্পনার প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার কাহিনীর মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল নূতন কোনও উপকরণের সন্ধান দিতে পারেন নাই, প্রৌঢ় ও তরুণীর দাম্পত্য জীবনে হাস্যরস সৃষ্টির নিতান্ত গতানুগতিক উপকরণই ইহাতে ব্যবহৃত হইয়াছে ; অবিশ্বাস, সন্দেহ, ভ্রান্তি ও পরিণামে তাহাদের নিরসন ইত্যাদির বিবরণ ইহাতে অত্যন্ত লঘুপরিবেশের ভিতর দিয়া পরিবেশন করা হইয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলালের অন্যান্য প্রহসনের মত ইহাতে শ্লেষ বা ব্যঙ্গের ভাব নাই ; ইহার হাস্যরসে কোন জ্বালা নাই, সেইজন্য রসসৃষ্টির দিক দিয়া ইহা সার্থক বলিয়া অনুভব করা যায়।

কাহিনীর অসম্ভাব্যতা ও চরিত্রসৃষ্টির ব্যর্থতার জন্য দ্বিজেন্দ্রলালের 'ত্র্যহস্পর্শ বা সুখী পরিবার' নামক প্রহসনখানিও নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হইবে। ইহার চিত্রগুলি অতিরঞ্জিত এবং বাস্তবতার সঙ্গে সকল প্রকার সম্পর্কবর্জিত। ইহাতে একই পাত্রীকে বিবাহ করিবার জন্য পিতা ও পুত্রে 'যুদ্ধ',

পিতামহ ও পৌত্রের একই পাত্রীতে আসক্তি ইত্যাদির যে পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, তাহা উচ্চাঙ্গের হাস্যরস সৃষ্টির পরিবর্তে নীচ গ্রাম্য রুচির পরিচয় দিয়াছে, ইহার উৎসর্গ-পত্রে নাট্যকার উল্লেখ করিয়াছেন, 'প্রহসনখানিকে উদ্দেশ্যহীন বিবেচনা করাই শ্রেয়ঃ।' ইহা যে উদ্দেশ্যহীন, এই বিষয়ে সংশয়ের কোনও কারণ নাই। কাহাকেও লক্ষ্য করিয়া ইহা রচিত নহে বলিয়াই ইহা রচনার দিক দিয়া শক্তিহীন। ইহার কাহিনীটি এতই অকিঞ্চিৎকর যে, তাহা এখানে উল্লেখ করাও নিষ্প্রয়োজন বলিয়া বোধ করি। বিবাহ-বাতিকগ্রস্ত বৃদ্ধের চরিত্র অবলম্বন করিয়া ইতিপূর্বে বাংলা সাহিত্যে যে সকল প্রহসন রচিত হইয়াছে, তাহা হইতে ইহা কোন দিক দিয়া সার্থক বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না।

প্রহসন রচনার মধ্যে যে দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার মৌলিক প্রতিভার সন্ধান পান নাই, 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকখানি তাহার প্রমাণ। ইংরেজিশিক্ষিত নব্য সম্প্রদায় এবং 'বিলাত ফেরতা' সমাজকে আক্রমণই ইহার লক্ষ্য। ইতিপূর্বে অমৃতলাল বসুর মধ্যে অনুদার সামাজিক মনোভাবের পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে, ইহার মধ্য দিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল তাহাই অনুকরণ করিয়াছেন মাত্র। তদানীন্তন পাশ্চাত্ত্যশিক্ষিত সমাজের দোষগুণ সম্পর্কে ইহার মধ্যে তাঁহার নিজস্ব কোনও মনোভাবের পরিচয় প্রকাশ পায় নাই। ইহাতে অমৃতলালের অনুকরণে শিক্ষিতা নারী সম্পর্কেও দ্বিজেন্দ্রলাল অসঙ্গত কটাক্ষপাত করিয়াছেন। কিন্তু ইহা তাঁহার পরানুকরণেরই ফল, নিজস্ব ব্যক্তিগত অভিমত নহে। প্রহসন রচনার মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল নিজের প্রতিভার যে কোন সন্ধান পান নাই, ইহা অপেক্ষা এমন স্পষ্ট করিয়া তাঁহার আর কোন রচনায় তাহা প্রকাশ পায় নাই।

দ্বিজেন্দ্রলালের 'পুনর্জন্ম' একখানি অতি জনপ্রিয় প্রহসন। ইহার বিষয়-বস্তু সম্পর্কে নাট্যকার ভূমিকায় উল্লেখ করিয়াছেন, 'ডীন সুইফট্ সত্য সত্যই একজন জীবিত জ্যোতিষী পঞ্জিকাকারকে মৃত বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার অত্যাচারে নিরুপায় হইয়া পঞ্জিকাকার শেষে আপনাকে জীবিত প্রমাণ করিবার উদ্দেশ্যে একজন উকীল নিযুক্ত করেন। কথিত আছে যে তথাপি ঐ পঞ্জিকাকার স্বীয় অস্তিত্ব সন্তোষকর রূপে প্রমাণ করিতে পারেন নাই। সেই আখ্যানকে অবলম্বন করিয়া বর্তমান প্রহসনখানি রচিত হইয়াছে।'

কিন্তু একটি বৈদেশিক ভিত্তি ইহার অবলম্বন হইলেও, নাট্যকার যে ভাবে

ইহাকে আনিয়া একটি নিতান্ত পরিচিত বাঙ্গালী পরিবেশের মধ্যে স্থাপন করিয়াছেন, তাহাতে ইহার বৈদেশিক পরিচয় একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। যাদব চক্রবর্তী নামক এক কৃপণ ও অত্যাচারী মহাজনকে তাঁহার অপকার্যের জন্য সমুচিত শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার সকল আত্মীয় বন্ধু ও এমন কি দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী সৌদামিনী পর্যন্ত ষড়যন্ত্র করিয়া মৃত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিল, ইহাতে যাদব চক্রবর্তী যথেষ্ট শিক্ষাপ্রাপ্ত হইলেন; তাঁহার চরিত্রের আমূল পরিবর্তন হইয়া গেল, তিনি যেন নূতন জীবন লাভ করিলেন। তারপর সকলের সঙ্গে সহজ ভাবে মিলিত হইবার পক্ষে তাহার কোন বাধা রহিল না।

প্রহসনখানি নিতান্ত ক্ষুদ্র, কিন্তু ঘটনা-বহুল। ইহার সংলাপ ও সঙ্গীতের ভিতর দিয়া দ্বিজেন্দ্রলালের স্বাভাবিক প্রতিভার সহজ বিকাশ হইয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলাল 'আনন্দ-বিদায়' নামক একখানি প্রহসন রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা ব্যক্তিগত আক্রমণাত্মক রচনা বলিয়া সাহিত্যের ইতিহাসে আলোচনার যোগ্য নহে।

দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যসাহিত্য রচনার প্রথম যুগ যেমন প্রহসন রচনার যুগ, তেমনই তাহার দ্বিতীয় যুগ নাট্যকাব্য রচনার যুগ বলিয়া নির্দেশ করিতে পারা যায়। যে বিশিষ্ট সমাজ-চৈতন্য দ্বারা দ্বিজেন্দ্রলাল সর্বপ্রথম সামাজিক প্রহসনগুলি রচনা করিয়া তাঁহার নাট্যকার-জীবনের সূত্রপাত করিয়াছিলেন, তাঁহার নাট্যকাব্যগুলির মধ্যেও সেই সমাজ-চৈতন্যের বিশেষ ব্যতিক্রম ছিল না। পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক পরিবেশের মধ্যেও তাঁহার নাট্যকাব্য-গুলিতে তিনি তাঁহার বিশিষ্ট সমাজ-চৈতন্যেরই অভিব্যক্তি করিয়াছেন; তাঁহার প্রথম দুই একখানি নাট্যকাব্য সম্পর্কে এই কথা বিশেষভাবেই প্রযোজ্য। নাট্যকার হিসাবে দ্বিজেন্দ্রলালের যে বৈশিষ্ট্য সর্বসাধারণের নিকট সুপরিচিত, এই নাট্যকাব্যগুলির মধ্য দিয়া তখন পর্যন্তও তাহার কোন পরিচয় লাভ করিতে পারা যায় না। রক্ষণশীল সমাজের উপর যে আক্রমণ-মূলক মনোভাব লইয়া তিনি তাঁহার সামাজিক প্রহসনগুলি রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার নাট্যকাব্য রচনার যুগে তাহা তিনি পরিত্যাগ করিলেও সমাজ-সম্পর্কিত তাঁহার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির ইহাতে কোন পরিবর্তন দেখা দেয় নাই। এদেশের রক্ষণশীল সমাজের প্রতি তাঁহার ক্রুদ্ধ আক্রোশ তখন অনেকটা স্তিমিত হইয়া আসিয়াছে সত্য, কিন্তু প্রহসনগুলি রচনার

ভিতব দিয়া তিনি যেমন সমাজের দোষত্রুটিগুলি অনাবৃত করিয়া দেখিয়াছেন, তিনি এই নাট্যকাব্যগুলির মধ্য দিয়া সমাজের প্রতি এই আক্রমণমূলক মনোভাব পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার নিজের দিক হইতে কতকগুলি আদর্শ সামাজিক সম্পর্ক লইয়া বিচার করিয়াছেন। এই বিচারের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে তাঁহার যে স্বকীয়তা আছে, তাহাই এই নাটকগুলিকে রোম্যাণ্টিক বা কাব্যধর্মী করিয়া তুলিয়াছে। পৌরাণিক চরিত্রকে রোম্যাণ্টিক আদর্শে গঠিত করিয়া কাব্যরচনার পথপ্রদর্শক যেমন ছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত, এই বিষয়ে নাট্যরচনার পথপ্রদর্শক দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যকার-খ্যাতি তাঁহার কবি-খ্যাতি আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছে, এ কথা বাহিরের দিক হইতে সত্য হইলেও অন্তরের দিক হইতে সত্য নহে। এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে নাট্যকার দ্বিজেন্দ্র-লালের মধ্যে কবি দ্বিজেন্দ্রলাল বাঁচিয়া রহিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য বিস্তৃত-ভাবে বুঝাইয়া বলিবার আবশ্যকতা আছে বলিয়া মনে কবি না; তবে তাঁহার রচিত নাট্যকাব্যগুলির মধ্যে নাট্যকাব দ্বিজেন্দ্রলাল ও কবি দ্বিজেন্দ্রলালকে একেবারে পাশাপাশি দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া ইহাদেব মধ্যেই দ্বিজেন্দ্র-লালের পুর্ণতর পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া অনুভূত হয়। এখানে দ্বিজেন্দ্রলাল পরিপুর্ণ আদর্শবাদী। যে বাস্তবতার স্পর্শ রবীন্দ্রনাথের নাট্য-কাব্যগুলিকে কতকটা নাট্যিক মর্যাদা দান করিয়াছে, দ্বিজেন্দ্রলালের এই শ্রেণীর নাটকের মধ্যে তাহাবও অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল রচনা প্রধানতঃ আদর্শ বা তত্ত্বপ্রধান। প্রহসন রচনায় দ্বিজেন্দ্রলাল যে কতকটা বাস্তবমুখীনতার পরিচয় দিয়াছিলেন, নাট্যকাব্যগুলির মধ্যে তাহার কোনই পরিচয় নাই; এখানে কবি দ্বিজেন্দ্রলালই নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালকে জয় কবিয়াছেন।

তিনি মোট পাঁচখানি এই শ্রেণীর নাটক রচনা করেন, তাহাদের মধ্যে একখানি মাত্র বিষয় ও আদর্শের দিক হইতে এই যুগের অন্তর্ভুক্ত হইয়াও রচনাকালের দিক হইতে কিছু পরবর্তী হইয়া পড়িয়াছে। অন্যান্য নাটকগুলি অনতিকাল ব্যবধানেই রচিত। নাট্যকাব্য রচনার যুগের সঙ্গে সঙ্গেই দ্বিজেন্দ্র-নাট্যসাহিত্যে স্বদেশী আন্দোলনের পুর্ববর্তী যুগের অবসান হয়।

দ্বিজেন্দ্রলালের এই নাট্যকাব্যগুলি রচনার কাল মোটামুটি ১৩০৭ সাল হইতে ১৩১০ সাল। এই সময়ের মধ্যেই তাঁহার কাব্যগ্রন্থ 'মন্দ্র' প্রকাশিত হয়।

এই যুগ সূচনার মাত্র দুই বৎসর পূর্বে তাঁহার অন্যতম সুপরিচিত কাব্যগ্রন্থ 'আষাঢ়ে' প্রকাশিত হইয়াছিল। তরুণ দ্বিজেন্দ্রলালের ব্যক্তিগত জীবনের দিক হইতেও এই সময়টি যে তাঁহার কাব্যরচনার সম্পূর্ণ অনুকূল ছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায়। তাঁহার চরিত-লেখক লিখিয়াছেন,—"শুভোদ্বাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার প্রায় ছয় বৎসর পরে, অর্থাৎ প্রণয়ের সেই উদ্বেলিত রসসিন্ধু, উচ্ছ্বসিত ভাবাবেগ প্রশান্ত ও প্রশমিত হইতে যে সময়টুকু লাগিয়াছিল তাহার পর হইতে—তাঁহার অন্তর্জাত আনন্দ অন্য এক ভিন্ন মূর্তিতে উদ্ভাসিত ও প্রকট হইয়া, এই বিরস-শুষ্ক, মৌন-ম্লান বঙ্গদেশকে বিমুগ্ধ ও বিস্মিত করিয়া তুলিল। এ সময়ে তাঁহার কবি-প্রতিভার সুন্দর সুরভি-প্রসূনগুলি প্রস্ফুটিত হইয়া মাতৃভাষাকে অতি মোহন সুগন্ধ ও দিব্য সৌন্দর্যে আমোদিত ও গরিমান্বিত করিয়া তুলিয়াছে" ('দ্বিজেন্দ্রলাল', পরে দ্রষ্টব্য)। এই কথাটি বিশেষভাবে বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, তাঁহার এই নাট্যকাব্য রচনার যুগ শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই এক দিক দিয়া যেমন তাঁহার অন্তর্জগতে তেমনি আর এক দিক দিয়া এ দেশের বহিরাকাশেও এক বিপর্যয় দেখা দেয়; এই সময়েই যে অন্তরের দিক দিয়া তাঁহার স্ত্রীবিয়োগ ও বাহিরের দিক দিয়া বাঙ্গালার স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়, তাহা তাঁহার পরবর্তী নাট্যরচনাগুলির উপর বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। সেইজন্যই এ যাবৎ কাল রচিত তাঁহার নাটকগুলিতে অসংযত ভাবোচ্ছ্বাস, আবেগময়তা, অতি-নাটকীয় (melo-dramatic) লক্ষণ—ইহাদের কোনটিরই প্রকাশ প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব এই নাট্যকাব্য রচনার যুগ শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যসাহিত্য-রচনার প্রথম অংশের অবসান হয়।

দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যসাহিত্য রচনার প্রথমাংশের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এক কথায় বলিতে পারা যায় যে, ইহাতে দ্বিজেন্দ্রলাল যুক্তিবাদী; তাঁহার নাট্য-কার জীবনের দ্বিতীয় অংশের সঙ্গে ইহার মূল পার্থক্য এই যে, ইহাতে দ্বিজেন্দ্র-লাল তৎপরিবর্তে ভাববাদী; কিন্তু নাট্যকাব্য রচনায় যুক্তিবাদী না হইয়া ভাববাদী হইলে কোন ক্ষতি ত ছিলই না, বরং তদ্দ্বারা কাব্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাইত এবং ঐতিহাসিক ও সামাজিক নাটক রচনায় ভাববাদী না হইয়া যুক্তিবাদী হইতে পারিলে তাহাতেও যথার্থই নাট্যিক গুণ প্রকাশ পাইত এই হেরফেরটুকু ঘুচাইতে পারিলে দ্বিজেন্দ্রলাল একজন শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হইতে পারিতেন। কাব্যরচনার ক্ষেত্রে যুক্তিবাদী হওয়ার যে ত্রুটি, দ্বিজেন্দ্রলালের

নাট্যকাব্যগুলির মধ্যেও সেই ত্রুটিই প্রধান ত্রুটি। সেইজন্য তাঁহার এই শ্রেণীর নাটকগুলির মধ্যে রস-সৌন্দর্য অপেক্ষা তত্ত্বকথাই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে এবং আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিবার আগ্রহে বাস্তব সত্য উপেক্ষিত হইয়াছে।

প্রহসন রচনার যুগের শেষ ভাগে দ্বিজেন্দ্রলাল সর্বপ্রথম যে গুরুবিষয়ক ও তত্ত্বমূলক নাটকখানি রচনা করেন, তাহার নাম 'পাষাণী'। লেখক ইহাকে 'গীতি-নাটিকা' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বস্তুতঃ ইহা অমিত্র পয়ার ছন্দে রচিত একখানি গীতিবহুল নাটক। এই নাটকখানি প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে সমালোচক মহলে ইহা লইয়া এক তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। একদিকে যেমন পাশ্চাত্ত্য-শিক্ষিত সমাজ ইহার বিষয়-বিন্যাসের মধ্যে নির্ভীক সংস্কার-মুক্তির ভাব দেখিয়া ইহার প্রতি আকৃষ্ট হয়, তেমনই অন্যদিকে রক্ষণশীল সমাজ ইহার মধ্যে সামাজিক অকল্যাণের আশঙ্কায় আতঙ্কগ্রস্ত হয়। লেখক তাঁহার 'মন্দ্র' কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় 'পাষাণী'র সমালোচকদিগের প্রতি একটি নিবেদন প্রকাশ করিয়াছিলেন ; কিন্তু তাহাতে রক্ষণশীল মতাবলম্বী সমালোচক-দিগের আলোচনার বিস্তৃত প্রত্যুত্তর নাই, তবে কোন কোন সাময়িক পত্রিকায় তাহার বিস্তৃত প্রত্যুত্তরও প্রকাশিত হইয়াছিল। নাটকের কাহিনীভাগ লক্ষ্য করিলেই এই উভয় মনোভাবের অর্থ হৃদয়ঙ্গম হইবে।

রাজর্ষি জনক একদিন বিশ্বামিত্রকে বলিলেন, 'যদিও তুমি তপোবলে ব্রাহ্মণ হইয়াছ, তথাপি তোমার আসন প্রকৃত ব্রাহ্মণের অনেক নিম্নে। এ কথার সত্যতা যদি পরীক্ষা করিতে চাও, তবে মহর্ষি গৌতমের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর। গৌতমকে পরীক্ষা করিবার জন্য বিশ্বামিত্র তাঁহার আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গৌতমের পত্নী অহল্যা, অহল্যা পরমা সুন্দরী পঞ্চদশী যুবতী। ভোগে তাঁহার পরিপুর্ণ আসক্তি ; কিন্তু বৃদ্ধ স্বামী ঐহিক বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরাসক্ত। এই অতৃপ্তির অশান্তি অহল্যার জীবন বিষাক্ত করিয়া ফেলিয়াছে। বিশ্বামিত্র অহল্যাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন ; ভাবিলেন, এই পত্নী হইতে গৌতমকে কিছুদিনের জন্য বিচ্ছিন্ন করিয়া ইহাদের পরস্পরের অনুরাগ পরীক্ষা করিতে হইবে। গৌতম তপস্যার নাম করিয়া বিশ্বামিত্রের সঙ্গে বিনা দ্বিধায় আশ্রম ত্যাগ করিয়া গেলেন ; লাঞ্ছিত রূপ-যৌবন অহল্যার কাছে দুর্ভার হইয়া উঠিল। অহল্যার রূপের কথা শুনিয়া একদিন ব্যভিচারী ইন্দ্র গৌতমের আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অহল্যাও দর্শনমাত্রই ইন্দ্রের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। উভয়ের গোপন ব্যভিচার চলিতে লাগিল। এমন সময় জানা

গেল, গৌতম আশ্রমে ফিরিতেছেন। ইন্দ্র অহল্যাকে লইয়া স্থানান্তরে চলিয়া যাইবার সিদ্ধান্ত করিলেন; অহল্যার বালক-পুত্র শতানন্দ মাতার পলায়নের সময় বাধা সৃষ্টি করিল বলিয়া ইন্দ্র তাহাকে অহল্যার সম্মুখেই কণ্ঠরোধ করিয়া মৃত-প্রায় করিয়া ফেলিয়া দিলেন। তারপর তাঁহারা নির্বিবাদে পলাইয়া গেলেন। কৈলাস পর্বতের এক নির্জন শিখরে ইন্দ্র ও অহল্যা কিছুকাল বাস করিলেন; ক্রমে অহল্যার উপর ইন্দ্রের আসক্তি দূর হইল; নিঃশেষিত-সৌরভ পুষ্পের মত অহল্যাকে ত্যাগ করিয়া তিনি স্বর্গরাজ্যে ফিরিয়া গেলেন। অহল্যা পুরুষের প্রতি বিশ্বাস হারাইলেন। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইল। গৌতমের শূন্য আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়া পতিপুত্র-বিরহিত হইয়া দুঃসহ মানসিক যন্ত্রণায় সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। এমন সময় একদিন বিশ্বামিত্রের সঙ্গে রামলক্ষ্মণ এই আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অহল্যার দুঃখ দেখিয়া শ্রীরামচন্দ্রের দয়া হইল। তিনি তাঁহাকে তাঁহার স্বামী মহর্ষি গৌতমের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া এই দুরপনেয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে উপদেশ দিলেন। সীতার বিবাহোপলক্ষ্যে গৌতম তাঁহার অজ্ঞাতবাস হইতে জনকের রাজ-সভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন; শুনিতে পাইয়া অহল্যা সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। স্বামীর নিকট অকপটে নিজের সমস্ত পাপ স্বীকার করিয়া অহল্যা তাঁহার ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। গৌতম সর্বান্তঃকরণে ক্ষমা করিয়া তাঁহাকে প্রিয়তমা বলিয়া নিজের বক্ষে তুলিয়া লইলেন। বিশ্বামিত্র গৌতমের মাহাত্ম্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। গৌতমের পুণ্যতেজে অহল্যা পবিত্র হইল।

এই কাহিনীর মধ্যে প্রধানতঃ সামাজিক পাপ ও প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা তাহার শুদ্ধির কথাই রহিয়াছে; এই সম্পর্কে এই কাহিনীর মধ্যে নাট্যকারের যাহা বক্তব্য তাহা এই দেশীয় সামাজিক ও নৈতিক বিশ্বাসে কেবল যে নূতন তাহা নহে—বিদ্রোহমূলকও বটে। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সম্মুখীন হইয়া এতদ্দেশীয় শিক্ষিত সমাজ তখন সবেমাত্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দাবী তুলিতে শিখিয়াছে, কিন্তু সেই দাবী তখনও সমাজে স্বীকৃত হয় নাই। অবশ্য ইতিপূর্বেই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার কয়েকখানি উপন্যাসের ভিতর দিয়া এই প্রকার প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি সমাজের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে স্বীকার করিয়া লইলেও, ইহার দাবীগুলি কদাচ স্বীকার করিয়া লন নাই। তিনি তাঁহার 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসখানিতে পাপের পথে শৈবলিনীর স্বাধীনতা দিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাহার সেই স্বেচ্ছাচারিণী প্রবৃত্তিকে জয়মাল্য দিয়া ভূষিত করেন নাই। ব্যক্তি-মানবের দুর্বলতার

অনুভূতি তাঁহার অন্তর দ্রব করিলেও, সামাজিক নীতির শাসনকে সর্বত্রই তিনি সম্মান করিয়াছেন। সেইজন্য নীতিবাগীশ পাঠক-সম্প্রদায়ও বঙ্কিম-আদর্শের বিরোধিতা করিতে পারেন নাই। কিন্তু 'পাষাণী' নাটকের কাহিনীতে দ্বিজেন্দ্রলাল সামাজিক নীতি অগ্রাহ্য করিয়া ব্যক্তি-অনুভূতিকে আরও একটু বেশি স্বাধীনতা দিয়াছেন। সুতরাং তদানীন্তন সমাজ ইহাকে তেমন শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে পারে নাই। রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের একটি কাহিনীর উপর নির্ভর করিয়া এই নাটকটি রচিত হইলেও, ইহাতে নাট্যকার সর্বত্র রামায়ণ-কাহিনীর অনুসরণ করেন নাই। চরিত্রগুলির পরিকল্পনাতেও তিনি স্বকীয় অনুভূতি বিসর্জন দিতে পারেন নাই—এই হিসাবেই এই নাটক রোমান্টিকধর্মী, প্রকৃত পৌরাণিক নাটক নহে। রামায়ণ-কাহিনীর সঙ্গে ইহার প্রধান বিরোধ এই যে, রামায়ণে অহল্যা ইন্দ্রকে নিজের পতি গৌতমের ছদ্মবেশেই পাইয়াছিলেন এবং তাহাকে পতি বলিয়া জানিতে পারিয়াই তাহার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। অহল্যাকে ছলনা করিবার জন্য ইন্দ্রকেও তথায় শাপগ্রস্ত হইতে হয় ; কিন্তু নাটকে ইন্দ্র চরম পাপাচরণ করিয়াও নিষ্কৃতি পাইয়াছে। পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যে রোমান্টিসিজমের এই স্বেচ্ছাচারিতা সেদিনকার সমাজ সহ্য করিতে পারে নাই।

তবে 'পাষাণী'র বক্তব্য বিষয় যতই নৈতিক সমালোচনার সৃষ্টি করুক না কেন, ইহার সুস্পষ্ট ও নির্ভীক উক্তির মধ্যে যে কোথাও সংস্কারগত জড়তার আভাস পাওয়া যায় না, ইহা বাস্তবিকই লক্ষ্য করিবার বিষয়। বঙ্কিমচন্দ্র শৈব-লিনীকে গৃহত্যাগিনী করাইয়া তাহার জন্য পরিণামে যে কঠোর প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, দ্বিজেন্দ্রলালের অহল্যা তদধিক পাপীয়সী হইয়াও তাঁহার হাতে তাহার প্রায়শ্চিত্তের একাংশেরও ভাগিনী হয় নাই। পাপের তুলনায় অহল্যার প্রায়শ্চিত্ত অতি,সামান্যই হইয়াছে বলিতে হইবে। এই নাটকখানি পরবর্তী বাংলা বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্যের উপর কোন প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই সত্য, কিন্তু তাহা হইলেও ইহা যে উনবিংশ শতাব্দীর নৈতিক আদর্শের গণ্ডী উত্তীর্ণ হইয়া বাংলা সাহিত্যে নূতন আদর্শের ইঙ্গিত দিয়াছিল, সেই হিসাবে ইহার মূল্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বাংলা নাট্যসাহিত্যে ইহাতেই সর্বপ্রথম নির্ভীক সংস্কারমুক্ত বাস্তবতার পরিচয় পাওয়া যায়।

অহল্যা-গৌতমের মূল কাহিনী ব্যতীতও ইহার মধ্যে চিরঞ্জীব-মাধুরীর

আর একটি যে উপকাহিনী আছে, তাহাতে এই নাটকের বক্তব্য বিষয় আরও স্পষ্ট হইয়াছে। চিরঞ্জীব আজীবন দস্যুতা করিয়া আসিয়াছে, মহর্ষি গৌতমের সংস্পর্শে আসিয়া তাহার চরিত্রের অদ্ভুত পরিবর্তন দেখা দিল; সে ঋষির শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া দস্যুবৃত্তি পরিত্যাগ করিল। মাধুরী ছিল মিথিলার সর্বশ্রেষ্ঠ বারাঙ্গনা। একদিন ঋষি গৌতমকে প্রলুব্ধ করিতে গিয়া সে নিজেই তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে বাধ্য হইল এবং আধ্যাত্মিক সাধনায় মনোনিবেশ করিল। অতঃপর গৌতম চিরঞ্জীব ও মাধুরীর যথাবিধি বিবাহ দেন। মাধুরী আদর্শ পত্নীরূপে স্বামিসেবায় জীবনোৎসর্গ করে।

অতএব দেখা যাইতেছে, এই নাট্যকাহিনী অবলম্বন করিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল কতকগুলি সামাজিক আদর্শ প্রচার করিতে চাহিয়াছিলেন। ইহাতে প্রচারিত তাঁহার মত এই, চরম ব্যভিচারিণী নারী'ও স্বামীর ক্ষমাযোগ্য; এমন কি, বারাঙ্গনাও আদর্শ পত্নীরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সক্ষম। নাট্যিক সৌন্দর্য অপেক্ষা ইহার মধ্যে সামাজিক আদর্শ প্রচারের প্রয়াস অধিকতর পরিস্ফুট হইয়া রহিয়াছে। এই আদর্শের নূতনত্বের জন্যই ইহা লইয়া সমসাময়িক সমাজে এত গোলযোগের সৃষ্টি হইয়াছিল। আদর্শ প্রচারের ব্যগ্রতায় ইহার অন্তরগত সৌন্দর্যসৃষ্টি ব্যাহত হইয়াছে; তত্ত্বকথায় স্থানে স্থানে ইহার স্বাচ্ছন্দ্য নষ্ট হইয়াছে; তাহা না হইলে ইহার কোন কোন অংশে উচ্চ কবি-কল্পনা এবং রচনাশক্তির পরিচয় যে না পাওয়া গিয়াছিল, তাহা নহে। এমন কি ইহার তত্ত্বকথাও স্থানে স্থানে যথেষ্ট হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে; যেমন—

> বিবাহ বিলাস নহে, প্রেম লিপ্সা নহে।
> পতিপত্নী পণ্যদ্রব্য নহে; বাছিবার,
> মূল্য দিয়া ক্রয় করিবার বস্তু নহে।
> বিবাহ কর্তব্য। প্রেম নিষ্কাম সাধনা।—১।২

কিন্তু নাটকের মধ্যে এইরকম তত্ত্বকথার অবতারণা করিলে ঘটনার গতিশীলতা নিদারুণ বাধাপ্রাপ্ত হয়। পূর্বেই বলিয়াছি, ঘটনার গতিশীলতাই নাট্যশিল্পের সর্বপ্রধান গুণ। এই সকল তত্ত্বকথা বক্তৃতা দ্বারা না বুঝাইয়া নাট্যিক ক্রিয়া দ্বারা বুঝানই নাটকের উদ্দেশ্য; ইহাতে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে নাই।

একমাত্র দুইটি চরিত্র ব্যতীত 'পাষাণী'র সকল চরিত্রই অবাস্তব আদর্শের উপর ভিত্তি করিয়া পরিকল্পিত হইয়াছে। অতএব এই দুইটি চরিত্রই এখানে

আলোচনার যোগ্য। নাটকের নায়িকা অহল্যার চরিত্রই এই সম্পর্কে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য। অহল্যার চরিত্র নাট্যকার বাস্তব নারীচরিত্ররূপে উপস্থাপিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। সেই প্রয়াস কতদূর সার্থক হইয়াছে, তাহাই বিচার্য। অহল্যা মহর্ষি গৌতমের পত্নী; কিন্তু পতির আধ্যাত্মিক আদর্শের কোন প্রভাব তাঁহার চরিত্রের উপর পড়ে নাই। অহল্যা 'দেবী' হইতে চাহেন না—সামান্য মানবীর সুখদুঃখবেদনা সর্বান্তঃকরণ দিয়া গ্রহণ করিয়া দশজনের মত তিনি বাঁচিয়া থাকিতে চাহেন। তিনি গৌতমের অযোগ্য পত্নী—তাহা স্বীকার করিতেও লজ্জাবোধ করেন না; অন্তঃকরণের মানবোচিত দুর্বলতাগুলি লৌকিক সংস্কারের জালে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিবারও প্রবৃত্তি তাঁহার নাই; স্বামী তাঁহার নিকট হইতে যখন বিদায় লইতে আসিলেন তখন তাঁহাকে নির্মম আঘাত করিয়া কহিলেন—

> কঠিন পুরুষ!—নিত্য বিয়োগে, মিলনে,
> আমরা করিব ধ্যান তোমাদের স্মৃতি,
> তোমরা যখন ইচ্ছা আসিবে যাইবে,—
> স্বাধীন তরঙ্গসম সহিষ্ণু সৈকতে।—১।৬

কিন্তু অহল্যা-চরিত্রের সর্বাপেক্ষা গুরুতর ত্রুটি এই যে, ইহার মধ্যে একটি প্রবৃত্তিই বৃহদায়তন করিয়া দেখাইতে গিয়া নাট্যকার ইহার অন্যান্য একান্ত স্বাভাবিক বৃত্তিগুলি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন রহিয়াছেন। অহল্যা-চরিত্রের মধ্যে কোন প্রকার দ্বন্দ্ব নাই; কিন্তু অহল্যা সন্তানের জননী; ইহা উপলক্ষ্য করিয়াই গার্হস্থ্য কর্তব্যের সঙ্গে তাঁহার সহজাত হৃদয়বৃত্তির দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করা যাইত। কিন্তু যেখানে ইন্দ্র অহল্যার চক্ষুর সম্মুখেই তাহার বালক-পুত্রকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিতেছে, সেখানেও অহল্যা একপ্রকার নীরব সাক্ষীরূপেই এই বীভৎস ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া যাইতেছে; এই দৃশ্য বাস্তবতার পরিপন্থী ও একান্ত অস্বাভাবিক বলিয়াই দর্শকের পক্ষে পীড়াদায়ক। অতএব অহল্যার মধ্যে বাস্তবধর্মী চরিত্রসৃষ্টির প্রয়াস দেখিতে পাওয়া গেলেও, এই বিষয়ে ইহার অপূর্ণতাও উপেক্ষণীয় নহে।

'পাষাণী'র আর একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র চিরঞ্জীব। চিরঞ্জীব প্রথম জীবনে দস্যু ছিল; মহর্ষি গৌতমের সংস্পর্শে আসিয়াও তাহার যে পরিবর্তনটুকু সাধিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে অলৌকিকত্ব কিছুই নাই; লেখকের এই বিষয়ে সতর্কতা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। তাহার চরিত্রটি একান্তই বাস্তব

এবং ইহার পরিণতিও সুসঙ্গত হইয়াছে। এই নাটকে ইন্দ্রের চরিত্র নিতান্তই বিশেষত্বহীন।

কৃত্তিবাসী রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ড হইতে 'পাষাণী' নাটকের গল্পাভাস গ্রহণ করা হইয়াছে সত্য, কিন্তু ইহার নাট্যিক কাহিনীর পরিকল্পনায় লেখক মৌলিক প্রতিভারও পরিচয় দিয়াছেন। ভাষার দিক দিয়া ইহার ত্রুটি গুরুতর। যে ছন্দ ইহাতে তিনি ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা দৃশ্যতঃ অমিত্রাক্ষর বলিয়া ভ্রম হইতে পারে, কিন্তু ইহা প্রকৃতপক্ষে মধুসূদনের অমিত্রাক্ষরও নহে, কিংবা রবীন্দ্রনাথের তদানীন্তন অমিত্র পয়ারও নহে—ইহাদের উভয়ের গঠন-কৌশল তিনি আদৌ আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। তবে তিনি রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক নাট্যকাব্যগুলিতে ব্যবহৃত ছন্দই যে অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা সুস্পষ্ট অনুভব করা যায়; ভাষায় ও ভাবে রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদার'ই যেন এখানে প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়—

অহল্যা। এত রূপ! এ পূর্ণ যৌবন! সব বৃথা?
ধরিয়া রাখিতে তবু পারিলি না হায়
এ স্ত্রৈণ স্থবির মূঢ় গৌতমে?—হা ধিক্!
চলিয়া গেল সে দৃঢ় চরণে, চাহিয়া
শুষ্কনেত্রে, যেন গাঢ় অনুকম্পা ভরে
মোর পানে? হা রমণি, করিস্ না তুই
দুর্বল নিষ্ফল এই রূপের গৌরব।—১।৬

কিন্তু এই ভাষায় মধুসূদনের গাম্ভীর্য এবং রবীন্দ্রনাথের লালিত্য দুইয়েরই অভাববোধ হইবে। ব্যর্থ অনুকরণের জন্য ইহার ত্রুটি পীড়াদায়ক।

হাসির গানের রাজা দ্বিজেন্দ্রলালের শ্রেষ্ঠ কয়েকটি হাসির গান এই 'পাষাণী' নাটকেরই চিরঞ্জীব চরিত্রের কণ্ঠে স্থান পাইয়াছে। অভিনব বিষয়-বস্তু এবং সুরচিত সঙ্গীত—ইহাদেরই ভিতর দিয়া অতি সহজে পাষাণী সমসাময়িক সমাজে লোকপ্রীতি অর্জন করিয়াছিল। কিন্তু উচ্চ শিল্পনৈপুণ্যের অভাবে সমসাময়িক উত্তেজনা প্রশমিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ইহা লোক-লোচনের অন্তরালবর্তী হইয়া পড়ে।

রচনার গুণে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'সীতা' শুধু তাঁহার পৌরাণিক নাটকগুলির মধ্যে নহে, তাঁহার সকল নাট্যরচনার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু চরিত্র-পরিকল্পনায়

ইহার ত্রুটি আছে ; সেইজন্যই ইহা আশানুরূপ লোকপ্রীতি অর্জন করিতে সমর্থ হয় নাই।

'সীতা' রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের রাম কর্তৃক সীতা নির্বাসনের কাহিনী লইয়া রচিত। এই সম্পর্কে নাট্যকার সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত নাটক ভবভূতি-প্রণীত 'উত্তর-রাম-চরিত'-এর কিংবা বাল্মীকি-রচিত রামায়ণের আখ্যায়িকা কাহারও অন্ধ অনুকরণ করেন নাই। তিনি "কেবলমাত্র বনবাস-আখ্যানটিতেই ভবভূতির পদানুসরণ" করিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ; আর বাল্মীকি সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, "মহর্ষি বাল্মীকির রামায়ণে ভগবান্ রামের চরিত্র যেরূপ বর্ণিত আছে, তাহাতে এইরূপ প্রতীয়মান হয় যে, রামচন্দ্র শুদ্ধ বংশ-মর্যাদা-রক্ষার জন্য সীতার বনবাস দিয়াছিলেন। তাহার উপরে, লক্ষ্মণের প্রতি, তপোবন দর্শনচ্ছলে সীতাকে বনে লইয়া গিয়া সেখানে ছাড়িয়া আসিবার আজ্ঞায়, একটা নিষ্ঠুর ছলনাও লক্ষিত হয়" ('সীতা'-ভূমিকা)। ইহাই মনে করিয়া নাট্যকার এই বিষয়ে বাল্মীকির পদানুসরণ করেন নাই এবং তাঁহার বিশ্বাস এরূপ করায় তাঁহার পরিকল্পিত রামের চরিত্র "বাল্মীকির চিত্রিত চরিত্র হইতে হীন না হইয়া মহৎই হইয়াছে" (ঐ)। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা হয় নাই। 'সীতা' নাটকখানি প্রকাশিত হইবার সময় সমালোচকগণ একবাক্যে বলিয়াছিলেন যে, রাম-চরিত্রকে ইহাতে খর্ব করা হইয়াছে, কিন্তু নাট্যকার তাহা স্বীকার করিয়া লন নাই বরং তিনি বাল্মীকি হইতে মহত্তর রাম-চরিত্রের পরিকল্পনা করিয়াছেন বলিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন। (ঐ)

রামের চরিত্র-পরিকল্পনা এই নাটকের প্রধান ত্রুটি। ইহার রাম নিতান্তই ব্যক্তিত্বহীন পুরুষ। গুপ্তচর দুর্মুখের নিকট হইতে পৌরজন-আলোচিত সীতার অপবাদের কথা শুনিয়া তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া বশিষ্ঠের শরণাপন্ন হইলেন ; বশিষ্ঠ পরামর্শ দিলেন, এই অবস্থায় সীতা পরিত্যাজ্যা। বশিষ্ঠাশ্রম হইতে প্রত্যাগমন করিয়াই তিনি প্রাসাদে প্রচার করিলেন যে, সীতাকে তিনি পরিত্যাগ করিবেন ; ক্রমে ভ্রাতা ভরত, ভগ্নী শান্তা, জননী কৌশল্যা আসিয়া তাঁহাকে এই সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করিলেন, অবশেষে জননীর কথায় তিনি এই সঙ্কল্প পরিত্যাগও করিলেন ; শান্তা এই 'শুভ সমাচার' প্রাসাদে বিতরণ করিতে চলিল ; কিন্তু এমন সময় সীতা স্বয়ং রামের কাছে আসিয়া এই বলিয়া নিজের বনবাস প্রার্থনা করিলেন,

পিতৃসত্য তুমি রেখেছিলে প্রভু,
আমিও রাখিব পতিসত্য।

রামচন্দ্র পুনরায় তাহাতে সম্মতি দিলেন। সীতা রামের অনুমতি লইয়া স্বেচ্ছায় বনবাস বরণ করিয়া লইলেন। রামচন্দ্র সীতা-বিসর্জনের জন্য সর্বত্রই কুলগুরু বশিষ্ঠকে যতখানি দায়ী করিয়াছিলেন, পরাপবাদকারী অযোধ্যার পৌরজনকে ততখানি দায়ী করেন নাই। রামচন্দ্র ভরতের নিকট বলিতেছেন, 'ইহা কুলগুরু বশিষ্ঠ-আদেশ' (১।৪); জননীর নিকট বলিতেছেন, 'জানো না মা, মহর্ষি বশিষ্ঠ-আদেশ।' সংস্কৃত নাট্যকার ভবভূতি এই বশিষ্ঠ-প্রসঙ্গ একেবারেই বাদ দিয়াছেন; তাহাতে দেখা যায়, বশিষ্ঠ-প্রমুখ গুরুজন অযোধ্যায় তখন অনুপস্থিত ছিলেন বলিয়া রামচন্দ্র নিজের দায়িত্বেই সীতা বিসর্জন দিয়াছেন। ইহাতে রামচন্দ্রের পাপ যত গভীর হইয়াই দেখা দিক না কেন, তাঁহার ব্যক্তিত্ব রক্ষা পাইয়াছে। আর অন্যদিকে নিজের অপরাধ কুলগুরুর নামে ঢাকিয়া লইবার পাপের মধ্যে কোন কিছুরই মুখ রক্ষা পাইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। সীতার হিরণ্ময়ী প্রতিকৃতি নির্মাণ এবং শূদ্রক-বধ প্রভৃতি বিষয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল বাল্মীকি-রামায়ণের অনুসরণ করিয়াছেন।

নাট্যকার উল্লেখ করিয়াছেন যে তিনি "বনবাস আখ্যানটিতেই ভবভূতির পদানুসরণ" কবিয়াছেন। কিন্তু বনবাস-আখ্যান বলিতে তিনি কি বুঝিয়াছেন, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে না। বিশেষতঃ ভবভূতির 'উত্তর-রাম-চরিতে' সীতার বনবাস-জীবন ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'সীতায়' সীতার বনবাস-জীবন এক নহে। প্রথমোক্ত সংস্কৃত নাটকে বিসর্জিতা সীতা পাতালে গঙ্গা ও পৃথ্বীর সাহায্যে দ্বাদশ বর্ষ অতিবাহিত করিয়াছিলেন বলিয়া নির্দেশ পাওয়া যায়, তাঁহার যমজ পুত্রদ্বয় গঙ্গা কর্তৃক বাল্মীকির তত্ত্বাবধানে প্রেরিত হয়। দ্বিজেন্দ্র-লালের 'সীতা'য় বাল্মীকির আশ্রমেই পরিত্যক্তা সীতা তাঁহার পুত্রদ্বয় সহ অবস্থান করেন, বাল্মীকির অন্যতম পালিতা কন্যা বাসন্তী তথায় সীতার সহচরী ছিলেন। অতএব ভবভূতির পদানুসরণ করিয়া তিনি যে বনবাস আখ্যানটি বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা সত্য নহে। প্রকৃত পক্ষে ভবভূতির 'উত্তর-রাম-চরিতে'র সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের 'সীতা'র কোনও সম্পর্কই নাই। নাট্যকার অনেক বিষয়েই মূল বাল্মীকি-রামায়ণেরই পদানুসরণ করিয়াছেন। এই নাটকের অন্যতম ত্রুটি ইহার সীতার চরিত্র। সীতার চরিত্র আদর্শের দিক দিয়া উন্নত করিতে গিয়া নাট্যকার ইহার যে শুধু

নাট্যিক গুণই খর্ব করিয়াছেন তাহা নহে, আদর্শেরও মুখ রক্ষা করিতে পারেন নাই। বাল্মীকি ও ভবভূতির সীতা-চরিত্রের পরিকল্পনার মধ্যে যে একটা মানবিকতার পরিচয় আছে, দ্বিজেন্দ্রলালের সীতায় তাহা নাই। যে আদর্শের প্রেরণায় নাট্যকার এখানে সীতার বাস্তব পরিচয় খর্ব করিয়াছেন, তাহাও উচ্চাঙ্গের এমন কিছু নহে যে তাহা পালনের জন্য সীতার প্রতি পাঠকের মন শ্রদ্ধায় অবনত হইয়া আসিতে পারে। রামচন্দ্রের পিতৃসত্য পালনের আদর্শ যত মহান্ ছিল, সীতার তথাকথিত 'পতিসত্য' পালনের আদর্শ তত মহান্ নহে। বিশেষতঃ সীতার এই 'পতিসত্য' পালনের মধ্যে তাঁহার কোন গৌরব নাই, বরং অগৌরবের মাত্রা ষোল আনাই আছে। তাঁহার বনগমন স্বীকার করার মধ্যে তাঁহার পতিভক্তির গৌরব অপেক্ষা তাঁহার সম্বন্ধে প্রচারিত লোকাপবাদের স্বীকৃতি-মূলক অগৌরবই অধিক বলিয়া অনুভূত হয়। অতএব সীতা চরিত্রে এই 'পতিসত্য' পালনের আদর্শের মধ্যে তাঁহার কোন মহত্ত্ব প্রকাশ পায় নাই। এই বিষয়ে বাল্মীকি ও ভবভূতি আদর্শের স্পর্শ হইতে মুক্ত রাখিয়া সীতাচরিত্রের যে একটি সুন্দর বাস্তব পরিচয় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা কাব্য এবং নাটক উভয়েরই মর্যাদা রক্ষায় সক্ষম হইয়াছে। বিশেষতঃ দ্বিজেন্দ্রলালের মতে সীতা স্বেচ্ছায়ই যদি বনবাস বরণ করিয়া থাকেন, তবে নাটকের শেষ দৃশ্যে রামের সঙ্গে তাঁহার যে পুনর্মিলনের আগ্রহের পরিচয় পাই তাহা নিতান্তই অর্থহীন বলিয়া মনে হয়।

সীতা বিসর্জনের নির্মমতা ও তৎসম্পর্কিত 'নিষ্ঠুর ছলনা' হইতে রামচন্দ্রকে রক্ষা করিবার জন্য দ্বিজেন্দ্রলাল সীতার স্বেচ্ছায় বনবাস বরণ করিবার যে নির্দেশ দিয়াছেন, তাহাতে এই নাটকের বিয়োগান্তক পরিণতি বা সীতার পাতাল-প্রবেশ নাট্যকাহিনীর অপরিহার্য পরিণাম বলিয়া মনে না হইয়া নিতান্তই আকস্মিক বলিয়া মনে হয়। সংস্কৃত নাটকের মিলনান্তক পরিণতি রক্ষা করিবার জন্য ভবভূতি তাঁহার 'উত্তর-রাম-চরিত'-এ এই পাতাল-প্রবেশের প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াছেন। বাল্মীকির রামায়ণে অযোধ্যাবাসীদের সীতাকে পুনরায় পরীক্ষা করিয়া গ্রহণ করিবার প্রস্তাবে জননী ধরিত্রীর কোলে তাঁহার আশ্রয় লাভ করিবার কথা আছে; সেখানে ঘটনা-পরম্পরার মধ্য দিয়া বাল্মীকি তাঁহার কাব্যের বিয়োগান্তক পরিণতির সঙ্গতি রক্ষা করিয়াছেন। প্রথমতঃ সীতার প্রতি রামের অবিচার, তারপর দীর্ঘ দুঃখসহনের পরও অযোধ্যাবাসীর অপমানকর প্রস্তাব, ইহাদের মধ্য দিয়া সীতার পাতাল-প্রবেশের বিয়োগান্তক পরিণতি

নিতান্তই অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটকে সীতার প্রতি রামের অবিচারের কথা নাই, পুনর্মিলনের পরও অযোধ্যাবাসীর পক্ষ হইতে কোন অপ্রীতিকর প্রস্তাবও নাই; অথচ সীতার পাতাল-প্রবেশের কথা আছে। সেইজন্যই ইহা নিতান্তই আকস্মিক বলিয়া বোধ হয়। মনে হয়, যেন এক দৈবদুর্ঘটনায় সীতা সহসা মৃত্তিকাতলে প্রোথিত হইয়া গেলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল 'সীতা'কে ভবভূতির 'উত্তর-রাম-চরিত'-এর মত মিলনান্তক করিয়া লইলে এই ত্রুটির হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতেন।

পূর্বেই বলিয়াছি, রচনা-গুণে 'সীতা' দ্বিজেন্দ্রলালের সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক। ইহা আদ্যোপান্ত মিত্রাক্ষরে রচিত; অথচ তাঁহার মিত্রাক্ষরের এখানে প্রধান গুণ এই যে, ইহা কোথাও একঘেয়ে দোষদুষ্ট হইয়া উঠিবার অবকাশ পায় নাই; প্রত্যেক নূতন দৃশ্য নূতন অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত; এমন কি, একই দৃশ্য শব্দ-বিন্যাস-পারিপাট্য এবং যতিবিন্যাস-বৈচিত্র্যের গুণে সতেজ অমিত্রাক্ষরের মত শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে। ইহার রচনায় দ্বিজেন্দ্রলালের যে শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা তাঁহার আর কোন নাটকের মধ্যেই দৃষ্টিগোচর হয় না; মিত্রাক্ষর ছন্দে দ্বিজেন্দ্রলাল আর কোন নাট্যকাব্য রচনা করিবার প্রয়াস পান নাই।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের তৃতীয় পৌরাণিক নাটক 'ভীষ্ম'। নাটকখানি দ্বিজেন্দ্র-লালের মৃত্যুর পর ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। পূর্বোক্ত নাটক দুই-খানির কাহিনী রামায়ণ হইতে গৃহীত হইয়াছে, ইহা মহাভারতের ভীষ্ম-চরিত্র অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে। রচনা ও ঘটনা সন্নিবেশের দিক দিয়া ইহা কিছুতেই তাঁহার পূর্ববর্তী দুইখানি নাটকের সমকক্ষতা দাবী করিতে পারে না। নাটক হিসাবে ইহার কতকগুলি গুরুতর ত্রুটি আছে। এই নাটকের মূল কাহিনীটি নাট্যকার মহাভারত হইতে সংগ্রহ করিলেও, ইহার মধ্যে তিনি তাঁহার নিজস্ব কল্পনার যোগও নিতান্ত অল্প করেন নাই। পুরাণ-বহির্ভূত কল্পিত অংশটুকু অনেক ক্ষেত্রেই মূল বিষয়বস্তুর মর্যাদা রক্ষা করিতে সক্ষম হয় নাই।

ভীষ্মের 'প্রতিজ্ঞার কঠোরত্ব ও চরিত্রমহত্ত্ব' 'বর্ধিত' করিবার অভিপ্রায়ে নাট্যকার ইহাতে ভীষ্মের সহিত অম্বার সম্প্রীতিমূলক একটি কল্পিত কাহিনী যোগ করিয়াছেন। ইহা দ্বারা ভীষ্মের দিক হইতে নাট্যকারের উদ্দেশ্য কতকটা সফল হইলেও, অম্বার চরিত্র-কল্পনায় যে অসঙ্গতির পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে

তাহা নাটকের ত্রুটি বলিয়াই বিবেচিত হইবে। মহাভারত-বহির্ভূত ইহার আর একটি বিষয়ের তাৎপর্য স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় না। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় শান্তনু-পত্নী সত্যবতী জীবিত ছিলেন না বলিয়াই মহাভারতে নির্দেশ পাওয়া যায়। ইচ্ছামৃত্যু ও ব্রহ্মচর্যের গুণে ভীষ্ম দীর্ঘজীবন লাভ করিলেও, সত্যবতীকে চারি পুরুষ অতিক্রম করিয়া কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কাল পর্যন্ত জীবিত বলিয়া কল্পনা করিয়া নাট্যকার কি উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে চাহিয়াছেন, তাহা নাটকে বোধগম্য নহে। সত্যবতী ঋষির নিকট হইতে 'অনন্ত যৌবন' বর চাহিয়া লইয়াছিলেন, কিন্তু অনন্ত আয়ু লন নাই। ভীষ্মের পতন সংবাদ শুনিবা মাত্র সত্যবতী স্থবিরা হইয়া গেলেন বলিয়া নাট্যকার যে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহারও যে কি তাৎপর্য তাহাও বুঝিয়া উঠিতে পারা যায় না।

সত্যবতীর পিতা দাশরাজ ও মাতা দাশরাজ্ঞী এবং তাহাদের মন্ত্রী এই কয়টি কাল্পনিক চরিত্র নাট্যকার ইহাতে যোগ করিয়াছেন; কিন্তু এই চরিত্রগুলি দ্বারা মধ্যে মধ্যে স্থূল হাস্যকর অবকাশ (humorous relief) রচিত হইলেও, ইহারা অনেক ক্ষেত্রেই নাটকের গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশকে আঘাত করিয়াছে। বিশেষতঃ এই চরিত্রগুলি নাট্যকাহিনীর অপরিহার্য অঙ্গরূপে গড়িয়া উঠিতে পারে নাই বলিয়া ইহারা কাহিনীর স্বচ্ছন্দ গতিরও বাধা স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। সেইজন্য এই নাটকে কতকগুলি দৃশ্য সম্পূর্ণ অনাবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হইবে। ভীষ্মের সহিত সৌভরাজ শাল্বের বিদ্বেষের কথা মহাভারতে নাই, নাট্যকার 'নাটক হিসাবে' তাহা এখানে কল্পনা করিয়া লইয়াছেন। তবে এই বিদ্বেষের যে কারণটির নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহা উন্নত রুচি- ও নীতি-সম্মত নহে। শাল্বের চরিত্রও সুপরিকল্পিত হয় নাই।

উল্লিখিত ঘটনাগুলি ব্যতীত মহাভারতের ভীষ্মচরিত্রের সঙ্গে এই নাটকাখ্যানের আর বিশেষ কোন অসঙ্গতি নাই। তবে নাট্যকার ভীষ্মের প্রায় আনুপূর্বিক জীবন এই নাটকের উপজীব্য করিয়া লওয়ায় ইহার কাহিনীর নাট্যিক গঠন-কৌশল নির্দোষ করিয়া তুলিতে পারেন নাই। ভীষ্মের জীবনের প্রারম্ভ হইতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তাঁহার পতনকাল পর্যন্ত প্রকৃতপক্ষে চারি পুরুষের ব্যবধান। এই নাটকে কালগত এই ব্যবধান সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হইয়াছে, তাহার ফলে ঘটনার নিবিড়তা ও তৎসঙ্গে নাট্যকাহিনীর কালগত ঐক্য সর্বাধিক নির্মমভাবে বিনষ্ট হইয়াছে। কাহিনীর অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে নাট্যকারকে নূতন নূতন চরিত্র আনিয়া এই নাটকাখ্যানের মধ্যে স্থান দিতে

হইয়াছে। পঞ্চম অঙ্কের প্রথম দৃশ্য হইতে এক সম্পূর্ণ নূতন পরিবেশের মধ্যে নূতনতর চরিত্র সমাবেশ দ্বারা নূতন সুরে কাহিনী বাঁধিতে হইয়াছে, তাহার ফলে ইহার রস বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। যে কেন্দ্রগত ঘটনার আকর্ষণে নাট্যকাহিনীর অন্যান্য বহির্মুখী ঘটনাসমূহ ঘটিয়া থাকে, এই নাটকের মধ্যে তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না; ইহার কাহিনীর কোন মর্মস্থল নাই—ইহার উত্থান নাই, ইহার পতনও নাই, এই শ্রেণীর কাহিনী সাধারণতঃ নাটকের উপজীব্য হইবার উপযোগী নহে, বরং নাট্যকার ভীষ্মের জীবনের আনুপূর্বিক কাহিনীকে অবলম্বন না করিয়া যদি তাহার একটি অংশের উপর আলোক-সম্পাত করিতেন, তাহা হইলে এই কাহিনী নাট্যিক মর্যাদা লাভ করিতে পারিত। অতএব 'ভীষ্ম' প্রকৃতপক্ষে নাটকাকারে গ্রথিত জীবনী মাত্র, নাটক নহে। ভীষ্মের জীবনের মহৎ আদর্শ অঙ্কিত করাই লেখকের লক্ষ্য ছিল, সেই দিক দিয়া তিনি কতখানি সফলকাম হইয়াছেন, এখন তাহাই বিচার করিয়া দেখিতে হইবে।

ভীষ্ম আদর্শ চরিত্র। নাট্যকার যথার্থই উপলব্ধি করিয়াছেন, ভীষ্মের মত মহৎ চরিত্র আর মহাভারতে নাই বলিলেও চলে। তাঁহার এই মহত্ত্ব সম্পূর্ণই আদর্শবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাঁহার জীবনের সমগ্র মানবিক আশা-আকাঙ্ক্ষা এই আদর্শের মূলেই উৎসর্গীকৃত। এই দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে দেখা যাইবে, নাট্যিক চরিত্র হিসাবে ইহার কোনই সার্থকতা নাই। ভীষ্মের চরিত্রের মধ্যে আত্মসংগ্রাম ও অন্তর্দ্বন্দ্বের যে একেবারে অবকাশ ছিল না, তাহা নহে—নাট্যকারও তাহার ক্ষীণতম আভাস এক স্থানে দিয়াছেন (তৃতীয় অঙ্ক, চতুর্থ দৃশ্য); কিন্তু তাহা স্পষ্টতর হইলে কাহিনীর পৌরাণিক আদর্শ-গৌরব কিছু ক্ষুণ্ণ হইলেও, ইহার নাট্যিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাইত। একমাত্র আদর্শাশ্রিত চরিত্র বলিয়া এই নাটকে ভীষ্ম কিছুতেই যেন দর্শকের নিতান্ত হৃদয়ের সন্নিকটবর্তী বলিয়া বিবেচিত হইতে পারেন না।

এই নাটকে সর্বাপেক্ষা অসঙ্গত চরিত্র অম্বার। অম্বাকে কাশীরাজের জ্যেষ্ঠা কন্যা ও ভীষ্মের প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণী বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। স্বয়ম্বর সভা হইতে ভীষ্ম বলক্রমে তাহার কনিষ্ঠা দুই ভগিনীর সঙ্গে তাহাকেও হস্তিনায় লইয়া আসেন; কিন্তু বিচিত্রবীর্যের সঙ্গে তাহার বিবাহ না দিয়া কনিষ্ঠা ভগিনীদ্বয়ের বিবাহ দিয়া অনূঢ়া অবস্থাতেই তাহাকে হস্তিনার অন্তঃপুরে রাখিয়া দেন। তারপর অম্বা একাকিনী হস্তিনা ত্যাগ করিয়া শাম্বের নিকট তাঁহার

পত্নীত্ব যাজ্ঞা করে, সেখান হইতে প্রত্যাখ্যাত হইয়া পুনরায় ভীষ্মের নিকট উপযাচিকা হয়। নাট্যকার এখানে নীতি, নিয়ম ও সংযমের সকল রকম শাসন নির্মমভাবে উপেক্ষা করিয়াছেন। এই চরিত্রের ব্যর্থ পরিকল্পনাটি এই নাটকের গৌরবহানির জন্য অনেকখানি দায়ী। এই নাটকের ভাষা গদ্যপদ্য-মিশ্র। গদ্যাংশ বৈশিষ্ট্যবর্জিত, পদ্যাংশ অমিত্রাক্ষরে রচিত।

নাট্যকাব্য রচনার ভিতর দিয়া দ্বিজেন্দ্রলালের সমাজ-সম্পর্কিত বিশিষ্ট মতবাদগুলির প্রকাশ তখনও নিঃশেষ হয় নাই, এমন সময় দেশে এক উত্তেজনা-পূর্ণ আন্দোলনের সূত্রপাত হয় এবং তখন হইতে তাহাই অবলম্বন করিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কিত মতবাদগুলি প্রচার করিতে উদ্যোগী হন। এই আন্দোলনই বাঙ্গালার 'স্বদেশী আন্দোলন' নামে পরিচিত। যদিও ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কার্জন কর্তৃক বঙ্গবিচ্ছেদই এই আন্দোলনের জন্য মুখ্যতঃ দায়ী, তথাপি ইহার বহু পূর্বে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে এ-দেশের কতিপয় স্বদেশানুরাগী উৎসাহী ব্যক্তি কর্তৃক 'স্বদেশী মেলা'র প্রতিষ্ঠার পর হইতেই যে এ-দেশের শিক্ষিত সমাজে এক জাতীয়তাবোধের উন্মেষ হইতেছিল, এই স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যে তাহারই পূর্ণতম বিকাশ দেখা গিয়াছিল। এই সদ্য-প্রবর্তিত দেশাত্মবোধ আন্দোলনের প্রতি কোনরূপ আন্তরিক সহানুভূতির জন্যই যে দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার নাট্যসাহিত্যে ইহাকে উপজীব্য করিয়াছিলেন, তাহা নহে; কেবল যুগ-প্রভাব দ্বিজেন্দ্রলালের শক্তিতে অনতিক্রম্য ছিল বলিয়াই তিনি তাঁহার সমসাময়িক নাট্যরচনাগুলি এই ভাবের বাহন করিয়া লইয়াছিলেন। এই কথা বলিবার কারণ এই যে, দ্বিজেন্দ্রলালের এই শ্রেণীর তথাকথিত দেশাত্মবোধক নাট্যরচনাগুলির মধ্য দিয়া তাঁহার বিশিষ্ট সমাজ-চৈতন্যেরই অভিব্যক্তি দেখা দিয়াছে—কুসংস্কার ও সঙ্কীর্ণ আচার-দুষ্ট সমাজ যে কোনদিনই জাতীয় কল্যাণের অধিকারী হইতে পারে না, তিনি এই কথাই বিশেষ করিয়া এই নাটকগুলির মধ্যে বলিতে চাহিয়াছেন; সমাজ- ও ধর্মবোধ-নিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদকে তাঁহার কোন নাটকের মধ্যেই তিনি জয়মাল্য দিয়া ভূষিত করেন নাই। যে কথা তিনি তাঁহার 'একঘরে' নিবন্ধে প্রকাশ করিয়াছেন, কিংবা যে কথা তিনি তাঁহার সামাজিক প্রহসনগুলির ভিতর দিয়া, এমন কি কোন কোন নাট্যকাব্যগুলির ভিতর দিয়াও বলিতে চাহিয়াছেন, তাহাই তিনি তাঁহার এই দেশাত্মবোধক নাটকগুলির মধ্য দিয়াও প্রচার করিয়াছেন। অতএব দ্বিজেন্দ্রলালের দেশাত্মবোধক নাটকগুলির আলোচনা-সম্পর্কে বাংলার স্বদেশী

আন্দোলনের বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক, তাঁহার এই নাটকগুলির মধ্য দিয়া স্বদেশী আন্দোলনের মূল আদর্শ বা তাহার প্রকৃতি কিছুই ধরা পড়ে নাই—সমসাময়িক স্বদেশী আন্দোলনের দেশাত্মবোধক তাঁহার বিশিষ্ট সামাজিক মতবাদ প্রকাশেরই অবলম্বনরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে মাত্র। এই কথাটি আরও একটু স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে হইলে বঙ্গবিচ্ছেদ আন্দোলন সম্বন্ধে দ্বিজেন্দ্রলালের ব্যক্তিগত মনোভাব যে কি ছিল, তাহা জানা প্রয়োজন ; অতএব এ বিষয়ে একটু আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

দ্বিজেন্দ্রলালের জীবন-চরিত আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে বঙ্গ-বিচ্ছেদের প্রতিবাদরূপে মুখ্যতঃ স্বদেশী আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছিল, সেই বঙ্গ-বিচ্ছেদের প্রতি দ্বিজেন্দ্রলালের আন্তরিক সহানুভূতিই বর্তমান ছিল। দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা যে ব্যবস্থার প্রতিবাদ করিতেছিল, স্বাধীন-চেতা দ্বিজেন্দ্রলাল নিজের বুদ্ধি ও বিবেকদ্বারা তাহার পরিণাম বিবেচনা করিয়া তাহার পক্ষপাতিত্বই করিয়াছিলেন। এই সম্পর্কে তাঁহার জীবন-চরিতকার লিখিয়াছেন,—'মূলে, যে-কারণে দেশে এই আন্দোলন সুরু হইল, (অর্থাৎ ঐ বঙ্গচ্ছেদ বা পার্টিশন) দ্বিজেন্দ্রলাল প্রথম হইতেই তাহার এক রূপ পক্ষপাতই দেখাইতেছিলেন। গোটা দেশের সমস্ত লোক যে-সম্বন্ধে এতটা জেদের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত, একা দ্বিজেন্দ্রলালকে সে-সম্বন্ধে এমন ভিন্ন মতাবলম্বী দেখিয়া খুবই অবশ্য আশ্চর্যান্বিত হইতে হয় ; কিন্তু, যাঁহারা তাঁহাকে তেমন যাচাইয়া জানিতেন, তাঁহাদের পক্ষে ইহাতেও তত বিস্ময়-বোধের কারণ ছিল না" (দেবকুমার রায়চৌধুরী, দ্বিজেন্দ্রলাল, ১৩২৮, পৃঃ ৩৯৩)। তাঁহার জীবন-চরিতকার অন্যত্রও লিখিয়াছেন,—'দেশের-আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই যে বঙ্গবিভাগের অপকারিতা সম্বন্ধে সন্ত্রস্ত ও শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন, দ্বিজেন্দ্রলাল ধীরভাবে তাহারই বহু গুণ ও কল্যাণকর পরিণাম, নিঃসংশয় দৃঢ়তার সঙ্গে, অনুকূল যুক্তিবলে প্রচার করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার এই বিচিত্র আচরণ তখন আমাদের এতই বিসদৃশ ও বিরক্তিকর বোধ হইত যে, সেই প্রবল উত্তেজনার মুখে, এজন্য কখনও কখনও আমরা ক্রোধে আত্মবিস্মৃত হইয়া, যা-মুখে-আসিত তাই বলিয়া অত্যন্ত অশোভন ভাবে তাঁহাকে গালি দিতেও দ্বিধা করি নাই' (ঐ, পৃঃ ৩৯৫)। এমন কি, দেশব্যাপী আন্দোলনের ফলে এই বঙ্গ-বিচ্ছেদ যখন রদ হইয়া যাইবে বলিয়া শোনা যাইতে লাগিল, তখন তিনি এক পত্রে তাঁহার এক বন্ধুর নিকট এই প্রকার আশঙ্কা প্রকাশ করিতেছেন,

'Partition রদ হওয়ার উপক্রম হয়েছে শুনছি। কিন্তু বেহারের সঙ্গে আবার বিচ্ছেদ হবে নাকি? বেহারীদের সঙ্গে বাঙ্গালীদের তেমন মনের মিল—সদ্ভাব নাই সত্য, কিন্তু ক্রমে একদিন তাহাদেরও সহানুভূতি ও সাহায্য যে পাওয়া যেত এ'বার তা'হলে সে আশাও গেল, Partition-এর সময়ে আমরা বলেছিলাম যে এ'র একটা bright side আছে। তোমরা ত তখন আমার উপরে খড়্গহস্তই ছিলে। সে ভালোর দিকটা এই যে,—একদিকে বাঙ্গালী আসামীদের শিক্ষিত করুক, আর একদিকে বেহারীদের শিক্ষিত করুক। নইলে একা বাঙ্গালীর আর বল কতটুকু?' (ঐ, পৃঃ ৩২৫-২৬)

এই স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে 'দ্বিজেন্দ্রলালের তেমন কোন প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ ছিল না' এবং এ'কথাও সত্য যে 'স্বদেশী-সভায় বক্তৃতা দিয়া লোক মাতাইতে দ্বিজেন্দ্রলাল কোনদিন আসরে নামেন নাই।' (ঐ, পৃঃ ৩২০) এই কথা বিশেষ ভাবে বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, কেহ কেহ মনে করেন, 'Dvijendralal Roy was deeply stirred by the Svadesi movement, and for a time almost completely threw himself into it.' (P. Guha-Thakurta, *Bengali Drama*, London, 1930, p. 154.) বাঙ্গালীর এই নবপ্রবুদ্ধ জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে দ্বিজেন্দ্রলালের এই বিশ্বাস ছিল যে, 'যতদিন আমাদের সামাজিক অনেক প্রথাই উঠিয়া না যায় অর্থাৎ সময়ানুরূপ সংস্কৃত না হয়, ততদিন আমাদের politically এক হওয়া অসম্ভব (ঐ, পৃঃ ৪৩৮)।' তাঁহার স্বদেশ-প্রেমমূলক নাটকগুলির মধ্যে তিনি এই কথাই বলিতে চাহিয়াছেন, ইহার অতিরিক্ত আর কিছু বলেন নাই।

দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাট্যরচনার যুগকে দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে; প্রথমতঃ ঐতিহাসিক নাট্যরচনার প্রথম যুগ ও দ্বিতীয়তঃ ঐতিহাসিক নাট্যরচনার দ্বিতীয় যুগ। তাঁহার দেশাত্মবোধক নাটকগুলি প্রথম যুগের অন্তর্গত; এই নাটকগুলির মধ্যেও দ্বিজেন্দ্রলালের আত্মসচেতনতা অত্যন্ত প্রখর; এই দিক দিয়া এই নাটকগুলি বিশেষভাবেই রোমান্টিক-ধর্মী। এই শ্রেণীর নাটক তিনি মাত্র তিনখানি রচনা করিয়াছেন,—'প্রতাপ সিংহ', 'দুর্গাদাস' ও 'মেবার পতন'। বিষয়বস্তু সর্বত্রই টড্-প্রণীত 'রাজস্থানের কাহিনী' হইতে গৃহীত হইলেও, নিজের বক্তব্য বিষয় স্পষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে কোন কোন চরিত্রের উপর নাট্যকারের স্বকীয় মনোভাব প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। টড্-প্রণীত 'রাজস্থানের কাহিনী'র ঐতিহাসিকত্ব বিচার করিতে গেলে এবং নাট্যকারের

বিশিষ্ট আত্মভাব-প্রাধান্যের উপর লক্ষ্য করিলে, এই নাটকগুলিকে যথার্থ ঐতিহাসিক নাটক বলিয়া উল্লেখ করিতে পারা যায় না। ইহাদিগকে প্রকৃতপক্ষে রোমান্টিক নাটক বলিয়া নির্দেশ করাই সঙ্গত; তথাপি ঐতিহাসিক পরিবেশ এই সকল নাটকে যথেষ্ট প্রাধান্য লাভ করিয়াছে বলিয়া ইহাদিগকে ব্যাপকভাবে ঐতিহাসিক নাটকেরই অন্তর্ভুক্ত করা যাইতেছে।

পৌরাণিক আখ্যানমূলক দুইখানি নাট্যকাব্য রচনার পর দ্বিজেন্দ্রলাল ক্রমে ঐতিহাসিক নাটক রচনায় মনোনিবেশ করেন, তবে তখনও নাটকের গঠনভঙ্গির দিক দিয়া পূর্বোক্ত নাটক দুইখানির প্রভাব একেবারে তিরোহিত হয় নাই। পূর্বেই বলিয়াছি, টডের 'রাজস্থানের কাহিনী'ই দ্বিজেন্দ্রলালের প্রধান ঐতিহাসিক উপজীব্য ছিল এবং ইহা হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া তিনি সর্বপ্রথম যে নাটক রচনা করেন, তাহার নাম 'তারাবাই'। তখনও এদেশে স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত হয় নাই বলিয়াই ইহার মধ্যে দেশাত্মবোধের তেমন কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। 'তারাবাই' অতিনাটকীয় লক্ষণাক্রান্ত একটি নাট্যকাব্য। নিয়তিবাদই এই নাট্যকাব্যের মূল ভিত্তি। কাহিনীটি সংক্ষেপে এই,—

মেবারের বৃদ্ধ রাণা রায়মলের তিন পুত্র,—সঙ্গ, পৃথ্বী ও জয়মল। পিতার মৃত্যুর পর ইহাদের মধ্যে কে রাণা হইবে তাহা লইয়া জল্পনা কল্পনা চলিতেছিল। মুমূর্ষু রাণার শয্যাপার্শ্বে একদিন সঙ্গ ও পৃথ্বী এই লইয়া পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। এই অপরাধে রাণা পৃথ্বীকে রাজ্য হইতে নির্বাসিত করিলেন এবং সঙ্গকেও রাজ্যের অধিকার হইতে বঞ্চিত করিলেন। তিনি কনিষ্ঠ পুত্র জয়মলকে সিংহাসন প্রদান করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিলেন। মনোদুঃখে সঙ্গ নিরুদ্দিষ্ট হইলেন। তোড়ার অধিপতি শূরতান রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়া সপরিবারে নির্বাসনে কালযাপন করিতেছিলেন। তাঁহার এক কন্যা ছিল, নাম তারা। পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধার করা তাহার সঙ্কল্প ছিল। জয়মল তাহার প্রণয়াসক্ত হন, কিন্তু অবশিষ্ট আচরণের জন্য শূরতানের হস্তে মৃত্যুমুখে পতিত হন। মেবারের সেনাপতির নাম সূর্যমল, তিনি রাণা রায়মলের ভ্রাতা। পত্নী তামসীর প্ররোচনায় তিনি এবার মেবারের সিংহাসন অধিকার করিবার জন্য ভ্রাতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। এ দিকে পৃথ্বী নিজের বাহুবলে পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়া দিয়া তারাকে বিবাহ করেন। তিনি পত্নী তারার সহায়তায় মেবারের বিদ্রোহ দমন করিয়া পিতৃব্য সূর্যমলকে বন্দী করেন। অনুতপ্ত রাজা এবার পৃথ্বীকেই মেবারের সিংহাসন দান করিবার

সঙ্কল্প করেন। রায়মলের এক কন্যা ছিল, নাম যমুনা। সিরোহীর অপদার্থ রাজা প্রভুরাওর সঙ্গে তাহার বিবাহ হইয়াছিল। পৃথ্বী মেবারের সিংহাসনের পথে তাঁহার কণ্টক—ইহা বিবেচনা করিয়া একদিন প্রভুরাও তাঁহার গৃহে অতিথি পৃথ্বীকে খাদ্যের সঙ্গে বিষ মিশ্রিত করিয়া হত্যা করিল। পতির মৃত্যুতে তারা নিজেও আত্মঘাতিনী হইল।

পৃথ্বীর জীবনের করুণতম ট্র্যাজিডির মধ্যে নিয়তিরই অমোঘ বিধানের কথা ঘোষিত হইয়াছে। পৃথ্বী এই নাটকের মধ্যে প্রকৃতই বীর চরিত্র; তিনি প্রজাদিগের প্রিয়; ভাগ্যক্রমে পিতা কর্তৃক নির্বাসিত হইয়া নিজের বাহুবলে এক স্বতন্ত্র রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা; শুধু তাহাই নহে, নিজের বাহুবলে তারার পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিয়া দিয়া তিনি তারার মত সুন্দরী ও বিদুষী নারীকে জীবনে লাভ করিয়াছিলেন; তারপর পৃথ্বী নিজের পিতৃরাজ্যে বিদ্রোহ দমন করিয়া যখন মেবারের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইবার স্বপ্ন সফল করিতে চলিয়াছিলেন তখনই অলক্ষিতে নিজেরই পরম আত্মীয়ের বিশ্বাসঘাতকতায় তাঁহাকে মৃত্যু বরণ করিতে হইল। তাঁহার বীর্যোন্নত কীর্তিমান জীবন এক কাপুরুষ বিশ্বাসঘাতকের নির্মমতায় নিশ্চিহ্ন হইল। এই নাটকের ট্র্যাজিডি এইখানেই।

'তারাবাই' এই নাটকের নামকরণ হইলেও ইহার মধ্যে 'তারাবাই'র চরিত্র তেমন প্রাধান্য লাভ করিতে পারে নাই, কিংবা তারাবাইকে কেন্দ্র করিয়াও এই নাট্যকাহিনী আবর্তিত হয় নাই; এই নাটকের ট্র্যাজিডির মূলে তাবাবাইর যে কোন বিশিষ্ট দান আছে তাহাও নহে। প্রকৃতপক্ষে মেবারের সিংহাসনকে কেন্দ্র করিয়াই ইহার কাহিনী আদ্যোপান্ত আবর্তিত হইয়াছে। এই সিংহাসনের জন্যই পৃথ্বীর নির্বাসন, সঙ্গের বৈরাগ্য; ইহার জন্যই সূর্যমলের বিদ্রোহ এবং ইহার জন্যই পরিণামে পৃথ্বীর উপর বিষ-প্রয়োগ। অতএব এই সিংহাসনের উপর ভগবানের অভিশাপ নির্দেশ করাই যেন লেখকের উদ্দেশ্য ছিল। এই বিষয়টিই নাটকের মধ্যে স্পষ্ট হইয়াছে।

এই নাটকের উপর সেক্সপীয়রের 'ম্যাকবেথ' নাটকখানিরও একটু প্রভাব আছে বলিয়া অনুমিত হয়। ইহার সূর্যমলের চরিত্রের মধ্যে ম্যাকবেথ-চরিত্রের ক্ষীণ প্রভাব রহিয়াছে এবং সূর্যমলের পত্নী তমসার চরিত্রের উপর লেডী ম্যাকবেথের প্রভাব আরও একটু স্পষ্ট বলিয়া অনুভূত হয়। কিন্তু সূর্যমলের চরিত্রে আনুপূর্বিক সঙ্গতি রক্ষা পাইলেও, তমসার চরিত্রের মধ্যে তাহার অভাব আছে। অতএব নাট্যিক চরিত্র হিসাবে

তমসা ততখানি সার্থকতা লাভ করিতে পারে নাই। সেইজন্য সেক্সপীয়রের প্রভাবও বিশেষ কার্যকরী হইতে পারে নাই। সূর্যমলের বিচারের দৃশ্যে নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নাটকের নক্ষত্র রায়ের বিচারের দৃশ্য দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছেন।

এই নাটকের প্রধান চরিত্র পৃথ্বী। রাজপুত চারণদিগের গীতিকায় পৃথ্বীর কাহিনী বহুল প্রচলিত আছে বলিয়া টড্ উল্লেখ করিয়াছেন। এই নাটকের মধ্যেও পৃথ্বীই যথার্থ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। পৃথ্বীর চরিত্র উদ্ধত প্রকৃতির, শৌর্য তাঁহার থাকিলেও তাহা বিনয় ও সৌজন্য দ্বারা শাসিত নয়; সেইজন্য পৃথ্বী নাটকে প্রাধান্য লাভ করিলেও একমাত্র তাঁহার শেষ দৃশ্যটি ব্যতীত অন্য কোথাও তিনি দর্শকের ঔৎসুক্য আকর্ষণ করিতে পারেন নাই। বিয়োগান্তক নাটকের নায়কের বিশেষ কতকগুলি সদ্‌গুণ থাকিবার প্রয়োজন; একমাত্র উদ্ধত শৌর্য ব্যতীত পৃথ্বীর আর কোন গুণ নাই, সেইজন্য এই চরিত্রটির পরিকল্পনা একেবারে নির্দোষ নহে।

তারাবাইর চরিত্রও তেমন আকর্ষণীয় হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা' নাটকের চিত্রাঙ্গদা চরিত্রের অনুরূপ তাহার চরিত্রেও যে পৌরুষের কল্পনা করা হইয়াছে, তাহা পুর্বাপর সঙ্গতিহীন বলিয়াই ব্যর্থ হইয়াছে। পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধার করিতে তিনি অন্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া নিজে নিশ্চেষ্ট রহিয়াছেন। বিবাহান্তে স্বামী কর্তৃক উপেক্ষিত হইয়াও আত্মমর্যাদাবোধে তাঁহার আঘাত লাগে নাই। সঙ্গ ও জয়মলের সাহচর্যে আসিয়া তাঁহাদের প্রতি তিনি যে কি মনোভাব পোষণ করিতেন তাহা যেমন অস্পষ্ট, পৃথ্বীর প্রতি তাঁহার প্রণয়সঞ্চারও তেমনই আকস্মিক। সেইজন্যই স্বামীর মৃত্যু-শয্যাপার্শ্বে আত্মঘাতিনী হইয়াও তিনি দর্শকের মনের উপর প্রভাব স্থাপন করিতে পারেন নাই।

'তারাবাই'র ভাষা গদ্যপদ্য-মিশ্র। ইহার পদ্যাংশ বৈশিষ্ট্যহীন অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত—প্রায় সর্বত্রই সরসতার অভাব। গদ্যাংশ রচনায়ও দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষার যথার্থ শক্তির পরিচয় এখনও পাওয়া যাইতেছে না।

স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই দ্বিজেন্দ্রলাল বাহ্যতঃ ইহার নবপ্রবুদ্ধ দেশাত্মবোধের আদর্শ অবলম্বন করিয়া সর্বপ্রথম যে নাটক-খানি রচনা করেন তাহাই 'প্রতাপসিংহ'। 'প্রতাপসিংহ' রচনার ভিতর দিয়া দ্বিজেন্দ্রলালের এক স্বতন্ত্র নাট্যরচনার যুগের সূত্রপাত হয়;

দ্বিজেন্দ্রলালের নিজস্ব নাট্যিক গদ্যভাষারও সার্থক উন্মেষ ইহাতে সর্বপ্রথম সূচিত হয়।

'প্রতাপ সিংহ'-এর আখ্যানভাগ মূলতঃ টড্-প্রণীত 'রাজস্থানের কাহিনী' হইতেই গৃহীত হইয়াছে। টড্-প্রণীত 'রাজস্থানের কাহিনী' হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল এই যুগে অন্যান্য যে কয়খানি নাটক রচনা করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে ইহার আখ্যানভাগেই মূলের প্রতি সর্বাধিক আনুগত্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই দিক দিয়া ঐতিহাসিক নাটক হিসাবে ইহার কতকটা সার্থকতা স্বীকার করিতেই হয়। যদিও দেশাত্মবোধজাত ভাবপ্রবণতার উপর ভিত্তি করিয়া এই নাটকখানি রচিত, তথাপি ভাব-সংযম ইহার একটি বিশিষ্ট গুণ।

মেবারের রাজ্যভ্রষ্ট রাণা প্রতাপ সিংহ রাজপুত সর্দারগণসহ মেবারের রাজধানী চিতোর উদ্ধার করিবার জন্য দেবতার সম্মুখে কঠিন শপথ গ্রহণ করিলেন। রাজপুতানার সমগ্র অংশ মোগলসাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছে, প্রতাপ পরিবারবর্গসহ অরণ্যে আশ্রয় লইয়াছেন। কিন্তু মেবার মোগলসাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াও শ্মশানতুল্য—প্রতাপের আদেশে মেবারের অধিবাসিগণ মেবার ত্যাগ করিয়া গিয়াছে। মোগল সম্রাট্ আকবর প্রতাপকে বশীভূত করিবার জন্য তাঁহার প্রধান সেনাপতি মান সিংহকে তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে বলিলেন। ইতিমধ্যে মান সিংহ প্রতাপ কর্তৃক অপমানিত হইয়াছিলেন, অতএব তিনি এক বিরাট মোগল সৈন্য লইয়া আসিয়া প্রতাপসিংহকে আক্রমণ করিলেন। হল্‌দিঘাটের রণক্ষেত্রে প্রতাপ তাঁহার সামান্য সৈন্যবল লইয়া অসীম বীরত্বের সহিত তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। কিন্তু রাজপুত সৈন্য পরাজিত হইল। অশ্ব চৈতক যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রতাপকে লইয়া পলাইয়া গেল। পরিবারবর্গসহ প্রতাপ গভীরতর অরণ্যে আশ্রয় লইলেন। মোগল সৈন্য বারবার তাঁহাকে বন্দী করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু তিনি বিশ্বস্ত সর্দারদিগের সহায়তায় সর্বত্রই রক্ষা পাইলেন; পরিবারবর্গসহ তিনি নিদারুণ দুঃখকষ্ট ভোগ করিতে লাগিলেন। দুঃখকষ্টের জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া একবার তিনি মোগলের বশ্যতা স্বীকার করিবেন স্থির করিলেন; কিন্তু বিশ্বস্ত অনুচরদিগের সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি পাইয়া সেই সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন। জীবনের শেষভাগে প্রতাপ মেবারের কোন কোন অংশ পুনরুদ্ধার করিলেন; কিন্তু রাজধানী চিতোর উদ্ধার করিতে পারিলেন না।

এই মূল ঐতিহাসিক কাহিনীটি ব্যতীত ইহার মধ্যে প্রতাপের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শক্ত সিংহ ও আকবরের ভাগিনেয়ী দৌলতউন্নিসার একটি রোমান্টিক কাহিনী আছে—মূল নাট্যকাহিনীর সঙ্গে ইহার খুব নিবিড় যোগ অনুভব করা যায় না। আকবরের কন্যা মেহেরউন্নিসারও ব্যর্থ প্রণয়ের একটি রোমান্টিক বৃত্তান্ত এই নাটকাখ্যানের অঙ্গীভূত করা হইয়াছে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মূল নাটকাখ্যানের সহিত ইহারও যোগ খুব নিবিড় বলিয়া অনুভূত হয় না—তবে প্রতাপ সিংহের চরিত্রের একটি দিক ইহার সংস্পর্শে সুপরিস্ফুট হইয়াছে, এই দিক দিয়া নাটকে দৌলতউন্নিসা অপেক্ষা মেহেরউন্নিসার অবস্থিতি অধিকতর প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হইবে।

নাটকের প্রধান চরিত্র প্রতাপ সিংহ, মান সিংহ, শক্ত সিংহ প্রভৃতি প্রত্যেকেই ঐতিহাসিক চরিত্র—এই তিনটি চরিত্রই এই নাটকে উল্লেখযোগ্য। স্ত্রীচরিত্রের মধ্যে একমাত্র প্রতাপের পত্নী লক্ষ্মীর চরিত্র ব্যতীত আর কোন চরিত্রই সম্যক্ স্ফূর্তি লাভ করিতে পারে নাই। ঐতিহাসিক নির্দেশ পদে পদে অনুসরণ করিয়া ইহাতে যে সকল চরিত্র পরিকল্পিত হইয়াছে, তাহাদের চরিত্রগত সঙ্গতি কতকটা রক্ষা পাইলেও, এই নাটকের রোমান্টিক অংশ কল্পনার দিক দিয়া নিতান্ত শক্তিহীন।

প্রতাপ সিংহের চরিত্র টড্-প্রণীত 'রাজস্থানের কাহিনীর' মধ্যে যেমন পাওয়া যায়, নাটকের মধ্যেও তাহার কোনই ব্যতিক্রম দেখা যায় না। টড্ কর্তৃক উল্লিখিত প্রত্যেকটি ঘটনাকেই ইহাতে নাট্যরূপ দেওয়ার প্রয়াস করা হইয়াছে। অতিরিক্ত ঐতিহাসিক তথ্যানুরক্তির জন্য চরিত্রটিতে কতকগুলি সদ্গুণের সমাবেশ সত্ত্বেও ইহা নির্জীব বলিয়া মনে হয়। ঐতিহাসিক প্রতাপ সিংহের অন্তরালবর্তী মানুষ প্রতাপ সিংহকে অনুসন্ধান করিবার যে দায়িত্ব নাট্যকারের ছিল, তাহা এখানে সম্যক্ পালন করা হয় নাই বলিয়াই চরিত্রটি নাটকীয় চরিত্র হিসাবে তেমন সার্থকতা লাভ করিতে পারে নাই।

মান সিংহের চরিত্র পরিকল্পনায় নাট্যকার ঐতিহাসিক নির্দেশই সর্বথা অনুসরণ করিলেও, তাঁহার মধ্য দিয়াই তিনি তাঁহার নিজস্ব সমাজ-সম্পর্কিত বক্তব্য বিষয়ও প্রকাশ করিয়া লইবার সুযোগ গ্রহণ করিয়াছেন। মান সিংহ মোগলের দাস, আকবরের শ্যালকপুত্র এবং যুবরাজ সেলিমের সঙ্গে তাঁহার ভগিনীর বিবাহের কথা চলিতেছিল; এই হিসাবে হিন্দু বা রাজপুত সমাজে

তাঁহার স্থান নিন্দনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। মান সিংহের এই অবস্থাটির সুযোগ লইয়া নাট্যকার তাঁহার মুখ দিয়া হিন্দুসমাজের আচারগত সঙ্কীর্ণতার কথা ব্যক্ত করিয়াছেন (৫ম অঙ্ক, ৬ষ্ঠ দৃশ্য দ্রষ্টব্য)। সমাজ-সম্পর্কিত মান সিংহের এই সকল উক্তির ভিতর দিয়া নাট্যকারের ব্যক্তিগত সামাজিক মতবাদই প্রকাশ পাইয়াছে। সামাজিক সঙ্কীর্ণতা বিসর্জন দিতে না পারিলে দেশাত্ম-বোধ যে অর্থহীন, তাহাই এখানে নাট্যকারের বক্তব্য বিষয়। প্রতাপ সিংহের পরাজয়ের জন্য যে রাজপুতজাতির সামাজিক সঙ্কীর্ণতাই দায়ী, মান সিংহের মুখ দিয়া নাট্যকার তাহাই প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন এবং নাটকের মধ্যে এই কথাটিই প্রাধান্য লাভ করিয়া গিয়াছে। সামাজিক দিক দিয়া প্রতাপ সিংহের চরিত্রে উদারতা ছিল না; মান সিংহের পরিবার মোগল পরিবারের সহিত বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছে বলিয়া তিনি মান সিংহকে অপমানিত করিয়াছিলেন; শক্ত সিংহ মোগল রমণী দৌলতউন্নিসাকে বিবাহ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রতাপ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; প্রতাপ চরিত্রের এই সামাজিক সঙ্কীর্ণতার দিকটাকে এই নাটকে বিশেষ প্রাধান্য দেওয়ার ফলে ট্র্যাজিডির নায়ক হিসাবে প্রতাপের চরিত্র তেমন স্ফূর্তি লাভ করিতে পারে নাই। অথচ মান সিংহকেও এই নাটকের নায়ক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। দেশাত্মবোধক পরিবেশের মধ্যে সামাজিক প্রশ্ন অবতারণার ফলে ইহার উদ্দেশ্য সুনির্দিষ্ট হইয়া উঠিতে পারে নাই।

প্রতাপের ভ্রাতা শক্ত সিংহের চরিত্র এই নাটকের অন্যতম উল্লেখযোগ্য চরিত্র। নাট্যকার ইহার ঐতিহাসিক মর্যাদা যথাসাধ্য রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু শক্ত সিংহের চরিত্র একটু জটিল। জন্মভূমি মেবারের সঙ্গে তাঁহার সম্পর্ক শৈশব হইতেই একরকম বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল, সেইজন্য জন্ম-ভূমির প্রতি তাঁহার কোন আন্তরিক আকর্ষণ ছিল না; সাহচর্যের অভাবে ভ্রাতার সঙ্গেও তাঁহার সম্প্রীতির ভাব গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। কোনও ধর্মমতের প্রতিই তাঁহার কোন অন্ধ বিশ্বাস নাই। শক্ত সিংহ খেয়ালী প্রকৃতির লোক, তাঁহার জীবনের নির্দিষ্ট কোন লক্ষ্যও নাই; মোগলের সঙ্গে যোগ দিতেও যেমন তাঁহার বাধে না, তেমনি ভ্রাতাকে রক্ষা করিতে অগ্রসর হইতেও তিনি কোনও দ্বিধা করেন নাই। তবে দৌলতউন্নিসার সঙ্গে তাঁহার আচরণ একটু অসঙ্গত হইয়াছে; তাঁহার জীবনের এই নিতান্ত মানবিক অংশটির পরিকল্পনায় নাট্যকার যথার্থ শক্তির পরিচয় দিতে পারেন নাই। এই নাটকের

অন্যান্য চরিত্র একেবারেই বৈশিষ্ট্যহীন। নিতান্তই ঐতিহাসিক তাগিদে নাট্যকার ইহার মধ্যে কতকগুলি অনাবশ্যক চরিত্রেরও স্থান দিয়াছেন।

এই নাটকের প্রধান ত্রুটি এই যে, ইহার কেন্দ্রগত কোন কাহিনী নাই— প্রতাপ সিংহের জীবন-সম্পর্কিত কতকগুলি বিচ্ছিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনা ইহাতে বিভিন্ন দৃশ্যের ভিতর দিয়া নাট্যরূপে প্রকাশ করা হইয়াছে মাত্র; সেইজন্য ইহার যবনিকাপাতের সঙ্গে সঙ্গে কোন রকম কাহিনীগত ঔৎসুক্যের নিবৃত্তি হয় না। এই নাটক প্রকৃত পক্ষে দ্বিজেন্দ্রলালের পরবর্তীকালে, রচিত নাটক 'মেবার পতন'-এর প্রথম খণ্ড বলিয়া ধরিয়া লইতে পারা যায়। সেইজন্য কাহিনীর দিক দিয়াই ইহার মধ্যে কোন সুস্পষ্ট সম্পূর্ণতার নির্দেশ নাই। ইহা দ্বিজেন্দ্রলালের এই শ্রেণীর ঐতিহাসিক নাটক মাত্রেরই একটি বিশেষ ত্রুটি।

'প্রতাপ সিংহ'-এর পর 'রাজস্থানের কাহিনী' হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল আরও একখানি অনুরূপ নাটক রচনা করেন, তাহার নাম 'দুর্গাদাস'। 'প্রতাপ সিংহ' ঐতিহাসিক নাটকের মর্যাদা লাভ করিতে পারিলেও, 'দুর্গাদাস'-এ রোমাণ্টিক ভাব অত্যন্ত প্রবল, সেইজন্যই ইহার ঐতিহাসিক মর্যাদা অনেকাংশেই ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। ইহার কাহিনীভাগ সংক্ষেপে এই—ঔরংজীবের চক্রান্তে যোধপুররাজ যশোবন্ত সিংহের মৃত্যু হইলে সম্রাট্ তাঁহার বিধবা পত্নী মহামায়া ও শিশুপুত্র অজিত সিংহকে বন্দী করিতে চাহিলেন। কিন্তু মাড়বার সেনাপতি দুর্গাদাসের অসীম সাহসিকতায় রাণী ও রাজপুত্র ঔরংজীবের কবল হইতে মুক্ত হইয়া মেবারের রাণা জয় সিংহের আশ্রয় লাভ করেন। ঔরংজীব তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সসৈন্যে মেবার আক্রমণ করেন। রাজপুত সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধে মোগল সৈন্য পরাজিত হয়। দুর্গাদাস বিজয়ী রাজপুত সৈন্যের অধিনায়কত্ব করেন। পরাজিত মোগল সৈন্য অধিকতর শক্তি সংগ্রহ করিয়া পুনরায় মাড়বার আক্রমণ করেন। মোগল সৈন্য এইবারও রাজপুত সৈন্যের নিকট পরাজিত হয় এবং ঔরংজীবের পুত্র আকবর সপরিবারে বন্দী হন। অতঃপর ঔরংজীব রাজপুতদিগের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া দাক্ষিণাত্যে শিবাজির পুত্র শম্ভুজিকে দমন করিবার জন্য অগ্রসর হন। পতির রাজ্য নিষ্কণ্টক করিয়া পুত্র অজিত সিংহকে সিংহাসনে বসাইয়া যশোবন্তের পত্নী পতির উদ্দেশ্যে জলন্ত চিতায় আত্মবিসর্জন করেন। ঔরংজীবের ক্রোধ হইতে শাহ্‌জাদা আকবরকে আশ্রয় দেওয়ার অপরাধে রাজপুতদলপতিগণ দুর্গাদাসকে পরিত্যাগ করেন। দুর্গাদাস আকবর সহ

শম্ভুজির আশ্রয় প্রার্থনা করেন। সেখানে শম্ভুজির এক মুসলমান অনুচরের বিশ্বাসঘাতকতায় দুর্গাদাস ঔরংজীবের হস্তে বন্দী হন। সম্রাজ্ঞী গুল্‌নেয়ার বন্দী দুর্গাদাসের নিকট প্রণয় নিবেদন করেন, তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁহার চরিত্রবলে মুগ্ধ হইয়া ঔরংজীবের সেনাপতি দিলির খাঁ তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দেন। দুর্গাদাস পুনরায় রাজপুত দলপতিদিগের আহ্বানে রাজপুতানায় ফিরিয়া আসেন। তাঁহার আশ্রিত শাহ্‌জাদা আকবর বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া মক্কা যাত্রা করেন। অজিত সিংহ কর্তৃক আকবরের কন্যা রাজিয়াকে ঔরংজীবের হস্তে সমর্পণ করার অপরাধে দুর্গাদাস পুনরায় নির্বাসিত হইয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করেন। দাক্ষিণাত্যে শম্ভুজি ঔরংজীবের হস্তে বন্দী হইয়া নিহত হন; কিছুদিন পর ঔরংজীবেরও তথায় মৃত্যু হয়।

এই নাটকের প্রধান ত্রুটি এই যে, ইহাতে কাহিনীগত কোনও কেন্দ্রীয় ঐক্য নাই। এই ত্রুটি প্রতাপ সিংহ হইতেও ইহাতে অধিক। বিভিন্ন ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া একই বিশিষ্ট লক্ষ্যে উপস্থিত হওয়াই নাট্যকাহিনীর উদ্দেশ্য। এখানে বিভিন্ন ঘটনাস্রোত একলক্ষ্যমুখী না হইয়া বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। দুর্গাদাসের চরিত্রের মধ্য দিয়া আদর্শ দেশপ্রেম ও তৎসহ নৈতিক চরিত্রবল দেখানই এই নাটকের উদ্দেশ্য। তাহাই দেখাইতে গিয়া নাট্যকার এখানে কতকগুলি পরস্পর সম্পর্কহীন বিচ্ছিন্ন ঘটনার পরিকল্পনা করিয়াছেন। ঘটনাগুলি মূল নাট্যকাহিনীর অপরিহার্য অগ্রগতির ধারা অনুসরণ করিয়া অনেক ক্ষেত্রেই অগ্রসর হইতে পারে নাই; সেইজন্য সমগ্রভাবে নাট্যকাহিনীটি দর্শকের মনে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। ইহার অন্যতম ত্রুটি এই যে, এই নাটকের প্রথমাংশে ঘটনাস্রোত অত্যন্ত দ্রুত প্রবাহিত হইয়াছে, কিন্তু শেষাংশে তাহা অত্যন্ত শিথিলগতি হইয়া পড়িয়াছে —কাহিনীর নাট্যিক ঔৎসুক্য শেষ পর্যন্ত কিছুতেই রক্ষা পায় নাই। কালগত ঐক্যও এই নাটকে নির্মমভাবে বিপর্যস্ত হইয়াছে।

কাহিনীর অসঙ্গতিও এই নাটকের মধ্যে নিতান্ত অল্প নহে। রাজপুত বীরত্বের আদর্শকে সবদিক হইতেই জয়মাল্য দ্বারা ভূষিত করিতে গিয়া নাট্যকার এখানে কাহিনীর বাস্তবতা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া গিয়াছেন। অনেক সময় এই ত্রুটি নিতান্ত পীড়াদায়ক বলিয়া মনে হয়। চরিত্র-সৃষ্টিও ইহার মধ্যে সার্থকতা লাভ করিতে পারে নাই। প্রথমে দুর্গাদাস চরিত্রের কথাই ধরা যাক। দ্বিজেন্দ্রলালের পরিকল্পনায় দুর্গাদাস আদর্শমাত্রে পর্যবসিত হইয়াছেন,

তাঁহার কোন রক্তমাংসের পরিচয় আছে বলিয়া মনে হয় না। নাট্যকার সে যুগের দেশপ্রেমিকতার আদর্শকে দুর্গাদাসের স্বদেশপ্রেম, বীরত্ব, আত্মত্যাগ, কর্তব্যনিষ্ঠা ও চরিত্রবলের মধ্য দিয়া রূপ দিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের মতে দুর্গাদাস আদর্শ পুরুষ, তাঁহার সাহস অসীম, প্রভুভক্তি অতুলনীয়, কর্তব্যবুদ্ধি তীক্ষ্ণ, তিনি আশ্রিতবৎসল ও সর্বোপরি সচ্চরিত্র। একাধারে এতগুলি সদ্‌গুণের অস্তিত্ব কল্পনা করিবার ফলে তাঁহাকে আর মাটির মানুষ বলিয়া মনে হয় না। রাণা প্রতাপের স্বদেশ-প্রীতির মধ্যেও তাঁহার একটা মর্ত্যপরিচয় ছিল, তাঁহার স্বদেশ-প্রীতি যেমন বিশেষ একটা দেশ কেন্দ্র করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাঁহার মর্ত্যপরিচয়ও তাঁহার নিজস্ব পরিবার কেন্দ্র করিয়াই প্রকাশ পাইয়াছিল; কিন্তু দুর্গাদাসের জীবন নির্বিশেষ আদর্শবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। সেইজন্য তাঁহার উচ্ছ্বসিত স্বদেশপ্রেম ও অপূর্ব বীরত্ব-কীর্তির মধ্যেও তাঁহাকে দশজনের মত মানুষ বলিয়া মনে হয় না। আদর্শ স্বদেশপ্রেমিক হিসাবে রাণা প্রতাপের চরিত্র দুর্গাদাস হইতে অধিকতর সার্থক।

সম্রাজ্ঞী গুল্‌নেয়ারের চরিত্র পরিকল্পনা এই নাটকের একটি গুরুতর ত্রুটি। সম্রাজ্ঞী প্রথমতঃ যোধপুরের বিধবা রাণীর উপর তাঁহার পূর্বকৃত এক অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য প্রতিহিংসা-পরায়ণা। কিন্তু তিনি যোধপুর-মহিষী কর্তৃক পুনর্বার অপমানিতা হইয়াও একমাত্র দুর্গাদাসকে দর্শনমাত্রই তাঁহার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া পড়িলেন; তারপর হইতে তিনি প্রতিহিংসা গ্রহণের কথা বিস্মৃত হইয়া এই প্রণয়-স্বপ্নে বিভোর। দ্বিজেন্দ্রলাল এখানে ঐতিহাসিক নাট্যকারের সমস্ত দায়িত্বই যে কেবল অবহেলা করিয়াছেন তাহা নহে, সমগ্র নাট্যিক পরিবেশটির সর্বপ্রকার গুরুত্বের মূলেই নির্মম আঘাত করিয়াছেন। বিশেষতঃ একই নাটকাখ্যানের মধ্যে পিতামহী ও পৌত্রী উভয়কেই সমভাবে শুধু যে প্রণয় ব্যাপারেই লিপ্ত হইতে দেখি তাহা নহে, উভয়কেই (গুল্‌নেয়ার ও রিজিয়া) তাঁহাদের প্রেমের ব্যর্থতার জন্য একসঙ্গে বিলাপ করিতে শুনি (৫ম অঙ্ক, ৬ষ্ঠ দৃশ্য)। এই অসঙ্গতি নিতান্ত পীড়াদায়ক।

একটি মাত্র চরিত্র এই নাটকে সুন্দর এবং সুসঙ্গত হইয়াছে, তাহা মেবারের রাণা রাজ সিংহের চরিত্র। মোগল-সেনাপতি দিলীর খাঁর মধ্য দিয়া নাট্যকার হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের যুগবাণী শুনাইয়াছেন। 'দুর্গাদাস' অতিনাটকীয় লক্ষণাক্রান্ত ও ঘটনা-ভারাক্রান্ত এক করুণ বিয়োগান্তক নাটক। দুর্গাদাস চরিত্রের ভিতর দিয়া লেখক ইহাই দেখিয়াছেন যে সত্যকারের দেশপ্রেম

কোন বাহ্যিক পুরস্কারের অপেক্ষা রাখে না। একবার অকৃতজ্ঞ রাজপুত দলপতিগণ ও দ্বিতীয়বার অকৃতজ্ঞ প্রভুপুত্র কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া দুর্গাদাস ইহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। দেশের সেবায় দুঃখ আছে, কোন পুরস্কার নাই, দেশসেবার জন্যই দেশসেবা করিতে হয়; কোন প্রতিদানের প্রলোভনে নহে। দুর্গাদাসের জীবনের সকরুণ পরিণতির ইহাই সান্ত্বনা। নাট্যকার ইহার কাহিনীর পরিণতিতে পৌঁছিয়া সব দিক হইতেই ইহার উপর কৃষ্ণযবনিকা টানিয়াছেন।) গুলনেয়ারের আত্মহত্যা, রিজিয়ার উন্মাদ, দুর্গাদাসের বৈরাগ্য, শম্ভুজির হত্যা, ঔরংজীবের মৃত্যু, অজিত সিংহের নৈরাশ্য এই সমস্ত বিষাদাত্মক ঘটনা একসঙ্গে নাট্যকাহিনীর পরিণতিতে আসিয়া ভিড় করিয়া নাটকের লক্ষ্যগত ঐক্য বিনষ্ট করিয়াছে।

'নুরজাহান' দ্বিজেন্দ্রলালের একটি পূর্ণাঙ্গ ঐতিহাসিক নাটক। ইহার পূর্ববর্তী ঐতিহাসিক নাটক দুইখানিতে দ্বিজেন্দ্রলাল টডের 'রাজস্থানের কাহিনী' হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন; পূর্বেই বলিয়াছি, টড্ প্রণীত 'রাজস্থানের কাহিনী'র ঐতিহাসিক মূল্য অকিঞ্চিৎকর বলিয়াই নাটক দুইখানিও প্রকৃত ঐতিহাসিক মর্যাদায় উন্নীত হইতে পারে নাই। 'নুরজাহানের'র মধ্যেই দ্বিজেন্দ্রলাল সর্বপ্রথম যথার্থ ঐতিহাসিক উপাদান ব্যবহার করিবার সুযোগ পাইলেন এবং বহুলাংশেই তিনি তাহার সদ্ব্যবহারও করিলেন; এই দিক দিয়া 'নুরজাহান'ই দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম ঐতিহাসিক নাটক বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। অবশ্য অবিমিশ্র ঐতিহাসিক উপাদান অবলম্বন করিয়া ইহার পরবর্তীকালেও তিনি আর একখানি মাত্র নাটক রচনা করিয়াছিলেন, তাহা 'সাজাহান'। তাহার কথা পরে যথাস্থানে আলোচিত হইয়াছে। নুরজাহানের মধ্যে নুরজাহানের বর্ধমান জীবন হইতে আরম্ভ করিয়া জাহাঙ্গীরের মৃত্যু পর্যন্ত তাঁহার জীবনের সমস্ত প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ঘটনারই বর্ণনা রহিয়াছে। কাহিনীটি সুপরিচিত বলিয়া তাহা এখানে উল্লিখিত হইল না। 'নুরজাহান' দ্বিজেন্দ্রলালের বাংলাদেশের সমসাময়িক দেশপ্রেম-মূলক নাট্যরচনার যুগের মধ্যবর্তী রচনা হইলেও ইহার মধ্যে দেশপ্রেমোচ্ছ্বাসের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। এমন কি, দ্বিজেন্দ্রলালের শ্রেষ্ঠ দুইখানি দেশ-প্রেমমূলক নাটক যথা 'দুর্গাদাস' ও 'মেবার-পতন'-এর মধ্যবর্তী কালে রচিত হইয়াও এই নাটকখানি এই ভাবের স্পর্শ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত রহিয়াছে। এই নাটকখানির রচনায় দ্বিজেন্দ্রলাল ঐতিহাসিক তথ্যের প্রতি যেরূপ নিষ্ঠা

দেখাইয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। বলাই বাহুল্য যে, নুরজাহানের জীবনে প্রচুর নাট্যিক উপাদান বর্তমান আছে, সক্ষম শিল্পীর হাতে পড়িলে তাহা দ্বারা প্রথম শ্রেণীর ঐতিহাসিক নাটক রচিত হইতে পারে। এই উপকরণসমূহ দ্বিজেন্দ্রলাল কতদূর সার্থকতার সহিত ব্যবহার করিয়াছেন, এখন তাহাই বিচার করিয়া দেখিতে হইবে।

প্রথমেই নুরজাহানের চরিত্রের কথা উল্লেখ করিতে হয়। নুরজাহানের জীবনের দুটি প্রধান বিভাগ—প্রথমতঃ নুরজাহান শের আফগানের পত্নী ও দ্বিতীয়তঃ নুরজাহান ভারত-সম্রাজ্ঞী। শের আফগানের হত্যার পর নুরজাহান চারি বৎসর কাল পর্যন্ত জাহাঙ্গীরের প্রতি যে রকম আচরণ করিয়াছিলেন বলিয়া ঐতিহাসিক নির্দেশ পাওয়া যায়, তাহা হইতে স্পষ্টই অনুমতি হয় যে, নুরজাহান (তখন মেহেরউন্নিসা) যথার্থই তাঁহার স্বামী শের আফগানকে ভালবাসিতেন; কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে দেখিতে পাওয়া যায় যে, শের আফগান ও মেহেরউন্নিসার জীবনের এই অংশটির উপর বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক রোমান্স 'কপালকুণ্ডলা'র একটু প্রভাব আসিয়া পড়িয়াছে। মতিবিবির নিকট হইতে মেহেরউন্নিসা আকবর শাহ্‌র মৃত্যুসংবাদ ও জাহাঙ্গীরের সিংহাসনারোহণের সংবাদ শুনিয়া 'কপালকুণ্ডলা'য় মেহেরউন্নিসা বলিয়াছিলেন—সেলিম ভারতবর্ষের সিংহাসনে, আমি কোথায় (৩য় খণ্ড, ৩য় পরিচ্ছেদ)? দ্বিজেন্দ্রলালের নুরজাহানও অনুরূপ অবস্থায় তাহারই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছিলেন,—সেলিম সম্রাট্। আবার সে কথা কেন মনে আসে? (১।২) এইজন্যই দ্বিজেন্দ্রলাল মেহেরউন্নিসাকে শের আফগানের প্রতি প্রকৃত প্রেমাসক্ত বলিয়া কল্পনা করেন নাই। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের ত্রুটি এই যে, নুরজাহানকে তিনি জাহাঙ্গীরের প্রতিও প্রকৃত প্রণয়াসক্ত বলিয়া কল্পনা করেন নাই। দ্বিজেন্দ্রলালের কল্পনায় ভারত-সম্রাজ্ঞী নুরজাহান কেবলমাত্র ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির মোহে জাহাঙ্গীরের পত্নীত্ব স্বীকার করিয়াছেন। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, এই নারীর জীবনে প্রেম কোনদিনই সত্য ছিল না। সেলিমের প্রতি তাঁহার জীবনের প্রথম ভাগে যে আকর্ষণ দেখা গিয়াছিল, তাহাও শের আফগানের হত্যার সঙ্গে সঙ্গেই দূর হইয়া যায়। নুরজাহান শের আফগানকেও ভালবাসিতে পারিলেন না, আর জাহাঙ্গীরকেই পাইবার আগেই তাঁহার প্রতি তাঁহার ভালবাসা লোপ পাইল। ইহা নিতান্তই বাস্তবতা-বিরোধী। এই দিক দিয়া বিচার করিলে দ্বিজেন্দ্রলালের নুরজাহান চরিত্রের পরিকল্পনা সার্থক

হয় নাই বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। মনে হয়, ইহাতে ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথের ক্ষমতা-বিলাস ও হৃদয়-হীনতার প্রভাব কিছু আসিয়া থাকিবে; ভারতীয় নারীচরিত্রের কোন বৈশিষ্ট্যই ইহাতে নাই।

নুরজাহানের কন্যা লয়লার চরিত্র আরও অবাস্তব। নাট্যকারের নিজস্ব মনোধর্ম এই চরিত্রটি অবলম্বন করিয়াই প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া ইহার মধ্যে এই ত্রুটি দেখা দিয়াছে। লয়লাকে কোথাও নুরজাহানের কন্যা বলিয়া মনে হয় না; সর্বত্রই যেন সে তাঁহার অভিভাবিকা; তবে একমাত্র নাটকের সর্বশেষ দৃশ্যে যেখানে অন্ধ স্বামী ও উন্মাদিনী জননীর দিকে তাহার দুইটি স্নেহকোমল হস্ত সে বাড়াইয়া দিল, সেখানেই তাহার প্রকৃত মানবিক মহিমার বিকাশ অনুভূত হয়। এতদ্ব্যতীত সর্বত্রই তাহাব পরিকল্পনা নিতান্ত পীড়াদায়ক। জাহাঙ্গীরের চরিত্রটি সুপবিকল্পিত, তাঁহার উচ্চ মর্যাদা ও আভিজাত্যের গৌরব নাট্যকারের কল্পনায় সর্বত্রই অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। এই নাটক আদ্যোপান্তই গদ্যে লিখিত এবং ইহাতে দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্য-ভাষার সুপবিণত রূপের সঙ্গেই পরিচয় লাভ করা যায়। এই ঘটনাবর্ত-সঙ্কুল বিয়োগান্তক নাটক সম্বন্ধে আব একটি কথা এই যে, ইহার মধ্যে নাট্যকাব বিশেষ কোন লঘু হাস্যরসিকতার অবতারণা না করিয়া ইহার ঘটনার নিবিড়তা ও বিষয়েব গুরুত্ব দুইই বহুলাংশে অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের স্বভাব-রসিকতা এখানে বিশেষভাবেই সংযত রহিয়াছে।

প্রকৃতপক্ষে 'তারাবাই' বচনার সঙ্গে সঙ্গেই দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যকাব্য রচনার যুগ শেষ হয় এবং ইহার পববর্তী রচনা 'প্রতাপ সিংহ' হইতেই তাঁহার দেশপ্রেমমূলক রোমান্টিক নাটক বচনাব যুগের সূত্রপাত হয়। কিন্তু দেশপ্রেম-মূলক রোমান্টিক নাটক রচনার যুগের মধ্যবর্তী কালে তিনি আর একখানি কাব্যধর্মী নাটক রচনা করেন—তাহার নাম 'সোরাব রুস্তম'। ইহা কাব্যধর্মী নাটক হইয়াও দ্বিজেন্দ্রলালের দেশপ্রেমমূলক রোমান্টিক নাটক রচনাকালের অন্তর্বর্তী রচনা বলিয়া ইহার মধ্যে সমসাময়িক দেশাত্মবোধেরও সামান্য প্রভাব আসিয়া পড়িয়াছে। তথাপি প্রধানতঃ ইহা নাট্যকাব্যই এবং দ্বিজেন্দ্রলালের অন্যান্য নাট্যকাব্যের সঙ্গেই ইহারও আলোচনা করিতে হয়।

বিখ্যাত পারসী কবি ফেরদৌসীর সুপ্রসিদ্ধ কাব্য 'শাহ্‌নামা'র অন্তর্গত সোরাব-রুস্তমের কাহিনী অবলম্বন করিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার এই নাটক

রচনা করিয়াছেন। সোয়াব-রুস্তমের কাহিনী 'শাহ্‌নামা'র অন্যান্য বৃত্তান্তের মতই বিষাদমূলক; অতএব ইহার উপকরণ গুরুবিষয়ক ঐতিহাসিক নাট্য-রচনার উপযোগী। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল এই দিকে অগ্রসর না হইয়া ইহার বিষয়বস্তু লইয়া একখানি লঘু 'নাট্যরঙ্গ' বা 'অপেরা' রচনার প্রয়াস পাইয়াছেন। ইহার রচনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নাট্যকার ভূমিকায় উল্লেখ করিয়াছেন,—কিছুদিন হইতে একটি কথা শুনিতে পাইতেছি যে, আমাদের দেশের রঙ্গালয়ের দর্শকবৃন্দ অশ্লীল 'হাবভাব' সমন্বিত গ্রাম্য রসিকতা শুনিবার জন্যই রঙ্গালয়ে গিয়া থাকেন; এবং সুরুচি-সঙ্গত নাটক বা নাটিকার সম্প্রতি আর আদর নাই। আমি একবার আমার সাধ্যমত পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চাই যে, সুরুচিসঙ্গত অপেরা এখন চলে কি না (ভূমিকা)। অবশ্য তাঁহার 'সোরাব-রুস্তমে'র নাট্যপরিকল্পনায় সুরুচির মর্যাদা সর্বত্র অক্ষুণ্ণ থাকিলেও, ইহার বিষয়-নির্বাচন যে 'অপেরা'-শ্রেণীর নাটকের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুভব করা যায়। প্রকৃতপক্ষে ইহাই এই নাটকের একটি গুরুতর ত্রুটি বলিয়া মনে হয়। সোরাব-রুস্তমের বিষয়বস্তু যে 'অপেরা'র একেবারেই উপযুক্ত নয়, তাহা নাটক রচনাব্যপদেশে নাট্যকারই প্রথম উপলব্ধি করিয়াছিলেন, সেইজন্যই নাট্যকারের নিজের বিচারেই ইহা অপেরায় আরম্ভ হইয়া ক্রমে ক্রমে নাটকে শেষ হইয়াছে (ঐ)। এই বীর-রসাত্মক বিষাদান্তক নাট্যকাহিনীর উপর যে গীতি ও হাস্যরসাত্মক লঘু পরিবেশের ছায়াপাত করা হইয়াছে, তাহা মূল নাট্যকাহিনীর সঙ্গে নিবিড় যোগস্থাপন করিতে পারে নাই বলিয়াই নহে, কাহিনীর ঐতি-হাসিক মর্যাদাও বিশেষভাবেই ক্ষুণ্ণ করিয়াছে বলিয়া ইহার পরিকল্পনা সকল দিক দিয়া ব্যর্থ হইয়াছে। বিশেষতঃ নাট্যকার নিজে যথার্থই উপলব্ধি করিয়াছেন যে, 'ইহা দস্তুরমত অপেরা নয়' আবার 'ইহা নাটকও নহে' (ঐ)। তবে অপেরা রচনার মনোভাব বিসর্জন দিয়া নাট্যকার ইহার বিষয়বস্তু লইয়া যদি একখানি নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হইতেন, তাহা হইলে ইহা দ্বারা তিনি যথার্থই যশোলাভ করিতে পারিতেন বলিয়া মনে হয়।

'সোরাব-রুস্তম' তিন অঙ্কে সম্পূর্ণ এবং দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যকাব্যগুলির মধ্যে ইহাই ক্ষুদ্রতম। কাহিনীর এই অপরিসর ক্ষেত্রে চরিত্রগুলির সম্যক্ বিকাশ সম্ভব হয় নাই। দুই একটি অপরিণত-গঠন চরিত্র ব্যতীত নাট্যকার-

এই নাটকের আর কোন চরিত্রেরই ঐতিহাসিক মর্যাদা রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই। ইহা এই ঐতিহাসিক নাটকের অন্যতম গুরুতর ত্রুটি।

প্রথমতঃ রুস্তমের চরিত্রের কথাই আলোচনা করা যাক। রুস্তম বীর এবং নিয়তির নির্মম বিধানে নিজের পুত্রহন্তা; এই বিষাদান্তক নাটকের তিনি নায়ক। কিন্তু এই নাট্যকাব্যের প্রথম ভাগে তাঁহাকে একজন ভাঁড়রূপে, মধ্যভাগে এক সুরাসক্ত বিলাসীরূপে এবং একমাত্র শেষভাগে প্রকৃত বিয়োগান্তক নাটকের নায়করূপে দেখিতে পাই; বলা বাহুল্য, তাঁহার চরিত্র আনুপূর্বিক সঙ্গতি রক্ষা কবিতে পারে নাই বলিয়াই পরিকল্পনার দিক দিয়া ব্যর্থ হইয়াছে। এমন একটি মর্মান্তিক বিয়োগান্তক কাহিনীর নায়কের চবিত্রগত যে গাম্ভীর্য ও বিশেষ গুরুত্ব রক্ষার প্রয়োজন আছে, নাট্যকার সেই দায়িত্ব সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়াছেন। বিশেষতঃ চরিত্রটির ঐতিহাসিক মর্যাদাও ইহা দ্বারা বিশেষভাবেই ক্ষুণ্ণ করা হইয়াছে। অপরিসর ক্ষেত্রে রুস্তমের পুত্র সোরাবের চরিত্রটি অনতিপরিস্ফুট থাকিলেও ইহাব ঐতিহাসিক মর্যাদা কতকটা রক্ষা কবিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। তুবাণ রাজকন্যা তামিনার চরিত্রের মধ্যে তাহার পরিচয়োচিত মর্যাদা রক্ষা পাইয়াছে, তবে তাহার চরিত্রটিও সম্যক্ বিকাশ লাভ করিতে পারে নাই। এক দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে এই কাহিনীর শোচনীয় বিয়োগান্তক পরিণতির জন্য তাহাকেই দায়ী করা যায়; তাহার অন্ধ পুত্র-স্নেহই তাহার স্বামী কর্তৃক তাহার পুত্রহত্যাব একমাত্র কারণ; এই অন্ধ মাতৃস্নেহ নিয়তির দুর্বার বিধানে এমন এক পথে অগ্রসর হইয়া গিয়াছে যেখানে এই বিয়োগান্তক পরিণতি একেবারে অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে। এই দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে তামিনার চরিত্রের বিশেষ প্রাধান্য অনুভূত হয়; নাটকের মধ্যে তাহাকে সেইভাবে অঙ্কিত করা হয় নাই। পারস্যের রাজা কৈকায়ুশের চরিত্রটিরও ঐতিহাসিক মর্যাদা রক্ষা পায় নাই; এই নাটকে কৈকায়ুশ ভীরু, ব্যক্তিত্বহীন ও আত্মরক্ষায় অক্ষম। তাহার মহিষীর চরিত্রটি সংক্ষিপ্ত হইলেও তাহার মধ্যে তাহার পরিচয়োচিত মর্যাদা অনেকখানি রক্ষা পাইয়াছে। তামিনার পিতা তুরাণ-রাজ সামিঙ্গনের চরিত্রটির ঐতিহাসিক পরিচয় সর্বাংশেই খর্ব করা হইয়াছে; সামিঙ্গন বিদূষক ও পারিষদবর্গ-বেষ্টিত ভাঁড়ের চরিত্র মাত্র।

এই নাটকে গুস্তাহামের কন্যা আফ্রিদের চরিত্রের একটু বিশেষত্ব আছে। আফ্রিদ সোরাবকে ভালবাসে; কিন্তু সোরাব তাহার পিতৃহন্তা বলিয়া তাহাকে

বিবাহ করা ত দূরের কথা, তাহাকে হত্যা করিয়া পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে চায়। অবশেষে রুস্তম যখন সোরাবকে বধ করিল, তখন এই পিতৃ-হত্যার প্রতিশোধরূপে তাহার রক্তে নিজের হস্তখানি রঞ্জিত করিয়া সোরাবের প্রেমের ঋণ শোধ করিবার জন্য পুনরায় নিজের বক্ষে ছুরিকাঘাত করিয়া মৃত্যু বরণ করিল। এই চরিত্রটির মধ্য দিয়াই দ্বিজেন্দ্রলালের সমসাময়িক দেশপ্রেম-মূলক রোমান্টিক নাট্যরচনার প্রভাব অনুভূত হয়। আফ্রিদের পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় দ্বিজেন্দ্রলালের সমসাময়িক দেশপ্রেমিকতার অনুভূতি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। আফ্রিদের চরিত্র সম্পূর্ণ ই রোমান্টিক আদর্শে পরিকল্পিত। এই নাটকে বিদূষক ও পার্ষদবর্গের যে চিত্র দেওয়া হইয়াছে তাহা পারস্য-ইতিহাসের পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করিতে পারে নাই, ইহা দ্বিজেন্দ্র-লালের ভারতীয় বিষয়ক অন্যান্য নাটকের অনুরূপ। এতদ্ব্যতীত ইহাতে পারস্য-রমণীদের মুখে ভারতীয় শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক যে গান শুনিতে পাওয়া যায়, তাহার যদিও নাট্যকার এক অভিনব ব্যাখ্যা দিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তথাপি পরিবেশের সম্পূর্ণ উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

এই নাট্যকাব্য অমিত্রাক্ষর ও গদ্য উভয়েই রচিত। ইহার প্রথমাংশ গীতিবহুল; এই ক্ষুদ্রায়তন নাটকটির মধ্যে গদ্য, অমিত্রাক্ষর পদ্য ও সঙ্গীত এই ত্রিবিধ বিপরীতধর্মী রচনা-রীতি প্রায় সমানভাবে অবলম্বন করার ফলে ইহা রসের দিক দিয়া নিবিড়তা লাভ করিতে পারে নাই।

রাজস্থানের কাহিনী-মূলক নাটকের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলালের 'মেবার পতন' নাটকখানি এককালে সর্বাধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল। রাজপুত ইতিবৃত্তমূলক ইহাই দ্বিজেন্দ্রলালের সর্বশেষ নাট্যরচনা। রাজস্থানের কাহিনীমূলক নাট্যরচনার মধ্যে ইহার ঐতিহাসিক মূল্য 'প্রতাপ সিংহ' হইতে অধিক না হইলেও অন্ততঃ তাহার সমতুল্য বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে; ইহাতে রোমান্টিক প্রভাব অপেক্ষাকৃত অল্প বলিয়া অনুভূত হয়। কিন্তু কাহিনীবিন্যাস, চরিত্রসৃষ্টি ও অন্যান্য নাট্যিক পরিকল্পনায় ইহার স্থান 'প্রতাপ সিংহ' হইতে অনেক নিম্নে। ইহার নাট্যিক ঘটনাবলীও সুগ্রথিত নহে। ইহার বিচ্ছিন্ন দৃশ্যের মধ্যে বিভিন্ন অতি-নাট্যিক ঘটনার সমাবেশ হওয়া সত্ত্বেও ইহাদের কেন্দ্রগত আকর্ষণের অভাবেই সমগ্র নাট্যকাহিনীটি নিবিড়তা লাভ করিতে পারে নাই। বিশেষতঃ ইহার কাহিনীর ধারা নাট্যিক নিয়মে অগ্রসর

না হইয়া কোন কোন স্থানে আকস্মিক ভাবেই অতি-নাট্যিক পর্যায়ে উন্নীত হইয়া পুনরায় আকস্মিকভাবেই দ্বন্দ্বসংঘাতহীন বৈশিষ্ট্যবর্জিত সমতল স্তরে অবনমিত হইয়াছে, সমগ্র কাহিনী ব্যাপিয়া ঘটনার সমতা রক্ষা পায় নাই। ইহার কাহিনীটি সংক্ষেপে এইরূপ—

প্রতাপ সিংহের পুত্র অমর সিংহ তখন মেবারের রাণা, তাঁহার রাজধানী উদয়পুর; মেবারের পূর্বতন রাজধানী চিতোর মোগলের অধিকারভুক্ত। মোগল সৈন্য মেবার আক্রমণ করিল, হেদায়েৎ আলি খাঁ মোগল সৈন্যের অধিনায়ক হইয়া আসিলেন, কিন্তু রাজপুতদিগের পরাক্রমে তিনি পরাজিত হইয়া পলাইয়া গেলেন। শীঘ্রই শাহ্জাদা পরভেজের অধিনায়কত্বে মোগল সৈন্য নূতন বিক্রমে আসিয়া মেবার আক্রমণ করিল; মোগলের আশ্রিত সগর সিংহ এইবার মোগল সৈন্যের সঙ্গে আসিলেন। এই সগর সিংহ মোগল সেনাপতি মহাবৎ খাঁর পিতা এবং রাণা প্রতাপের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। কিন্তু এবারেও রাজপুত সৈন্যের হস্তে মোগলের পরাজয় হইল। অবশেষে মহাবৎ খাঁ এক বিপুল মোগলবাহিনী লইয়া আসিযা মেবার আক্রমণ করিলেন, পূর্বের দুই যুদ্ধে মেবারের বহু সৈন্যক্ষয় হইয়াছিল, এবার আর মোগল সৈন্যকে বাধা দিবার তাহার শক্তি ছিল না—মেবারের পতন হইল, উদয়পুর দুর্গ মোগল সৈন্য অধিকার করিয়া লইল।

কাহিনীর দিক দিয়া ইহা 'প্রতাপ সিংহ' নাটকেরই পরিশিষ্ট বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রতাপ আজীবন সংগ্রাম করিয়া মেবারের যে অংশ মোগলের হস্ত হইতে পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন, তাঁহার পুত্র অমর সিংহের কালে তাহাও কিভাবে পুনরায় মোগলের করতলগত হইল তাহাই এই নাটকের প্রতিপাদ্য বিষয়। কিন্তু মেবারের এ পতনের মূলে একটা বিষয়কে মুখ্য করা হইয়াছে, তাহা ধর্মান্তরাশ্রিত মহাবৎ খাঁর স্বজাতিবিদ্বেষ। স্বজাতি-বিদ্বেষই যে জাতির ধ্বংসের মূল তাহা মহাবতের বাক্যে ও আচরণে সর্বত্রই প্রকাশ করা হইয়াছে। জাতীয় ঐক্যের উপরই রাষ্ট্রীয় ভিত্তি স্থাপিত হইতে পারে। এই জাতীয়তামূলক উদ্দেশ্য ব্যতীতও ইহার একটা ধর্মসম্বন্ধীয় মতবাদ-প্রচারের উদ্দেশ্য ছিল, তাহা এই যে রাজপুতজাতির ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতাই তাহার পতনের মূল। যতদিন পর্যন্ত না হিন্দুর সামাজিক আচারগত সঙ্কীর্ণতার অবসান হইতেছে, ততদিন পর্যন্ত তাহার জাতীয় কল্যাণের আশা নাই। দ্বিজেন্দ্রলাল যে কথা একদিন তাঁহার গদ্য নিবন্ধ 'একঘরে' ও প্রহসন

'প্রায়শ্চিত্তে'র মধ্য দিয়া বলিতে চাহিয়াছিলেন এবং যাহা তিনি 'প্রতাপ সিংহ' নাটকেও বলিয়াছেন, তাহাই তিনি আবার 'মেবার পতন'-এর মধ্য দিয়াও প্রকাশ করিয়াছেন। জাতীয়তার প্রেরণা বাঙ্গালীর সামাজিক সঙ্কীর্ণতার বাধা ঘুচাইতে পারে নাই দেখিয়া এবং সন্ত্রাসমূলক স্বদেশী আন্দোলনের ভয়াবহ পরিণতির প্রতি লক্ষ্য করিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার সর্বশেষ জাতীয়তাবোধক নাট্যরচনার এই বলিয়াই উপসংহার করিয়াছেন।

এই নাটকের কাহিনী-পরিকল্পনায় ত্রুটির কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। এখন চরিত্রসৃষ্টির দোষগুণ বিচার করা যাইতেছে। এই সম্পর্কে প্রথমেই রাণা অমর সিংহের চরিত্রের কথা উল্লেখ করিতে হয়। অমর সিংহের চরিত্র-পরিকল্পনায় নাট্যকার ঐতিহাসিক মর্যাদা যথাসম্ভব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। অমর সিংহ দৃঢ়তাহীন ও যুদ্ধ-নিরুৎসুক ব্যক্তি; তিনি শত্রুর সঙ্গে সন্ধি করিয়া মেবারের শান্তিরক্ষায় কৃতসঙ্কল্প—ইতিহাসেও তাঁহার এই পরিচয় পাওয়া যায়। নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক গণ্ডীর মধ্যে বিচরণ করিবার ফলে চরিত্রটির নাট্যিক রসস্ফূর্তি তত উচ্চাঙ্গের হয় নাই; তবে প্রথম হইতে তাঁহার জীবনের নৈরাশ্য ও বিষাদের ভাব নাট্যকাহিনীর বিয়োগাত্মক পরিণতির সঙ্গে সুন্দর যোগ রক্ষা করিয়াছে। অমর সিংহের পরই মহাবৎ খাঁর চরিত্র উল্লেখযোগ্য। নাট্যকার মহাবৎ খাঁর ভিতর দিয়া তাঁহার বিশিষ্ট একটি রাজনীতিক মতবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। মহাবৎ খাঁই নিজের জন্মভূমির স্বাধীনতা শত্রুর হস্তে তুলিয়া দিলেন; ইহার কারণ, ধর্মান্তরাশ্রিত মহাবতের উপর তাঁহার স্বজাতীয় ও স্বদেশীয়ের অনুদার ও সঙ্কীর্ণ আচরণ। মেবারের প্রকৃত শত্রু মোগল নহে—মেবারেরই সন্তান মহাবৎ এবং মহাবতের তীব্রতম স্বদেশদ্রোহিতাই মেবারের পতনের মূল। কিন্তু মহাবৎকে মেবারের শত্রু কে করিয়াছে? হিন্দুধর্মের অনুদারতাই মহাবৎকে মেবারের শত্রু করিয়াছে। মহাবতের পূর্বজীবনের হিন্দু পত্নী কল্যাণী তাঁহার স্বামীর ধর্মান্তর গ্রহণ করার পরও তাঁহাতে আসক্ত জানিতে পারিয়া তাঁহার পিতা তাঁহাকে গৃহ হইতে বিতাড়িত করিয়া দিলেন। ইহাতেই মহাবৎ স্বজাতি ও স্বদেশীয়ের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা গ্রহণ করিবার জন্য অস্ত্র ধারণ করিলেন। হিন্দুধর্মের সঙ্কীর্ণতায় মহাবতের স্বজাতিদ্রোহিতার জন্ম এবং স্বজাতিদ্রোহিতা ও ভ্রাতৃদ্রোহিতাই মেবারের পতনের মূল। মহাবৎ খাঁকে স্বজাতিদ্রোহীর প্রতীক করিয়া চিত্রিত করা হইয়াছে। এই জন্যই মহাবতের মধ্য দিয়া চরিত্রসৃষ্টির প্রয়াস

অপেক্ষা মতবাদ প্রচারের প্রবৃত্তিই অধিকতর স্পষ্ট বলিয়া অনুভূত হয়।

স্ত্রীচরিত্রের মধ্যে রুক্মিণীর চরিত্রে একটু বাস্তবতার স্পর্শ আছে। কিন্তু তাহার উচ্চ পদমর্যাদানুযায়ী অভিজাত্যের গৌরব তাহাতে অনেকখানি লাঘব হইয়াছে। রাজকুমারী মানসীর চরিত্রটি নিতান্তই আদর্শ-প্রণোদিত সৃষ্টি। ইহার মধ্যে নবীনচন্দ্র সেনের 'কুরুক্ষেত্র'-কাব্যের সুভদ্রা-চরিত্রের ও রবীন্দ্রনাথের 'মালিনী' নাটকের মালিনী-চরিত্রের প্রভাব অনুভব করা যায়। সগর সিংহের কন্যা সত্যবতীর চরিত্র বাস্তবতার সম্পর্কহীন, নিতান্তই রোমাণ্টিক কল্পনার ফল। মহাবতের পত্নী কল্যাণীর চরিত্রও আদর্শ-প্রণোদিত সৃষ্টি। এতদ্ব্যতীত 'মেবার পতনে'র বিশেষ কোন চরিত্রই নাট্যিক চরিত্র হিসাবে সার্থকতা লাভ পরিতে পারে নাই।

'মেবার পতন'-এর মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশপ্রেমিকতার উচ্ছ্বাস অনেকটা স্তিমিত হইয়া আসিয়াছে, আবেগ-প্রবণতা অপেক্ষা ইহার মধ্যে স্থির বিবেকবুদ্ধিপ্রণোদিত বিচার-বিশ্লেষণের প্রবণতা দেখা দিয়াছে। ইহার কারণ, জাতীয়তা অপেক্ষা মনুষ্যত্বকে দ্বিজেন্দ্রলাল ইহাতে বড় করিয়া দেখিয়াছেন; প্রেমের মধ্য দিয়া যে মনুষ্যত্বের বিকাশ—ভ্রাতৃদ্রোহিতা, স্বজাতিদ্রোহিতা যাহার অন্তরায়, দ্বিজেন্দ্রলাল এই নাটকের মধ্য দিয়া সেই মনুষ্যত্বের সন্ধান করিয়াছেন। এই নাটকের প্রধান সুর চারণীদের গীতে এইভাবে প্রকাশ পাইয়াছে—

কিসের শোক করিস্ ভাই—
আবার তোরা মানুষ হ'।
গিয়েছে দেশ দুঃখ নাই—আবার তোরা মানুষ হ'।
পরের পরে কেন এ রোষ,
নিজেরই যদি শত্রু হোস?
তোদের এ'যে নিজেরই দোষ—আবার তোরা মানুষ হ'। ৫।৮

পরাধীনতার শৃঙ্খল এই জাতি নিজের হাতেই নিজে পরিয়াছে, নিজের হাতেই তাহাকে তাহা মোচন করিতে হইবে। ইহাই তাঁহার এই নাটকের প্রধান বক্তব্য বিষয়। সমসাময়িক রাজনৈতিক অবস্থা হইতেই তিনি এই চৈতন্য লাভ করিয়াছিলেন—এই দিক দিয়া এই নাটকে যুগলক্ষণ অত্যন্ত প্রবল বলিয়া অনুভূত হয়। স্বদেশী আন্দোলনের ভিতর দিয়া বাংলার

হিন্দুমুসলমানের বিরোধের দিকটা যখন ক্রমে স্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল, তখনই দ্বিজেন্দ্রলাল জাতীয় মিলনের কল্যাণকর আদর্শ এইভাবে প্রতিষ্ঠা করিবার প্রয়াস পাইলেন।

'সাজাহান' নাটক রচনার ভিতর দিয়া দ্বিজেন্দ্রলালের উচ্চাঙ্গ প্রতিভার পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। ইহা তাঁহার কেবলমাত্র ঐতিহাসিক নাটকগুলির মধ্যেই নহে, সমগ্র নাট্যরচনার মধ্যেই সর্বশ্রেষ্ঠ। বাংলা সাহিত্যের ইহা অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক। ইহার রচনায় কবি দ্বিজেন্দ্রলাল এবং নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের একত্র মিলন হইয়াছে, সেইজন্য ইহা তাঁহার এত শক্তিশালী রচনা। মোগল সম্রাট্ সাজাহানের শেষ জীবনের কয়েক বৎসরের বিচিত্র নাটকীয় ঘটনাপূর্ণ বিষয়-বস্তু অবলম্বন করিয়া ইহা রচিত হইয়াছে। ইহার রচনায় নাট্যকার যে ঐতিহাসিক তথ্যনিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বাংলা ঐতিহাসিক নাট্যরচনার ক্ষেত্রে দুর্লভ। এই দিক দিয়া বিবেচনা করিতে গেলে ইহা বাংলা সাহিত্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক নাটক বলিয়াও উল্লেখ করা যাইতে পারে। দ্বিজেন্দ্রলাল যখন এই নাটক রচনা করেন, তখন মোগল ইতিহাস সম্পর্কিত প্রামাণিক ঐতিহাসিক তথ্যসমূহ সর্বসাধারণের সহজ আয়ত্তের অধীন ছিল না, তাহা সত্ত্বেও কিংবদন্তী এবং জনশ্রুতি সতর্কতার সঙ্গে পরিহার করিয়া অধ্যবসায়ের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলাল এই বিষয়ে প্রামাণিক ঐতিহাসিক তথ্যসমূহ অনুসন্ধান করিয়া তাঁহার এই নাটক রচনায় নিয়োজিত করিয়াছেন। তাঁহার পরিবেশিত তথ্যসমূহ পরবর্তী বিস্তৃততর গবেষণা দ্বারাও সমর্থিত হইয়াছে। এই দিক দিয়া ঐতিহাসিক নাটক হিসাবে 'সাজাহান' বাংলা সাহিত্যের একটি স্থায়ী আসনের অধিকারী হইয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলালের অন্য কোন ঐতিহাসিক নাটকের তথ্যগত এই মূল্য প্রকাশ পায় নাই। ইহার কাহিনী সংক্ষেপে এই—

বৃদ্ধ বয়সে অসুস্থ সাজাহান সম্পর্কে জনরব প্রচারিত হইল যে, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। শুনিবামাত্র বাংলার সুবাদার শাহ্‌জাদা সুজা, গুজরাটের সুবাদার শাহ্‌জাদা মোরাদ স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিবার জন্য সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। দাক্ষিণাত্য হইতে আওরঙ্গজেব আসিয়া মোরাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। দারা সম্রাটের সঙ্গেই ছিলেন, তিনি তাঁহাকে সম্মত করাইয়া বিপুল সংখ্যক মোগল সৈন্য লইয়া বিদ্রোহী ভ্রাতাদিগকে দমন করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। আওরঙ্গজেবের বিক্রম ও কৌশলে

অবশেষে দারা ও মোরাদ বন্দী হইলেন, সুজা সপরিবারে আরাকানে বিতাড়িত হইলেন। পুত্র মহম্মদের রক্ষণাধীনে আগ্রার দুর্গে সাজাহানকে বন্দী করিয়া আওরঙ্গজেব দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। আওরঙ্গজেব দারা ও মোরাদের মৃত্যুদণ্ড দিলেন, পলায়িত সুজা আরাকানে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। কন্যা জাহানারা বন্দী পিতার পরিচর্যার ভার গ্রহণ করিলেন। অবশেষে অনুতপ্ত আওরঙ্গজেব পিতার নিকট আসিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। সাজাহান তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন।

'সাজাহান' বাংলা সাহিত্যের একটি সার্থক ট্র্যাজিডি ; কেবলমাত্র পাঠলব্ধ নীরস তথ্যপ্রচারের পরিবর্তে ইহাতে কয়েকটি প্রধান চরিত্রের মধ্য দিয়া যে বাস্তব মানবিক অনুভূতির বিকাশ হইয়াছে, তাহাই ইহাকে ঐতিহাসিক জগৎ হইতে চিরন্তন সাহিত্যের জগতে উত্তীর্ণ করিযা দিয়াছে। ইহার ঘটনা-প্রবাহ দ্রুত সঞ্চরণশীল, দৃশ্যেব পব দৃশ্য অনুসরণ করিয়া যাইবার পথে ইহার নাট্যিক ঔৎসুক্য কোথাও শিথিল হইয়া পডিবার অবকাশ পায় নাই ; প্রথম দৃশ্য হইতেই ইহার কাহিনী দর্শকের হৃদয় সম্পূর্ণ অধিকার করিয়া লইয়া ইহার নিঃশ্বাসরুদ্ধকারী ঘটনাবলীর আবর্তসঙ্কুল পথে অগ্রসর হইয়া যায়। কাহিনী যখন শেষ হইয়া যায়, তখন বিমূঢ় দর্শকের স্তম্ভিত হৃদয় মথিত করিয়া একটি সুগভীর দীর্ঘশ্বাস উত্থিত হয়।

এই ট্র্যাজিডির নায়ক সাজাহান, প্রতিনায়ক আওরঙ্গজেব। সাজাহানের অন্তর্দ্বন্দ্বই এই নাটকের দ্বন্দ্ব, তাঁহার জীবনের করুণ পরিণতিই ইহার ট্র্যাজিডি। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, নাটকের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হইয়া থাকে, তাহা দুই প্রকারের হইতে পারে—বহির্দ্বন্দ্ব ও অন্তর্দ্বন্দ্ব। বাহিরের জগতে নানা ঘটনার সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে সক্রিয় জীবনে যেমন দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়, বহির্ঘটনার মানসিক প্রতিক্রিয়াস্বরূপ নিষ্ক্রিয় জীবনেও তেমনই অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। অন্তর্দ্বন্দ্বের শক্তি বহির্দ্বন্দ্ব অপেক্ষা কোন অংশেই যে অল্প, তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। অনুভূতিশীল বা সচেতন হৃদয়ে কেবলমাত্র অন্তর্দ্বন্দ্ব দ্বারা যে ট্র্যাজিডির সৃষ্টি হয়, তাহা তীব্রতার দিক দিয়া যে কোন বহির্ঘটনাসঙ্কুল ট্র্যাজিডির সমান হইতে পারে।

সাজাহান বৃদ্ধাবস্থায় অসুস্থ ও পুত্রের হস্তে বন্দিভাবে নিষ্ক্রিয় জীবন যাপন করিয়াছেন সত্য, কিন্তু সেই অসহায় বৃদ্ধের বুক চিরিয়া যদি হৃদয়টি খুলিয়া দেখিবার কোন উপায় থাকিত, তাহা হইলে দেখা যাইত যে তাহার উপর

দিয়া কুরুক্ষেত্রের মহাসমর সংঘটিত হইতেছে। নৈরাশ্যে, অপমানে, বেদনায়, শোকে, অবসাদে, স্নেহে, গৌরবে, বিশ্বাসে প্রতিমুহূর্তে তাঁহার সচেতন মনের যে বিচিত্র উত্থান-পতনের কাহিনী এই নাটকে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে সার্থক নাটকীয় অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হইয়াছে। বহির্জগতের নিষ্ক্রিয়তার ভিতর দিয়াও দ্বিজেন্দ্রলাল সাজাহান-চরিত্রের এই জটিল অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করিতে যে সার্থক হইয়াছেন, তাহা তাঁহার অপরিসীম কৃতিত্বেরই পরিচায়ক। যে মানবিক দুর্বলতার ছিদ্রপথে ট্র্যাজিডির বীজ প্রবেশ করিয়া নায়কের করুণ পরিণতি সম্ভব করিয়া তোলে, সম্রাট্ সাজাহানের মধ্যেও তাহার অস্তিত্ব ছিল—তাহা পুত্রস্নেহ। পিতা সাজাহানের নিকট সম্রাট্ সাজাহানের পরাজয়ের বৃত্তান্ত লইয়া ইহার কাহিনীর সূত্রপাত। নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যেই পুত্রস্নেহবশতঃ নিজে সুদৃঢ় কোন সঙ্কল্প গ্রহণ করিবার পরিবর্তে দারা এবং জাহানারার পরামর্শে বিদ্রোহী পুত্রদিগকে শাসন করিবার জন্য দারার হাতে যে সম্রাটের পাঞ্জাটি তুলিয়া দিলেন, এই নাটক সাজাহানের সেই ভুলেরই করুণ প্রায়শ্চিত্তের মর্মন্তুদ কাহিনী। তিনি দৃঢ়চিত্ত ও কর্তব্যপরায়ণ সম্রাট্ হইলে দারা ও জাহানারার পরামর্শ উপেক্ষা করিতে পারিতেন। বিদ্রোহী পুত্রদিগকে দমন করিবার মধ্যে তাঁহার প্রিয়তম জ্যেষ্ঠ পুত্র দারার স্বার্থরক্ষার প্রতিও যে তিনি লক্ষ্য রাখেন নাই, তাহা বলিতে পারা যায় না। সেইজন্যই অকপটে দারার হাতে সে'দিন সম্রাটের পাঞ্জা তিনি তুলিয়া দিয়াছিলেন। দারাকে যে পিতা সর্বাপেক্ষা স্নেহ করেন, ইহা স্বভাবতঃই সাজাহানের অন্যান্য পুত্রদিগের ঈর্ষ্যার কারণ। বাহিরের সাম্রাজ্য-লোলুপতার কথা বাদ দিলেও অন্তরের একান্ত এই সহজ মানবিক ঈর্ষ্যাবোধ এই নাটকের ভ্রাতৃকলহের কারণ। এই সকল চিরন্তন মানবিক গুণের আবেদনেই 'সাজাহান' নাটকখানি দ্বিজেন্দ্রলালের অন্যান্য ঐতিহাসিক নাটক হইতে স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়াছে।

এই নাটকের বিপুল জনপ্রিয়তার অন্যতম প্রধান কারণ, ইহার মধ্যে ভাগ্যবিড়ম্বিত মানুষ নিজের জীবনেরই ছায়ারূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছে। ভারতবর্ষের সম্রাট্ সাজাহান, বিশ্বসৌন্দর্যের প্রেমময় রূপায়ণ তাজমহলের কবি সাজাহান—তাঁহার জীবনের এ কী শোচনীয় পরিণতি! যে পত্নীর প্রেমে তাঁহার প্রাণ হইতে তাজমহলের রূপসঙ্গীত উৎসারিত হইয়াছিল, সেই পত্নীরই গর্ভজাত সন্তানগণ তাঁহার চোখের সম্মুখে তাঁহারই সঞ্চিত ঐশ্বর্যের

অধিকার লইয়া নির্মম আত্মঘাতী সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছে—তিনি অসহায়ভাবে তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছেন। বেদনায় তাঁহার নাড়ি ছিঁড়িয়া যাইতেছে, প্রতিটি আঘাত তাঁহার অন্তর দিয়া তিনি নিজে গ্রহণ করিতেছেন। প্রিয়তম পুত্র দারা তাঁহার অন্য এক পুত্র কর্তৃক নিয়োজিত ঘাতকের হস্তে নির্মমভাবে নিহত হইল—তিনি সম্রাট্ হইয়া, পিতা হইয়া তাহাকে রক্ষা করিতে পারিলেন না। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে দারার সকল জ্বালা জুড়াইয়াছে, কিন্তু যে হতভাগ্য পিতা তখনও বাঁচিয়া থাকিয়া জীর্ণদেহে ও ভগ্নহৃদয়ে প্রতি মুহূর্তে সেই ভীষণ মৃত্যুর চরম নিষ্ঠুরতার কথা স্মরণ করিতেছে, সে যে কী নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, তাহা কে বলিবে? এই ট্র্যাজিডির মধ্যে সাজাহানের মৃত্যু হয় নাই সত্য, কিন্তু মৃত্যু অপেক্ষাও ভয়াবহ যদি কিছু থাকে তবে তাঁহার তাহাই ভোগ হইয়াছে। সাজাহানের পরিণতির ভিতর দিয়া শাশ্বত মানবজীবনের একটি চরম শিক্ষার কথাই ব্যক্ত হইয়াছে—সাজাহানের জীবনে সাজাহান যে লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছেন, সাধারণ মানুষ তাহাদের নিজেদের জীবনে অহরহ সেই শিক্ষা লাভ করিতেছে। সাধারণ মন অদৃষ্ট বা নিয়তির লীলা বলিয়া জীবনে সান্ত্বনা লাভ করিয়া থাকে। সাজাহানের জীবন অদৃষ্ট-বিড়ম্বিত মানব-জীবনের এক মহতী সান্ত্বনা। এই গুণেই ইহার আবেদন এত ব্যাপক।

এই নাটকের একটি গুণ এই যে, ঐতিহাসিক নির্দেশ অনুসরণ করিবার ফলে ইহার কোন চরিত্রসৃষ্টির মধ্যেই অসঙ্গতি দেখিতে পাওয়া যায় না। সক্রিয় অনৈতিহাসিক চরিত্র ইহাতে প্রায় নাই বলিলেই চলে। এই সম্পর্কে সুজার পত্নী পিয়ারার চরিত্রটি উল্লেখ করা যায়, ইহাও ইতিহাস-বিরোধী নহে। তবে বাংলার সুবেদার শাহ্‌জাদা সুজার পত্নী পিয়ারার চরিত্র-রূপায়ণের মধ্য দিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার কবিমনোভাবের পরিচয় ব্যক্ত করিয়াছেন। পিয়ারার বাক্যে ও আচরণে লঘু কৌতুক ও সঙ্গীতপ্রিয়তার পরিচয় প্রকাশ পাইলেও, ইহা নাটকের করুণ রসের নিবিড়তা বিনষ্ট করিয়াছে বলিয়া বোধ হইবে না। কারণ, গভীরভাবে লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পারা যাইবে, তাঁহার সঙ্গীত ও সংলাপের মধ্য দিয়া একটি সুগভীর মর্মবেদনার প্রচ্ছন্ন আর্তনাদই ধ্বনিত হইয়াছে। আসন্ন ভবিষ্যৎ জীবনের করুণ পরিণতির পূর্বগামিনী ছায়া তাঁহার উপর বিস্তারলাভ করিয়াছে। তিনি জানেন, মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে তাঁহার স্বামী জয়লাভ করিতে পারিবেন না, অথচ যুদ্ধের পথ

হইতে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিবারও তাঁহার শক্তি নাই। পরিণতির কথা জানিতে পারিয়াও তিনি তাহার প্রতিকার করিতে অক্ষম। এই অসহায়তাই তাঁহার জীবনের সকল স্বাচ্ছন্দ্য দূর করিয়া দিয়াছে। এই দুঃখ ভুলিবার জন্যই তাঁহার সঙ্গীত—তাঁহার সঙ্গীত আনন্দের সঙ্গীত নহে। তাঁহার সঙ্গীতগুলির কথা ও সুরের ভিতর দিয়া হৃদয়ের এই অস্বস্তি ও বেদনার ভাব সুস্পষ্ট ব্যক্ত হইয়াছে। বাংলার সুবেদার সুজার পত্নী পিয়ারা বাংলাদেশের সজল-শ্যামল স্নেহমমতায় মাখা—তাঁহার চরিত্রের এই আবেদনটি বাঙ্গালী দর্শককে সহজেই মুগ্ধ করিয়াছে।

দারার হত্যাদৃশ্যটি অতিনাটকীয় ঘটনায় ভারাক্রান্ত এবং দর্শকের অনুভূতি নির্মমভাবে পীড়িত করিয়াছে বলিয়া বোধ হইতে পারে। কিন্তু ইহার ঘটনাবলী ইতিহাস-বিরুদ্ধ নহে—এই দৃশ্যের নির্মমতা দারার প্রতি সাজাহানের স্নেহশীলতার সঙ্গে বৈপরীত্য সৃষ্টি করিয়া নাটকীয় গুণই বৃদ্ধি করিয়াছে। একদিক দিয়া সাজাহানের উপর ইহার মানসিক প্রতিক্রিয়া এবং অপর দিক দিয়া ইহা দ্বারা আওরঙ্গজেবের যে নৃশংসতার পরিচয় নগ্নরূপ ধারণ করিয়াছে, নাটকের মধ্যে ইহাদের উভয়েরই বিশেষ স্থান আছে।

'সাজাহান'ই দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশী আন্দোলনের প্রত্যক্ষ প্রভাবমুক্ত প্রথম ঐতিহাসিক নাটক, কিন্তু তথাপি ইহার মধ্যেও যে পিয়ারার মুখে বঙ্গভূমির বন্দনা (২।৫) এবং চারণ বালকদিগের মুখে জন্মভূমির মহিমা কীর্তন সূচক সঙ্গীত (৩।৬) শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা বাঙ্গালীর নিকট ইহার যুগচৈতন্যের দাবীও পূর্ণ করিয়াছিল। কিন্তু যুগচৈতন্য অপেক্ষা চিরন্তন মানবিকতার রস-চৈতন্যের আবেদনেই দ্বিজেন্দ্রলালের এই নাটকখানি অধিকতর সার্থকতা লাভ করিয়াছে।

'সাজাহান'-এর পরই জনপ্রিয়তার দিক দিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকখানি উল্লেখ করিতে হয়। 'সাজাহান'-এর অব্যবহিত পরই ইহা রচিত হয়। দ্বিজেন্দ্রলাল এতকাল মোগল ও রাজপুত ইতিহাস হইতেই তাঁহার নাটকের উপকরণ সংগ্রহ করিতেছিলেন, হিন্দু রাজত্বকালীন ইহাই তাঁহার সর্বপ্রথম নাটক। ইহার পর এই বিষয়ক আর একখানি মাত্র ঐতিহাসিক নাটক তিনি রচনা করেন, তাহা তাঁহার সর্বশেষ রচনা, তাহার নাম 'সিংহল বিজয়'। হিন্দু রাজত্বকালীন ঐতিহাসিক নাটক রচনার অসুবিধা সম্পর্কে তিনি নিজেই উল্লেখ করিয়াছেন,—'এতদিন মুসলমান-কাল সম্বন্ধেই নাটক

লিখিতেছিলাম কেন, পাঠক বোধ হয় বুঝিতে পারিতেছেন। মুসলমান ইতিহাসকারগণ নিজেদের পরাজয়গুলি গোপন করিলেও নাটক লিখিবার যথেষ্ট উপকরণ রাখিয়া গিয়াছেন। হিন্দু ইতিহাসকারগণ আপনাদের বিজয় কাহিনী পর্যন্ত গোপন করিয়াছেন' ('চন্দ্রগুপ্ত'—ভূমিকা)। 'চন্দ্রগুপ্ত'-এরও ঐতিহাসিক মূল্য তাঁহার মুসলমান-রাজত্বকালীন ঐতিহাসিক নাটকগুলি হইতে সেইজন্য অনেক কম। নাট্যকার নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, 'অনন্যোপায় হইয়া কল্পনার উপরেই সমধিক নির্ভর করিয়াছি' (ঐ)। প্রকৃত-পক্ষে ইহাও একটি ঐতিহাসিক রোমান্স। ঐতিহাসিক মূল্য কম হইলেও দ্বিজেন্দ্রলালের এই শ্রেণীর অন্যান্য রচনা হইতে ইহার নাট্যিক মূল্য সমধিক। কাহিনীটি সংক্ষেপে এই,—

দিগ্বিজয়ী সেকেন্দার শাহ যখন ভারত আক্রমণ করেন, তখন মগধরাজের শূদ্রাণী-গর্ভজাত পুত্র চন্দ্রগুপ্ত তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নন্দ কর্তৃক রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়া হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের আশায় গ্রীক-পরিচালিত যুদ্ধ-কৌশল শিক্ষা করিবার জন্য সিন্ধুনদ-তট পর্যন্ত আগমন করেন। তথায় সেকেন্দার শাহার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। সেকেন্দার ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, চন্দ্রগুপ্ত হৃতরাজ্য উদ্ধার করিবেন। চন্দ্রগুপ্ত এই কার্যে চাণক্য নামক এক ব্রাহ্মণের সহায়তা লাভ করেন। চাণক্য মগধরাজ নন্দ কর্তৃক অপমানিত হইয়া অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প ছিলেন। চন্দ্রগুপ্তের শূদ্রাণী জননীর নাম মুরা। মুরাও একদিন নন্দ কর্তৃক অপমানিত হ'ন এবং তিনিও তাঁহার অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার জন্য পুত্র চন্দ্রগুপ্তকে উত্তেজিত করিতে থাকেন। চন্দ্রগুপ্ত মলয়রাজ চন্দ্রকেতুর সহায়তা লাভ করেন। নন্দের মন্ত্রী কাত্যায়নও নন্দের নির্মম আচরণে পূর্ব হইতেই বিরক্ত ছিলেন, তিনিও গোপনে বিদ্রোহীদলের সহায়তা করিতে লাগিলেন। সেকেন্দার শাহ্‌র মৃত্যুর পর তাঁহার সেনাপতি সেলুকস তাঁহার পরিত্যক্ত সমগ্র এশিয়া সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী হইলেন। সেলুকসের বিদুষী কন্যার নাম হেলেন। হেলেন পিতার অত্যন্ত অনুরক্ত, পিতাও তাহার প্রতি নিতান্ত স্নেহশীল। চন্দ্রকেতুর পার্বত্য সৈন্যের সহায়তায় ও চাণক্যের নির্দেশে চন্দ্রগুপ্ত মগধরাজ্য আক্রমণ করিলেন। নন্দ পরাজিত হইয়া বন্দী হইলেন। চাণক্যের নির্দেশে কাত্যা-য়ন নন্দকে বধ করিল, চাণক্যের প্রতিহিংসা-বৃত্তি চরিতার্থ হইল। চন্দ্রগুপ্ত মগধের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। চাণক্য তাঁহার মন্ত্রী হইলেন। চন্দ্র-

গুপ্ত সমগ্র ভারতবর্ষব্যাপী নিজের সাম্রাজ্য বিস্তার করিলেন। সেলুকস যখন দেখিলেন, চন্দ্রগুপ্তের প্রতাপে ভারতবর্ষ হইতে গ্রীক প্রাধান্য একেবারে লোপ পাইতে চলিয়াছে, তখন তিনি পুনরায় ভারতবর্ষ আক্রমণ করিলেন। চাণক্যের কৌশলে সেলুকস ও চন্দ্রগুপ্তে সন্ধি স্থাপিত হইল। সন্ধির একটা সর্ত অনুসারে চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে হেলেনের বিবাহ হইল।

এই মূল নাট্যকাহিনীর মধ্যে দুইটি উপকাহিনী আছে, একটি আন্টিগোনাসের ও অপরটি ছায়ার। গ্রীক সৈন্যাধ্যক্ষ আন্টিগোনাস হেলেনের পাণিপ্রার্থী ছিল এবং মলয়রাজ চন্দ্রকেতুর ভগিনী ছায়া চন্দ্রগুপ্তের প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণী ছিল। চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে হেলেনের বিবাহের ফলে উভয়েরই জীবন ব্যর্থ হইলেও নাট্যকার আন্টিগোনাসের জীবনের পরিণামে একটি সুখকর পরিচ্ছেদ টানিয়াছেন, কিন্তু ছায়াব পরিণতি একটি প্রচ্ছন্ন দীর্ঘশ্বাসের মত নাটকাখ্যানের পরিণতিটি ছায়াচ্ছন্ন করিয়াছে।

দ্বিজেন্দ্রলালের অন্যান্য রোমান্টিক নাটকের মতই 'চন্দ্রগুপ্ত'-এব অতি-নাটকীয় লক্ষণ অত্যন্ত প্রকট। তথাপি ইহাব বহিরঙ্গগত অতিনাটকীয় ঘটনাবলীব অন্তরালবর্তী আবও কতকগুলি জিনিস আছে; তাহাই এই নাটকখানির লোকপ্রিয়তার কারণ। ইহার ঐতিহাসিক উপাদান নিতান্ত নগণ্য ছিল বলিয়াই নাট্যকারকে অনন্যোপায় হইয়া যে কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল, তাহার ফলেই ইহার মধ্যে কতকগুলি লৌকিক উপাদান ব্যবহৃত হইয়াছে। চন্দ্রগুপ্ত, চাণক্য, সেলুকস, নন্দ, সেকেন্দার শাহ, মুরা—ইহারা ঐতিহাসিক চরিত্র। কিন্তু ইহাদেব সম্পর্কে যে ঐতিহাসিক পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা দ্বাবা প্রত্যেক চরিত্রকেই এক একটি সম্পূর্ণতা দান করিতে পারা যায়। সেইজন্যই নাট্যকাবকে এই সকল চরিত্র-পরিকল্পনায় কল্পনার উপবই অধিকতর নির্ভর করিতে হইয়াছে। কিন্তু ঐতিহাসিক ঘটনা অতিক্রম করিয়া যেখানে দ্বিজেন্দ্রলালকে নিজস্ব কবি-কল্পনার উপব নির্ভর করিতে হইয়াছে, সেখানেই নাট্যকারের নিজস্ব মনোভাব এত প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে যে, নাটকের ঐতিহাসিক মর্যাদা তাহাতে অনেকাংশেই ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। যেখানে ঐতিহাসিক কোন নির্দেশ পাওয়া গিয়াছে, দ্বিজেন্দ্রলাল সেখানে ইতিহাসেরই অনুসরণ করিয়া ঐতিহাসিক নাটকের মর্যাদা যথাসম্ভব রক্ষা করিতে পারিয়াছেন। মোগল আমল বিষয়ক তাঁহার নাটকগুলিই ইহার প্রমাণ। কিন্তু যেখানে ঐতিহাসিক নির্দেশ অত্যন্ত ক্ষীণ, সেইখানেই দ্বিজেন্দ্রলালের

ব্যক্তি-চৈতন্য অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। তাহার ফলে 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে ইতিহাস নিতান্ত গৌণ হইয়া পড়িয়া কবির আত্মগত মনোভাবই মুখ্যভাবে দেখা দিয়াছে। সেইজন্য ঐতিহাসিক নাটক হিসাবে 'চন্দ্রগুপ্ত' যেমন সার্থকতা লাভ করিতে পারে নাই, তেমনই নাটক হিসাবেও ইহা সর্বাংশেই ত্রুটিহীন নয়। তবে ইহার লোকপ্রিয়তার বিশিষ্ট কারণগুলি বিচার করিয়া দেখা যাইতেছে।

নাট্যকার ভূমিকায় বলিয়াছেন, 'বর্ণভেদকেই বর্তমান নাটকের ভিত্তি-স্বরূপ করা হইয়াছে।' কিন্তু এ কথাও সত্য নহে; বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বর্ণ-সংস্কার যখন এ দেশের সমাজে অত্যন্ত শিথিল হইয়া আসিয়াছে, তখন বর্ণভেদকে ভিত্তি করিয়া নাটক রচনা করিলে তাহা গণ-রুচির অনুগামী হইবার কথা নহে। যুগন্ধরতাই যে দ্বিজেন্দ্র-নাট্যসাহিত্যের বিশিষ্ট গুণ, সে কথা পূর্বেও বলিয়াছি। বর্ণসংস্কার যুগ-চৈতন্যের বিরোধী ছিল এবং দ্বিজেন্দ্র-লালের অনুভূতিও কোন দিক দিয়াই কালোত্তীর্ণ হইতে পারে নাই। বিশেষতঃ নাটকখানি বিশেষ ভাবে বিচার করিয়া দেখিলেও বুঝিতে পারা যায় যে, বর্ণভেদের কথা ইহার মধ্যে থাকিলেও ইহাই ইহার চরম লক্ষ্য ছিল না। চাণক্য ব্রাহ্মণের অধঃপতনের জন্য পরিতাপ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু একমাত্র ব্রাহ্মণ্য শক্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্যই তাঁহার সমগ্র কর্মশক্তি একান্তভাবে নিয়োজিত করেন নাই; নন্দ তাঁহাকে যে অপমান করিয়াছিল, তাহা তিনি সমগ্র ব্রাহ্মণেতর জাতির ব্রাহ্মণের প্রতি অপমানের পরিবর্তে নিজের উপর ব্যক্তিগত অপমান বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলেন,—সেইজন্যই নন্দের হত্যাতেই তাঁহার প্রতিহিংসার নিবৃত্তি হইয়াছিল এবং চন্দ্রগুপ্তও যখন তাঁহাকে একবার অপমানিত করেন, তখনও তিনি তাঁহার উপর অভিমানে তাঁহার মন্ত্রীর পদ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়া পুনরায় চন্দ্রকেতুর কথায় ফিরিয়া আসিয়া-ছিলেন। হৃত কন্যাকে ফিরিয়া পাইবার পর আসন্ন বৌদ্ধধর্মের বন্যার বিভীষিকা দেখিয়াই চাণক্য তাঁহার সমস্ত পূর্ব সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় গার্হস্থ্য জীবনের মধ্যেই জীবনের সত্যের সন্ধান পাইয়াছিলেন। - বর্ণভেদ চাণক্যের জীবনের একটা উপলক্ষ্য মাত্র ছিল, একমাত্র লক্ষ্য ছিল না। অতএব বর্ণভেদকে বর্তমান নাটকের ভিত্তি বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

তাহা হইলে ইহার মূল ভিত্তি কি? একটু সহজ ভাবে বিবেচনা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, প্রকৃতপক্ষে গৃহধর্ম এই নাটকের মূল ভিত্তি। স্নেহ,

প্রেম, ভক্তি, বাৎসল্য প্রমুখ নিতান্ত সহজ মানবিক বৃত্তিগুলিকেই এই নাটকা-খ্যানের মূল উপজীব্য করা হইয়াছে এবং তাহাই এইঘটনা-বহুল অতিনাটকীয় লক্ষণাক্রান্ত নাটকটিকে এত জনপ্রিয় করিয়াছে। ইহার বহির্মুখী নাটকীয় ঘটনাসমূহ অপেক্ষা এই সকল স্বাভাবিক মানবিক বৃত্তিগুলি সাধারণ পাঠকের নিকট অধিকতর আকর্ষণীয়। হেলেনের প্রতি সেলুকসের স্নেহ, হেলেনের পিতৃভক্তি, চন্দ্রগুপ্তের মাতৃভক্তি, মুরার সন্তান-স্নেহ, কাত্যায়নের সন্তান-শোক, চাণক্যের সন্তান-বাৎসল্য, ছায়ার প্রেম, চন্দ্রগুপ্তের ভ্রাতৃপ্রীতি, আন্টিগোনাসের জননীর বাৎসল্য, আন্টিগোনাসের মাতৃভক্তি এই সকল বিষয়ই ইহার মধ্যে এত প্রাধান্য লাভ করিয়াছে যে, ইহার বহির্মুখী ঘটনাবলী ইহাদের নিকট গৌণ হইয়া পড়িয়াছে। এই সকল অংশ ইতিহাস-বহির্ভূত কবি-কল্পনার ফল। একটি রোমান্টিক পরিবেশের মধ্যে কতকগুলি মানবিক হৃদয়বৃত্তির প্রাধান্য দিয়া নাট্যকার অতি সহজেই ইহা দ্বারা সুলভ জনপ্রিয়তা অর্জন করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

এই নাটকের প্রধান চরিত্র চাণক্য। এই চাণক্য আনুপুর্বিক ইতিহাসের চাণক্য নহেন। ইহার চরিত্র নাট্যকারের রোমান্টিক কল্পনার ফল। ইহাকে ইতিহাসের চাণক্য বলিয়া ভুল করাতেই কাহারও কাহারও নিকট তাঁহার সংলাপ বাহুল্য ও বৈষম্যপূর্ণ বলিয়া মনে হইয়াছে। এই নাটকে চাণক্যকে আমরা একটা সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে পাই না, নাট্যকার তাহার কারণও যথাযথভাবে নির্দেশ করিয়াছেন। নাটকের মধ্যে প্রথম আবির্ভাবেই চাণক্য নিজের সম্পর্কে বলিতেছেন—

'মহারাজ আমার ব্রহ্মোত্তর বাজেয়াপ্ত কর্লেন·· ···। ঈশ্বর আমার গৃহ শূন্য করে আমার গৃহলক্ষ্মীকে কেড়ে সবলে ছিনিয়ে নিলেন······। দস্যু আমার কন্যা অপহরণ কর্ল······'(১।২)। রাজা, ভগবান ও সমাজ ইহাদের বিরুদ্ধে আক্রোশ লইয়াই এই নাটকে চাণক্যের আবির্ভাব এবং নাটকে তাঁহার প্রত্যেকটি আচরণের মধ্য দিয়া তাহারই প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়াছে মাত্র। অতএব এই নাটকের মধ্যে চাণক্যের কোন আচরণই সুস্থ, স্বাভাবিক ও সঙ্গত হইবে বলিয়া প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। ইতিহাসের চাণক্যের এমন কোন পরিচয় নাই, ইতিহাসের কূট ও রাজনীতিজ্ঞ চাণক্যের ব্যক্তিগত চরিত্র-বৈশিষ্ট্য কি ছিল কে তাহা বলিতে পারে? কিন্তু নাটকের চাণক্যচরিত্রের মধ্যে একটা সাময়িক অবস্থা-বৈগুণ্যের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। নাটকের শেষাংশে

চাণক্য যখন তাঁহার হৃত কন্যা আত্রেয়ীকে ফিরিয়া পাইলেন, তখন তিনি স্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু সেই মুহূর্তেই চাণক্য নাটক হইতে বিদায় লইয়া গেলেন। সেইজন্যই স্বাভাবিক দৃষ্টিতে নাটকের মধ্যে চাণক্যের চরিত্রের সংলাপ অনেক জায়গাতেই বাহুল্য ও বৈষম্যপূর্ণ মনে হইতে পারে। নাটকের মধ্যে চাণক্যের ক্রূর প্রতিহিংসা-পরায়ণতার দিকটি যে রকম চিত্রিত হইয়াছে তাঁহার কূট রাজনীতিজ্ঞানের পরিচয় তেমন সুপরিস্ফুট হয় নাই। ঐতিহাসিক চরিত্র হিসাবে এই নাটকে চাণক্য-চরিত্রের ইহাও একটি গুরুতর ত্রুটি। চরিত্রটিকে নিতান্ত আবেগ-প্রবণ (sentimental) করিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। বলাই বাহুল্য যে; আবেগপ্রবণতার সঙ্গে কূট রাজনীতি-জ্ঞান সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতে পারে না। সেইজন্যই চন্দ্রগুপ্ত চাণক্যকে যখন ভুল বুঝিলেন, তখন চাণক্য অভিমানে তাঁহার মন্ত্রিত্ব পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। পুনরায় চন্দ্রকেতুর অনুরোধে চন্দ্রগুপ্তের পার্শ্বে ফিরিয়া আসিলেন। এই নাটকে চাণক্যের মধ্যে গৃহধর্মই ছিল একমাত্র সত্য। চাণক্য সর্বোপরি স্নেহশীল পিতা। স্নেহ ব্যাহত হইয়াই তাঁহার মধ্যে হিংসার জন্ম হয়। প্রথমেই যেমন দেখিতে পাইয়াছি, তিনি তাঁহার ব্রহ্মোত্তর ও পত্নীকন্যার জন্য পরিতাপ করিতেছেন, আবার চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যশাসন ব্যাপারের প্রত্যক্ষ সংস্রবে আসিবার পরও কন্যাকে ফিরিয়া পাইবার পর আবার দেখিতে পাই এই দুর্লভ ক্ষমতার মোহ অতি সহজেই পরিত্যাগ করিয়া তিনি পুনরায় নিজের কুটীরবাসী হইয়াছেন। পূর্বেই বলিয়াছি, ব্রাহ্মণ্য অভিমানও চাণক্যের জীবনের চরম সত্য ছিল না; কারণ, এই অভিমান রক্ষা করিবার জন্য তিনি জীবনের কিছুই বিসর্জন দেন নাই। ব্রাহ্মণ্য অভিমান তাঁহার ব্যক্তিগত অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণেই তিনি নিয়োজিত করিয়াছিলেন। প্রতিহিংসা গ্রহণ ব্যতীত তাঁহার আর কোন সঙ্কল্প ছিল না। নন্দ বধের পর তিনি বলিতেছেন,—'প্রতিহিংসা পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু সে একটা ক্ষণিক উন্মাদনা। আবার সেই অবসাদ। বাহিরের বাদ্য থেমে গিয়েছে। আবার হৃদয়ের সেই হাহাকার শুনতে পাচ্ছি। অগাধ স্নেহরাশি—রাখি এমন পাত্র নাই। হৃদয় কম্পিত আগ্রহে কাকে যেন বক্ষে চেপে ধর্তে চায়। কিন্তু সে ব্যগ্র আলিঙ্গন বক্ষে চেপে ধরে—নিজেরই উষ্ণনিঃশ্বাস।—রাক্ষসি! করেছিস্ কি ?—এ শুধু অরণ্যে রোদন—(কপালে করাঘাত)।'

'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের মধ্যে কাত্যায়নের চরিত্রই সর্বাপেক্ষা অসঙ্গত বলিয়া

বোধ হয়। ইহার একটি কারণ এই যে, এই নাটকের মধ্যে কাত্যায়ন যে সকল আচরণ করিয়াছেন, তাহাদের সকলেরই প্রেরণা আসিয়াছে নাটকের অনভিনীত নেপথ্যাংশ হইতে। বিশেষতঃ নন্দের উপর কাত্যায়নের আক্রোশের যে কারণ-নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহা কেবল নাটকের বহির্ভূত অংশ বলিয়াই নহে, তাহার সুস্পষ্ট কোন কারণেরও নির্দেশ পাওয়া যায় না বলিয়া দর্শকের উপর তাহার প্রভাব স্থাপিত হইতে পারে না। কাত্যায়নের সাতটি শিশু পুত্রকে কেন যে নন্দ নির্মমভাবে অনশনে হত্যা করিয়াছিল, তাহার যেমন কোন কারণ-নির্দেশ নাই, তেমনই আবার সন্তানদিগকে হত্যা করিয়া সেই নিহত সন্তানদিগের পিতাকেই মন্ত্রিত্ব দিবারও কোন যুক্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,

> 'অপমানিতের করে,
> ক্ষমতার অস্ত্র দেওয়া মরিবার তরে।'

নন্দ এই নিতান্ত সাধারণ রাজনীতি সম্বন্ধে যে অজ্ঞ ছিল, তাহাও বুঝিতে পারা যায় না। অথচ এই কাত্যায়নকে দিয়াই এই নাটকের নিষ্ঠুরতম কায অর্থাৎ নন্দকে বলি দেওয়া সাধিত হইয়াছে। ঐতিহাসিক চরিত্রের সঙ্গে এই কাত্যায়নের কোন প্রকার যোগ রক্ষিত হয় নাই, অথচ নাট্যকারের মনে এই চরিত্র পরিকল্পনায় বৈয়াকরণ কাত্যায়নেরও ছায়াপাত হইয়াছিল; এই চরিত্র বৈয়াকরণ কাত্যায়নের ছায়াতলে পরিকল্পিত হইয়াও তাঁহার মর্যাদা রক্ষায় অসমর্থ হইয়াছে বলিয়া ইহার মধ্যে সম্যক্ রসস্ফূর্তি হয় নাই। পাণিনি লইয়া এই কাত্যায়ন স্থানে স্থানে যে শ্রেণীর রসিকতার অবতারণা করিয়াছেন তাহা কোনদিক দিয়াই তাঁহার মর্যাদা অনুযায়ী হয় নাই। এই কাত্যায়ন দুর্বল-চেতা, ব্যক্তিত্বহীন ও বিশ্বাসঘাতক। প্রতিহিংসা গ্রহণ করিবারও দৃঢ়তা তাঁহার নাই, তাঁহার সেই প্রেরণাও আসিয়াছে চাণক্য হইতে; নন্দকে বধ করিবার মধ্যেও তাঁহার কোনই পৌরুষ প্রকাশ পায় নাই, সেখানেও তিনি চাণক্যের হস্তে ক্রীড়া-পুত্তলিকারূপে কার্য করিয়াছেন। 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের ঐতিহাসিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হইবার জন্য এই চরিত্রটি বহুলাংশে দায়ী।

একদিকে চাণক্য ও অপরদিকে মুরা এই উভয়ের ব্যক্তিত্বের অন্তরালে পড়িয়া চন্দ্রগুপ্ত চরিত্রটির সম্যক্ বিকাশ হয় নাই। কাহিনীর দিক দিয়া বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, চন্দ্রগুপ্তই এই নাটকের নায়ক; কিন্তু

রচনার ত্রুটিতে তাহা সুপরিস্ফুট হয় নাই; বরং চাণক্যকেই এই নাটকাখ্যানের নায়ক বলিয়া ভ্রম হয়।

স্ত্রীচরিত্রের মধ্যে সেলুকসের কন্যা হেলেনের চরিত্রটি বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। ইহাতে বাঙ্গালী শিল্পী যেন গ্রীক উপাদানে এক সুন্দরী নারীমূর্তি গড়িয়াছেন। বজ্রে বিদ্যুতের লাবণ্য খেলিয়াছে, কঠিন পাষাণে কমনীয় সৌন্দর্যের বিকাশ হইয়াছে। মানবিক আবেদনই হেলেন চরিত্রের প্রধান আকর্ষণীয় গুণ। হেলেন পিতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল, তাহার দয়ার্দ্র হৃদয় সর্বদা পরদুঃখকাতর, এমন কি আন্টিগোনাসকে জীবনে সে গ্রহণ করিতে না পারিলেও তাহাকে প্রত্যাখ্যান করার মধ্যেও সে বেদনাবোধ করে; সেইজন্য চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে যখন মিলনের পর হেলেন শুনিতে পাইল যে আন্টিগোনাস তাহার ভ্রাতা তখন আন্টিগোনাসের নিকট সে আর অপরাধিনী নহে এই বিবেচনায় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলিল,

হেলেন। আন্টিগোনাস! তুমি এক পর্বত-ভার বক্ষ থেকে নামিয়ে নিলে। আমি এখন সহজে নিঃশ্বাস ফেলছি। আন্টিগোনাস—ভাই—আমায় ক্ষমা কর! (সোচ্ছ্বাসে) ক্ষমা কর ভাই।

হেলেন চন্দ্রগুপ্তকে প্রথম দর্শনেই ভালবাসিয়াছিল, কিন্তু অপূর্ব সংযমের গুণে সে তাহার মনোভাব নিজের অন্তস্তলেই প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছিল। একবার শুধু তাহা তাহার পাঠ-গৃহের নিভৃত অবসরে অবচেতন আত্মার অনুভূতিলোক হইতে দর্শকবর্গকে আভাস দিয়াছিল (১।২)। সেলুকস চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে হেলেন তাঁহাকে তাহা হইতে নিরস্ত হইবার জন্য যে অনুরোধ জানাইয়াছিল, তাহার মধ্য দিয়াও নাট্যকার পরম কৌশলে চন্দ্রগুপ্তের প্রতি হেলেনের মনোভাবের ইঙ্গিত দিয়াছেন (৩।৪)। তারপর সন্ধির সর্ত অনুসারে হেলেনকে যখন চন্দ্রগুপ্তকে বিবাহ করিতে হইল, তখন হেলেনের মুখে 'মানবের মহাহিতে আত্মবলিদানে'র (৫।৪) যে শুভ-সঙ্কল্পের কথা শুনিতে পাই, তাহার অন্তরালেও তাহার ব্যক্তিগত প্রণয়-স্বপ্নের সার্থকতা-মূলক পরিতৃপ্তির আস্বাদ অনুভব করা যায়। সংযমই এই চরিত্রটির সৌন্দর্যের মূল।

মুরার চরিত্রে বাঙ্গালীজননী-সুলভ সুকোমল হৃদয়-বৃত্তির সঙ্গে অনেক স্থলেই তাহার দৃঢ়তা সহজ সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে পারে নাই। এইজন্যই চরিত্রটির ঐতিহাসিক মর্যাদাও অনেকাংশে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। এই নাটকের

মধ্যে ছায়ার চরিত্রের বিশেষ কিছু সার্থকতা দেখিতে পাওয়া যায় না; অথচ পুর্বেই বলিয়াছি, একটি দীর্ঘনিঃশ্বাসের মত সে এই নাট্যকাহিনীর পরিণতিটি করুণ করিয়া তুলিয়াছে।' চন্দ্রগুপ্ত ও হেলেনের মিলনের মাঝখান হইতে এই বঞ্চিতা নারীর মর্মবেদনাটুকু কিছুতেই মুছিয়া ফেলা যায় না। নাট্য-কাহিনীর ইহা কোন অপরিহার্য পরিণতি নহে বলিয়াই তাহার জন্য বেদনাও যেন অধিক বোধ হয়; নাটকের মিলনোজ্জ্বল পরিণতির মধ্যে ছায়ার এই মলিন স্পর্শ টুকু নাট্যকার পরিত্যাগ করিলেই ভাল করিতেন।

নাটকের মধ্যে আর কোন উল্লেখযোগ্য চরিত্র নাই, তবে সেলুকসের চরিত্র সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা যাইতে পারে। সেলুকস গ্রীক্ সেনাপতি, পরে এসিয়ার গ্রীক্ সাম্রাজ্যের সম্রাট্। কিন্তু নাটকের মধ্যে তাঁহাকে প্রকৃত রাজমর্যাদায় মর্যাদাবান্ কোন স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি এখানে স্নেহশীল পিতা; শুধু তাহাই নহে, মাতৃহীনা কন্যার জনক-জননী-স্থানীয়। সন্তানগতপ্রাণ বাঙ্গালী জনকের একটি নিখুঁত চিত্রই তাঁহার মধ্যে ফুটিয়াছে, গ্রীক্ শৌর্যবীর্য ও মর্যাদাবোধ তাঁহার মধ্যে ততখানি বিকাশ লাভ করিতে পারে নাই। সেইজন্যই সেলুকসের শেষ দৃশ্যটি বড় করুণ। নাটকের কোন দৃশ্যেই সেলুকস তাঁহার কন্যার সঙ্গচ্যুত হন নাই; সুতরাং শেষ দৃশ্যে (৫।৪) যখন হেলেন পিতার আশীর্বাদ লইয়া বিদায় হইয়া গেল, তখন সেই শূন্য দৃশ্যে সেলুকসের উক্তি,—

'...যাই, দেশে ফিরে যাই, কোথায়?—কৈ! এ যে ঘোর অন্ধকার। পথ দেখতে পাই না। মা আমার! আমায় অন্ধ করে কোথায় চলে গেলি মা।' (৫।৪)

হৃদয় স্পর্শ না করিয়া পারে না। সেলুকসের দিক হইতে এই নাটকের ইহাই করুণতম ট্র্যাজিডি। আন্টিগোনাসের চরিত্রের মধ্যে বিশেষত্ব কিছু না থাকিলেও, তাহার আচরণের মধ্য দিয়া নাট্যকার একটি ইঙ্গিত প্রকাশ করিয়াছেন। সামান্য এক সৈন্যাধ্যক্ষ হইয়া আন্টিগোনাস যে প্রভু-কন্যা হেলেনের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে, তাহার মূলে একটি গভীর সত্য নিহিত আছে। তাহাদের আকর্ষণের মূল, উভয়েই এক পিতার সন্তান; অপরিচয়ের ব্যবধান, ভগিনীকে ভ্রাতা হইতে পৃথক্ করিলেও এই সত্য তাহারা জীবনে পরিহার করিতে পারে না। (তুলনীয় 'উত্তররামচরিত নাটক'—'নিজো বা সম্বন্ধঃ কিমু বিধিবশাৎ কোঽপ্যবিদিতো।') পরস্পর অপরিচয়ের জন্য স্বভাবতঃই এই আকর্ষণ যুবক-যুবতীর প্রণয়াকর্ষণের রূপ গ্রহণ করিয়াছে এবং

অবশেষে যখন তাহাদের প্রকৃত পরিচয় একদিন প্রকাশিত হইয়াছে, তখনও ভ্রাতা ভগিনীর মিলন পরম আন্তরিকতাপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। পিতা সেলুকসের সঙ্গে হেলেনের বিচ্ছেদের বেদনাশ্রু ভ্রাতা আণ্টিগোনাসের সঙ্গে মিলনের আনন্দাশ্রুতে ধুইয়া গিয়াছে।

পূর্বেই বলিয়াছি, 'চন্দ্রগুপ্ত' ঐতিহাসিক নাটক হইলেও ইহাতে নাট্যকার ঐতিহাসিক চরিত্রগুলিকেও তাহাদের দেশ ও কাল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া বাঙ্গালীর হৃদয়ের দ্বারে টানিয়া আনিয়াছেন। সেইজন্য দিগ্বিজয়ী সেকন্দর শাহ'র মুখে ভারতের প্রকৃতি-স্তব, সেলুকসের মুখে হেলেনকে 'আমার বুড়ো বয়সের মা' (২।১) সম্বোধন, চন্দ্রগুপ্তের মুখে নন্দের প্রতি 'আমাব বক্ষে এস,—ছোট ভাইটি আমার' (২।৫) উক্তি, নন্দ-বলির পর মুবার করুণ শোকার্ত বিলাপ, ভিক্ষুক-বালাকে দেখিয়া চাণক্যের স্নেহাভিব্যক্তি ও আণ্টিগোনাসের প্রকৃত পরিচয় পাইয়া হেলেনের 'তুমি আমার ভাই!' বলিয়া স্নেহগদ্‌গদভাব ইত্যাদি দ্বারা আবেগ প্রকাশ করিতে শুনিতে পাই। এই ভাব-বিলাস বাঙ্গালীর হৃদয়ধর্মের অনুগামী বলিয়া এই নাটক অতি সহজেই জনপ্রিয়তা অর্জন করিতে সক্ষম হইয়াছিল। এই নাটকের জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ ইহার যুগ-লক্ষণ। যে দেশাত্মবোধের চৈতন্য দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের প্রায় সমগ্র ঐতিহাসিক নাটকেরই মূল ভিত্তি, ইহার মধ্যেও তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। অখণ্ড ভারতকে কেন্দ্র করিয়া দ্বিজেন্দ্রলালের যে দেশপ্রীতি গড়িয়া উঠিয়াছিল, 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের মধ্যেও এক অখণ্ড ভারত-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ভিতর দিয়া তাহা রূপলাভ করিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ'-এর মাতৃমূর্তি দর্শনের মত এখানেও চাণক্য মানস-নেত্রে প্রত্যক্ষ করিতেছেন,—

> এই প্রধূমিতা, প্রজ্বলিতা, প্রবাহিত রক্ত-স্রোতস্বতী ভৈরবী ভারতভূমির পরিবর্তে এক রত্নালঙ্কারা, পুষ্পোজ্জ্বলা, সঙ্গীত-মুখরা, হাস্যময়ী জননী (১।৪)।

সেকেন্দার শাহ'র মুখে ভারতের প্রকৃতি-স্তব এই দেশ-মাতৃকারই বন্দনা। চন্দ্রগুপ্তের মাতৃভক্তিও এই নাটকের অন্যতম যুগ-লক্ষণ। বাঙ্গালীর এই একটি প্রবল হৃদয়-বৃত্তিকে গিরিশচন্দ্রও যে কি ভাবে তাঁহার নাটকে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহার কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। জননীর সঙ্গে জন্মভূমির অভিন্ন পরিকল্পনা সেই যুগেই সর্বপ্রথম সাহিত্যে ও জীবনে বাস্তব রূপ লাভ করিয়াছিল। চন্দ্রগুপ্তও তাহারই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেছেন—

………তুমি যা'ই কর, তুমি আমার কাছে চিরদিনই মা,—'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।' (৩১৬)

অপমানিত মানবতার প্রতি শ্রদ্ধা সেই যুগের বিশিষ্ট ধর্ম ছিল। সমসাময়িক কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'শূদ্র', 'মেথর', 'দূর্বা', এই শ্রেণীর কবিতায় ও রবীন্দ্রনাথের বহু জাতীয় সঙ্গীতে সাহিত্যের মধ্য দিয়াও তাহার অভিব্যক্তি দেখা গিয়াছে। 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে শূদ্রাণী মুরা এই অপমানিত মানবতার প্রতীক। নন্দ তাঁহাকে শূদ্রাণী বলিয়া অপমানিত করিয়াছিল—মুরার সমগ্র নাট্যিক আচরণের মধ্যে তাহারই প্রতিহিংসা গ্রহণের দুরন্ত প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায়। সেক্সপীয়রের 'মার্চেণ্ট অব ভেনিস' নাটকের নির্যাতিত য়িহুদি সাইলক যেমন বলিয়াছিল,

'I am a Jew, Hath not a Jew eyes? Hath not a Jew hands, organs, dimensions, senses, affections, passions?' (৩১১)

অপমানিতা শূদ্রাণী মুরাকে তেমনি বলিতে শুনি,—

শূদ্রাণী!—শূদ্র মানুষ নহে? তার কি ক্ষত্রিয়েরই মত হস্তপদ নাই? মস্তিষ্ক নাই? হৃদয় নাই? এত ঘৃণা!—উত্তম। দেখাবো একবার শূদ্রের শক্তি।' (১১৪)

মুরার অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের ভিতর দিয়াই নাট্যকার নির্যাতিত মানবতার বিজয় ঘোষণা করিয়াছেন। এই ভাবে একটি বিশিষ্ট যুগধর্ম এখানে স্বীকৃত হওয়াতে ইহার মধ্যে জনসাধারণের হৃদয়ের যোগ অতি সহজেই স্থাপিত হইয়াছে। 'চন্দ্রগুপ্ত'-নাটকের গঠন ও ঘটনা-বিন্যাস দ্বিজেন্দ্রলালের অন্যান্য নাটক অপেক্ষা অনেকাংশে ত্রুটিহীন। নাটকের ভাষা একেবারে নির্দোষ না হইলেও ইহার ভাষা স্বচ্ছ, সতেজ ও গতিশীল, অতএব বহুলাংশেই নাট্যধর্মী। দ্রুত সঞ্চরণশীল ঘটনা-প্রবাহ অতিনাট্যিক পরিণতির পথে সহজ গতিতেই অগ্রসর হইয়াছে। সেইজন্য ইহার অতিনাট্যিক পরিকল্পনা অনেকাংশেই সার্থক হইয়াছে বলিয়া অনুভূত হইবে।

দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার শেষ জীবনে দুইখানি মাত্র সামাজিক নাটক রচনা করেন—'পরপারে' ও 'বঙ্গনারী'। ইহাদের মধ্যে তিনি 'বঙ্গনারী' অসম্পূর্ণ রাখিয়াই পরলোক গমন করেন। অতএব কেবলমাত্র 'পরপারে' নাটকখানি এখানে আলোচনা করা যাইবে। ইহার কাহিনী এই—

বিশ্বেশ্বর ধনী জমিদার, তিনি শত্রুমিত্র নির্বিচারে অকাতরে ধন দান করিয়া থাকেন। তাঁহার সংসারে একমাত্র তাঁহার পৌত্রী ব্যতীত আর কেহ

নাই—পৌত্রীর নাম সরযূ। মহিমারঞ্জনের সঙ্গে সরযূর বিবাহ হইল। মহিমের সংসারেও তাহার একমাত্র বিধবা জননী করুণাময়ী ব্যতীত আর কেহ নাই। মহিম অত্যন্ত মাতৃভক্ত, কিন্তু বিবাহের অল্পদিন পরই স্ত্রীর প্রতি একান্ত আসক্ত হইয়া পড়িয়া মাতার প্রতি কর্তব্যে অবহেলা করিতে লাগিল। দিবারাত্র পুত্রের কল্যাণ কামনা করিতে করিতে করুণাময়ী শয্যাগ্রহণ করিলেন, কিন্তু মহিমের কোন চৈতন্য হইল না, স্ত্রীকে লইয়া কলিকাতায় দাদাশ্বশুরের গৃহে বাস করিতে লাগিল। এদিকে পল্লীভবনে পুত্রের অনুপস্থিতিতে করুণাময়ীর মৃত্যু হইল। মাতার মৃত্যুর পর মহিম ক্রমে স্ত্রীকেও উপেক্ষা করিতে লাগিল; সে শান্তা নামক এক গণিকাতে আসক্ত হইল, দাদাশ্বশুরের নিকট হইতে প্রাপ্ত মাসিক অর্থ গণিকাকে গণিয়া দিতে লাগিল। স্বামীকে সৎপথে আনিবার জন্য সরযূ প্রাণপণ যত্ন করিতে লাগিল, কিন্তু তাহার বিনিময়ে তাহার নিজেরই লাঞ্ছনার একশেষ হইল; বিনা চিকিৎসায় তাহার শিশুপুত্রটি মৃত্যুমুখে পতিত হইল, নিজেও অনাহারে দিন যাপন করিতে লাগিল, পিতামহ প্রদত্ত অর্থ স্বামীর গণিকার সেবায় ব্যয়িত হইতে লাগিল। একদিন শান্তা সরযূর নিকট আসিয়া স্বামীকে অর্থ যোগাইতে নিষেধ করিল, সরযূও তাহার কথায় সম্মত হইল, অর্থ না পাইয়া মহিম স্ত্রীকে পদাঘাত করিল। সে পত্নীকে গুলি করিবার জন্য পিস্তল তুলিল; সহসা শান্তা আসিয়া তাঁহাতে বাধা দিল, গুলিতে শান্তা আহত হইল। মহিম ফেরার হইল, পুলিশ অবশেষে তাহাকে গ্রেপ্তার করিল, শান্তার মৃত্যুর জন্য তাহাকে যখন দোষী সাব্যস্ত করিয়া বিচারক দণ্ড দিবার আয়োজন করিলেন, তখন সরযূ আসিয়া হত্যার দায়িত্ব নিজের স্কন্ধে লইয়া স্বামীকে মুক্ত করিয়া দিল। অবশেষে শান্তা আবির্ভূত হইয়া সরযূকে মুক্ত করিল। কিন্তু ইতিপূর্বেই বিশ্বেশ্বর সরযূর দুঃখে উন্মাদ হইয়া গিয়াছেন, তিনি আত্মঘাতী হইলেন, সেই শোকে সরযূও মৃত্যুমুখে পতিত হইল।

'পরপারে' সামাজিক নাটক হইলেও ইহার মধ্যেও বাংলার সমাজের রসঘন পরিচয়টি প্রকাশ পায় নাই, একজন খেয়ালী বৃদ্ধ জমিদারের নির্বিচার দানশীলতার শোচনীয় পরিণাম ও এক বেশ্যা-চরিত্রের মাহাত্ম্যের কথাই ইহাতে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। ইহাতে দুই শ্রেণীর চরিত্র আছে—চরম পাপিষ্ঠ ও পরম সৎ, অর্থাৎ কতকগুলি চরিত্র যেমন পশুত্বের নিদর্শন, তেমনই অপর কতকগুলি চরিত্র দেবত্বের আদর্শ; কিন্তু এই উভয় গুণের সংমিশ্রণেই যে

মনুষ্য-চরিত্রের যথার্থ বিকাশ হইয়া থাকে, নাট্যকার তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। সেইজন্যই ইহার কোন চরিত্রের মধ্যেই রক্তমাংসের কোন সম্পর্ক অনুভব করা যায় না। মহিমের চরিত্রের ভিতর দিয়া এই একটি বিষয় প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া অনুভব করা যায় যে, পারিবারিক কর্তব্য পালনের ভিতর দিয়াই দাম্পত্য প্রেমের যথার্থ উপলব্ধি—একান্ত স্বার্থপরতার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়িলে তাহা সার্থকতা লাভ করিতে পারে না, কিন্তু রচনার ত্রুটির জন্য এই ভাবটি নাটকের মধ্যে সুপরিস্ফুট হইতে পারে নাই।

'পরপারে' সামাজিক নাটক হওয়া সত্ত্বেও ইহার উপর দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার ঐতিহাসিক নাটক রচনার আঙ্গিক ব্যবহার করিয়াছেন, তাহার ফলেই ইহা নানা রোমাঞ্চকর ঘটনায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। এই সকল ঘটনা অনেক ক্ষেত্রেই বাস্তব জীবনের সম্ভাব্যতা বহুদূর অতিক্রম করিয়া গিয়াছে।

দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্বে 'বঙ্গনারী' নামে একখানি পূর্ণাঙ্গ সামাজিক নাটক রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু জীবদ্দশায় তাহা প্রকাশিত করেন নাই—তাঁহার মৃত্যুর তিন বৎসর পর তাহা প্রকাশিত হয়। যদিও স্বদেশী আন্দোলনের পর বাংলার সমাজ-জীবনে বহু পরিবর্তন দেখা গিয়াছিল, তথাপি উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সামাজিক নাটক রচনার বিষয়-বস্তুগত সংস্কার অনুসরণ করিয়াই দ্বিজেন্দ্রলাল এই নাটকখানি রচনা করিয়াছিলেন। ইহাতে পণপ্রথা ও বাল্যবিবাহের দোষ কীর্তন করা হইয়াছে। ইহার প্রেরণা দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যরচনার প্রতিভার অনুকূল ছিল না, অর্থাৎ সমসাময়িক সমাজ ও রাষ্ট্রচেতনা হইতে প্রেরণা লাভ করিয়া দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যরচনা যেমন সার্থকতা লাভ করিত, ইহাতে তাহার অস্তিত্ব ছিল না বলিয়া ইহার রচনা শক্তিহীন—এমন কি গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটকগুলির অন্ধ অনুকরণ ব্যতীত আর কিছুই নহে। তবে ইহার কোন কোন স্থলে প্রহসন-রচয়িতা দ্বিজেন্দ্রলালের বিদ্রূপাত্মক মনোভাবের অভিব্যক্তি দেখা যায়।

চতুর্থ অধ্যায়

বিবিধ নাট্যকার

(১৯১৪—১৯৪০)

বাংলা নাট্য সাহিত্যের মধ্যযুগের ধারা বিশেষতঃ গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাট্য রচনার আদর্শ অনুসরণ করিয়া যাঁহারা ইহার আধুনিক যুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় অন্যতম। তিনিও গিরিশচন্দ্রের মত অভিনেতা রূপেই সর্বপ্রথম রঙ্গালয়ে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং ব্যবসায়ী নাট্যপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত থাকিয়া ইহারই প্রয়োজনীয়তা মিটাইবার জন্য নাটক রচনা করিয়াছেন। তাঁহার রচিত নাটক ও সমসাময়িক কালে তাহাদের জনপ্রিয়তা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, যে-যুগে নূতন আদর্শে বাংলা নাটক রচনার প্রেরণা দেখা দিয়াছিল, সেই যুগেই এই দেশের এক সুবৃহৎ সম্প্রদায় তখনও প্রাচীনতর আদর্শের প্রতি নিজেদের অনুরাগ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলিয়াছে। কিন্তু এই আদর্শের ধারাটি ইতিপূর্বেই গতিশক্তি-হীন হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়া ইহার মধ্যে যেমন কোন মৌলিক প্রতিভার বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায় না, তেমনই ইহাদের কোনও প্রভাব সুদূরপ্রসারী হইতে পারে নাই—কিছুকালের মধ্যেই এই ধারাটি একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। তাহার ফলে এই যুগে উপন্যাসের যত নাট্যরূপ দিয়া রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইতেছিল, প্রকৃত নাটক রচিত হইয়া তত অভিনীত হয় নাই।

কয়েকখানি ইংরেজি নাটকের কাহিনী অবলম্বন করিয়া বাংলা নাটক রচনার ভিতর দিয়া অপরেশচন্দ্রের নাট্যকার জীবনের সূত্রপাত হয়। কিন্তু ইহাদিগকে যথার্থ স্বাঙ্গীকরণের প্রতিভা তাঁহার ছিল না। সেইজন্য বৈদেশিক ছায়াবলম্বনে রচিত তাঁহার নাটক কয়খানির মধ্যে বৈদেশিক নাট্যসাহিত্যের রসও যেমন কিছুই আস্বাদন করিতে পারা যায় না, তেমনই জাতীয় রসাস্বাদনেরও কোন উপায় নাই। সুতরাং রচনার দিক দিয়া তাঁহার এই শ্রেণীর কয়খানি নাটকই নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। তবে ইহাদের বৈচিত্র্য বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার মত। শেরিডানের একখানি ইংরেজি নাটক অবলম্বন করিয়া অপরেশচন্দ্র তাঁহার প্রথম নাটক রচনা করেন, ইহার নাম

'রঙ্গিলা'। ইহা কৌতুক-রসাশ্রিত একখানি গীতি-নাটক। ইহার মধ্যে অমৃতলাল বসুর সামাজিক নাটক 'তরুবালা'র সুস্পষ্ট প্রভাব অনুভব করা যায়। সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজি গ্রন্থ 'Sign of the Cross' অবলম্বন করিয়া অপরেশচন্দ্র 'আহুতি' নামক একখানি রোমান্টিক নাটক রচনা করেন ; ইহার বৈদেশিক বিষয়-বস্তুর যথার্থ স্বাঙ্গীকরণের অভাবেই ইহা রসোত্তীর্ণ হইতে পারে নাই। লর্ড লিটনের 'লেডি অব্ আয়ন্‌স্' নাটকখানি অবলম্বন করিয়া অপরেশচন্দ্র 'শুভদৃষ্টি' নামক একখানি সামাজিক নাটক রচনা করেন। ইহার স্বাঙ্গীকরণের অভাব অত্যন্ত প্রত্যক্ষ ও পীড়াদায়ক।

একখানি ধর্মমূলক ঐতিহাসিক নাটক রচনা দ্বারাই অপরেশচন্দ্রের মৌলিক নাট্যকার জীবনের যথার্থ সূত্রপাত হয়—ইহার নাম 'রামানুজ'। দাক্ষিণাত্যের ধর্মাচার্য রামানুজের জীবন-বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া অপরেশচন্দ্র এই নাটকখানি রচনা করেন। এই বিষয়ে তিনি যে গিরিশচন্দ্রের প্রবর্তিত ধারাই অনুসরণ করিয়াছেন, তাহা অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায়। গিরিশচন্দ্রের বিভিন্ন চরিত-নাটকে ব্যবহৃত সংলাপের প্রতিধ্বনি ইহার মধ্যে শুনিতে পাওয়া যায়। তবে এই শ্রেণীর চরিত-নাটকের বিষয়-নির্বাচনে গিরিশচন্দ্র যে দক্ষতা দেখাইয়াছেন, অপরেশচন্দ্র এই নাটকখানির রচনায় তাহা দেখাইতে পারেন নাই। যে ভক্তিবোধ বাঙ্গালী দর্শকের হৃদয় সহজেই অধিকার করিয়া থাকে, ইহাতে তাহার আবেদন খুব সার্থক বলিয়া মনে হইবে না।

অপরেশচন্দ্রের পরবর্তী ঐতিহাসিক নাটক 'রাখী-বন্ধন'। অপরেশচন্দ্র বাংলা নাট্যসাহিত্যের মধ্যযুগের অনুসরণ করিলেও তিনি যে যুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহার প্রত্যক্ষ প্রভাবজাত ঐতিহাসিক নাটক রচনার প্রেরণাও যে তিনি অস্বীকার করিতে পারেন নাই, তাঁহার রচিত ঐতিহাসিক নাটক কয়খানিই তাহার প্রমাণ। অতএব দেখা যাইতেছে, অপরেশচন্দ্রের সাধনার মধ্যে বাংলা নাট্যসাহিত্যের মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগ উভয়েরই প্রভাব বর্তমান ছিল। তথাপি এ'কথা স্বীকার করিতেই হয় যে, মধ্যযুগের প্রভাবই তাঁহার মধ্যে সক্রিয় ছিল, আধুনিক যুগের প্রভাব তাহার মধ্যে তেমন সক্রিয় হইতে পারে নাই। বাংলা নাট্যসাহিত্যের আধুনিক যুগে রাজপুত-কাহিনী অবলম্বন করিয়া নাটক রচনার যে ধারা প্রবর্তিত হইয়াছিল, তাহাই অনুসরণ করিয়া অপরেশচন্দ্র তাঁহার 'রাখী-বন্ধন' রচনা করেন। ইহার যথার্থ কোনও ঐতিহাসিক মর্যাদা নাই—ইহা সর্বতোভাবে রোমান্টিক নাটকেরই

লক্ষণাক্রান্ত। ঘটনার গুরুভারে ইহার কাহিনীর প্রবাহ মন্থরগামী হইয়া পড়িয়াছে।

'অযোধ্যার বেগম' অপরেশচন্দ্রের একখানি সুপরিচিত ঐতিহাসিক নাটক। অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা ও বাংলার রাজ্যচ্যুত সর্বশেষ স্বাধীন নবাব মীর কাসেমের বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া ইহা রচিত। কিন্তু ইতিহাস অপেক্ষা জনশ্রুতিই ইহার অধিকতর অবলম্বন। রচনার আঙ্গিকের মধ্যে পূর্ববর্তী ও সমসাময়িক কয়েকজন নাট্যকারের প্রভাব অত্যন্ত প্রত্যক্ষ বলিয়া অনুভূত হয়।

বাংলার কবি চণ্ডীদাস ও রজকিনীর জনশ্রুতিমূলক প্রণয়-বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া অপরেশচন্দ্র একটি চরিত শ্রেণীর নাটক রচনা করিয়াছিলেন, তাহার নাম 'চণ্ডীদাস'। প্রেমের আধ্যাত্মিকতা বিশ্লেষণ ইহার প্রধান লক্ষ্য হইলেও ইহার লৌকিক আবেদনটিও অসার্থক হয় নাই। গিরিশচন্দ্র ভক্তিমূলক নাট্যরচনার যে ধারার সূত্রপাত করিয়াছিলেন, প্রধানতঃ তাহা অবলম্বন করিয়া অপরেশচন্দ্রের চরিত-নাটক কয়খানি রচিত হইলেও তাঁহার '৺গৌরাঙ্গ' নাটকে গিরিশচন্দ্র প্রবর্তিত ভক্তিভাবটি অধিকতর প্রত্যক্ষ বলিয়া অনুভূত হইতে পারিত। ইহাকে নাট্যকার 'প্রেমভক্তি ও করুণরসাত্মক' নাটক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু গৌরাঙ্গদেবের জীবনীর মধ্যে যে বাস্তব ও মানবিক অংশটুকু ছিল, নাট্যকার তাহা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার সন্ন্যাসগ্রহণের বৃত্তান্ত হইতে ইহার সূত্রপাত করিয়াছেন। তাহার ফলে ইহার যথার্থ নাটকীয় গৌরব যে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, তাহা অতি সহজেই অনুভব করা যায়। ইহা গৌরাঙ্গ-জীবনের অলৌকিক অংশ অবলম্বন করিয়াই রচিত, সেইজন্যই ইহা কোন দিক দিয়াই রসোত্তীর্ণ হইতে পারে নাই, কেবল মাত্র কাহিনীর বর্ণনাতেই পর্যবসিত হইয়াছে। এই শ্রেণীর নাটক রচনায় গিরিশচন্দ্রের যে কৌশল আয়ত্ত ছিল, অপরেশচন্দ্রের তাহা ছিল না। অতএব ইহা গিরিশচন্দ্রের অক্ষম অনুকরণেরই একটি ব্যর্থ ফল মাত্র। অপরেশচন্দ্র 'মগের মুলুক' নামক আরও একখানি ঐতিহাসিক নাটক রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু বিংশতি শতাব্দীর প্রথমার্ধে কোন কোন নাট্যকারের মধ্যে ঐতিহাসিক তথ্যনিষ্ঠার যে পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল, অপরেশচন্দ্রের মধ্যে তাহা ছিল না। বাংলা নাট্যসাহিত্যের মধ্যযুগসুলভ ঐতিহাসিক তথ্যবিষয়ক শৈথিল্য তাঁহার ঐতিহাসিক ও চরিত নাটকের বৈশিষ্ট্য ছিল।

অপরেশচন্দ্রের রোমান্টিক প্রেরণা তাঁহার ঐতিহাসিক নাটক রচনায়

নিয়োজিত হইয়াছিল বলিয়া তিনি একখানিও আনুপূর্বিক রোমান্টিক নাটক রচনা করেন নাই। তাঁহার ঐতিহাসিক নাটক মাত্রই রোমান্টিক-ধর্মী হইয়া রহিয়াছে। তবে তাঁহার একখানি মাত্র নাটককে আনুপূর্বিক রোমান্টিক বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে—তাহার নাম 'ইরাণের রাণী'। প্রেম, হিংসা, বিদ্বেষ, হত্যা, ষড়যন্ত্র, করুণা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় ইহার অবলম্বন হইলেও ইহার মূল কাহিনীর একটি নাটকীয় প্রবাহ অনুসরণ করা যায়। তবে ইহার অতি-নাটকীয় লক্ষণ অত্যন্ত প্রকট।

পৌরাণিক নাটক রচনায় অপরেশচন্দ্রের যে কতকটা কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তাঁহার সর্বপ্রথম মৌলিক পৌরাণিক নাটক 'কর্ণার্জুন'। কালিদাসের সংস্কৃত নাটক 'বিক্রমোর্বশী'র ভাব অবলম্বন করিয়া তিনি ইতিপূর্বে 'উর্বশী' নামক একখানি মাত্র নাটক রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার মধ্যে নাট্যকারের কোনও বৈশিষ্ট্য প্রকাশের সুযোগ হয় নাই; তাঁহার পরবর্তী পৌরাণিক নাটক 'কর্ণার্জুনে'র মধ্যে তাহার কতকটা পরিচয় পাওয়া যায়। মহাভারতের সর্বাপেক্ষা নাটকীয় অংশ তিনি এখানে সংক্ষিপ্ত নাটকাকারে পরিবেশন করিয়াছেন; অতএব ইহার বিষয়গত আবেদনের জন্য নাট্যকারের কোন কৃতিত্ব নাই। ইহার মধ্যে কর্ণের চরিত্রটির উপর নাট্যকার দর্শকের সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। ইহাই এই নাটকের সার্থকতার অন্যতম প্রধান কারণ। জন্ম হইতে নিধন পর্যন্ত কর্ণের জীবন দৈব-বিড়ম্বিত, নিয়তি-লাঞ্ছিত। দৈব-বিড়ম্বনার আবেদনের মধ্যে একটি সর্বজনীন সহানুভূতি অতি সহজেই সৃষ্টি হইয়া থাকে; কারণ, ইহার মধ্যে প্রত্যেকেই তাহার নিজস্ব জীবনের দৈব লাঞ্ছনায় সান্ত্বনা সন্ধান করিয়া থাকে। উদার চরিত্র ও অপরিমিত শৌর্যবীর্যের অধিকারী হইয়াও কর্ণের অনিবার্য পতনের মধ্যে নিয়তির যে ক্রূর পরিহাসের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহার মানবিক আবেদন এই নাটকখানির সার্থকতার মূল। নিয়তিবাদই এই নাটকের মুখ্য বর্ণনীয় বিষয়। তবে এই নিয়তি অশরীরিণী থাকিয়া যদি অদৃশ্যভাবে নাটকের ঘটনা নিয়ন্ত্রিত করিত, তবে ইহার ক্রিয়া অধিকতর কার্যকরী বলিয়া অনুভূত হইতে পারিত। কর্ণ ব্যতীত শকুনির চরিত্রের মধ্যেও নাট্যকার এখানে নূতন আলোকপাত করিয়াছেন। প্রতিহিংসা গ্রহণের মানবিক বৃত্তিটি তাহার মধ্য দিয়া অত্যন্ত প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে, তাহার ফলে ইহার নাটকীয় আবেদনও সার্থক হইয়াছে। এই নাটকের

কতকগুলি দৃশ্য অতি-নাটকীয় রূপ লাভ করিয়াছে, অথচ মহাভারতের মৌলিক কাহিনীরও ইহারা ব্যতিক্রম নহে। সাধারণ দর্শকের মধ্যে ইহাদের একটি সহজ আবেদন ছিল।

'কর্ণার্জুনে'র পর অপরেশচন্দ্র 'শ্রীকৃষ্ণ' নামক একখানি নাটক রচনা করেন। ইহাতে কংসবধ হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগ পর্যন্ত ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। বলাই বাহুল্য, এই সুদীর্ঘ বিবরণীর মধ্যে নাটকীয় ঘটনার সংহতি-সৃষ্টি সম্ভব হয় নাই। ইহা শ্রীকৃষ্ণের জীবন-বৃত্তান্তের একটি তালিকা মাত্র—ঘটনাগুলির মধ্যে অন্তর্নিহিত কোন যৌগিক সূত্র নাই, অতএব ইহার নাটকীয় পরিকল্পনা স্বভাবতঃই ব্যর্থ হইয়াছে, ইহার পর তিনি 'শ্রীরামচন্দ্র' নামক একখানি নাটকও রচনা করেন, ইহাও শ্রীরামচন্দ্রের জীবন-বৃত্তান্তের একটি তালিকা মাত্র। অপরেশচন্দ্রের পৌরাণিক নাট্যরচনার একটি প্রধান ত্রুটি এই যে, তিনি রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণের কাহিনীর মধ্য হইতে যথার্থ নাটকীয় ঘটনাসমূহ সন্ধান করিয়া লইতে পারেন নাই, এবং তাহার পরিবর্তে আনুপূর্বিক বৃত্তান্ত লইয়াই নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাহার ফলে তাঁহার অধিকাংশ পৌরাণিক নাটকই পৌরাণিক বিবরণীর তালিকা মাত্রেই পর্যবসিত হইয়াছে। এই বিষয়ে তাঁহার 'কর্ণার্জুন'ই একমাত্র ব্যতিক্রম। উল্লিখিত নাটকগুলি ব্যতীতও অপরেশচন্দ্র আরও কয়েকখানি পৌরাণিক নাটক রচনা করেন ; যেমন, 'পুষ্পাদিত্য', 'শকুন্তলা' প্রভৃতি। কিন্তু ইহারাও বিশেষত্ব-বর্জিত। মধ্যযুগের বাংলা মঙ্গলকাব্যের কাহিনী অবলম্বন করিয়া তিনি 'ফুল্লরা' নামক একখানি নাটক রচনা করেন। ইহার মধ্যেও তাঁহার কোনও কৃতিত্ব প্রকাশ পাইতে পারে নাই।

অপরেশচন্দ্র একখানি পূর্ণাঙ্গ সামাজিক নাটকও রচনা করিয়াছিলেন, তাহার নাম 'ছিন্নহার'। গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটক রচনার আদর্শে ইহা রচিত। ইহার মধ্যে উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর কতকগুলি সামাজিক সমস্যারও উল্লেখ আছে। ইহাতে অভিশপ্ত বাল্যপ্রণয়, স্বামী কর্তৃক স্ত্রী ত্যাগ, আত্মহত্যা, নারীর গৃহত্যাগ, নারীহরণ, বেশ্যাগৃহবাস, পুলিশ কর্তৃক অপহৃতা নারী উদ্ধার, মিথ্যা সাক্ষ্যদান, জালিয়াতি ইত্যাদি বহু রোমাঞ্চকর ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে। দৈব ও পুরুষকারের দ্বন্দ্বের মধ্যে দৈবকেই অধিকতর বলশালী প্রতিপন্ন করা এই নাটকের উদ্দেশ্য। সামাজিক নাটক রচনায় গিরিশচন্দ্রের যে সকল ত্রুটির কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, ইহার মধ্যেও

তাহাদের প্রায় সব কয়টিরই সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারা যায়। ইহাও অপরেশচন্দ্র কর্তৃক গিরিশচন্দ্রের ব্যর্থ অনুকরণের অন্যতম শোচনীয় ফল মাত্র। অপরেশচন্দ্রের ইহাতে কোনও মৌলিক প্রেরণা ছিল না, এই বিষয়ক আর কোন নাটক রচনায় তিনি প্রবৃত্তও হন নাই।

রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট থাকিবার ফলে অপরেশচন্দ্র তাঁহার নাট্য-রচনায় স্বভাবতই বিষয়গত যে বৈচিত্র্যসৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়াছিলেন, তাহার ফলেই তিনি কয়েকখানি কৌতুক- ও গীতি-নাট্য রচনা করিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে তাঁহার কৌতুক-নাট্য 'দুমুখো সাপ' ও গীতি-নাট্য 'অপ্সরা', 'সুদামা' ইত্যাদির উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিন্তু রচনার দিক দিয়া ইহারা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। কৌতুক রসের অনুভূতি একটি সহজাত মানবিক গুণ, ইহা অনুকরণ দ্বারা সার্থকতা লাভ করিতে পারে না। অপরেশচন্দ্রের জীবন-দৃষ্টি গিরিশচন্দ্রেরই কতকটা অনুরূপ ছিল, এমন কি একদিক দিয়া বিবেচনা করিতে গেলে গিরিশচন্দ্র হইতেও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সেইজন্য জীবনের রসরূপটি তাঁহার সহজ উপলব্ধির মধ্যে আসিতে পারে নাই। অতএব কেবলমাত্র সাময়িক প্রয়োজনীয়তার দাবী মিটাইতে গিয়া তিনি কয়েকখানি কৌতুকনাট্য কিংবা গীতিনাট্য রচনায় প্রবৃত্ত হইলেও তিনি তাহাদের মধ্য দিয়া কোন সার্থকতার পরিচয় দিতে পারেন নাই।

নাট্যরচনার বহিরঙ্গের দিক দিয়াও অপরেশচন্দ্রের কোনও মৌলিক কৃতিত্ব প্রকাশ পায় নাই। এই বিষয়েও তিনি প্রধানতঃ গিরিশচন্দ্রকেই অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু মৌলিক প্রেরণার মত পরানুকরণ কদাচ শক্তিশালী হইতে পারে না। সেইজন্য রচনার দিক দিয়াও অপরেশচন্দ্রের মধ্যে সর্বত্রই শৈথিল্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

বাংলা নাট্যসাহিত্যের আধুনিক যুগে ইহার মধ্যযুগের ধারা অনুসরণ করিয়া যাঁহারা নাটক রচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে যোগেশচন্দ্র চৌধুরী অন্যতম। তিনিও একাধারে নট ও নাট্যকার, ব্যবসায়ী রঙ্গমঞ্চের সঙ্গেই তাঁহার আজীবন সম্পর্ক ছিল। ব্যবসায়ী রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে সংশ্লিষ্ট থাকিবার দোষ ও গুণ উভয়েরই তিনি অধিকারী হইয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাট্যরচনার ধারাটি তিনিই আধুনিক যুগের দূরতম প্রান্ত পর্যন্ত অগ্রসর করিয়াছিলেন। বাংলাদেশের একজন আধুনিক শ্রেষ্ঠ অভিনেতার সান্নিধ্য

লাভ করিবার ফলে তাঁহার অধিকাংশ নাটকই ব্যাপক অভিনীত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল।

পৌরাণিক নাটক রচনা দ্বারাই তাঁহার নাট্যকার জীবনের সূত্রপাত হয় এবং তাঁহার প্রথম নাটকখানি উচ্চাঙ্গ অভিনয়-গুণে তাঁহার পরিচয় সর্বত্র প্রচার করিতে সহায়ক হয়। তাঁহার এই নাটকখানির নাম 'সীতা'। সীতার বনবাসের বৃত্তান্ত ইহার উপজীব্য। সীতা বিসর্জনের পর রামচরিত্রের অন্তর্বিশ্লেষণ ইহার মুখ্যস্থান অধিকার করিয়াছে এবং ইহার মধ্যে যে মানবিক গুণের বিকাশ হইয়াছে, তাহা এই নাটকখানির বিশিষ্ট আকর্ষণ। কিন্তু রচনাগুণ অপেক্ষা অভিনয়-গুণেই ইহার এই আকর্ষণের পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। ইহার চরিত্রসৃষ্টির মধ্যে বিষয়োচিত মর্যাদা কোথাও ক্ষুণ্ণ না হইলেও রাম চরিত্রের অতিরিক্ত ভাব-প্রবণতা ইহার একটি ত্রুটি বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। সীতা-চরিত্রের আনুপূর্বিক মর্যাদা রক্ষায় নাট্যকার সফলকাম হইয়াছেন বলিয়াই মনে হইবে।

যোগেশচন্দ্রের আর কোনও পৌরাণিক নাটকই 'সীতা'র মত জনপ্রিয়তা লাভ করিতে পারে নাই, এমন উচ্চাঙ্গের অভিনয়-গুণও তাঁহার আর কোনও নাটকের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইতে পারে নাই। কালানুক্রমিক বিচার করিলে 'সীতা'র পরই তাঁহার পৌরাণিক নাটক 'রাবণে'র উল্লেখ করিতে হয়। ইহা কোনদিন অভিনীত হইয়াছিল কি না, তাহা জানিতে পারা যায় নাই, সুতরাং ইহার প্রচারও নিতান্ত সীমাবদ্ধ ছিল। বিষয়বস্তুর মধ্যে ইহাতে নূতনত্ব কিছুই নাই, থাকিবার কথাও নহে; কারণ, পূর্বেই বলিয়াছি, পৌরাণিক নাটক রচনায় যোগেশচন্দ্র গিরিশচন্দ্রেরই শিষ্য ছিলেন; কিন্তু আধুনিক যুগসুলভ রোমান্টিক মনোভাবও তাঁহার উপর একেবারেই কোনও প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই, এ কথাও বলিতে পারা যায় না। দ্বিজেন্দ্রলাল ইতিপূর্বে রাম-চরিত্র হইতে সীতা-বনবাসের কলঙ্ক-স্খালন করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তাহার কথা যথাস্থানে উল্লেখ করিয়াছি; এই নাটকেও দেখিতে পাওয়া যায়, যোগেশচন্দ্র বিভীষণ চরিত্রের কলঙ্ক-স্খালন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত রাম-চরিত্রের কোন কোন অংশ তিনি নূতন ভাবে ব্যাখ্যা করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। ইহা তাঁহার সমসাময়িক রোমান্টিক মনোভাবেরই ফল বলিয়া মনে করিতে হয়। কৃত্তিবাসী রামায়ণ অনুসারে তিনি রাবণকে পরিণামে এইভাবে

রামভক্তে পরিণত করিয়া বাঙ্গালীর জাতীয় রসচৈতন্যের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন—

> মোক্ষ নাহি চাহি রাম।
> আমার প্রার্থনা—
> সীতারাম নাম গান, গাহি রসনায়,
> চক্ষে হেরি রাম-সীতা যুগল মিলন,
> কর্ণে শুনি সীতারাম প্রণব ঝংকার।

গিরিশচন্দ্র ভক্তিমূলক চরিত-নাটক রচনার যে ধারা প্রবর্তন করিয়াছিলেন, তাহাই অনুসরণ করিয়া যোগেশচন্দ্র 'শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া' নামক নাটক রচনা করেন। বিষ্ণুপ্রিয়া-চরিত্রের প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্য নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, অতএব প্রচলিত জনশ্রুতি ও কল্পনাই ইহার প্রধান অবলম্বন হইয়াছে। সুতরাং ইহা রোমান্টিক নাটকের লক্ষণাক্রান্ত। তবে গৌরাঙ্গের জীবনীই ইহাতে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে বলিয়া ইহার রোমান্টিক লক্ষণ তত প্রকট বলিয়া অনুভূত হয় না।

যোগেশচন্দ্রের সুপরিচিত ঐতিহাসিক নাটক 'দিগ্বিজয়ী' নাদির শাহের দিগ্বিজয়ের বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া রচিত। দিল্লী নগরীর অবাধ নরহত্যা ও গৃহদাহের বৃত্তান্ত ইহার প্রধান উপজীব্য। নাট্যকার ইহাতে নাদির শাহ চরিত্রের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই ব্যাখ্যা তাঁহার এই বিষয়ক স্বকীয় অনুভূতির ফল। অতএব এই অংশে নাটকের বস্তুধর্ম বিনষ্ট হইয়া ইহা রোমান্টিক লক্ষণাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে। একজন সমালোচক এই নাটকের নাদির চরিত্র হইতে এই প্রকার তত্ত্বোদ্ধার করিয়াছেন—'নাদির শক্তির পূজারী এবং নিজ বুদ্ধি ও মস্তিষ্কের উপর পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন, বীর বলিয়া বীরত্বের তিনি উপাসক, অতিমাত্রায় দাম্ভিক, অভিজাত ও অনভিজাতের মধ্যগত দ্বন্দ্ব তিনি মিটাইতে চান, সাম্যবাদ তাঁহার কাম্য। নাদিরের বিদ্যা নাই, কিন্তু বুদ্ধিতে তিনি সতেজ। গুপ্তহত্যা, ষড়যন্ত্র, এককালীন রোধকল্পে ক্রোধান্ধ নাদির শাহ দিল্লী নগরীতে অবাধ নরহত্যা ও গৃহদাহের আদেশ দিয়াছিলেন। তাঁহার এইরূপ শাস্তি-দানের তাৎপর্য এই যে যদি কেহ শাস্তি দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া তাহার প্রতিবিধানে মাথা তুলিতে পারে, তাহাই তাহার মানবোচিত ধর্ম হইবে।...নিশ্চেষ্টতা বা আবেদন-নিবেদন দ্বারা দেশরক্ষা হয় না, শক্তিমত্তাই ও তৎপ্রসূত অত্যাচারেই দেশবাসীকে বাঁচাইয়া রাখে।' ইংরেজের দাসত্ব-শৃঙ্খল হইতে মুক্তিসংগ্রামের দিন

ইংরেজের অত্যাচারকে এই তত্ত্বের আলোকেই সে'দিন প্রত্যক্ষ করা হইয়াছিল বলিয়া এই নাটকের একটি যুগোচিত আবেদন প্রকাশ পাইয়াছে। এই দিক দিয়া বিচার করিলে ইহাকে বাংলা নাট্যসাহিত্যের আধুনিক যুগের অন্যান্য ঐতিহাসিক নাটকের সমধর্মী বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে। অতএব পৌরাণিক নাটক রচনায় যোগেশচন্দ্র ইহার মধ্যযুগের ধারা কতকটা অনুসরণ করিলেও ঐতিহাসিক নাটকখানির রচনায় তিনি যে যুগ-প্রভাব স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

যোগেশচন্দ্র একাধিক সামাজিক নাটক রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার 'পূর্ণিমা-মিলন' নামক রঙ্গনাট্য ফরাসী নাট্যকার মলেয়ারের *School for Husbands* নামক প্রহসনের অনুকরণে রচিত। কাহিনীর একটি বাঙ্গালীরূপ সৃষ্টি করিতে যোগেশচন্দ্রের চেষ্টা ব্যর্থ হয় নাই। তাঁহার প্রথম সামাজিক নাটক 'নন্দরাণীর সংসার' একখানি উপন্যাসের নাট্যরূপ মাত্র। ইহার মধ্যে এতদ্দেশীয় প্রাচীন সামাজিক আদর্শের সঙ্গে আধুনিক পাশ্চাত্ত্য ভাবাপন্ন সমাজের মিলনের ব্যর্থ প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায়। উপন্যাসের বিষয় নাটকে রূপান্তরিত করিলে ইহার যে সকল ত্রুটি অপরিহার্য, ইহাতেও তাহাই দেখা দিয়াছে। নাটকীয় দ্বন্দ্ব বলিতে যাহা বুঝায়, ইহার মধ্যে তাহা নাই। বাঙ্গালীর গার্হস্থ্য জীবন অবলম্বন করিয়া যোগেশচন্দ্র 'মহামায়ার চর' নামক একখানি নাটক রচনা করেন। একখানি ইংরেজি নাটক হইতে ইহার মৌলিক প্রেরণা গৃহীত হইলেও নাট্যকার তাহা স্বাঙ্গীকরণের প্রয়াস পাইয়াছেন। অলৌকিকতা, লৌকিকতা, রূপক ও বাস্তবের সংমিশ্রণে ইহা রচিত। ইহার মধ্যে তত্ত্বনির্দেশের প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায়। নাটক হিসাবে ইহার কোনও মূল্য নাই। ইহার দেহতত্ত্ব বিষয়ক সঙ্গীত, প্রেত ও পরলোক তত্ত্ব ইহাকে অনাবশ্যক ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে। এক রোমাঞ্চকর ঘটনা অবলম্বন করিয়া যোগেশচন্দ্রের 'মাকড়সার জাল' নাটকটি রচিত হয়। ইহা কিছুকাল কলিকাতার সাধারণ রঙ্গমঞ্চে কৃতিত্বের সঙ্গে অভিনীত হইয়াছিল।

যোগেশচন্দ্রের আর একখানি সামাজিক নাটক 'পরিণীতা'। 'তরুণের আত্ম-প্রতিষ্ঠা' এই নাটকের লক্ষ্য বলিয়া নাট্যকার ইহাতে উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার মধ্য দিয়া আধুনিক সমাজ ও নাগরিক জীবন সম্পর্কে নাট্যকারের বিশিষ্ট মতবাদ প্রকাশ পাইয়াছে। অতএব অতি-আধুনিক যুগের বাংলা

নাটকের মত ইহার মধ্যে নাট্যকারের রোমান্টিক প্রেরণা অত্যন্ত প্রবল। মধ্যযুগের বাংলা সামাজিক নাটকের সঙ্গে ইহার সুস্পষ্ট পার্থক্য অতি সহজেই অনুভূত হয়। অতএব মধ্যযুগের ধারা অবলম্বন করিয়া যোগেশচন্দ্রের নাট্য-সাধনার সূত্রপাত হইলেও তাহা আধুনিক যুগের ভাবধারার মধ্যে আসিয়াই সমাপ্তি লাভ করিয়াছে। যোগেশচন্দ্রের সর্বশেষ নাট্য রচনা 'কঙ্কাল'। ইহা ১৯৫০ সনে প্রকাশিত হয়। ইহা কোথাও অভিনীত হইয়াছিল বলিয়া জানিতে পারা যায় নাই। যোগেশচন্দ্র বিভিন্ন ঔপন্যাসিক রচিত কতকগুলি উপন্যাসের সার্থক নাট্যরূপ দিয়াছিলেন; তাহাদের মধ্যে 'মহানিশা' 'বাংলার মেয়ে' 'পতিব্রতা' 'পথের সাথী' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

এই যুগে আর যে সকল নাট্যকার আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে আর বিশেষ কেহ রঙ্গালয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন না, তাঁহাদের রচিত নাটকের সংখ্যাও নিতান্ত নগণ্য। ইহাদের মধ্যে কেবলমাত্র নিশিকান্ত বসু রায় কয়েকখানি জনপ্রিয় নাটক রচনা করিয়াছিলেন। বাংলায় বর্গী আক্রমণের ঐতিহাসিক বিষয়-বস্তু অবলম্বন করিয়া তিনি 'বঙ্গে বর্গী' নাটক রচনা করেন। মধ্যযুগের একটি নাটকের বিষয়-বস্তু অবলম্বন করিয়া তিনি 'দেবলা দেবী' নামক একখানি ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেন। তিনি 'পথের শেষে' নামক একখানি সামাজিক নাটকও রচনা করেন। সব কয়খানি নাটকের মধ্যেই দ্বিজেন্দ্রলালের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট।

মনোমোহন রায় রচিত 'রিজিয়া' নামক ঐতিহাসিক নাটকখানিও সমসাময়িক কালে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল। কিন্তু ইহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিক সার্থকতা কিছুমাত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। এই যুগে আর যে সকল নাট্যকারের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাঁহাদের অধিকাংশই দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকের ধারাই অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন, কিন্তু এই অনুকরণ দ্বারা কেহই মৌলিক কোনও কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। এই যুগেই অতি-আধুনিক বাংলা নাটকের একটি স্বতন্ত্র ধারা স্বকীয় রস ও রূপ লাভ করিয়া গড়িয়া উঠিতেছিল। তাহার বিষয় স্বতন্ত্র আলোচনার যোগ্য।

উপন্যাসকে নাটকে রূপান্তরিত করিয়া অনেক সময় বাংলা সাহিত্যে নাটকের অভাব পূর্ণ করিবার প্রয়াস পাইতে দেখা যায়। যদি সেই প্রয়াস কেবলমাত্র রঙ্গমঞ্চের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, অর্থাৎ কেবল অভিনয়ের

উদ্দেশ্রেই কিছু কিছু উপন্যাস নাট্যান্তরিত করা হয়, তাহা হইলে বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতাদের সে দিকে দৃষ্টি না দিলেও চলিতে পারে ; কারণ, নাটকের কোনও গুণই নাই, এমন কত নাটকই ত বাংলার রঙ্গমঞ্চে দিনের পর দিন অভিনীত হইয়া সাধারণের মধ্যে প্রচুর আনন্দ বিতরণ করিতেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রায় সকল উপন্যাসকেই নাট্যরূপ দেওয়া হইয়াছে এবং তাহা পুরাপুরি ব্যর্থ হইয়াছে, এমন কথা বলা যাইতে পারে না ; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্রের কোন উপন্যাসের নাট্যরূপ স্বতন্ত্র নাটক হিসাবে প্রচার লাভ করে নাই। অথচ একথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, বঙ্কিমের প্রত্যেকটি উপন্যাসেরই স্বাধীন নাটকীয় গুণ আছে। সাহিত্য-স্রষ্টা যে রূপের ভিতর দিয়া তাঁহার রসবস্তু পরিবেশন করিবার প্রেরণা অনুভব করেন, সেই রূপের ভিতর দিয়াই তাহার বিকাশ সব চাইতে সার্থক হইয়া থাকে। বঙ্কিমের উপন্যাসের মধ্যে নাটকীয় গুণ যাহাই থাক না কেন, বঙ্কিম উপন্যাসই রচনা করিয়াছেন, একখানিও নাটক রচনা করেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যের বিপুল জনপ্রিয়তার জন্য তাঁহার উপন্যাসগুলি নাটকরূপে পরিবেশন করিবার একটা ব্যবসায়িক (professional) প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছিল। কিন্তু এই নিতান্ত ব্যবসায়িক প্রয়োজনীয়তা যদি সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তাহার দাবী জানাইতে আসিত, তবে সেই দাবী স্বীকৃত হইত না। বঙ্কিমের উপন্যাসগুলি নাটকান্তরিত হইয়া রঙ্গমঞ্চের ব্যবসায়িক ক্ষেত্রের বাহিরে কোনদিন নিজের দাবী প্রতিষ্ঠা করিতে আসে নাই। সেইজন্য বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস উপন্যাসই, ইহার কোন নাট্যরূপ লইয়া সাহিত্যে কোন দিন কোন আলোচনা করিবার প্রয়োজন হয় নাই।

অনুরূপ ব্যবসায়িক প্রেরণাতেই শরৎচন্দ্রের কয়েকখানি উপন্যাস নাটকে পরিবর্তিত করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। বঙ্কিমের উপন্যাসগুলি যখন নাট্যাকারে পরিবর্তিত হয়, তখন বঙ্কিম জীবিত ছিলেন না ; অতএব এই নাট্যীকরণের মূলে বঙ্কিমের স্বীকৃতির কোনও কথাই আসিতে পারে না। মঞ্চাধ্যক্ষগণ নিজেদের দিক হইতে নিজেদের অভিনেতা অভিনেত্রীর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই নাট্যীকরণ করিয়াছেন, তাহা পাণ্ডুলিপি আকারেই অধিকাংশ সময় রক্ষিত হইত, কখনও মঞ্চ-সংশ্লিষ্ট সমাজের বাহিরে সাহিত্যের আম-দরবারে প্রচার লাভ করিতে পারিত না। কিন্তু শরৎচন্দ্রের ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রম হইয়াছে। শরৎচন্দ্রের জীবিত অবস্থাতেই তাঁহার তিন খানি

উপন্যাস নাট্যরূপ লাভ করিয়া এক একটি নাম লইয়া প্রচার লাভ করিয়াছে। তাঁহার উপন্যাস 'পল্লীসমাজ'—'রমা', 'দত্তা'—'বিজয়া, ও 'দেনা-পাওনা'—'ষোড়শী' নাটকে রূপ লাভ করিয়াছে। ইহারা স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়া শরৎচন্দ্রের নামেই প্রচারিত হইয়াছে। অতএব ইহাদের নাট্যরূপ যে রঙ্গমঞ্চের অভিনয় ব্যবস্থার উপর লক্ষ্য রাখিয়া যিনিই দিয়া থাকুন না কেন, নাটক হিসাবে ইহাদের সার্থকতা কিংবা ব্যর্থতার সকল দায়িত্ব শরৎচন্দ্রের নিজেরই। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার একাধিক উপন্যাস নাটকে রূপান্তরিত করিয়াছেন, একই নাটকের বারবার রূপ পরিবর্তন করিয়াছেন এবং সেই বিভিন্ন রূপ বিভিন্ন পুস্তকাকারেও প্রচারিত হইয়াছে। কিন্তু এই কাজ রবীন্দ্রনাথ নিজেই করিয়াছেন—এই বিষয়ে কোনও বিশেষ মঞ্চব্যবস্থা যে তাঁহার লক্ষ্য ছিল, সে কথা বলিতে পারা যায় না। তাঁহার নিজের উপন্যাসকে নাটকে রূপান্তরিত করিবার কাজ রবীন্দ্রনাথ কোন যান্ত্রিক নিয়মে করিয়া যান নাই—সেখানে তাঁহার স্বাধীন রসবোধ তাঁহার জীবনের নব নব পর্যায়ে যে নূতন নূতন প্রেরণার সন্ধান দিয়াছে, তাহাদেরই রসস্বীকৃতি জানাইয়াছেন মাত্র। সেইজন্য অনেক সময় রবীন্দ্রনাথের মূল উপন্যাস ও তাঁহার স্বকৃত নাট্যরূপের মধ্যে কোনও ঐক্য রক্ষা পায় নাই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের স্বকৃত নাটকীকরণ যে সব সময় সার্থক হইয়াছে, সে কথা বলা যায় না। তবে এই বিষয় আমাদের এখানে আলোচ্য নয়। শরৎচন্দ্রের যে কয়খানি উপন্যাসের নাট্যরূপ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাদের কথাই আমাদের আলোচনার বিষয়।

এই কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, উপন্যাস উপন্যাস, নাটক নাটক—একটা কখনও আর একটার রূপে যথার্থ পরিবর্তিত হইতে পারে না। কেহ নাটককে যেমন উপন্যাসে রূপান্তরিত করিবার কথা কল্পনাও করিতে পারেন না, তেমনি উপন্যাসও কোন দিনই যথার্থ নাটকে রূপান্তরিত হইতে পারে না। অনেকে মনে করেন, সেক্সপীয়রের 'হ্যামলেট' নাটকখানি উপন্যাসাকারে রচিত হইলে ভালো হইত—নাটকের ভিতর দিয়া ইহার রস যথার্থ প্রকাশ পাইতে পারে নাই। কিন্তু সেক্সপীয়র কখনও 'হ্যাম্‌লেট' নাটকের বিষয় যথার্থ উপন্যাসের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিতে পারিতেন না, কারণ, ঔপন্যাসিকের জীবন-বিশ্লেষণের ভঙ্গি স্বতন্ত্র। যদি তাহাই সত্য হয়, তবে এই কথাও স্বীকার করিতে হইবে যে, যথার্থ ঔপন্যাসিক কখনও সার্থক নাট্যকার হইতে পারেন না। উপন্যাস ও নাটকের মধ্যে একটা প্রধান পার্থক্য এই যে, উপন্যাসের

জীবন বিশ্লেষণাত্মক এবং নাটকের জীবন প্রত্যক্ষ ঘটনাত্মক। বহির্ঘটনা যথাযথ সংযত করিয়া ঔপন্যাসিকের দৃষ্টি অন্তর্মুখী হইয়া পড়ে। নাট্য-রচনায় অন্তর্মুখী বিশ্লেষণের অবকাশ থাকে না। ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'চন্দ্রশেখরে' শৈবলিনীকে নিজেই 'পাপীয়সী' বলিবার অধিকার ভোগ করেন, কিন্তু নাটকে নাট্যকারের সে অধিকার থাকে না—সেখানে কেবল মাত্র নাট্যিক ক্রিয়া দ্বারা শৈবলিনীর আচরণ প্রকাশ করিতে হইবে এবং তাহার ভিতর হইতে পাঠককে শৈবলিনীর চরিত্র সম্পর্কে অভিমত সৃষ্টি করিতে হইবে। বঙ্কিমের ব্যক্তিগত নীতিবোধ এমন প্রখর ছিল যে, তাহা দিয়া তিনি তাঁহার পরিকল্পিত চিত্রগুলির নৈতিক আচরণ সম্পর্কে ব্যক্তিগত মতবাদ প্রকাশ করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিতেন না। এই দিক দিয়া উপন্যাস বস্তুধর্মী হইয়াও আত্মভাব-পরায়ণ সৃষ্টি। কিন্তু নাটক একান্ত বস্তুধর্মী সৃষ্টি, সেইজন্য সজাগ আত্মসচেতনতা লইয়া নাট্যরচনায় কেহ সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। বাংলা সাহিত্যে পাশ্চাত্ত্য আদর্শে রচিত নাটক যথার্থ সার্থকতা লাভ করিতে পারে নাই, তাহার কারণ, আত্মসচেতনতা বাঙ্গালী চরিত্রের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। শরৎ-সাহিত্যের ভিতর দিয়াও শরৎচন্দ্রের এই আত্মসচেতনার গুণটি স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। অতএব তাঁহার এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য লইয়া তিনি যে নাট্যরচনায় যথার্থ সার্থকতা লাভ করিতে পারেন না, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। উপন্যাস হিসাবে শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজ', 'দত্তা' ও 'দেনাপাওনা' যে প্রথম শ্রেণীর সার্থকতা লাভ করিয়াছে, সে বিষয়ে কেহ সন্দেহ প্রকাশ করিতে পারিবেন না। কিন্তু ইহাদের নাট্যরূপের মধ্য দিয়া এই উচ্চ সাহিত্যিক মর্যাদা কতদূর অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, তাহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার প্রয়োজন। যদি দেখা যায় যে, ইহারা এই উচ্চ মর্যাদা হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে, তবে শরৎচন্দ্রের এই প্রয়াস অর্থাৎ ব্যবসায়িক দাবী মিটাইবার জন্য তাঁহার এই তিনখানি প্রথম শ্রেণীর রচনাকে রূপান্তরিত করা বাংলা সাহিত্যের দিক হইতে অভিনন্দিত করা যায় না। কারণ, ইহাতে এই নাটকগুলির কেবলমাত্র অভিনয় দেখার ভিতর দিয়া শরৎ-প্রতিভা সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইবার আশঙ্কা আছে। একথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, 'পল্লীসমাজে'র রস পুরাপুরি 'রমা'র ভিতর দিয়া বিকাশ লাভ করিতে পারে নাই; এক জায়গায় বাংলার বিস্তৃত পল্লীর সমাজ লেখকের লক্ষ্য, আর এক জায়গায় কেবলমাত্র একটি চরিত্রের

উপর লেখকের দৃষ্টি স্তম্ভ হইয়াছে। অথচ সেই যে একটিমাত্র চরিত্র তাহাও সমগ্র পল্লীসমাজের ভিতর হইতে সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে বিকাশ লাভ করিয়া উঠে নাই। এক জায়গায় সমাজ-জীবনের বাস্তব রূপায়ণ লক্ষ্য, আর এক জায়গায় ব্যক্তি-জীবনের সুখদুঃখানুভূতিই লক্ষ্য হইয়াছে; অতএব এই দুইয়ের ভিতর দিয়া একই রস কি ভাবে পরিবেশন করা সম্ভব হইতে পারে? 'দেনা-পাওনা' উপন্যাসের সঙ্গে তাহার নাট্যরূপ 'ষোড়শী'র পার্থক্য আরও গুরুতর। কারণ, 'দেনা-পাওনা' মিলনাত্মক, কিন্তু 'ষোড়শী' বিয়োগাত্মক। অতএব ইহাদের ভিতর দিয়া অভিন্ন রসের অভিব্যক্তি কিছুতেই সম্ভব হইতে পারে না। অতএব উপন্যাসের নাট্যরূপ কথাটাই ভুল হইয়া দাঁড়ায়; প্রকৃতপক্ষে একটা আর একটার পরিবর্তিত রূপ না হইয়া, প্রত্যেকটাই এক একটা স্বাধীন সৃষ্টি হইয়া দাঁড়ায়। অতএব উপন্যাস কখনও নাট্যরূপ লাভ করিতে পারে না—উপন্যাস উপন্যাসই থাকে, তাহার ছায়াতলে নাটকের রূপে যাহা আত্মপ্রকাশ করে, তাহা একটা স্বতন্ত্র রসবস্তু। পরিবর্তিত রূপকে মৌলিক রূপের সঙ্গে তুলনা করিলে পরিবর্তিত রূপ যে মৌলিকের তুলনায় শক্তিহীন হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। এইজন্য উপন্যাসের নাট্যরূপ মাত্রই মূল উপন্যাসের তুলনায় শক্তিহীন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর কোনও লেখকের যদি কোন অপেক্ষাকৃত অপরিচিত উপন্যাস নাট্যরূপ লাভ করিয়া রঙ্গমঞ্চের ভিতর দিয়া জন-সাধারণের মধ্যে প্রচার লাভ করে, তবে এ বিষয়ে কিছুই বলিবার থাকে না; কারণ, তাহাতে সাহিত্যের একটা কিছু গুরুতর ক্ষতির কারণ হয় না। কিন্তু শরৎচন্দ্রের মত কোনও শক্তিশালী লেখকের কোনও প্রথম শ্রেণীর উপন্যাস কেবলমাত্র সাময়িক তাগিদের জন্য যদি তাহার মৌলিক রূপ বিসর্জন দিয়া নূতন পরিচয় লাভ করিবার প্রয়াস পায়, তবে সেই সম্পর্কে সাহিত্য সমালোচকদের একেবারে উদাসীন থাকিলেও চলে না। কারণ, প্রথম শ্রেণীর প্রত্যেক সৃষ্টিরই মৌলিক পরিচয়টি রক্ষা করিবার প্রয়োজন আছে; 'পল্লীসমাজ', 'দত্তা' কিংবা 'দেনা-পাওনা'র মত উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে খুব বেশী যে সৃষ্টি হইবে, তাহাও নহে। অতএব যাহা হইয়াছে, তাহার উপর কোন দিক হইতেই কোন আঘাত না লাগে, তাহা লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। শরৎচন্দ্রের উক্ত তিনখানি উপন্যাসের নাট্যরূপ ইহাদের মূল উপন্যাসের মর্যাদা রক্ষা করিতে কতদূর সক্ষম হইয়াছে, তাহা এখন আলোচনা করিয়া দেখিতে হয়।

প্রথমতঃ 'পল্লীসমাজে'র কথাই ধরা যাক্। 'পল্লীসমাজে'র বিষয় যে একটা নাটকের উপজীব্য হইতে পারে না, তাহা সহজেই অনুভব করা যায়। 'পল্লীসমাজে'র মধ্যে বাংলার পল্লীজীবনের বিভিন্ন কতকগুলি বাস্তব চিত্রের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়, এই চিত্রগুলির ভিতর দিয়া পরস্পর যে যোগসূত্র রহিয়াছে, তাহা নিতান্ত শিথিল। কিন্তু নাটকীয় কাহিনী কদাচ শিথিল-বদ্ধ হইতে পারে না; দৃশ্যের পর দৃশ্যের ভিতর দিয়া কাহিনী যে-ভাবে অগ্রসর হইয়া যায়, তাহাতে এতটুকুও ফাঁক পড়িবার অবকাশ থাকে না—তাহাতেই কাহিনী দৃঢ়-সংবদ্ধ হইয়া উঠে। কিন্তু পল্লীজীবনের বিস্তৃত পরিবেশ সৃষ্টি করিবার জন্য যে বিভিন্নমুখী জীবন-চিত্রগুলি 'পল্লীসমাজে'র ভিতর দিয়া পরিবেশন করা হইয়াছে, তাহারা একযোগে একই লক্ষ্যমুখে অগ্রসর হইয়া গিয়াছে, এ'কথা বলিতে পারা যায় না। ইহার মধ্যে রমা, রমেশ ও জ্যেঠাইমার যে পরিচয় আছে, তাহা বহুবিচিত্র পল্লীজীবনের বাস্তব পরিবেশের যথার্থ অন্তর্নিবিষ্ট হইতে না পারিলেও, কাহিনীর বিস্তৃতির জন্য ততটা প্রাধান্য লাভ করিয়া উঠিতে পারে নাই। কিন্তু 'রমা' নাটক 'পল্লীসমাজ' অপেক্ষা সংক্ষিপ্ততর রচনা—নাটক সর্বদাই উপন্যাস হইতে আয়তনের দিক দিয়া সংক্ষিপ্ত হইতে বাধ্য। এই সংক্ষিপ্ততার জন্য পল্লীজীবনের যে বিস্তৃত পরিবেশের উপর এই উপন্যাসের যথার্থ রসসৃষ্টি হইয়াছে, তাহা যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে বলিয়াই অনুভূত হইবে। ব্যক্তিজীবনের অন্তর্বিশ্লেষণের উপর 'পল্লীসমাজে'র সার্থকতা নহে, বরং বিচিত্র জীবনের বাস্তব রূপায়ণেই ইহার সার্থকতা। বৈচিত্র্যের পরিবর্তে ব্যক্তির পরিচয়ে 'রমা' নাটক সীমায়িত হইয়াছে। সেইজন্য ইহার ভিতর 'পল্লীসমাজে'র জীবন-রস নাই, বরং তাহার পরিবর্তে আত্মসচেতন নাট্যকারের আদর্শবোধ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। 'রমা' নাটকের কাহিনী পড়িলে বুঝিতে পারা যায় যে, 'পল্লীসমাজে'র কতকগুলি চিত্র ইহার মধ্য দিয়াও পরিবেশন করিবার আকাঙ্ক্ষা নাট্যকারের ছিল—কিন্তু চিত্রগুলি 'রমা' নাটকের মধ্যে একান্তই অপরিহার্য কি না, সে বিষয়ে নাট্যকার গভীরভাবে বিচার করিয়া দেখেন নাই। তাহার ফলে এই সকল চিত্র নাট্যকাহিনীর মধ্যে সহজ সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া উঠিতে পারে নাই—মূল কাহিনীর মধ্যে কেমন যেন অসংলগ্ন হইয়া আছে। অতএব 'রমা' নাটকের ভিতর দিয়া যে কেহ 'পল্লীসমাজে'র রসোপলব্ধি করিতে পারিবে না, তাহা নিশ্চিত।

'দত্তা' উপন্যাসে বাহিরের সমাজ-চিত্র অপেক্ষা ব্যক্তি-চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্বের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। বাহ্যঘটনার অবকাশ ইহাতে অল্প, কেবল-মাত্র চরিত্রগুলির মানসিক দ্বন্দ্বসংঘাতের ভিতর দিয়া ইহার কাহিনী অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। উপন্যাসের অন্তর্বিশ্লেষণের ভিতর দিয়া এই মানসিক দ্বন্দ্বসংঘাতের পরিচয় উচ্চাঙ্গের সার্থকতা লাভ করিয়াছে। বাহ্যিক ঘটনার দৈন্য থাকিলেই যে সার্থক নাটক রচিত হইতে পারিবে না, তাহা নহে—কিন্তু নাটকে কাহিনীকে সূচনা হইতে চরম পরিণতি পর্যন্ত একটি সুস্পষ্ট ধারায় অগ্রসর হইতে হয়। নাটকের ঔৎসুক্য রক্ষা করিবার জন্য যে বিষয় নাটকের পরিণতিতে সংঘটিত হওয়া প্রয়োজন, উপন্যাসের কাহিনী অনুসরণ করিবার জন্য তাহা যদি পুর্বেই সংঘটিত করা হয়, তাহা হইলে নাটকের কাহিনী আর অগ্রসর করিয়া লইয়া যাইতে পারা যায় না, সেখানেই তাহার যবনিকাপাত করিতে হয়। 'বিজয়া' নাটকের শেষাংশ অনুসরণ করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, কেবল মাত্র নাটকের নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য এখানে নিতান্ত কৃত্রিম উপায়ে রক্ষা করা হইয়াছে, ইহার ঔৎসুক্যের দিকটা পুর্ববর্তী ঘটনা দ্বারা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। উপন্যাসের ভিতর এই ত্রুটি তত গুরুতর বলিয়া মনে হয় না; কারণ, উপন্যাসে অন্তর্বিশ্লেষণের যে অবকাশ পাওয়া যায়, তাহা দিয়া কাহিনীর এই শূন্যতা ভরিয়া দেওয়া যায়। সুতরাং 'দত্তা' উপন্যাস হিসাবে যত সার্থকতাই লাভ করুক, ইহার কাহিনীর মধ্যে যে নাটকীয় গুণ নাই, সে কথা স্বীকার করিতেই হয়। অতএব 'দত্তা' উপন্যাসের নাট্যরূপ দেওয়ার প্রেরণা ইহার কাহিনীর দিক হইতে আসে নাই, বরং ইহার জনপ্রিয়তার দিক হইতে আসিয়াছে। 'দত্তা'র কাহিনী-নিরপেক্ষ স্বাধীন নাট্যরচনা হিসাবেও যদি 'বিজয়া' সার্থকতা লাভ করিতে পারিত, তাহা হইলেও এই বিষয়ে বলিবার কিছুই ছিল না। কিন্তু 'বিজয়া'য় 'দত্তা'র গৌরবও রক্ষা পায় নাই, স্বাধীন নাটক হিসাবেও কোনও সার্থকতা লাভ করিতে পারে নাই—সেই জন্যই ইহার নাট্যরূপের পরিকল্পনা মঞ্চব্যবসায়ীদের পক্ষে যতই লাভজনক হোক না কেন, সাহিত্যের দিক হইতে অর্থহীন বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে।

'দেনা-পাওনা' শরৎ-সাহিত্যের একটি প্রধান গৌরব। উপন্যাস হিসাবে ইহা অবিসংবাদিতভাবে প্রথম শ্রেণীর সার্থকতা লাভ করিয়াছে। ইহার নাট্যরূপ যদি এই মর্যাদা হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকে, তবে উপন্যাস হিসাবে পাঠ করিয়া ইহা হইতে যে তৃপ্তির আস্বাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহার উপর

স্বভাবতঃই আঘাত লাগিতে পারে। অতএব এই প্রকার প্রথম শ্রেণীর উপন্যাসের নাট্যরূপ দেওয়ার একটি কঠিন দায়িত্ব আছে। সে দায়িত্ব 'ষোড়শী' সম্পর্কে কতদূর পালন করা হইয়াছে, তাহা আলোচনা করিয়া দেখা যাইতে পারে।

'দেনা-পাওনা'ও 'দত্তা'র মত অন্তর্বিশ্লেষণমূলক উপন্যাস, তবে বাহিরের ঘটনায় যে ইহার খুব বেশী দৈন্য আছে, তাহাও নহে। ষোড়শীর অন্তর্দ্বন্দ্ব এই উপন্যাসের প্রধান বিষয়, জীবানন্দের আঘাতে ষোড়শীর সুপ্ত নারীত্বের জাগরণই ইহার প্রধান বক্তব্য। বাহ্যসংস্কার দ্বারা আড়ষ্ট নারীত্বের জাগরণের যে সূক্ষ্ম পরিচয় এই উপন্যাসের ভিতর পাওয়া যায়, তাহা নাটকীয় ঘটনা দ্বারা বাহিরে সার্থকভাবে প্রকাশ করা দুরূহ। উপন্যাস বিশ্লেষণধর্মী, সূক্ষ্ম অন্তর্দ্বন্দ্বের বর্ণনায় 'দেনা-পাওনা' উপন্যাস তিনশত পৃষ্ঠারও অধিক আকার লাভ করিয়াছে। তাহার পরিবর্তে 'ষোড়শী' নাটক দেড়শত পৃষ্ঠারও কমের মধ্যে শেষ হইয়াছে। অবশ্য একথা সত্য, অতিভাষণ শরৎ-সাহিত্যের একটি প্রধান ত্রুটি। বঙ্কিমচন্দ্রের মিতভাষণের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের অতিভাষণের তুলনা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, যে-কথা বঙ্কিমচন্দ্র ইঙ্গিত মাত্রেই শেষ করেন, শরৎচন্দ্র সেখানে তাহা দীর্ঘায়িত করিয়া লন, সূক্ষ্মবিশ্লেষণ ও ভাষার রসাবেদনের গুণে শরৎচন্দ্রের অতিভাষণ উপন্যাসের মধ্যে বিরক্তিকর হইয়া উঠে না। নাটকে অতিভাষণের একেবারেই স্থান নাই। কিন্তু অন্তর্বিশ্লেষণ-জাত অতিভাষণই যে-উপন্যাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য, তাহাকে এই বৈশিষ্ট্যবর্জিত করিয়া নাটকের ভিতর উপস্থিত করিলে তাহার মৌলিক আবেদনই বিনষ্ট হয়। তিন শত পৃষ্ঠার সার্থক উপন্যাস যে দেড়শত পৃষ্ঠার নাটকে পরিবর্তিত করিতে গেলে ইহার মৌলিক পরিচয় ইহার মধ্যে আর থাকে না, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু তবু একথা স্বীকার করিতে হইবে, 'দেনা-পাওনা'র রস 'ষোড়শী'তে না থাকিলেও স্বাধীন নাটক হিসাবে ইহার একটা স্থান আছে। কারণ, ইহার কাহিনী নাটকীয় গতিতে অগ্রসর হইয়া একটা চরম পরিণতিতে গিয়া পৌঁছিয়াছে এবং যেখানে ইহার চরম পরিণতি আসিয়াছে, সেখানেই নাটকের যবনিকাপাতও হইয়াছে। অতএব কাহিনী বিন্যাসের দিক দিয়া 'ষোড়শী'কে স্বাধীন নাটক বলিয়া গ্রহণ করাই সঙ্গত। তারপর আগেই উল্লেখ করিয়াছি, 'দেনা-পাওনা' মিলনাত্মক রচনা, 'ষোড়শী' বিয়োগান্তক। অতএব উপন্যাসের পরিণতি নাটকের উপর প্রভাব বিস্তার

করিতে পারে নাই। 'দেনা-পাওনা' ও 'ষোডশী' অন্ততঃ এ'ক্ষেত্রে পরস্পর সম্পূর্ণ স্বাধীন। কাহিনীর দিক হইতে উপন্যাসই হউক, কিংবা নাটকই হউক ইহাদের পরিণতি-অংশের একটা বিশেষ মূল্য আছে; তাহা দ্বারাই পাঠকের মনের উপর যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, তাহার ভাব স্থায়িত্ব লাভ করে। বিশ্লেষণ-ধর্মী উপন্যাসকে ঘটনাধর্মী নাটকে পরিণত করার অযোগ্যতাব কথা বাদ দিলেও 'ষোড়শী'র যে একটি নাট্যরূপ, তাহা যে স্তরেরই হোক—সার্থকতা লাভ করিয়াছে, তাহা স্বীকার করিতেই হয়, কিন্তু তাহা 'দেনা-পাওনা'র কাহিনীসাপেক্ষ নয়, তাহা স্বাধীন।

শরৎচন্দ্র ঔপন্যাসিক, ইহাই তাঁহার একমাত্র পরিচয়। তিনি নাট্যকার নহেন—নাটকের প্রেরণা তাঁহার মৌলিক নহে। তাঁহার উপন্যাসের ভিতর দিয়া যে বিশ্লেষণধর্মী গুণ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা নাট্যরচনার অনুকূল নয়। তাঁহার কাব্যধর্মী ভাষাও নাটকীয় সংলাপ রচনার প্রতিকূল। শরৎ-প্রতিভার ইহা বিশেষত্ব মাত্র—ত্রুটি নহে।

শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর সাম্প্রতিক কালে তাঁহার প্রায় সব কয়খানি উপন্যাসকেই নাট্যরূপ দিয়া রঙ্গমঞ্চে কিংবা চলচ্চিত্রে অভিনীত হইয়াছে। এই কার্যে দেব নারায়ণ গুপ্ত বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন, নাটকের অভিনয়গুলিও ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহাদের একখানি নাট্যরূপও মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়া বিশিষ্ট কোন সাহিত্য পরিচয় লাভ করিতে পারে নাই। ইহাদের জনপ্রিয়তার একটি কারণ প্রধানতঃ অভিনয় গুণ হইলেও শরৎচন্দ্রের প্রায় প্রত্যেক কাহিনীই যে অন্তর্দ্বন্দ্বমূলক মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহাও অস্বীকাব করা যায় না এবং এই অন্তর্দ্বন্দ্বের জন্যই ইহাদের নাটকীয় শক্তিও সহজেই সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিবার সুযোগ পায়। অনেক সময় শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলিতে নাটকান্তরিত করিতে গিয়া নূতন নূতন চরিত্র ও নূতন নূতন দৃশ্যের অবতারণা করা হইয়া থাকে। এই বিষয়ে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন না করিলে শরৎচন্দ্রের রচনার রসোপলব্ধিতে ব্যাঘাত সৃষ্টি হইতে পারে।

পঞ্চম অধ্যায়

অতি-আধুনিক যুগের নাট্যকারগণ

(১৯২৬—১৯৪৩)

বাংলা নাট্যসাহিত্যের আধুনিক যুগে যে দুইটি ধারা পরস্পর স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে, পূর্ববর্তী কয়েকটি অধ্যায়ে তাহাদের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে—ইহাদের মধ্যে একটি ধারা অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত ধারাটির সঙ্গে যে বাংলা নাট্যসাহিত্যের ক্রমবিকাশের কোনও যোগ নাই, সে কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। অতএব আধুনিক যুগের রবীন্দ্র-নাট্যসাহিত্যের কথা বাদ দিলে দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাট্যরচনার মধ্য দিয়া ইহার একটি স্বাধীন ধারার বিকাশ অনুভব করা যায়। ইহার দ্বিতীয় ধারাটি প্রধানতঃ পৌরাণিক বিষয়-বস্তু অবলম্বন করিয়া বাংলা নাট্যসাহিত্যের মধ্যযুগের ধারাই অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইয়াছে—ইহার কিছু মাত্র মৌলিকতা নাই। কিন্তু এই দুইটি ধারার প্রায় শেষ প্রান্তে আসিয়া বাংলা নাট্যসাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ-দ্বিজেন্দ্রলাল কিংবা তাঁহাদের সমসাময়িক অন্যান্য বাংলা নাট্যকারের মধ্যে যে সকল বৈশিষ্ট্যের পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে, ইহার মধ্যে তাহাদের সাক্ষাৎকার লাভ করা যায় না। অতএব ইহা বাংলা নাট্যসাহিত্যের অতি-আধুনিক যুগ বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে। স্বপ্ন-বিলাসিতা আধুনিক যুগের ধর্ম ছিল, বাস্তব-প্রীতিই অতি-আধুনিক যুগের ধর্ম হইয়াছে। অতএব ইহাদের মধ্যে যে ব্যবধান তাহা কেবল মাত্র কালের ব্যবধান নহে, অন্তঃপ্রকৃতিরও মৌলিক ব্যবধান। এই ব্যবধানটুকু সুস্পষ্ট ভাবে উপলব্ধি করিতে পারিলেই বাংলা নাট্যসাহিত্য এখনও যে ইহার প্রাণধর্ম রক্ষা করিয়া নিজের শক্তিতে ক্রমাগত অগ্রসর হইয়া যাইতেছে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, প্রধানতঃ স্বদেশী আন্দোলন হইতে নাট্যসাহিত্যের আধুনিক যুগের সূত্রপাত হইয়াছে অর্থাৎ দেশাত্মবোধই আধুনিক যুগের জন্মদাতা। কিন্তু স্বদেশী যুগের দেশাত্মবোধ যে বহুলাংশেই বাস্তবাশ্রয়ী

ছিল না, রবীন্দ্রনাথও তাহা গভীর উদ্বেগের সঙ্গে বার বার লক্ষ্য করিয়াছিলেন—তাহা প্রত্যক্ষ দেশকে বাদ দিয়া দেশাত্মবোধের অপ্রত্যক্ষ ভাবাদর্শকেই আশ্রয় করিয়াছিল; কিন্তু দেশের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের ভিতর দিয়াই অতি-আধুনিক যুগের যাত্রারম্ভ হইয়াছে। আধুনিক যুগে যেমন দেশ বাদ দিয়া দেশাত্মবোধ এবং মানব বাদ দিয়া মানবিকতার উপলব্ধি করিবার প্রয়াস দেখা গিয়াছিল, অতি-আধুনিক যুগে তেমনই প্রত্যক্ষ দেশ, ইহার অন্তর্ভুক্ত সহস্র সমস্যা-কণ্টকিত সমাজ ইত্যাদি নাটকের উপজীব্য হইয়াছে। অতি-আধুনিক পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক নাটকও ইহাদের মৌলিক লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া প্রত্যক্ষ জীবনের নানা সমস্যা সমাধানের সহায়তা করিতেছে। আধুনিক যুগে দ্বিজেন্দ্রলাল-প্রবর্তিত ঐতিহাসিক নাট্যধারার মধ্যে হিন্দু জাতীয়তাবোধই প্রবলতর রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল; কিন্তু অতি-আধুনিক যুগে অন্ততঃ ভারত-বিভাগের পূর্ব পর্যন্ত ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান মিলনের যে প্রয়োজনীয়তা দেখা গিয়াছিল, এই যুগের ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যেও তাহার প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলালের অধিকাংশ ঐতিহাসিক নাটক হিন্দু রাজপুত শক্তির সঙ্গে মুসলমান মোগল রাজশক্তির দ্বন্দ্ব-সংঘাত লইয়া রচিত—হিন্দু রাজপুত জাতির বিজয়-গৌরবই ইহাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠার বিষয়। কিন্তু অতি-আধুনিক যুগের বাংলা ঐতিহাসিক নাটকগুলির মধ্য হইতে এই সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা-বোধ দূর হইয়া গিয়া হিন্দু-মুসলমান মিলনের আদর্শই লক্ষ্য করা হইয়াছে। একদিন ঐতিহাসিক তথ্য উপেক্ষা করিয়া সর্বতোভাবে হিন্দুর গৌরব প্রতিষ্ঠা করাই যে ঐতিহাসিক নাটকের একমাত্র লক্ষ্য হইয়াছিল, অতি-আধুনিক যুগে তাহাই হিন্দু-মুসলমানের মিলনের আদর্শকেই লক্ষ্য করিয়া লইয়াছে। সেইজন্য ইতিহাস যে সকল চরিত্রকে বিশ্বাসঘাতকতা, দেশদ্রোহিতা প্রভৃতি দোষে মসীলিপ্ত করিয়াছে, এই শ্রেণীর নাটকের মধ্যে এই সকল চরিত্র হইতে এই সকল ইতিহাস-নির্দেশিত কালিমা দূর করিয়া দিয়া তাহাদিগকে অভিনব গৌরব-মণ্ডিত করিয়া তাহাদের কল্পিত মহিমার কীর্তন করা হইয়াছে। ভারত-বিভাগের সময় পর্যন্ত এই শ্রেণীর হিন্দু-মুসলমান মিলনাত্মক নাটক রচিত হইলেও ইহার পর হইতেই ইহাদের রচনা একেবারেই রুদ্ধ হইয়া যায়। অতএব যে ঐতিহাসিক নাটক প্রধানতঃ দেশাত্মবোধ ও সাম্প্রদায়িক মিলনের ভাব অবলম্বন করিয়া প্রথমতঃ আধুনিক ও পরে অতি-আধুনিক যুগে বাঁচিয়া

ছিল, ভারত-বিভাগের পর তাহাদের আর কোনও অবলম্বন রহিল না; অতএব ইহার পর হইতে বাংলা ঐতিহাসিক নাটক নিতান্ত শক্তিহীন হইয়া পড়িল।

অতি-আধুনিক যুগের পৌরাণিক নাটকের মধ্যেও লক্ষ্যণীয় পরিবর্তনের সূচনা দেখা দিল। আধুনিক যুগেও যে কয়জন নাট্যকার বাংলা নাট্যসাহিত্যের মধ্যযুগের ধারা অবলম্বন করিয়া বাংলার পৌরাণিক নাটক রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের কেহই অতি-আধুনিক যুগে উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। অতএব পৌরাণিক নাটকের মধ্য দিয়া আধুনিক যুগ অতি-আধুনিক যুগের সঙ্গে কোনও যোগসূত্র রক্ষা করিতে পারে নাই। মধ্য যুগের এবং আধুনিক যুগের কতকাংশেও পৌরাণিক নাটকের প্রধান লক্ষণ ছিল ভক্তি। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে উত্তীর্ণ হইয়া স্বদেশী আন্দোলনের বাস্তব সংগ্রামের সম্মুখীন হইবার ফলে এই জাতির মধ্য হইতে অবাস্তব ভক্তির প্রভাব হ্রাস পাইতে আরম্ভ হয়। অতি-আধুনিক যুগে উত্তীর্ণ হইয়া তাহা একেবারেই লুপ্ত হইয়া যায়। তখন যে সামান্য কয়টি পৌরাণিক নাটক রচিত হইয়াছে, তাহাতে পৌরাণিক পরিবেশের মধ্যে সমসাময়িক সামাজিক কিংবা রাজনৈতিক চৈতন্যেরই অভিব্যক্তি দেখা গিয়াছে। তখন হইতে পৌরাণিক নাটকের মধ্যে অলৌকিক আচার-সিদ্ধ দেবতা আর নাই, দেবদেবীর পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া নরনারীই তাহাতে বিচরণ করিতেছে। অতএব পৌরাণিক নাটকের যাহা মূল লক্ষ্য, এখানে তাহারই অভাব দেখা দিল। শুধু তাহাই নহে, সংখ্যার দিক দিয়াও ইহারা এতই সামান্য হইয়া দাঁড়াইল যে, ইহাদের সম্বন্ধে স্বতন্ত্র কোনও আলোচনাও অনাবশ্যক বলিয়া মনে হইতে পারে। ইহা হইতেই দেখা যাইবে, যে-পৌরাণিক নাটক রচনা দ্বারাই বাংলা নাট্যসাহিত্যের সূত্রপাত হইয়াছিল, এক শত বৎসরের মধ্যেই তাহা প্রায় লুপ্ত হইয়া গেল। বিশেষতঃ এই পৌরাণিক নাটকই বাংলা নাট্যসাহিত্যের মধ্যযুগের সমগ্র ক্ষেত্র সম্পূর্ণ অধিকার করিয়াছিল এবং ইহার মধ্যেই বাংলার সর্বাধিক জনপ্রিয় নাট্যকারেরও আবির্ভাব হইয়াছিল। জাতীয় জীবনের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে জাতির রস ও রুচির ধারা যে কি ভাবে পরিবর্তিত হইতে পারে, ইহা তাহার অন্যতম প্রমাণ। স্বাধীনতা-লাভের পরও ঐতিহাসিক নাটক কোনও উপায়ে আত্মরক্ষা করিয়া বাঁচিয়া থাকিলেও, ইহার বহু পূর্ব হইতেই পৌরাণিক নাটক যে প্রকৃত পক্ষে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার কোনও উপায়

নাই। যাহা হউক, পৌরাণিক নাটক ইহার কার্য সিদ্ধ করিয়াই যে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্র হইতে বিদায় লইয়াছে, তাহা সত্য। এ'দেশের সামাজিক জীবনের অগ্রগতির যে আদর্শ দেখা যাইতেছে, তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে ইহার যদি পুনরভ্যুদয় হয়, তবে পৌরাণিক দেহে রোমান্টিক আত্মা লইয়াই ইহারা অভ্যুত্থিত হইবে, পৌরাণিক নীতি ও আদর্শ দ্বারা ইহাদের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা আর সম্ভব হইবে না। আত্মার পরিচয়েই দেহের পরিচয়; অতএব তখন ইহাদিগকে আর পৌরাণিক নাটক বলিয়া পরিচয় দিবার কোন উপায় থাকিবে না।

এইবার অতি-আধুনিক যুগের সামাজিক নাটক সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিতে হয়। সামাজিক নাটক অতি-আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। বাংলা নাট্যসাহিত্যের মধ্যযুগে পৌরাণিক নাটক ও ইহার আধুনিক যুগের প্রারম্ভে ঐতিহাসিক নাটক বাংলা সাহিত্যে যে স্থান অধিকার করিয়াছিল, অতি-আধুনিক যুগের সামাজিক নাটকও সেই স্থানের অধিকারী হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে বাংলা নাট্যসাহিত্যের মধ্যযুগ পৌরাণিক নাটকের যুগ, আধুনিক যুগ ঐতিহাসিক নাটকের যুগ এবং অতি-আধুনিক যুগ সামাজিক নাটকের যুগ। বাংলা নাট্যসাহিত্যের আদিযুগে সামাজিক নাটক রচনার প্রবণতা দেখা গিয়াছিল, কিন্তু তাহার সঙ্গে অতি-আধুনিক যুগের সামাজিক নাটকের সুস্পষ্ট পার্থক্য অনুভব করা যায়। বাংলা নাট্যসাহিত্যের আদিযুগ সমাজ-সংস্কারমূলক নাট্যরচনার যুগ, কিন্তু ইহার অতি-আধুনিক যুগ সমাজ-সমস্যামূলক নাট্যরচনার যুগ—ইহাতে সমাজেব অন্তর্ভুক্ত নরনারীর বিবিধ সামাজিক দাবী সম্পর্কিত প্রশ্ন ও সমস্যার সুনিপুণ বিশ্লেষণ করিবার প্রবণতা দেখিতে পাওয়া যায়। এ যুগের সামাজিক সমস্যা যেমন জটিল, তেমনই গুরুত্বপূর্ণ; সেইজন্য ইহা অবলম্বন করিয়া ব্যঙ্গাত্মক কিংবা গুরুবিষয়ক সামাজিক নাটকই রচিত হইয়াছে, প্রহসন রচিত হইতে পারে নাই। বিধবা-বিবাহের সামাজিক স্বীকৃতি ও স্ত্রীশিক্ষা প্রচারের ভিতর দিয়া বাংলার সামাজিক জীবনের একটি প্রধান অংশ অর্থাৎ নারীসমাজ আজ সকল সামাজিক দাবী লইয়া অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে। একদিন এই নারীসমাজ উপেক্ষিত ছিল বলিয়া ইহার সম্পর্কিত কোনও সমস্যা বাংলা নাটকের ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করিতে পারে নাই। সেইজন্য পূর্ববর্তী সামাজিক নাটকের মধ্যে কোনও জটিলতা প্রকাশ পায় নাই। পুরুষ-নির্দিষ্ট পথে অগ্রসর হইয়া

গিয়া নারী চিরদিন নিজের আত্মবোধ বিসর্জন দিয়াছে। কিন্তু স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যে প্রতিষ্ঠা হইতেছে, তাহার ফলে বিবিধ অভাবনীয় ও জটিল সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হইতেছে। অতি-আধুনিক বাংলা নাটকে সেই সমস্যাগুলি নানাদিক লইতে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার প্রবৃত্তি দেখা যাইতেছে। এই বিষয়ে কয়েকজন আধুনিক পাশ্চাত্ত্য নাট্যকারের প্রভাব যে প্রত্যক্ষভাবে কার্যকর হয় নাই, তাহা বলিবার উপায় নাই। এই সম্পর্কে প্রথমেই নরওয়ে দেশীয় নাট্যকার ইবসেন রচিত *A Doll's House* নাটকের মধ্য দিয়া নারীর আত্মবোধের বলিষ্ঠ অভিব্যক্তি যে ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার প্রভাব কেবল মাত্র পাশ্চাত্ত্য জগতের মধ্যেই যে সীমাবদ্ধ ছিল, তাহা নহে—পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় দীক্ষিত পৃথিবীর সকল দেশেই তাহা বিস্তার লাভ করিয়াছে। অতি-আধুনিক যুগের বাঙ্গালী নাট্যকারদিগের মধ্যেও ইহার সুস্পষ্ট প্রভাব অনুভব করা করা যাইতে পারে। ইব্‌সেন ব্যতীত আরও দুইজন এ'যুগের ইংরেজ নাট্যকারের প্রভাবও অতি-আধুনিক যুগের নাট্যকারদিগের মধ্যে বিশেষ কার্যকর হইয়াছে বলিয়া অনুভব করিতে পারা যায়—তাঁহারা জন্ গল্‌সওয়াদি এবং জর্জ বার্ণার্ড শ। যে ভাবে সমাজের নানা দিক ইঁহারা বিচার করিয়া দেখিয়াছেন, সেই ভাবেই এ'যুগের বাঙ্গালী নাট্যকারগণও এদেশের সমাজের নানা দিক বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। অতি-আধুনিক যুগের একজন নাট্যকার নিজেকে বাঙ্গালী বার্ণার্ড শ' বলিয়া দাবী করিয়া থাকেন। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে, এই সকল আধুনিক পাশ্চাত্ত্য নাট্যকারদিগের চিন্তাধারা দ্বারা অতি-আধুনিক যুগের বাংলা নাট্যকারগণ কতদূর প্রভাবিত হইয়াছেন।

অতি-আধুনিক যুগের প্রথম ভাগ হইতেই আর একজন পাশ্চাত্ত্য মনীষীর চিন্তাধারা দ্বারা পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজ প্রভাবিত হইতে থাকে—তাঁহার নাম ফ্রয়েড্। মানব-প্রকৃতির বিশ্লেষণে তিনি তাঁহার মৌলিক চিন্তাধারা দ্বারা জগতে যে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছেন, তাহার প্রতি প্রথম হইতেই পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙ্গালীর মন আকৃষ্ট হইয়াছিল এবং বাংলার অতি-আধুনিক যুগের কাব্য ও কথাসাহিত্যে ইহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছিল। অতি-আধুনিক যুগের নাট্যসাহিত্যও যে ইহার প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল, এমন কথা বলিতে পারা যায় না। নরনারীর চরিত্র-সৃষ্টিতে কোন কোন বাঙ্গালী নাট্যকার ফ্রয়েড-প্রদর্শিত বিশ্লেষণ গ্রহণ করিয়াছেন এবং বাঙ্গালীর

সামাজিক জীবনের পটভূমিকায় তাহা রূপায়িত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। তাহার ফল যাহাই হউক না কেন, বাংলা সামাজিক নাটকের চরিত্র-সৃষ্টিতে ইহা দ্বারা এক নূতন দিকের সন্ধান লাভ করা যায়। চরিত্র-সৃষ্টির চিরাচরিত পদ্ধতির মধ্যে ইহা যে বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

বাংলা নাট্যসাহিত্যের অতি-আধুনিক যুগকে প্রধানতঃ দুইটি ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা পর্যন্ত ইহার প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হইতে ইহার দ্বিতীয় ভাগের আরম্ভ হইয়াছে। ভারতের স্বাধীনতা বাংলা ও পাঞ্জাবের ললাটে দুর্ভাগ্যের মসীলেখা লিপ্ত করিয়া দিয়াছে এবং তাহা দ্বারা এই উভয় প্রদেশের সামাজিক জীবনেরও সংহতি বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। অতএব বাংলার সামাজিক নাটক রচনায় ইহার অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে। অতি-আধুনিক যুগের প্রথমার্ধে ব্যক্তি-স্বার্থের সঙ্গে সমাজ-স্বার্থের যে সংঘাতের কথা বাংলা নাটকের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার দ্বিতীয়ার্ধেই তাহার পরিবর্তে ছিন্নমূল সমাজের বৃহত্তর অর্থনৈতিক সমস্যা এই স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছে। সমাজ-জীবনের মধ্যে স্থৈর্য না থাকিলে ইহার অন্তর্ভুক্ত ব্যষ্টি জীবনেরও স্বরূপ যথার্থ উপলব্ধি করিতে পারা যায় না। সেইজন্য বঙ্গবিভাগ-জনিত সমাজ-বিশৃঙ্খলা যতদিন পর্যন্ত না কোন একটি অবস্থার মধ্যে গিয়া স্থৈর্য লাভ করিবে, ততদিন পর্যন্ত বাংলা নাটকে বৃহত্তর সমাজের পটভূমিকায় ব্যক্তি-স্বার্থের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণও আর তেমন সম্ভব হইবে না।

অতি-আধুনিক যুগের বাংলা সামাজিক নাটকের অবলম্বন নাগরিক সমাজ—পল্লীসমাজ নহে। অবশ্য বাংলা নাটকের জন্মকাল হইতেই এ'দেশে নাগরিক জীবনের প্রতিষ্ঠা হইতে আরম্ভ হইয়াছে; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বাংলা নাট্য-সাহিত্যের আদিযুগে এদেশের নবপ্রতিষ্ঠিত নাগরিক জীবন ইহার একমাত্র অবলম্বন হইয়া উঠিতে পারে নাই। ইহার মধ্যযুগে বাংলা সামাজিক নাটকের উপর নাগরিক জীবনের প্রভাব অধিকতর বিস্তৃত হইয়াছে সত্য; কিন্তু তখনও পল্লীজীবনের আদর্শ ইহা হইতে একেবারে লুপ্ত হইয়া যায় নাই; বরং তখন নাগরিক জীবনের সঙ্গে পল্লীজীবনের সংঘর্ষের কথাই ইহার মধ্য দিয়া নানাভাবে ব্যক্ত হইয়াছে—এই সংঘর্ষের মধ্যেও পল্লীসমাজাদর্শেরই জয়গান করা হইয়াছে।

কিন্তু অতি-আধুনিক যুগের উপজীব্য সমাজ—প্রধানতঃ নাগরিক সমাজ, পল্লীসমাজের আদর্শ ইহা হইতে বহু দূরবর্তী হইয়া পড়িয়াছে। ইহার কারণও অত্যন্ত স্পষ্ট। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাবিস্তার ও যন্ত্রসভ্যতা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে পল্লীর সমাজ ও তাহার অর্থনৈতিক বনিয়াদ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এখন নাগরিক জীবন কেন্দ্র করিয়াই শিক্ষিত বাঙ্গালীর নূতন সমাজ গড়িয়া উঠিতেছে। ভগ্নপ্রায় পল্লীসমাজের বুকে যে সমাজ এখন নূতন গড়িতেছে, তাহা এখনও স্থৈর্য লাভ করিতে পারে নাই বলিয়া ইহার মধ্যে সহস্র সমস্যা দেখা দিতেছে। অতি-আধুনিক বাংলা নাটকে সেই সমস্যাগুলি নানাদিক দিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিবার প্রয়াস দেখা যাইতেছে। এই বিষয়ে কয়েকখানি নাটকের মধ্যে যে কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা নিতান্ত উপেক্ষণীয় বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

বাংলা নাট্যসাহিত্যের আদি, মধ্য ও আধুনিক যুগে যে এক-নায়কত্বের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, অর্থাৎ আদিযুগে দীনবন্ধু, মধ্যযুগে গিরিশচন্দ্র এবং আধুনিক যুগে একদিকে রবীন্দ্রনাথ ও অপরদিকে দ্বিজেন্দ্রলাল যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, অতি-আধুনিক যুগের নাট্যসাহিত্যে তেমন কোন একক ব্যক্তি-প্রতিভার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় নাই। সেইজন্য অতি-আধুনিক যুগ আপাতদৃষ্টিতে বৈশিষ্ট্যহীন বলিয়া মনে হয়; কিন্তু একটু গভীবভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহার মধ্যেও বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যাইবে। তবে বাংলা নাট্যসাহিত্যের পর পর তিনটি যুগেই এক-নায়কত্বের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয় বলিয়া প্রত্যেক যুগেই অনুরূপ এক-নায়কত্বের অনুসন্ধান করা আমাদের অভ্যাসের মধ্যে গিয়া দাঁড়াইয়াছে—ইহার ব্যতিক্রম দেখিলেই আমরা বিমুখ হইয়া পড়ি; নাটকের বৈশিষ্ট্যহীনতার জন্য এমন হয় না, বরং আমাদের অভ্যাসের ত্রুটির জন্যই তাহা হইয়া থাকে। এক-নায়কের অভাবের ফলে অতি-আধুনিক নাট্যসাহিত্যে বিশেষ কতকগুলি গুণও প্রকাশ পাইয়াছে। সাহিত্যে এক-নায়কের প্রভাব থাকিলে অন্যান্যের পক্ষে ব্যক্তি-প্রতিভার স্বাধীন বিকাশে বাধার সৃষ্টি হইয়া থাকে—ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক প্রত্যেকেই অধিকতর প্রতিষ্ঠা-সম্পন্ন সাহিত্যিকের অনুকরণ করিতে বাধ্য হয়; ইহাতে তাহার গুণেরও যেমন অনুকরণ হয়, দোষেরও তেমনই অনুকরণ হইয়া থাকে। বিশেষতঃ অনুকরণ দ্বারা কোন উচ্চাঙ্গের সাফল্য লাভ করা যাইতে পারে না। সেইজন্য দীনবন্ধুর অনুকরণ করিয়া রামনারায়ণ তাঁহার 'নব-নাটকে'

তাঁহার 'কুলীনকুল-সর্বস্বে'র বৈশিষ্ট্যও অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারেন নাই। সমাজের সমগ্র প্রতিভা শোষণ করিয়া এক-নায়কের পরিপুষ্টি হয়। ইহা সাহিত্যের Fascism বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। কিন্তু যেখানে এই প্রকার এক-নায়কের অভাব, সেখানে ব্যক্তিজীবনের সূক্ষ্মতম প্রতিভা-বিকাশেরও কোনও অন্তরায় হয় না। অতি-আধুনিক যুগের বাংলা নাট্যসাহিত্য এক-নায়কত্বের শাসন হইতে পরিত্রাণ পাইয়া ব্যক্তি-প্রতিভার স্বাধীন বিকাশের সুযোগ লাভ করিয়াছে। যেখানে সাধারণের মধ্যে প্রতিভার অভাব, সেখানে এক-নায়কেরই প্রয়োজন। কিন্তু অতি-আধুনিক যুগে সাধারণের মধ্যে প্রকৃত প্রতিভার যথার্থ অভাব আছে বলিয়া স্বীকার করা যায় না। এক-নায়কত্বের ফলে সমাজের শক্তি ব্যক্তিবিশেষে কেন্দ্রিত হইয়া থাকে, সেইজন্য সহজেই তাহা সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে, কিন্তু যেখানে এই এক-নায়কত্বের অভাব, সেখানে সমাজের প্রতিভা বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে বলিয়া তাহা সমাজের দৃষ্টি সহজে আকর্ষণ করিতে পারে না। অতি-আধুনিক যুগের বাংলা নাট্য-সাহিত্য সেইজন্যই বৈশিষ্ট্যহীন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এই যুগে রচিত বিভিন্ন নাটকের অন্তর্নিহিত মূল্য বিচার করিয়া দেখিলে ইহাদিগকে আদি কিংবা মধ্যযুগের যে কোন নাটক হইতেই হীন বলিয়া বিবেচিত হইবে না। একমাত্র রবীন্দ্রনাথের নাটকের কথা বাদ দিলে এই যুগের বহু নাটকই বাংলা নাট্যসাহিত্যের পূর্ববর্তী যে কোন নাট্যকারের রচনার সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে এবং এই প্রকার তুলনামূলক বিচারে অতি-আধুনিক যুগের বহু নাটকই নিঃসন্দেহে অধিকতর শক্তিশালী বলিয়া বিবেচিত হইবে। ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে নাট্য-প্রতিভা এই যুগে কেন্দ্রিত হইয়া নাই বলিয়াই সমষ্টির মধ্যে তাহা বিকীর্ণ হইয়া আছে। সেইজন্য এই যুগের একাধিক অপরিচিত নাট্যকারও এমন কয়েকখানি নাটক রচনা করিয়াছেন, যাহা পূর্ববর্তী যুগের প্রথম শ্রেণীর প্রতিভাসম্পন্ন নাট্যকারের পক্ষে রচনা করাও বিস্ময়কর বলিয়া বোধ হইত। অতি-আধুনিক যুগের নাট্যকারের এই শ্রেণীর দুই একখানি নাটকের সঙ্গে প্রায় সকলেই পরিচিত আছেন।

কেহ কেহ মনে করেন, রবীন্দ্রোত্তর যুগে বাংলা নাট্যসাহিত্যের 'পতন' হইয়াছে। এই ধারণা সম্বন্ধে প্রথম কথা এই যে, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বাংলা নাট্যসাহিত্যের উত্থান-পতনের কোনও যোগ নাই—সে কথা পূর্বে বিস্তৃত

আলোচনা করিয়াছি। যদি অতি-আধুনিক যুগে নাট্যসাহিত্যের যথার্থই 'পতন' হইয়া থাকে, তবে সেই পতনের যুগকে রবীন্দ্রনাথের নাম দ্বারা চিহ্নিত করা যাইবে না। রবীন্দ্রনাথের কথা বাদ দিলে আধুনিক যুগে আর যাঁহারা অবশিষ্ট থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে ক্ষীরোদপ্রসাদ-দ্বিজেন্দ্রলালই উল্লেখযোগ্য। অতএব অতি-আধুনিক যুগে বাংলা নাট্যসাহিতের 'পতনে'র কথা যদি স্বীকার করিতে হয়, তবে ক্ষীরোদপ্রসাদ-দ্বিজেন্দ্রলালের রচনার মান হইতে ইহা অধঃপতিত হইয়াছে, ইহাই বুঝিতে হইবে। কিন্তু দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, অতি-আধুনিক যুগে ক্ষীরোদপ্রসাদ-দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকও অপ্রচলিত হইয়া গিয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলালের একমাত্র 'চন্দ্রগুপ্ত' এবং 'সাজাহান' ব্যতীত আর কোনও নাটক এখন অভিনীত কিংবা পঠিত হয় না—ইহাদেরও বহিরঙ্গগত রূপ আর সাধারণের প্রীতিকর নহে। ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটক পূর্ব হইতেই অপ্রচলিত হইয়া গিয়াছে। অতএব প্রকৃত 'পতন' বলিতে যাহা বুঝায়, এখানে তাহা হয় নাই ; এখানে যাহা হইয়াছে তাহা 'পতন' নহে, ধারার পরিবর্তন মাত্র। আদিযুগ হইতে আরম্ভ করিয়া অতি-আধুনিক যুগ পর্যন্ত বাংলা নাটক নূতন নূতন ধারায় পরিবর্তিত হইয়া অগ্রসর হইতেছে—সমাজ-জীবনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইহার এই পরিবর্তন অপরিহার্য। অতএব এখানে উত্থান-পতনের কোনও প্রশ্নই নাই। বিশেষ কোন যুগে যদি প্রতিভাশালী নাট্যকারের যথার্থই অভাব হয়, তবেই সেখানে 'পতনে'র কথা আসিতে পারে। কিন্তু অতি-আধুনিক যুগে সে অবস্থা দেখা দিয়াছে বলিয়া মনে করিবার কোনও সঙ্গত কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না।

অতি-আধুনিক যুগের কোন কোন নাট্যকার ব্যবসায়ী রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকিলেও, মধ্যযুগের মত সকলেই যে ইহার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এমন নহে। এ যুগে রঙ্গমঞ্চের সংস্রব বহির্ভূত অঞ্চল হইতেও নাট্যকারদিগের রচনা সংগৃহীত হইয়া মঞ্চস্থ হইতেছে সত্য, তথাপি এ' কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, যাঁহারা রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে কোন সম্পর্ক রক্ষা করেন নাই, তাঁহারাও ইহার আঙ্গিক ব্যবস্থা দ্বারা প্রভাবিত হইতেছেন। তাহার ফলে অতি-আধুনিক বাংলা নাটকের বহিরঙ্গগত কিছু কিছু উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। বিদ্যুচ্চালিত ঘূর্ণায়মান মঞ্চব্যবস্থার অনুকূল করিবার জন্য ইহার দৃশ্যগুলি একদিক দিয়া যেমন বৈচিত্র্যহীন করা হইতেছে, তেমনই দৃশ্যগুলির দৈর্ঘ্যও বিস্তৃতিলাভ করিতেছে। অনেক সময় একটি

দৃশ্যেই ইহাদের এক একটি অঙ্ক সম্পূর্ণ হইতেছে। মধ্যযুগের দীর্ঘ পঞ্চাঙ্ক ও ষষ্ঠাঙ্ক নাটকের পরিবর্তে অতি-আধুনিক যুগে সেইজন্যই তিন অঙ্ক অথবা চার অঙ্ক নাটক রচনার প্রচলন হইতেছে। অঙ্গ ও ভাবগত আদর্শের দিক দিয়া গতানুগতিক (conventional) নাট্যরচনার ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অতি-আধুনিক কালে এদেশে কতকগুলি স্বাধীন নাট্যপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে; নিজেদের আদর্শের দিক হইতে জাতীয় জীবনের ক্রমবিকাশের বিভিন্ন ধারার সঙ্গে নাট্যরচনার ধারা অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া লওয়াই ইহাদের প্রত্যেকেরই উদ্দেশ্য। এমন কি, ইহাদের মধ্যে কোন কোন প্রতিষ্ঠান পূর্ববর্তী যুগের নাটকগুলিকেও যুগোপযোগী পরিবর্তন করিয়া লইবার পক্ষপাতী। ইহা হইতে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, অতি-আধুনিক যুগে বাংলা নাটককে জাতীয় জীবনের একটি সক্রিয় অংশ দান করিবার প্রবৃত্তি দেখা দিয়াছে। একদিন যাহা অবসর-বিনোদনের অবলম্বন মাত্র ছিল, আজ তাহা জাতীয় জীবনের সক্রিয় শিরা-উপশিরা বলিয়া গণ্য করা হইতেছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত যে ইহা এই বিষয়ে কোনও সুস্পষ্ট পথরেখার সন্ধান পায় নাই, তাহা সত্য।

অতি-আধুনিক যুগের বাংলা নাটকের একমাত্র লক্ষ্য মানুষ—সমাজও নহে, দেশও নহে। একদিন সমাজের সহস্র ত্রুটি-বিচ্যুতি বাংলা নাটকের লক্ষ্য ছিল, দেশের পরাধীনতাও ইহার লক্ষ্য ছিল। সামাজিক সমস্যাগুলি আপনা হইতেই সমাধান হইয়া আসিয়াছে—এখন তাহা দ্বারা কাহারও শিরঃপীড়ার উদয় হয় না; দেশের পরাধীনতাও দূর হইয়াছে; অতএব এখন মানুষই ব্যক্তিকেন্দ্রিক নাগরিক জীবনের একমাত্র সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বৃহত্তর সামাজিক পটভূমিকায় একদিন এই মানুষ অস্পষ্ট হইয়াছিল, আজ সামাজিক পটভূমিকা অস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে, মানুষ তাহার ভিতর হইতে স্পষ্ট হইয়া আসিতেছে। সমাজ ও ধর্মসংস্কার-নিরপেক্ষ মানুষেরই জটিল জিজ্ঞাসা অতি-আধুনিক নাটকের বিষয়ীভূত হইয়াছে।

পৌরাণিক বিষয়-বস্তু অবলম্বন করিয়াও অতি-আধুনিক যুগের মনোভাব যে সার্থক ভাবে প্রকাশ করা যাইতে পারে, এ যুগের সুপরিচিত নাট্যকার মন্মথ রায়ের নাটকগুলিই তাহার প্রমাণ। রবীন্দ্রনাথ-দ্বিজেন্দ্রলালের সমসাময়িক কালেই পৌরাণিক বিষয়-বস্তুর ব্যবহার নাটকের মধ্যে অপ্রচলিত হইয়া আসিতে থাকিলেও মন্মথ রায় তাহাই তাঁহার নাট্যরচনার অবলম্বনরূপে

গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু ইহাদের মধ্য দিয়া তাঁহার যে বক্তব্য প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার ভঙ্গি এবং ভাব দুইই অতি-আধুনিক—তাহাদিগকে কোনমতেই পুর্ববর্তী যুগের বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না। পৌরাণিক নাটক হইলেও পৌরাণিক নীতি কিংবা ধর্মের গুণকীর্তন তাঁহার নাটকে নাই; বরং তাহাদের পরিবর্তে অতি-আধুনিক মনোভাবই তাহাদের মধ্য দিয়া ব্যক্ত হইয়াছে। সেইজন্য যাঁহারা পৌরাণিক বিষয়-বস্তুর মধ্যে এখনও এদেশের সনাতন নীতি ও ধর্মেব আদর্শ অনুসন্ধান করিয়া থাকেন, তাঁহারা তাঁহার পৌরাণিক নাটকের রসাস্বাদন করিতে পারেন নাই। তাঁহার প্রকাশ-ভঙ্গির মধ্যে একদিকে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রভাব ও অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব অনুভব করা যায়—দ্বিজেন্দ্রলালের নিকট হইতে তিনি তাঁহার প্রকাশভঙ্গির বলিষ্ঠতার গুণটি লাভ করিয়াছেন এবং রবীন্দ্রনাথেব নিকট হইতে তিনি তাঁহার অলঙ্করণের গুণটি গ্রহণ করিয়াছেন। অতএব তাঁহার প্রকাশভঙ্গি একদিক দিয়া যেমন প্রত্যক্ষ, অন্যদিক দিয়া তেমনি অলঙ্কৃত—এই দুইটি বিষয়ের মধ্যে যে বিরোধ আছে, তিনি তাহাতে সামঞ্জস্য বিধান করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহার ভাষা কবিত্ব-ভারাক্রান্ত, তাঁহার নাটকের ঘটনাসমূহ সাধারণতঃ রোমাঞ্চকর—দৃশ্যের পর দৃশ্যের ভিতর দিয়া পাঠককে রুদ্ধশ্বাসে অগ্রসর হইতে হয়। অতি-আধুনিক যুগে বাহ্য নাট্যিক ক্রিয়া অপেক্ষা যে অন্তর্দ্বন্দ্বের উপর জোর দেওয়া হইয়া থাকে—তাঁহার নাটক তাহা হইতেও বঞ্চিত নহে। রোমাঞ্চকর ঘটনা-প্রবাহের সঙ্গে নাটকীয় চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্বের বিশ্লেষণ তাঁহার নাটকের একটি প্রধান গুণ। বাহ্য ঘটনার বিক্ষোভ সৃষ্টির বিষয়ে তিনি যেমন বাংলা নাট্যসাহিত্যের আধুনিক যুগেব অন্তর্ভুক্ত দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যরচনাব ধারা অনুসরণ করিযাছেন, অন্তর্দ্বন্দ্বের বিশ্লেষণে তিনি তেমনই অতি-আধুনিক যুগের প্রতিনিধিত্ব করিয়াছেন। এই দিক দিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে একমাত্র তাঁহার মধ্য দিয়াই এই যুগে আধুনিক যুগের সঙ্গে অতি-আধুনিক যুগের সংযোগ রক্ষা পাইয়াছে বলিয়া মনে হইবে।

মন্মথ রায়ের সর্বপ্রথম পৌরাণিক নাটক 'চাঁদ সদাগর'। ইহার কাহিনী সুপরিচিত। মর্ত্যলোকে মনসাদেবীর পুজার প্রচারকে কেন্দ্র করিয়া যে পৌরাণিক আখ্যান প্রচলিত আছে এবং চাঁদ সদাগর ও মনসার সংঘর্ষের ফলে বেহুলা-লখীন্দরের জীবনের যে করুণ কাহিনী পরিশেষে মিলনান্তক উপসংহারে সমাপ্ত হইয়াছে, তাহাই এই নাটকের মূল উপজীব্য। এই নাটকে নাট্যকারের

চরিত্রাঙ্কন ও ঘটনা সংস্থাপনার দক্ষতা প্রশংসনীয়। দেবদ্রোহী চাঁদ সদাগরের চরিত্রের মধ্যে আধুনিক সমাজোচিত মনোভাবের অভিব্যক্তি দেখা যায়, তাহাই স্পষ্টতর করিয়া তুলিয়া নাট্যকার নাটকখানিকে যুগোপযোগী করিয়া লইয়াছেন। ইহার দুইটি প্রধান চরিত্র চাঁদ সদাগব ও বেহুলা। নাট্যকার ইহাদের মধ্য দিয়া যথার্থ শক্তি সঞ্চারিত কবিতে সমর্থ হইয়াছেন। চাঁদ সদাগরের দেবদ্রোহিতা এবং বেহুলার প্রচলিত বিধি নিয়মকে শিরোধার্য করিয়া লইতে অস্বীকৃতির ভিতর দিয়াই চরিত্র দুইটির আধুনিক মনোভাব বিকাশ পাইয়াছে।

বৈদিক কাহিনী অবলম্বন করিয়া মন্মথ রায়ের 'দেবাসুর' নামক পঞ্চাঙ্ক নাটক রচিত হইয়াছে। ইহাতে জাতিব মুক্তিযজ্ঞে মহর্ষি দধিচীর আত্ম-দানকে কেন্দ্র করিয়া বৈদিক কাহিনীর ভিত্তিতে একটি দেশাত্মবোধক নাটক সৃষ্ট হইয়াছে। লাঞ্ছিত নিপীড়িতের বক্ষপঞ্জরে যে বিক্ষোভের অগ্নি জ্বলিয়াছিল, তাহা বিদ্রোহের বজ্রশক্তি হইয়া অত্যাচাবীর বক্ষ বিদীর্ণ করিল। নাটকের সেইখানেই সমাপ্তি। ঘটনা সংস্থাপনার কৌশলে নাটকীয়তার সৃষ্টি হইয়াছে। বলাসুর, বৃত্রাসুর, দধীচি, শচী প্রভৃতি চরিত্রগুলি উল্লেখযোগ্য। মন্মথ রায় কেবল মাত্র নাট্যকার নহেন, তিনি যে পণ্ডিত ব্যক্তি এই নাটকে তাহারও পরিচয় পাওয়া যায়। সমগ্র মধ্যযুগ ব্যাপিয়া কৃত্তিবাস-কাশীরাম আশ্রয় করিয়া যে সকল বৈচিত্র্যহীন পৌরাণিক নাটক রচিত হইয়াছিল, অতি-আধুনিক যুগের এই পৌরাণিক নাটকখানিতে তাহার উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম সৃষ্টি হইল। নাট্যকার ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যের এক নূতন ক্ষেত্র সন্ধান করিয়া তাহা দ্বারাই তাঁহার নূতন পৌরাণিক নাটক রচনা করিলেন। বৈদিক বিষয়-বস্তু বাঙ্গালী দর্শকদিগের অপরিচিত ছিল, নাট্যকার ইহার ভিতর দিয়া বাঙ্গালী দর্শককে তাহার রহস্যলোকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করিলেন।

শ্রীবৎস ও চিন্তার সুপরিচিত পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বন করিয়া মন্মথ রায়ের 'শ্রীবৎস' নামক পঞ্চাঙ্ক নাটক রচিত হয়। শনির কোপদৃষ্টির ফলে রাজা শ্রীবৎসকে উপর্যুপরি যে লাঞ্ছনার আঘাত সহ্য করিতে হইয়াছিল, তাহারই মূলসূত্রগুলি অত্যন্ত নিপুণহাতে গ্রথিত করিয়া এই পরিবর্ধিত পৌরাণিক কাহিনীটি নাট্যকার অঙ্কিত করিয়াছেন। মধ্যযুগের পৌরাণিক নাটকগুলির মধ্যে বিষয়গত বৈচিত্র্য খুব বেশী ছিল না; তাহার প্রধান কারণ,

ভক্তির সুরটিকেই তাহাতে প্রাধান্য দিবার ফলে রাম এবং কৃষ্ণই প্রধানতঃ তাহাদের নায়ক হইত। কিন্তু অতি-আধুনিক যুগের পৌরাণিক নাটক হইতে ভক্তির সুরটি বিদূরিত হইয়া যাইবার ফলে বিষয়গত বৈচিত্র্য দেখা যাইতে লাগিল। 'শ্রীবৎস' কাহিনীর মধ্যে 'ভক্তি'র পরিবর্তে নিয়তি প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।

'শ্রীমদ্‌ভাগবতে'র কাহিনী অবলম্বনে মন্মথ রায়ের পৌরাণিক নাটক 'কারাগার' রচিত হইয়াছে। ভোজ বংশের নরপতি উগ্রসেনের পুত্র কংশ রাজা হইয়া নিষ্ঠুর অত্যাচারে যাদব কুলকে নিপীড়িত করিলেন। লাঞ্ছিত যাদবগণের আকুল প্রার্থনায় পরিত্রাতা ভগবান দুর্বৃত্তের কারাগারে জন্ম নিলেন। জন্ম নিলেন অরাতি নিধনের জন্য, অধর্মপ্লাবিত পৃথিবীতে ধর্ম স্থাপনের জন্য, দানব কংসকে ধ্বংস করিয়া পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের জন্য। ইহাই এ নাটকের আখ্যান-বস্তু।

এই নাটক যখন রচিত হয়, পরাধীন ভারতবর্ষে তখন আইন অমান্য আন্দোলন চলিতেছে; আইন অমান্য করিয়া দেশের কোটি কোটি লোক বিদেশী রাজের কারা বরণ করিতেছে। কারাগারে স্থান সঙ্কুলানের অভাব ঘটিল। বিদেশী রাজের কারাগার স্বদেশপ্রেমিকদের তীর্থক্ষেত্র হইয়া উঠিল। পরাধীন জাতির পুঞ্জীভূত বেদনা এবং ক্ষোভে জন্মলাভ করিল শক্তি। আন্দোলন সার্থক হইয়া উঠিল। তৎকালীন দুর্ব্যবস্থার বাস্তব রূপায়ণ এই নাটকে ঘটিয়াছিল বলিয়া এই নাটক জাতির মর্মস্পর্শ করিয়াছিল। কারাগারের জনপ্রিয়তা বিদেশী সরকারের শোষণ শক্তির ভিত টলাইয়াছিল, সেই জন্য রাজরোষে এই নাটকের অভিনয় নিষিদ্ধ হয়। বার্ণার্ড শ'য়ের 'সেণ্ট জোয়ানের' সঙ্গে এ নাটকের তুলনা চলে। চন্দনা, কঙ্কা, কঙ্কন এবং বিদুর নাট্যকারের অভিনব চরিত্র সৃজন।

সাবিত্রী ও সত্যবানের কাহিনী অবলম্বন করিয়া মন্মথ রায়ের 'সাবিত্রী' নাটক রচিত হয়। বিধিলিপি অগ্রাহ্য করিয়া কালান্তকের নিকট হইতে মৃত স্বামীর জীবন ফিরাইয়া আনিয়া তাহাকে পুনরায় সঞ্জীবিত করিয়া যে সীমন্তিনী সতীত্বের পরাকাষ্ঠায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছেন, সেই সাবিত্রীর পুরাতন অথচ অতি পরিচিত কাহিনীর মর্মগত সত্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া নাট্যকার ইহাকে এমন এক বেদনসুন্দর মধুররূপে রূপায়িত করিয়াছেন, যাহার স্নিগ্ধ সৌন্দর্য প্রত্যেক দৃশ্যে কৌতূহল ও করুণ রসের মধ্য দিয়া অনাড়ম্বরে সুরে

স্তরে বিকশিত হইয়া আনন্দাশ্রুপরিপ্লুত তৃপ্তিময় পরিণতি লাভ করিয়াছে। সাবিত্রী চরিত্রে তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রাম করিবার যে শক্তির পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা আধুনিক সমাজের নারীচরিত্রের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের পরিচায়ক। সুতরাং পৌরাণিক নাটক হইলেও ইহার একটি যুগোপযোগী সার্থকতা রহিয়াছে।

মন্মথ রায়ের পৌরাণিক কিংবদন্তীমূলক নাটক 'খনা'র বিষয়-বস্তু এই—বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার অন্যতম রত্ন জ্যোতিষার্ণব বরাহ। তাঁহার পুত্র সন্তান মিহির জন্মগ্রহণ করিলে আয়ু গণনার ভুলে শতায়ু পুত্রকে মাত্র দশ বৎসরের পরমায়ু দেখিয়া পিতা তাহাকে একটি তাম্রপাত্রে নদীতে ভাসাইয়া দেন। নাট্যকারের নিজ কল্পনা অনুযায়ী, মিহিরের জন্মলগ্নে জাত ক্রীতদাস ভৈরবের কন্যা মদনিকাকে অচেতন পত্নী ধরণীর ক্রোড়ে তুলিয়া দেন। মিহির ভাসিতে ভাসিতে সিংহলে উপনীত হয় এবং সিংহল-রাজার পালিত পুত্ররূপে যৌবনে পদার্পণ করে। জ্যোতিষশাস্ত্রে পরমবিদুষী সিংহল-রাজকন্যা খনার সহিত মিহিরের বিবাহ হয়, খনার গণনায় মিহির তাহার পিতৃপরিচয় লাভ করে। উভয়ে ভারতবর্ষে ফিরিয়া বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভায় আসিয়া জ্যোতিষ বিচারে বরাহকে পরাস্ত করেন। বরাহের সংসারে খনা ও মিহির আশ্রয় পাইলেন বটে, কিন্তু বহু নাটকীয় ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে খনাকে আত্মহত্যা করিতে হয়। কিংবদন্তীর ভিত্তিতে রচিত এবং নাট্যকারের কল্পনাপুষ্ট এই নাটকটি উচ্চাঙ্গের রচনা রূপে অভিনন্দন লাভ করিয়াছে।

মন্মথ রায়ের দক্ষযজ্ঞ বিষয়ক পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটক 'সতী'। ইহা সেই পুরাতন করুণ কাহিনীর একটি উজ্জ্বল নাট্যরূপ। একদিকে পিতা অপরদিকে স্বামীর আকর্ষণকে কেন্দ্র করিয়া যে নাট্য-সংঘর্ষ গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা নাট্যকারের দক্ষতায় মর্মস্পর্শী হইয়া উঠিয়াছে।

মন্মথ রায়ের কল্পনাশ্রয়ী নাটক 'বিদ্যুৎপর্ণা'। বৈষ্ণব-বিদ্বেষী এক শাক্ত নৃপতির উপর প্রতিহিংসা লইবার জন্য হৃষীকেশ মঠের বৈষ্ণব মোহান্ত এক বেদের পরম সুশ্রী শিশুকন্যাকে তিল তিল বিষ খাওয়াইয়া বিষকন্যায় পরিণত করেন—তাহার চুম্বনে বিষ, আলিঙ্গনে বিষ। সে যে বিষকন্যা, ইহা মোহান্ত ভিন্ন অন্য কেহ অবগত ছিল না। তাহার সংসর্গ মৃত্যুর কারণ হইতে পারে আশঙ্কায় তাহাকে মোহান্ত শিষ্যবর্গ হইতে দূরে

রাখেন। কিন্তু শিষ্য ইন্দ্রজিৎ এবং বিত্যুৎপর্ণার মধ্যে গভীর প্রেমের সঞ্চার হয়। বিত্যুৎপর্ণার রূপলাবণ্যের কথা অবগত হইয়া বৈষ্ণব-বিদ্বেষী রাজা মোহান্তের নিমন্ত্রণেই হৃষীকেশ মঠে আসিয়া উপস্থিত হন এবং বিত্যুৎপর্ণার চুম্বন আলিঙ্গনে রূপমুগ্ধ রাজা মৃত্যুমুখে পতিত হন। বিত্যুৎপর্ণা তখনই বুঝিতে পারে যে, সে বিষকন্যা এবং তখনই ইন্দ্রজিৎকে দূরে অপসারিত করিয়া নিজে নারায়ণ বিগ্রহ বুকে লইয়া তাহার অপূর্ব প্রেমের পরিসমাপ্তি ঘটায়।

'বিত্যুৎপর্ণা'র প্রায় অনুরূপ কাহিনী লইয়া রচিত 'রাজনটী'। রাজনটী মধুছন্দা এবং যুবরাজ চন্দ্রকীর্তির মধ্যে প্রণয় সঞ্চার হয়। এদিকে ত্রিপুর-রাজকন্যার সহিত চন্দ্রকীর্তির বিবাহ দিয়া মণিপুররাজ জয়সিংহ নিজ রাজ্যের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা রক্ষার ব্যবস্থা করেন। এই সময়ে নবদ্বীপ হইতে প্রভুপাদ ও কাশীশ্বর গোস্বামী শ্রীগৌরাঙ্গের পদধূলি লইয়া মণিপুর রাজ্যে শুভ পদার্পণ করেন। উদ্দেশ্য, প্রকৃত বৈষ্ণবকে ঐ পদধূলি দিয়া আশীর্বাদ করিবেন। চন্দ্রকীর্তি সিংহাসন তুচ্ছ করিয়া রাজনটীকে লইয়া নির্বাসনে যাইতে প্রস্তুত হন। ইহার পরিণামে বৈষ্ণব রাজ্য মণিপুর ত্রিপুর-রাজের রোষানলে ধ্বংস হইবে দেখিয়া রাধা-কৃষ্ণ-প্রেমভক্ত রাজনটীর নিকট যে ভিক্ষা চাহেন, তাহার পরিণামে রাজনটী ভান করে যে চন্দ্রকীর্তিকে সে ভালোবাসে না—তাহার প্রেম ছিল নটীসুলভ অভিনয় মাত্র। কাশীশ্বর রাজনটীর এই আত্মত্যাগে মুগ্ধ হইয়া তাহাকেই শ্রীচৈতন্যের পদধূলি দ্বারা আশীর্বাদ করেন। কিন্তু ইহাতে তাহাকে ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ জনতার হাত হইতে রক্ষা করিতে পারেন নাই। রাজনটী বিষপানে আত্মহত্যা করে।

মন্মথ রায়ের একান্ত রোমান্টিক নাটক 'রূপকথা'। কুবেরের অনুচর এক যক্ষ তাহার অভিশাপে মর্ত্যের এক মরুভূমিতে নির্বাসিত হয়। কোন মানবীর প্রেম লাভ করিলে সে অভিশাপমুক্ত হইয়া স্বর্গে যাইতে পারিবে, ইহাই ছিল কুবেরের বিধান। কিন্তু এই যক্ষ কোন নারীরই প্রেমলাভ করিতে সক্ষম হয় না। ফলে সে ক্ষিপ্ত হইয়া বহু নারীকে তাহার প্রাসাদে বন্দী করিয়া আনে এবং তাহাদের প্রেমলাভে বিফল হইয়া তাহাদিগকে পাষাণী মূর্তিতে পরিণত করিয়া রাখে। এই নাটকে এমনি এক বন্দিনী রাজ-কন্যার কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। যক্ষের কবল হইতে কি করিয়া তাহার প্রণয়ী রাজপুত্র এই রাজকন্যাকে উদ্ধার করে, এই কাহিনী ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

অভিশপ্ত যক্ষের মনোবেদনা এক বন্দিনী ক্রীতদাসীকে বিচলিত করে, তাহার প্রেমলাভ করিয়াই যক্ষও অভিশাপমুক্ত হয়।' ভারতীয় রূপকথার যাবতীয় উপাদানই এই নাটকে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। রাজপুত্র, রাজকন্যা, যক্ষ, সোনার কাঠি, রূপার কাঠি, প্রাণভোমরা, পক্ষিরাজ ঘোড়া, রাক্ষস খোক্কস প্রভৃতির সমাবেশে নাটকটির রূপকথা নামকরণও সার্থক হইয়াছে।

মন্মথ রায়ের 'আজব দেশ'ও রোমান্টিক কিংবদন্তীমূলক কাহিনী লইয়া রচিত। ইহা আজব দেশের কাহিনী। হবুচন্দ্র রাজাও আছে, গবুচন্দ্র মন্ত্রীও আছে সেখানে। আজব দেশবাসীও পরম আনন্দে নিশ্চিন্ত নির্দ্বিধায় দিন কাটাইতেছিল। কিন্তু ঝঞ্ঝাট হইল একটি লোককে লইয়া। ঘরে ঘরে সে এক ধূয়া তুলিয়া দিল—আলো চাই। নির্বোধ রাজার বুদ্ধিমান মন্ত্রী প্রমাদ গণিল। তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ জারী হইল। কিন্তু কোথায় সে? তাহাকে খুঁজিতে যাইয়াই স্পষ্ট হইয়া উঠিল, চতুর মন্ত্রীর নিপুণ হাতে সাজানো রাজ্যময় দুর্নীতির ইমাবতগুলি। জ্ঞানের আলোর স্পর্শে অজ্ঞানের তমিস্ররজনী অপসৃত হইল, ইহাই এই নাট্যের কাহিনী। ব্যঙ্গাত্মক আঙ্গিক, শ্লেষাত্মক সংলাপ এবং অন্তর্নিহিত বেদনাবোধ দিয়া নাটকটি বচিত হইয়াছে। রূপকাহিনীর মোড়কে মোড়া চরিত্রগুলি অত্যন্ত পরিচিত। কাহিনী এবং চরিত্র-বিন্যাসের কারুকর্মে এ নাটক বিশেষত্বপুর্ণ অনির্বচনীয় হইয়া উঠিয়াছে।

একটি কিংবদন্তীকে আশ্রয় করিয়া মন্মথ রায়ের 'রঘু ডাকাত' নাটকের বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে। 'দুর্বলের উপর প্রবলের অত্যাচার যখন ধৈর্যের সীমা অতিক্রম করে, তখন এমনি করিয়াই নিপীড়িত মানবাত্মার আর্তনাদের মধ্যে যুগে যুগে রঘুডাকাত জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এমনি এক রঘুডাকাত কি করিয়া প্রেমের পরশপাথর-স্পর্শে সন্ন্যাসীর জীবন বরণ করিল, তাহারই একটি মর্মস্পর্শী কাহিনী এই নাটকে রূপায়িত হইয়াছে।'

মন্মথ রায়ের পূর্ণাঙ্গ ঐতিহাসিক নাটক 'অশোক'। ধর্মপ্রবৃত্তি আর চণ্ডপ্রবৃত্তির মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্লান্ত পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নরপতি দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী সম্রাট্ অশোকের জীবনবেদকে কেন্দ্র করিয়া এই নাটক রচনা করা হইয়াছে। 'জীবন ভোগের নয়, জীবন ত্যাগের—অশোকের জীবনে শ্রীবুদ্ধের এই অবিনশ্বর বাণীর সার্থক প্রতিফলন ঘটিয়াছে।' তাঁহার জীবনে যে দুইটি পরস্পর-বিরোধী শক্তির সংঘর্ষ চলিয়াছে এবং পশুশক্তির প্রভাব মুক্ত

হইয়া পরিশেষে যে ভাবে অশোকের মগ্নচৈতন্যের আত্মবিকাশ ঘটিয়াছে, তাহাতে একটি উচ্চাঙ্গের নাটকই সৃষ্টির সুযোগ রহিয়াছে। ভাষানৈপুণ্য এবং প্রকাশভঙ্গীর বিশিষ্টতা মন্মথ রায়ের রচনাটিকে চিত্তাকর্ষক করিয়া তুলিয়াছে। ইতিপুর্বে গিরিশচন্দ্র অশোকের জীবন বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া যে নাটক রচনা করিয়াছিলেন, তাহা নানা দিক দিয়া অলৌকিকতা ভারাক্রান্ত হইয়াছিল; বিশেষতঃ তত্ত্বকথাও তাহার ভিতরে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল; কিন্তু মন্মথ রায়ের এই বিষয়ক রচনায় ঐতিহাসিক তথ্যকে অনুসরণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে অশোকের একটি মানবিক পরিচর্য উদ্ধার করিবার সার্থক প্রয়াস দেখা যায়—এখানেই ইহার বিশেষত্ব।

১৭৫৭ সনে পলাশীর প্রান্তরে বিশ্বাসঘাতকের দুরভিসন্ধি ও চাতুর্যে ভারতবর্ষের যে ভাগ্য রচিত হইয়াছিল, শেষ স্বাধীন নবাব মীর কাশীমের হৃদয়ে তাহারই প্রায়শ্চিত্তের প্রয়াসে বাংলার অতীত স্বাধীনতার সন্ধ্যাদীপ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল; তৎকালীন স্বার্থান্বেষী ভীরু বিশ্বাসঘাতকের দল তাহাকে নির্বাপিত করিয়া দিতে কুণ্ঠাবোধ করে নাই। সেই রক্তরাঙা অধ্যায়ের করুণরসঘন অথচ বীর্যদীপ্ত কাহিনীতে মন্মথ রায়ের 'মীর কাশীম' নাটক পরিপুষ্ট হইয়াছে। এই নাট্যের বিষয়বস্তু ইতিহাস-আশ্রিত। নাট্যকার প্রতিটি চরিত্রে এবং কাহিনীবিন্যাসে ঐতিহাসিক সত্য বিশেষ ক্ষুণ্ণ করেন নাই। পরাধীন ভারতে এই নাটক জাতির মর্মস্থানে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া দেশাত্মবোধে ভারতবাসীকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। এইখানেই এই নাটকের সার্থকতা।

ঐতিহাসিক বিষয় লইয়া মন্মথ রায়ের 'সাঁওতাল বিদ্রোহ' নাটক রচিত হয়। ১৮৫৪ সাল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্বকাল। ঘটনাস্থল তিনপাহাড়—সাঁওতাল পরগণা। দুইশত মাইল দূরে কলিকাতার সঙ্গে যোগাযোগের জন্য সাঁওতালরা রেলপথ তৈরীর কর্মে রত। কিন্তু দিনের পর দিন হিন্দু মহাজনদের নিষ্ঠুরতা এবং প্রবঞ্চনা সাঁওতালদের আশ্চর্য শক্তিতে উদ্বুদ্ধ করিল। তাহারা বিদ্রোহের চেতনায় দলবদ্ধ হইল। দশ হাজার সাঁওতাল যখন একসঙ্গে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল, বণিক ও শাসকের অচলায়তনের ভিত সেদিন থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু সমস্ত আন্দোলন ব্যর্থ করিয়া বণিকেরা আবার বাংলাদেশের ভাগ্যবিধাতা হইল। সাঁওতালেরা শাসকের বন্দুকের গুলির মুখে প্রাণ দিল, কিন্তু প্রতিবাদকে দীর্ঘজীবী করিয়া

রাখিয়া গেল। এমনি করিয়া নবতর আদর্শবাদকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া এ নাটক রচিত হইয়াছে। সংবেদনশীল কাহিনী ও সুন্দর চরিত্র সৃষ্টি ইহার বৈশিষ্ট্য। বাংলার প্রতিবেশী সাঁওতাল জাতির সঙ্গে বাঙ্গালীর সম্পর্কের কথা উল্লেখ করিয়া ইতিপূর্বে আর কোন বাংলা নাটক রচিত হয় নাই, অথচ ইহার মধ্যে নাটকীয় উপাদানের যে কিছুমাত্র অভাব নাই, মন্মথ রায়ের এই নাটকখানিই তাহার প্রমাণ। চরিত্রগুলির মধ্যে বাস্তব জীবন রূপায়ণের চেষ্টা ব্যর্থ হয় নাই।

মন্মথ রায়ের সর্বশেষ ঐতিহাসিক নাটক 'অমৃত অতীত'। অষ্টম শতাব্দীর গৌড়বঙ্গের পটভূমিতে এই নাট্যকাহিনীর বিস্তার। কি ভাবে দুর্নীতিক্লিষ্ট, বিশৃঙ্খল গৌড়রাজ্যে বীর্যবান গোপালদেব জনতার সাহায্যে প্রজাশোষণের সমাপ্তি ঘটান এবং একটি ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্রের সূচনা করেন, সেইটুকু লইয়াই এ নাটকের আখ্যানভাগ গড়িয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের রূপক নাটকের আঙ্গিকে এ নাটক রচিত। কৃতান্তক চরিত্রটি বর্তমানকালের নাট্যসাহিত্যের একটি নূতন পরিচয় দিয়াছে।

যাঁহারা মনে করেন, বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক নাটক রচনার যুগের অবসান হইয়াছে, তাঁহাদের অনুমান সত্য নহে। বরং ভারতবর্ষের ইতিহাসের যে অন্তহীন বৈচিত্র্য দেখা যায়, তাহা হইতে নাটকীয় উপকরণ সংগ্রহ করিয়া চিরকালই সার্থক ঐতিহাসিক নাটক রচনার সম্ভাবনা বর্তমান থাকিবে। এমন কি, ভারতবর্ষের বৃহত্তর ঐতিহাসিক পরিবেশের কথা বাদ দিলেও বাংলা দেশের ইতিহাসেও যে উপাদান আছে, তাহার বহু উপকরণই সার্থক বাংলা নাটকের ভিত্তি হইতে পারে। ইতিহাসের বিষয় নূতন করিয়া কোন দিনই পুরাতন হয় না, সুতরাং একই ঐতিহাসিক ভিত্তি অবলম্বন করিয়া বিভিন্ন নাট্যকার বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নাটক রচনারও সুযোগ লাভ করিতে পারেন। এক সম্রাট্ অশোকের জীবন ও চরিত্র ভিত্তি করিয়া বাংলা সাহিত্যেও একাধিক নাটক রচিত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও এই বিষয় অবলম্বন করিয়াই বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক রচিত হইতে পারে। সুতরাং ঐতিহাসিক নাটকের নামে যাঁহারা আজ নাসিকা কুঞ্চিত করেন, তাঁহাদের এই মনোভাব নিতান্ত অর্থহীন। বাংলা সাহিত্যেও আজ যে ঐতিহাসিক নাটক রচনার প্রেরণা হ্রাস পাইয়াছে, তাহাও বাংলা নাটকের পক্ষে একটি স্বাস্থ্যকর লক্ষণ নহে। এই অবস্থায় নাট্যকার মন্মথ রায় রচিত

ঐতিহাসিক নাটক 'অমৃত অতীত' সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার যোগ্য। ইতিহাসের মানুষের সঙ্গে আমাদের কালগত যে ব্যবধানই থাকুক না কেন, চিরন্তন মানবিক অনুভূতির দিক দিয়া ইহাদের সঙ্গে আমরা এক অখণ্ড যোগ অনুভব করিয়া থাকি। সুতরাং ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহের জন্য নহে, চিরন্তন মানুষের সঙ্গে পরিচয় লাভ করিবার জন্যই আমরা ঐতিহাসিক নাটকের দ্বারস্থ হইয়া থাকি। "অমৃত অতীত' ঐতিহাসিক পট-ভূমিকায় মানুষের চিরন্তন জীবন সম্পর্কে আমাদের কৌতূহল দূর করিতে ব্যর্থ হয় নাই ; সেইজন্যই আধুনিক যুগে ইহার আবেদন সার্থক হইয়াছে।

নাটকখানি আকারে ক্ষুদ্র ; কিন্তু বাংলার ইতিহাসের অন্ধকারময় যে যুগটিকে নাট্যকার আমাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত করিয়াছেন, তাহা বিচিত্র ও ঘটনাসঙ্কুল ছিল। অষ্টম শতাব্দীর বাংলার অরাজকতা ও গোপালদেব নামক ব্যক্তিকে রাজা নির্বাচিত করিয়া সেই অরাজকতার অবসানের বৃত্তান্ত ভিত্তি করিয়াই নাটকখানি রচিত। নাট্যকার ঐতিহাসিক পরিবেশটি ইহাতে যথাসাধ্য নিশ্ছিদ্র করিবারই প্রয়াস পাইয়াছেন। এই কার্যটি খুব সহজসাধ্য ছিল না ; কারণ, বর্তমান যে পরিবেশে আজ আমরা বাস করিতেছি, তাহার মধ্যে থাকিয়া এক হাজার বছরেরও আগেকার বাংলা দেশের সামাজিক পরিবেশের পরিকল্পনা সুগভীর অনুশীলন সাপেক্ষ। অথচ পরিবেশের সেই রহস্যঘন নিবিড়তা সৃষ্টি করিতে না পারিলে ইহার মধ্যে চরিত্রসৃষ্টিও সার্থকতা লাভ করিতে পারে না। ঐতিহাসিক নাটক রচনায় নাট্যকারকে অসির ধারের উপর দিয়া পথ চলিতে হয় ; কারণ, ঐতিহাসিক তথ্য-নির্দিষ্ট পরিবেশকে ক্ষুণ্ন না করিয়া তাঁহাকে চরিত্রের আচরণ ও সংলাপ রচনা করিতে হয়। তথ্যজ্ঞানের সঙ্গে উচ্চ কল্পনাশক্তির সংমিশ্রণ না হইলে এ কার্য কখনও সম্ভব হইতে পারে না। মন্মথ রায়ের মধ্যে একটি কল্পনাবিলাসী কবিপ্রাণও লুক্কায়িত আছে, কিন্তু ইতিহাসের পাঠকরূপে তিনি কল্পনার অবাধ অধিকারও স্বীকার করিতে পারেন নাই। সেইজন্য তাঁহার ঐতিহাসিক নাটকগুলি বিশেষ সার্থকতা লাভ করিতে পারে। তাঁহার 'অমৃত-অতীত'ও এই গৌরব হইতে বঞ্চিত হয় নাই।

এই নাটকের প্রধান চরিত্র রাণী ; তিনি গোপালের নিকট ইন্দিরা ও কৃতান্তকের নিকট মক্ষিরাণী। ইহা নাট্যকারের কল্পনা-প্রসূত একটি চরিত্র। ইহার একটি জটিল আচরণ নাটকের কাহিনীগত ঔৎসুক্য শেষ পর্যন্ত রক্ষা

করিয়াছে। নাটকটি মাত্র দুই অঙ্কে সমাপ্ত, কিন্তু ইহা দীর্ঘতর হইলে যে এই চরিত্রটি অধিকতর বিকাশ লাভ করিতে পারিত, তাহা অস্বীকার করা যায় না। বহু বিস্তৃত এবং জটিল ঘটনাকে এখানে নাট্যকার মাত্র দুটি দৃশ্যের ভিতর দিয়া সংহত করিয়াছেন। ইহা দ্বারা বহুমুখী ঘটনাকে নাট্যকাহিনীর একান্ত প্রয়োজন অনুযায়ী সংযত করিয়া লইবার প্রয়াস নাট্যকারের মধ্যে সাফল্য লাভ করিয়াছে। ঐতিহাসিক নাটকের ইহা একটি প্রধান গুণ, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও চরিত্রের পরিপূর্ণ বিকাশের পথে তাহা কোনও অন্তরায় সৃষ্টি করে কি না, তাহাও লক্ষ্য করা আবশ্যক। বাংলার সে যুগে নৈরাজ্যের সঙ্গে আধুনিক কালেরও যে কোন কোন বিষয়ে ঐক্য নির্দেশ করা হইয়াছে, তাহা কালাতিক্রমণের দোষ নহে—বরং একই অবস্থার অধীনস্থ সমাজের অনুরূপ চিন্তার ফল। নাটকখানির কাহিনী দৃঢ়সংবদ্ধ এবং সংলাপ শক্তিশালী।

১৯৫৩ সনে মন্মথ রায়ের সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ সামাজিক নাটক রচিত হয়, ইহার পূর্ব পর্যন্ত বহুসংখ্যক বিভিন্ন নাটক রচনার ভিতর দিয়া তাঁহার যে বিশিষ্ট একটি সংস্কার গড়িয়া উঠিয়াছে, সামাজিক নাটকগুলি প্রধানতঃ তাহার আঙ্গিক দ্বারাই রচিত হইয়াছিল। তথাপি ইহাদের মধ্য দিয়াও আধুনিক জীবন-বেদের অভিব্যক্তি দেখা যায়। তাঁহার প্রথম পূর্ণাঙ্গ সামাজিক নাটক—'মমতাময়ী হাসপাতাল।' ইহার কাহিনী এইরূপ—

ডাক্তার দীনদয়াল চৌধুরী মৃতা স্ত্রীর স্মৃতিকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য তাঁহার নামে একটি হাসপাতাল তৈয়ারী করিলেন—মমতাময়ী হাসপাতাল। বোর্ড অব ট্রাস্টির হাতে হাসপাতালের পরিচালনার ভার সমর্পণ করিয়া নিজে একজন সাধারণ চিকিৎসক হইয়া ঐ হাসপাতালেই চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। দীনদয়ালের একমাত্র পুত্র জয়ন্ত কলিকাতায় ডাক্তারি পড়ে। অকস্মাৎ কিছু অর্থের প্রয়োজনে 'বিবাহ করিয়াছে' এই মর্মে পিতাকে পত্র লেখে। এই সংবাদে নিজে কলিকাতায় বধূ দেখিতে উপস্থিত হইতে পারেন এই সম্ভাবনায় একটি উদীয়মানা চিত্রাভিনেত্রীকে কিঞ্চিৎ অর্থের বিনিময়ে জয়ন্ত একরাত্রি তাহার স্ত্রীর ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য চুক্তিবদ্ধ করিল। দীনদয়াল যথারীতি কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া পুত্রবধূ দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। এই আপনভোলা বৃদ্ধটিকে অভিনেত্রী জয়া মিত্রের ভালো লাগিয়া গেল। সে দীনদয়ালের সহিত মদনপুরে চলিয়া আসিল। এক রাত্রির প্রেমমুগ্ধ জয়ন্তও সেখানে আসিয়া

উপস্থিত হইল। তারপব মদনপুরে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া এক দুর্নিবার নাট্যপরিস্থিতির উদ্ভব হইল। জুনিয়ার ডাক্তারের লোভী মন দীনদয়ালকে উন্মাদ করিল। কিন্তু ধীরে ধীরে এই জটিল নাটকীয় পরিবেশের জাল ছিন্ন করিয়া মিলনান্ত সমাপ্তি রচিত হইল। করুণ রসঘন অথচ মিলনমধুর কাহিনীবিন্যাস, অপূর্ব সংলাপ রচনা নাটকটিকে উপভোগ্য করিয়া তুলিয়াছে।

তাঁহার পরবর্তী পুর্ণাঙ্গ সামাজিক নাটক 'জীবনটাই নাটক'। এই নাটকে অভিনব এক আঙ্গিকের মাধ্যমে মঞ্চশিল্পীদের জীবনযাত্রার আনন্দ ও বেদনা রূপায়িত হইয়াছে। "মঞ্চ ও নেপথ্যের আশ্চর্য সমন্বয়ের ফলে জীবনমঞ্চের উপরে জীবন রঙ্গেরও যোগাযোগ হইয়াছে। হাসি এবং অশ্রুর পাশাপাশি সমাবেশে নাটকটি আদ্যোপান্ত উপভোগ্য হইয়াছে।

আধুনিক শ্রমিক-মালিক সমস্যা কেন্দ্র করিযা মন্মথ রায়ের পুর্ণাঙ্গ সামাজিক নাটক 'ধর্মঘট' রচিত হয়। হিন্দু মুসলমান শ্রমিকের পরিশ্রমের স্বেদরক্তে স্ফীত ছাতার কারখানার মালিক দীনবন্ধু চৌধুরীর বিভিন্ন ছল চাতুরীতে ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে ধর্মঘট কি ভাবে মালিকের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে ভাঙিয়া যাইতে বসিয়াছিল, তাহারই এক সংঘাতপূর্ণ কাহিনী এ নাট্যের প্রাণকেন্দ্র। বেপরোয়া শ্রমিক মানুষগুলি সেই হীন ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া অবশেষে ধর্মঘটে অবতীর্ণ হইল। নাটকেরও সমাপ্তি হইল। নিতান্ত আধুনিক সমস্যার রূপায়ণের দিক দিয়া নাটকটি সার্থক বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়।

মন্মথ রাযের ত্রয়াঙ্ক সামাজিক নাটক 'মহাভারতী'। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ইহার কাহিনী গঠিত হইয়াছে।' ১৮৫৭ সনের সিপাহী বিদ্রোহের সুরু হইতে যে দুশ্চর সাধনার মধ্য দিয়া স্বদেশের মুক্তির জন্য বীরের রক্তস্রোত, মাতার অশ্রুধারা ক্ষরিত হইয়াছে এবং পরবর্তী কালে কী ভাবে রাত্রির তপস্যায় সুদিনের সূর্য উঠিয়াছে, একটি চাষী পরিবারের সেই বীর্যদীপ্ত কাহিনীই এ নাটকের প্রাণকেন্দ্র। নাট্যকার আশ্চর্য সংযমবোধের মধ্য দিয়া ইহা রচনা করিয়া এ নাটককে আগামীকালের ইতিহাসের পর্যায়ে উন্নীত করিয়াছেন। সেইখানেই ইহার সার্থকতা।

'চাষীর প্রেম' মন্মথ রায়ের পুর্ণাঙ্গ সামাজিক নাটক। গরীব হওয়ার পাপে যাহাদের সংসার ভাঙিয়া খানখান হইয়া যায়, তেমনি এক দরিদ্র চাষী অর্জুনের জীবনের করুণ কাহিনী এই নাটকের আখ্যানভাগ গড়িয়া তুলিয়াছে। অর্থের প্রয়োজনে অর্জুন এক বাইজীর বাদকরূপে দাসত্ব গ্রহণ করিল।

সাধ্বী স্ত্রী এবং শিশুপুত্রকে ত্যাগ করিয়া সে সেই বাইজীর প্রেমমুগ্ধ হইয়া কলিকাতায় প্রস্থান করিল। বাঁচিয়া থাকিবার যুদ্ধে স্ত্রী দুর্গা, পুত্র লক্ষ্মণ বিধ্বস্ত হইতে লাগিল। অবর্ণনীয় নাটকীয় ঘটনার সংঘাতের মধ্যে যখন অর্জুন বুঝিতে পারিল, সে প্রবঞ্চিত হইয়াছে, তখন আর তাহার ফিরিবার পথ রহিল না,—বাইজীকে হত্যা করিয়া তখন সে খুনী হইয়াছে। এক অশ্রুসজল পরিস্থিতির মধ্য দিয়া স্বামী কর্তৃক উপেক্ষিতা, কিন্তু সন্তানগর্বে গর্বিতা দুর্গার সংসার হইতে এমনি করিয়া একদিন অর্জুন ধীরে ধীরে সরিয়া গেল। এই নাটকে অশিক্ষিত মানুষগুলির প্রেমের গভীরতা নিপুণভাবে অঙ্কিত হইয়াছে।

মন্মথ রায়ের অদ্ভুত ফ্যাণ্টাসী 'উর্বশী নিরুদ্দেশ' নাটক। যে হেতু জীবনই শিল্প, সেইজন্য শিল্পের মৃত্যুতেই জীবনের মৃত্যু—এই তত্ত্বের ভিত্তিতেই এই নাটকের জন্ম। যুগোত্তীর্ণ কালোত্তীর্ণ শিল্পের প্রতীক উর্বশী স্বর্গ হইতে ভালোবাসার কামনায় আসিয়া মর্ত্যের মৃৎশিল্পী মৃন্ময় ভাস্করের উর্বশী মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করিল। কিন্তু স্বার্থপরতা এবং সংকীর্ণতার স্পর্শে মৃন্ময়ের শিল্প বিচূর্ণ হইল। উর্বশীকে ব্যর্থতা লইয়া স্বর্গে ফিরিয়া যাইতে হইল এবং সৃষ্টির ধ্বংসে শিল্পীর জীবনাবসান ঘটিল। এই নাটক আঙ্গিকের বৈশিষ্ট্যে বাংলার নাট্যসাহিত্যে অভিনব।

মন্মথ রায়ের ব্যঙ্গধর্মী পূর্ণাঙ্গ নাটক 'মরা হাতী লাখ টাকা'। সংসারের ঘানিতে চোখবাঁধা বলদের মত নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া জীবনের রস নিংড়াইয়া ফেলিয়াছে, এমনি এক কেরানী এককড়ি বসু ভাগ্যবিপর্যয়ে একখানি লটারীর টিকিটে একটি বৃদ্ধ হস্তী লাভ করিল। প্রতিদিন দুই বেলা অন্ন সংস্থান করা যাহাদের নিকট প্রায় বিলাস, হাতীর খোরাক জোগাইবার কথা তাহাদের নিকট আকাশকুসুম হইবে ইহাতে আশ্চর্য কী! সমস্ত পরিবারটিকে আত্মসাৎ করিলেও বোধ হয় এক বেলা হাতীর উদরপূর্তি ঘটে না। বাধ্য হইয়া কেরানী এককড়ি হাতীর মালিককে তাহার স্বত্ব প্রত্যাখ্যান করিয়া মুক্তি পাইল। নাট্যকার বর্তমান সমাজব্যবস্থাকে ব্যঙ্গের কশাঘাতে বিধ্বস্ত করিয়াছেন। হাসির অন্তরালে করুণ রসের ধারা মনকে সিক্ত করিয়া তোলে।

মন্মথ রায়ের সর্বশেষ পূর্ণাঙ্গ সামাজিক নাটক 'বন্দিতা'। বেনারসের কোনো স্থানীয় কলেজের অর্থনীতির অধ্যাপক সত্যশরণ রায়। তিনি গান্ধীপন্থী।

লোকশিক্ষা দানে তাঁহার প্রবল আগ্রহ। রবীন্দ্রনাথ নির্দেশিত সমবায় আন্দোলনের প্রচারে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। একমাত্র কন্যা তরুণী বন্দিতা আত্মভোলা পিতার উদারতার সুযোগে ভুলপথে চালিত হইল। অধ্যাপক রায়ের কোনো এক ছাত্রের প্রতি প্রেমের বিশ্বাসে কুমারী অবস্থাতেই সে সন্তান-সম্ভবা হয়। কাপুরুষ ছাত্রটির পলায়নে অনন্যোপায় হইয়া সত্যশরণ সপরিবারে দার্জিলিংয়ে পলায়ন করেন। এখানে বন্দিতা একটি কন্যা প্রসব করে এবং সত্যশরণের স্ত্রী ঘৃণায় লজ্জায় ও শোকে দেহত্যাগ করেন। কিছুকাল পরে অধ্যাপক রায় বারাসত কলেজে অধ্যাপনার কাজ সংগ্রহ করিয়া কন্যা এবং নাতনীকে লইয়া চলিয়া আসেন এবং দুইজনেই তাঁহার কন্যা এই কথা প্রচার করেন। তারপর আঠোরো বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। নাত্‌নী নন্দিতা বড হইয়াছে। সমবায় আন্দোলন আরও অগ্রগতির পথে আগাইয়া চলিয়াছে। অধ্যাপক রায়ের প্রিয় ছাত্র পার্থ এ কাজে তাঁহার প্রধান সহকর্মী। নন্দিতার সঙ্গে তাহার গভীব প্রেম। ঘটনাচক্রে জানা গেল, কুখ্যাত মহাজন কুবের সরকার পার্থের পিতা। যে মহাজনী বৃত্তির বিরুদ্ধে এই আন্দোলন, তাহার বীজ তাঁহার ঘরে অঙ্কুরিত হইতে চলিয়াছে। তিনি শঙ্কিত হইলেন। ইহার পর অত্যন্ত জটিল পরিস্থিতির মধ্য দিয়া পার্থের সহিত নন্দিতার বিবাহ হইল। নন্দিতা অর্থকেই মোক্ষ জানাতে পার্থের সহিত গভীর মতবিরোধ ঘটিল। প্রবল নাটকীয় সংঘাতের মধ্যে অধ্যাপক বায়ের মৃত্যু এবং নন্দিতাব পিতার প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়া এই নাট্যের যবনিকা নামিল। রবীন্দ্রনাথের মতাদর্শ এবং এক সামাজিক জীবনের অন্ধকারাচ্ছন্ন সমস্যাকে নাট্যকার এই নাটকের কাহিনীগ্রন্থনে একত্র মিলাইয়াছেন।

মন্মথ রায় বাংলা সাহিত্যে আধুনিক একাঙ্ক নাটকের জন্মদাতা। যে সকল গুণে নাটক যথার্থ একাঙ্ক নাটকের রসোত্তীর্ণ হইয়া থাকে, প্রথম হইতেই তাঁহার রচনায় সেই গুণ প্রকাশ পাইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে একাঙ্ক নাটক রচয়িতা রূপেই মন্মথ রায় বাংলা সাহিত্যে প্রথম আবির্ভূত হন। ১৯২৩ সনে যখন তাঁহার প্রথম একাঙ্ক নাটক 'মুক্তির ডাক' প্রকাশিত হয়, তখনই তদানীন্তন বাংলার শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-সমালোচক বীরবল বা প্রমথ চৌধুরী তাঁহার সেই প্রচেষ্টার প্রতি অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। ১৯২৩ সনের ২৪শে ডিসেম্বর ষ্টার থিয়েটারে তাঁহার সেই নাটক প্রথম অভিনীত হয়। তদবধি

তাঁহার একাঙ্ক নাটক রচনা অবিরাম অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। বাঙ্গালী পাঠক কিংবা দর্শক সমাজ যখন এই বিশিষ্ট সাহিত্যরূপটি সম্পর্কে সচেতন হইতে পারে নাই, তখন হইতেই তিনি বাংলা সাহিত্যে একাঙ্ক নাটক রচনা করিয়া ইহার একটি ধারার প্রবর্তন করিয়াছেন। আজ বাংলা একাঙ্ক নাটক যে জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে, তাহার মূলে তাঁহার এই অপরিসীম দানের কথা কিছুতেই বিস্মৃত হওয়া যায় না।

মন্মথ রায়ের প্রথম একাঙ্ক নাটক 'মুক্তির ডাক' এক বৌদ্ধ আখ্যায়িকা কেন্দ্র করিয়া রচিত হইয়াছে। নগরনটী অম্বার প্রেমমুগ্ধ হইয়া হৃতসর্বস্ব শ্রেষ্ঠিযুবক সুন্দরক তাঁহাকে নিজগৃহে আমন্ত্রণ জানাইল এবং অম্বার দর্শনী দশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা স্ত্রীধন উত্তরাধিকারিণী পত্নী পদ্মার নিকট দাবী করিল। স্বামি-প্রেম-উপেক্ষিতা পদ্মা অস্বীকৃতা হওয়ায় সুন্দরক স্বামিত্বের অধিকারে তাহার যথাসর্বস্ব অম্বাকে দান করে। এমন সময় সেই গৃহে অম্বার প্রণয়ী নৃপতি বিম্বিসার প্রবেশ করিলেন। তিনি মর্মযন্ত্রণায় কাতর হইয়া এক নিদারুণ সত্য প্রকাশ করিলেন। জানা গেল, পদ্মা বিম্বিসার-অম্বার অবৈধ সন্তান। তাহার জন্মের অনতিকাল পরে অম্বা তাহাকে তাহার পূর্বতন স্বামী সুচিত্রের গৃহে পরিত্যাগ করিয়া বিম্বিসারের সহিত পলায়ন করে। সুচিত্র তাহাকে মানুষ করেন এবং সুন্দরকের সহিত তাহার বিবাহ দিয়া নিজে সংসার ত্যাগ করিয়া বৌদ্ধ ভিক্ষু হন। এই ঘটনার মধ্যে তিনিও উপস্থিত হইয়াছেন। অনুতপ্ত অম্বা তখন বেণুবনে ভগবান বুদ্ধের চরণ আশ্রয় করিতে ছুটিয়া যান। শ্রীবুদ্ধ তাঁহাকে আশীর্বাদ করেন, এই খানেই নাটকের যবনিকা। আশ্চর্য ঘটনাবিন্যাস এবং চরিত্র-সৃষ্টি এ নাট্যের প্রাণসম্পদ। 'সবুজ পত্র' সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী 'মুক্তির ডাক'কে একখানা 'যথার্থ ড্রামা' বলিয়া গিয়াছেন।

এক বৌদ্ধ কাহিনী অবলম্বন করিয়া 'রাজপুরী' একাঙ্ক নাটক রচিত হইয়াছে। কোশলরাজ তলোয়ারের জোরে শাক্যবংশের কন্যা বিবাহ করিয়া কুলীন হইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু বিবাহের ষোলো বৎসর পরে জানা গেল যে, কপিলাবস্তুর এক নর্তকী-কন্যাকেই রাজা ভ্রমক্রমে বিবাহ করিয়াছেন। এদিকে এই দীর্ঘ ষোড়শ বৎসর ধরিয়া প্রতি মুহূর্তে রাণী মিথ্যা ছলনার অন্তর্জ্বালা অনুভব করিয়াছেন। এই অসহনীয় যন্ত্রণা হইতে মুক্তি পাইবার জন্য তিনি কৌশলে রাজার নিকট হইতে নির্বাসন দণ্ড ভিক্ষা করিয়া রাজপুরী

পরিত্যাগ করিলেন, তারপর শাক্যমুনির আশ্রমে প্রস্থান করিলেন। এদিকে ক্ষুব্ধ যুবরাজ শাক্যদের হত্যার নির্দেশ দিয়াছিলেন—রাণী তাঁহার ছিন্নশির যুবরাজের নিকট প্রেরণ করিয়া শাক্যঋষিগণকে রক্ষা করিলেন এবং রাজপুরীর মিথ্যা পদমর্যাদার আভিজাত্যকে চরম আঘাত হানিলেন। ঘটনার বিন্যাস এবং চরিত্রসৃষ্টি এই নাটকের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য।"

পুরাণ ও ইতিহাস হইতে এ যাবৎ বাংলা নাট্যকারগণ কেবলই পূর্ণাঙ্গ নাটকের বিস্তৃত কাহিনীর সন্ধান করিয়াছেন, কিন্তু ইহাদের মধ্যেও একাঙ্ক নাটকের উপাদানের যে সন্ধান পাওয়া যায়, তাহার সংবাদ কেহই রাখিতেন না। রবীন্দ্রনাথ বৌদ্ধ কাহিনী অবলম্বন করিয়া খণ্ড কাব্য রচনা করিলেও তাহা দ্বারা যে নাটক রচনা করিয়াছেন, তাহাদের প্রত্যেকটিই পূর্ণাঙ্গ। সুতরাং হিন্দু ও বৌদ্ধ পুরাণ হইতে একাঙ্ক নাটক রচনার সার্থক উপাদান সংগ্রহের কৃতিত্ব একমাত্র মন্মথ রায়েরই প্রাপ্য।

মন্মথ রায়ের সামাজিক একাঙ্ক নাটিকা 'যজ্ঞফল'। জমিদার কালিকাপ্রসাদ পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিলেন। মহাতান্ত্রিক গুরুদেবের সফল সাধনায়, অক্লান্ত-পরিশ্রমের যজ্ঞফলে হৈম পুত্রবতী হইলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে পুত্রের জন্মলগ্নের পরই হৈমর মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটিল। চিকিৎসকের পরামর্শে পুত্রকে কালিকাপ্রসাদ তাহার মাসীর নিকট প্রেরণ করিলেন। হৈমবতী সুস্থ হইলেন। তারপর দীর্ঘ বিশ বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে। নিজেকে অপুত্রক মনে করিয়া হৈম একটি পোষ্য লইবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। কালিকাপ্রসাদ জানাইলেন, তাহার পুত্র মাসীর নিকট মানুষ হইতেছে। হৈমবতী পুত্রকে দেখিবার জন্য উতলা হইলেন। মা-কে প্রণাম করিবার জন্য পুত্র আসিতেই হৈমবতী তাহার দেহে গুরুদেবের যৌবনকে দেখিতে পাইয়া আতঙ্কে গুলি করেন এবং সেইখানেই নাট্যের সমাপ্তি ঘটে। ইহাতে যাগযজ্ঞের আড়ালে, স্বামী স্ত্রীর সরলতার সুযোগে তান্ত্রিক গুরুর ব্যভিচারের রূপ এবং তাহার শয়তানীর প্রকৃতি অত্যন্ত প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। মনস্তাত্ত্বিক অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং তাহার বিশ্লেষণে যে নাট্যসংঘর্ষের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে সামাজিক প্রবঞ্চনার আর একটি দিক অত্যন্ত প্রকটভাবে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে।

'লক্ষহীরা' মন্মথ রায়ের কিংবদন্তীমূলক একাঙ্ক নাটক। যৌবনমদমত্তা দেহবিলাসিনী রাজনটী লক্ষহীরা। যাহার চরণতলে সর্বস্ব লুটাইয়া দিয়া রাজা ধন্য সেই লক্ষহীরার রূপে এক গলিতকুষ্ঠব্যাধি-আক্রান্ত দরিদ্র যুবক কামার্ত

হইয়াছে। পতিব্রতা স্ত্রী অদিতি হতভাগ্য স্বামীর কামনাকে রূপ দিয়া তাহাকে শান্তি দিবার জন্য নিজের আলুলায়িত কেশ বেশকারের নিকট বিক্রয় করিল ; তাহা দ্বারা সেই রাজনটীর দর্শনী একশত এক স্বর্ণমুদ্রা সংগ্রহ করিয়া লক্ষহীরার প্রাসাদ দ্বারে উপস্থিত হইল। সন্ন্যাসী চন্দনদত্ত অদিতির পাতিব্রত্য দর্শনে ব্যাধি-গ্রস্ত যুবকের কামনা চরিতার্থের জন্য লক্ষহীরাকে অনুরোধ জানাইল। ঘৃণায় রাজনটী লক্ষহীরা চীৎকার করিয়া উঠিল। যে সমাজ স্বামীর বিকৃত কামনাকে চরিতার্থ করিবার জন্য স্ত্রীর দেহপাতকে পতিভক্তি বলিয়া বাহাদুরী জানায়, সেই ঘৃণ্য সমাজের সঙ্গে তাহার কোনো সম্পর্ক নাই বলিয়া সে গর্বিত। এইখানেই যবনিকা। চন্দনদত্ত যেন তৎকালীন সমাজের প্রতিচ্ছবি ; লক্ষহীরা যেন নাট্যকারের আদর্শের মুখপাত্র। তাঁহার প্রতিটি শব্দ ব্যঙ্গে কৌতুকে আঘাতে বেদনায় সমাজের মিথ্যা ন্যায়ের ধ্বজাকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়াছে।"

মন্মথ রায়ের আর একখানি সামাজিক একাঙ্ক নাটিকা 'উপচার'। তারা এবং তারানাথ, ভৈরব ভৈরবী। গ্রামের প্রান্তে পঞ্চবটীতলায় আশ্রম করিয়া বসবাস করিতেছে। তারানাথ রুগ্ন, মুমূর্ষু। তারা যৌবনবতী এবং সুস্থ। বে-ওয়ারিশ মনে করিয়া গ্রামের অসুস্থ মনোভাবাপন্ন কিছু লোকের মমত্ববোধ তারা ভৈরবীর জন্য প্রায়শই জাগিয়া ওঠে। গ্রামের জমিদারের একমাত্র মৃতপ্রায় পুত্রের আরোগ্য কামনায় দুর্গা পূজার আয়োজন হইয়াছে। মহাষ্টমীর দিনে জানা গেল, দেবীস্নানের জন্য বেশ্যাদ্বারমৃত্তিকা পাওয়া যাইতেছে না। গভীর রাত্রে নায়েব হইতে জমিদার পর্যন্ত ভৈরবীর নিকট কুৎসিত প্রস্তাব লইয়া উপস্থিত হয়। যৌবন-উচ্ছলা সেই অবলা নারীর সামান্য দেহদানে যদি দেবীর মহাস্নান সুসম্পন্ন হয়, তবে তাহাতে দ্বিধাগ্রস্ত হওয়া অনুচিত, ইহা বুঝাইবার চেষ্টা তাহাদের চলে। পশুশক্তির নিকট হইতে নারীধর্মরক্ষার লড়াইয়ের মধ্যে এই নাট্যের পরিসমাপ্তি। এই নাটিকায় তৎকালীন বিকৃত সামাজিক রূপের প্রতিফলন ঘটিয়াছে। সামান্য কয়েকটি শ্লেষাত্মক তুলির টানে শক্তিশালী গ্রামীণ লোভী পশুদের মুখোস খুলিয়া গিয়াছে।

'কানাই বলাই' মন্মথ রায়ের সামাজিক একাঙ্ক নাটিকা। বলাই অধিকারী আর কানাই চৌধুরী, সম্পর্কে দুই ভায়রা। বলাইয়ের স্ত্রী চণ্ডী অত্যন্ত কুটিলা এবং মুখরা। কানাইয়ের স্ত্রী দুর্গা সরল এবং শান্ত। বলাই এবং কানাই পুরী বেড়াইতে গিয়া একটি অসুন্দর, অসুস্থা জমিদার কন্যার প্রেম

সংক্রান্ত ঘটনায় জড়াইয়া পড়ে। ঘটনার নায়ক বলাই। কিন্তু মুখরা স্ত্রীর ভয়ে নিজের নাম গোপন করিয়া কানাইয়ের নাম জানায়। জমিদার কন্যাটি সরল বিশ্বাসে কানাইয়ের নামে সমস্ত পত্রাদি পাঠায়। সংসারে ইহা লইয়া তুমুল অশান্তি সৃষ্টি হয়। চণ্ডী স্বামীর সৎচরিত্র প্রমাণের জন্য কানাইকেই দোষী সাব্যস্ত করে। এই চরম মুহূর্তে একটি পত্রে নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটে। বলাইয়ের প্রেমলুব্ধা সেই অসুস্থা জমিদার তনয়াটি তাহার বিরহে দেহরক্ষা করিয়াছে এবং তাহার দশলক্ষ টাকার সম্পত্তি বলাইকে ওরফে কানাই চৌধুরীকে উইল করিয়া দিয়া গিয়াছে। বলাইয়ের স্ত্রী চণ্ডীর তখন স্বামীর সৎচরিত্র প্রমাণের জন্য ক্ষোভের আর অন্ত থাকে না। এক অচিন্ত্যপূর্ব কৌতুকরসমধুর ঘটনাবিন্যাসে এ নাটিকাটি শোভন সুন্দর হইয়াছে।

'অসাধারণ' মন্মথ রায়ের একটি সামাজিক একাঙ্ক নাটিকা। অর্থনৈতিক অক্ষমতা কতখানি নির্মম আঘাত হানিতে পারে, তাহারই এক বাস্তব করুণ চিত্র 'অসাধারণের' কাহিনী গড়িয়াছে। আদর্শবাদী এক অধ্যাপকের স্ত্রী সামান্য মার্কশিটের গোঁজামিলে শহরের বিখ্যাত ব্যারিস্টারের একমাত্র সন্তানকে তিন হাজার রৌপ্যমুদ্রার বিনিময়ে পাশ করাইয়া সংসারে সচ্ছলতা আনিবার চেষ্টা করিল। কারণ, তাঁহার মতে বর্তমান সমাজে কাঞ্চন-কৌলীন্যকে অগ্রাহ্য করা যায় না। অধ্যাপকের আদর্শবাদে আঘাত লাগে। এই সংঘাতের পরিণতিতেই নাটকের যবনিকা। কাহিনী-গ্রন্থন ও চরিত্র-বিশ্লেষণ এ নাট্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

'অর্কেস্ট্রা' নিম্নমধ্যবিত্ত এক বাঙালী পরিবারের সুখদুঃখবিজড়িত দারিদ্র্য-সংঘাতের টানাপোড়েনে বিব্রত জীবনযাত্রার কাহিনী। দেড়শো টাকা মাহিনার কনিষ্ঠ কেরানী মহারাজ মিত্রের দুইটি ছেলে, দুইটি মেয়ে আর স্ত্রীকে লইয়া সংসার। যক্ষ্মারোগাক্রান্ত জ্যেষ্ঠপুত্র ক্রশওয়ার্ড পাজল-এ অবসর কাটায় এবং আঙিনার মাধবীলতার গাছে ফুল ফোটাইবার প্রাণপণ প্রয়াস পায়। সেই ক্রশওয়ার্ড হইতে একদিন বড়ো মেয়ে জয়ন্তীর নামে বিশ হাজার টাকার পুরস্কারের খবর পাওয়া যায়। পরিবারে সুখের বন্যা; কিন্তু ভাগ্যবিপর্যয়ে দুঃসংবাদ আসে, এ জয়ন্তী সে জয়ন্তী নয়। ঠিকানা ভুল ছাপা হইয়াছিল। সুখের আলো মুহূর্তের জন্য নিভিয়া যায়। কিন্তু দারিদ্র্য তাহাদের ম্লান করিতে পারে না। দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্য দিয়া নবজীবনে উত্তরণের শপথে

নাটকে যবনিকা নামে। নাটিকার প্রতিটি মুহূর্ত হাসি-কান্নার দোলায় স্পন্দিত।

ভারতবর্ষের সর্বাপেক্ষা কমসংখ্যক এবং অবহেলিত উপজাতি টোটোদের জীবন লইয়া 'টোটোপাড়া' নাটক রচিত হইয়াছে। তাহাদের লোকসংখ্যা মাত্র তিনশত চৌদ্দজন, চাষই ইহাদের প্রধান উপজীবিকা। নাট্যকার অখ্যাত উপজাতিটির সুখদুঃখকে অত্যন্ত দরদী মন লইয়া আঁকিয়াছেন। এমনি এক পরিবার। দুই ভাই পেস্তা আর লাবেজ। তাহাদের দুই স্ত্রী, যমনা আর কুপিনী। সন্তান-সম্ভবা সুখী কুপিনীকে দেখিয়া নিঃসন্তান যমনার তৃষ্ণা বৃদ্ধি পায়। স্বামীর সুখের সংসারে অশান্তির আগুন জ্বলে। ন্যায়ের দণ্ড হাতে লইয়া সমাজপতি আসেন। তাহার আঘাতে পেস্তা-লাবেজের ছোট্ট সংসারটিতে বিপর্যয় ঘটে। যৌবনের অতৃপ্ত অগ্নিদাহ অস্বীকৃতি পাওয়ায় নাটকে তীব্র দ্বন্দ্ব সংঘাতের মধ্যে আশ্চর্য কৌশলে ছেদ নামে। নাট্য-পরিস্থিতি ও চরিত্র-সৃষ্টি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। মন্মথ রায় তাঁহার 'সাঁওতাল বিদ্রোহ' নাটকের ভিতর দিয়া বাংলার আদিবাসী সমাজের যে বাস্তব জীবন-পরিচয় প্রকাশ করিয়াছিলেন, ইহার মধ্য দিয়াও তাহারই অভিব্যক্তি দেখা যায়। মন্মথ রায়ের এই নাটকগুলির ভিতর দিয়া তাঁহার মধ্য হইতে রোমাণ্টিক চেতনার অবসান হইয়া কি ভাবে যে বাস্তব জীবন চেতনার বিকাশ হইতেছে, তাহা অনুভব করিতে পারা যায়।

মন্মথ রায়ের 'উল্কাপাত' একখানি রোমাণ্টিক-ধর্মী সামাজিক একাঙ্ক নাটিকা। লৌকিক এবং পারলৌকিক জীবনের জটিল দ্বন্দ্বসংঘাত এই নাটিকার প্রধান উপজীব্য। স্বামীর ব্যভিচার আর অবৈধ প্রণয়ের কুফল স্বাধ্বী স্ত্রী পরলোকে গিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। পরলোকবাসী স্বামীও তাহার কোনো সুযুক্তিপূর্ণ জবাব দিতে পারেন নাই। মানসচক্ষে সন্তানের একই অঙ্গে বিবাহ এবং মৃত্যুর অশুভযোগ দেখিতে পাইয়া পরলোকবাসী মাতাপিতা ইহলোকে অবতীর্ণ হন। মৃত পিতা তাঁহার অবৈধপ্রণয় কাহিনী জীবিতকাল পর্যন্ত গোপন রাখার ফলে কানীন কন্যার সহিত নিজ পুত্রের প্রেম ঘটে এবং তাহার বিষময় ফলস্বরূপ বৈধ পুত্রের অন্যত্র বিবাহ এবং অবৈধ কন্যার আত্মহত্যা নাটকের উপসংহার টানে। বর্তমান সামাজিক নীতির পঙ্গুতাকে এই ব্যঙ্গাত্মক কাহিনীর মাধ্যমে চরম কশাঘাত হানা হইয়াছে। ইহার আঙ্গিক সম্পূর্ণ নূতন ধরনের।

বিগত প্রায় চল্লিশ বৎসর ধরিয়া মন্মথ রায় যে অংসখ্য একাঙ্ক নাটক রচনা করিয়া বাংলা সাহিত্যের বিশেষ একটি সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছেন, তাহার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় প্রকাশ করা এখানে অসম্ভব। এখানে কেবল মাত্র কয়েকটির পরিচয় প্রকাশ করা গেল। মন্মথ রায় নিষ্ঠাবান্ নাট্যকার। বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য অনেক নাট্যকারের মত তিনি সাহিত্যের অন্যান্য রূপ-সৃষ্টি লইয়া কদাচ পরীক্ষা করিতে যান নাই, কিংবা নাটক রচনা তাঁহার বিলাস মাত্র নহে। তিনি তাঁহার জীবনের সমগ্র রস-সাধনার মধ্যে একমাত্র নাট্যরূপটিকেই গ্রহণ করিয়াছেন, নানা ভাবে ইহার অনুশীলন করিয়াছেন, ইহার মধ্য দিয়া অফুরন্ত বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়াছেন। ব্যবসায়ী রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট না থাকিয়াও তিনি বাংলা সাহিত্যে সর্বাধিক নাটক রচনার গৌরব লাভ করিয়াছেন।

অতি-আধুনিক নাট্যকারদিগের মধ্যে রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে দীর্ঘকাল সংশ্লিষ্ট থাকিয়া যাঁহারা ইহারই প্রয়োজনীয়তা সিদ্ধ করিবার জন্য নাটক রচনা করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত সর্বপ্রধান। অতি-আধুনিক মঞ্চ-ব্যবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহার সকল নাটকই রচিত হইয়াছে বলিয়া ইহাদের বহিরঙ্গ পরিচয়ের মধ্য দিয়া একটি নির্দিষ্ট রূপ গড়িয়া উঠিয়াছে। ঐতিহাসিক এবং সামাজিক উভয় শ্রেণীর নাটকেই তাঁহার অনুরূপ আঙ্গিক ব্যবহৃত হইয়াছে। ঐতিহাসিক বিষয়বস্তুর ভিতর দিয়া তাঁহার অতি-আধুনিক মনোভাবই ব্যক্ত হইয়াছে। তাঁহার 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকে গিরিশচন্দ্রের 'সিরাজদ্দৌলা'র কয়েকটি ত্রুটি সংশোধিত হইলেও তিনি অন্যান্য বিষয়ে গিরিশচন্দ্রের প্রভাব ইহাতে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারেন নাই। তথ্যের প্রতি তিনি গিরিশচন্দ্র অপেক্ষা অধিক আনুগত্য দেখাইয়াছেন, তাহা বলিতে পারা যায় না। বাংলার জাতীয় জীবনে হিন্দু-মুসলমান মিলনাদর্শের উপর তিনি অধিকতর জোর দিয়াছেন। আধুনিক দেশাত্মবোধের আদর্শ অবলম্বন করিয়া শচীন্দ্রনাথ তাঁহার 'গৈরিক পতাকা' নাটক রচনা করিয়াছেন। শিবাজীর নেতৃত্বে মহারাষ্ট্র জাতির অভ্যুত্থানের ইতিহাস লইয়া ইহা রচিত। ভারত-সম্রাট্ সাজাহানের পুত্র দারার উদার ধর্মবোধের সঙ্গে আওরঙ্গজেবের ধর্মবিষয়ক গোঁড়ামির সাংঘাতের সৃষ্টি করিয়া তাঁহার 'রাষ্ট্রবিপ্লব' নামক ঐতিহাসিক নাটক রচিত হইয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলালের 'সাজাহান' নাটকের প্রভাব ইহার মধ্যে সুস্পষ্ট হইয়া রহিয়াছে। সুপরিচিত রাজপুত কাহিনী

অবলম্বন করিয়া শচীন্দ্রনাথের 'ধাত্রী পান্না' নামক ঐতিহাসিক নাটক রচিত হয়। ইহার কাহিনীর মধ্যে যে নাটকীয় দ্বন্দ্ব আছে, নাট্যকার এখানে তাহার সদ্ব্যবহার করিতে পারিয়াছেন বলিয়াই মনে হইবে। পরস্পর বিপরীতধর্মী চরিত্রগুলির বিরোধ সুস্পষ্ট করিয়া তুলিবার জন্য ইহার নাটকীয় আকর্ষণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। শচীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক নাটকগুলির মধ্যে 'আবুল হাসান', 'রাষ্ট্রবিপ্লব', 'কামাল আতাতুর্ক', 'বাংলার প্রতাপ' ইত্যাদিও উল্লেখযোগ্য রচনা। কাহিনীর দৃঢ়সংবদ্ধতা ও শক্তিশালী সংলাপ তাঁহার প্রত্যেকটি ঐতিহাসিক নাটকেরই বৈশিষ্ট্য।

শচীন্দ্রনাথের সামাজিক নাটকগুলির মধ্য দিয়া অতি-আধুনিক নাগরিক সমাজের পটভূমিকায় ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনের বিচিত্র সমস্যা রূপায়িত করিবার প্রয়াস দেখা যায়। কিন্তু সমস্যাগুলি বাস্তব জীবন হইতে অনেক ক্ষেত্রেই সংগৃহীত নহে—মানব-চরিত্র সম্পর্কিত পুঁথিলব্ধ জ্ঞান হইতে পরিকল্পিত। সেইজন্য তাঁহার অধিকাংশ সমস্যারই বাস্তব আবেদন খুব সার্থক হইতে পারে নাই। অতি-আধুনিক উচ্চশিক্ষিত নাগরিক সমাজের অন্তর্মুখীন পরিচয় যতই প্রত্যক্ষ হইবে, ততই এই বিষয়ক নাটক রচনায় সার্থকতা লাভ করা যাইবে; কিন্তু এই সম্পর্কিত কোন অনুমানাত্মক পরিকল্পনা দ্বারা কোনও সার্থক নাটক সৃষ্টি করা যাইতে পারিবে না। ভাবের সঙ্গে বস্তুর সামঞ্জস্যের অভাবে তাঁহার অধিকাংশ সামাজিক নাটকই যথার্থ রসোত্তীর্ণ হইয়াছে বলিয়া মনে হইতে পারে না। মনোবিজ্ঞানের দুই একটি অতি-আধুনিক তত্ত্বের উপর নির্ভর করিয়া তিনি দুই একখানি সামাজিক নাটক রচনা করিয়াছেন, কিন্তু ইহাদের মধ্যেও সর্বত্র তত্ত্বের সঙ্গে বস্তুর যথার্থ সামঞ্জস্য-সাধন সম্ভব হয় নাই। সেইজন্য তাঁহার সামাজিক নাটক সাময়িক আবেদন মাত্র সৃষ্টি করিলেও সাহিত্যের মধ্যে স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে নাই। শচীন্দ্রনাথের সামাজিক ও পারিবারিক নাটকগুলির মধ্যে 'রক্তকমল', 'ঝড়ের রাতে', 'জননী', 'স্বামী-স্ত্রী', 'কালের দাবী', 'তটিনীর বিচার', 'নার্সিং হোম', 'সুপ্রিয়ার কীর্তি', 'মাটির মায়া', 'কালো টাকা' প্রভৃতি নাটক উল্লেখযোগ্য। শচীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক বা দেশাত্মবোধক নাটকের সংখ্যাও অল্প নহে, ইহাদের মধ্যে 'দশের দাবী', 'নর-দেবতা', 'সংগ্রাম ও শান্তি', 'ভারতবর্ষ', 'এই স্বাধীনতা', 'সবার উপরে মানুষ সত্য' নাটকগুলি উল্লেখ করিতে পারা যায়। ইহাদের রচনায় তাঁহার সত্যভাষণের যে দুঃসাহসের পরিচয় পাওয়া

যায়, তাহাতেই ইহাদের মূল্য প্রকাশ পাইয়াছে। শচীন্দ্রনাথ একখানি রোমান্টিক নাটকও রচনা করিয়াছিলেন—'সতী তীর্থ'। তাঁহার শিক্ষা-বিষয়ক একখানি নাটক 'বাংলার দুলাল'। এতদ্ব্যতীত তিনি কয়েকখানি প্রচলিত উপন্যাসেরও সার্থক নাট্যরূপ দিয়াছেন। তিনি একনিষ্ঠ নাট্যকার। সাহিত্যে ও রঙ্গমঞ্চে নাটক প্রচারের ভিতর দিয়া তাঁহার সুদীর্ঘ কর্মজীবন তিনি ব্যয় করিয়াছেন, তাঁহার এই বিষয়ক নিষ্ঠার জন্য নাট্যসাহিত্য জনসাধারণের শ্রদ্ধা লাভ করিতে বহুল পরিমাণে সক্ষম হইয়াছে।

অতি-আধুনিক যুগে কেবল মাত্র ঐতিহাসিক নাটক রচয়িতা রূপে যাঁহারা পরিচয় লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে মহেন্দ্র গুপ্ত অন্যতম। তিনিও অভিনেতা, নাট্যকার এবং রঙ্গালয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। ঐতিহাসিক নাটকের ভিতর দিয়া তিনি ইংরেজ-বিদ্বেষ, দেশাত্মবোধ, হিন্দু-মুসলমান মিলন প্রভৃতি আধুনিক ও অতি-আধুনিক বিষয় প্রকাশ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহার নাটকের মধ্য দিয়া এই সকল বিষয়ক মনোভাবের পরিচয় যেমন প্রকাশ পাইয়াছে, ঐতিহাসিক তথ্যনিষ্ঠা তেমন প্রকাশ পায় নাই। পূর্বেই বলিয়াছি, ইহা আধুনিক এবং অতি-আধুনিক ঐতিহাসিক নাটকের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। ইংরেজের সঙ্গে যাঁহারা সংগ্রাম বা বিবাদ করিয়া পরাজিত হইয়াছেন, তাঁহারা তাঁহার মতে সকলেই আদর্শ চরিত্র—দেশহিতব্রতী ও ন্যায়পরায়ণ—অত্যাচারী বৈদেশিক শক্তি দ্বারা অন্যায় ভাবে পরাজিত মাত্র। তাঁহার 'টিপু সুলতান', 'মহারাজ নন্দকুমার' এই ভাবাপন্ন নাটক। এই হিসাবেই তাঁহার ঐতিহাসিক নাটকগুলি রোমান্টিক-ধর্মী।

অতি-আধুনিক যুগে কেবল মাত্র সামাজিক নাটক রচয়িতা রূপে যাঁহারা পরিচয় লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে বিধায়ক ভট্টাচার্যের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার 'মাটির ঘর' একখানি সুপরিচিত সামাজিক নাটক। ইহার কাহিনী এই—

প্রৌঢ়, বিপত্নীক, উচ্চ মধ্যবিত্ত সংসারী সত্যপ্রসন্ন; তিনটি মেয়ে তন্দ্রা, নন্দা ও ছন্দাকে লইয়াই তাঁহার সংসার। মেয়েদের জন্য চিন্তা ছাড়া জীবনে তাঁহার আর কোন চিন্তাই নাই। উচ্চশিক্ষিত কল্যাণের সঙ্গে তন্দ্রার বিবাহ দিয়া মেয়ে-জামাইকে নিজের কাছেই রাখেন। ধনী চঞ্চলের সঙ্গে নন্দার বিবাহ দেন। কিন্তু চঞ্চলের চরিত্রহীনতার জন্য নন্দা শ্বশুরবাড়ী হইতে চলিয়া আসে। তন্দ্রার ঘরে রাতের অন্ধকারে পুরানো

বন্ধু অলকের আবির্ভাব হইতে নাটক শুরু হয়—অলক তন্দ্রাকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু তাহা হইয়া উঠে নাই। অলক প্রস্তাব করে তন্দ্রাকে তাহার সঙ্গে যাইবার জন্য, তন্দ্রা রাজী হয় না। অলকের কথাবার্তা ও ব্যবহার কল্যাণের মনে তন্দ্রার অতীত সম্বন্ধে একটা সন্দেহ জাগায়। এইদিকে ছন্দার সহপাঠী উৎপলের সঙ্গে ছন্দার ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়া উঠে। নন্দাকে শ্বশুরবাড়ী ফিরাইয়া লইবার জন্য তাহার দিদি চেষ্টা করে ও পরে আইনের সাহায্য লইবে বলিয়া ভয় দেখায়; কল্যাণের সন্দেহ যখন বাড়িয়া উঠে, তখন তন্দ্রা উভয় সঙ্কটের মধ্যে আর থাকিতে না পারিয়া অলকের সঙ্গে যাইতে রাজী হয়। যে রাত্রিতে তন্দ্রা পলাইয়া যাইবে, সেই রাত্রিতেই নন্দা বিষ খাইয়া আত্মহত্যা করে। উত্তেজনায় ক্লান্ত তন্দ্রার স্নায়ু এই আঘাত সহ্য করিতে পারে না—সে পাগল হইয়া যায়। সত্যপ্রসন্নের সংসার দুর্যোগের কালো মেঘে ঢাকিয়া যায়। উৎপলের বাবা ছন্দাকে গ্রহণ করিতে রাজী না হওয়ায় ছন্দার জীবনও ব্যর্থ হয়। কল্যাণ সিমলায় বদলী হইয়া যায়, তন্দ্রাকেও সে তাহার সঙ্গে লইয়া যায়। সিমলায় কল্যাণ হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়ে। অশোকের সাহায্যে অলক ও সত্যপ্রসন্নকে খবর পাঠায়। অলক, সত্যপ্রসন্ন, ছন্দা সিমলায় আসে। চঞ্চলও সঙ্গে আসে, তাহার মনে ছন্দাকে বিবাহ করার অভিসন্ধি ছিল। অলকের কাছে চঞ্চলের আসল রূপ প্রকাশ পায়, অলক ভয় দেখাইয়া চঞ্চলকে তাড়াইয়া দেয়। তারপর কল্যাণের শেষ মুহূর্ত আসে। কল্যাণের অনুরোধে অলক ছন্দাকে বিবাহ করিতে রাজী হয়। কল্যাণের অন্তিম মুহূর্তে সত্যপ্রসন্নের তীব্র হাহাকারের মধ্যে যবনিকা নামিয়া আসে।

পূর্বেই বলিয়াছি, নাগরিক সমাজই অতি-আধুনিক সামাজিক নাটকের উপজীব্য; এই নাগরিক সমাজ এখনও এদেশে সম্পূর্ণ স্থিতি লাভ করিয়া একটি সুনির্দিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করিতে পারে নাই। অতএব এখনও ইহার মধ্যে যে সমস্যা দেখা যায়, তাহা যেমন ক্ষণস্থায়ী, তেমনই লঘু। সুতরাং পরিবর্তনের মুখে নূতন সমাজের এই ক্ষণিক সমস্যাগুলি যত জটিল বলিয়াই মনে হউক, যতদিন পর্যন্ত ইহারা একটি স্থির সমাজ দেহে অন্তর্নিবিষ্ট না হইতেছে, ততদিন পর্যন্ত ইহাদিগকে উপজীব্য করিয়া কোনও গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক নাটক রচনাই স্থায়ী কৃতিত্বের অধিকারী হইতে পারে না। যে পরিবার কেন্দ্র করিয়া 'মাটির ঘরে'র কাহিনী পরিকল্পিত হইয়াছে, তাহা

অতি-আধুনিক নাগরিক ভাবাপন্ন (ultra-modern); এই পরিবারের বয়স্থা মেয়েরা পাশ্চাত্ত্য সমাজের মত 'কোর্টশিপ' করিয়া নিজেদের বিবাহ স্থির করিতেছে, চলাফেরায় তাহাদের মধ্যে কোনও বাধা নাই। এদেশের নাগরিক সমাজের মধ্যে এমন পরিবারের কোন সমস্যা এদেশের সমাজের কোন সুগভীর সামাজিক সমস্যা নহে—ইহা বিশেষ পরিবারেরই এক একটি বিচ্ছিন্ন সমস্যা মাত্র। বৃহত্তর বাস্তব সমাজ হইতে সমস্যা গ্রহণ করিতে না পারিলে ইহাদের মধ্যে যথার্থ শক্তি বা গুরুত্ব আরোপ করা যায় না। 'মাটির ঘরে'র মধ্যে যে সমস্যা তাহা ব্যক্তিগত বা পারিবারিক সমস্যা বলিয়াই সামাজিক সমস্যার তুলনায় শক্তিহীন। কল্পিত সমাজ হইতে কল্পিত সমস্যা গ্রহণ না করিয়া বাস্তব সমাজ হইতে প্রত্যক্ষ সমস্যাগুলি উদ্ধার করিবার প্রয়াস এ যুগে দেখিতে পাওয়া যায় না। সেইজন্য এ যুগের সামাজিক নাটকগুলি যথার্থ শক্তির অধিকারী হইতে পারে নাই। 'মাটির ঘবে'র এই ত্রুটি কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। বিধায়ক ভট্টাচার্যের সামাজিক নাটক যে সামাজিক সমস্যার পরিবর্তে অতি-আধুনিক নাগরিক জীবনের ব্যক্তিগত বা বিচ্ছিন্ন পারিবাবিক সমস্যা মাত্র, তাহা তাঁহার আরও কয়েকখানি নাটক অনুসরণ করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে। তবে বৃহত্তর সামাজিক জীবনের বাস্তব পটভূমিকায় ব্যক্তিচরিত্রের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের সন্ধান করিয়া তিনি তাঁহার কয়েকটি নাটক রচনা সার্থক করিয়া তুলিতে যে সক্ষম হইয়াছেন, তাহাও অস্বীকার করা যায় না।

১৯৩৮ সনে বিধায়ক ভট্টাচার্যের নাটক 'মেঘমুক্তি' রঙমহল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়। ইহার কাহিনী এই—স্বামী প্রতিদিন রাত্রি ৮টায় বাহির হইয়া পরদিন সকাল ৮টায় ফেরেন, এই লইয়া স্ত্রীর মনে একটা অভিমান জমা হইতে থাকে, এই পরিবারের বন্ধু ডাঃ স্বপন রায় (বিলাত ফেরৎ) অণিমার এই অভিমানকে সন্দেহে রূপান্তরিত করে। এমন সময় পশ্চিম হইতে প্রফেসর অতুল ঘোষ তাঁহার ফ্রয়েড-পড়া নাতনীকে লইয়া আসেন। তাঁহার একান্ত চেষ্টায় এই দাম্পত্য কলহের মেঘমুক্তি ঘটে এবং প্রমাণ হয় যে, ডাঃ স্বপন রায় একজন দুর্বৃত্ত। হাসি-কান্নায় ভরা এই নাটক এককালে জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল।

নিম্নলিখিত বিষয়-বস্তু লইয়া বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'বিশ বছর আগে' রচিত। দীপক ডাস্ট-বিন হইতে কুড়াইয়া পাওয়া ছেলে। ফলে সে স্বভাবতঃই নারী-

বিদ্বেষী। থিয়েটারের অভিনেত্রী একটি পতিতার মেয়ে। তাহাকে সে ভালবাসিত। থিয়েটারের ভূতপূর্ব মালিক প্রদীপের হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করিয়া এই নাটকে যে আবর্তের সৃষ্টি হয়, তাহাতে দীপককে বিশ বৎসর দ্বীপান্তর খাটিয়া আসিতে হয়। দীপক জেল হইতে ফিরিয়া আসার পর 'ফ্ল্যাশ ব্যাক' প্রথায় নাটকের সুরু এবং শেষ। বাংলা নাটকে নিঃসন্দেহে "বিশ বছর আগে'ই ফ্ল্যাশ ব্যাক প্রথা ও সমগ্র নাটকে একটি বিরতি প্রথার প্রবর্তক। ইহার আলেখ্য বেদনাকরুণ এবং সংলাপ কাব্যপ্রধান।

বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'মালা রায়'-এর ঘটনা সূত্র এই—একটি বেদের মেয়েকে জনৈক ধনী শিশুকালে অপহরণ করিয়া লইয়া আসেন। পরে তাহাকে লেখাপড়া শিখাইয়া পুরোপুরি বাঙ্গালী করিয়া তোলেন। কিন্তু মালার বেদে পিতা খুঁজিতে খুঁজিতে আসিয়া মেয়ের খোঁজ পায়। তারপরই আরম্ভ হয় সংঘাত। ইহাতে ইহার কাহিনী রোমান্টিকধর্মী হইলেও চরিত্রগুলি বহুলাংশে বাস্তব। অন্তর্দ্বন্দ্বের বিশ্লেষণও ব্যর্থ হয় নাই।

নিম্নলিখিত কাহিনী লইয়া বিধায়কের 'রক্তের ডাক' নাটক রচিত হইয়াছে। গৃহস্থ বধূ বুলু শাশুড়ীর অত্যাচারে জর্জরিতা হইয়া নদীর ঘাটে আত্মহত্যা করিতে গিয়া তাহার বাল্যবন্ধু জমিদার শুভেশের দেখা পায়, সে তাহাকে মরিতে না দিয়া কলিকাতায় লইয়া যায়। সেখানে তাহাকে লেখাপডা শিখাইয়া জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে। শুভেশের ইচ্ছা ছিল বুলু শিক্ষার ক্ষেত্রে গিয়া মেয়েদের শিক্ষা দিক। কিন্তু ভুল বোঝাবুঝির ফলে বুলু চিত্রজগতে যোগ দিল।. মনোমালিন্যের ফলে নাটকের শেষাঙ্ক মৃত্যু দ্বারা আকীর্ণ ও অশ্রুকরুণ হইয়া উঠে।

বিধায়কের 'তুমি আর আমি' অতি-আধুনিক সমাজের আগামী অভিনয় উপলক্ষে মহড়ার জন্য সমবেত বিচিত্র লোকজন ও কৌতুককর রীতিনীতিকে কেন্দ্র করিয়া তীব্র শ্লেষাত্মক রচনা। এই নাটকের নৃত্যগুলি এককালে বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে বিশেষ আকর্ষণ সৃষ্টি করিলেও কাহিনী বৈশিষ্ট্যহীন।

কামরূপ কামাখ্যার উপর একটি কল্পিত কাহিনীকে কেন্দ্র করিয়া বিধায়ক 'কুহকিনী' নামক নাটক রচনা করেন। ডাঃ বাসুকি নাগ নামক একজন শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত লোকের জীবনে ডাঃ জেকীল ও মিঃ হাইডের খেলা বর্ণনা করিয়া তাঁহার 'চিরন্তনী' নাটক রচিত হইয়াছে। পঞ্চাশের মন্বন্তরের উপর ভিত্তি করিয়া বিধায়ক একখানি নাটক রচনা করিয়াছেন, তাহার নাম

'তেরোশো-পঞ্চাশ'। সম্পূর্ণ নূতন আঙ্গিকে রচিত বিধায়কের 'খেলাঘর' একখানি উল্লেখযোগ্য নাটক। এই নাটকের বিশিষ্ট আঙ্গিকটি এই প্রকার—

যবনিকা উত্তোলনের পর নাট্যকার অপরাধীর মত আসিয়া দর্শকের সামনে দাঁড়ান। বলেন,—একটা দুঃসংবাদ নিবেদন করার আছে। 'খেলাঘর' নাটকটি এখনও শেষ হয়নি। দর্শকবৃন্দ চীৎকার করিয়া ওঠেন। নাট্যকার বলেন—'আমার আলস্যের অপরাধে মঞ্চ-মালিককে শাস্তি দেবেন না। আপনারা উপভোগ করবেন, আমি সৃষ্টি করবো, কাজেই উভয় পক্ষই যখন এখানে হাজির আছি, তখন আসুন,—"খেলাঘর" সৃষ্টি করা যাক্'। এই বলিয়া নাট্যকার এক এক করিয়া অভিনেতা অভিনেত্রীদের ডাকিয়া বলেন—'একটা নাটক তৈরী করতে হ'বে, তোমরা আমাকে সাহায্য কর। ধীরাজ, তুমি মনে কর একটা খবরের কাগজের সাব-এডিটার, রাত্রি জেগে কাজ কর। একটু আধটু নাটক-টাটকও লেখ। এর পরেরটা তুমি তৈরী করগে, যাও। তোমার নাটকের নাম ধরো গোকুল। তুমি রমা। তুমি যাও, ওই ধীরাজ অর্থাৎ গোকুলের স্ত্রী হওগে, যাও। শান্ত মেয়ে, ভালবাসতে জানো, কাঁদতে জানো—কিন্তু প্রতিবাদ করতে জানো না। নরেশদা! তুমি মনে কর একজন সমাজকর্মী, যে বস্তীতে ওই ধীরাজ থাকে, সেখানকার লোকেদের সুখদুঃখের খবর তুমি রাখো; যাও।' এই ভাবে নাট্যকার প্রত্যেককে পাঠাইয়া দিয়া দর্শককে বলেন, 'এবার আমি যাই। ওরা গল্প তৈরী করুক, আমি উইংসের পাশে দাঁড়িয়ে দেখিগে। যদি কোথাও গোলমাল দেখি—অর্থাৎ গল্পটা ওরা নষ্ট করবার উপক্রম করে—তবেই আমি এসে ঠিক ক'রে দিয়ে যাব—নইলে নয়।'

নাটক চলিতে থাকে। প্রথম অঙ্কের শেষের দিকে যেখানে ধীরাজকে উদ্ধার করিতে নরেশ মিত্র, রমাকে সঙ্গে লইয়া মালিনীর বাড়ী যাইতেছেন, সেইখানে নাট্যকার ঢুকিয়া তাহাদের বাধা দেন। নাট্যকারের আসার ইঙ্গিত হইতেছে—সমগ্র ঘরের আলোটা বদলাইয়া যায় এবং নাট্যকার ঢুকিলে চরিত্রগুলি স্থির হইয়া যায়। নাট্যকার গল্প ঠিক করিয়া দিয়া যান। প্রথম অঙ্কের ড্রপ পড়ে। সর্বশেষে দেখা যায়, নায়িকা বিদ্রোহ করিয়াছে, নাট্যকারের আদেশ সে মানিতে চাহিতেছে না। সে বলে—তুমি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছ, সেই জন্য তোমাকে আমি বড় করিয়াছি। নাট্যকার দর্শক-বৃন্দকে সম্বোধন করিয়া বলেন—'যুগে যুগে বিদ্রোহিনী নায়িকা নিয়ে লেখকরা

যে বিপদে পড়েছেন, আজ আমারও ঠিক সেই বিপদ; অতএব চিরাচরিত পন্থায় আমি নায়িকাকে হত্যা করছি।' গুলি খাইয়া নায়িকা (মালিনী) মাটিতে পড়িয়া যায়। আলো কমিতে কমিতে ছোট হইয়া তাকের ওপর গোকুলের লেখা 'খেলাঘর' নাটকখানিতে থামে। আলো আবার বাড়ে। দেখা যায়, কেউ কোথাও নাই, নাট্যকারও সরিয়া গিয়াছেন। নায়িকা মিথ্যা, সত্য শুধু নাটক। ইঙ্গিত এই যে নাট্যকার, নটনটী কেউ থাকে না। বাঁচিয়া থাকে নাটক। ইহার পর হাজারীবাগের সন্নিকটস্থ রাজরূপা ছিন্নমস্তা দেবীর মহিমাকে কেন্দ্র করিয়া বিধায়ক ভট্টাচার্য একখানি ঐতিহাসিক-ধর্মী নাটক রচনা করেন, তাহার নাম 'রাজরাপ্পা'।

বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'ক্ষুধা' নামক সামাজিক নাটকখানি বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। ইহার কাহিনী এই—

সদা, গজা, আর রমা তিন বন্ধু। তিন জনেই আত্মীয়-স্বজন বিহীন ভাগ্যবিড়ম্বিত ,বেকার। বৃদ্ধ জগৎ চ্যাটার্জির বাহিরের একখানা ঘর ভাড়া লইয়া তিনজন থাকে। ভাড়া ঠিকমত দিতে পারে না—ফলে লজ্জায় ও ক্ষোভে তাহারা দিনের বেলাটা বাহিরে কাটায়। গভীর রাত্রে চুপি চুপি বাড়ী ফিরিয়া আবার জগৎবাবুর চোখ এড়াইয়া সকাল সকাল বাহির হইয়া যায়। অধিকাংশ দিনই তাহাদের অনাহারে কাটে। সদা বড় ভাইয়ের মত ব্যবহার করে, আর সর্বদা তুড়ি দিয়া হাসি ঠাট্টা করে, নিজেদের অবস্থার কথা কাউকে বুঝিতে দেয় না এবং নিজেও ভুলিয়া থাকার চেষ্টা করে। পুত্রবধূ প্রভা, অষ্টাদশী নাত্নী মানবী ও ছোট একটি নাতি বাবুয়া—এই লইয়া জগৎবাবুর সংসার। একমাত্র পুত্র নিরুদ্দিষ্ট, পেন্সনের সামান্য টাকায় চলে না, বুড়ো বয়সে তিনি চাকরীর চেষ্টা করিতেছেন। পুত্রবধূ প্রভা সর্বংসহা ধরিত্রীর মত সব দুঃখ কষ্ট অসচ্ছলতার মধ্যে সংসার চালাইয়া যান। বাহিরের ঘরের তিনটি ভাগ্যবিড়ম্বিত যুবকও তাঁহার মাতৃস্নেহে বাঁধা পড়ে। ক্ষুধার নির্মম তাড়নায় প্রতিনিয়ত বাংলার নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের জীবনে যে সব মর্মান্তিক পরিণতি ও বিকৃতি ঘটে, তাহার কবল হইতে এতগুলি প্রাণী নিজেদের রক্ষা করিবার দুরন্ত প্রয়াস করিতে থাকে; কিন্তু বিভিন্ন অবস্থার ভিতর দিয়া গিয়াও ইহার কোন সমাধান দেখা যায় না। ধনীর অবহেলা, বিদ্রূপ ও লাঞ্ছনা এই দারিদ্র্যের অপমানকে দুঃসহ করিয়া তুলে। ইহা চিত্র-প্রধান রচনা। ইহাতে জীবনের সমস্যা আছে, সমাধান নাই।

বিধায়ক ভট্টাচার্যের আধুনিকতম পূর্ণাঙ্গ সামাজিক নাটক 'খেলা' এবং দুইখানি একাঙ্ক নাটক 'কান্না' ও 'হাসি'। তিনি বর্তমানে ব্যবসায়ী রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং স্বয়ং একজন উত্তম অভিনেতা। সুতরাং আধুনিকতম নাট্যরচনার আঙ্গিক তাঁহার পূর্ণায়ত্ত। তাঁহার সংলাপ সহজ, সরল এবং সরস; সেইজন্য তিনি 'মধুসংলাপী' বলিয়া আধুনিক নাট্যামোদীদিগের নিকট পরিচিত।

অতি-আধুনিক বাংলা নাট্যকারদিগের মধ্যে প্রমথনাথ বিশীর একটা স্বাতন্ত্র্য আছে। তিনিও কেবল মাত্র সামাজিক নাটকই রচনা করিয়াছেন; কিন্তু তিনি ইহার বিস্তৃত কিংবা সুগভীর কোনও সমস্যা সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ দ্বারা প্রকাশ করিবার পরিবর্তে ইহার ছোটখাট ত্রুটি ও অসঙ্গতিগুলি তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের বাণে বিদ্ধ করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। কাহিনীর বিস্তারের মধ্যে তাঁহার নাটকের রস নাই এবং তাহার পরিবর্তে ইহার বিচ্ছিন্ন অংশে ইহার রস বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। এই রস স্নিগ্ধ-মধুর নহে, বরং অম্ল, কটু ও কষায়। তিনি আধুনিক নাগরিক সমাজভুক্ত মানব-চরিত্রের একজন তীক্ষ্ণ সমালোচক —অন্যায়ের উপর তাঁহার রোষ সর্বত্র তীব্রতম ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে, এই বিষয়ে তাঁহার ক্ষমা কিংবা সহানুভূতি নাই; তাঁহার ভাষায় জ্বালা আছে, আরাম নাই—নির্মমতা আছে, স্নেহ নাই। তিনি নিজেই জর্জ বার্ণার্ড শ'র সমধর্মী বলিয়া দাবী করেন—মানব-চরিত্র সমালোচনা এবং মানুষের সম্পর্কে বিশ্বাসের দিক দিয়া উভয়ের মধ্যে বিশেষ অনৈক্য নাই। তিনি প্র-না-বি বলিয়াও বাংলা সাহিত্যে পরিচত। বাংলা নাট্য-সাহিত্যের মধ্য যুগে ফরাসী প্রহসন-রচয়িতা মলেয়ার যেমন বহু বাংলা প্রহসনের আদর্শ বলিয়া গৃহীত হইয়াছিলেন, তাঁহার মধ্যেও ইহার প্রভাব কেহ কেহ অনুভব করিয়াছেন। কিন্তু এ কথা সর্বাংশে সত্য নহে। মলেয়ারের তুলনায় প্রমথনাথ বিশীর জীবনদৃষ্টি গভীর এবং স্বচ্ছতর; তাঁহার সহজাত কৌতুকবোধের স্পর্শে তাঁহার রচনা মাত্রই সরস হইয়া উঠে। তথাপি মলেয়ার অপেক্ষা তাঁহার আঘাত তীব্রতর বলিয়া বোধ হইবে।

প্রমথনাথ বিশীর 'পরিহাস বিজল্পিতম্' নাটকের কাহিনী এই—ধনীর কন্যা মিনি। তাহার জন্মতিথি উপলক্ষে মিনিদের বাড়িতে এক নাট্যানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক গণ্যমান্য অতিথির সমাগম হইবার কথা। এমন সময় আকস্মিক এক দুর্ঘটনার জন্য নাটকের পার্টি নাটক করিতে পারিবে না

জানাইয়া দিল। এই সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে মিনির প্রণয়ী নাট্যানুষ্ঠানের এক অভিনব ব্যবস্থা করিল। বিশিষ্ট অভ্যাগতদের সে মঞ্চে অভ্যর্থনা করিয়া আনিল। তাহাদের মধ্যে সম্পাদক, ডাক্তার, সাহিত্যিক, অধ্যাপক, আধুনিকা, রাজনীতিক, ফিল্ম ডিরেক্টর সকলেই ছিলেন। সকলে বর্তমান বাঙ্গালী জাতির সমস্যা লইয়া আলোচনা আরম্ভ করিল। রাষ্ট্রভাষা, সাহিত্য প্রচার, স্বদেশী সমস্যা, হিন্দু-মুসলমান সমস্যা ইত্যাদি লইয়া তুমুল তর্কবিতর্ক চলিল। নেপথ্যে ক্রিটিক, মেয়র, প্রকাশক, রিপোর্টার দর্শক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। এই চার ব্যক্তি উপরোক্তদের আলোচনাকে সত্যকারের অভিনয় বলিয়া মনে করিয়া নাটক দেখিতেছিল। প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে ডাক্তার, রাজনীতিক ইত্যাদির খাইবার ডাক পড়িল। পরে তাহারা শুনিতে পাইল যে, তাহারা এতক্ষণ পর্যন্ত যে তর্কবিতর্ক করিয়াছে, তাহা ঐ চারজনের কাছে নাটকরূপে প্রতিভাত হইয়াছিল। মিনির প্রণয়ীর সাফল্যে মিনি খুশী হইল। পরে উভয়ের ভালবাসা প্রকাশ করিবার সঙ্গে সঙ্গে নাটকের সমাপ্তি হইল।

তাঁহার 'ভূতপুর্ব স্বামী' নাটকটি এই বিষয় লইয়া রচিত—চন্দ্রভানু এবং পুরুষোত্তম দুই অন্তরঙ্গ বন্ধু। পুরুষোত্তম যুদ্ধে চলিয়া যায়। যুদ্ধ থামিবার পর পুরুষোত্তমের মৃত্যু সংবাদ আসে। চন্দ্রভানু পুরুষোত্তমের পত্নী পুর্ণিমাকে বিবাহ করে। ঘরের মধ্যে পুরুষোত্তমের একখানা ছবি ছিল। এই ছবিটি চন্দ্রভানু সহ্য করিতে পারিত না। পুরুষোত্তমের অশরীরী উপস্থিতি তাহাকে উত্যক্ত করিত। সেই কারণে ছবিটি সে উন্টাইয়া দিত। পুর্ণিমা পুরুষোত্তমকে ভুলিতে পারে নাই। সেইজন্য সে ছবিটি সোজা করিয়া রাখিত। এই ব্যাপারে নবাগত পরিচারক তারক চন্দ্রভানুর সহায়ক ছিল এবং নবাগতা পরিচারিকা মল্লিকা পুর্ণিমার হুকুম মানিয়া কাজ করিত। চন্দ্রভানুর থিয়োসফিতে বিশ্বাস ছিল। একদিন চন্দ্রভানু তাহার বন্ধু পরাশর এবং পুর্ণিমা মৃত আত্মাকে আনিবার চেষ্টা করিল। এমন সময় আকস্মিকভাবে পুরুষোত্তমের আবির্ভাব ঘটিল। পুরুষোত্তমের আবির্ভাবে সকলেই বিস্মিত এবং স্তম্ভিত হইয়া গেল। জাপানী যুদ্ধে পুরুষোত্তম মরে নাই। বন্দী হইয়াছিল মাত্র। তাহার মৃত্যু সংবাদ মিথ্যা। পুরুষোত্তম পুর্ণিমা-চন্দ্রভানু বিবাহিত জানিতে পারিয়া ক্ষোভে অভিমানে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। পুর্ণিমাকে সে ফিরিয়া পাইতে চাহিল। চন্দ্রভানুও পুর্ণিমার উপর তাহার অধিকার

ছাড়িয়া দিতে রাজী নয়। পরাশর পুরুষোত্তমকে অনেক বুঝাইল, কিন্তু কোনও ফল হইল না। শেষ পর্যন্ত উভয়েই তলোয়ার লইয়া দ্বৈত লড়াইয়ে অবতীর্ণ হইল। পুর্ণিমা এই কাণ্ড দেখিয়া উভয়কে এই বলিয়া নিরস্ত কবিবার চেষ্টা কবিল যে, সে কাহাকেও ভালবাসে না। কিন্তু ইহাতেও দুই বন্ধু দমিল না। তাহারা যখন লডাইয়ে ব্যস্ত, তখন হঠাৎ সংবাদ পাইল পুর্ণিমা জলে ঝাঁপ দিয়াছে। প্রকৃত পক্ষে তখনই উভয়েব লডাই থামিল। পুরুষোত্তম, চন্দ্রভানু, পরাশর সকলেই নিষ্ক্রিয় হইল। পরেব অঙ্কে দেখা যায় যে, উভয়ে পুর্বঘটনা লইয়া পর্যালোচনা করিতেছে। ইতিমধ্যে পুরুষোত্তম নূতন বান্ধবী মিস্ গুপ্তের সঙ্গে হৃদ্যতা বাড়াইয়া দিল। পুর্ণিমা এই সংবাদ জানিতে পারিয়া ঈর্ষান্বিতা হইল। পরাশর আলোচনাব সূত্রপাত কবিল। কিন্তু তাহাব বিচাব কেহই মানিতে চাহিল না। কেননা পুর্ণিমা নারী। পুরুষ বিচাবক তাহার বিপক্ষে যাইবে, আর যদি কোনও নারী বিচারক হয়, তবে সে চন্দ্রভানু এবং পুরুষোত্তমেব বিপক্ষে যাইবে। উপর হইতে প্যারাসুট সৈন্যেব অবতরণে এই সমস্যার সমাধান হইয়া গেল। তাহাব চেহাবা না নাবীব, না পুরুষেব। সকলেই সেই পুরুষেব বিচাব মানিতে রাজী হইল। উক্ত পুরষ বিচাব করিয়া বলিলেন, নাবীকে কেবলমাত্র বিবাহিত পত্নী রূপে দেখিলেই বিপদ। যদি নারীকে বান্ধবীরূপে দেখা যায়, তবে সকল সমস্যাব সমাধান হইয়া যায়। বলা বাহুল্য, এই ব্যাপারে ঐকমত্য দেখা গেল না। এমন সময় মিস্ গুপ্ত আসিলেন। তাঁহাব পুরুষোত্তমের সঙ্গে সিনেমা যাইবার কথা। মিস্ গুপ্তকে দেখিয়া পুর্ণিমা মূর্ছিত হইয়া পড়িল। পুরুষোত্তম তাহার সেবাতে লাগিয়া গেল। চন্দ্রভানু মিস্ গুপ্তেব সৌন্দর্যে বিমুগ্ধ হইয়াছিল। চন্দ্রভানু মিস্ গুপ্তকে লইয়া সিনেমায় চলিয়া গেল। এ ছাড়া নাটকটিতে তারক এবং মল্লিকাব প্রেম এবং ভৃত্য গোপাল এবং খুন্তির ভালবাসাও মূল কাহিনীর সঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে। তারক-মল্লিকা উভয়েই ছদ্মবেশে চন্দ্রভানুর বাড়ীতে ছিল। মাতাপিতা তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহ দিবার প্রস্তাব করিলে উভয়ে পলাইয়া এই বাড়ীতে আসে। পরে জানা গেল, তাহাদের অভিভাবকদের নির্বাচিত বর কনে ছিল তারক এবং মল্লিকা। সুতরাং বিবাহে আর আপত্তি থাকিল না। গোপাল এবং খুন্তিও নিজেদের বিবাহের সংবাদটি জানাইয়া বাড়ী হইতে বিদায় লইল।

প্রমথনাথ বিশীর 'ঋণং কৃত্বা' নাটকখানি বহুল প্রচার লাভ করিয়াছিল; তাহার কাহিনী এই প্রকার—সনৎকুমারের পিতা ঋণ করিয়া ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছিলেন। ব্যবসা জমিল না। ভদ্রলোক পঞ্চাশ হাজার টাকা ঋণের বোঝা পুত্রের ঘাড়ে ফেলিয়া মৃত্যুবরণ করিলেন। সনৎকুমারেরও অনেক ঋণ হইয়াছিল। পাওনাদারেরা টাকা চাহিতে আসিলে সে দেখা করে না। তাহার ভৃত্য ভজুয়া মনিবের হইয়া নানা ফন্দি করিয়া পাওনাদারদের হটাইয়া দেয়। এমন কি, সে নিজেও ঋণ করার কৌশলটি আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিল। সনৎকুমার পিতৃবন্ধুর কন্যা মঞ্জরীর পাণিপ্রার্থী। মঞ্জরীর দাদু সুরদাসবাবু ধনাঢ্য বৃদ্ধ। বৃদ্ধ এখন সকল জায়গায় বক্তৃতা দিয়া বেড়ান। নাতনীর দিকে নজর দিবার সময় পান না। সনৎকুমার মঞ্জরীকে সঙ্গীত শিক্ষা দিত। সুরদাসবাবুর বন্ধু হর্ষনাথবাবু উকিল। সনৎকুমারকে তিনি পছন্দ করিতেন না। সুতরাং সনৎকুমারকে পদচ্যুত করিয়া তিনি অন্য একজন সঙ্গীতশিক্ষক নিযুক্ত করিলেন। এই সঙ্গীতশিক্ষক আসলে বৃদ্ধের ছদ্মবেশে সনৎকুমার। মঞ্জরীর বন্ধু মণিকাকে ললিত ভালবাসিত। ললিত সনৎ-কুমারের বন্ধু। হর্ষনাথবাবুর মণিকার টাকার উপরেও নজর ছিল। সুতরাং তিনি তাহার বন্ধু লোকেনের শ্যালক চন্দ্রনাথকে স্ত্রীবেশে ললিতের নিকট পাঠাইলেন। চন্দ্রনাথের নাম হইল পুনর্ণবা। সুরদাসবাবুকে বলিয়া সনৎকুমারের কাছে বকেয়া টাকার জন্য হর্ষনাথবাবু চিঠি দিলেন। মঞ্জরী কিংবা মণিকা যে-কাউকে তিনি করায়ত্ত করিতে চাহিলেন। এই ভাবে একদিকে হর্ষনাথবাবুর কৌশল অন্যদিকে সনৎকুমারের চাতুর্য চলিতে লাগিল। সনৎকুমার ছদ্মবেশে মঞ্জরীকে গান শেখায়। মঞ্জরী সনৎকুমারকে চিনিতে পারিয়া উৎসাহের সঙ্গে সঙ্গীত চর্চা সুরু করিল। কিন্তু হর্ষনাথবাবুর চালে ললিত ভুল করিল। পুনর্নবাকে দেখিয়া সে মণিকাকে ভুলিয়া গেল। হর্ষনাথবাবু মঞ্জরী এবং মণিকার নিকট প্রেমনিবেদন করিয়া যাইতে লাগিলেন। বার বার ব্যর্থ হইলেও তিনি হাল ছাড়িলেন না। মণিকা ললিতের পরিবর্তনে বিষণ্ণ হইয়া পড়িল। পুনর্নবাকে কেন্দ্র করিয়া ললিতের মেজর গুপ্ত নামে এক ডাক্তার প্রতিদ্বন্দ্বী জুটিয়া গেল। প্রতিদ্বন্দ্বিতা এমনই তীব্র আকার ধারণ করিল যে, উভয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধে উভয়কে আহ্বান করিল। এদিকে সনৎকুমারের ছদ্মবেশ একদিন সুরদাসবাবু ধরিয়া ফেলিলেন। সুরদাসবাবু সাদাসিধা ধরণের লোক। তিনি নাতনী মঞ্জরীর বিবাহ পাকা করিয়া

ফেলিলেন। হর্ষনাথবাবুর ব্যর্থতা চরমে উঠিল। পুনর্নবা এই ছদ্মবেশ ত্যাগ করিতে চাহিতেছিল। পুনর্নবা এবং হর্ষনাথবাবুর কথাবার্তা মণিকা এবং ললিত একদিন আড়ালে থাকিয়া শুনিতে পাইয়া বুঝিল যে পুনর্নবা পুরুষ। ললিতের মোহভঙ্গ হইল। মণিকাকে সে কাছে টানিয়া লইল। ভজুয়া এবং মঞ্জুরীর ঝি পুঁটি নিজেদের বিবাহ সংবাদ ঘোষণা করিল।

যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশকে কেন্দ্র করিয়া প্র-না-বি'র 'পারমিট' নাটকটির ঘটনা গড়িয়া উঠিয়াছে। রামসদয়বাবু ধনী। তাঁহার কন্যা হিমানী। হিমানীকে অরুণ এবং সুপ্রকাশ দুইজনেই ভালবাসে। কিন্তু রামসদয়বাবুর ইচ্ছা অন্যরূপ। তিনি বিলাতফেরৎ দিগ্বিজয় চৌধুরীর সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ দিতে ইচ্ছুক। সুতরাং নিঃসম্বল অরুণ এবং সুপ্রকাশকে ভাবিবার জন্য এক বছরের সময় দিলেন। তাহার সর্ত হইল, যদি অরুণ এবং সুপ্রকাশ একবছরের মধ্যে এক লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিতে পারে, তবেই তাহারা হিমানীর পাণিগ্রহণ করিতে পারিবে। দিগ্বিজয় চৌধুরী ইত্যবসরে রামসদয়বাবুর অর্থ এবং কন্যা দুইই লাভ করিবার জন্য তৎপর হইয়া উঠিল। কিন্তু হিমানী দিগ্বিজয়ের সান্নিধ্য এড়াইয়া চলিতে লাগিল। সুপ্রকাশ এবং অরুণ টাকা সংগ্রহের জন্য চেষ্টা আরম্ভ করিল। বালিগঞ্জের 'পাঁচমিশেলী ক্লাবে' রঞ্জিত সেনের সঙ্গে সুপ্রকাশ পরামর্শ করিয়া ঠিক করিল, সে কালোবাজারে সিমেণ্টের ব্যবসা সুরু করিবে। তাহার জন্য পারমিট চাই। জেলফেরৎ এবং দেশসেবী এই সার্টিফিকেট লইয়া সুপ্রকাশ কালোবাজারে সিমেণ্টের ব্যবসা সুরু করিয়া দিল। ইতিমধ্যে একবার অরুণকে ডাক্তারের ছদ্মবেশে হিমানীর কাছে যাইতে দেখিতে পাই। দিগ্বিজয় চৌধুরীকে দূরে রাখিবার জন্যই তাহার এই মতলব ছিল। সুপ্রকাশ যখন নির্দিষ্ট টাকা করায়ত্ত করিয়াছে, তখন মন্ত্রীবদলের জন্য তাহাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করিল। জেল হইতে মুক্তি পাইয়া সুপ্রকাশ দেশবাসীর অভিনন্দন লাভ করিল। পারমিট ব্যবস্থার অলৌকিকতায় সুপ্রকাশের তখন প্রচুর টাকা। সুতরাং সংস্কৃতিপরায়ণ, প্রগতিপরায়ণ উৎসাহী ব্যক্তিরা সুপ্রকাশের কাছে আসিল। এমন কি, রাজনৈতিক নেতারাও সুপ্রকাশের কাছে ধর্না দিল। কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা, পুত্রের জন্য চাকুরী প্রার্থী পিতা সুপ্রকাশের করুণা চাহিতে লাগিল। সুপ্রকাশ বুঝিল অর্থই সব। এক বছরের ঠিক দিনটিতে রামসদয়বাবুর বাড়ীতে

গিয় সুপ্রকাশ তাহার ব্যাঙ্কের টাকার খাতা দেখাইল। এমন সময় অরুণ আসিয়া উপস্থিত হইল। অরুণের জমার খাতায় শূন্য। রামসদয়বাবু সৎপথে ব্যবসা চালাইতে গিয়া সর্বস্ব হারাইয়াছিলেন। সুতরাং অরুণের মনের অবস্থা এবং তাঁহার মনের অবস্থা একই রকম। হিমানী অরুণকেই গ্রহণ করিল। সুপ্রকাশ হিমানীর বান্ধবী নবীনাকে লাভ করিল। দিগ্বিজয়ের আকাশকুসুম ধূলিসাৎ হইয়া গেল। নাটকটিতে আরও একজোড়া প্রেমিক-প্রেমিকা আছে,—তাহারা হইতেছে রামসদয়বাবুর চাকর লক্ষ্মণ এবং পরিচারিকা মিনু। ইহারাও পরস্পরের পাণিগ্রহণ করিল। নাটকটিতে ভদ্র দেশপ্রেমিক রূপে হংসবিলাস বাবুর ভূমিকা সমসাময়িক সমাজ হইতে নেওয়া। রজত সেন বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন লোক। কালোবাজারের তিনি সমর্থক, কিন্তু কালোবাজারকে তিনি দেশসেবার কাজ মনে করেন নাই।

প্রমথনাথ বিশীর 'মৌচাকে ঢিল' নাটকটির কাহিনী কতকটা ঐতিহাসিক হইলেও, প্রেরণা আধুনিক; কাহিনীটি এই প্রকার—খ্রীষ্টীয় ৭৮৫-৯০ সালের কথা। গৌড়ে মাৎস্যন্যায় প্রতিষ্ঠিত। চারিদিক হইতে গৌড় আক্রান্ত। প্রজারা এই সময় একজন উপযুক্ত রাজা নির্বাচন করিতে চাহিল। কিন্তু এই ব্যাপারে তাহাদের মধ্যে ঐকমত্য ছিল না। গৌড়ের বিখ্যাত শ্রেষ্ঠী চন্দ্রসেনের কন্যা ভদ্রা ভীষ্মদেবের প্রণয়ী ছিল। কিন্তু জনশ্রুতি এই যে, গোপালদেব ভীষ্মদেবকে নিহত করেন। অতএব ভদ্রা গোপালদেব নিধনের জন্য বদ্ধপরিকর হইল। নানা বাধা সত্ত্বেও গোপালদেব রাজা নির্বাচিত হইলেন। রাজা হইয়াই গোপালদেব দেশের অত্যাচার, নিপীড়ন, শোষণ বন্ধ করিবার জন্য আইন প্রণয়ন করিলেন। এই সমস্ত আইন শ্রেষ্ঠীদের মনঃপুত হইল না। যুদ্ধ থাকিলে অস্ত্রবিক্রয়ের সুবিধা, আইন না থাকিলে ভেজাল মিশানো যায়, চুরি ডাকাতি অবাধে চলে। অতএব স্বার্থ প্রণোদিত ব্যক্তিরা গোপালদেবের রাজত্বের অবসান কামনা করিতে লাগিল। তাহারা ভদ্রার প্রণয়ী মণিভদ্রকে কেন্দ্র করিয়া ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল। এক সময় মণিভদ্র এমনও প্রস্তাব করিল যে, ভদ্রাকে বিদেশীদের হস্তে সমর্পণ করিয়া বিদেশীদের দ্বারা দেশে নিজেদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করা হউক। এই ষড়যন্ত্র যখন কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছে, তখন গোপালদেব তাহা জানিতে পারিলেন। তিনি ভদ্রাকে সমস্ত বিবরণ জানাইলেন। ভদ্রা বুঝিতে পারিল, ইন্দ্রদত্ত, সগভট্ট, ঈশ্বর ঘোষ, মণিভদ্র ইহারা উচ্চ শ্রেণীর লোক। ভদ্রা গোপালদেবের

সাহস ও শক্তিমত্তায় শ্রদ্ধান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল। গোপালদেবকেই তাহার প্রেম নিবেদন করিল। গোপালদেবও ভদ্রার প্রতি আসক্তি প্রকাশ করিলেন। এমন সময় গোপালদেব মৃত্যুর ভান করিয়া পড়িয়া রহিলেন। সগভট্ট, ঈশ্বর ঘোষ ইত্যাদি উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। মণিভদ্র সুযোগ বুঝিয়া ভদ্রার কাছে প্রেম নিবেদন করিল। উভয়ের মালা বিনিময় হইল। বাহিরে কোলাহল শোনা গেল। সৈন্যরা উপস্থিত হইলে গোপালদেব সকলকে স্তম্ভিত বিস্মিত করিয়া দিয়া উঠিয়া পড়িলেন। সৈন্যদের এবং জনতাকে উদ্দেশ্য করিয়া গোপালদেব দেশের প্রকৃত অবস্থা বুঝাইয়া বলিলেন। দেশের ভূস্বামী, শ্রেষ্ঠী, ধনী ব্যক্তিরা জনসাধারণকে ভুলাইয়া রাখিয়াছে। প্রকৃত স্বাধীনতা কি, তাহারা জানে না। বাহ্য স্বাধীনতা এবং আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতার জন্য চাই ত্যাগ, নিয়মতন্ত্রতা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থ। গোপালদেব যেন এই কথাগুলি আজিকার দিনের বাঙ্গালীকে শোনাইয়া বলিলেন।

নাটকটিতে আরও একটি কাহিনী আছে এবং দুটি কাহিনীই পাশাপাশি চলিয়াছে। সেই কাহিনীটি এই—

কলিকাতায় সর্বানন্দবাবুর কন্যা সুভদ্রা বিবাহযোগ্যা হইয়া উঠিয়াছে। সর্বানন্দবাবু এই মর্মে উইল করিয়া গিয়াছিলেন যে, সুভদ্রার বয়স একুশ বছর পূর্ণ হইলে সে বঙ্গীয় আইন সভার কোন সভ্যকে বিবাহ করিবে; অন্যথা করিলে পরিত্যক্ত যাবতীয় সম্পত্তি ও টাকা-কড়ি গৌড়ীয় পুরাতত্ত্ব-গবেষণা সমিতি পাইবে। এই অদ্ভুত উইলের সর্ত পূর্ণ করিবার জন্য সুভদ্রার বিমাতা চিন্তিত। আগামী নির্বাচনে জিতিবার জন্য মণিময় চেষ্টা করিতেছে। বঙ্গীয় আইন সভার সদস্য হইতে পারিলে মণিময়ই সুভদ্রাকে পাইবে। জগদম্বার ইচ্ছা ছিল, সুভদ্রার সহিত শ্রীমন্তর বিবাহ দেয়। কিন্তু বহুদিন শ্রীমন্তর দেখা নাই। নির্বাচনের প্রাক্কালে শ্রীমন্ত হঠাৎ বিলাত হইতে ফিরিল। জগদম্বার হরিষে বিষাদ হইল; কারণ, শ্রীমন্ত তো আইন সভার সদস্য হইতে পারিবে না। শ্রীমন্ত লীগ অব নেশনসের শিক্ষাপ্রাপ্ত। তাহার হাতে একটি বাক্স। ইহার উপর দাঁড়াইয়া সে বড় বড় তত্ত্বকথা বলে। সে আসিয়া সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া নির্বাচনে দাঁড়াইবে স্থির করিল। তাহার প্রতীক ফুটবল। মণিময়ের লাঙল। নির্বাচনে শ্রীমন্ত জিতিয়া গেল। মণিময় এই সংবাদে হার্টফেল করিল। শ্রীমন্তের কৃতিত্বে উল্লসিত হইয়া সুভদ্রা যখন তাহাকে বিবাহ করিতে উদ্যত হইল, তখন শ্রীমন্ত জানাইল নির্বাচনে

জিতিবার মধ্যে কোনও বাহাদুরি নাই। সে কেবল চালাকির দ্বারা এই নির্বাচনে জিতিয়াছে। শুনিয়া সুভদ্রা বিচলিত হইল। সুতরাং সে কল্যাণকে বিবাহ করিতে চাহিল। কল্যাণ ছিল নিরপেক্ষ দ্রষ্টা। মণিময়-শ্রীমন্ত দ্বন্দ্বে কিংবা জগদম্বার সমস্যায় সে মাঝে মাঝে উপদেশ দিয়াছে এইমাত্র। কল্যাণ সুভদ্রাকে বলিল, সে ম্যাজিসিয়ান, তবে শ্রীমন্তের ম্যাজিক উচ্চশ্রেণীর কলাকৌশলের, তাহার ম্যাজিক নিম্নশ্রেণীর। সুভদ্রা কল্যাণকেও বিবাহ করিতে চাহিল না। গৌড়ীয় পুরাতত্ত্ব-গবেষণা সমিতির কাছে সম্পত্তি চলিয়া গেল। সমিতির সম্পাদক সুভদ্রা, ট্রেজারার কল্যাণ।

গৌড়ীয়-পুরাতত্ত্ব গবেষণা-সমিতি গোপালদেবের স্মৃতিরক্ষার জন্য একটি সভা আহ্বান করিয়াছে। সভামঞ্চে গোপালদেবের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। সেই সভায় মাড়োয়ারী, ব্যবসায়ী, অধ্যাপক ইত্যাদি উপস্থিত। সকলেই নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধিতে নিপুণ। সভাতে তাঁহারা জ্বালাময়ী ভাষাতে বাংলাদেশের দুরবস্থার কথা উল্লেখ করিলেন। তাঁহাদের বক্তব্য হইতে ইহাই বোঝা গেল যে, গোপালদেবই এই দুরবস্থা হইতে বাংলাদেশকে উদ্ধার করিতে পারিতেন, যেমন করিয়াছিলেন তাঁহার নিজের সময়ে। সভাস্থ সকলেই যেন গোপাল-দেবের অভাব বোধ করিতে লাগিলেন। গোপালদেবের মূর্তি সজীব হইয়া উঠিল। সকলেই বিস্ময়ের সহিত দেখিল, গোপালদেব উপস্থিত। সভার সকলে পলাইয়া গেল। রহিল বৃদ্ধ রিপোর্টার। গোপালদেব ইহাদের পলায়নের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। রিপোর্টার বুঝাইয়া দিলেন, গোপালদেবকে ইঁহারা চাহেন নাই। লোককে ভুলাইবার জন্য একটা সভা করিয়াছিলেন মাত্র। নিজেদের সম্মান প্রতিপত্তি রাখিবার জন্যই মধ্যে মধ্যে এইভাবে দেশের জন্য কাঁদিতে হয়, বক্তৃতা দিতে হয়, উৎসব অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাও করিতে হয়। গোপালদেব অন্তর্হিত হইলেন। রঙ্গমঞ্চে আবির্ভাব ঘটিল শ্রীমন্তের। সে বলিল নির্ভেজাল মিথ্যাই বাংলাদেশের একমাত্র সত্যবস্তু। সে মিথ্যার ধারক বাহক। জনতা শ্রীমন্তকে বাহবা দিল; গ্রহণ করিল। সুভদ্রা এবং কল্যাণ পরস্পরকে প্রেম নিবেদন করার সঙ্গে সঙ্গে নাটকের যবনিকা নামিয়া আসিল।

প্রমথনাথ বিশীর 'ঘৃতং পিবেৎ' বা 'সানি ভিলা' নাটক এই বিষয়বস্তু লইয়া রচিত—সাধারণ মধ্যবিত্ত সর্বেশ্বর বাবু কিছুদিনের জন্য রায়বাহাদুর সাজিয়া বালীগঞ্জে 'সানি ভিলা' অট্টালিকায় বাস করিতেছেন। লোকে জানে, তাঁহার

লাখ টাকা। সর্বেশ্বর সংস্কৃতিবান, আধুনিক রুচির চূড়ান্ত রূপ তাঁহার গৃহে। সর্বেশ্বরের এক কন্যা প্রমীরা এবং বৃদ্ধ পিতা জগন্নাথ। অর্থ এবং সম্পত্তির প্রলোভনে মাকড়দ'র মহারাজকুমার ত্রিদিবেন্দু নারায়ণ প্রমীরার পাণিপ্রার্থী। সর্বেশ্বর কন্যার বিবাহ দিয়াই বডলোকের শ্বশুর হইবার স্বপ্ন সফল করিতে চান। সে জন্য 'সানি ভিলা', কালচারের চর্চা, লাখ টাকার সম্পত্তির গুজব রটনা। মাকড়দ'র রাজকুমার কিন্তু আসলে ছদ্মবেশী ত্রিদিব, গাড়ীর ড্রাইভার। প্রমীরাকে বিবাহ করিয়া সে রাতারাতি বডলোক হইতে চায়। প্রমীরার সেক্রেটারি মালবিকা এবং নীরজা পরস্পরের প্রণয়ী। মালবিকার জীবনের ইতিহাস এই। আগে তাহার নাম ছিল মন্দাকিনী। বাবা মার ইচ্ছানুযায়ী সে বিবাহ করিয়াছিল। কিন্তু বিবাহ রাত্রিতেই সে পলাইয়া যায়। যমুনার জলে তাহার কাপড় ভাসাইয়া দিয়া সে কলিকাতায় চলিয়া আসে। লোকে জানিয়াছে, মালবিকা মরিয়া গিয়াছে। নীরজানাথ মালবিকাকে ভালবাসে। ত্রিদিব এবং প্রমীবার প্রেম অগ্রসর হইতে লাগিল। মাকড়দ'র কুমারের কাছে আকর্ষণীয় করিয়া তুলিবার জন্য সর্বেশ্বরবাবু কন্যাকে বিবিধ শিক্ষায় শিক্ষিত কবিয়া তুলিতে লাগিলেন। ত্রিদিব প্রমীরাকে বিবাহ করিল। মালবিকা নীবজানাথকে বিবাহ করিল। নীরজানাথ ধনী। মালবিকা সুখের স্বর্গ গডিয়া তুলিতে লাগিল। বিদেশ ভ্রমণেব জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। প্রমীবাও ত্রিদিবকে বিদেশে লইয়া যাইবার জন্য পীডাপীডি করিতে লাগিল। এমন সময় নীরজানাথের জ্ঞাতি নীরজানাথের বাবার উকিলের দ্বারা উইল পাঠাইয়া দিলেন। উইলের সর্ত ছিল, যদি নীরজা দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহ করে, তবে সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইবে। নীরজার পুর্বনাম নৃপনাথ। তাহার পুর্বে একবার বিবাহ হইয়াছিল। সুতরাং মালবিকাকে বিবাহ করিবার জন্য সে সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইল। মালবিকা সমস্ত শুনিয়া মুষড়াইয়া পড়িল। সে আত্মহত্যা করিবার জন্য বিষ আনিল। নীরজাও আত্মহত্যা করিতে চাহিল। সেও বিষ লইয়া আসিল। যে বিষ তাহারা সংগ্রহ করিয়াছিল, তাহা পটাসিয়াম সাইনাইডের পরিবর্তে পটাসিয়াম ব্রোমাইড ছিল। সুতরাং বিষের ক্রিয়া দেখা দিল না। পরে উভয়ে জানিল যে মালবিকা পুর্বে নৃপনাথকেই বিবাহ করিয়াছিল। উভয়ের মিলনের পথে আর কোন বাধা রহিল না। ত্রিদিব এবং সর্বেশ্বরবাবু ধীরে ধীরে নিজেদের প্রকাশ করিতে লাগিলেন। মালবিকা এবং নীরজানাথের জীবন ত্রিদিব

প্রমীরাকে বাস্তব পৃথিবীতে নামাইয়া আনিল। নীরজানাথ সর্বেশ্বরকে তাহার বাড়ীতে লইয়া আসিল। ভাড়ার দায়, কন্তার সমস্যা ইত্যাদি হইতে মুক্তি পাইয়া সর্বেশ্বরবাবু আনন্দের নিঃশ্বাস ফেলিলেন। নাটকখানিতে আধুনিক নাগরিক জীবনের অন্তঃসারশূন্যতাকে তীব্র নিন্দা করা হইয়াছে।

প্রমথনাথ বিশীর 'গবর্ণমেণ্ট ইন্‌পেক্টর' নাটকের বিষয় এই—দিনাজশাহী সহরের ম্যাজিস্ট্রেট সংবাদ পাইয়াছেন যে, গোপনে তথ্যসংগ্রহের জন্য এই সহরে ছদ্মবেশে একজন গভর্ণমেণ্ট ইন্সপেক্টর আসিয়াছেন। এই সংবাদে ম্যাজিস্ট্রেট পঞ্চানন প্রচণ্ড চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তিনি সহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের কাছে এই সংবাদ দিলেন। সরকারী কর্মচারীরা সকলেই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। সিভিল সার্জেন, হেডমাস্টার, পোস্টমাস্টার, পুলিশ সুপার, দাতব্য বিভাগের কর্তা সকলেই নিজ নিজ বিভাগের দোষত্রুটি সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিলেন। সকলেই নিজের নিজের বিভাগের কাজ সাবধানে পরিচালনা করার জন্য অস্থির হইয়া পড়িল। এতদিন যে অব্যবস্থা ছিল, কিছুদিনের জন্য তাহা ধামা চাপা দিবার জন্য যে যার বিভাগ লইয়া ব্যস্ত হইয়া পডিল। এমন সময়ে খবর আসিল কানাইবাবুর হোটেলে সেই ইন্সপেক্টর আসিয়াছেন। ম্যাজিস্ট্রেট হইতে সকলে ভয়ে ভয়ে ইন্সপেক্টরের সহিত দেখা করিতে গেল। আসলে কেরানী অনঙ্গ চম্পটি কানাইবাবুর হোটেলে উঠিয়াছিল। হোটেলে তাহার বিস্তর বাকি পড়িয়াছিল। ম্যাজিস্ট্রেট চম্পটিকে ইন্সপেক্টর ভাবিয়া সরকারীভাবে তাহার সহিত কথাবার্তা বলিল। শেষে হোটেলের বাকি টাকা পরিশোধ করিয়া অনঙ্গ এবং তাহার ভৃত্য মুকুন্দকে নিজের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিল। অনঙ্গ ইহাদের ব্যাপার দেখিয়া তাজ্জব বনিয়া গেল। পরে সে বুঝিতে পারিল যে, ইহারা তাহাকে ইন্সপেক্টর বলিয়া ভুল করিতেছে। ধূর্ত অনঙ্গ ইহাদের বোকামির সুযোগ লইয়া প্রচুর অর্থ আত্মসাৎ করিতে লাগিল। হেড্‌মাস্টার, দাতব্য বিভাগের কর্তা, ম্যাজিস্ট্রেট প্রত্যেকেই এই আশায় টাকা দিতে লাগিলেন, যাহাতে তাঁহাদের স্ব স্ব বিভাগের দোষ ইন্সপেক্টর মন্ত্রীদের কানে না তোলেন। অনঙ্গ অর্থ লইয়া প্রত্যেককেই আশ্বাস দিতে লাগিল। ম্যাজিস্ট্রেটের কন্যা কমলাকে অনঙ্গ বিবাহ করিবার প্রতিশ্রুতি দিল। ম্যাজিস্ট্রেট এত সহজে ইন্সপেক্টরের শ্বশুর হইতেছে দেখিয়া উল্লসিত হইয়া উঠিল। অনঙ্গ এই ব্যাপার জানাইয়া কলিকাতায় পরশুরামের কাছে চিঠি দিল। অনঙ্গ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বিদায় লইয়া

কিছুদিনের মধ্যেই ফিরিয়া আসিবে জানাইল। দিনাজশাহীর ম্যাজিস্ট্রেটের সৌভাগ্যে সকলেই বিস্মিত হইল। অভিনন্দনের পর অভিনন্দন আসিতে লাগিল। ম্যাজিস্ট্রেট আকাশকুসুম রচনা করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে পোস্টমাস্টার অনঙ্গের চিঠি আনিয়া সমস্ত ব্যাপার ফাঁস করিয়া দিলেন। ম্যাজিস্ট্রেট চিঠি দেখিয়া বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইলেন। সকলের মধ্যে একটা শোকের ছায়া নামিয়া আসিল। এমন সময় সংবাদ আসিল, গভর্ণমেণ্ট ইন্সপেক্টর ম্যাজিস্ট্রেটের সহিত দেখা করিবার জন্য আসিয়াছেন।

অতি-আধুনিক নাট্যকারদিগের মধ্যে জলধর চট্টোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি মৌলিক বিষয়বস্তু লইয়া প্রধানতঃ বাংলার সমাজ ও পারিবারিক জীবনভিত্তিক নাটকই রচনা করিয়াছেন, পাশ্চাত্ত্য নাটকের কোনও অনুবাদ কিংবা কোন উপন্যাসের কোন নাট্যরূপ দিবার প্রয়াস পান নাই। তাঁহার 'রীতিমত নাটক' নামক একখানি নাটক অতি-আধুনিক যুগের একটি বিশিষ্ট সৃষ্টি, এই যুগে সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতার অভিনয়ের মাধ্যমে ইহা ব্যাপক প্রচার লাভ করিয়া নাট্যকারের নাম অত্যন্ত জনপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল। নাট্যকার নিজের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, 'প্রায় অর্ধশতাব্দী নাট্যরচনায় আনন্দ লাভ করিতেছি। সংস্কারগত ভাবে পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক নাটক প্রণয়নে উৎসাহবোধ করি নাই বা কোন উপন্যাসের নাট্যরূপদানে আত্মনিয়োগ করি নাই। দেশীয় ভাবধারার অনুকূল কাল্পনিক নাট্য সৃষ্টিতেই আনন্দ পাইতেছি। দেশের মাটির সঙ্গে সম্বন্ধশূন্য হাওলাতী গল্পাংশ লইয়া নাট্যরচনাকে নাট্যসাহিত্যিকের পক্ষে অকর্তব্য মনে করি।' 'দেশের মাটির সঙ্গে' যে নাটকের সর্বোতোভাবে যোগ রাখা আবশ্যক, নাট্যকার তাহা অন্তর দিয়া অনুভব করিয়াছেন ; কিন্তু এই অনুভূতি যে তাঁহার নাটকের মধ্য দিয়া কতদূর সার্থকভাবে রূপায়িত হইয়াছে, তাহাই বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক।

জলধর চট্টোপাধ্যায়ের সর্বপ্রথম নাটক 'সত্যের সন্ধান' ১৩৩৪ সাল বা ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইহা কোন পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বন করিয়া রচিত না হইলেও, পৌরাণিক পরিবেশের মধ্যে কাল্পনিক কাহিনী লইয়া রচিত। সুতরাং ইহাকে রোমান্টিক নাটক বলা যাইতে পারে। ইহার বিষয়-বস্তু এই প্রকার—রাজা স্বয়ম্ভূ পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, সাধুর মধ্যেও অসাধুতা আছে। অহেতুক উৎপীড়নে একজন ব্রহ্মচারীও চন্দন দস্যু প্রমাণিত

হইল, অন্যদিকে অসাধু সৈনিকবৃত্তিধারী হিংস অরিন্দম অহিংস তাপস হইয়া উঠিল। মানুষ অবস্থার দাস—এই বিষয়টি নাটকের মধ্য দিয়া বক্তব্য। পৌরাণিক পরিবেশের মধ্যে আধুনিক সমাজ-জীবনের একটি তত্ত্বকথা ইহার ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। পৌরাণিক নাটকগুলি যখন এই যুগে ক্রমে বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছিল, তখন ইহাদের মধ্য দিয়া আধুনিক রাষ্ট্র ও সমাজ-জীবনের কথাই পৌরাণিক কাহিনীর পরিবেশে যে প্রকাশ পাইত, তাহা মন্মথ রায়ের নাটকের মধ্যেও আমরা লক্ষ্য করিয়াছি, এখানে তাহারই আর একটি পরিচয় পাওয়া যায় মাত্র। নাটকখানি চতুর্থ সংস্করণ পর্যন্ত মুদ্রিত হইয়াছিল। মিনার্ভা থিয়েটারে ইহার অভিনয়ের ভিতর দিয়া যে ইহা ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল, ইহাই তাহার প্রমাণ।

জলধর চট্টোপাধ্যায়ের পরবর্তী নাটক 'প্রাণের দাবী' ইহার দুই বৎসর পরই প্রকাশিত হয়। ইহা পূর্ণাঙ্গ সামাজিক নাটক। ইহার মধ্যে যে সামাজিক সমস্যাটির অবতারণা করা হইয়াছে, সে সম্বন্ধে নাট্যকার নিজেই ভূমিকায় বলিয়াছেন,—'আজকালকার হিন্দু-সমাজে সব চেয়ে বেশী প্রাণহীনতার পরিচয় পাওয়া যায়—নারীজাতির দৈহিক মর্যাদাবোধ বা সতী ধর্মের বিকৃত ব্যাখ্যার মধ্যে। প্রতিদিন সংবাদপত্রগুলি নারীনিগ্রহের যে করুণ-কাহিনী বহন করে আনে—নির্মম পুরুষ যেখানে পাশবিক হিংস্রতা নিয়ে নারীকে আক্রমণ করে, দুর্বল নারীর পক্ষে সেখানে আত্মরক্ষার উপায় কি? নারীকে রণরঙ্গিণী করে তুললেও ত সে সমস্যার সমাধান হবে না! আত্মরক্ষার জন্য অত্যাচারিত যতখানি প্রস্তুত হতে পারে, আক্রমণের জন্যে অত্যাচারিতের প্রস্তুতিও হতে পারে, তার চেয়ে বহুগুণ বেশী। দৈহিক প্রতিযোগিতায় পুরুষের কাছে নারীর পরাজয় অনিবার্য হলেও, তার "প্রাণের দাবী" অগ্রাহ্য হবে কেন? নাবিকের দিঙ্-নির্ণয় যন্ত্রের মত নারীমন যতক্ষণ কোন ধ্রুব লক্ষ্যে অবিকম্পিত থাকবে, ততক্ষণ তার শুচিতাকে অস্বীকার করবার অধিকার কোনো সমাজের নেই। কেন হবে না সেই নারী, প্রাতঃস্মরণীয়া, মহাপাতকনাশনা পঞ্চকন্যার মতই সতীত্বের গৌরবে আরও উজ্জ্বল, আরও পবিত্র? অতএব নারীধর্মের মূলকথা "প্রাণের দাবী"—দেহের বিকার নয়।' ইহার অর্থ এই যে, নারীর মন যদি পবিত্র থাকে, তবে দেহ পরপুরুষের স্পর্শে অপবিত্র হইলেও সে অশুচি হইতে পারে না, সমাজের এই বিধান নির্মম এবং প্রাণহীন। পতিতা অচলার জীবন অবলম্বন করিয়া নাট্যকার এই কথাই এই নাটকে বলিতে

চাহিয়াছেন। সমসাময়িক কথাসাহিত্যে পতিতা চরিত্রের মধ্যে মাহাত্ম্য ও প্রেম অনুসন্ধান করিবার প্রয়াস যে দেখা দিয়াছিল, ইহা তাহারই প্রভাবজাত বলিয়া মনে হইলেও ইহার মধ্যে নাট্যকারের বক্তব্য বিষয়ে যে বলিষ্ঠতার প্রকাশ দেখা যায়, তাহা তাঁহার নিজস্ব। তবে তাঁহার বক্তব্য বিষয় অনেক সময় বক্তৃতার রূপ লাভ করিয়াছে—ইহাই নাটকের সামান্য একটু ত্রুটি।

ইহার পর জলধর চট্টোপাধ্যায়ের 'রাঙ্গা রাখী' সামাজিক নাটক রচিত হয়। ইহাও মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত হইবার ফলে ব্যাপক লোকপ্রীতি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। একটি একান্নবর্তী পরিবারের সুখদুঃখ হাসিকান্নার বৃত্তান্ত লইয়া এই নাটকখানি রচিত হইয়াছে। নাট্যকার ইহার 'কৈফিয়তে' লিখিয়াছেন, 'চরিত্র সৃষ্টির দিক দিয়ে আমি কতকগুলি জীবন্ত "মডেলে"র সাহায্য গ্রহণ করিছি।' এই সকল 'মডেল'কে যে তিনি আনুপূর্বিক নিখুঁত রাখিতে না পারিয়া 'বিপর্যস্ত' করিতে বাধ্য হইয়াছেন, এ কথাও নাট্যকার উল্লেখ করিয়াছেন। তবে তিনি একথাও বলিয়াছেন, 'ইহার বারো আনাই সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত', তবে ঘটনার পরিণতিটি সম্পূর্ণ কল্পিত।

সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক ডাঃ সদাশিব মুখোপাধ্যায় ও তাঁহার চারি কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও তাহাদের পত্নীদিগের নিতান্ত বাস্তবধর্মী এক পরিবারিক জীবন-কাহিনী আশ্রয় করিয়া নাটকখানি রচিত হইয়াছে। 'জীবন্ত মডেল' সম্মুখে রাখিয়া এই পারিবারিক জীবন-চিত্রটি রচিত হইয়াছে বলিয়া ইহা বিশেষ শক্তিশালী বলিয়াই অনুভূত হইবে; কিন্তু ইহার পরিণতির অংশ লেখকের কল্পনার ফল বলিয়া তাহা একটু অতি-নাটকীয় পরিচয় লাভ করিয়াছে বলিয়া কাহারও মনে হইতে পারে। নাট্যকারের রচনায় একটি সুনিবিড় গার্হস্থ্য জীবনের পরিচয় এখানে সুন্দর প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি যে বাংলার মাটির সঙ্গে সম্পর্কের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, ইহার মধ্যে তাহার পরিচয় ব্যথ হয় নাই। গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল' নাটক রচনার পর যৌথ পরিবারের সমস্যা লইয়া যে সকল নাটক রচিত হইয়াছিল, তাহাদের উপর গিরিশচন্দ্রের প্রভাব অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি পারিবারিক জীবনের সক্রিয় আদর্শ নাট্যকারের সম্মুখে ছিল বলিয়া ইহার মধ্যে তাহা অনুভূত হয় না। দীনবন্ধু ও গিরিশচন্দ্রের সর্ববিষয়ক প্রভাব হইতে মুক্ত

হইয়া সেই যুগে যে সকল পারিবারিক জীবন-ভিত্তিক বাংলা নাটক রচিত হইয়াছিল, ইহা তাহাদের অন্যতম। তবে শরৎচন্দ্রের সামাজিক উপন্যাসগুলির প্রভাব ইহাদের উপর যে ছিল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

রোমান্টিক বিষয়-বস্তু অবলম্বন করিয়া অতঃপর জলধর চট্টোপাধ্যায়ের 'শক্তির মন্ত্র' নাটকখানি রচিত হয়। রাজ্যচ্যুত এক কল্পিত ভক্ত বৈষ্ণব রাজা মুক্তিকাম, তাহার পত্নী কমলা, অত্যাচারী শাক্ত রাজা শক্তিধর ইত্যাদির আনুপুর্বিক এক কল্পিত কাহিনী ভিত্তি করিয়া নাটকখানি রচিত হইয়াছে। বাংলা নাট্যসাহিত্যের আদি ও মধ্যযুগে যে সকল রোমান্টিক নাটক রচিত হইয়াছে, তাহাদের একটি প্রধান গুণ এই ছিল যে, ইহাদের সুনিবিড় কাল্পনিক বা কল্পজগতের পরিবেশ কদাচ ক্ষুণ্ণ হইত না, দুই একজন অক্ষম নাট্যকারের রচনায় তাহার ব্যতিক্রম দেখা যাইত মাত্র। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর রোমান্টিক নাটকের মধ্যে প্রায়শঃই সেই কাল্পনিক পরিবেশের নিবিড়তা রক্ষা পাইত না। 'শক্তির মন্ত্র' নাটকেও তাহা রক্ষা পায় নাই। ইহার মধ্যে আধুনিক সমাজের বহু প্রত্যক্ষ ও পরিচিত জীবনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ঘটে, তাহাতে ইহার রোমান্টিক রস অনেকখানি ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। অত্যাচারী রাজশক্তির প্রতীক শক্তিধর প্রাণহীন যন্ত্রদানবের মত আচরণ করিয়াছে, ইহার কোন রক্তমাংসের পরিচয় প্রকাশ পাইতে পারে না। তাহার কন্যা সুনন্দা করুণার প্রতিমূর্তি, রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নাটকের অপর্ণার মত আদর্শ প্রতিমা মাত্র। তবে নাট্যকারের অভিপ্রায় ছিল অন্যরূপ, অত্যাচারী শক্তিধরকে তিনি প্রাণবান্ ব্যক্তি এবং সমাজকে প্রাণহীন করিয়া অঙ্কিত করিতে চাহিয়াছিলেন। কাহিনীর শেষ প্রান্তে আসিয়া নাটকীয় চরিত্রের গোপন পরিচয়ের রহস্যোদ্ধার রোমান্টিক নাটকের একটি বিশেষত্ব, এইভাবে শক্তিধরের পরিচয়-রহস্য উদ্ধারের ভিতর দিয়াই এই নাটকের যবনিকা পাত হইয়াছে।

ইহার পর ১৩৩৯ সালে জলধর চট্টোপাধ্যায় 'আঁধারে আলো' নামক এক-খানি সামাজিক নাটক রচনা করেন, ইহা ঐ বৎসর নাট্যনিকেতনে অভিনীত হইয়াছিল ; কিন্তু কোন দিন মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয় নাই। সেই বৎসরই তাঁহার 'অসবর্ণা' নামক আর একখানি সামাজিক সমস্যামূলক নাটক রঙমহল নাট্যমঞ্চে অভিনীত হয়, কিন্তু তাহাও মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয় নাই। অস্পৃশ্যতা বর্জন সঙ্কল্প করিয়া মহাত্মা গান্ধীর একুশ দিনের জন্য অনশনব্রত

গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা উপলক্ষ করিয়া অতঃপর জলধর চট্টোপাধ্যায় 'মন্দির প্রবেশ' নামক একখানি সামাজিক নাটক রচনা করেন। ১৩৪২ সালে তাঁহার 'আত্মাহুতি' নামক আরও একখানি সামাজিক নাটক রঙমহল নাট্যমঞ্চে অভিনীত হইয়াছিল, কিন্তু তাহাও মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয় নাই।

জলধর চট্টোপাধ্যায়ের সর্বাধিক জনপ্রিয় নাটক 'রীতিমত নাটক'। আধুনিক বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ নট শিশিরকুমার ভাদুড়ী ইহার একটি ভূমিকায় বিস্ময়কর অভিনয় করিয়াই প্রধানতঃ নাটকখানিকে জনপ্রিয় করিয়া তুলিলেও ইহার মধ্যে যে কতকগুলি বিশিষ্ট নাটকীয় গুণ প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা সেই যুগের বহু নাটকের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায় নাই। সুতরাং নাটকখানি বিস্তৃত আলোচনার যোগ্য।

১৩৪২ সাল অথবা ১৯৩৬ সনে নব-নাট্যমন্দিরে শিশিরকুমার ভাদুড়ীর প্রযোজনায় জলধর চট্টোপাধ্যায় রচিত 'রীতিমত নাটকে'র প্রথম উদ্বোধন হয়। ইহার কাহিনী এই—দিগম্বর মৌলমিনে অধ্যাপনা করিতেন, তাঁহার পত্নীর নাম স্বাগতা। দিগম্বরের মাতৃপিতৃহীনা ভগ্নী শান্তা তাঁহাদের সঙ্গে থাকিয়াই লেখাপড়া শিখিত, তাহার বিবাহের বয়স হইয়াছে, কিন্তু তখনও বিবাহ হয় নাই। বিবাহ করিবার তাহার ইচ্ছাও ছিল না, লাইব্রেরীতে পড়াশুনা লইয়াই সে সর্বদা ব্যস্ত থাকিত। বীরেন নামক এক বাঙ্গালী যুবক দিগম্বরের মোটর চালকের কাজ করিত, যুবক সুপুরুষও ছিল। বিদেশে বাঙ্গালীর ছেলে বলিয়া সে পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিত; এমন কি, শান্তাকে একা গাড়ীতে করিয়া লইয়া হাওয়া খাইতে যাইত। দিগম্বর কিছুই মনে করিতেন না, স্বাগতা কিছু মনে করিলেও স্বামীর নিকট এ বিষয়ে কিছুই বলিতে সাহস পাইত না। কিন্তু একদিন বীরেন ও শান্তা হাওয়া খাইতে বাহির হইল, আর ফিরিল না। এক পাহাড়ের নীচে গাড়ীটি ফেলিয়া রাখিয়া তাহারা উভয়েই নিরুদ্দেশ হইয়া গেল। তাহাতে শান্তা একখানি চিঠি লিখিয়া রাখিয়া গেল যে, সে চিরবিদায় লইয়া যাইতেছে, তাহাকে যেন কেহ অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিবার চেষ্টা না করে। তখন হইতেই দিগম্বর মিত্রের মস্তিষ্ক-বিকৃতির লক্ষণ দেখা যাইতে লাগিল। স্ত্রী-জাতির প্রতি অবিশ্বাস ও ঘৃণাই তাহার ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইতে লাগিল। ক্রমে মৌলমিনের অধ্যাপনার চাকুরিটি ছাড়িতে হইল, চিকিৎসার জন্য স্বাগতা তাহাকে লইয়া কলিকাতায় আসিল। সেখানে সুহৃৎ ডাক্তার

চিকিৎসা করিবার সূত্রে তাহাদের গৃহে যাতায়াত করিতে লাগিল, সুন্দরী যুবতী স্বাগতার প্রতি তাহার লুব্ধ দৃষ্টি পড়িল। দিব্যেন্দু নামক একজন নাট্যকার স্বাগতাকে নানা ভাবে সাহায্য করিবার জন্য অগ্রসর হইয়া আসিল, দিগম্বর তাহাকেও সন্দেহ করিতে লাগিলেন। স্বাগতার দাদা অর্থসাহায্য করিয়া পরিবারটিকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার পক্ষে তাহাও কঠিন হইয়া উঠিল। একদিন দিব্যেন্দু রচিত একটি নাটকের অভিনয়ের বিজ্ঞাপনে এক অভিনেত্রীর চিত্র দেখিয়া স্বাগতার সন্দেহ হইল যে, ইহা শান্তার ছবি। সে দিগম্বরকেও তাহা দেখাইল, পরে তাহাকে লইয়া থিয়েটার দেখিতে চলিল। রঙ্গমঞ্চে 'হরধনুভঙ্গে'র অভিনয় হইতেছে। সীতা-স্বয়ম্বর দৃশ্যে রামরূপী বসন্ত ও সীতারূপিণী বুলবুল আবির্ভূত হইল। দীননাথ নামক এক বৃদ্ধ দীর্ঘকাল যাবৎ তাহার পুত্র বসন্তের কোন সন্ধান না পাইয়া কোন সূত্রে জানিতে পারিল যে, সে এই রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিয়া থাকে। শুনিয়া সেই দিনই বসন্তের স্ত্রী ও বালক পুত্রকে সঙ্গে করিয়া রঙ্গমঞ্চে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, সে বসন্তকে দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। বহুদিন পর বসন্ত তাহার পুত্র মধুময়কে পাইয়া বুকে জড়াইয়া ধরিল। বুলবুল যখন জানিতে পারিল, বসন্তের আর এক স্ত্রী বর্তমান, তখন সে মূর্ছিত হইয়া পড়িল। স্বাগতা চিনিল, রামচন্দ্ররূপী বসন্তই বীরেন এবং সীতারূপিণী বুলবুলই—শান্তা। বসন্তের পূর্ববিবাহিত স্ত্রীর নাম সান্ত্বনা, তাহার পিতা বদ্‌মেজাজী জমিদার ছিলেন, একদিন জামাতাকে অপমানিত করিয়া নিজগৃহ হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন, তদবধি সে পত্নী ত্যাগ করিয়া নিরুদ্দিষ্ট ছিল। দিব্যেন্দুর নিকট স্বাগতা এ কথা জানিতে পারিল। দিব্যেন্দুর নিকট হইতে বুলবুল বলিয়া পরিচিতা শান্তা দিগম্বরের সকল কথা শুনিতে পাইল, শুনিয়া তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিবার জন্য অধীর হইয়া উঠিল। বিশ্বাসঘাতক বসন্তর প্রতি তাহার ঘৃণা জন্মিয়া গেল। শান্তা স্বাগতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাহার অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিল, কিন্তু বলিল, 'আমি তার ধর্মপত্নী—শাস্ত্রমতে বিবাহিতা স্ত্রী! হিন্দু নারীর একনিষ্ঠা ও পাতিব্রত্যধর্মে আমি জলাঞ্জলি দিই নি! তোমরা বিশ্বাস ক'রো আমি চরিত্রহীনা নই।' স্বাগতা সবই বুঝিতে পারিল, কিন্তু এ'কথা কি করিয়া স্বামীকে বুঝাইবে, তাহাই বুঝিতে পারিল না। এ দিকে দৈবদুর্ঘটনায় বসন্তের রিভলবারের গুলিতে সান্ত্বনার মৃত্যু হইল, পুলিশের ভয়ে বসন্ত ফেরার হইয়া গেল, শান্তা মধুময়কে

নিজের আশ্রয়ে লইয়া লালন পালন করিতে লাগিল। জানা গেল, সান্ত্বনা দিব্যেন্দুর ভগ্নী; সে বসন্তকে পুলিশে ধরাইয়া দিয়া শাস্তি দিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। কখনও মুস্কিল আসান, কখনও বা পাঞ্জাবী ড্রাইভারের ছদ্মবেশ ধরিয়া বসন্ত গোপনে শান্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। শান্তার দিকে চাহিয়া দিব্যেন্দু বসন্তকে ক্ষমা করিল, পুলিশের হাত হইতে তাহাকে রক্ষা করিল। অনুতপ্ত শান্তা দাদা দিগম্বরের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিবার জন্য নিজেই আসিয়া তাহার সম্মুখে কাঁদিতে লাগিল। দিব্যেন্দুও আসিয়া তাহার পাশে দাঁড়াইল। দিগম্বর শান্তাকে চিনিতে পারিয়া বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিলেন। বসন্ত দিগম্বরের হাতে নিজের পিস্তলটি তুলিয়া দিয়া তাহাকে শাস্তি দিতে বলিল। দিগম্বর রিভলবার হাতে লইয়া তাহার দিকে লক্ষ্য করিলেন, এমন সময় স্বাগতা আসিয়া বাধা দিল, বলিল, 'কি করছ?... শুধু আমার কপালের সিঁদূর মুছবে না, তোমার বড় আদরের শান্তাকেও বিধবা কর্‌বে তুমি! চেয়ে দেখ, তার কপালেও সিঁদূর আছে!' শান্তা দাদার পায়ের তলে লুটাইয়া পড়িয়া বলিল, 'দাদা, ওকে ক্ষমা করো—ও আমার স্বামী!' 'দিগম্বর কিছুক্ষণ হাসিলেন, কাঁদিলেন, হাসি-কান্নার সংমিশ্রণ হইল—শান্তা ও বসন্ত পদতলে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল—তিনি দু'জনকেই টানিয়া তুলিয়া বুকে চাপিয়া ধরিলেন।'

এই নাটকের কাহিনীবিন্যাস, চরিত্রসৃষ্টি ও জীবন-দর্শন জলধর চট্টোপাধ্যায়ের অন্যান্য নাটক হইতে এতই স্বতন্ত্র যে, ইহা শিশিরকুমার ভাদুড়ীর পরিচালনায় নব-নাট্যমন্দিরে প্রথম অভিনীত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সকলে এ'রূপ সন্দেহ প্রকাশ করিতে লাগিল যে, যদিও শিশিরকুমার নিজে কোন নাটক রচনা করেন নাই, তথাপি ইহা তাঁহারই রচনা, কোন কারণে জলধর চট্টোপাধ্যায়কে নাট্যকার রূপে উল্লেখ করা হইয়াছে মাত্র। এমন কি, এই নাটকের তৃতীয় সংস্করণ যখন প্রকাশিত হয়, তখন নাট্যকারকে এইজন্য এক সুদীর্ঘ 'কৈফিয়ৎ' দিতে হয়। তিনি তাঁহার কৈফিয়তে লিখিয়াছেন—রীতিমত নাটকের প্রথম সংস্করণ ছ' মাসের মধ্যে নিঃশেষ হ'য়ে যায়। দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপার পর আমি অনেক চিঠিপত্তর পাই; অনেকেই জিজ্ঞাসা করেন, এই নাটক রচনায় শিশিরবাবু আমাকে কি ভাবে, কতটুকু সাহায্য করেছেন? তখন ভেবে রেখেছিলাম, তৃতীয় সংস্করণে একটি কৈফিয়ৎ দেবো।...

'আমার লিখিত মূল পাণ্ডুলিপির নাম ছিল "রঙ্গমঞ্চ"। "রীতিমত নাটক"

নামটি শিশির বাবুর দেওয়া। রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজনে "গল্পটিকে ঢেলে সাজবার" জন্য শিশিরবাবু আমাকে কয়েকটি মূল্যবান্ উপদেশ দেন। আমিও তদনুসারে নাটকখানি "রিরাইট" করি। চরিত্র-সৃষ্টি, ঘটনা-সমাবেশ, সংলাপ-যোজনা বিষয়ে শিশিরবাবু আমাকে কোন সাহায্যই করেন নি'।'

শিশিরকুমার স্বয়ং দিগম্বর চরিত্র অভিনয় করিয়া নাটকখানির জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করেন। অধ্যাপক দিগম্বর-চরিত্রের বিদগ্ধজনোচিত ইংরেজি ও বাংলা আবৃত্তি নাটকটির একটি বিশিষ্ট আকর্ষণ সৃষ্টি করিয়াছিল। আবৃত্তির এই উদ্ধৃতিগুলি সম্পর্কেও নাট্যকার কৈফিয়তে লিখিয়াছেন, 'দিগম্বর-চরিত্রের সুযোগ নিয়ে যদিও সুপণ্ডিত শিশিরবাবু রঙ্গমঞ্চে নিত্য নূতন "কোটেশন" আবৃত্তি করে থাকেন, তবু এ' কথাটি প্রকাশ থাকা উচিত যে মুদ্রিত নাটকে সেক্সপীয়র, মিল্‌টন প্রভৃতির লেখা থেকে আমার সংলাপের গতির সঙ্গে যে সব কোটেশন উদ্ধার করা হ'য়েছে, তা আমি নিজেই ক'রেছি। সে দিক দিয়েও শিশির বাবুর নিকট থেকে কোনো সাহায্য নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হয় নি'। মুদ্রিত নাটকে কোটেশনের ভঙ্গিতে আমার নিজের রচনা কয়েকটি ইংরেজি কবিতাও সন্নিবিষ্ট আছে।'

'কৈফিয়তে'র উপসংহারে নাট্যকার লিখিয়াছেন,—'অভিনয়ের প্রয়োজনে ডিরেক্টারের চাহিদা অনুসারে অনেক সময় নাটকীয় ঘটনা-সমাবেশের ওলট্-পালট অপরিহার্য হয়ে পড়ে। বিজ্ঞ ডিরেক্‌টারের হাতে পড়্‌লে সে কারণে গল্পের মাধুর্য ও চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় না। এ ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। শিশির বাবুর পরামর্শেই গল্পের মাধুর্য অক্ষুণ্ণ রেখে নাটকখানিকে মঞ্চোপযোগী করেছিলাম—এ' কথা অস্বীকার করবো না। তবে মূল নাটক রচনা-বিষয়ে শিশিরবাবু আমার পাণ্ডুলিপিতে কোনো রেখাপাত করেন নি।। সে সম্বন্ধে কারো মনে কোনো ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি হওয়া উচিত নয়।...'

এই নাটকেরই একটি বাংলা বাণীচিত্ররূপ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার নাম ছিল, Talkie of Talkies ; ইহার রচয়িতারূপে শিশিরকুমার ভাদুড়ীরই নাম উল্লেখিত হইয়াছিল। ইহার কৈফিয়ৎ রূপে শিশিরকুমার ভাদুড়ী স্বয়ং একটি 'নিবেদন' প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছিলেন,

'এই নাটকের আখ্যায়িকা জলধরবাবু আমার কাছে এনেছিলেন। আমার খুব ভাল লেগেছিল। তারপর অভিনয়ার্থে যত কিছু পরিবর্তন করতে চেয়েছি, অসীম ধৈর্য সহকারে সে বিষয়ে তিনি আমাকে সাহায্য করেছেন।

এই নাটকের নাট্যকার হিসাবে নামটা যে আমার দেওয়া হয়েছে, সে শুধু তাঁরই অনুরোধে। নতুবা এই নাটকের মধ্যে যা কিছু নাট্য—তা' জলধরবাবুর নিজের, তা' আমার নয়। তবে আমি নিজের নাম এ'র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ক'রেছি কেন? তার কারণ, আমার মনে হয়েছে, আমি যদি নিজে এই নাটকটি রচনা করতে পারতাম, তা হ'লে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করতাম।'

এ' কথা সত্য, সমসাময়িক কালে যে শ্রেণীর নাটক প্রকাশিত হইতেছিল, তাহার মধ্যে ইহা একটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম বলিয়াই মনে হইবে। ইহার কাহিনী প্রথম হইতে সুদৃঢ় সংহতি রক্ষা করিয়া পরিণতি পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে; চরিত্র রূপায়ণে বাস্তব জীবনবোধের সার্থক বিকাশ দেখা যায়; দিগম্বর চরিত্রের পরিকল্পনা এক দিক দিয়া যেমন বাস্তবধর্মী, অন্য দিক দিয়া তেমনই বিদগ্ধ মানস-প্রসূত। একটি উচ্চশিক্ষিত সাহিত্যভাববিলাসী চরিত্র আকস্মিক মানসিক আঘাতের ফলে যে বুদ্ধি-বিপর্যয়ের সম্মুখীন হওয়া স্বাভাবিক, তাহার সুনিপুণ ও সরস বর্ণনায় ইহা আকর্ষণীয় হইয়া উঠিয়াছে। তবে সান্ত্বনাব মৃত্যুর মধ্য দিয়া যে অতি-নাটকীয়তার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা কোন দিক দিয়া পবিহার করিতে পারিলে, ইহাব পরিণতি আরও সুখকর বলিয়া বোধ হইত। কারণ, সান্ত্বনার মাতৃহারা পুত্র মধুময়কে সম্মুখে রাখিয়া ইহার কাহিনী যে পরিণতির মধ্যে সমাপ্তি লাভ করিয়াছে, তাহাতে সান্ত্বনার মৃত্যুর বেদনার ছায়াটুকু কিছুতেই মুছিয়া যাইতে পারে নাই। দিগম্বরের ক্ষমা লাভ করিবার মধ্যেও বসন্তের সান্ত্বনাকে অবহেলা করিবার পাপ কিছুতেই দূর হইয়া যাইতে পারে নাই। এই নাটকের সংলাপ যেমন সতেজ ও গতিশীল, তেমনই কবিত্বের স্পর্শ লাভ করিয়া সরস। দীর্ঘ কাল যাবৎ বাংলা সাহিত্যে যে বৈচিত্র্যহীন ও রোমান্টিকধর্মী নাটক রচিত হইতেছিল, তাহার মধ্যে এই নাটকখানি সে দিন এক দুর্লভ ব্যতিক্রম সৃষ্টি করিয়াছিল। একটি বিশিষ্ট অভিনেতৃগোষ্ঠীর অভিনয় কৌশলের উপর ইহার প্রচার সে দিন সম্ভব হইয়াছিল; তাহার ফলে রঙ্গমঞ্চের মধ্যেও ইহার প্রচার সে দিন যেমন সীমাবদ্ধ ছিল, আজও তেমনই আছে।

'রীতিমত নাটক' হইতেই যে জলধর চট্টোপাধ্যায়ের নাট্যরচনার ধারা এই নূতন আদর্শই অনুসরণ করিয়া চলিল, তাহা নহে, তিনি তাঁহার পূর্ববর্তী ধারা অনুসরণ করিয়া ইহার পাঁচ বৎসর পর 'সিঁথির সিঁদুর' নামক নাটক রচনা করিলেন। সেকেলে গ্রাম্য জমিদার মাধব রায়ের রক্ষণশীলতা ও তাহার

পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত পৌত্রের আধুনিকতার দ্বন্দ্ব লইয়া প্রধানতঃ এই নাটক রচিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে উগ্র আধুনিকতাকে গ্রহণ করিবার কিংবা প্রাচীন ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিবার পরিবর্তে উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনের প্রয়াস দেখা যায়। ইহাতে আধুনিক কোর্টশিপ করিয়া বিবাহিত দম্পতির যুবকটির আচরণ প্রাচীনপন্থী মাধব রায় সমর্থন করিলেন না, কিন্তু তাঁহার শিক্ষিতা যুবতী পত্নীকে এই বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন, 'কিন্তু, কিন্তু আমার এই দিদিমনির "সিঁথির সিঁদুর" যেন অক্ষয় হয়।' সুতরাং ইহার মধ্যে যথার্থ সামঞ্জস্য স্থাপনের প্রয়াসও যে সফল হইয়াছে, তাহাও বলা যায় না।

ইহার পর রচিত জলধর চট্টোপাধ্যায়ের 'পি-ডব্‌লিউ-ডি' নাটকখানিও এককালে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। তবে সমসাময়িক অভিনয়গুণেই যে ইহার পক্ষে এই জনপ্রিয়তা বহুলাংশে সম্ভব হইয়াছিল, তাহাও মনে করা অসঙ্গত নহে। 'সেবিকা-সঙ্ঘ', তাহার সেক্রেটারী, কয়েকজন সেবিকা ও তাহাদের পাণিপ্রার্থীর বিবরণ লইয়া এই কাহিনী রচিত। ইহার নায়িকার নাম শ্যামলী, সে সঙ্ঘের একজন সেবিকা, এক ধনশালী বৃদ্ধের পরিচর্যার ভিতর দিয়া তাহার জীবনের বিচিত্র গতিপথ রচিত হইয়াছে। শেষ দৃশ্যে সেবিকা সঙ্ঘের সেক্রেটারীর মুখের উপর রিভলভার ধরিয়া এক পকেটমার ভবঘুরে শ্যামলী নিষ্পাপ কি না তাহা জিজ্ঞাসা করে, তাহার উত্তরে সে নারীচরিত্রের 'রহস্য' এই ভাবে প্রকাশ করিয়া বলে, 'এই শ্যামলীকে আমি ভালোবাসি! অত্যন্ত ভালোবাসি—পাঁচ বছর সে ছিল আমার কাছে—কখ্‌খনো তার মুখের দিকে কুভাবে তাকাইনি—ছোট বোনটির মতই দেখেছি। তোমার কাছে সে ছিল মাত্তর পনর দিন। তাতেই আজ তার কুমারী জীবন কলঙ্কিত হ'য়ে উঠেছে। শ্যামলী আজ তোমাকেই ভালোবাসে আর আমাকে করে ঘৃণা। মেয়েদের সম্বন্ধে আমার মনে যে কত বড় একটা ভুল ধারণা ছিল, তা আজ আমি বুঝতে পারছি।' ইহাই এই নাটকের বক্তব্য বিষয়। এই নাটকে একটি নূতন আঙ্গিক বা technique ব্যবহার করা হইয়াছে। উপরোক্ত দৃশ্যে শ্যামলী সেন সাহেবের হাত হইতে রিভলবারটি কাড়িয়া লইতে গেল, এমন সময় বন্ধনীর মধ্যে নাট্যকার লিখিতেছেন,—'এই সময় একটা ভুল হইয়া গেল। অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ মনে করিলেন, নাটক শেষ হইয়া গিয়াছে—সকলেই নিজের পোষাক খুলিয়া ফেলিলেন। কেহ বা গুণ গুণ করিয়া গান গাহিতেছিলেন—কেহ বা অভিনয়ের সমালোচনা করিতেছিলেন।

একটা বিশৃঙ্খলা আবম্ভ হইল। হঠাৎ প্রম্‌টাব খাতা, বাঁশী ও টর্চ লইয়া ঢুকিলেন।' তাবপর

প্রমটাব। আপনারা করছেন কি? এখনো ড্রপ পড়েনি।

সেন সাহেব। অ্যাঁ, ড্রপ পড়েনি। কেন?

প্রমটাব। আপনাব পার্ট বাকি আছে যে ·

সেন সাহেব। তাই নাকি? দশটা টাকা দাও। নেই? হা হা হা··
then, my P. W. D. work is over. Good night, ladies and gentlemen, good night.

[সকলে এক সঙ্গে গাহিল]

মায়া-প্রপঞ্চময আমাদেব এই মঞ্চমাঝে—
নটবব শ্রীজলধব যাবে যা সাজান সে তাই সাজে।"

—যবনিকা—

বাংলাব নাট্যসাহিত্যেব মধ্যযুগে গিবিশচন্দ্র ঘোষেব কোন কোন নাটকে প্রায় অনুরূপ আঙ্গিক ব্যবহৃত হইয়াছিল, কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে ইহাদেব আবেদন সার্থক হইতে পারে নাই।

ইহার পব জলধব চট্টোপাধ্যায় 'নাবীধর্ম' নামক একখানি সামাজিক নাটক বচনা কবেন, ইহাব মধ্যেও ভাবতীয় নাবীত্বেব আদর্শের প্রতি নাট্যকাবেব নিষ্ঠা প্রকাশ পাইয়াছে। বিংশ শতাব্দীব সর্ববিধ নাবী-'প্রগতি'-মূলক আন্দোলনেব যুগে নাটক বচনা কবিয়াও নাট্যকাব যে প্রাচীন আদর্শেব প্রতিই শ্রদ্ধাবান্‌ ছিলেন, এই নাটকখানি তাহাব প্রমাণ। নাট্যকার জলধব চট্টোপাধ্যায়েব ইহা একটি বিশেষত্ব। তিনি নাবী-প্রগতি-বিষয়ে বাংলাব সমাজেব বাস্তব রূপটিকে উপেক্ষা কবেন নাই, যাহা নাই তাহাকে ভিত্তি করিয়া নাটক বচনা কবেন নাই, তাঁহাব সামাজিক নাটকে এ দেশেব সমাজে যাহা প্রত্যক্ষভাবে বর্তমান আছে, তাহার কথাই বলিয়াছেন। তাঁহাব 'নাবীধর্ম' ইহার কোন ব্যতিক্রম নহে।

ইহার পরবর্তী রচনা 'হাউস ফুল' জলধব চট্টোপাধ্যায়েব একখানি প্রহসন, ইহাব নামকবণ হইতেই ইহার বিষয়-বস্তুব আভাস পাওয়া যাইতে পারে। ইহা বিশেষত্বহীন রচনা হইলেও মিনার্ভা থিয়েটাবে কিছুকাল অভিনীত হইয়াছিল। কবি কালিদাসের কিংবদন্তীমূলক জীবন-কাহিনী অবলম্বন করিয়া জলধর চট্টোপাধ্যায় 'কবি কালিদাস' নামক একখানি পূর্ণাঙ্গ নাটক

রচনা করিয়াছিলেন, ইহাও মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছিল। ১৯৪৬ সনে কলিকাতায় মুস্‌লীম লীগের 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' (Direct Action) উপলক্ষে যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং তারপর নোয়াখালিতে যে মর্মান্তিক ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, তাহার বিষক্রিয়া লক্ষ্য করিয়া হিন্দু-মুসলমান মিলনের সদুদ্দেশ্যে জলধর চট্টোপাধ্যায় 'থামাও রক্তপাত' নামক নাটক রচনা করেন। ইহাও মিনার্ভা থিয়েটারে কিছুকাল অভিনীত হইয়াছিল। ইহা একান্ত সমসাময়িক বিষয় অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছিল বলিয়া ইহার আবেদন দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে নাই। এই নাটক সম্পর্কে নাট্যকার নিজস্ব 'বক্তব্যে' প্রকাশ করিয়াছেন, 'জনমত গঠনের পক্ষে রঙ্গমঞ্চের শ্রেষ্ঠত্ব সবদেশে ও সবকালে মানিত। নাট্যরস পরিবেশনের ভিতর দিয়ে এই চোরাবালিতেই জাতিগঠনের কংক্রিটভিত্তি রচনার ভার, নাটমণ্ডপ আজ যতখানি নিতে পারে, তত আর কেউ পারে না। এই ধারণা নিয়েই আমি "থামাও রক্তপাত" লিখেছি—কতখানি কৃতকার্য হয়েছি জানি না।' সুতরাং ইহা সুস্পষ্ট উদ্দেশ্যমূলক রচনা, লেখকের রচনার মধ্য দিয়া এই উদ্দেশ্য কোথাও গোপন থাকিতে পারে নাই।

জলধর চট্টোপাধ্যায়ের সর্বশেষ নাটক 'ডাঃ শুভঙ্কর' ১৯৫৮ সনে প্রকাশিত হয়। এত দীর্ঘ ব্যবধানে তাঁহার ইতিপূর্বে আর কোনও নাটক প্রকাশিত হয় নাই। তাঁহার এই নাটকখানিও যে আশানুরূপ সাফল্যলাভ করিয়াছে, এমন কথা বলিতে পারা যায় না। দর্শক এবং পাঠকের রুচি আজ সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে, নূতন যুগের নূতন প্রেরণা অনুযায়ী নাটক রচনায় যে তিনি সার্থক হইয়াছেন, এ'কথা বলিবার উপায় নাই। 'ডাঃ শুভঙ্কর'কে সামাজিক নাটকই বলা যায়, কিন্তু জলধর চট্টোপাধ্যায় এ' যাবৎকাল যে সমাজ জীবন ভিত্তি করিয়া নাটক রচনা করিয়া আসিতেছিলেন, ইহাতে সেই সমাজ- নাই, মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যেই শিক্ষিত বাঙ্গালীর সমাজ ও চিন্তার জগতে যে পরিবর্তন দেখা দিয়াছে, ইহা তাহাই অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছে। এই নাটকের নায়ক ডাঃ শুভঙ্কর নারী-প্রগতি-বিরোধী উচ্চশিক্ষিত ডাক্তার, তাহার স্ত্রী সুজাতা এম. এ. অধ্যাপিকা। স্বামী স্ত্রীকে চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া সন্তানের প্রতি যত্ন লইতে বলে, স্ত্রী তাহাতে অসম্মত হয়, এই বিষয়ের ভালমন্দের আলোচনা ও বিচার লইয়াই নাটক। এই বিষয়ে নাট্যকার তাঁহার নাটকে একটি সুদীর্ঘ 'কৈফিয়ৎ' দিয়াছেন, তাহাতেই এই নাট্য

রচনায় তাহার মূল উদ্দেশ্য কি; তাহা স্পষ্ট হইয়াছে। নাটকে ডাঃ শুভঙ্করের ভিতর দিয়া নাট্যকারের এই সম্পর্কিত নিজস্ব মনোভাব ব্যক্ত হইয়াছে। তিনি কৈফিয়তে লিখিয়াছেন, 'পশ্চিমী চশমাধারীরা দেখলেন—অষ্টম ও দ্বাদশের বিবাহ সম্পর্ক নিতান্তই বর্বরোচিত। আধুনিক সভ্যতার দৃষ্টিতে অত্যন্ত অসভ্য ও অহিতকর। ঠাণ্ডা দেশের আইন পাশ করা হলো এই গরম দেশে। ইউরোপীয় রজস্বলা-বিবাহই বিধৃত হলো সভ্যতাসম্মত বলে। এই সরদা এ্যাক্টকেই বলা যায়—ভারতীয় শিক্ষা ও সভ্যতাকে পাশ্চাত্যী-করণের ভিত্তিপ্রস্তর। হয়ে গেল সমাজ-ব্যবস্থার বিপর্যয় স্থরু। হিন্দু-কোড বিল তাহার স্বাভাবিক পরিণতি।' নাট্যকারের প্রতিনিধিরূপেই শুভঙ্কর যে এই ব্যবস্থার প্রতিবাদ করিয়াছে, তাহা বুঝিতে বেগ পাইতে হয় না। উনবিংশ শতাব্দীতে বিধবা-বিবাহ বিধিবদ্ধ হইবাব পব হইতে বর্তমান শতাব্দীতে হিন্দু কোড বিল প্রবর্তন হওয়া পর্যন্ত এদেশে যে সকল সামাজিক পরিবর্তন দেখা দিয়াছে, সমসাময়িক কালে রচিত নাটকের মধ্যেও তাহার প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়াছে। বর্তমান সমাজের রক্ষণশীল মনোভাবের উপর হিন্দু কোড বিলেব প্রতিক্রিয়া স্বরূপই যে 'ডাঃ শুভঙ্কর' বচিত হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সেইজন্য নাটকটি যতখানি ঘটনামূলক, তত বেশী আলোচনামূলক। এই দিক দিয়া ইহা অতি-আধুনিক পাশ্চাত্ত্য নাটকের সমধর্মী।

জলধর চট্টোপাধ্যায় 'ডাঃ শুভঙ্কব' বচনার পরও আরও কয়েকখানি নাটক রচনা করিয়াছেন, কিন্তু তাহা মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত কিংবা কোন রঙ্গালয়ে অভিনীত হয় নাই। তিনি বাংলা সাহিত্যের একজন একনিষ্ঠ নাট্যকার, নাটক ব্যতীত সমগ্র জীবন ব্যাপিয়া আর কিছুই রচনা করেন নাই। তবে তিনি যে চিন্তাধারা অনুসরণ করিয়া নাট্যসাহিত্য রচনার সূত্রপাত করিয়াছিলেন, অল্পদিনের মধ্যে বাংলার সমাজ-জীবনের আমূল পরিবর্তনেব ফলে তাহাও পরিবর্তিত হইয়াছে, সেইজন্য নূতন যুগের সঙ্গে তিনি স্বভাবতঃই যোগ রক্ষা করিতে সক্ষম হন নাই। তাঁহার নাটকীয় ভাষা শক্তিশালী, চবিত্র পরিকল্পনা বলিষ্ঠ এবং বক্তব্য বিষয় অত্যন্ত স্পষ্ট ছিল।

অয়স্কান্ত বক্সীর 'ভোলা মাষ্টার' নামক নাটকখানি এককালে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। একজন দরিদ্র বিদ্যালয়ের শিক্ষকের বিচিত্র আশা-আকাঙ্ক্ষার রূপায়ণ লইয়া এই নাটক রচিত হইয়াছে। ভোলামাষ্টার

পল্লীগ্রামের বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিতেন; তিনি দরিদ্র, কিন্তু তিনি পুত্রকে উচ্চশিক্ষিত করিয়া তুলিবার স্বপ্ন দেখিলেন। বিত্তহীন শিক্ষক সেই স্বপ্ন সফল করিয়া তুলিবার কোন উপায় দেখিতে পাইলেন না; অবশেষে এক সুযোগ লাভ করিলেন। বিদ্যালয়ের তহবিলের আট হাজার টাকা তাঁহার হাতে পড়িল। তিনি সেই টাকা লইয়া কলিকাতায় আসিলেন এবং তদ্দ্বারা পুত্রের শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া নিজে কলিকাতায় আততায়ীর হস্তে নিহত হইয়াছেন বলিয়া কৌশলে প্রচার করিয়া দিলেন। বিদ্যালয়ের টাকা পরিশোধ করিবার দায় হইতে এই ভাবে তিনি পরিত্রাণ পাইলেন। নিজে এইবার আত্মগোপন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। পুত্র উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া জজ হইল, যে বিদ্যালয়ে পিতা শিক্ষকতা করিতেন, তাহাতে সে এক সভায় নিমন্ত্রিত হইয়া সভাপতিত্ব করিতে আসিল। ভোলা মাষ্টার ভিক্ষুকের ছদ্মবেশে পুত্রের গৌরব দেখিয়া আনন্দিত হইলেন। স্ত্রী তাঁহার পরিচয় জানিল, কিন্তু পুত্রের নিকট তিনি গোপন রহিলেন। উচ্চ আদর্শবাদী শিক্ষক বলিয়া কল্পিত হইলেও ভোলা মাষ্টারের চরিত্রের মধ্যে স্বাভাবিকতার অভাব আছে। তাঁহার ছদ্মবেশী জীবন নিতান্ত রোমাণ্টিক চেতনা-প্রসূত এবং অনেক ক্ষেত্রেই স্বাভাবিকতার বিরোধী। কাহিনীর পরিকল্পনাটি সুন্দর হইলেও রূপায়ণ সর্বাংশে সার্থক বলিয়া মনে করা যায় না।

অয়স্কান্ত বক্সী আরও একখানি নাটক রচনা করিয়াছেন, তাহার নাম 'ডক্টর মিস্ কুমুদ'। ইহা আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও বিদগ্ধ সংলাপের গুণে রসোজ্জ্বল। তথাপি ঘটনা বৈচিত্র্যহীন বলিয়া আকর্ষণ সৃষ্টি করিতে সার্থক হয় নাই।

অতি-আধুনিক বাংলা নাট্যসাহিত্যে দেবনারায়ণ গুপ্তের নাম নিতান্ত পরিচিত হইলেও তিনি প্রধানতঃ উপন্যাসের নাট্যরূপদাতারূপে যত কৃতিত্ব লাভ করিয়াছেন; নাট্যকার হিসাবে তত কৃতিত্ব লাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহার কয়েকখানি মৌলিক নাটক আছে সত্য, কিন্তু তাহাদের জন্য তিনি দর্শক ও পাঠক সমাজের নিকট পরিচিত নহেন, বিশিষ্ট ঔপন্যাসিকদিগের উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়া তাহাদিগকে রঙ্গমঞ্চে সার্থকভাবে উপস্থাপনা করিয়া তিনি বাঙ্গালী নাট্যামোদীদিগের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। বিশিষ্ট উপন্যাসের নাট্যরূপ দেওয়ার মধ্যে সূক্ষ্ম ও সুচতুর রস দৃষ্টি থাকার একান্ত প্রয়োজন; কারণ, প্রত্যেকটি ঔপন্যাসিকের জীবনদৃষ্টি স্বতন্ত্র। যাঁহার মধ্যে সেই উপলব্ধি

আছে, কেবল মাত্র তিনিই এ' কার্যে সাফল্য লাভ করিতে পারেন। উপন্যাসের নাট্যরূপদাতার কাজটি ক্ষুরের ধারের উপর দিয়া চলিবার মত কঠিন, তাঁহার এ'দিক সে দিক করিবার উপায় নাই, উপন্যাসের রস এবং নাটকের রস উভয় তাঁহার সৃষ্টি করিতে হয়। এই কার্যে আধুনিকতম কালে দেবনারায়ণ গুপ্ত যে কৃতিত্ব লাভ করিয়াছেন, তাহা উল্লেখযোগ্য। বাংলা নাটকের দৈন্য সত্ত্বেও বাঙ্গালীর নাট্যরসপিপাসা ইহা দ্বারাই সর্বদা জাগ্রত রহিয়াছে। প্রধানতঃ শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের নাট্যরূপ দাতারূপেই তাঁহার পরিচয় হইলেও তিনি উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'রাজপথ', নিরূপমা দেবীর 'শ্যামলী', মনোজ বসুর 'বৃষ্টি' বৃষ্টি', সুবোধ ঘোষের 'শ্রেয়সী' ইত্যাদি উপন্যাসেরও সার্থক নাট্যরূপ দিয়া ইহাদের কাহিনীকে অধিকতর আকর্ষণীয় করিয়া তুলিয়াছেন। অনেক অজ্ঞাতনামা উপন্যাসও এই ভাবে জনচক্ষুর সম্মুখীন হইয়া প্রশংসা অর্জন করিতে সক্ষম হইয়াছে। দেবনারায়ণ গুপ্ত কয়েকখানি মৌলিক নাটকও রচনা করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে 'ঋণ-শোধ' মৌলিক একাঙ্ক ,'দানের মর্যাদা' স্ত্রীভূমিকা-বর্জিত একাঙ্ক এবং 'পরমারাধ্য রামকৃষ্ণ' পূর্ণাঙ্গ নাটক। রামকৃষ্ণ-দেবের জীবনাশ্রিত আরও যে কয়খানি নাটক ইতিমধ্যেই বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে ইহা কতকগুলি বিষয়ে বিশেষত্বপূর্ণ। ইহার কাহিনীটি এই—১২৬২ সাল ১৮ই জ্যৈষ্ঠ। স্নানযাত্রার শুভদিন। রাণী রাসমণির ঠাকুর-বাড়ীর আজ প্রতিষ্ঠা দিবস। এই উৎসব উপলক্ষে একদিকে যেমন বহু মানুষের সমাগম হইয়াছে, অপর দিকে তেমনি সমারোহের ঘটা! এরই মধ্যে সহসা এক অঘটন ঘটিল—সব উৎসব আয়োজন বুঝি পণ্ড হইয়া যায়। যাঁহাকে মা ভবতারিণীর পুজারী নিযুক্ত করা হইয়াছিল, তিনি শেষ পর্যন্ত পূজা করিতে পারিব না বলিয়া চলিয়া গিয়াছেন। প্রতিষ্ঠাত্রী রাণী রাসমণি, তাঁহার জামাতা মথুর এবং পরিবারবর্গের সকলেই চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন, সব আয়োজন সম্পূর্ণ কিন্তু বোধনে বসিবে কে? মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছেন কামারপুকুর গ্রামের পরম সাত্ত্বিক সর্বশাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিত রামকুমার চট্টোপাধ্যায় (ভট্টাচার্য), আর তাঁহার সঙ্গে তাঁহার ছোট ভাই রামকৃষ্ণ ওরফে গদাধর। রামকুমারদের পাশের সিয়র গ্রামের মহেশ চাটুজ্যে রাণী রাসমণির জমিদারী সেরেস্তায় কাজ করেন। এই সঙ্কটে কি করিয়া উদ্ধার পাওয়া যায়, মহেশ চাটুজ্যে তাহার জন্য রামকুমারকে ধরিয়া বসিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন রাসমণি, মথুর।

রামকুমার ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া পুজার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে রাজী হইলেন। সাড়ম্বরে পুজা সুরু হইল! মায়ের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা। মন্দিরের প্রাণ-চাঞ্চল্য ফিরিয়া আসিল। রাণী রাসমণির দীর্ঘ দশ বৎসরের স্বপ্ন সফল হইল। এদিকে মন্দিরের নানান লোকের মধ্যে তাঁহার আবাল্য সহচর ভাগিনেয় হৃদয়ের সঙ্গে রামকৃষ্ণের দেখা হইয়া গেল। হৃদয় জানাইল, সে সিয়রের লোকেদের সঙ্গে এই মন্দির প্রতিষ্ঠার উৎসব দেখিতে আসিয়াছে। হৃদয়কে পাইয়া রামকৃষ্ণের আর আনন্দ ধরে না। ইতিমধ্যে হৃদয় রামকৃষ্ণের ভাবান্তর লক্ষ্য করে। দর্শনার্থীর মধ্যে জনৈক ব্যক্তি মায়ের উদ্দেশে দূর হইতে প্রণাম করে, পুজা আরতি কিছুই দেখে না, প্রসাদ নেয় না। জাতি-বৈষম্যের কথা ভাবিয়া রামকৃষ্ণের মন ভারি হইয়া উঠে। তিনি রামকুমারকে কিছু না বলিয়া ঝামাপুকুরে চলিয়া যান। কয়দিন পর রামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে, দাদার সঙ্গে দেখা করিতে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু রামকৃষ্ণের দক্ষিণেশ্বরে থাকিতে মন চায় না। রামকুমার বহু যুক্তি দিয়া শেষে রামকৃষ্ণকে পর্যন্ত রাজী করান। রামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে মা ৺ভবতারিণীর মন্দিরে থাকিয়া যান। কিন্তু ভোগের প্রসাদ গ্রহণ করেন না। গঙ্গাতীরে গঙ্গাজলে নিজের হাতে রাঁধিয়া খান। রামকৃষ্ণের নূতন জীবন সুরু হয়। আত্মভোলা যুবক রামকৃষ্ণ সারা রাতদিন ঘুরিয়া বেড়ান শ্রীমন্দিরের আশে পাশে, গঙ্গার ধারে। নির্জনে সুরু হয় জপ-তপ -সাধনা। এমনি করিয়া লোকচক্ষুর অন্তরাল হইতে প্রকাশ্যে কঠোর সাধনা সুরু হয়। শান্ত-দাস্য-সখ্য-প্রেম-বাৎসল্য-মধুর সব ভাবের অবিরাম সাধনা চলে। আসেন ভৈরবী যোগেশ্বরী, আসেন বৈদিক সন্ন্যাসী মায়াপাশ-মুক্ত তোতাপুরী। এমনিতর সাধুসন্তদের আসা যাওয়া চলে—দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে। সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন—শ্রীরামকৃষ্ণ অবতার। তাঁহার সর্ব অঙ্গে অবতারের সর্ব লক্ষণ সুপরিস্ফুট। কলিকাতার শিক্ষিত সম্প্রদায় ভিড় জমান সত্যদর্শী সাধকের পাশে। দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে সব বয়সের মানুষের সমাগম হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের সহজ সরল যুক্তি ও উপদেশে সকলে শ্রদ্ধায় মাথা নোয়ান। বলেন, অসাধারণ। লোক-কল্যাণের জন্যই ইঁহার আবির্ভাব!

দেবনারায়ণ গুপ্ত ‘রামপ্রসাদ’ এবং ‘সাহিত্যরক্ষা সমিতি লিমিটেড্’ নামক আরও তুইখানি নাটক রচনা করিয়াছেন। ইহাদের প্রথমটি ভক্তিমূলক, দ্বিতীয়টি ব্যঙ্গ রচনা। ইহারা মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া অভিনীত হইলেও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই।

অতি-আধুনিক বাংলা কথা-সাহিত্যে নীহাররঞ্জন গুপ্তের নাম সুপরিচিত, তাঁহার কয়েকখানি নাটকও ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে, বাংলা নাট্যসাহিত্যে তাঁহার যে দান লক্ষ্য করা যায়, তাহা উপেক্ষণীয় বিবেচিত হইতে পারে না। তাঁহার প্রথম প্রকাশিত নাটক 'পদ্মিনী'। রাজস্থানের সুপরিচিত পদ্মিনী উপাখ্যান ভিত্তি করিয়াই ইহা রচিত হইলেও এই বিষয়ে নাট্যকারের কিছু বক্তব্য আছে। তিনি তাঁহার এই নাটক সম্পর্কিত 'দুইটি কথায়' লিখিয়াছেন—'রাজস্থানের ঐতিহাসিক পদ্মিনীর উপাখ্যানকে কেন্দ্র করে আমি যে নাটক রচনার প্রয়াস পেয়েছি, তাকে পুরোপুরি ঐতিহাসিক মর্যাদা দিয়ে ঐতিহাসিক নাটকের পর্যায়ে ফেললে আমার প্রতি সত্যিই অবিচার করা হবে। কারণ, ইতিহাস ইতিহাসই এবং নাটক নাটকই। নাট্যরসকে সাহিত্যের মর্যাদা দিতে গিয়ে বহু ক্ষেত্রেই আমার পক্ষে সুষ্ঠুভাবে ইতিহাসকে মেনে চলা সম্ভব হয় নি। তাই আমার অনুরোধ "পদ্মিনী" নাটকটিকে যেন নাটক হিসাবেই গণ্য করা হয়।' সুতরাং তাঁহার নিজের কথাতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে, ইহা তাঁহার রোমান্টিক নাটক, পদ্মিনী উপাখ্যানের পটভূমিকায় ইহা রচিত মাত্র। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, আধুনিক ঐতিহাসিকদিগের মতে পদ্মিনী উপাখ্যানও উপাখ্যানই, ঐতিহাসিক ঘটনা নহে; সুতরাং নাট্যকারের এই বিষয়ে সঙ্কোচের কোন কারণ ছিল না। সুতরাং পদ্মিনী সম্পর্কিত রাজস্থানের কাহিনীতে যে উপাখ্যান প্রচলিত আছে, ইহাতে তাহারও কিছু কিছু ব্যতিক্রম দেখা যাইবে বলিয়াই নাট্যকার ভূমিকায় নিজেই ঐ কথা বলিয়া রাখিয়াছেন। এই নাটকখানির একটি বিশিষ্ট গুণ সংলাপের ভাষার বলিষ্ঠতা ও প্রত্যক্ষতা, এবং পরিণতি পর্যন্ত ঘটনার নাটকীয় গতিতে দ্রুত সঞ্চরণ। ইহা নীহাররঞ্জন গুপ্তের প্রায় প্রত্যেক নাটকেরই বিশেষত্ব। তবে এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, রাজপুত জীবন অবলম্বন করিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল যে কয়েকখানি নাটক রচনা করিয়াছিলেন, ইহার মধ্যে তাহাদের ক্ষীণ ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে। বাংলা নাট্যসাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলালের যুগের যে এখনও সম্পূর্ণ অবসান ঘটে নাই, এই নাটকের বিষয়বস্তু এবং বর্ণনাভঙ্গি দ্বারা তাহাই প্রমাণিত হইবে। পদ্মিনী এই নাটকের নামকরণ এবং নায়িকা বলিয়া মনে হইলেও প্রকৃত পক্ষে ইহার মধ্যে অন্য একটি স্ত্রীচরিত্র প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, তাহাকেই এই নাটকের নায়িকা বলিয়া উল্লেখ করা সঙ্গত,

তাহার নাম চম্পা। চম্পা গোয়ার বাগ্‌দত্তা রাজপুত নারী, তাহার সক্রিয়তায় এই নাট্যকাহিনী আদ্যোপান্ত প্রাণচঞ্চল রহিয়াছে।

নীহাররঞ্জন গুপ্তের 'পদ্মিনী'র পর তাঁহার 'রাত্রিশেষ' নাটকখানি প্রকাশিত হয়। কিন্তু ইহা তাঁহার পদ্মিনীর পূর্ববর্তী রচনা। এ কথা তিনি তাঁহার 'রাত্রিশেষে'র ভূমিকায় উল্লেখ করিয়াছেন। বাংলা দেশের বিপ্লব আন্দোলনের পটভূমিকায় 'রাত্রিশেষ' রচিত। একই পরিবারভুক্ত বিভিন্ন-মুখী কতকগুলি চরিত্র অবলম্বন করিয়া একটি কাহিনী পরিকল্পিত হইয়াছে। ইহাতে বিপ্লবী পিতা খুনের অভিযোগে পলাতক, জ্যেষ্ঠ পুত্র সিভিলিয়ান জজ, কনিষ্ঠ পুত্র পলাতক বিপ্লবী ইত্যাদি। স্বদেশী আন্দোলন ও সন্ত্রাসবাদের যুগে ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য অনেকে যে পারিবারিক স্বার্থ বিসর্জন দিয়াছে, ইংরেজের দাস্য সুখের বিনিময়ে যে পারিবারিক আত্মীয়তার সম্পর্ক নানা-ভাবে বলি দিয়াছে, এই নাটকে তাহারই কথা বর্ণিত হইয়াছে। জমিদার পরিবারের এক বিচিত্র রহস্যপূর্ণ জীবন কেন্দ্র করিয়া এই কাহিনী রচিত হইয়াছে, রোমান্টিক চিন্তার বিলাস ইহার একান্ত বস্তুধর্মিতা ও মানবিকতাকে মধ্যে মধ্যে আচ্ছন্ন করিয়া গিয়াছে। তবে নীহার-রঞ্জনের অন্যান্য নাটকের মত ইহার মধ্যেও কাহিনীতে দ্রুত সঞ্চারিত গতিবেগের উল্লাস আছে, ঘটনার ঘনঘটা আছে, দুর্ভেদ্য জটিলতাও আছে। অত্যাচারী জমিদারের স্বরূপ বর্ণনার দিক দিয়া ইহার মধ্যে শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'সংগ্রাম ও শান্তি' নাটকের কোন কোন দৃশ্যের ঐক্য দেখা যায়। ইহার জমিদার-পত্নী সুভদ্রার চরিত্রের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম নাটকীয় দ্বন্দ্বের অবকাশ ছিল—তাহার স্বামী ও এক পুত্র বিপ্লবী, কিন্তু অন্য এক পুত্র সিভিলিয়ান জজ। ইহাদের প্রত্যেকের স্বার্থরক্ষাই তাহার সমান উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনের পথে তাঁহার চারিত্রিক বলিষ্ঠতা যথার্থ মানবিক অনুভূতি বিসর্জন না দিয়া প্রকাশ পাইলে, ইহা একটি সার্থক নাটকীয় চরিত্র হইতে পারিত; কিন্তু তাহার চরিত্রে মানবিক অনুভূতি অনেকখানি অস্পষ্ট রহিয়া গিয়াছে। জজ ভ্রাতা বিপ্লবী ভ্রাতাকে ভাই বলিয়া না জানিয়া প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়া নিজেও মৃত্যুবরণ করিল, ইহাই নাটকের বিষয়। বহির্মুখী ঘটনার আড়ম্বরে অন্তরের নিভৃত পরিচয়গুলি ইহাতে প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

নীহাররঞ্জনের ইহার পরবর্তী নাটক 'চৌধুরী বাড়ী'। ইহা তাঁহার একখানি উপন্যাসের নাট্যরূপ হইলেও 'নাটকের প্রারম্ভ ও কাহিনীর

পরিণতি সম্পূর্ণ পৃথক্।' এই নাটকের 'আমার কথা'য় নাট্যকার লিখিয়াছেন, 'ইদানীংকার নাট্যসাহিত্য কেবল আমাদের আধুনিক সামাজিক পরিবেশ ও তার দোষ ত্রুটি নিয়েই লেখা হচ্ছে। কিছু কিছু তার মধ্যে আবার 'আইডিয়ালিজমে'র গুরুপাক দিয়ে নাটকের বিষয়বস্তুকে এক অদ্ভুত পরিবেশের মধ্যেও এনে ফেলতে দেখি।' নাট্যকারের মতে ইহারা নাটক কিনা তাহা 'ভাববার বিষয়।' এই সকল ত্রুটি হইতে নাটককে মুক্ত করিয়া বাংলা নাটক রচনা তাঁহার উদ্দেশ্য। সেই সূত্রেই তিনি 'চৌধুরী বাড়ী' রচনা করিয়াছেন। এই নাটকের বিষয়বস্তু সম্পর্কেও তিনি নিজেই বলিয়াছেন, ' "চৌধুরী বাড়ী"র চরিত্র, দৃশ্যপট, ঘটনা ও সংলাপ আমাদের দেশেরই এমন একটা কালের যে সময় জমিদাররাই ছিল প্রকৃত পক্ষে দেশের রাজা। তাহাদের অসীম ক্ষমতার স্বৈরাচার, দম্ভ, শাসকীয় মনোবৃত্তির এক ছবিই আমি "চৌধুরী বাড়ী" নাটকে এঁকেছি।'

জমিদারের কল্পিত অত্যাচারের কাহিনী অবলম্বন করিয়া নাটক ও উপন্যাস রচনা করা কিছুকাল যাবৎ বাংলা সাহিত্যে একটা সংস্কারের মত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ইতিপূর্বেই জমিদারী প্রথা লুপ্ত হইয়া গিয়া দেশে নূতন সমাজ-ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছিল, সুতরাং তাহা যে সমসাময়িক সমাজের চিত্র তাহা বলিবার উপায় নাই। প্রাচীন যুগের প্রতি মানুষের যে স্বাভাবিক একটি মোহ আছে তাহা হইতেই বাংলা সাহিত্যেও এককালে পৌরাণিক ও রোমান্টিক নাট্যরচনার ধারা সৃষ্টি হইয়াছিল। সেই সংস্কার অনুসরণ করিয়াই আধুনিকতম যুগেও প্রাচীন জমিদারদিগের কল্পিত অত্যাচারের কাহিনী লইয়া নাটক রচিত হয়। সুতরাং ইহারা রোমান্টিকধর্মী রচনা, একান্ত বাস্তবানুগত্য ইহাদের মধ্যেও আশা করা যায় না। ইহাদের মধ্যে সরযূ অপর্ণা রাজেশ্বর সূর্যকান্ত ইত্যাদি যে সকল চরিত্র আছে, তাহারা আমাদের পরিচিত জীবনের মধ্যে বাস করে না, যেন উনবিংশ শতাব্দীর এক রহস্যলোক হইতে এখানে উড়িয়া আসিয়া পড়িয়াছে।

ইহার পর নীহাররঞ্জনের 'উল্কা' নাটক রচিত হয়। দীর্ঘকাল যাবৎ ইহা কলিকাতার রঙমহল রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের ফলে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। কাহিনীর অভিনবত্বে নাটকখানি বিশেষত্বপূর্ণ। ইহার কাহিনীটি সংক্ষেপে এই প্রকার—নার্সিং হোমে রায় বাহাদুর রাজীব ঘোষের এক পুত্র জন্মিল; শিশুর মুখ বিকৃত ও কদাকার দেখিয়া রাজীব সেখানেই তাহাকে

হত্যা করিয়া ফেলিতে চাহে, কিন্তু ডাক্তার বাধা দেন। প্রসূতির অজ্ঞান অবস্থায় ডাক্তার শিশুটিকে সরাইয়া লইয়া যান। ডাক্তারের মহানুভবতায় শিশুটি স্বর্গাশ্রমে বিরজানন্দের নিকট প্রতিপালিত হইতে থাকে। ইহার পঁচিশ বৎসর পরে, শিশু এখন পঁচিশ বৎসরের যুবক, নাম অরুণাংশু, মহারাজের নিকট সে পিতৃপরিচয় জানিবার জন্য অধীর হইয়া উঠে। অতঃপর তিনি তাহাকে নার্সিং হোমের সেই ডাক্তারের নিকট একখানি পত্র দিয়া কলিকাতায় পাঠাইয়া দেন। ডাক্তার তাহাকে চিনিতে পারিলেন, তাহার পিতার সঙ্গে পরিচিত করাইয়া দিবার জন্য সে ডাক্তারকে অনুরোধ করিল। মাতা এবং পিতা তাহার কোন সংবাদ রাখিতেন না। রায় বাহাদুরের পরে আরও পুত্র কন্যা জন্মলাভ করিয়াছে, তাহাদের সঙ্গে তিনি সুখে স্বচ্ছন্দে অতুল সমৃদ্ধির মধ্যে সংসারজীবন যাপন করিতেছিলেন; পরিত্যক্ত কদাকার পুত্রের কথা তিনি নিজে স্মরণ করিতেন না, পরিবারের অন্য কেহ জানিতও না। সেদিন রায় বাহাদুরের একমাত্র ছেলে সুধীরের জন্মতিথি উৎসব। বহু সম্ভ্রান্ত অভ্যাগতের সমাগম হইয়াছে। এমন সময় কুৎসিত ও বিকৃতমুখ অরুণাংশু আসিয়া সেখানে আবির্ভূত হইল, সুধীর তাহাকে প্রহার করিয়া তাড়াইয়া দিল। রায় বাহাদুর পুত্রকে চিনিতে পারিলেন, কিন্তু তাহাকে গ্রহণ করিতে চাহিলেন না, গোপনে অর্থ দিয়া বিদায় করিয়া দিতে চাহিলেন। অরুণাংশু নিজের মাকে দেখিতে চায়, মায়ের শয়ন কক্ষের জানালা দিয়া নিদ্রিতা সুন্দরী জননীকে দেখিয়া তাহার মাতৃভক্তি উথলিয়া উঠে, অথচ সে প্রকাশ্যে পরিচয় দিয়া গৃহে প্রবেশ করিতে পারে না। 'মিড্ নাইট' হোটেলে সুধীরকে আততায়ীর হাত হইতে রক্ষা করিতে গিয়া অরুণাংশু নিজে গুরুতর আঘাত পাইল। হাসপাতালে নীত হইলে তাহার মৃত্যু হইল। জননী কমলা শেষ সময়ে পুত্রের পরিচয় পাইলেন, কিন্তু তাহাকে আর রক্ষা করিতে পারিলেন না। সেই আঘাতেই হাসপাতালে জননীব চোখের সাম্‌নেই তাহার মৃত্যু হইল, অন্তিম মুহূর্তে জননী তাহাকে সন্তান বলিয়াছিলেন—এই শান্তি লইয়া সে সুগভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। জন্মমুহূর্তে পরিত্যক্ত সন্তানের জননীর প্রতি অভিমানের কথা এই নাটকে ততখানি পরিস্ফুট হয় নাই সত্য, কিন্তু তাহার পরিবর্তে জননীর প্রতি সন্তানের এক দুর্নিবার আকর্ষণের কথাই ইহার ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। ঘটনার দুর্ভেদ্য জটিলতা সৃষ্টি না করিয়াও এই একান্ত মানবিক কাহিনীটি বিবৃত করা সম্ভব ছিল, কিন্তু ইহাকে

একটি বহির্মুখী ঘটনাসঙ্কুল নাটকের রূপ দিতে গিয়াই ইহার অন্তর্মুখী রস-নিবিড়তার মধ্যে কতকটা আঘাত লাগিয়াছে। ডাক্তার চরিত্রের মহানুভবতার দিকটি অল্পের মধ্যেও অন্তর স্পর্শ করে, কিন্তু কোন কোন চরিত্র ইহাতে সুদীর্ঘ অংশ অধিকার করিয়াও এই গুণের অধিকারী হইতে পারে নাই। ইহাতে রায় বাহাদুরের অন্তর্দ্বন্দ্বের দিকটিও যে মধ্যে মধ্যে নাটকীয় গৌরব লাভ করিয়া উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা এই নাটকের একটি বিশিষ্ট আকর্ষণ। কাহিনীর রোমান্টিকতা ইহার বস্তুধর্মে কতকটা আঘাত করিলেও শাশ্বত একটি মানবিক বৃত্তি ইহার মৌলিক অবলম্বন বলিয়া ইহা জনসাধারণের মধ্যে একটি বিশেষ আবেদন সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছিল। ইহার কতকগুলি দৃশ্য ও চরিত্র মৌলিক নাট্যকাহিনীর অনিবার্য ধারার সঙ্গে সংযুক্ত হইতে পারে নাই, নাট্যকারের রোমাঞ্চকর পরিবেশ সৃষ্টি করিবার স্বাভাবিক প্রেরণা হইতেই আসিয়াছে, ইহাই প্রধানতঃ এই নাটকের ত্রুটি।

নীহাররঞ্জনের নাটক 'মায়ামৃগ' তাঁহার একখানি উপন্যাসের নাট্যরূপ মাত্র। এই সম্পর্কে তিনি লিখিয়াছেন, 'মঞ্চের প্রয়োজনে মূল উপন্যাসের কাহিনীকে নাটকে কিছু অদল বদল করা হ'য়েছে এবং উপন্যাসের সুজাতা চরিত্রটিও পরিবর্তন করা হয়েছে। আর কিছু কিছু নূতন চরিত্রও অনিবার্য ভাবে ঐ সঙ্গে এসে নাটকে ভিড় করেছে।' এই নাটকের জীবনটি নীহার-রঞ্জনের অন্যান্য নাটকের তুলনায় অনেক বাস্তব। কাহিনীটি এই প্রকার—

লক্ষপতি ব্যবসায়ী অঘোরনাথের সাবিত্রী আর সীতা মাতৃহারা দুই মেয়ে। সাবিত্রীর চাইতে সীতা অনেক ছোট। বাল্য-বন্ধুর অকালমৃত্যুর পর অঘোর-নাথ তাঁহার একমাত্র পুত্র অমিয়নাথকে লেখাপড়া শিখাইয়া বিলাত হইতে ব্যারিস্টার করিয়া আনিয়া সাবিত্রীর সঙ্গে বিবাহ দিলেন। কলিকাতায় একটা বাড়ীও কিনিয়া দিলেন। অমিয়নাথ হাইকোর্টে প্র্যাকটিস শুরু করিল। এদিকে ছোট মেয়ে সীতা তাহার পিতারই অধীনস্থ এক কর্মচারীর ছেলে কায়স্থ বিভূতিকে ভালবাসিয়া গোপনে বিবাহ করিল। কারণ, সীতা ভাল-ভাবেই জানিত ধনগর্বী ও জাত্যভিমানী পিতা অঘোরনাথ তাহাদের এই বিবাহটা ক্ষমার চক্ষে দেখিবেন না। কার্যত তাহাই হইল। সীতা সন্তান-সম্ভাবিতা হইল এবং তাহাদের বিবাহের ব্যাপারটা আর কোনক্রমেই যখন গোপন করা সম্ভব নয়, তখন পিতাকে সে কথাটা জানাইল। অঘোরনাথ রুদ্ধ আক্রোশে গর্জিয়া উঠিলেন এবং মেয়ে-জামাইকে চাবুক মারিয়া তাঁহার গৃহ

হইতে বিতাড়িত করিলেন। শুধু তাহাই নয়, বিভূতি আর সীতা যাহাতে কোন-মতেই ঘর না বাঁধিতে পারে গোপনে গোপনে আক্রোশের বশে সে চেষ্টাও করিতে লাগিলেন। এদিকে সীতার একটি পুত্র হইল। পিতার আক্রোশ, এবং দারিদ্র্য ও দুর্দশার হাত হইতে গর্ভজাত সন্তানটিকে বাঁচাইবার জন্য সীতা অনন্যোপায় হইয়া সাবিত্রীর শরণাপন্ন হইল। সাবিত্রীর কোন সন্তানাদি ছিল না। সীতার সন্তান শুভ্রকে সে নিজ পুত্র পরিচয়ে বক্ষে তুলিয়া লইল এবং জীবনে আর কখন নিজ সন্তান বলিয়া শুভ্রকে দাবী করিবে না এই প্রতিজ্ঞা করিয়া দিদির কাছ হইতে হাত পাতিয়া চল্লিশ হাজার টাকা লইয়া সীতা আর বিভূতি সুদূর বর্মা মুলুকে চলিয়া গেল। বর্মায় বিভূতির আর একটি সন্তান হয়। কিশোর অবস্থায় ছেলেটি আই-এ পাস করিয়া প্রথম হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সহসা তাহার অকালমৃত্যু ঘটে। আর একটি দুর্বিপাকে বিভূতি পঙ্গু ও অসহায় হইয়া পড়ে। তখন দীর্ঘ চব্বিশ বৎসর অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে। অর্থ, স্বাস্থ্য, সন্তান সব হারাইয়া বর্মা হইতে বিভূতিকে সঙ্গে লইয়া সীতা পুনরায় একদিন অমিয়নাথের প্রাসাদে আশ্রয় লইতে আসে, কিন্তু অমিয়নাথেব সহধর্মিণী সাবিত্রী, সীতা ও বিভূতির এই আকস্মিক আগমনকে ভালভাবে গ্রহণ করিতে পারে না। কেবল মাত্র আশ্রয়ের জন্যই আশ্রয় গ্রহণ করে নাই, সন্তানের আকর্ষণই যে সেখানে এক-মাত্র সত্য ছিল, তাহা তাহাদের অন্তর্দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়া প্রকাশ পায়। তারপর জননীর সঙ্গে পুত্রের পরিচয় ও মিলনের মধ্য দিয়া কাহিনীর সমাপ্তি হয়। এই নাটকের কাহিনীবিন্যাস ও চরিত্রসৃষ্টি নীহাররঞ্জনের অন্যান্য নাটকের তুলনায় অনেক ত্রুটিহীন। প্রধানতঃ রোমাঞ্চকর ও রোমান্টিক কাহিনী রচনায় সিদ্ধহস্ত নাট্যকার এখানে তাঁহার সেই সকল বহির্মুখী প্রেরণা বহুলাংশে সংযত করিয়া জনক জননীর শাশ্বত অন্তঃপ্রকৃতিটিই অনাবৃত করিয়া দেখাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। সেই প্রয়াস যে তাঁহার ব্যর্থ হইয়াছে, তাহা বলিতে পারা যায় না।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের যে কয়জন বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক নাট্যকার রূপেও খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। তারাশঙ্করের প্রথম নাটক 'দুই পুরুষ' প্রাচীনপন্থী জমিদার পিতা ও আধুনিক ভাবাপন্ন তাঁহারই পুত্রের বিরোধকে ভিত্তি করিয়া রচিত হইয়াছে। বাংলার বিশিষ্ট আঞ্চলিক জীবন

তারাশঙ্করের রচনায় যেমন বাস্তব হইয়া উঠিতে পারে, ইহা তাহাই অবলম্বন করিয়া লিখিত হইলেও ইহার আবেদন তাঁহার উপন্যাসগুলির তুলনায় অনেক অল্প বলিয়াই অনুভূত হইবে। সুদীর্ঘ বর্ণনার সূত্রে যাঁহারা উপন্যাসের কাহিনীতে যথার্থ রস ফুটাইয়া তুলিতেই দক্ষ, তাঁহারা নাটকীয় খণ্ড খণ্ড সংলাপের মধ্য দিয়া তাহা অক্ষুন্ন রাখিতে পারেন না। বিশেষতঃ যেখানে বহির্মুখী ও অন্তর্মুখী দ্বন্দ্বসংঘাতের উত্থান-পতনের অবকাশ বেশী নাই, সেখানে উপন্যাস সার্থকতা লাভ করিলেও নাটক যে সার্থকতা লাভ করিতে পারে না, তাহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। 'দুই পুরুষে' মত ও আদর্শের যে সংঘাত সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা নাটকীয় কৌশলে উপস্থাপিত হইলেও যে তাহা অত্যন্ত সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারে নাই, এ কথা সত্য। এই নাটকখানির মধ্যে বাংলার বৃহত্তর সমাজ জীবনের পরিবর্তনের একটি ঐতিহাসিক দিক যতখানি স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, ব্যক্তিচরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্বগুলি তত স্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারে নাই। তারাশঙ্কর তাঁহার একখানি উপন্যাসকেও নাট্যরূপ দিয়াছেন, তাহা 'কালিন্দী'। হত্যা ও মৃত্যুর ঘনঘটায় এই নাটকের কাহিনীটি আচ্ছন্ন। উপন্যাসের বিস্তৃত পরিসরের মধ্যে স্ত্রীপুত্র হত্যার নৃশংস কাহিনী যে ভাবেই বর্ণিত হোক না কেন, নাটকের মধ্য দিয়া তাহা উপস্থাপনা করিবার দায়িত্ব আরও অনেক বেশী। সুতরাং তাহার জন্য সুবিস্তৃত পরিবেশ সৃষ্টি করিবার প্রয়োজন হয়। কিন্তু 'কালিন্দী' নাটকে সেই পরিবেশ সৃষ্টি হইতে পারে নাই বলিয়াই রামেশ্বরের আচরণ, চরম নৃশংসতার গণ্ডী অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে নাই। ইহা চরিত্রটির অভিজাত পরিচয়ের বিরোধী বলিয়া মনে হওয়া নিতান্তই স্বাভাবিক। ইহার একটি চরিত্র অহীন; তাহাকে অনেক সময় রক্তমাংসের সম্পর্কহীন বলিয়া মনে হয় না। ইহার কোন কোন অংশ বক্তৃতা দ্বারা ভারাক্রান্ত হইয়া আছে। তথাপি এক শ্রেণীর চরিত্র যে ইহাতে যথার্থ জীবন্ত হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাও অস্বীকার করা যায় না। যে জীবনদৃষ্টির গুণে তারাশঙ্করের উপন্যাসে চরিত্রগুলি জীবন্ত হইয়া উঠে, ইহাদের মধ্যেও সেই দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়।

'পথের ডাক' তারাশঙ্করের আর একখানি নাটক। ইহাতে সমসাময়িক সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার কথা থাকিলেও আদর্শবাদের কথাও আছে; সেইজন্য তাঁহার অন্যান্য নাটকের তুলনায় ইহার শক্তিহীন। দেশাত্ম-

বোধের আদর্শের উপর ইহার কাহিনী পরিকল্পিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে দেশপ্রেম ও জনসেবার বৃহত্তর আদর্শের কথা যত আছে, একান্ত ব্যক্তি-কেন্দ্রিক জীবনের ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ সুখদুঃখ বোধের সুনিবিড় উপলব্ধির কথা তত নাই। ইহার মূল চরিত্রগুলি আদর্শচরিত্র। এই শ্রেণীর চরিত্র লইয়া সুসঙ্গত নাট্যিক ক্রিয়া সৃষ্টি করা সহজসাধ্য নহে, নাট্যকারও এ বিষয়ে সফলকাম হইতে পারেন নাই, কতকগুলি অসঙ্গত ঘটনার ইহাতে প্রাধান্য দিয়াছেন। কয়েকটি মৃত্যুকেও তিনি অনাবশ্যক ভাবেই কাহিনীতে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে কথাসাহিত্য রচনা করিয়াই খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। তাঁহার কয়েকখানি নাটকও জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে 'বন্ধু' ও 'ডিটেকটিভ' নামক নাটক দুইটিই উল্লেখযোগ্য। 'বন্ধু' কৌতুকরসাশ্রিত নাটক। ইহাতে কাহিনীর কোন জটিলতা কিংবা রহস্যনিবিড় পরিবেশ নাই, ঘটনার কোন ঘনঘটা সুন্দর জীবনগুলির স্বচ্ছন্দ প্রবাহকে কোন দিক দিয়া বাধা দেয় নাই, জীবনের কোন গূঢ় রহস্যের সন্ধানও ইহার লক্ষ্য নহে। সহজ কৌতুকরসের ভিতর দিয়া নাটকীয় গতিতে কাহিনীটি একটি সুখকর পরিণতি লাভ করিয়াছে। ইহার বৈজ্ঞানিক অধ্যাপকের চরিত্রটি শিশুর মত সরল, তাহার খুঁটিনাটি মুদ্রা-দোষগুলি অশেষ কৌতুককর। ইহার মধ্যে হেমন্ত-অশনির সঙ্গে ঊর্মিলা-মন্দার প্রণয়ের চিত্রটি লঘু ও কৌতুককর, ভাবগভীরতা দ্বারা ভারাক্রান্ত নহে। সরল সংলাপ ইহার বিশেষত্ব।

এক জমিদারের 'ডিটেকটিভ' হইবার কাহিনী লইয়া শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ডিটেকটিভ' নাটকখানি রচিত হইয়াছে। ইহার কাহিনীও সরস কৌতুকরসে স্নিগ্ধ, প্রেমের কথা থাকিলেও তাহা সুগভীর গুরুত্বপূর্ণ নহে, তাহা জীবনের উপরিস্তর অতিক্রম করিয়া গভীরতর স্তরে পৌঁছিতে পারে নাই। জমিদার অনন্ত চৌধুরী ডিটেকটিভ হইতে গিয়া একটি নিরুদ্দিষ্টা কন্যার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল, অবশেষে তাহার প্রেমে পড়িল। নিরুদ্দিষ্টা কন্যাটি সম্পর্কে নানা ভুলভ্রান্তির সৃষ্টি করিয়া নাট্যকার বিচিত্র কৌতুকরসের অবতারণা করিয়াছেন। ইহার ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যেই নাট্যকার মানবজীবন সম্পর্কে বিচিত্র অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন। এই গুণেও নাটকটি আকর্ষণীয় হইয়াছে।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিক মনোজ বসুর নাটকের সংখ্যাই কথাসাহিত্যিকদিগের মধ্যে সর্বাধিক। সাধারণ মানুষের জীবনের প্রতি তাঁহার সুগভীর সহানুভূতির পরিচয়ে যেমন তাঁহার কথা-সাহিত্যের সার্থকতা, তাঁহার নাটকের মধ্যে তাহার কিছু ব্যতিক্রম দেখা যায় না। তাঁহার কথাসাহিত্যে বাংলার পল্লীপ্রকৃতির সহজ সুন্দর রূপটির উপর সাধারণ নরনারীর জীবন যেমন রেখাপাত করিয়াছে, নাটকের মধ্যেও তাহার সঙ্গে পরিচয় লাভ করা যায়। তাঁহার কথাসাহিত্য কবিধর্মী রচনায় সরস, নাটকের মধ্য দিয়া কথাসাহিত্যের সেই রস অখণ্ডভাবে প্রকাশ করিবার সুযোগ নাই; তথাপি তাহা যতদূর সম্ভব, তাহা তাঁহার নাটকের ভিতর দিয়াও প্রকাশ পাইয়াছে।

মনোজ বসুর প্রথম নাট্যরচনা 'প্লাবন' ১৯৪২ সনে প্রকাশিত হয়। জলপ্লাবন ভাঙ্গাগড়ার প্রতীক্, ইহা একদিকে ভাঙ্গে আর একদিকে গড়ে। কেবল নদীতীরের ক্ষেত খামার বাড়ীঘরই যে ভাঙ্গে গড়ে—তাহাই নয়, সেই সূত্রে নরনারীর জীবনও ভাঙ্গে গড়ে। এক প্লাবনের ভাঙ্গাগড়ার ভিতর দিয়া কাহিনীর সূত্রপাত হইয়াছে, আর এক প্লাবনের ভাঙ্গাগড়ার ভিতর দিয়া ইহার কাহিনী শেষ হইযাছে, প্লাবনের এই ভাঙ্গাগড়ার সূত্রে নিশারাণীর জীবনও জড়াইযাছে। এক প্লাবনে সে স্বামীর সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া আর একজনের জীবনের সঙ্গে যুক্ত হইল, আর এক প্লাবনে স্বামীকে ফিরিয়া পাইল সত্য, কিন্তু সেদিন তাহার জীবনের আর কোন প্রয়োজন রহিল না। সেদিন তাহার সব কিছুই আবার ভাসিয়া গেল। মনোজ বসুর সকল শ্রেণীর রচনার মধ্যেই একটি স্বচ্ছ কবি-দৃষ্টি আছে, ইহার অতি-নাটকীয় ঘটনারাশির অন্তরাল পথ দিযা তাঁহার কবি-দৃষ্টিটিও সর্বদা সজাগ থাকিয়া অগ্রসর হইয়া গিয়াছে।

মনোজ বসুর পরবর্তী নাটক 'নূতন প্রভাত' কান্তরাম ও রহিমের অত্যাচারিত জীবনকে অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে। আশার শক্তি লইয়া মানুষ জীবনের চরম লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া যায়, একদিন জীবনের নব অরুণোদয়ে তাহাদের সকল লাঞ্ছনার অবসান হইবে এই দুঃসহ প্রতীক্ষার তপস্যার মধ্য দিয়া তাহারা জীবনপথে উত্তীর্ণ হয়। আশাবাদী লেখক নিদারুণ হতাশার মধ্যেও জীবনে শান্তির সান্ত্বনা-বাণী শুনাইয়াছেন। 'অত্যাচারের মধ্যেই অত্যাচারীর ধ্বংসের বীজ লুক্কায়িত থাকে, একদিন

অনুকূল অবসরে তাহাই অত্যাচারীকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া দেয়। ইহার কোন কোন চরিত্র আদর্শ সৃষ্টি বলিয়া মনে হইতে পারে। তথাপি হলধর, আমিনুল ইত্যাদির মত সমাজের নিম্নস্তর হইতে যে সকল বিচিত্র চরিত্রের তিনি সন্ধান করিয়াছেন, তাহাদের বাস্তবধর্মিতা নাটকের মধ্যে বিশেষ শক্তি সঞ্চার করিতেও ব্যর্থ হয় নাই। কেবল উচ্চ শ্রেণীর কয়েকটি চরিত্রের মধ্যে আদর্শবাদিতার কিছু স্পর্শ অনুভব করা যায়। অত্যাচারিত মানবতার প্রতি নাট্যকারের সহানুভূতির পরিচয়ে নাট্যকাহিনী সরস হইয়া উঠিয়াছে।

দাম্পত্য জীবনে পরস্পর পরস্পরকে ভুল বুঝিবার একটি মর্মান্তিক কাহিনী লইয়া মনোজ বসুর 'বিপর্যয়' নাটকটি রচিত হয়। প্রগাঢ় প্রেম যেখানে সত্য, সেখানে পরস্পর পরস্পরকে ভুল বুঝিবার কোন কারণ থাকিতে পারে না, বিশ্বাসের শক্তিতেই ভুল বুঝিবার সকল আশঙ্কা দূর হইয়া যায়। এখানে স্বামী হিরণ্ময় তাহার পত্নী নলিনীকে যে যথার্থই ভালবাসিত, তাহা সত্য, নলিনীর প্রেমেও অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ ছিল না। তথাপি নলিনী স্বামীর মিথ্যা অপবাদ মাত্র শুনিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া গেল। সামান্য যে ভুল প্রথমে হয় ত সহজেই বুঝিতে পারা যাইত, তাহাই ক্রমে বাহিরের ঘটনার আবর্তে জটিল হইয়া উঠিল, ইহা দূর করিবার আর কোন উপায় রহিল না। অথচ পরস্পরের প্রতি আসক্তি যে কোন দিক দিয়া শিথিল হইল, তাহা নহে। বিচ্ছেদের মধ্য দিয়াই তাহাদের জীবনের বিপর্যয় ঘটিয়া গেল। অন্তর্মুখী দ্বন্দ্বের উপর এই নাটক রচিত হইয়াছে, এই দ্বন্দ্বের সূক্ষ্ম অন্তর্বিশ্লেষণ এই নাটকের বিশেষত্ব। এই নাটকের মলয়ার চরিত্রটির মধ্যে কতকগুলি আকর্ষণীয় গুণ আছে, তাহার জীবনের ব্যর্থতায় এই নাটকের করুণ পরিণতি নিবিড়তর করিয়াছে।

বাংলার রাজনৈতিক জীবনের বহির্মুখী ঘটনাবলীর পটভূমিকায় মনোজ বসুর 'রাখিবন্ধন' নাটকখানি রচিত হইয়াছে। ইহাতে ব্যক্তিজীবনের একান্ত সুখদুঃখভিত্তিক সূক্ষ্ম অন্তর্বিশ্লেষণ নাই, কেবল বহির্মুখী রাজনৈতিক সংগ্রামের ঘনঘটা আছে। বিভাগোত্তর যুগের খণ্ডিত বাংলার রক্তাক্ত স্বরূপের মধ্যেও আশাবাদী নাট্যকার রাখিবন্ধনের স্বপ্ন দেখিয়াছেন। বাস্তব জীবনের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মধ্যেও ইহাতে মিলনের স্বপ্নকথা শুনিতে পাওয়া যায়। সেইজন্য ইহার মধ্যে হৃদয়োচ্ছ্বাস ও ভাবাবেগের বন্যা বহিয়াছে, বাস্তব

জীবনের পদচারণা অনুভব করা যায় না। বঙ্গবিভাগের মুহূর্তে খণ্ডিত বাংলার বিপর্যস্ত রূপ দেখিয়া ভাব-প্রবণ কবিমন যে ভাবে অধীর হইয়া উঠিয়াছিল, ইহার মধ্যে তাহারই পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে, ইহাতে স্বভাবতঃই ধীর ও সংযত সমাজ কিংবা জীবনদৃষ্টির ফল প্রকাশ পাইতে পারে নাই। তথাপি নাট্যকারের অন্যান্য রচনার মতই ইহাও রচনার দিক দিয়া শক্তিশালী।

এই সকল নাটক রচনা সত্ত্বেও এ' কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, মনোজ বসু মূলতঃ ঔপন্যাসিকই, নাট্যকার নহেন; তাঁহার নাটকগুলির মধ্য দিয়া উপন্যাসেরই গুণ প্রকাশ পাইয়াছে।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ও কয়েকখানি নাটক রচনা করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে তাঁহার 'ভাড়াটে চাই', 'বারোভূতে' অত্যন্ত জনপ্রিয় কৌতুকরসাশ্রিত একাঙ্ক নাটক। কলিকাতার গৃহ-সঙ্কটকে ভিত্তি করিয়া বিচিত্র প্রকৃতির বিভিন্ন চরিত্রের সমাবেশ তাঁহার 'ভাড়াটে চাই' রচিত হইয়াছে। ইহার বাস্তব জীবন-দৃষ্টি নাটকীয় গৌরব লাভ করিয়াছে। 'বারোভূতে' সম্পর্কে নাট্যকার লিখিয়াছিলেন, "সব পেয়েছির আসরে' বার্ষিক উৎসবে সাহিত্যিকদের অভিনয়ের প্রয়োজনে 'বারোভূতে' লেখা হইয়াছিল। নাটকের বক্তব্য নামের মধ্যে চিহ্নিত।" তাঁহার 'রামমোহন' জীবনী নাটক এবং 'এক সন্ধ্যায়' জীবনীমূলক একাঙ্ক নাটক। বিহারীলাল ও বালক রবীন্দ্রনাথের জীবনের এক সন্ধ্যার বৃত্তান্ত হইয়া শেষোক্ত নাটকটি রচিত।

অতি-আধুনিক যুগে একখানি সামাজিক নাটক জনসাধারণের বিশেষ প্রশংসা লাভ করিয়াছিল—তাহা রবীন্দ্র মৈত্রের 'মানময়ী গার্লস স্কুল'। ইহাতে লঘু কৌতুকপূর্ণ পরিবেশের মধ্য দিয়া দুই বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী নরনারীর জীবনের জটিলতম একটি সমস্যার সহজ মীমাংসা দেখা যায়। কাহিনীর অগ্রগতি এবং চরিত্রের সূক্ষ্ম ক্রমবিকাশ নির্দেশ করিতে নাট্যকার প্রশংসনীয় কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। ইহার কাহিনীটি উল্লেখযোগ্য—

মানসমোহন মুখোপাধ্যায় একজন গ্রাজুয়েট বেকার যুবক; বহু চেষ্টা করিয়াও একটি সামান্য চাকরী যোগাড় করিতে পারিতেছে না। ফলে চরম অর্থ-সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছে। এমন সময় একদিন আমহার্স্ট স্ট্রীটের মোড়ে লাইটপোস্টে একটি কর্মখালির বিজ্ঞাপনের সন্ধান পাইল। পাড়াগাঁয়ের কোন এক মানময়ী গার্লস্ স্কুলের জন্য একজন শিক্ষক ও একজন শিক্ষিকার পদের

জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হইয়াছে। কিন্তু চাকরীর প্রধান সর্ত হইল এই যে, উক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাকে অবশ্যই স্বামী-স্ত্রী হইতে হইবে। সুতরাং অবিবাহিত মানসমোহনের কোন আশা রহিল না। ইতিমধ্যে নীহারিকা গাঙ্গুলী নামে অপর একটি বেকার খ্রীষ্টান যুবতীর আবির্ভাব হইল। সে ডায়োসেশনের গ্রাজুয়েট। টুইশনি সম্বল করিয়া কোনমতে দিন যাপন করিতেছে। কোথাও সামান্য একটি চাকরী মিলিতেছে না। পথের পাশে কর্মখালির বিজ্ঞাপনে সেও আকৃষ্ট হইল। নীহারিকাও কুমারী। সুতরাং নিরাশ হইয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল। নিরুপায় মানসমোহন তখন সসঙ্কোচে নীহারিকার কাছে একটি প্রস্তাব পেশ করিল। তাহার প্রস্তাবটি হইল এই যে, তাহারা দুইজন স্বামী-স্ত্রীর ভূমিকা গ্রহণ করিলে এমন একটি লোভনীয় চাকরী অনায়াসে তাহাদের হইতে পারে। বাঁচিয়া থাকিবার সংগ্রামে যদিও নীহারিকা মানসের মতই বিপর্যস্ত, তবু স্ত্রীজাতির স্বাভাবিক সংস্কারবশে এই প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারিল না।

এদিকে এক কৃষ্ণবর্ণ সাহেব মিঃ ফার্ণাণ্ডেজের কাছ হইতে নীহারিকা তাহার বি. এ. পরীক্ষার আগে কিছু টাকা ধার করিয়াছিল। অনেকদিন পরে তাহার সঙ্গে নীহারিকার দেখা হইয়া গেল এবং টাকার জন্য সে জঘন্য ভাষায় শাসাইয়া গেল। এমন কি, একথাও বলিয়া গেল যে, এক মাসের মধ্যে প্রাপ্য টাকা পরিশোধ না করিলে হয় তাহাকে মিসেস ফার্ণাণ্ডেজ হইতে হইবে, অথবা কারাবাস বরণ করিতে হইবে। নীহারিকার প্রতি এই দুষ্ট প্রকৃতির কৃষ্ণবর্ণ সাহেবের বহুদিনের আসক্তি। অপমানিতা নীহারিকা অনেকটা নিরুপায় হইয়া শেষ পর্যন্ত মানসমোহনের প্রস্তাবে রাজী হইল। মানসমোহনকে মোটামুটি একজন ভদ্র যুবক বলিয়াই মনে হইল এবং স্বামী-স্ত্রীর ছদ্মপরিচয়ে তাহারা উক্ত চাকরীর জন্য দরখাস্ত করিয়া দিল।

মানময়ী গার্লস স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা দামোদর চৌধুরী একজন গ্রাম্য জমিদার। পাশের গাঁয়ের বিত্তশালী ব্যবসায়ী বদন সরকারের সঙ্গে জেদ করিয়া স্ত্রীর নামে এই স্কুল প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। লেখাপড়া যতটা হউক বা না হউক—বদন সরকারের স্কুলের চেয়ে সব দিক দিয়া বড় স্কুল গড়িতে হইবে—ইহাই দামোদর চৌধুরীর পণ। সেইজন্য যথেষ্ট লোভনীয় মাহিনাতে গ্রাজুয়েট শিক্ষক-শিক্ষিকার জন্য বিজ্ঞাপন দিয়াছে।

এই স্কুলের সেক্রেটারী হইল রাজেন্দ্রলাল বাড়োরী—মুক্টিয়ার ইন দি কোর্ট অফ হিস অনার দি সাব ডিবিসনাল অফিসার অফ্ বদরতলা—রেভিনিউ। স্কুল সংক্রান্ত সর্ববিষয়ে সে হইল দামোদর চৌধুরীর দক্ষিণ হস্ত। তাহারই পরামর্শে স্বামী-স্ত্রী শিক্ষক-শিক্ষিকার জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল। ইহার পিছনে অবশ্য আর একটু রহস্য আছে। রাজেন বাড়োরী আবার দামোদর-কন্যা চপলার প্রতি প্রেমাসক্ত, যদিও বহু চেষ্টায়ও চপলার মন সামান্য মাত্রও আকৃষ্ট করিতে পারে নাই। পাছে একক গ্রাজুয়েট শিক্ষক আসিলে চপলা একেবারে হাতছাড়া হইয়া যায়—এই তাহার ভয়। দামোদর চৌধুরী এসবের কোনই খোঁজ রাখে না। তাহার স্কুলে একজোড়া গ্রাজুয়েট আসিবে—এই আনন্দেই সে আত্মহারা। যেমন করিয়াই হউক বদনের স্কুলকে হারাইতে হইবে—এই তাহার সংকল্প।

মানসমোহন এবং নীহারিকা যথারীতি স্বামী-স্ত্রীর ছদ্মবেশে একদিন মানময়ী গার্লস্ স্কুলে যোগদান করিল। নীহারিকা চিরকাল শহরে মানুষ, খ্রীষ্টীয় সৌখিন জীবনের আদবকায়দায় অভ্যস্ত, কিন্তু এই গ্রাম্য পরিবেশে এখানকার মানুষের গায়ে পড়িয়া আলাপ ও অতিরিক্ত সহৃদয়তায় শীঘ্রই হাঁপাইয়া উঠিল। বিশেষ করিয়া দামোদর ও দামোদর গিন্নীর পাড়াগেঁয়ে আদিরসাত্মক ঠাট্টা ও রসিকতায় সে একেবারে বিপন্ন হইয়া পড়িল। তাহা ছাড়া একজন অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে দিন রাত্রি স্ত্রীর ভূমিকায় অভিনয়, দামোদর ও দামোদর-গিন্নীর এই ভাবে যখন তখন নাতবৌ বলিয়া সম্বোধন, পায়ে আলতা পরানো,—কপালে সিন্দুর মাখা, ঘোমটা টানা, হিন্দুয়ানীর এ সব অত্যাচার সে আর সহ্য করিতে পারিতেছিল না। সেইজন্য সে চাকরী ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া যাইবার জন্য অধীর হইয়া উঠিল। অভিনীত ভূমিকার আড়ালের সত্য সম্পর্ক কোন্ সময় প্রকাশ হইয়া পড়ে মানস এই ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া আছে। তাহার উপর নীহারিকার এই পালাই পালাই ভাব তাহাকে আরো ভাবনার মধ্যে ফেলিল। নীহারিকাকে অনেক বুঝাইয়া অন্তত একমাসের জন্য এই সব উৎপাত কোন রকমে মুখ বুজিয়া সহ্য করিতে রাজী করাইল। স্থির হইল, প্রথম মাসের মাহিনা পাইলেই তাহাকে ছুটি দিয়া কলিকাতায় পাঠাইয়া দেওয়া হইবে।

সেক্রেটারী রাজেন বাড়োরীর যত ভাবনা—চপলাকে লইয়া। নতুন মাস্টারের বাসায় চপলার যথেচ্ছ যাওয়া আসা তাহার মোটেই পছন্দ

নয়। তাহার সন্দেহ মানসমোহনও চপলার প্রতি প্রেমাসক্ত এবং প্রেমের স্বাভাবিক নিয়মেই রাজেন বাড়োরী গ্রাজুয়েট মানসমোহনের প্রতি ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠিল। সে মাস্টারের বাসার সব কিছু গোপনে জানিবার জন্য চাকর হারানিধিকে উৎকোচে বশীভূত করিল।

নীহারিকার বিদায়ের দিন ঘনাইয়া আসিয়াছে। দুইজন নিঃসম্পর্কিত নারীপুরুষ, কেবল মাত্র বাঁচিবার সংগ্রামে তাহাদের এই স্বামী-স্ত্রীর অভিনয়। তবু এত দিনের পরিচয় ও এক সঙ্গে বসবাসের মধ্য দিয়া অভিনয়ের অতীত আর এক জীবনসত্য কখন যে আপনার নিয়মে তাহাদের অন্তরে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল—তাহাবা কেউ যেন তাহা জানিয়াও জানিতে পারিল না বা চাহিল না। তাহারা দুইজনই ভদ্র মার্জিতরুচি যুবক-যুবতী। সেইজন্য আসন্ন বিদায়কে সহজভাবেই তাহারা গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিল।

এদিকে বেচারী রাজেন! মোক্তারী ছাড়িয়া স্কুলের সেক্রেটাবী হইয়াছিল—চপলাকে কাছে পাইবার আশায়। কিন্তু কিছুতেই কিশোরী চপলার হৃদয় জয় করিবাব মন্ত্রটি সে আয়ত্ত করিতে পারিতেছে না। বিশেষ করিয়া মতুন মাষ্টার আসিবার পর হইতে সে যেন আরো দূরে চলিয়া গিয়াছে এবং এখন মাষ্টারনী চলিয়া যাইতেছে শুনিযা সে যেন আরো চিন্তাক্লিষ্ট হইয়া পড়িল।

নীহারিকার বিদায়ের আর একদিন মাত্র বাকী। দামোদরের বাড়ীতে আজ তাহাদের নিমন্ত্রণ। মানস ভাবিতেছে, আর একটা দিন কোন রকমে ভালোয় ভালোয় কাটিয়া গেলে হয। কিন্তু রাত্রে ঘোরতব বিপদ উপস্থিত হইল। খাওয়া দাওয়ার পর দামোদর গিন্নীর কৌশলে মানস ও নীহারিকা দামোদরের গৃহের এক শয়নকক্ষে বন্দী হইল। মানস অনেক রাত্রে তাহার জন্য নির্দিষ্ট শয়নকক্ষে গিয়া যখন নীহারিকাকে আবিষ্কার করিল —তখন সে নিরুপায়। কারণ, বাহির হইতে ততক্ষণে শেকল বন্ধ হইয়া গিয়াছে। পাছে সব জানাজানি হইয়া সব মাটি হইয়া যায়—এই ভয়ে মানসমোহন ট্রেনের যাত্রীর মত একটা রাত্রি কাটাইয়া দিবার প্রস্তাব করিল। কিন্তু চিরন্তন কুমারী নারীর সংস্কারবশে নীহারিকা এ প্রস্তাব কিছুতেই মানিয়া লইতে পারিল না, বরং আরও যেন বেশী ঘাবড়াইয়া গেল। মানস তখন গত্যন্তর না দেখিয়া দোতলার খোলা জানালা দিয়া লাফাইয়া পড়িয়া মান সম্মান ও প্রাণ বাঁচাইল এবং নীহারিকাকেও মুক্তি দিল।

বলা বাহুল্য, এই ছদ্ম স্বামী-স্ত্রীর ব্যবহারের মধ্যে যে অসঙ্গতি ছিল, তাহা দামোদর ও দামোদর-গিন্নী তুইজনেই লক্ষ্য করিয়াছিল। কিন্তু তাহারা ইহাকে ভাবিয়াছিল—ক্ষণিকের দাম্পত্য কলহ মাত্র। সেইজন্য স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য মিটাইবার প্রত্যাশায়ই উপরোক্ত ষড়যন্ত্র করিয়াছিল।

নীহারিকার বিদায় সভা। চপলা অভিনন্দন-পত্র পাঠ করিল এবং অন্যান্য ছাত্রীরা গান করিল। এই অভিনন্দন পত্র ও গান তুইই মানসের রচনা এবং তাহাদের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে মানস যেন অনেকটা নিজের হৃদয়ের কথা প্রকাশ করিয়া বিদায় মুহূর্তের যন্ত্রণার ভার লাঘব করিয়া দিয়াছে। কিন্তু নীহারিকা ছাড়া ইহা আর কেহই বুঝিতে পারিল না। শেষ বিদায় লগ্নে নীহারিকা স্পষ্ট বুঝিতে পারিল যে, এখানে গত একমাসের অভিনয়ের অন্তরালে সে এই গ্রাম, এই পরিবেশ এবং সর্বোপরি যাহার জন্য এই চাকরী সেই মানুষটিকে অজ্ঞাতে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে। সেইজন্য স্বভাবতঃই আজ অকারণে কোথায় যেন একটা অভিমানক্ষুব্ধ বেদনা উদ্বেল হইয়া উঠিতেছে। বিদায়-সভার পর নীহারিকা যখন এই যন্ত্রণাবিদ্ধ হৃদয়ের মুখোমুখি হইয়া নানা ভাবে স্মৃতিচারণা করিতেছে, তখনই সেখানে রাজেনের আবির্ভাব হইল এবং ব্যর্থপ্রেমিক রাজেন হিতৈষীর ছদ্মবেশে গোপন চিঠিতে মাস্টারের চপলার প্রতি আসক্তির ইতিবৃত্ত নীহারিকাকে জানাইয়া গেল। ইতিমধ্যে ধূর্ত চাকর হারুর মারফৎ রাজেন জানিয়াছে যে মাস্টারনী জাতিতে খ্রীষ্টান। শুধু তাহাই নয়, অর্থের বিনিময়ে—হারানিধি তাহাদের স্বামী-স্ত্রীর ছদ্ম সম্পর্কের আবরণও উন্মোচিত করিয়া দিয়াছে। ব্যর্থ প্রেমিক রাজেন দামোদর ও মানময়ীকে সঙ্গে লইয়া চুপি চুপি মাস্টারের বাসায় চলিল—রহস্যের সম্পূর্ণ উদ্ঘাটনের আশায়। অশ্রুসজল এক প্রেমিকা কখন জাগিয়া উঠিয়াছে নীহারিকার মধ্যে—সে নিজেও জানিত না। কিন্তু চপলার প্রতি মানসের এই আসক্তির সংবাদ জানিয়া সে আর যেন নিজেকে সামলাইয়া রাখিতে পারিল না। আজ সে স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছে, কখন অজ্ঞাতে সে মানসকে তাহার কুমারী হৃদয়ের সবটুকু দান করিয়া ফেলিয়াছে। অভিমানহত শাশ্বতী নারী আজ আর কোন বাধা মানিতে চাহিল না। সমস্ত মিথ্যা অভিনয়ের খোলস কখন খুলিয়া পড়িয়া গেল। এদিকে মানসের সমগ্র সত্তাও কখন যে সহৃদয়তার ঐশ্বর্যে ও স্নেহের বেদনায় পরিপ্লাবী হইয়া উঠিয়াছে এই খামখেয়ালী সহায়-

সম্বলহীনা সংসার-অনভিজ্ঞা নারীর প্রতি—প্রত্যহের পরিচয়ের পথে ধীরে ধীরে,—তাহা সে এতদিনে প্রথম জানিতে পারিল। সেইজন্য দুইজনেই দুইজনের কাছে সমস্ত অতীত বিস্মৃত হইয়া আত্মসমর্পণ করিল। চিরন্তন নর ও নারী রূপে প্রেমসিক্ত যাত্রাপথের সপ্তপদীর মধ্য দিয়া তাহাদের যেন নবজন্ম হইল। এক আবেগ-বিহ্বল আনন্দ-বেদনার মধ্যে তাহারা সত্যকারের স্বামী-স্ত্রীতে রূপান্তরিত হইয়া গেল। নীহারিকার চলিয়া যাওয়া আর হইল না। বৃদ্ধ দামোদর চৌধুরী তাঁহার স্কুলের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইলেন। আর রাজেন বাড়োরী—সেও ঈর্ষার দংশন হইতে মুক্তি পাইল—। অবশ্য চাকর হারুর যে চাকরীটি গেল সে কথা বলাই বাহুল্য।

অতি-আধুনিক বিষয় লইয়া প্রচলিত ভঙ্গিতে যে এই যুগে একখানি নাটক রচিত হইয়াছিল, তাহা শশিভূষণ দাশগুপ্তের 'দিনান্তের আগুন'। বাস্তুত্যাগী পূর্ববঙ্গবাসীর সমস্যা লইয়া ইহা রচিত। শশিভূষণ দাশগুপ্ত ইতিপূর্বে 'রাজকন্যার ঝাঁপি' নামক একখানি ক্ষুদ্র রোমাণ্টিক নাটক রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার 'দিনান্তের আগুনে'র মধ্যে রোমাণ্টিক মনোভাবের চিহ্নমাত্রও নাই। অনুভূতির তীব্রতা এবং প্রকাশ-ভঙ্গির প্রত্যক্ষতার গুণে ইহা মর্মস্পর্শী হইয়া উঠিয়াছে। 'নূতন ইহুদি'র মধ্যেও এই গুণ প্রকাশ পাইয়াছে। বাঙ্গালী জীবনের এই সমস্যার যতদিন পর্যন্ত কোন স্থায়ী সমাধান না হয়, ততদিন পর্যন্ত ইহা আরও উচ্চাঙ্গ নাটকের প্রেরণা দান করিতে পারে। আধুনিকতম কাল পর্যন্ত এই সমস্যাই বাঙ্গালী জীবনের সর্বশেষ গুরুতর সমস্যা হইয়া রহিয়াছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

নব-নাট্য আন্দোলন

১৯৪৪—১৯৬০

সূচনা

এক

কিছুকাল যাবৎ বাংলা নাটক যে ইহার গতানুগতিক বিষয়-বস্তু পরিত্যাগ করিয়া নূতন বিষয়-বস্তুর সন্ধান করিবার প্রয়াস পাইতেছে, তাহা সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। এ' পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে সমাজ-সংস্কারমূলক ও দেশাত্মবোধক আন্দোলন ভিত্তি করিয়া যে সব নাটক রচিত হইয়াছিল, তাহাদের ধারা সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়াছে। পৌরাণিক বিষয় ইহার যে একটি প্রধান অংশ অধিকার করিয়াছিল, তাহাও আজ আর নাই। অথচ এমন একদিন ছিল, যখন বাংলায় পৌরাণিক নাটকের মত জনপ্রিয় আর কিছুই ছিল না; এই অবস্থারও সম্পূর্ণ পরিবর্তন হইয়াছে। বাঙ্গালীর সমাজ-জীবনের মধ্যে ভক্তি ও বিশ্বাসের যে প্রেরণা ছিল, প্রধানতঃ তাহা আশ্রয় করিয়াই পৌরাণিক নাটক বিকাশ লাভ করিয়াছিল; যদিও বিংশ শতাব্দীতে প্রবেশ করিবার পর হইতেই ইহার সেই ভক্তি ও বিশ্বাস-বোধের মধ্যে শৈথিল্য দেখা দিয়াছিল, তথাপি পৌরাণিক নাটক ইহার বহিরঙ্গটুকু অক্ষুণ্ণ রাখিয়াও আরও কিছুকাল আত্মরক্ষা করিয়াছিল; কিন্তু আজ তাহার জীবনী-শক্তি লুপ্ত হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, এ' যাবৎকাল বাংলা নাটকের যাহা উপজীব্য ছিল, তাহা প্রায় সমূলেই বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। যদি তাহাই হয়, তবে এ' কথা স্বীকার করিতে হয় যে, বাংলা নাটক সাম্প্রতিক কালে নূতন রূপ লাভ করিয়াছে; প্রায় একশত বৎসর যাবৎ যে সংস্কার ইহার অন্তর ও বাহির আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল, ইহার মধ্য হইতে তাহা আজ সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে; সুতরাং আজ বাংলা নাটক রচনায় কোন কৃতিত্ব কিংবা নিষ্ফলতা যাহাই দেখা দিক না কেন, তাহার জন্য ইহার প্রায় এক শত বৎসরের ঐতিহ্য কোন দিক দিয়াই দায়ী নহে।

বাংলা নাট্যসাহিত্য যে একান্ত সাম্প্রতিক কালেই ইহার নিজস্ব ঐতিহ্যের ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে, তাহা নহে—ইহার পূর্ববর্তী কালেও রবীন্দ্র নাট্য-সাধনার ভিতর দিয়া ইহার ঐতিহ্যের ধারার সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল। এ' কথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, কাব্য কিংবা কথাসাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে বাংলা সাহিত্যের প্রচলিত ধারা অনুসরণ করিয়াই রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল, কিন্তু নাটকের ক্ষেত্রে তাহা সম্ভব হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ যখন প্রথম নাটক রচনা করিলেন, তখন বাংলা নাটক রচনার যে একটি আদর্শ সম্মুখে ছিল না, তাহা নহে—কিন্তু তিনি তাহা উপেক্ষা করিয়াই নিজের সাধনার পথে অগ্রসর হইয়া গেলেন। ঐতিহ্যের সঙ্গে তাঁহার বিচ্ছেদ ঘটিল; কিন্তু সাম্প্রতিক কালে বাংলা নাটক যে ইহার ঐতিহ্যের ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে, তাহার প্রকৃতি একটু স্বতন্ত্র। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার একান্ত আত্মভাব পরায়ণ (Subjective) কাব্যসাধনার ধারাকে আশ্রয় করিয়াই তাঁহার নাট্যরচনার ধারা সৃষ্টি করিলেন, ইহার সঙ্গে বাঙ্গালীর বহির্মুখী সমাজ-জীবনের সম্পর্ক অত্যন্ত গৌণ ছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে বাংলা নাটকে ঐতিহ্যের সঙ্গে যে বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে, তাহা কাহারও নিতান্ত আত্মকেন্দ্রিক অনুভূতি-আশ্রিত বলিয়া নির্দেশ করিবার উপায় নাই,—বহির্মুখী সমাজ-জীবনের পরিবর্তনের প্রত্যক্ষ ধারা অনুসরণ করিয়াই ইহা সৃষ্টি হইয়াছে; সুতরাং রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিতে যেমন যথার্থ নাটকীয় উপকরণ লক্ষ্যচ্যুত হইয়া পড়িয়াছিল, সাম্প্রতিক বাংলা নাটকে তাহা হয় নাই। সাম্প্রতিক বাংলা নাটকের সম্মুখে যে জীবন আছে, তাহা বহুলাংশে যেমন সত্য, তেমনই প্রত্যক্ষ। সেইজন্য রবীন্দ্র-নাটকের ঐতিহ্যচ্যুতি এবং সাম্প্রতিক নাটকের ঐতিহ্যচ্যুতি সম্পূর্ণ অভিন্ন প্রকৃতির বলিয়া নির্দেশ করিতে পারা যায় না।

এ' কথা কাহারও কাহারও মনে হইতে পারে যে, বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকেই বাংলা দেশে যে দেশাত্মবোধের জন্ম হইয়াছিল, তাহার মধ্য দিয়াও বাংলা নাটক ইহার পূর্ববর্তী ধারার সঙ্গে সুস্পষ্ট বিচ্ছেদ সৃষ্টি করিয়াছিল। কিন্তু এ' কথা সত্য নহে। ইহা যুগের পরিবর্তন মাত্র, ঐতিহ্যের বিচ্ছেদ নহে—রবীন্দ্র-নাটক কিংবা সাম্প্রতিক নাটকের সঙ্গে ইহার যেমন বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল এবং ঘটিয়াছে, ইহা সেই প্রকৃতির নহে। নাটকের তখন কেবল মাত্র বিষয়-বস্তুরই পরিবর্তন হইয়াছিল, আঙ্গিকের কোন পরিবর্তন হয় নাই। সাম্প্রতিক কালে বিষয়-বস্তুর সঙ্গে সঙ্গে আঙ্গিকেরও পরিবর্তন হইয়াছে—রবীন্দ্র-নাটকেও

এমনই অন্তর ও বহিরঙ্গগত পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল, সাম্প্রতিক কালেও তাঁহাই হইয়াছে। তবে রবীন্দ্রনাথের ধারা অনুসরণ করিয়া সাম্প্রতিক নাটকের পরিবর্তন আসে নাই, সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে ইহার পরিবর্তন হইয়াছে। সাম্প্রতিক নাটকের মধ্যে সেই পরিবর্তন কবে কোন দিক হইতে কি ভাবে আসিল, তাহাই আমাদের আলোচনার বিষয়। ইহার গতি এবং প্রকৃতিও এই সম্পর্কে আমাদের অনুধাবনযোগ্য।

বিংশ শতাব্দীতে পদার্পণ করিবামাত্র বাংলা নাটক যে স্বদেশী আন্দোলনের সম্মুখীন হইয়াছিল, তাহার মূলে আদর্শবাদের প্রেরণা যতদূর কার্যকরী ছিল, বাস্তব সমাজ-জীবনের প্রেরণা তত কার্যকরী ছিল না। দেশাত্মবোধের অনুভূতি বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে পাশ্চাত্ত্যশিক্ষার প্রত্যক্ষফল রূপেই বিকাশ লাভ করিয়াছিল, পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহে যেমন ইহা সামগ্রিক জাতীয় চৈতন্যের সঙ্গে সংযুক্ত, এ' দেশে তাহা তেমন নহে। সেইজন্য সেই যুগে বাংলা নাটকের ভিতর দিয়া যে উত্তেজনাই প্রকাশ পা'ক, তাহা কিছুতেই জাতির জীবনের অন্তস্তল স্পর্শ করিতে পারে নাই। সুতরাং ইহার অভিব্যক্তি যেমন আকস্মিক হইয়াছিল, তেমনই ইহার ফলও ক্ষণস্থায়ী হইয়াছিল; দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকগুলি অনুসরণ করিলেই এ' কথা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে। স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম দিকে তাঁহার রচনাগুলির মধ্যে যে উত্তেজনার পরিচয় পাওয়া যায়, ইহার শেষ ভাগের রচনার মধ্যে তাহা স্তিমিত হইয়া আসিয়াছিল; শুধু তাহাই নহে, নাট্যরচনার বিষয়ের মধ্যেই তখন তাঁহার পরিবর্তন দেখা দিয়াছিল। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও দেশাত্মবোধক নাটক রচনায় তাঁহার মধ্যে যে সংস্কার গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা তিনি পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই বলিয়া নূতন বিষয়-বস্তু লইয়া রচিত নাটকেরও অন্তর ও বহিরঙ্গগত পরিচয়ে তাহার প্রভাব অত্যন্ত সক্রিয় হইয়াছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রভাব সে যুগের নাট্যরচনায় সুদূরপ্রসারী হইয়াছিল; ভাব, আদর্শ এবং বিষয়-বস্তু নির্বাচনে দীর্ঘকাল যাবৎ তাহারই অনুসরণ চলিতেছিল। এমন সময় অত্যন্ত আকস্মিকভাবে ভারতের স্বাধীনতালাভ এবং বঙ্গবিভাগ ঘটিয়া গেল। স্বাধীনতালাভের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গবিভাগ সংঘটিত হইবার কিছুকাল পূর্ব হইতেই বাংলার সমাজের নৈতিক মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জাপানের যোগদানের পর হইতেই এই অবস্থার সৃষ্টি হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। ব্রহ্মদেশে মিত্রশক্তি জাপানের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া আসিয়া ভারতের

পূর্বসীমান্ত রক্ষা করিবার যে 'কৌশল' অবলম্বন করিল, তাহার ফলে বাংলাদেশের সমাজ বিধ্বস্ত হইয়া গেল—পঞ্চাশ লক্ষ অধিবাসীর দৈহিক মৃত্যু হইলেও অবশিষ্ট জনসাধারণেরও নৈতিক মৃত্যু হইল। বাংলার সামাজিক জীবনের ইতিহাসে ইহার মত বিপর্যয় ইতিপূর্বে ঘটিয়াছে বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং সাহিত্যে ইহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে ইহা নিতান্তই স্বাভাবিক। আমরা জানি, বাংলা নাট্যসাহিত্য প্রথম হইতেই যুগাশ্রয়ী; বিশেষ যুগকে অতিক্রম করিয়া চিরকালের রাজ্যে ইহা প্রথম হইতেই উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই; সুতরাং যখন একটি যুগান্তকারী অবস্থার সৃষ্টি হইয়া পড়িল, তখন তাহা স্বভাবতঃই ইহার দৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত হইল। অন্য কোন বিষয়ের জন্য না হইলেও বাংলা নাটকের দিক দিয়া এ দেশের সমাজ-জীবনে এই প্রকার একটি যুগান্তকারী ঘটনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আমরা দেখিয়াছি, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়াও পর্বে পর্বে বাংলা সাহিত্যে নূতন নূতন অধ্যায় সৃষ্টি হইয়াছে। বাংলা নাট্যসাহিত্যের ধারায়ও যুগের পরিবর্তন হইয়াছে সত্য, কিন্তু পূর্ববর্তী ধারার সঙ্গে ইহাদের ব্যবধান সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগের মত এত সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারে নাই। বিশেষতঃ আনুপূর্বিক ইহার আঙ্গিক সাম্প্রতিক কালের পূর্ব পর্যন্ত প্রায় অভিন্নই ছিল। সুতরাং একটি সম্পূর্ণ যুগান্তকারী ঘটনা না হইলে ইহার দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে কোনদিনই আনুপূর্বিক পরিবর্তন দেখা দিতে পারিত না। সাম্প্রতিক কালের সূচনায় বাংলার সমাজ-জীবনে সেই পরিবর্তনই দেখা দিয়াছিল। একান্তভাবে জীবনকে আশ্রয় করিয়া বিকাশ লাভ করে বলিয়াই সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ধারার মধ্যে একটি অখণ্ডতা দেখা যায়। কারণ, জীবনের শাশ্বত গুণের উপর ভিত্তি করিলেই যুগ হইতে নূতন যুগে উত্তীর্ণ হইয়াও ইহার মৌলিক বিষয়ের কোনও বিকার ঘটিতে পারে না; কিন্তু যেখানে তাহা পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র উপরিস্তরকেই আশ্রয় করা হয়, সেখানেই ইহার একটি অখণ্ড ধারা সৃষ্টি হইতে পারে না; নূতন নূতন যুগে ইহার নূতন নূতন রূপ দেখা যায় মাত্র। বাংলা নাট্যসাহিত্যের ধারায়ও একটি অখণ্ড যোগসূত্র সর্বদা যে উদ্ধার করা যায় না, তাহার প্রধান কারণই এই যে, ইহা কোন কালেই একান্তভাবে জীবনের আনুগত্য স্বীকার করে নাই। জীবন-সূত্রেই সাহিত্যের অখণ্ডতার সৃষ্টি; যেখানে জীবনের এই অনুভূতি নাই, সেখানে এই অখণ্ডতাও সৃষ্টি হইতে পারে নাই। সাম্প্রতিক বাংলা

নাটক যে পূর্ববর্তী ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, তাহার প্রধান কারণ এই যে, প্রধানতঃ ইহা বহির্মুখী বিষয় আশ্রয় করিয়াছিল, তাহা যে যুগের বিষয় ছিল, সেই যুগের অবসানেই তাহার মূল্য হ্রাস পাইয়াছে। যে ঘটনা-রাশির ভিতর দিয়া এই দেশের সমাজ সাম্প্রতিক্ কালে অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে, একান্ত ভাবে তাহারই ফলাফলের উপর তাহার সকল ঔৎসুক্য আজ কেন্দ্রীভূত হইয়াছে।

স্বাধীনতা লাভের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্তও জাতির মনে এ আশঙ্কা কোনদিন কোন ভাবেই দেখা যায় নাই যে, এ দেশ কোন কারণে বিভক্ত হইয়া যাইতে পারে। বহু দূরদর্শী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির মধ্যেও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্য দিয়া কোনদিন যে দেশবিভাগ সম্ভব হইতে পারে স্বপ্নেও এই আশঙ্কা কোনদিন অনুভূত হয় নাই। পূর্ব হইতে ইহার কোন প্রস্তুতি ছিল না, ইহার আসন্ন পরিণাম সম্পর্কেও পূর্ব হইতে কোন অস্পষ্ট ধারণাও ছিল না। পূর্ব হইতে সমাজের চিন্তা এই ধারায় কোনদিনই অগ্রসর হয় নাই বলিয়া ইহা যখন একান্তই সত্য হইয়া উঠিল, তখন তাহার সম্মুখীন হইয়া কোনও পূর্বপরিকল্পিত পথে সমাজ অগ্রসর হইয়া যাইবার সুযোগ লাভ করিল না; তখন এ'দেশের সমাজে যাহা সংঘটিত হইল, তাহা বিমূঢ়বুদ্ধি জাতির পরিণাম-চিন্তাহীন এবং অর্থহীন আকস্মিক অঙ্গ-আস্ফালন মাত্র। এই অবস্থা স্থায়ী হইতে পারে না, এ'কথা সত্য; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বুঝিতে পারা যায় যে, সুদীর্ঘ সাধনা দ্বারা লব্ধ সমাজের একটি স্থির লক্ষ্যও ইহা দ্বারা আবিল হইয়া যাইতে পারে। যত দীর্ঘ সময়েরই প্রয়োজন হউক না কেন, সমাজের এই অবস্থাও একদিন কাটিয়া যায় এবং তাহার মধ্যে বিনষ্ট আদর্শের পুনরুদ্ধারও সম্ভব হয়; কিন্তু যতদিন পর্যন্ত তাহা না হয়, ততদিন পর্যন্ত সমাজ-জীবনের উপরি-স্তরে এই সাময়িক বিক্ষোভ যদি জাতির সাহিত্যের উপজীব্য হইয়া দাঁড়ায়, তবে সাহিত্য-সৃষ্টির মধ্যে তাহা যথার্থ শক্তি সঞ্চার করিতে পারে কি না, তাহা বিচার করিয়া দেখা প্রয়োজন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সমকালীন ও বিভাগোত্তর সাম্প্রতিক যুগের সমাজে জীবনের শাশ্বত এবং চিরন্তন উপকরণের উপরিস্তরে যে বহুমুখী বিষয়ের জঞ্জালরাশি স্তূপীকৃত হইয়াছে, তাহা অবলম্বন করিয়া ইহার গভীরতম স্তরে গিয়া পৌঁছান কতদূর সম্ভব এবং কতখানি প্রতিভার প্রয়োজন তাহা বিশেষ বিচার-সাপেক্ষ। এ'কথা সত্য, জীবনের উপরিস্তরের বিক্ষোভ ইহার

অন্তস্তলেও সুগভীর অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করিবার পক্ষে সহায়ক হয়। সুতরাং সমাজের বহির্মুখী সাময়িক উত্তেজনার মধ্য দিয়া ইহার আশ্রিত চরিত্রগুলি অন্তর্দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে উত্তীর্ণ হইতে পারিলে নাটক রচনার ক্ষেত্রে সার্থকতা লাভের কোন অন্তরায় সৃষ্টি হইতে পারে না। সামগ্রিক ভাবে বাংলার সমাজ-জীবনের উপর এত বড় বিক্ষোভ ইতিপূর্বে আর দেখিতে পাওয়া যায় নাই। বাংলার নীল-বিদ্রোহ হউক, স্বদেশী আন্দোলনই হউক কিংবা অসহযোগ আন্দোলনই হউক, সাম্প্রতিক দেশ-বিভাগের মত ইহারা এত বিরাট সামাজিক বিক্ষোভ এ'দেশে আর কোন দিন সৃষ্টি করিতে পারে নাই। কেবল মাত্র আধুনিক কালেই নহে, মধ্যযুগেও ইহার তুলনা নাই। দীর্ঘকালের সংগ্রামের ভিতর দিয়া একটা সমাজের আত্ম-প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়, সুতরাং ইহা সহজে ভাঙ্গিতেও পারে না; কিন্তু ইহাও যখন ভাঙ্গিয়া পড়ে, তখন যে বিরুদ্ধ শক্তির আঘাতে ইহার আত্মরক্ষা অসম্ভব হইয়া উঠে, তাহা যে কত কঠিন তাহা আমরা অনুভব করিতে পারি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সমসাময়িক কালে লক্ষ লক্ষ লোক বাংলা দেশের পথে ঘাটে পড়িয়া মরিল, অবশিষ্ট কয়েক কোটি লোক চোখের সম্মুখে দাঁড়াইয়া সেই মৃত্যু প্রত্যক্ষ করিল, রোধ করিতে পারিল না। সমাজের মধ্যে ইহা যে এক সুগভীর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিবে, তাহা ত নিতান্ত স্বাভাবিক। কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে কোন দেশে হয়ত একসঙ্গে ইহা অপেক্ষাও বেশি লোক মারা যাইতে পারে, কিন্তু তাহার সঙ্গে বাংলা দেশের এই ঘটনার পার্থক্য আছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে মানুষ যখন মরে, তখন সে নিজে কিংবা সমাজের অন্য কেহই তাহাকে রক্ষা করিতে পারে না। ভিসুবিয়সের অগ্ন্যুদ্গারের ফলে পম্পাই নগর ধ্বংস হইয়া লক্ষ লক্ষ লোক মরিয়াছিল, এই ধ্বংসক্রিয়া যেমন মানুষের ক্রিয়া নহে, তেমনই সেদিনে যাহারা বাঁচিয়াও ছিল তাহারাও তাহাদের প্রতিবেশীদের মৃত্যু রোধ করিতে পারে নাই, সেখানে দৈবনির্ভরতার সৃষ্টি হয়; কিন্তু বাংলায় এই অভিশাপ মানুষই সৃষ্টি করিয়াছে, সেই মানুষ যেই হউক না কেন, সে মানুষই; সে একটা বিরাট শক্তির অধিকারী হইলেও সে মানুষ হইয়া নিজের স্বার্থের বশবর্তী হইয়া অসহায় দুর্বল অন্য মানুষের প্রাণ হরণ করিয়াছে; সেই নরঘাতক অত্যাচারীশক্তির দাক্ষিণ্য ভিক্ষা করিয়া সে'দিন সমাজের যে অংশ স্ফীত হইয়া উঠিয়াছিল, সে তাহার প্রতিবেশীকে রক্ষা করিতে

আসে নাই; সুতরাং আগেই বলিয়াছি, যে মরিল, তাহার দৈহিক মৃত্যু হইলেও এই নির্বিচার মৃত্যুর যাহারা প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা তাহাদেরও নৈতিক মৃত্যু হইয়াছে। সমাজ-জীবনাশ্রিত মানুষই সাহিত্যের মানুষ, নীতি দ্বারা সমাজ নিয়ন্ত্রিত হয়, স্বেচ্ছাচারিতা দ্বারা নহে। সুতরাং মনুষ্যত্ব বিসর্জনই সামাজিক মানুষের মৃত্যু। অতএব নৈতিক মৃত্যুও মানুষ হিসাবে মৃত্যু। মানুষ ও মনুষ্যত্বের নির্বিচার হত্যা যে সমাজের চোখের উপর অনুষ্ঠিত হইয়াছে, সে তাহার প্রত্যক্ষ সমাজ-জীবন ভিত্তিক নাট্য সাহিত্যের মধ্য দিয়া উচ্চ আদর্শের কোন্ বলিষ্ঠ শক্তি প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হইতে পারে? এই ভাবে মানুষের শক্তির উপরই অবিশ্বাস আসিয়া পড়িলে শুধু নাট্য সাহিত্যেই কেন, সাহিত্যের কোন বিভাগেই উচ্চতর কোন সৃষ্টি সম্ভব হইতে পারে না।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন এই দুর্যোগ অনুসরণ করিয়াই আকস্মিকভাবে দেশ-বিভাগের অভিশাপ এই ভাগ্যহীন জাতির উপর নামিয়া আসিল। তাহার ফলে যাহা লইয়া গৃহ, পরিবার ও সমাজ এই জাতির তাহাই নির্মূল হইয়া গেল। আপাতদৃষ্টিতে এ'কথা মনে হইতে পারে, এক তৃতীয়াংশ বাংলা দেশ যখন রক্ষা পাইল, তখন এই কথা বলিবার তাৎপর্য কি? কিন্তু গভীর ভাবে বিচার করিলে দেখা যায়, এই অভিশাপে বাংলার কোন অংশই রক্ষা পাইল না। একটা সুপ্রতিষ্ঠিত সমাজ-জীবন অংশে অংশে খণ্ডিত হইয়া কদাচ বাস করে না; বাংলা দেশের মধ্যে যে আঞ্চলিক বিভাগই থাকুক না কেন, দীর্ঘকাল ধরিয়া একই ভাষার মাধ্যমে এই জাতির মধ্যে একটি অখণ্ড ঐক্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং ইহার একটি অংশ যখন ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গেল, তখন সমগ্র সমাজ-দেহের শিরা-উপশিরাগুলির মধ্যেও টান পড়িল; তাহার ফলে সামগ্রিকভাবে তাহারও জীবনীশক্তি হ্রাস পাইয়া গেল। বিশেষতঃ বাংলার সমাজ-দেহের যে অংশটি ছিন্নমূল হইয়া পড়িয়া গেল, তাহা যে ইহার একটি শক্তিশালী অঙ্গ ছিল, তাহা ত অস্বীকার করিবার উপায় নাই—সুতরাং ইহা দ্বারা সমাজ-দেহের সেই পরিমাণেই সর্বনাশ হইল। পক্ষাঘাতগ্রস্ত অঙ্গ সমস্ত দেহেরই ভার স্বরূপ হইয়া তাহাকে অচল করিয়া রাখে; সুতরাং বাংলার সমাজ-দেহের একাংশের ভাঙ্গন, অপর অংশের ক্ষয়কে রোধ করিতে পারিল না। অনাহারে মৃত লক্ষ লক্ষ লোকের পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া আরও কয়েক লক্ষ ছিন্নমূল পরিবার সীমান্ত অতিক্রম করিল। ইহাদের গৃহ নাই, পরিবার নাই, সমাজ নাই; অথচ ভার আছে, বাঁচিবার আকাঙ্ক্ষা

আছে। তাহারা ভার-স্বরূপ হইয়া আসিয়া দেশের একটি মাত্র অপরিসর অংশে কেন্দ্রিত হইতে লাগিল। ইহাদের প্রত্যেকেরই প্রাত্যহিক জীবন আচরণে আমূল পরিবর্তন দেখা দিল, কৃষিনির্ভর সমাজাশ্রিত একটি সমাজ ভূমিহীন শিল্পাঞ্চলের সমাজের মধ্যে অনধিকার প্রবেশ করিয়া নিজেদের বাঁচিয়া থাকিবার উপায় খুঁজিতে লাগিল। ইহাদের জীবনের লক্ষ্য পরিবর্তিত হইল, আদর্শ বিসর্জিত হইল, সুকঠিন সংগ্রামের মধ্যে শক্তিক্ষয় করিয়া করিয়া যে আত্মমর্যাদা ও প্রাণটুকু লইয়া অনিশ্চিত জীবনের পথে পা বাড়াইয়াছিল, তাহার কতটুকু অবশিষ্ট রহিল, তাহাও অনুসন্ধানের বিষয় হইয়া পড়িল। আপাতদৃষ্টিতে যাহাদিগকে মনে হইয়াছিল, অন্ততঃ দেশ-বিভাগের দ্বারা তাহাদিগের স্বার্থের কোন ব্যাঘাত হইবে না, তাহারাও অল্পদিনেই বুঝিতে পারিল, তাহাদের এই অনুমান সত্য নহে। সমাজ-দেহে বিষ প্রবেশ করিলে তাহার প্রভাব বহুদূর সঞ্চারী হয়, স্থানবিশেষেই সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে না। যাঁহারা ভাবিয়াছিলেন, পক্ষাঘাতগ্রস্ত অঙ্গটিকে কাটিয়া বাদ দিলেই দেহের পুষ্টি অব্যাহত থাকিবে, তাঁহারাও নিজেদের ভুল বুঝিতে পারিয়া আজ আতঙ্কগ্রস্ত হইয়াছেন। সুতরাং যুদ্ধকালীন মনুষ্যরচিত দুর্ভিক্ষেরই মত দেশ-বিভাগও এই সমাজের সামগ্রিক যুগান্তকারী একটি বিপর্যয়। সমগ্র সমাজ-মনের উপর ইহার যে আন্দোলন সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা যে'দিন স্থির হয়, সে'দিন সমগ্র সমাজের উপর একসঙ্গেই তাহা স্থির হইবে ; যতদিন তাহা না হয়, ততদিনে সমাজের একটি অংশ স্থৈর্য লাভ করিবে, অন্য অংশের মধ্যে এই বিক্ষোভ সক্রিয় হইয়া থাকিবে, তাহা সত্য নহে—কারণ, সমাজ-জীবনের ইহা ধর্ম নহে।

সাম্প্রতিক বাংলা নাটকের মধ্যে ব্যক্তিচরিত্রের বলিষ্ঠতার পরিচয়ের পরিবর্তে গোষ্ঠী জীবন যে অধিকতর প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে, ইহার প্রধান কারণ ইহাই। বিগত উনবিংশ শতাব্দীতে সমাজ-জীবনের মধ্য হইতে ব্যক্তি চরিত্রগুলি যে ভাবে স্বতন্ত্র হইয়া আসিতে পারিত, সাম্প্রতিক সমাজে তাহা হইবার উপায় নাই। এখন সমাজের যে পরিচয়, তাহা গোষ্ঠীগত ভাবেই প্রকাশ পায়, সমস্যা এখন আর ব্যক্তি কিংবা ব্যষ্টির নহে ; উপরে যে সমস্যা গুলির কথা উল্লেখ করিলাম, তাহা গোষ্ঠীরই সমস্যা। উনবিংশ শতাব্দীতে রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র, পরমহংস ও বিবেকানন্দের মত এক একটি বিরাট ব্যক্তিত্ব মধ্যে মধ্যে সমাজের মধ্য হইতে মাথা তুলিয়া উঠিত। তাঁহাদের

সেই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া সে যুগে যে নাটক রচিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে ইহাদের প্রতিবিম্বরূপে এক একটি বলিষ্ঠ নায়ক-চরিত্র সৃষ্টি হইবার সুযোগ পাইয়াছে। এমন কি, মধ্যযুগেও যে আখ্যায়িকা-সাহিত্য রচিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যেও প্রায় সর্বত্রই চৈতন্য-চরিত্রের অনুরূপ বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন চরিত্রের সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক নাটকের দিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, ইহাতে বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন একক নায়ক-চরিত্রের পরিকল্পনা সার্থকতা লাভ করিবার পরিবর্তে গোষ্ঠীজীবনের সামগ্রিক পরিচয়ই মুখ্য স্থান লাভ করে। এই কথাটি বিশেষ ভাবে বুঝিবার প্রয়োজন আছে ; কারণ, ব্যক্তির পরিবর্তে গোষ্ঠীজীবনই যদি সমাজের এই প্রকার লক্ষ্য হইয়া উঠে, সমগ্র সমাজের দুঃখ-দুর্দশা, অভাব-অভিযোগেরই যদি নাটক বাহন হয়, তাহা হইলে জীবনেব কোন গভীর বিষয়ের পরিবর্তে কেবলমাত্র উপরি স্তরেই ইহার দৃষ্টি সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িতে বাধ্য হয়। কঠিন সত্যের সম্মুখীন হইয়া বাঙ্গালীব জীবন হইতে ভাব কিংবা কল্পনা-বিলাসিতা দূর হইয়াছে সত্য, কিন্তু রূঢ় বাস্তবকে নাটকে রূপায়িত করিতে হইলেও নাটকের বিশিষ্ট আঙ্গিক অনুসরণ না করিলে ইহার যথার্থ শক্তি অনুভব করা যায় না। কিন্তু আজিকার জীবনের যে সমস্যা, তাহা ব্যক্তি অপেক্ষা শ্রেণীর ; সেইজন্য নাটকেও যে বিষয় রূপায়িত হয়, তাহাও ব্যক্তিকে আশ্রয় করিতে পারে না, শ্রেণীকে আশ্রয় করিয়াই প্রকাশ পায়।

সাম্প্রতিক বাংলা নাটকে জীবনের অর্থনৈতিক দিকটি বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিতেছে। একান্ত ব্যক্তিগত দুঃখ-বেদনা লইয়া সংগ্রাম এবং জীবনেব বহির্মুখী অর্থ নৈতিক দৈন্য লইয়া সংগ্রাম এক নহে—প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে সংগ্রামশীল চরিত্রের কোন সঙ্গী নাই, নিজের দুঃখভোগের ক্ষেত্রে সে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ ; কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সে ইহার বিপরীত, এখানে তাহার সঙ্গীর অভাব নাই ; সুতরাং সে অতি সহজেই এখানে অন্যের সঙ্গে একাকার হইয়া যায় ; কিন্তু প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে ব্যক্তিচরিত্রের বৈশিষ্ট্য আনুপূর্বিক রক্ষা পাইতে কোন বাধা হয় না। এই চরিত্রই যথার্থ নাটকীয় চরিত্র বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য, কিন্তু দ্বিতীয়োক্ত শ্রেণীর চরিত্রের সেই যোগ্যতার অভাব আছে। সাম্প্রতিক নাটকের মধ্যে প্রধানতঃ যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়, তাহা বহির্মুখী বিষয়কে এইভাবে অবলম্বন করে বলিয়া ব্যক্তিস্বার্থের সঙ্গে ব্যক্তিস্বার্থের সংঘর্ষ সৃষ্টি হইবার পরিবর্তে তাহা শ্রেণীর সঙ্গে শ্রেণীর সংগ্রামে পরিণত হয়। সাম্প্রতিক বাংলা

নাটকে প্রায়শঃই যে শ্রমিক ও মালিকের সংঘর্ষের কথা শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাও ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সংঘর্ষ নহে, বরং শ্রেণীর সঙ্গে শ্রেণীর সংঘর্ষ। ইহা শ্রেণীর সঙ্গে শ্রেণীর বহির্মুখী অর্থনৈতিক সংঘর্ষ বলিয়াই, ইহার মধ্য দিয়া নীতির কথা যত স্পষ্ট হইয়া উঠে, ব্যক্তিজীবন তত স্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারে না।

কর্মে ও চিন্তায় বাংলার সমাজ আজ নোঙরছেঁড়া নৌকার মত অকূলে ভাসিতেছে—ইহার কোন লক্ষ্য নাই, তীরের কোন ঠিকানা নাই। এই অবস্থা যতদিন চলিতে থাকিবে, ততদিন পর্যন্ত বহির্মুখী সমস্যারই সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে, এ কথা সত্য। কিন্তু এই সমস্যার মধ্যেও যে ব্যক্তি-মানবটি সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়া যায় নাই, তাহা স্পষ্ট করিয়া কেহ উপলব্ধি করিতে পারিতেছে না; সেইজন্য সাম্প্রতিক নাটকের মধ্যে জীবনের কোনও সমস্যারই সমাধান এখনও খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। এমন কি, যে সমস্যাগুলিও দেখা দিয়াছে, তাহা ব্যক্তি অপেক্ষা শ্রেণীরই সমস্যা। কিন্তু ব্যক্তির একান্ত নিজস্ব সমস্যাই নাটকের সমস্যা, শ্রেণীর আশ্রিত হইয়াও যে ব্যক্তিত্ব অবিনশ্বর, তাহার উপলব্ধিতেই নাটকের সার্থকতা।

দুই

প্রত্যেক সামাজিক কিংবা সাংস্কৃতিক আন্দোলনের যেমন মুখ্য কতকগুলি কারণ থাকে, তেমনই গৌণ কতকগুলি কারণও থাকে। বাংলা নবনাট্য আন্দোলনের কতকগুলি মুখ্য কারণ সম্বন্ধে উপরের আলোচনা হইতে কতকটা আভাস পাওয়া গেলেও, ইহার যে কতকগুলি গৌণ কারণও ছিল, তাহা অস্বীকার করা যায় না। অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও তাহার ফলাফল ইহার মুখ্য উপলক্ষ্য স্বরূপ হইয়াছিল, তাহার অন্তরালে দীর্ঘ দিন ধরিয়া জাতির মনের মধ্যে যে কতকগুলি শক্তি সক্রিয় হইয়া ছিল, তাহাও পরোক্ষে থাকিয়া এই আন্দোলনকে সম্ভব করিয়া তুলিয়াছে। কারণ, মুখ্য কারণের ফল ক্ষণস্থায়ী হয়, কিন্তু দীর্ঘ কাল ধরিয়া যে সকল গৌণ কারণ সংঘটিত হইয়া একটি প্রতিক্রিয়াকে অনিবার্য করিয়া তুলে, তাহার ফল দীর্ঘস্থায়ী হয়। বাংলার নবনাট্য আন্দোলনকে একান্ত আকস্মিক উত্তেজনার ফলে সৃষ্ট একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ গণ-আন্দোলন বলিয়া মনে করা হইলে ভুল করা হইবে; একটু গভীর ভাবে চিন্তা করিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, ইহার পশ্চাতেও জাতিব একটি সুদীর্ঘ তপস্যা অলক্ষিতে শক্তি সঞ্চার করিয়াছে। সেই বিষয়গুলি এখানে আলোচনা করিয়া দেখা যাইতে পারে।

এই যুগে রচিত নাটকগুলির একটি বিষয় যে রক্ষণশীল মনোভাবকে আঘাত কবিয়াছে, তাহা এই যে, ইহাদের মধ্যে অনেক সময় বাস্তব জীবনের বহু রূঢ় সত্য নগ্ন রূপ লইয়া আত্মপ্রকাশ করে। ইহা যে সম্পূর্ণই রাষ্ট্রীয় ও সমাজ-বিবর্তনের ফল, তাহা নহে,—ইহার মধ্য দিয়া ইউরোপীয় নবনাট্য আন্দোলনের জীবনদৃষ্টির প্রভাবও অস্বীকার করা যায় না। এই বিষয়টি প্রথমেই এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। ইউরোপে বিজ্ঞানচর্চার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ সম্পর্কিত মধ্যযুগীয় সংস্কার ক্রমাগত দূর হইয়া যাইতে আরম্ভ করে। মানুষ সম্পর্কিত সকল বিষয় বৈজ্ঞানিক চর্চার অঙ্গীভূত হইবার ফলে তাহার সম্পর্কে একদিক দিয়া খুঁটিনাটি জ্ঞান যেমন বাড়িতে থাকে, তেমনই অন্যদিক দিয়া তাহারই ভিত্তিতে ইহার ব্যক্তিগত সুখদুঃখের মূল্যাঙ্কনও বিশেষ মর্যাদালাভের অধিকারী হয়। বিজ্ঞান ব্যক্তি-মানুষের

শারীর গঠন হইতে তাহার মনস্তত্ত্ব পর্যন্ত সকল বিষয়ই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করিয়া যুক্তি ও বিচারের পথে তাহার সম্পর্কিত সত্যের সন্ধান লাভ করে, তাহার নিকট মানুষ সম্পর্কিত কোন বিষয়ই উপেক্ষিত হয় না ; ক্রমে বিজ্ঞানের এই দৃষ্টি ইউরোপের শিল্পে এবং সাহিত্যেও নিজের প্রভাব বিস্তার করে। শিল্প কিংবা সাহিত্য তখন হইতেই কেবল মাত্র সুন্দর ও কল্যাণেরই পুজারী রহিল না, জীবনের রূঢ় সত্যও তাহাদের মধ্যে নগ্নরূপ লইয়া আত্মপ্রকাশ করিতে. লাগিল। মানুষের সম্পর্কিত নিতান্ত তুচ্ছ কথা যখন শিল্পে ও সাহিত্যে স্থান লাভ করিল, তখন হইতেই অভিজাত জীবনকে ভিত্তি করিয়া যে একদিন সাহিত্য সৃষ্টি হইত, তাহার উপর হইতেও ঔৎসুক্য দূর হইয়া গিয়া সাধারণ মানুষের উপরই তাহার দৃষ্টি ন্যস্ত হইতে লাগিল। ইউরোপীয় নাট্যসাহিত্যে ট্র্যাজেডি রচিত হইলে একজন 'অসাধারণ' মানুষের পতন দেখাইতে হইত, এই অসাধারণত্বের সূত্রেই অভিজাত বংশের মানুষই সেখানে অনিবার্যভাবে আসিয়া উপস্থিত হইত ; কিন্তু ক্রমে অভিজাত মানুষের তুচ্ছ জীবনকথার পরিবর্তে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন সুখদুঃখের কথা শুনিবার জন্য সমাজ কৌতূহল অনুভব করিতে লাগিল। কারণ, বৈজ্ঞানিক চিন্তার ফলে সকলেই বুঝিল যে, সুখদুঃখের অনুভূতি সকলেরই সমান— বিশেষ একই অবস্থার অধীন হইয়া অভিজাত বংশের মানুষও যাহা অনুভব করিবে, সাধারণ মানুষও তাহাই অনুভব করিবে ; সুতরাং সাধারণ পাঠক তাহাতে নিজের কথাই শুনিতে চাহিবে, ইহাতে বিস্ময়ের বিষয়ও কিছু নাই। এইভাবে সাধারণ মানুষের পতনও তখন হইতে ইউরোপীয় সাহিত্যে ট্র্যাজিডির অবলম্বন হইল। সংস্কৃত নাটকে যেমন বীর ও উদাত্ত গুণসম্পন্ন উচ্চবংশোদ্ভূত ব্যক্তিরই নায়ক হইবার রীতি ছিল, সেই রীতির কোন রকম ব্যতিক্রম সৃষ্টি হইতে পারিল না, ইউরোপীয় সাহিত্যে তাহা হইল না ; ইউরোপীয় নাট্যসাহিত্য তাহার ব্যতিক্রমকে স্বীকার করিয়া লইল। তথাপি রক্ষণশীল দল সনাতন পথ অনুসরণ করিয়া চলিতে লাগিল। কিন্তু যুগোপযোগী পরিবর্তনকে যে স্বীকার করে না, তাহার যে পরিণাম অনিবার্য, ইহার বেলায়ও তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হইল না। প্রাচীন ধারায় রচিত নাটক ক্রমে পঙ্ককুণ্ডের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ হইয়া রহিল, নূতন ধারা স্বচ্ছ প্রবাহে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইয়া চলিল।

ইউরোপীয় সাহিত্যে নূতন ধারার প্রথম নাট্যকার ইব্‌সেন। তাঁহাকেই

ইউরোপীয় সাহিত্যে নবনাট্য আন্দোলনের জনক বলা যাইতে পারে। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার 'গোস্টস্' (*Ghosts*) নামক নাটক প্রকাশিত হয়, তাহা দ্বারা সমগ্র ইউরোপীয় সাহিত্যচিন্তার রাজ্যে এক আলোড়ন দেখা দেয়। চিরাচরিত প্রথায় এই নাটক রচিত হয় নাই বলিয়াই ইহাকে বিদগ্ধ মন উপেক্ষা করিতে পারিল না ; কারণ, নাটক কিংবা সাহিত্য মাত্রেরই যাহা লক্ষ্য, অর্থাৎ জীবন-রস-পরিবেশন—তাহা ইহার মধ্যে পূর্ণাঙ্গ সার্থকতা লাভ করিয়াছিল। এই জীবন নিতান্ত পরিচিত জীবন, সত্যভাষণের দুঃসাহসিকতা এই জাতির ছিল না বলিয়া এতদিন তাহা কেবলমাত্র গোপন করিয়াই আসিয়াছে। সৌন্দর্য ও কল্যাণের নামে সাহিত্যে এতদিন যে সত্য কত খণ্ডিত হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে, এই নাটকের মধ্য দিয়া তাহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। এ'পর্যন্ত ইউরোপীয় সাহিত্যের খ্যাতনামা নাট্যকারগণ কাব্যের ভাষাতেই নাটক রচনা করিয়া আসিয়াছেন, ক্রমে সেই ভাষার একটি নিরেট আদর্শ স্থির হইয়া গিয়াছিল। একটি নির্জীব আদর্শ শতাব্দীর পর শতাব্দী অনুসরণ করিয়া আসিবার ফলে নাটকের ভাষা নূতন নূতন যুগে উত্তীর্ণ হইয়া প্রত্যক্ষ জীবনের সংস্পর্শ হইতে দূরবর্তী হইয়া পড়িয়াছিল ; কিন্তু ইব্‌সেন 'গোস্টস্' নাটকে বিষয়-বস্তু ও জীবনদৃষ্টির নূতনত্বের সঙ্গে সঙ্গে নূতন ভাষাও ব্যবহার করিলেন, পাঠক ও দর্শক নাটকীয় চরিত্রের মুখে এতদিন পরে নিজের ভাষা শুনিতে পাইয়া পুলকিত হইয়া উঠিল। সাধারণ দশজনের সমাজের চারিদিকে সহজভাবে তাকাইয়া দেখিলে প্রত্যহ যাহা দেখা যায়, তাহাই 'গোস্টস্' নাটকে নাট্যকার বর্ণনা করিয়াছেন। জীবনে যে সত্য আমরা জানিয়া এবং স্বীকার করিয়াও কেবলমাত্র নীতি ও সমাজ-কল্যাণের দোহাই দিয়া অস্বীকার করিয়া থাকি, এই নাটকে তাহাই নির্ভীক ভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে। বিষয়টি সাধারণ, কেবলমাত্র জীবনদৃষ্টির গুণেই তাহা অসাধারণ হইয়া উঠিয়াছে। ইহা কেবলমাত্র ইউরোপীয় চিন্তাধারায় নহে, ইউরোপীয় চিন্তাধারার সঙ্গে যে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজ শতাধিক বৎসর ধরিয়া যোগ রক্ষা করিয়া চলিতেছিল, তাহার উপরও সুগভীর প্রভাব বিস্তার করিল। কিন্তু উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের বাঙ্গালী সমাজের উপর নীতি ও আদর্শবাদের প্রভাব এত বেশি ছিল যে, তাহা অতিক্রম করিয়া বাংলা সাহিত্যে ইহার সর্বাঙ্গীণ স্বীকৃতি কিছুতেই সম্ভব হইয়া উঠিতে পারে নাই। ইব্‌সেনের 'গোস্ট্‌স্' নাটকের

মধ্যে যে পরিবারকে ভিত্তি করা হইয়াছে, তাহা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, অভিজাত শ্রেণীর মাত্র এক সোপান নিম্নে অবস্থিত। ইহার ভিতর দিয়া গতানুগতিকতার শৃঙ্খল হইতে মুক্তির প্রথম প্রয়াস দেখা গেলেও সমাজের সর্বনিম্নস্তর তখন পর্যন্ত ইউরোপীয় নাট্যসাহিত্যের আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতে পারে নাই। তথাপি 'গোস্ট্স্' নাটক সর্বত্র যে ভাবে আন্তরিক অভিনন্দন লাভ করিল, তাহাতে বুঝিতে পারা গেল যে, মধ্যযুগের রক্ষণশীলতা হইতে সর্বাত্মক মুক্তির জন্য জাতির প্রাণ কতদূর অধীর হইয়া উঠিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপে মধ্যবিত্ত সমাজ নাট্যসাহিত্যের লক্ষ্য হইয়া থাকিলেও বিংশ শতাব্দীতে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গেই রুশ সাহিত্যে গোর্কি সমাজের নিম্নতম শ্রেণীর দিকে তাঁহার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন এবং সেখান হইতেই তাঁহার 'লোয়ার ডেপ্থ্স্-'এর উপাদান সংগ্রহ করিলেন। নিতান্ত সাধারণ বস্তীজীবনের দুঃখ দারিদ্র্য অসচ্ছলতার মধ্যে যাহাদের বৈচিত্র্যহীন জীবন কাটিয়া যায়, তাহাদেরও জীবনের অনুভূতিগুলি যে কত গভীর, তাহা ইহার মধ্যে সুগভীর সহানুভূতির সঙ্গে প্রকাশ করা হইয়াছে। অভিজাত শ্রেণীর অসাধারণ চরিত্র লইয়া সেক্সপীয়রের নাটক রচিত হইয়াছে, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সাধারণ মানুষের চিত্র লইয়া ইব্‌সেনের নাটক রচিত হইয়াছে, অতি-সাধারণ চরিত্রের নিতান্ত তুচ্ছ জীবন-কথা লইয়া গোর্কির নাটক রচিত হইয়াছে। অতি-সাধারণ জীবনের সুগভীর অনুভূতির ক্ষেত্রে যে অসাধারণত্ব আছে, গোর্কি তাহাই চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিলেন; বহুদিনের একটি ভ্রান্ত রস-সংস্কারের মধ্যে এইভাবে আসিয়া প্রথম আঘাত লাগিল। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে ইব্‌সেন এবং গোর্কির চিন্তাধারা শিক্ষিত তরুণ বাঙ্গালী সম্প্রদায়কে সেদিন যে ভাবে স্পর্শ করিয়াছিল, অন্য কাহারও চিন্তাধারা সেভাবে ইহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই; তথাপি একথা সত্য, ইউরোপের দুইটি প্রান্ত হইতে এই চিন্তাধারা বিকাশ লাভ করিয়া ক্রমে সমগ্র ইংরেজি ভাষাভাষী অঞ্চলে যখন বিস্তার লাভ করিয়াছিল, তখন প্রত্যেক দেশেই ইহাদের প্রভাব-জাত যে সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাদের সঙ্গে বাঙ্গালী শিক্ষিত মন যোগ স্থাপন করিয়াছিল এবং পরোক্ষভাবে তাহাদেরও প্রভাব এদেশের সাহিত্যের মধ্যে কার্যকর হইতেছিল।

মার্কিন দেশের কোন কোন নাট্যকার সে দেশের আদিবাসীর জীবন ভিত্তি করিয়া নাটক রচনা করিলেন। কেবলমাত্র সমাজের নিম্নতম স্তর বলিয়া

নহে, আদিবাসীর সমাজ-জীবনের যে বিশেষত্ব ছিল, তাহা সুগভীর অভিনিবেশের সঙ্গে লক্ষ্য করিয়া তাহার রস ও রহস্য উদ্ধার করিয়া ইউজিন ও'নীল তাঁহার 'ডিজায়ার আণ্ডার দি এল্‌ম্‌স' নাটক রচনা করিলেন। তথাকথিত সভ্য সমাজের নীতিবোধ দ্বারা আদিম সমাজের জীবন নিয়ন্ত্রিত হয় না, জীবনের যে সত্য উচ্চতর সমাজে অনেক সময় নীতি ও সৌন্দর্যবোধের নামে প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকে, তাহা আদিম সমাজে নগ্ন রূপ লইয়া প্রকাশ পায়। ও'নীল তাঁহার রচনাকে উচ্চতর সমাজের নীতিবোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিয়া না লইয়া ইহার প্রত্যক্ষ বাস্তব পরিচয়টি প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে রক্ষণশীলমনোভাব-জাত নীতিবোধ আহত হইলেও আদিম সমাজ-জীবনের যে বাস্তবপরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে, নাট্যসাহিত্যে তাহা অভিনব ছিল বলিয়াই জনসাধারণের অভিনন্দন লাভ করিয়াছিল। এই সকল বিষয় এত বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করিবার উদ্দেশ্য এই যে, বাংলার নবনাট্য আন্দোলনের জীবনদৃষ্টি কেবলমাত্র যে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক পরিবর্তনের জন্য আসে নাই, বরং তাহার সঙ্গে যে পাশ্চাত্ত্য চিন্তাধারার সঙ্গে বাঙ্গালী যোগ রক্ষা করিয়া চলিয়াছিল, তাহারও ক্রমবিকাশের একটি ধারা তাহার সঙ্গে আসিয়া যুক্ত হইয়াছিল, তাহাই এই আলোচনা হইতে স্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারে। ইউরোপীয় নাট্যসাহিত্যের এই জীবনদৃষ্টি কি ভাবে বাঙ্গালী নাট্যকারদিগের মধ্যেও সঞ্চারিত হইয়া বাংলার সমাজ হইতেও নূতন নূতন জীবনোপকরণ সন্ধানের কার্যে সহায়তা করিয়াছে, তাহাই এখানে বক্তব্য বিষয়। পাশ্চাত্ত্য এই চিন্তার ধারা বাংলা নাট্যসাহিত্যের ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করিবার পূর্বে কথাসাহিত্যের ভিতর দিয়া কয়েকজন শক্তিশালী লেখকের হাতে তাহা নিপুণ ভাবে প্রকাশ পাইল। তাহাই বাংলায় 'কল্লোল যুগে'র সাহিত্য বলিয়া পরিচিত। কিন্তু 'কল্লোল-যুগে'র সাহিত্য সৃষ্টির পূর্বেও বিচ্ছিন্নভাবে কয়েকজন নাট্যকার সমাজের সাধারণ মধ্যবিত্ত এবং কোন কোন ক্ষেত্রে নিম্নতম স্তর হইতেও জীবনের উপকরণ সংগ্রহ করিয়া তাহারই সুখদুঃখের ভিত্তিতে নাটক রচনা করিয়াছিলেন। বাংলা সাহিত্যের উপর পাশ্চাত্ত্য চিন্তাধারার প্রভাবের কথা উপরে যাহা উল্লেখ করিলাম, তাহার সঙ্গে ইহাদের কোন যোগ ছিল না; ইহারা সমসাময়িক সামাজিক অব্যবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই নাটক রচনা করিয়াছিলেন। তথাপি বাংলা নাট্যসাহিত্যের জন্মকাল হইতেই সাধারণ ও নিম্নস্তরের জীবনও যে ইহার উপজীব্য হইয়াছিল, তাহাই ইহাদের ভিতর

দিয়া প্রত্যক্ষ করা যাইতে পারে। বাংলার সর্বপ্রথম সামাজিক নাটক 'কুলীন কুল-সর্বস্ব' সাধারণ মধ্যবিত্ত-জীবনভিত্তিক এক দুঃসাহসিক রচনা। ইহার রচয়িতা পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন না, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও অসহায় মানবতার প্রতি নিতান্ত আন্তরিক সহানুভূতির বশবর্তী হইয়া তিনি সে দিন সাধারণ মধ্যবিত্ত সমাজের বিশেষ একটি অংশের এই করুণ চিত্রটি প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার কথা পূর্বে যথাস্থানে বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছি। তাঁহারই পথ অনুসরণ করিয়া মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলার নাগরিক সমাজের মধ্যবিত্ত-জীবনভিত্তিক দুইখানি নাট্যরচনা প্রকাশ করেন, একখানি 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' আর একখানির নাম 'একেই কি বলে সভ্যতা।' 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' নাটকে অবশ্য চাষী চরিত্রও আছে। বলা বাহুল্য যে, তখনও ইউরোপীয় সাহিত্যে নবনাট্য আন্দোলনের জন্মই হয় নাই। মাইকেল মধুসূদন দত্তের উক্ত দুইখানি নাটক রচনার প্রায় বিশ বৎসর পর ইব্‌সেনের 'গোস্ট্‌স্' নাটক রচিত হয়। বাংলা সাহিত্যে তখনও প্রত্যক্ষভাবে এই সকল ইউরোপীয় নাটকের প্রভাব বিস্তার লাভ না করিলেও, ঊনবিংশ শতাব্দী হইতেই বাঙ্গালীর সাহিত্য-চিন্তায় যে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের প্রভাব সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার ভিতর হইতেই সেদিন এদেশের এই সমাজ নূতন জীবন-বোধে দীক্ষা লাভ করিয়াছিল। বিশেষতঃ বাঙ্গালী জাতির নিজস্ব ধর্মচিন্তায়ও দুর্গত মানবের প্রতি সহানুভূতি-বোধের একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল। মধ্য যুগের বাংলা দেশের অন্তর হইতে যে ধর্মের বিকাশ হইয়াছিল, সেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম সর্বসংস্কারমুক্ত মানব প্রেমেরই জয়গান গাহিয়াছে। সুতরাং ইহা এই জাতিরই একটি বৈশিষ্ট্য ছিল।

যাহা হউক, মধুসূদন দত্ত পর্যন্ত বাংলার সমাজের মধ্যবিত্ত-জীবন ভিত্তি করিয়াই নাটক রচিত হইলেও, তাহারই সামান্য কয়েকদিন ব্যবধানে আর একজন নাট্যকারের আবির্ভাব হইয়াছিল, তিনিই সর্বপ্রথম নিম্নতম সমাজের সুখদুঃখ আশানৈরাশ্য ভিত্তি করিয়া একখানি বাস্তবধর্মী নাটক রচনা করিলেন, তিনি দীনবন্ধু মিত্র। তাঁহারই প্রথম নাট্য-রচনা 'নীল-দর্পণ' এক দুর্ধর্ষ অত্যাচারী শক্তির বিরুদ্ধে অসহায় বাঙ্গালী কৃষকের আর্তনাদ ভিত্তি করিয়া রচিত হইয়াছে। ইহা ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। যথাস্থানে ইহার সম্পর্কেও বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। দীনবন্ধুর পর হইতেই বাংলা নাট্যসাহিত্য আধ্যাত্মিক ও দেশাত্মবোধের আদর্শ অনুসরণ করিয়া

কি ভাবে উদ্দাম গতিতে প্রায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রারম্ভকাল পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে, তাহার ইতিহাস পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে বর্ণিত হইয়াছে। দীনবন্ধুর 'নীল-দর্পণ' নাটক দিয়া এ যুগের নবনাট্য আন্দোলনের যাত্রা শুরু না হইলেও, কিছুদিনের মধ্যেই নবনাট্য-আন্দোলনকারিগণ 'নীল-দর্পণ'কে পুনরুজ্জীবিত করিয়া আন্দোলনের ভিত্তিকে দৃঢ় করেন। ইহার মধ্যে যে জীবনদৃষ্টির বিকাশ দেখা যায়, তাহা নবনাট্য আন্দোলনের মধ্যে যে জীবনদৃষ্টির সন্ধান পাওয়া যায়, তাহারই অনেকটা অনুকূল। আঙ্গিকের দিক দিয়া সম্পূর্ণ না হইলেও জীবনদৃষ্টির দিক দিয়া একশত বৎসরের পূর্ববর্তী একখানি বাংলা নাটককে আধুনিকতম যুগের বাংলার নবনাট্য আন্দোলনের পুরোভাগে স্থাপন করা হইয়াছে। সেইজন্যই বলিতেছিলাম, বাঙ্গালী জাতির রস ও দর্শন সংস্কারের মধ্যে নবনাট্য আন্দোলনের বীজ নিহিত ছিল।

যাহা হউক, পূর্বে বলিয়াছি, 'কল্লোল যুগে'র বাংলা কথাসাহিত্যের ভিতর দিয়াই সর্বপ্রথম ইউরোপের আধুনিকতম জীবনদৃষ্টির বিকাশ দেখা দিয়াছিল, নাট্যসাহিত্যের ভিতর দিয়া তাহা দেখা দিতে পারে নাই। ইহার কারণ, বাংলা নাটক বাংলা কথাসাহিত্য হইতে অধিকতর রক্ষণশীল। কথা-সাহিত্যে যখন 'কল্লোল-যুগে'র আবির্ভাব দেখা দিয়াছিল, তখনও বাংলা নাট্যসাহিত্য উনবিংশ শতাব্দীর পর্যুষিত আদর্শ অনুসরণ করিয়া ধীর মন্থর গতিতে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছিল। ইহার প্রধান কারণ, বাংলা নাটক তখন একান্ত মঞ্চাশ্রয়ী ছিল; রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষগণ চিরাচরিত প্রথার কোন প্রকার পরিবর্তন সাধনে উৎসাহী ছিলেন না; সেইজন্য নূতন জীবন-চেতনা অনুযায়ী নাটক রচনায় কেহই উৎসাহ অনুভব করিতেন না। পূর্বেই বলিয়াছি, যতদিন বাংলা নাটক একান্ত ব্যবসায়ী-মঞ্চ-নির্ভর ছিল, ততদিন তাহার মধ্যে নূতন প্রাণের স্পন্দন অনুভব করা সম্ভব হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের নাটক বাদ দিলে নবনাট্য আন্দোলনের যুগেই বাংলা নাটক সর্বপ্রথম ব্যবসায়ী-রঙ্গমঞ্চের শাসন হইতে পরিত্রাণ পাইল, তাহার ফলেই ইহার মধ্যে নূতন প্রাণ-স্পন্দন সম্ভব হইল। সুতরাং একথা অত্যন্ত কঠিন অথচ সত্য যে, যে ব্যবসায়ী রঙ্গমঞ্চ একদিন বাংলা নাটক রচনায় উৎসাহ দিয়াছিল, তাহাই কালক্রমে কেবলমাত্র ব্যবসায়গত স্বার্থরক্ষার জন্যই ইহার ক্রমবিকাশের পথ রুদ্ধ করিয়া দিল; কিন্তু বাংলা কথাসাহিত্য রচনায় এই প্রকার কাহারও কোন অধীনতার

কথা ছিল না। কথাসাহিত্য স্বতঃস্ফূর্ত এবং স্বাধীন ক্রমবিকাশের ধারা অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইতে সক্ষম হইয়াছিল বলিয়া ইহার মধ্যে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব যত স্বীকৃত হইয়াছে, নাট্যসাহিত্যের সেই সুযোগ ছিল না বলিয়া তাহার পক্ষে তাহা সম্ভব হইয়া উঠে নাই। কিন্তু জাতির মনের মধ্যে নাট্য রচনার ক্ষেত্রেও যে নূতন প্রেরণা আসিয়াছিল, তাহাকেও রূপ দিবার জন্য জাতির রসমানস ক্রমেই ব্যাকুলতা অনুভব করিতেছিল; তাহারই প্রেরণায় বাংলার নবনাট্য আন্দোলন শক্তিশালী হইয়াছে। ক্রমে কথা ও কাব্য-সাহিত্যের পথ ধরিয়া নূতন বাংলা নাটকও রচিত হইতে লাগিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে বাংলার সমাজ ও অর্থনৈতিক জীবনে যে আমূল বিপর্যয় দেখা দিল, ইহাই তাহার মুখ্য অবলম্বন হইয়া উঠিল মাত্র। এই সম্পর্কে কেহ কেহ মনে করিয়া থাকেন, আধুনিকতম ইউরোপীয় একটি বিশিষ্ট সমাজ-চিন্তাই এই আন্দোলনের ভিত্তি। কিন্তু তাহা সত্য নহে। এই আন্দোলনের একজন বিশিষ্ট কর্মী ও নাট্যকার লিখিয়াছেন, 'নবনাট্য আন্দোলনের জন্য যাঁরা নাটক লিখেছেন, তাঁদের সবাই যে মার্ক্সীয় রাজনৈতিক মত ও পথে বিশ্বাসী এমন নয়। নিছক মানবতার বোধ থেকে যুগের প্রভাবেও কেউ কেউ নাট্যসাহিত্যের এই নূতন পথে পদক্ষেপ করেছেন। গোড়ার দিকে উপজীব্যের এই ক্ষেত্রান্তর ছিল অভিনব, এখন অভিনবত্বের পর্ব শেষ হয়ে এ' একটা method বা রীতিতে পরিণত হয়েছে। মোট কথা বাংলা দেশের অধিকাংশ নাট্যকারই আজ নাটক লেখার সময় এই রীতিতে চিন্তা করে থাকেন—যদিও রূপকর্ম ও আঙ্গিকে সবাই এক পথের পথিক ন'ন। সুতরাং বলা যায়, নবনাট্য আন্দোলন তার একটা নিজস্ব ট্র্যাডিশনও সৃষ্টি করতে পেরেছে।'

তিন

যাহা হউক, পুর্বের আলোচনা হইতে এ কথা বুঝিতে পারা যাইবে যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাঙ্গালীর সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং মানসিক জগতে প্রচণ্ডতম বিপর্যয় আনিয়া দিল। পঞ্চাশের মন্বন্তর পঞ্চাশ লক্ষ নরনারীর বলি গ্রহণ করিল, কালো বাজারের তামসরন্ধ্র বহিয়া নির্লজ্জ নিষ্ঠুর লোভের বীভৎস বন্যা বহিয়া চলিল, পুর্ব বঙ্গের সীমান্তে জাপানী আক্রমণের প্রেতচ্ছায়া নামিল। উন্মত্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ অগস্ট্ আন্দোলনকে বর্বরতম অত্যাচারে স্তব্ধ করিতে চাহিল। ফসলহীন প্রান্তরে বিকীর্ণ হইয়া রহিল বাঙ্গালী কৃষকের কঙ্কাল, বাংলার কুলবধূ অন্নাভাবে দেহপণ্যের পসরা সাজাইল, কলিকাতার নিষ্প্রদীপ রাত্রি পাপ ও অন্যায়ের উপর অন্ধকারের অবগুণ্ঠন মেলিয়া রাখিল। আর মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী বাঙ্গালী ক্রোধ, গ্লানি এবং অপমানের দুঃসহ জ্বালায় জ্বলিতে লাগিল। বাংলা কথাসাহিত্যে এই অন্তর্যন্ত্রণা বিম্বিত হইল—বাংলা নাটকও যুগের দাবিকে আর অস্বীকার করিতে পারিল না।

পুর্বের আলোচনায় আমরা বার বাব দেখিয়াছি, বাংলা নাটকের ঐতিহ্য একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রমোদপ্রবাহ মাত্র নয়। বাস্তবের মৃত্তিকা হইতে প্রাণরস আহরণ করিয়া যুগচেতনার আলোকে তাহা বারে বারে সূর্যমুখীর মত দল বিকীর্ণ করিয়াছে। প্রথম বস্তুতান্ত্রিক বাংলা নাটক 'কুলীন কুল-সর্বস্ব' তৎকালীন কৌলীন্য প্রথার বিরুদ্ধে আঘাত হানিয়াছে, তীব্র সমাজ-সমালোচনা করিযাছে মাইকেলের দুইখানি উৎকৃষ্ট প্রহসন, উপেন্দ্রনাথ দাসের 'শরৎ-সরোজিনী' সবলে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, দীনবন্ধুর 'নীল-দর্পণ' শোষণ-পীড়িত জনগণের রুদ্রকণ্ঠ প্রতিবাদ হইয়া দেখা দিয়াছে, ভক্তিবিহ্বল গিরিশচন্দ্রের নাটকে স্বাধীনতার অগ্নি জ্বলিয়াছে ('সিরাজউদ্দৌল্লা' 'মীরকাসেম'), ক্ষীরোদপ্রসাদ 'প্রতাপাদিত্য' লিখিয়াছেন, দ্বিজেন্দ্রলালের প্রধানাংশ নাটকে দেশপ্রেমই কেন্দ্রীয় বক্তব্য হইয়া দেখা দিয়াছে।

কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সর্বাত্মক বিপর্যয় পুর্ণতর বাস্তবতা এবং সমকালীন সমস্যা-সংঘাতের প্রত্যক্ষতর অভিব্যক্তি দাবি করিল। ব্যবসায়ী রঙ্গমঞ্চের

সমস্ত পূর্ব সংস্কারকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া, স্টান্ট্‌ধর্মী নাটকীয়তাকে সম্পূর্ণ পরিহার করিয়া জীবনকে নগ্ন নিরাবরণ রূপে উপস্থাপিত করিবার প্রেরণায় সৌখীন তরুণ নট ও নাট্যসম্প্রদায় অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিলেন। ইহার সহিত মিলিল রাজনৈতিক চেতনা—গণ-আন্দোলনের ঐতিহাসিক উপলব্ধি। শ্রমিক ও কৃষকের অধিনায়কত্বে ভবিষ্যৎ পৃথিবীর ইতিবৃত্ত রচিত হইবে, পুঁজিবাদ ও ঔপনিবেশিক শোষণবাদের হাত হইতে মুক্ত হইয়া বিশ্বব্যাপী এক স্বাধীন সর্বশৃঙ্খলমুক্ত মানবতার প্রতিষ্ঠা হইবে—সমগ্র দুঃখ ও দুর্গতির মধ্যেও এই আশার আলোক তরুণ নাট্যামোদীদের দৃষ্টিকে অনুরঞ্জিত করিয়া তুলিল।

ব্যবসায়ী রঙ্গমঞ্চও এই নবপ্রেরণায় সঞ্জীবিত হইয়া উঠিতে পারিত—তাহাই স্বাভাবিকও ছিল। কিন্তু মঞ্চ প্রযোজকেরা পিছাইয়া রহিলেন দুইটি কারণে। প্রথমতঃ বাস্তবতামুখ্য কোনো দুঃসাহসিক নাট্যপ্রয়াসকে মঞ্চস্থ করিবার মত কল্পনাশক্তি তাঁহাদের ছিল না এবং তাহার অর্থকরী সাফল্য সম্পর্কেও তাঁহারা নিশ্চিত হইতে পারেন নাই; দ্বিতীয়তঃ রাজরোষের আশঙ্কাও তাঁহারা করিতেন। অপ্রিয় সত্যের খাতিরে বলিতেই হইবে, লক্ষ্ণৌতে অস্ত্রধারী গোরা সৈন্যের আক্রমণের মুখেও যে বাঙ্গালী নটেরা নির্ভয়ে 'নীল-দর্পণ' মঞ্চস্থ করিয়াছিলেন, সেই গৌরবের উত্তরাধিকার তাঁহারা রক্ষা করিতে পারেন নাই। বরং নানাভাবে তাঁহারা বহুদিন পর্যন্ত নব-নাট্য আন্দোলনের বিরোধিতা করিয়াই আসিয়াছেন। আজ পর্যন্তও তাঁহারা ব্যবসায়ী গতানুগতিকা হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই—একথাও লক্ষ্য করা প্রয়োজন।

ব্যবসায়ী মঞ্চ পিছাইয়া রহিল বটে, কিন্তু ব্যাপক গণ আন্দোলনের পুরোভাগে নবনাট্য আন্দোলন তাহার যথাযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করিল। পথনির্দেশকরূপে উপস্থিত হইল 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ', ১৯৪৪ সালে তাঁহাদের 'নবান্ন' লইয়া। নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য মন্বন্তরের পটভূমিকায় গ্রাম্য কৃষক প্রধান সমাদ্দারের দুঃখ-বেদনা সংগ্রাম-স্বপ্নের যে চিত্রটি ফুটাইয়া তুলিলেন—এক কথায় তাহাকে বৈপ্লবিক বলা যাইতে পারে। নূতন বক্তব্য, নূতন পদ্ধতি ও নির্ভীক বাস্তবতায় রচিত এই নাটকটিকে প্রাণের দীপ্তিতে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিল তরুণ অব্যবসায়ী নটনটীদের অভিনয়। 'নবান্নে'র অভিনয় সমস্ত দেশের সম্মুখে এক নূতন আদর্শের সন্ধান দিল।

বস্তুতঃ দীনবন্ধু মিত্রের 'নীল-দর্পণে'র পর দেশের নিরন্ন কৃষক সমাজের

স্বপ্ন-সংগ্রামকে অবলম্বন করিয়া 'নবান্নে'র মত নাটক আর দ্বিতীয়টি রচিত হয় নাই। ইহার গুণাগুণ আমরা পরে আলোচনা করিব।

'নবান্ন' হইতে যে ধারা মুক্ত হইল, তাহা আর রুদ্ধ হইল না। বাংলা দেশের জেলায় জেলায় 'গণনাট্য সংঘে'র শাখা স্থাপিত হইল, সর্বত্র স্থানীয় প্রতিভা আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল। শ্রমিক-কৃষকের জীবন লইয়া, সমকালীন সমস্যা ও মধ্যবিত্তের দায়িত্ব নির্ণয় করিয়া, গণ আন্দোলনের আদর্শকে পুরোভাগে রক্ষা করিয়া নূতন নূতন নাটকের ও নাট্যকারের অভ্যুদয় ঘটিতে লাগিল। ইংরেজ সরকার কোন কোন নাটকের কণ্ঠরোধ করিল—কিন্তু আন্দোলন থামিল না।

রাজনৈতিক এবং অন্যান্য কারণে 'গণনাট্য সংঘে'র মধ্যে নানা ভাঙ্গাগড়া চলিল, কিন্তু তাঁহাদের প্রদর্শিত পথে আর যাত্রীর অভাব ঘটিল না। 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘে'র নির্দেশ অগণিত নব নব নাট্যসংস্থার মধ্য দিয়া সামগ্রিকভাবে বিকশিত হইয়া উঠিল। বর্তমান বাংলা দেশের অব্যবসায়ী প্রগতিশীল নাট্য-প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে আমরা তাহারই পরিপূর্ণ রূপ দেখিতে পাইতেছি।

নবনাট্য আন্দোলনের কয়েকটি বিশেষ উপস্থাপ্য বিষয় ছিল। বাহুল্য হইলেও পাঠকদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া প্রয়োজন যে, 'শিল্পের জন্য শিল্প'কে এই আন্দোলনের কর্মীরা কোনদিন মানিয়া লন নাই। 'জীবনের জন্য শিল্প'—ইহাই ছিল তাঁহাদের বক্তব্য। এই জীবনকে কিরূপে পরাজয়ের পঙ্ক হইতে মুক্ত করিয়া একটি সুস্থ সমাজবাদী অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে সমুত্তীর্ণ করানো যাইতে পারে, তাঁহারা সেইটিকেই তাঁহাদের ধ্রুব লক্ষ্যে পরিণত করিয়াছিলেন।

এই কারণেই তাঁহাদের নাট্যচেষ্টাগুলির মধ্যে কয়েকটি লক্ষণ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। আমরা মোটামুটি এইভাবে সেইগুলিকে নির্দেশ করিতে পারি:

(ক) নাটকে শ্রমিক-কৃষকের উপেক্ষিত ব্রাত্য জীবনকে উজ্জ্বল মহিমায় জাগাইয়া তুলিতে হইবে; তাহারাই আগামী ইতিহাসের অধিনায়ক—এই কথা স্মরণে রাখিয়া তাহাদের সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের দাবিকে পরিস্ফুট করিতে হইবে এবং জমিদার-মহাজন-কালোবাজারী ও দুর্নীতিগ্রস্ত আমলাতন্ত্র কি ভাবে তাহাদের উপর শোষণ ও নির্যাতন করে তাহাও উদ্‌ঘাটিত করিতে হইবে।

(খ) ইহারই সিদ্ধান্তরূপে গণসংগ্রামের শক্তিকে তুলিয়া ধরিতে হইবে।

(গ) এই সময় বাংলা দেশে লীগ-কংগ্রেসের বিরোধের ফলে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল—লজ্জাকর আত্মকলহ প্রতিদিনই কদর্যতর হইয়া উঠিতেছিল। সুতরাং, নাটকের মধ্য দিয়া হিন্দু-মুস্‌লিম ঐক্যের বাণী প্রচার করিতে হইবে এবং জনগণকে বুঝাইতে হইবে সাম্প্রদায়িক ঐক্যের বজ্রকঠিন বন্ধনের দ্বারাই দেশের স্বাধীনতা আনিতে হইবে ও গণসংগ্রামকে সফল করিতে হইবে।

(ঘ) মার্ক্সবাদের সূত্র অনুযায়ী মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে শূন্য-নির্ভর ত্রিশঙ্কু বলা যাইতে পারে। এই ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে অবক্ষয়ী মধ্যবিত্তের স্ববিরোধী বিভ্রান্ত ভূমিকাটি স্পষ্ট করিয়া তুলিতে হইবে এবং তাহাদেব একথা হৃদয়ঙ্গম করাইতে হইবে যে, বাঁচিতে হইলে আজ তাহাদেব শ্রমিক-কৃষাণেবই সংগ্রামের অংশীদার হইতে হইবে—পুঁজিবাদী ও শোষকশ্রেণীর কৃপানির্ভর হইলে চলিবে না। মধ্যবিত্ত সমাজেব ভাঙ্গনের রূপটিও নির্ভয়ে তুলিয়া ধরিতে হইবে।

(চ) জাপানী ফ্যাসিজ্‌ম্ ভারতবর্ষেব—বিশেষতঃ বাংলা দেশের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হইয়াছে। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ তাহাকে রোধ করিতে পারিতেছে না। এই ফ্যাসিস্তরা যাহাতে দেশের মৃত্তিকায় পদক্ষেপ করিতে না পারে, তাহার জন্য গ্রামে গ্রামে প্রতিরোধ বাহিনী গডিবার প্রেরণা যোগাইতে হইবে—প্রয়োজন হইলে ঘরের মেয়েরাও তাহাতে অংশগ্রহণ করিবেন।

সংক্ষেপে নবনাট্য আন্দোলনের প্রাথমিক পর্বে এইগুলিই ছিল মুখ্য বক্তব্য।

বক্তব্যের সহিত প্রয়োগ ব্যাপারেও নবতর পদ্ধতি অবলম্বিত হইল। জনসাধারণের সম্মুখে, শ্রমিক-কৃষাণের সমাবেশে যে নাটক অভিনয় করা হইবে, তাহার জন্য বিচিত্র দৃশ্যপট, সাজসজ্জা কিংবা বর্ণাঢ্য আলোক-সম্পাতের আয়োজন সম্ভব নয়। এই আন্দোলনেব কর্মীরা সেইজন্য রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টান্ত স্মরণে রাখিয়া কালোপর্দার সাহায্যে অথবা প্রতীকরূপে একটি গাছের ডাল কিংবা খড়ের চালাকে পশ্চাৎপটে রাখিয়া অভিনয়ের ব্যবস্থা করিলেন। বক্তব্যের শক্তি এবং আন্তরিকতাপূর্ণ বলিষ্ঠ অভিনয়ের দ্বারাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য সাধিত হইত—লক্ষ লক্ষ মানুষ অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিতেন, মঞ্চগত দৈন্য তাঁহারা লক্ষ্যও করিতেন না।

ইহার পরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার রক্তসমুদ্র মন্থন করিয়া স্বাধীনতা আসিল। কিন্তু এই স্বাধীনতার স্বাদ বাঙ্গালী সম্পূর্ণ গ্রহণ করিতে পারিল না। বঙ্গব্যবচ্ছেদ এবং উদ্বাস্তু-সমস্যার বেদনা তাহার বুকে পাষাণ ভার হইয়া চাপিয়া বসিল।

গণনাট্য সংঘের শিল্পসৃষ্টিরও মোড় ঘুরিল। নাটক, সঙ্গীত ও নৃত্য বহু-বিচিত্র মুখে আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল। গণসংগ্রাম, মধ্যবিত্ত সমস্যা প্রভৃতি ত রহিলই, তাহার সহিত আসিল ঐতিহ্যচর্চা। দীনবন্ধুর 'নীল-দর্পণ' নূতনভাবে সাজাইয়া মঞ্চস্থ করা হইল, মধুসূদনের প্রহসন দুইটি পুনর্জীবিত হইল, বিস্মৃতিলুপ্ত 'চা-কর দর্পণ' নবজন্ম লাভ করিল। নাটকের গণ্ডী কেবল স্বদেশের সীমানাতেই নিবদ্ধ রহিল না, সেক্সপীয়ারের নাটককে বাংলা ভাষায় মঞ্চস্থ করা হইল, গোর্কী-চেকভ-ইব্‌সেন প্রভৃতির নাটক হইতে অনুবাদ ও ভাবানুবাদ শুরু হইল, জুলিয়াস ফুচিক এবং রোজেনবার্গ দম্পতি বাংলা নাটকের বিষয়ীভূত হইলেন। প্রত্যক্ষ জীবন সমস্যার রূপায়ণের সহিত সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক প্রশ্নও নাটকের বক্তব্যে স্থানলাভ করিল। ভিখারী হইতে আরম্ভ করিয়া ফাঁসির আসামী পর্যন্ত কেহই আর নাটকের বাহিরে রহিল না। এক কথায় নবনাট্য আন্দোলন জীবনের সর্বদিকেই নিজেকে পরিব্যাপ্ত করিয়া দিল।

আঙ্গিকে, অভিনয়েও নব নব পরীক্ষা নিরীক্ষা আরম্ভ হইল। নবপদ্ধতির যাত্রা আসিয়াও দেখা দিল। বর্তমানকালে আমরা নাট্য আন্দোলনের এই বহু. সর্বাত্মক অভিব্যক্তিই লক্ষ্য করিতেছি। অসংখ্য নাট্যকার এবং অগণ্য নাট্যপ্রতিষ্ঠান সহস্রাশ্ব রথের ন্যায় ইহাকে বহন করিয়া চলিয়াছেন। সার্থকতা ও ব্যর্থতা, ফ্যাশান ও আন্তরিকতা, নিছক পরীক্ষামূলকতা ও নবীন কর্মোদ্যম—এইগুলি সম্মিলিত ভাবে ইহাকে কোন্ পরিণামে লইয়া চলিয়াছে, ভবিষ্যৎই তাহা নির্ধারণ করিবে। তবে এ-কথা বলা যাইতে পারে, ব্যবসায়ী মঞ্চই আজ আর একমাত্র বাংলা নাটকের ভাগ্যনিয়ন্তা নয়—এই সৌখিন ও অর্ধব্যবসায়ী নাট্য-প্রতিষ্ঠানগুলির হাতেই সম্ভবত আগামী কালের নাটক ও নাট্যকলা গড়িয়া উঠিবে।

নব-নাট্য আন্দোলন : নাটক ও নাট্যকার

আধুনিক যুগে বাঙ্গালা দেশে যে নবনাট্য-আন্দোলনের সূত্রপাত হইয়াছে, বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে তাহার প্রথম অঙ্কুরোদ্গম লক্ষ্য করা যায়। ১৯৪০ হইতে '৪২ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালার রাজনৈতিক জীবনে যে ঘন ঘন পট পরিবর্তন সুরু হইয়াছিল, তাহার ফলে জাতির ভাগ্যাকাশে দারুণ বিপর্যয়ের ঘনঘটা নামিয়া আসিয়াছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বীভৎস নগ্নরূপ তখন জন-সমাজে পরিপূর্ণভাবেই প্রকাশিত। রাজতন্ত্রের নারকীয় অত্যাচারে বাঙ্গালার বুকে দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া নামিয়া আসিয়াছে। শত শত নিরন্ন প্রাণ তখন মহানগরীর ফুটপাথে পড়িয়া অসহায় ভাবে মৃত্যু বরণ করিতেছে।

শত শত কুসুমদাম এবং দীপাবলী তেজে তখন আমাদের রঙ্গশালা উজ্জ্বলিত ছিল সত্য; কিন্তু সেখানে প্রধানত ছিল রাজারাণীর জলসা, পুরাণ এবং ইতিহাসের চর্বিত চর্বণ। সামাজিক নাটক যে ছিল না, তাহা নহে; কিন্তু সেখানে মধ্যবিত্ত জীবনের গুটিকয়েক কল্পিত সমস্যা ছাড়া ব্যাপক ভাবে জন-জীবনকে অঙ্কিত করা হয় নাই। এমন কি, নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ীর মত যুগন্ধর প্রতিভাও তখন আলমগীর-সীতার রূপকল্প সাধনায় মগ্ন ছিল।

কিন্তু বাঙ্গালী শিল্পমানস যুগসত্যকে কোন দিন অস্বীকার করিতে পারে নাই। ঘরে ঘরে দুর্ভিক্ষ ও মড়কের মহামারী, পথে ঘাটে বস্ত্রহীন বুভুক্ষিত মানুষের তিলে তিলে অসহায় মৃত্যুবরণকে উপেক্ষা করিয়া পুরাণ ইতিহাসের রোমান্টিক পরিবেশ রচনা স্বাভাবিক ভাবেই ক্লান্তিকর হইয়া উঠিল। তারপর একদিন মাঠের কৃষককে আনিয়া মঞ্চের উপর উপস্থিত করা হইল। সাধারণ দর্শক, সুধী সমালোচক সকলেই চমকিত হইয়া উঠিল। মীরকাশেম, সিরাজদ্দৌলার মুখে স্বাদেশিকতার আহ্বান নহে, জীবনের দুঃখ দৈন্যকে প্রকাশিত করিতে এইবার অবহেলিত উপেক্ষিত মানুষ আসিয়াছে। চির-পরিচিত চরিত্র, অস্বাভাবিক নূতনত্বের দীপ্তি লইয়া সেদিন জনমানসে বিস্ময়ের ঢেউ তুলিয়াছিল। এই নব্যচেতনার আন্দোলন হইতেই বাঙ্গালীর নবনাট্য-ধারার সূত্রপাত।

ব্যবসায়ী রঙ্গমঞ্চ সেদিন নীরব থাকিলেও এই আন্দোলনের ধারাকে খর্ব করিবার শক্তি সেদিন কাহারও ছিল না। কেন না, ইহার পটভূমি কষ্টকল্পিত সাজান গোছান চিত্রসমষ্টি নহে, অথবা বিদগ্ধ মানসের নবতম ইঙ্গিতবহও

নহে। নবনাটকের চরিত্র এবং কাহিনী সাধারণ মানুষ আর তাহার দুঃখ-দৈন্য—তাহাদের জটিল জীবন সমস্যা এবং সেই সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত। বিজন ভট্টাচার্যের নাটক রচনা লইয়াই নবনাট্য আন্দোলন গোড়ার দিকে রূপ লাভ করিয়া উঠিয়াছিল। সেইজন্য এই সম্পর্কে তাঁহার কথাই সর্বাগ্রে আলোচনা করিতে হয়।

বিজন ভট্টাচার্যের প্রথম উল্লেখযোগ্য রচনা 'জবানবন্দী' একটি ক্ষুদ্র নাটিকা। ইহার মধ্যে নূতনত্বের প্রথম ইঙ্গিত সর্বপ্রথম লক্ষ্য করা গেল। 'জবান-বন্দী' সম্পর্কে স্বয়ং নাট্যকার বলিয়াছেন— ··· 'সেও এক সোনা ধানের দুঃস্বপ্ন —মাঠের রাজা পরাণ মণ্ডল ('জবানবন্দী'র নায়ক) যে স্বপ্ন দেখতে দেখতে কোলকাতার ফুটপাথে না খেতে পেয়ে হুমড়ি খেয়ে মরেছিল।'. এই 'জবান-বন্দী' নাটকেই তাঁহার নব্যধারার প্রথম সুস্পষ্ট পরিচয় প্রকাশিত হয়। মুখ্যতঃ ইহারই পথ ধরিয়া নাট্যকারের পরবর্তী নাটকগুলিও রচিত হইল। এই প্রসঙ্গে সমকালীন যুগে 'জবানবন্দী'র অভিনয় দর্শনের পর 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র মতামত উল্লেখযোগ্য। আনন্দবাজার লিখিয়াছিলেন-—'জবানবন্দী বাঙলার নাট্যধারাকে নূতন পথে চালনা করার ইঙ্গিত······' কেবলমাত্র পত্রপত্রিকাই নহে, সমকালীন যুগের বহু গণ্যমান্য অভিনেতা এবং বিদগ্ধ সমালোচকমণ্ডলী 'জবানবন্দী'র নাট্যকারকে অভিনন্দন জানাইয়াছিলেন।

'জবানবন্দী'র পর 'নবান্ন' প্রকাশিত হয়। ইহার মধ্যেই নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্যের প্রতিভার সার্থকতম নিদর্শন দেখা যায়। 'নবান্নে'র প্রকাশ কাল ইংরাজী ১৯৪৪ সন। এই সনেই 'নবান্ন' প্রথম অভিনীত হয়। প্রথম সংস্করণের মুখপত্রে আমরা প্রথম অভিনয় রজনীর পাত্রপাত্রীর সুবিস্তৃত পরিচয় দেখিতে পাই। আধুনিক কালের অনেক সার্থক নটপ্রতিভা তখন 'নবান্নের' প্রযোজনায় গণনাট্য সংঘের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন—পাত্রপাত্রীর পরিচয়-পত্রই তাহার নিদর্শন। উল্লিখিত ব্যক্তিদের মধ্যে বর্তমান 'বহুরূপী' সম্প্রদায়ের কর্ণধার শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্র (তখন ভাদুড়ী ছিলেন), নট গঙ্গাপদ বসু, আধুনিক কালের রাজনৈতিক কর্মী মণিকুন্তলা সেন, অভিনেত্রী শোভা সেন, সুধী প্রধান, সজল রায়চৌধুরী, নিতাই ঘোষ, চারুপ্রকাশ ঘোষ এবং সাহিত্যিক গোপাল হালদারের নাম উল্লেখযোগ্য। ইহাদের সকলের সহযোগিতা এবং শম্ভু মিত্র ও বিজন ভট্টাচার্যের সুষ্ঠু পরিচালনা এবং অনবদ্য অভিনয়ে 'নবান্ন' সেদিন নাটকের রাজারাণীর জলসার জৌলুস ম্লান করিয়া

আপনার দুর্দম অগ্রগতি অপ্রতিহত রাখিয়াছিল। ইহার আলোচনা সম্পর্কে 'যুগান্তর' পত্রিকা লিখিয়াছিলেন,—

'আগস্ট আন্দোলন, বন্যা, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর পটভূমিকায় এই নাটকের গল্পাংশ রচিত এবং সমাজের যাহারা একেবারে নীচের তলায় বাঙ্গালার সেই দুঃস্থ কৃষকদের জীবন ইহার মধ্যে প্রতিফলিত। ইহা সত্য সত্যই গণজীবনের প্রতিচ্ছবি। এই ধরণের নাটক শুধু নূতনতর আর্ট হিসাবেই প্রশংসনীয় নহে, দুঃস্থ নিপীড়িত মনুষ্যত্বের প্রতি ইহা যে বেদনা জাগ্রত করে, তাহার মূল্য অনেক।'

'নবান্ন' সর্বসমেত চারিটি অঙ্ক এবং পনরটি দৃশ্যে বিভক্ত সুবৃহৎ নাটক।[4] প্রথম সংস্করণে ইহার পত্রসংখ্যা ছিল দুইশত চব্বিশ, চরিত্র সংখ্যা সাঁইত্রিশ, তাহা ছাড়াও নিরন্নের দল এবং জনতা আছে। 'নবান্ন' নাটকের প্রযোজনা ব্যাপারে উপদেষ্টা ছিলেন ব্যবসায়ী মঞ্চের শক্তিমান নট মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য।

"নবান্ন' নাটকের রচনা সম্পর্কে নাট্যকার স্বয়ং বলিয়াছেন, 'ঘরে যেদিন অন্ন ছিলো না, নিরন্নের মুখ চেয়ে সেদিন আমি 'নবান্ন' লিখেছিলাম। নাটক আরম্ভ করেছিলাম ১৯৪২ সালের জাতীয় অভ্যুত্থান আগস্ট আন্দোলনকে স্বাগত জানিয়ে।' ইহার কাহিনী এই—

আমিনপুর গ্রামের এক চাষী পরিবার। প্রধান সমাদ্দার সেই পরিবারের কর্তা; কুঞ্জ ও নিরঞ্জন—প্রধানের দুই ভ্রাতুষ্পুত্র, কুঞ্জর পুত্র মাখন এবং প্রধানের স্ত্রী পঞ্চাননী। রাধিকা এবং বিনোদিনী যথাক্রমে কুঞ্জ এবং নিরঞ্জনের স্ত্রী। এই সাতটি প্রাণীর সংসার জোতজমা চাষ-আবাদের কল্যাণে মোটামুটি সচ্ছলতার মধ্যেই কালাতিপাত করিতেছিল। এমন সময় আসিল আগস্ট বিপ্লব। পুলিশের গুলী বারুদের কটু গন্ধ গ্রামের শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিল। দরিদ্র চাষীরা নিশ্চুপ থাকে নাই, প্রধানের নেতৃত্বে তাহারাও এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু মার খাইল এবং মরিল মাত্র। প্রধানের দুই পুত্র শ্রীপতি ভূপতিও এই আন্দোলনে প্রাণ হারাইল। লড়াইয়ের সময় ধানগোলায় আগুন দিবার ফলে অনতিবিলম্বে চাষীমহলে খাদ্যাভাব দেখা দিল। ধীরে ধীরে সমস্ত গ্রামে দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া ঘনাইয়া আসিল। নিরক্ষর চাষী সমাজের এই দুর্দিনের সুযোগে স্থানীয় পোদ্দার হারু দত্ত তাহাদের নিকট স্বল্পমূল্যে আবাদী জমি খরিদ করিতে লাগিল। পেটের দায়ে কেহ জমি বেচিল, কেহ বেচিল না। কিন্তু জীবন-সমস্যার সমাধানের

পথ কেহই খুঁজিয়া পাইল না। দুর্ভিক্ষ আরও কবাল মূর্তিতে সারা গ্রামকে বেষ্টন কবিয়া ধরিল, সঙ্গে আনিল মহামড়ক। শান্ত স্নিগ্ধ পল্লী পরিবেশে সুরু হইল প্রেতেব তাণ্ডব নৃত্য ; অসহায় গ্রামবাসী দুমুঠা অন্নের প্রত্যাশায় শহবে পলাইয়া আসিল , প্রধান সমাদ্দাব এবং তাহাব পবিজনবর্গও বাদ গেল না। কিন্তু শহবেও শান্তি নাই। আড়ৎদাব চাল মজুত করে, মোটা মুনাফা নহিলে ছাড়ে না, সাধাবণ মধ্যবিত্ত মানুষ সেই মুনাফাচক্রেব ফাঁদে নিষ্পেষিত। গ্রাম-পবিত্যাগী গরীব চাষীব কথা কে ভাবে। ফটোগ্রাফাব দুর্ভিক্ষপীড়িত কঙ্কালসাব পল্লীবধুব ফটো তুলিয়া বাংলার ম্যাডোনা আখ্যা দিয়া চড়াদামে বিক্রয় কবে। শান্তি নাই, সহানুভূতি নাই—নিবন্ন মানুষেব দল এক লঙ্গব-খানা হইতে আব এক লঙ্গবখানায় ঘোবাফেরা কবে , পুণ্যকামী কোন মানুষেব দুই মুষ্টি অন্নবিতবণ আব সেই দয়ায় জীবন্মৃত হইয়া কায়ক্লেশে জীবন ধাবণ। এই দুঃখেব, এই অবিচাবেব কি শেষ নাই ? এই দহন-যন্ত্রণাব সমাপ্তি নাই ? নিশ্চয় আছে। এই অন্নহীন জনতাব মধ্য হইতেই সমাপ্তির সেই ইঙ্গিত আসিল। প্রধানেব ভ্রাতুষ্পুত্র নিবঞ্জন শহবে আড়ৎদাবেব নিকট চাকবী কবিতে গিয়াছিল , আড়ৎদাবেব জেল হইবাব পব সে তাহাব পবিত্যক্ত আমিনপুবের ভিটায় ফিবিয়া আসিল। বন্যাবিধৌত সেই ভিটাটিকে কোন মতে বাসোপযোগী কবিয়া সে ও তাহাব স্ত্রী বিনোদিনী বসবাস সুরু কবিল। কেবলমাত্র বসবাস নহে, নিবঞ্জন এবং গাঁয়েব আব এক মাতব্বব চাষী দয়াল মণ্ডলেব নেতৃত্বে হিন্দুমুসলমান-নির্বিশেষে সকল চাষী সঙ্ঘবদ্ধ হইল , প্রতিজ্ঞা কবিল স্বল্পাবশিষ্ট যেটুকু জমি আছে, তাহা পৃথক্‌ভাবে চাষ না কবিয়া সকলে সমবেতভাবে গতব খাটিয়া ধান ফলাইবে। 'মন্বন্তবে মবি নি আমরা, মাবী নিয়ে ঘব কবি',— অববোধেব বলদৃপ্ত শপথের পতাকাতলে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া, এই সত্য আব একবাব উপলব্ধি কবিল বাংলাব নিপীড়িত, অবহেলিত গ্রামীণ চাষী সম্প্রদায়। সুরু হইল 'নবান্ন' উৎসব। কুঞ্জ আসিল, আসিল তাহার স্ত্রী বাধা , আব আসিল শহবের ফুটপাথে হাবাইয়া যাওয়া অর্ধোন্মাদ প্রধান সমাদ্দাব স্বয়ং। উৎসব-প্রাঙ্গণ মুখবিত হইয়া উঠিল চাষী বৌয়েব 'নবান্ন' পালনেব গানে— , আব সেই উৎসব-প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া সমবেত চাষী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসাবে দয়াল মণ্ডল ঘোষণা কবিল, আগামী দিনের শপথ—'.. গতবারের মত এবার আব আকাল আচম্বিতে আমার চোখেব ওপব থেকে, আমারই পবিজন, আমারই

স্বজন, আমারই বন্ধুবান্ধব ··· ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না। ···এদের নিতে হলে আগে আমারে নিতে হবে, আমারে ঘায়েল করতে হবে···এট্টা ব্যবস্থার ওলোটপালোট করে দিতে হবে···তবে যদি পারে। জোর—জোর প্রতিরোধ···'

এই প্রতিরোধের শপথের সঙ্গে সঙ্গে 'নবান্ন' নাটকের যবনিকা পড়িয়াছে। সংক্ষেপে ইহাই 'নবান্ন' নাটকের কাহিনী।

'নবান্ন'র আলোচনায় স্বতঃই 'নীল-দর্পণ' নাটকের কথা মনে আসে। এই প্রসঙ্গে অমৃতবাজার পত্রিকার মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য—"For the first time since Dinabandhu Mitra's 'Nıldarpana' truly peasant's drama has come upon the Bengalı stage."

'নবান্ন' নাটকের মধ্য দিয়া নব্যধারার নাটকের আর যে একটি বৈশিষ্ট্য দেখা গেল, তাহা হইল নাটক হইতে এক-নায়কত্বের উচ্ছেদ। কোন একটি বিশেষ চরিত্রের পরিবর্তে সমগ্র জনতাই নায়কের পদে উন্নীত হইয়াছে। প্রধান সমাদ্দারের ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখ নহে, সমগ্র চাষী সমাজের বেদনাই 'নবান্ন'র মুখ্য বক্তব্য, সেইজন্য কেবল মাত্র প্রধান সমাদ্দার নহে—কুঞ্জ, নিরঞ্জন, দয়াল, বরকত আলি সেই সমগ্র চাষী সম্প্রদায় 'নবান্ন'র নায়ক হইয়া উঠিয়াছে।)

'নবান্ন'র পর বিজন ভট্টাচার্যের দুইটি নাটিকা প্রকাশিত হয়, 'কলঙ্ক' এবং 'মরাচাঁদ'। দুইটি নাটকেরই প্রকাশ কাল ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দ। 'কলঙ্ক' 'মরাচাঁদের' অগ্রবর্তী। বাঁকুড়ার প্রত্যন্ত অঞ্চলের আদিবাসী সাঁওতাল জীবনের আশা নিরাশার বর্ণনা 'কলঙ্কে'র উপজীব্য। ইহার কাহিনী এই—

সমাজ এবং পরিবারের মোড়ল বুড়া আর বউ গিরি, পুত্র মঙ্গলা, এবং পুত্রবধূ রত্নাকে লইয়া ছোট্ট সংসার। সাঁওতালের দল জনমজুরী খাটে, বেতের টুকরী বোনে। গ্রামে গোরা সৈন্য আসিয়াছে। তাহাদের জন্য টুপি বোনে, গান গায়, শিকার করে,—দল বাঁধিয়া সাঁওতালী মেয়েরা ছড়া কাটিতে কাটিতে জল আনিতে যায়—দুঃখদৈন্য সত্ত্বেও কর্ম এবং আনন্দের সম্মিলিত প্রাণোচ্ছ্বাসে নিরুপদ্রব সাঁওতালী জীবন কাটিয়া যায়। অনাবিল আনন্দের মধ্যে সকলের অলক্ষ্যে ঘনাইয়া আসে নিরানন্দের ক্রুর কুটিল অভিসম্পাত। একদিন বেতের টুকরী বাঁধিতে বাঁধিতে মঙ্গলার বউ রত্না হঠাৎ মাথা ঘুরিয়া অচৈতন্যপ্রায় হইয়া যায়। বৃদ্ধা গিরি তাহার কারণ বুঝিতে পারে। রত্নার সই কেয়ার সাহায্যে তাহাকে ঘরে পাঠাইয়া

সে ঘোষণা করে যে রত্না অন্তঃসত্ত্বা। বৃদ্ধ মোড়ল আনন্দিত হয়, আকাশে হাই তুলিয়া আবহাওয়া শুঁকিয়া লইয়া বলে—'দেয়া নামবে রে জোর…'। বুড়ার কথার সূত্র ধরিয়া আনন্দডগমগ কণ্ঠে গিরি বলিয়া উঠে—'তবে কি বানটান্ মাথায় করে ছেলেটো আসছে নাকিরে বুড়া—'। মঙ্গলার কিন্তু হুঁশপর্ব নাই। তাহার মনে তখন সন্তানের জন্য সুগভীর প্রত্যাশা। ভূমিষ্ঠ হয় সন্তান। আনন্দভরে সদ্যোজাত শিশু দেখিতে গিয়া মঙ্গলা ক্রোধে, ক্ষোভে, হতাশায় ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। তাহাদের সাঁওতাল-ঘরে এমন গৌরবর্ণ শিশুর জন্ম কেমন করিয়া সম্ভব হইল? আপন মনেই উত্তর খোঁজে সে; মানসপটে ভাসিয়া উঠে সদ্য আগত গোরা সৈন্যদের মুখগুলি। তাহাদের বর্বর ক্ষুধার অসহায় আহুতি রত্না তখন নিরুপায়, অপরাধিনীর ন্যায় ভয়ত্রস্তা। ক্ষিপ্ত মঙ্গলা তাহাকে কাটিয়া ফেলিতে উদ্যত হয়। প্রতিবেশীরা আসে। মোড়লের দাওয়ায় সভা বসে। সাব্যস্ত হয় সদ্যোজাত শিশুকে হত্যা করিবার, কেন না সে সাঁওতাল কুলে কলঙ্কের জ্বলন্ত স্বাক্ষর। কিন্তু শিশুহত্যাই কি এই কলঙ্কের কালিমা অবলুপ্ত করিতে পারিবে? যাহাদের পাশব ক্ষুধার ফলে একটি শিশুর জীবনে ঘনাইয়া আসিল নিদারুণ নিয়তি, তাহারা কি অবাধে সেই বর্বর লীলা চালাইয়া যাইবে? তাহা কখনই সম্ভব নহে। এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে জোট বাঁধিল সাঁওতালেরা, আর বৃদ্ধ মোড়ল স্বয়ং আসিয়া শিশুর ভার গ্রহণ করিল। 'দে ওটাক্, আমাক্ দেগো মা। কেউ যখন লিবে না ওটাক্ আমাকৃই দে। …আমিই কলঙ্কটাক্ লিয়্যা চলে যাই।' আঙিনার মাঝখানে বুড়া অগ্রসর হয়। শিশুটিকে দুই হাতে বুকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আকাশের দিকে মুখ তুলিয়া দাঁড়ায়…হয়ত বা পরমেশ্বরকেই জানায় তাহার নালিশ।

সংক্ষেপে ইহাই 'কলঙ্ক' নাটকের বিষয়বস্তু। তাহার পর 'মরাচাঁদ'। চব্বিশ পরগণার এক অন্ধ গায়কের জীবন 'মরাচাঁদে' রূপায়িত হইয়াছে। পবন আর রাধা, দুইজনের ছোট্ট সংসার। পোষ্য বলিতে রাধার এক বিধবা মাসী। অন্ধ পবন গাঁয়ের রাস্তায় ঘুরিয়া গান গায়। কখনও কখনও পালপার্বণ উপলক্ষ্যে সাথী মহিন্দরের হাত ধরিয়া রথতলায় গিয়া বসে। যে দুই চার আনা পায়, তাহাতেই কায়ক্লেশে দিনযাপন করে; পয়সা ভাঁড়াইয়া গাঁজাটা ইত্যাদিটা যে না খায়, এমনও নহে। মধ্যে মধ্যে গাঁয়ের মাতব্বর শচীনবাবু আসে, কোন্ সভা সমিতি উপলক্ষ্যে পবনকে গান গাহিবার জন্য লইয়া

যায়, পবন তাহাতেই খুশী। সে শিল্পী, গানেই তাহার আনন্দ, গানই তাহার আদর্শ। সেই গানকে বিকৃত করিয়া, সস্তা উপভোগ্য করিয়া জীবিকা আহরণে তাহার বাধিত, অথচ জীবিকার অন্য পথও নাই, অতএব দারিদ্র্য আর উপবাস ছিল তাহার নিত্যসঙ্গী। স্ত্রী রাধার কিন্তু এতটা সহ্য হয় না। সে সাধারণ মানুষ—কামনা-বাসনার উর্ধ্বে নহে, সুতরাং সংসারে যতই দারিদ্র্য বাড়ে, অন্ধ স্বামীর বিরুদ্ধে তাহার আক্রোশ ততই ফুঁসিয়া উঠে। আর এই আক্রোশে ইন্ধন যোগায় তাহার মাসী। অলক্ষ্যে আর এক শক্তিও কার্যকরী হয়—সে কেতকদাস কীর্তনিয়া। পবনের ভাষায় যে 'জ্ঞানদাস গোবিন্দদাসের পদের মধ্যিখানে নিজির পদ ঢুকিয়ে এমন সস্তা শৃঙ্গারের আমদানী করেছে যে, কুঞ্জবন হয়ে উঠেছে জমিদারের বাগান বাড়ী, আর কৃষ্ণরাধিকা সেখানে যে কোন সোমত্ত ছেলের-মেয়ের মত ঢলাঢলি করতি নেগেছে...' তবু এই কেতকদাসেরই পসার বেশী, পয়সাও বেশী। পবনকে সে বহুবার দলে ডাকিয়াছে, পবন কিন্তু যায় নাই ; প্রশ্ন করিলেই বলে—'খোল বোলে, সব মিথ্যে, সত্যি হলো শুধু পেট নাকি ?'—তাহার দৃঢ় বিশ্বাস শিল্পের এতখানি অমর্যাদা কখনই সম্ভব নহে—হইলে খোলবোল বেসুরা বাজিত। কিন্তু পবনের বিশ্বাস পবনের কাছে। রাধা তাহার সহিত সহযোগিতা করিতে পারে না। কেতকদাস পবনের জন্য প্রায়ই আসিত, আর ছল ধরিয়া অকুণ্ঠ ভক্তিরসের প্রাবল্যে রাধাকে সাড়ী ইত্যাদি উপহার দিত। ব্যাপারটা কিন্তু অন্য রকম। কেতকদাসের এই আন্তরিকতার গূঢ় কারণ সে বুঝিত ; মনে মনে পুলকিতও হইত। স্বামী তাহাকে ভালবাসে, তবু সে কপর্দকহীন ভিখারী। শুধু ভালবাসার দাবিতে বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করা যায় না। তাহা ছাড়া বৈষ্ণবের কণ্ঠিতে যখন দাসখতের মুচলেকা নাই, তখন রাধার অহেতুক ভীতিরও কোন কারণ নাই। সংসারদ্বন্দ্বে রাধা পরাজিত হইল—কেতকদাসের সহিত সে একদিন সব ভাসাইয়া বাহির হইয়া গেল। অন্ধ পবন রাধাকে প্রাণের অধিক ভালবাসিত। এই বিশ্বাসঘাতকতা সে সহ্য করিতে পারিল না। উন্মাদের মত ঘর দ্বার ভাঙ্গিয়া তছনছ করিতে সুরু করিল—এই সময় শচীনবাবু খাদ্য দাবির সভায় গান গাহিবার জন্য পবনকে আমন্ত্রণ জানাইতে আসিলেন। পবন অস্বীকার করিল। বলিল, তাহার গান শেষ হইয়া গিয়াছে—ভাঙাফাটা গলায় আর সে গাহিতে পারিবে না। শচীনবাবু

নাছোড়বান্দা। পবনকে রাজী করাইতে হইবে, শিল্পীর অপমৃত্যুই বা একজন যুগসচেতন রাজনৈতিক কর্মী প্রত্যক্ষ করে কেমন করিয়া! সেইজন্য পবনকে তিনি বুঝাইতে লাগিলেন যে, সে শিল্পী, সঙ্গীত ছাড়া তাহার আর কোন সত্তা নাই, গান তাহাকে গাহিতেই হইবে, কেননা গানই এখন একমাত্র তাহার—। সম্বিৎ ফিরিয়া পায় পবন, শচীনবাবুর কথার মধ্যে সে যেন আশার আলোকবর্তিকা দেখিতে পায়। একতারা হাতে উচ্ছ্বসিত শিল্পী গান ধরে। আর সেই সংগীত আকাশ বাতাস বিমথিত করিয়া চিরন্তনের উদ্দেশে ছুটিয়া চলে।

'কলঙ্ক' এবং 'মরাচাঁদ' সমসাময়িক হইলেও দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য অনেক। 'মরাচাঁদে' রাজনীতি নাই—শিল্পিজীবনের ব্যথাবেদনার করুণ মধুর রূপটিই 'মরাচাঁদে' রসব্যঞ্জনায় প্রকাশিত হইয়াছে।—'নবান্নে'র পর 'কলঙ্ক' নহে, 'মরাচাঁদই' নাট্যকারের শ্রেষ্ঠ নাটক।

ইহার পর বিজন ভট্টাচার্যের 'গোত্রান্তর' নাটক প্রকাশিত হয়। 'গোত্রান্তরে'র প্রকাশকাল ১৯৬০।

'গোত্রান্তর' নাটকের বিষয়-বস্তু ছিন্নমূল পূর্ববঙ্গবাসীর ভাগ্য-বিপর্যয় কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে; তাহা এই প্রকার—

শহরের উপকণ্ঠে শান্তি কলোনী। ছিন্নমূল উদ্বাস্তু পরিবারের সাময়িক শান্তিনীড়। গ্রামের স্কুল-শিক্ষক হরেন মাস্টার স্ত্রী শঙ্করী আর অনূঢ়া কন্যা গৌরীর হাত ধরিয়া এই শান্তি কলোনীতে আসিয়া উঠিয়াছেন। কায়ক্লেশে দিনপাত করেন। একটি পাঠশালা করিয়াছেন, সেখানেও ছাত্র নাই, তবু অর্থ নহে আদর্শের জন্যই হরেন মাস্টার প্রত্যহ পাঠশালা ঘরের শূন্য বেঞ্চির দিকে তাকাইয়া বসিয়া থাকেন। ছোট ভাই কেশবলাল শহরে চলিয়া গিয়াছে, তাহার কোন সংবাদ নাই। হরেন মাস্টারের মনে নিদারুণ দুঃখ, মাথায় সুগভীর চিন্তার জট, এই ছিন্নমূল জীবনের পরিণতি কোথায়, শ্মশানের ডোমের মত মড়া আগলাইয়া আর কতদিন বসিয়া থাকিতে হইবে? এমন সময় শহর হইতে কেশবলাল স্বয়ং আসিয়া দাঁড়াইল। সেখানে সে রেশনিং ডিপার্টমেণ্টে অস্থায়ী ভাবে চাকুরী পাইয়াছে, তাহার শহরের বাড়ীতে দাদা বৌদি আর গৌরীকে লইয়া যাইতে চায়। মরা গাঙেও জোয়ার আসে। দারিদ্র্যপীড়িত হরেন মাস্টারের অতি ছোট্ট সংসারেও সেই সংবাদে আনন্দের হিল্লোল বহিয়া গেল। জিনিসপত্র গোছগাছ শুরু

হইল। হরেন মাস্টার এবং তাহার পরিবার শহরে আসিল। ছিন্নমূল জীবনে শান্তি নাই। কেশবের চাকুরী সামান্য। তাহার আয়ে সংসার চলে না। বাড়ী ভাড়া বাকী পড়ে। জমিদারের দারোয়ান বকেয়া ভাড়ার জন্য তাহাকে অপমান করিয়া যায়। হরেন মাস্টার নিরুপায়—গুরুগিরি ছাড়া জীবনে আর কিছুই জানা নাই,—তবু ভগ্নহৃদয় হন না। সবাব অলক্ষ্যে ছোট ছেলেদের খেলনা পুতুল ফেরি করিয়া বেড়ান কলিকাতার রাস্তায়। পরিশ্রম হয়, কিন্তু আয় বাড়ে না। অবশেষে একদিন বাড়ীওয়ালা আসিয়া মারধর করিয়া তাঁহাদের বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিল। কেশবকে জেলে ধরিয়া লইয়া গেল। আবার পথ। প্রতিবেশী মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের জনতা সমবেতভাবে সহানুভূতি জানাইল, কিন্তু বাড়ীর বারান্দাব নীচটুকুও কেহ ছাড়িয়া দিতে রাজী হইল না। সাহায্য আসিল অপ্রত্যাশিত ভাবে, নিকটস্থ বস্তির সর্বজনীন মাতা শৈলবুড়ী আসিয়া ছিন্নমূল পরিবারটিকে তাহাদের বস্তির তাড়ীঘরে আশ্রয় দিল। ইহা এক নূতন অভিজ্ঞতা। হরেন মাস্টার শ্রমিক-জীবনেব দুঃখ-দারিদ্র্য, সহানুভূতি, নীচতা সব কিছুর সাক্ষাৎ পাইলেন। দেখিলেন, ভালয় মন্দয় মানুষ হিসাবে ইহারা এখনও বাঁচিয়া আছে। শঙ্করীর কিন্তু ভাল লাগে না। আজীবন মধ্যবিত্ত সংস্কার তাহার মনকে আরও বিরক্ত করিয়া তোলে। তাহার উপর কন্যা গৌরীর সহিত শৈলীবুড়ীর ছেলে কানাইয়ের ঘনিষ্ঠতা তাহার ভাল লাগে না। এই ঘনিষ্ঠতার কথা হরেন মাস্টারও জানেন; নাটকীয় ভাবে একদিন তাঁহার কাছে ইহাদের অন্তরের কথা প্রকাশিতও হইয়া পড়ে। বিচলিত হয়ত হন, কিন্তু ধৈর্য হারান না। দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন—'পিছু হটি নাই, পিছু হটবোও না। আমার বাধা এক সংস্কার। কিন্তু ন্যায়তঃ ধর্মতঃ যেটা সত্য, তারে আমি অস্বীকার করতে পারুম না। এ বিয়াই হইব।' সানাই বাজে। মধ্যবিত্ত স্কুলশিক্ষক হরেন মাস্টারের কন্যার সহিত বস্তি বাসী শৈলীবুড়ীর শ্রমিক সন্তান কানাইয়ের বিবাহ হয়। বিবাহ রাত্রেই অভাবনীয় আর এক দুর্যোগ ঘনাইয়া আসে। বহুদিন ধরিয়া বস্তি উচ্ছেদের জন্য জমিদারের সহিত বস্তিবাসীর কলহ চলিতেছিল ; সেই কলহ মারমূর্তি ধরিয়া প্রকাশিত হইল। বিবাহ রাত্রেই দলবল আনিয়া বস্তিতে আগুন দিয়া বস্তি উচ্ছেদ পর্ব সুরু হইল। অসহায় বস্তিবাসীর আর্তকণ্ঠে—শৈলীবুড়ীর কান্নায় আকাশ বাতাস মুখরিত হইল। হরেন মাস্টার বিচলিত হন না। আজীবন

সংগ্রামের কষ্টিপাথরে জীবন-সত্য যাচাই করা হইয়া গিয়াছে—সেই দারুণ দুর্দিনে অন্নক্লিষ্ট বৃদ্ধ হরেন মাস্টারের দেহ জ্যামুক্ত ধনুকের মত ঋজু হইয়া যায়, সমবেত বস্তিবাসীদের নেতৃস্থান অধিকার করিয়া তিনি ঘোষণা করেন জীবন-সংগ্রামের বাণী—'টিপনী দেখছ বুড়ী রক্ত চন্দনের—এই দেখ আর দুই দেখ। বিয়া গেছে কাইল, আইজ হবে বাসি বিয়া। কোন রাজার বেটার বিয়ায় এমন ধুম হইছে কইতে পার বুড়ী—এত বাজনা—এত বাইগু—হেই বিশ্বকর্মার পুতের দল, চুপ কইব্যা খাড়াইয়া আছস—হাত লাগাইতে পারসনা তবা—হাত চালাও কাম কব—উঠাও বস্তি—' হাতে হাতে আবার ঘর গড়িয়া উঠে।

'গোত্রান্তরে'র পর বিজন ভট্টাচায আরও দুটি নাটক রচনা করেন, 'অবরোধ' এবং 'জীয়নকন্যা'। 'অবরোধে' মিল মালিকের মুনাফা-লোভ এবং শ্রমিক-শোষণের নগ্ন রূপ প্রকাশিত হইয়াছে। 'জীয়নকন্যা' ভিন্ন জাতের নাটক। মনসার ভাসান কেন্দ্র করিয়া ইহার গল্পাংশ গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহা গীতি-নাট্য। আগাগোড়া নাট্যকার স্বয়ং সঙ্গীত, অভিনয়-পরিচালনা এবং সুর সংযোজনা করিয়াছেন।

দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার নবনাট্য আন্দোলনের একজন অত্যন্ত উৎসাহী কর্মী এবং সুপরিচিত নাট্যকার। পাশ্চাত্ত্য নবনাট্য আন্দোলনের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত এবং ইউরোপীয় বিভিন্ন রাষ্ট্রের আধুনিকতম সমাজ-দর্শন সম্পর্কেও তিনি সুগভীর অনুসন্ধান করিয়াছেন। তাঁহার নাটকগুলির মধ্যে কেবল মাত্র আধুনিক বাংলার সমস্যা-কণ্টকিত জীবনের বৈচিত্র্যেরই যে স্বাদ পাওয়া যায়, তাহা নহে—আধুনিকতম সমাজ-দর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি তাহার মূল্যবিচার করিবারও সর্বদা প্রয়াস পাইয়াছেন। আদর্শ সমাজ সম্পর্কে তাঁহার নিজস্ব যে স্বপ্ন, তাহাই তাঁহার নাটকের ভিতর দিয়া ফুটিয়া উঠে। তাঁহার বিভিন্ন নাটকের বিষয়বস্তু অনুসরণ করিলে নবনাট্য আন্দোলনের যথার্থ স্বরূপটি উপলব্ধি করা যাইতে পারে।' তিনি এই আন্দোলনের সঙ্গে ইহার সূত্রপাত হইতেই জড়িত আছেন এবং কেবলমাত্র চিন্তার ভাব-বিলাসিতায় নহে, কঠিন কর্মের প্রত্যক্ষ ক্ষেত্র হইতেও তিনি ইহার প্রেরণা লাভ করিয়াছেন।

দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাটকের আর একটি বৈশিষ্ট্য ইহার সাহিত্য-গুণ। তাঁহার অনেক নাটক যে কেবল মঞ্চেই সফলতা অর্জন করিতে পারে,

এমন নহে সাহিত্যপাঠকেব মধ্যেও তাহা—সমাদৃত হইবাব যোগ্য। বাংলা দেশেব সাহিত্য-সমালোচকগণ তাঁহাব নাটকেব প্রশংসা কবিয়াছেন। বিদেশেও তাঁহাব নাটক যে সমাদব লাভ করিয়াছে, তাহাব প্রমাণ চেক ভাষায় তাঁহাব 'মশাল' নাটকের অনুবাদ। 'ক্ষুবধাব সংলাপ বচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত। একাঙ্ক নাটক বচনাযও তিনি দক্ষতাব পবিচয় দিযাছেন। একমাত্র মন্মথ বায় ছাড়া বাংলা সাহিত্যে এত একাঙ্ক নাটক এযাবৎ আব কেহ রচনা কবেন নাই। দিগিন্দ্রচন্দ্র একাধিক নাট্যেব পবিচালক ও নাট্য-সমালোচক। তাঁহাব নাটকে যে কত বিচিত্র জীবন বিভিন্ন সমস্যা ও গভীর জীবনবোধ বহিয়াছে, নাটকগুলিব সাবাংশ হইতেই তাহাব পবিচয় পাওয়া যাইবে।

দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধাযেব প্রথম নাটক 'অন্তবাল'; ইহাব বচনাকাল ১৯৪২; ১৯৪৪ সালে ইহা প্রথম অভিনীত হয। ইহাব কাহিনী এই প্রকাব—

ভবতোষ মুখুজ্যে চিত্রশিল্পী—শিল্প বিদ্যালয়েব অধ্যক্ষ। প্রথম জীবনে স্বদেশী কবিযাছেন, পবে শিল্পসাধনায় আত্মনিযোগ কবেন। স্ত্রী মাধবী প্রবাসী বাঙ্গালী পবিবাব হইতে আসিয়াছেন। একমাত্র কন্যা ঝর্ণা ইংবেজী সাহিত্যে এম. এ পবীক্ষাথিনী। ঝর্ণাব জন্মদিনে আমন্ত্রিতদেব আহাবাদি প্রায় শেষ—এমন সময় মাধবীব সঙ্গে ঝর্ণাব পাণিপ্রার্থী সুবিনয়েব বন্ধু বণেশেব সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। বণেশকে দেখা মাত্রই মাধবীব মধ্যে একটা ভাব-বৈলক্ষণ্য দেখা দেয় —মনে হয বিগত জীবনেব কোনও এক ঘটনা যেন তাহাব স্মৃতিপটে অকস্মাৎ জাগিয়া উঠে। তাবপব হইতেই মাধবীব মধ্যে একটা বিষণ্ণতা, অন্যমনস্কতা ও সংসাব সম্পর্কে ঔদাসীন্যেব ভাব পবিলক্ষিত হইতে থাকে। শত চেষ্টা কবিযাও ভবতোষ স্ত্রীব মনেব কথা অবগত হইতে অসমর্থ হন। বণেশ উচ্চশিক্ষিত, ভাবতেব কৃষি-সমস্যা সম্পর্কে গবেষক, মার্ক্সীয় দর্শনে বিশ্বাসী এবং ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী। বণেশেব সংস্পর্শে আসিয়া ঝর্ণাও ক্রমশঃ মার্ক্সবাদে বিশ্বাসী হইয়া উঠে এবং শ্রমিক আন্দোলনে যোগ দেয। রণেশ-ঝর্ণাব ঘনিষ্ঠতা সুবিনয়েব মনে ঈর্ষাব উদ্রেক কবে। তাহাব ফলে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয। সুবিনয়েব ছোট বোন রেখা তাহাতে ইন্ধন যোগায়। রণেশেব কাছে প্রেম নিবেদন কবিয়া ব্যর্থকাম হয় বলিয়াই তাহাব উপব বেখার বাগ। অবস্থাটাকে সহজ কবিবাব জন্য ঝর্ণা সুবিনয়কেও শ্রমিক আন্দোলনের দিকে টানিতে চাহে। শ্রমিক আন্দোলনে বিশ্বাস না থাকিলেও ঝর্ণাকে খুসী

করিবার জন্য এবং তাহাকে বেশিক্ষণ নিজের কাছে পাইবে এই আশায় সুবিনয় ঝর্ণার প্রস্তাবে সম্মত হয়। এদিকে কার্যব্যপদেশে রণেশকে প্রায়ই ঝর্ণাদের বাড়ীতে আসিতে হয়। উদারস্বভাব বলিয়া ভবতোষবাবু তাহাকে প্রসন্নচিত্তেই গ্রহণ করিয়া থাকেন। রণেশের যথার্থ পরিচয় জানিবার জন্য মাধবী উদ্‌গ্রীব হইয়া পড়েন, কিন্তু কোথায় যেন কি একটা রহস্য লুকাইয়া থাকে। মাধবী পরিচয় জানিতে চাহিলেই রণেশ প্রশ্ন এড়াইয়া অন্য কথায় চলিয়া যায়। মাধবীর ভাবান্তর ও ঝর্ণার রূপান্তরে ভবতোষবাবু কেমন জানি কি রকম একটা অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে পড়েন। শ্রমিক আন্দোলনে যোগ দেওয়া সত্ত্বেও সুবিনয়ের মনের ঈর্ষার কিছুমাত্র লাঘব হয় না; বরং বাড়িয়াই চলে। ঝর্ণার সঙ্গে তাহার মান অভিমানের পালা চলে। ক্রমে তাহা বিবাদে পরিণত হয়। সুবিনয়ের এই দুর্বলতার কাছে ঝর্ণা আত্মসমর্পণ করে না। তাহার আত্মসম্মানে বাধে, কারণ, তাহার মন জানে যে সে দ্বিচারিণী নয়। রণেশের ব্যক্তিত্ব ও বুদ্ধির প্রখরতার কাছে সুবিনয়ের মনের এই সংকীর্ণতা ও ভাবালুতা যুগের অনুপযুক্ত বলিয়া তাহার কাছে বিবেচিত হয়। একদিন বিরোধ চরমে পৌঁছায়, ঝর্ণাও সুবিনয়ের এই দুর্বলতাকে চরম শ্লেষের ভাষায় কশাঘাত করে। ফল বিষময় হইয়া দাঁড়ায়। জীবনে বিতৃষ্ণ হইয়া সুবিনয় গিয়া এক শ্রমিক বিক্ষোভের পুরোভাগে দাঁড়ায় এবং পুলিশের গুলিতে প্রাণত্যাগ করে। তারপর আসে এক সংকট। সুবিনয়ের মৃত্যুর কয়েকদিন পরে প্রকাশ পায় ঝর্ণা সন্তান-সম্ভবা। বিবাহ রেজিস্ট্রি করার পথে মাঝখানের দ্বন্দ্ব অন্তরায় হইয়া দাড়াইয়াছিল। সুতরাং প্রচলিত সমাজবিধান অনুযায়ী দেখা দেয় কুমারীর মাতৃত্ব সমস্যা। কলঙ্ক হইতে অব্যাহতি পাইবার একমাত্র পথ ভ্রূণহত্যা; কিন্তু ঝর্ণা তাহাতে অসম্মত হয়। কারণ, সে জানে বর্তমানে এদেশের সামাজিক কাঠামোতে নারীজাতির পূর্ণ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নাই বলিয়াই মাতৃত্বের অবমাননা করা হয়, কিন্তু শ্রেণীহীন সমাজ-তান্ত্রিক রাষ্ট্রে কোনও অবস্থায়ই সন্তান অবৈধ বলিয়া বিবেচিত হয় না। ভবতোষবাবু স্বভাবতই এই নীতি মানিতে পারেন না। তিনি অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়েন। রণেশ যখন ঝর্ণার মত সমর্থন করিয়া ভবতোষবাবুর সঙ্গে তর্ক করিতে আসে, তখন রণেশকে তিনি তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন। আত্মসম্বরণ করিতে না পারিয়া রণেশ আবেগবশে নিজের জন্মবৃত্তান্ত বলিতে

আরম্ভ করে। মাধবী অকস্মাৎ আসিয়া তাহাতে বাধা দেয় এবং অন্য ঘরে লইয়া যায়। ভবতোষবাবু বিস্মিত হইয়া যান। তারপরেই প্রকাশ হইয়া পড়ে, রণেশ মাধবীরই কুমারী জীবনের সন্তান। ভবতোষবাবু একেবারে ভাঙিয়া পড়েন। মাধবী স্বামীর পায়ে পড়িয়া ক্ষমা ভিক্ষা করে; কিন্তু ভবতোষবাবু অনমনীয় মনোভাব লইয়াই থাকেন। মাধবী যখন নিরুপায় হইয়া রণেশের আশ্রয়ে যাইবার জন্য গৃহত্যাগে উদ্যত হয়, তখন ঝর্ণা আসিযা বলে যে, মায়ের স্থান না হইলে এই গৃহে তাহারও স্থান হইবে না— অতএব সেও এই মুহূর্তেই গৃহত্যাগ করিবে। ঝর্ণার কথা শুনিয়া ভবতোষের মন খানিকটা নরম হয় এবং নীতিগতভাবে গ্রহণ করিতে না পারিলেও অপত্যস্নেহের কাছে পরাজয় স্বীকার করেন।

দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের পরবর্তী নাটক 'দীপশিখা'। ইহা এই বিষয়বস্তু লইয়া লিখিত—

১৩৫০ সাল। বাংলার উপর মন্বন্তরের ছায়া নামিয়া আসিয়াছে। কলিকাতার পথে ভিক্ষাজীবীরা ভিক্ষা পায় না। বাজারে জিনিস ক্রমশঃই দুর্মূল্য হইয়া উঠিতেছে। কালোবাজার শুরু হইয়াছে। সমাজের নীচের তলার মানুষের ত্রাহি ত্রাহি ডাক উঠিয়াছে। চাষীরা বাঁচিবার আশায় গ্রাম ছাড়িয়া কলিকাতায় আসিতে আরম্ভ করিয়াছে। একদিন এক চাউল ব্যবসায়ী গাড়ী হইতে চাউলের বস্তা মুটের সাহায্যে তুলিয়া গুদাম বোঝাই করিতেছে। চাষী রমণী ভিখারিণীতে পরিণত হইয়াছে। তাহার সঙ্গে দুইটি শিশু পুত্রকন্যা। দূরে দাঁড়াইয়া চাউলের বস্তার দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া আছে। চাউল গুদামজাত হইবার পরে গাড়ী চলিয়া যায়। ছেঁড়া বস্তা দিয়া সামান্য চাউল পথে পড়িয়া গিয়াছিল, প্রথমে তাহা মহাজনের নজরে আসে নাই। কিন্তু ভিখারিণী যখন সেই চাউল কুড়াইয়া আঁচলে তোলে তখন মহাজন দেখিতে পাইয়া ছুটিয়া আসে এবং তাহাকে চোর বলিয়া শাসাইতে থাকে। চাষীবউ কান্নাকাটি করিতে আরম্ভ করে। মহাজন তাহাকে পুলিশে দিবার ভয় দেখায়। বেগতিক দেখিয়া চাষীবউ মহাজনের হাত কামড়াইয়া দেয় এবং পুত্রকন্যা লইয়া প্রাণপণ ছুটিতে থাকে। দুর্ভিক্ষের কালোমেঘ আরও ঘনাইয়া আসে। প্রতিরোধের একটা ক্ষীণ চেষ্টা দেখা যায়। আইন সভার দিকে বাহির হয় বুভুক্ষিতের 'ভুখা মিছিল'। সেই মিছিলে একটি শিক্ষিতা তরুণীকে নেতৃত্ব করিতে দেখা যায়—নাম

লতিকা। কিন্তু আরম্ভ হয় কলিকাতার উপর জাপানী বিমানের আক্রমণ, সবাই আশ্রয় নেন এয়ার-রেড শেল্‌টার-এ। সেই বিপৎকালে একই আশ্রয়স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়, সেই মহাজন ও কৃষক রমণীকে। চরম খাদ্যসংকট উপস্থিত। অবস্থা আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যায়। প্রতিরোধের আর কোনও উপায়ই থাকে না। চারিদিকে হাহাকার। কলিকাতার পথে পথে 'একটু ফ্যান দাও, একটু ফ্যান দাও' বলিয়া কঙ্কালসার লোকগুলি ঘুরিতে থাকে। এক মুষ্টি অন্নের জন্য ইতরপ্রাণীর মতন ক্ষুধার্ত মানুষের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়িয়া যায়, সন্তানের মুখের গ্রাস মাতা কাড়িয়া খায়। চাষী রমণীর পুত্রটি অনাহারে মারা যায়। তারপর একদিন মেয়েটিও হারাইয়া যায়। বাঁচিবার সমস্ত আশা তাহার ফুরাইয়া যায়—অনাহারে মুমূর্ষু অবস্থায় ফুটপাথে পড়িয়া থাকে। সেবাদলের লোক তাহাকে হাসপাতালে পৌঁছাইয়া দেয়। কিন্তু পুত্রকন্যার শোকে আত্মহারা চাষীবউ হাসপাতালে খাদ্যগ্রহণে অসম্মত হয়। সে কেবল ছেলেমেয়ের কথা বলিয়া কাঁদিতে থাকে। এমন সময় আশ্রয় শিবিরের পক্ষ হইতে হাসপাতালে আসে সেই দেশসেবিকা লতিকা। চাষীরমণীকে দেখিয়াই সে চিনিতে পারে। চাষীরমণী তাহাকে দেখিতে পাইয়া তাহার সঙ্গে চলিয়া যাইতে চাহে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের অনুমতি লইয়া লতিকা তাহাকে আশ্রয়-শিবিরে লইয়া যায়। যে সকল ছেলেমেয়ে পথে হারাইয়া যায় তাহাদিগকেই আশ্রয়শিবিরে রাখা হয়। সেখানকার শিশুদের মুখের দিকে তাকাইয়া চাষীবউ যেন নিজের মেয়েকে খুঁজিতে থাকে। অবশেষে একদিন হারাণো মেয়ের সন্ধান পাওয়া যায়। মেয়ে আসিয়া মাকে জড়াইয়া ধরে। এমন সময় খবর আসে পাশের ঘরেই দুইটি শিশু মারা গিয়াছে। খবর শুনিয়াই চাষীবউ তাহার মেয়ে নীলাকে দৃঢ়হস্তে বুকের কাছে টানিয়া লয়। স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাহার মুখ হইতে বাহির হইয়া আসে, 'না না, একে আমি একে আমি ছেড়ে দোব না '

১৯৪৪ সনে নভেম্বর মাসে দিল্লীর কর্তৃপক্ষ ভারতীয় গণনাট্য সংঘের স্থানীয় শাখাকে এই নাটক অভিনয়ের অনুমতি দিতে অস্বীকার করেন।

ইহার পর দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'তরঙ্গ' নামক একখানি নাটক রচনা করেন। ইহার কাহিনী এই : গ্রামের গরীব কৃষকদের শোষণ করে জোতদার, জমিদার ও মহাজন। বাজারে তোলা আদায়ের নামে জোরজুলুম চলে। কৃষকদের মনে মনে বিক্ষোভ জমে। তাহাদিগকে সমর্থন করে দেশপ্রেমিক

যুবক অমর। সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের অভিযোগে তাহাকে পুলিশে ধরাইয়া দেয় বড তরফের জমিদার ও ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট বিপিন। কৃষকসমাজ বিক্ষোভে ফাটিয়া পড়ে। বিপিন অত্যাচার শুরু করে। তাহার প্রধান সহায় মুসলমান জোতদার ও মহাজন বজ্জর বেপারী। অত্যাচারিত কৃষকদের পাশে দাঁড়ান বৃদ্ধ কংগ্রেসী নেতা ছোট তরফের জমিদার শশী ঘোষ, অমরের বাবা। চলে তোলাবন্ধ আন্দোলন। কায়েমী স্বার্থ ও আমলাতন্ত্র বিচলিত হয়। দেশপ্রেমিক মুসলিম যুবক মহিউদ্দীন এবং তোলাবন্ধ আন্দোলনের নেতা গোপাল মিস্ত্রীর মেয়ে মঞ্জরীর নামে তাহারা অপবাদ রটায়—ভীষণ ষড়যন্ত্র, সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াইয়া আন্দোলন বন্ধের অপচেষ্টা করে। অমর জেল হইতে বাহির হইয়া আসে। স্তিমিত আন্দোলন আবার নবরূপে দুর্বার হইয়া উঠে। অর্থনৈতিক সংগ্রাম মিলিত হয় জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের সঙ্গে। ইউনিয়ন বোর্ডের বিরুদ্ধে জেহাদ চলে। আরম্ভ হয় দমননীতি। আঘাতে সমুদ্রের জলরাশির ন্যায় আরও ফুলিয়া উঠে জনতার ক্রোধ, তাহাদের শক্তি দুর্নিবার হইয়া উঠে, প্রবল তরঙ্গাভিঘাতে ভাসাইয়া দিতে চাহে কায়েমী শোষণ ও শাসনের সকল যন্ত্র। জনতার রুদ্ররূপ দেখিয়া সংস্কারবাদী কংগ্রেসী নেতা শশীবাবু শঙ্কিত হইয়া পড়েন, বৈপ্লবিক নেতৃত্বের জন্য তিরস্কার করেন পুত্র অমরকে, অহিংসার বাণী দিয়া আচ্ছন্ন করিয়া রাখিতে চাহেন জনতার বৈপ্লবিক চেতনাকে। তাহারা শশীবাবুর কথা শুনিয়া বিস্ময়ে মূক হইয়া যায় তাহাদের মোহ কাটিয়া যায়, বাছিয়া লয় নিজেদের পথ, সক্রিয় প্রতিরোধের পথে আগাইয়া যায়। চলে লাঠি, গুলি, লুণ্ঠন, গৃহদাহ। পুলিশকে সাহায্য করিতে আসে সৈন্য, তাহারা বিভীষিকা সৃষ্টি করে। পুলিশের হাত হইতে ছিনাইয়া নেয় জনতা তাহাদের প্রিয় নেতা অমরকে। ভয় পাইয়া যায় অত্যাচারী স্পেশ্যাল ম্যাজিস্ট্রেট—রণে ভঙ্গ দিয়া সরিয়া পড়ে—আগাইয়া আসে জনতা বলিষ্ঠ পদক্ষেপে নির্ভীক অকম্পিত হৃদয়ে। তাহাদের সম্মুখে এক মহীয়সী নারী—শশীবাবুর ভগিনী নিবেদিতা। বজ্রকঠিন জননায়ক গোপাল মিস্ত্রী গুলিতে আহত হয়। রণক্ষেত্রে প্রাণ দেয় তাহার একমাত্র মাতৃহারা পুত্র নন্দ। মৃত্যু আসন্ন, তথাপি গোপাল আশা, উদ্দীপনা, উত্তেজনায় চঞ্চল। পুত্রের মৃত্যুসংবাদে সে কাঁদে, কিন্তু আত্মহারা হয় না, ছাড়িয়া আসা গ্রামের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া থাকে। কানে আসে জনতার জয়োল্লাস, সাম্রাজ্যবাদী সেনাদলের সঙ্গে গ্রামবাসীদের

খণ্ড খণ্ড সংগ্রামের সংক্ষিপ্ত সংবাদ। মৃত্যুপথযাত্রী গোপাল ডাক দেয় শেষ সংগ্রামের, জনতার অবশ্যম্ভাবী চূড়ান্ত জয়ের ভবিষ্যদ্বাণী ঘোষণা করে।

পশ্চিম বঙ্গ সরকার কর্তৃক 'তরঙ্গ' নাটকেব অভিনয় নিষিদ্ধ হয়, পরে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়।

পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু জীবন-সমস্যা লইয়া দিগিন্দ্রচন্দ্র 'বাস্তুভিটা' নামক নাটক রচনা করেন। ইহার কাহিনী এই প্রকার—

পূর্ববঙ্গের একটি গ্রাম। বঙ্গ বিভাগ হইবার ফলে অবস্থাপন্ন মধ্যবিত্ত হিন্দুরা আতঙ্কে গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে। গ্রাম্য পাঠশালার পণ্ডিত মহেন্দ্র মাস্টারের স্ত্রী মানদা চিন্তিত হইয়া পডিয়াছে। বিবাহযোগ্যা কন্যাকে লইয়া তাহার দুশ্চিন্তার অবধি নাই। গ্রাম ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যাইবাব জন্য স্বামীকে সে উদ্ব্যস্ত করিয়া তোলে। কিন্তু মহেন্দ্র মাস্টার গ্রাম ছাড়িয়া যাইতে নারাজ। যাইবেই বা কোথায়—গরীব সে। সেইজন্য বলে 'মরি বাঁচি এখানেই থাকব।' এদিকে মহেন্দ্র মাস্টারের পরিবারে আসিয়া জুটিল একটি কুগ্রহ। কলিকাতা হইতে শচীন বাডী বেচিয়া দিতে আসিয়াছে। কলিকাতায় মানুষ সে—যুদ্ধের বাজারে কিছু টাকা করিয়াছে—অর্থ ঢালিয়া দুর্নীতিব স্রোতে নিজেকে ভাসাইয়া দিতে অভ্যস্ত। মহেন্দ্রের অনূঢ়া কন্যা কমলাকে সে খেলার সামগ্রী করিয়া নিতে চাহে। নিরুপায় মানদা অকূল সাগরে তৃণখণ্ডের মতন তাহাকে আশ্রয় করে। শচীন তাহাদের এই অসহায় অবস্থার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিতে উদ্যত হয়। মানদা শচীনের সঙ্গে কলিকাতায় যাইবার জন্য উদগ্রীব হইয়া উঠে। কিন্তু মহেন্দ্র বাস্তুত্যাগের কথা হয়ত চিন্তাও করিত না, যদি স্থানীয় লীগ-নেতা সোনা মোল্লার কাছে অন্যায়ের প্রতিকারপ্রার্থী হইয়া তাহাকে না নিরাশ হইতে হইত। সোনা মোল্লা অবশ্য চাহে না যে হিন্দুরা গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া যায় ; কিন্তু তাহাদিগকে রাখিতে হইলে যতটা আগাইয়া আসিয়া অভয় দেওয়া দরকার ততটা তৎপরতা সোনা মোল্লার মধ্যে নাই। সাধারণ মুসলমান গৃহস্থেরা কিন্তু চাহে হিন্দুদের ফিরাইবার জন্য সোনা মোল্লাকে সক্রিয় করিয়া তুলিতে। এই জনশক্তির নেতৃত্ব করে মক্তবের মাস্টার আমীনমুন্সী—মহেন্দ্র মাস্টারের সুখদুঃখের সাথী। সোনা মোল্লার নিষ্ক্রিয়তার সুযোগ লইয়া একদল দাঙ্গাবাজ গ্রামের আবহাওয়াকে অশান্ত করিয়া তুলিল। তাহাদের নেতৃত্ব করে ইয়াসিন মিঞা—সোনা মোল্লার প্রতিদ্বন্দ্বী। অবস্থা ক্রমশই খারাপের

দিকে গড়াইতেছে দেখিয়া সোনা মোল্লা তৎপর হইয়া উঠে। ইয়াসিন মিঞার চক্রান্তকে সে ব্যর্থ করিয়া দিতে চাহে। কিন্তু যথাসময়ে তৎপর না হওয়ার জন্য গঞ্জ লুঠ হইয়া যায়। এই পরাজয়ের মধ্য দিয়াই আসে সোনা মোল্লার 'আত্মচেতন'। দুর্বৃত্তদের দমনের জন্য সে সম্পূর্ণ সক্রিয় হইয়া উঠে। মহেন্দ্র মাস্টার গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে শুনিয়া সোনা মোল্লা সদলবলে তাহার বাড়ীতে ছুটিয়া আসে এবং বাস্তুভিটা ত্যাগ না করার জন্য অনুরোধ করে। মহেন্দ্র মাস্টার সোনা মোল্লার আশ্বাসে বিশ্বাস করিতে পারে না, কিন্তু আহত আমীন মুন্সী যখন ছুটিয়া আসিয়া আকুল কণ্ঠে বলে, 'মাস্টারদা, তুমি নাকি গ্রাম ছেড়ে চলে যাচ্ছ?'—তখন মহেন্দ্র মাস্টার আর স্থির থাকিতে পারে না—আবেগে আমীন মুন্সীকে জড়াইয়া ধরিয়া বলে, না, তাহাদিগকে ছাড়িয়া সে কোথাও যাইবে না।

খণ্ডিত বাংলার স্বাধীনতা লাভের বৃত্তান্ত ভিত্তি করিয়া দিগিন্দ্রচন্দ্র 'মোকাবিলা' নামক নাটক রচনা করেন। তাহার বিষয়বস্তু এই প্রকার—

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট মানুষের মনে আনন্দের বান ডাকে। পরশাসনের অবসান, দাসত্বমোচন ও স্বাধীনতা অর্জনের জয়োল্লাস; সকলের বুকভরা আশা, কত স্বপ্ন, কত কল্পনা, কত উদ্যম! দুর্দিনের অবসান—এইবার আসিবে সুদিন। আর দশজনের মতই আশায় ভরিয়া উঠে নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের কর্তা বিশ্বনাথেরও হৃদয়। দরিদ্র কেরাণী তিনি, আজীবন দুঃখের বোঝা বহিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু কোনদিনই ভাঙ্গিয়া পড়েন নাই। ইস্পাতের মতনই দৃঢ় তাঁহার মন, স্ফটিকের মতন স্বচ্ছ তাঁহার হৃদয়, বজ্রের মতন কঠোর তাঁহার চরিত্র। তিনি দুর্নীতিকে ঘৃণা করেন। তাঁহার নীতি হইল : নুন-ভাত খাব, তবু সৎপথে থাকব।—যেখানে চারদিকে দুর্নীতি প্রবল, সেখানে এই নীতি মানিয়া চলিতে গেলে যে দুঃখ পাইতে হয়, বিশ্বনাথের অদৃষ্টেও সেই দুঃখই নামিয়া আসে। কালোবাজারী কালীনাথ এক সময় বিশ্বনাথবাবুর বাসাবাড়ীতেই একখানা ঘর ভাড়া করিয়া থাকিত। যুদ্ধের সময় অসদুপায়ে অর্থোপার্জন করিয়া সে হঠাৎ ফাঁপিয়া উঠে। আশী হাজার টাকা দিয়া নূতন বাড়ী কিনে। বিশ্বনাথ যে সওদাগরী অফিসে চাকরী করেন, তাহার অধিকাংশ শেয়ার কিনিয়া কালীনাথ কোম্পানী পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। এই সংবাদে প্রথমে বিশ্বনাথ খুশীই হন; কিন্তু পরে যখন জানিতে পারেন যে, কালীনাথ কোম্পানীর সমস্ত কর্মচারীর কাছ হইতে

একটি বিশ্বস্ততার বণ্ড লিখাইয়া লইতে চাহিতেছে, তখন তিনি ক্ষুব্ধ হন এবং এই ধরণের বণ্ডকে তিনি দাসখত বলিয়া মনে করেন। এই বণ্ড লেখানো লইয়া কোম্পানীর কর্মচারীদের সঙ্গে কালীনাথের বিরোধ বাধে। কর্মচারীদের ইউনিয়ন বাধা দেয়। বিশ্বনাথ ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে বিশ্বাস করেন না, কাজেই ইউনিয়নের সঙ্গে কোন যোগও রাখেন না। সরলবুদ্ধি, নিরীহ, শান্তিপ্রিয় বিশ্বনাথ নির্ঝঞ্ঝাট হইবার আশায় এই বিরোধ এড়াইয়া চলিতে চাহেন, কিন্তু নির্মম বাস্তব নিষ্ঠুর অক্টোপাশের মতো চারিদিক হইতে তাঁহাকে জড়াইয়া ধরে। প্রবল চাপে যেন তাঁহার শ্বাসরোধ হইয়া আসে। এদিকে কালীনাথ এক সিনেমা কোম্পানী খুলিয়া বসে। সিনেমাটা উপলক্ষ্য, আসল উদ্দেশ্য কিছু মেয়ে সংগ্রহ করিয়া নিজের অসৎ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা। কাগজে বিজ্ঞাপন দেখিয়া বিশ্বনাথের কনিষ্ঠা কন্যা কণিকা কালীনাথের কবলে পড়ে। কণিকার বড় ভাই সত্যজিৎ সিনেমা-পাগল। তাহার গল্প নেওয়া হইবে এই আশায় সে কণিকাকে কালীনাথের কাছে আগাইয়া দেয়। বিশ্বনাথের কাছে বিষয়টা গোপন থাকে। দারিদ্র্যের হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার আশায় বিশ্বনাথের স্ত্রী সুভদ্রাও ইহাতে সম্মতি দেন। কালীনাথের স্ত্রী পুষ্প স্বামীর এই অধোগতি দেখিয়া ব্যথা পায় এবং প্রতিবাদ করিতে গিয়া স্বামীর কাছে তিরস্কার লাভ করে। কালীনাথের দুর্ব্যবহারে সওদাগরী কোম্পানীর কর্মচারীরা বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। অবস্থা ঘোরাল হইয়া দাঁড়ায়। কালীনাথ কর্মচারী ছাঁটাইয়ের উদ্দেশ্যে কারখানা বন্ধ করিয়া দেয়। কিছু অর্থ দিয়া সে বিশ্বনাথের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া দিতে চাহে; কিন্তু বিশ্বনাথ সিংহের মতো গর্জিয়া উঠিয়া সেই অর্থ ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেন। বিশ্বনাথের মধ্যম পুত্র মনোজিৎ ট্রাম-শ্রমিক ও ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী। কালীনাথের সমস্ত চক্রান্ত সম্পর্কে বাপকে সে সতর্ক করিয়া দেয়। কালীনাথের সমস্ত আক্রোশ গিয়া পড়ে এই পরিবারের উপর। মনোজিৎ-এর নামে পুলিশের গ্রেফ্‌তারী পরোয়ানা বাহির হয়; সে গা-ঢাকা দেয়। বিশ্বনাথের পরিবারে চরম অর্থসঙ্কট। কাবুলীওয়ালার কাছ হইতে টাকা ধার করিয়া সংসার চলে। বড় মেয়ে আরতি পেটেণ্ট ঔষধ বিক্রী করিয়া সামান্য রোজগার করে, ছোট ছেলে দীপক ভিক্ষা করিয়া পয়সা সংগ্রহ করে এবং খবরের কাগজ ফেরী করিতে থাকে। কালীনাথের কদর্য রূপ দেখিতে পাইয়া কণিকাও সেই পথ ছাড়ে। কোম্পানীর গোলযোগের দরুণ

কালীনাথের ব্যাঙ্ক ফেল পড়ে। কন্যার বিবাহের জন্য বিশ্বনাথ সেই ব্যাঙ্কে যে সামান্য টাকা গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন তাহাও গেল। বিশ্বনাথ জানিতে পারিলেন, কালীনাথ তাহার বিষয় আশয় সমস্তই বেনামা করিয়া রাখিয়াছে। কারখানার লক-আউট-এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলনকে দৃঢ়তর করিবার জন্য সংগঠনের কাজ করিতে গিয়া আরতিও পুলিশের হাতে ধরা পড়িল। অথচ ব্যাঙ্কের টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগে ধরা পড়িয়াও কালীনাথ বিনা বিচারেই খুঁটির জোবে খালাস পাইয়া আসিল। বিশ্বনাথের চোখ খুলিয়া গেল। তিনি বুঝিতে পাবিলেন, ব্যক্তিবিশেষ নহে, একটা শ্রেণীই আজ সংঘবদ্ধভাবে সাধারণ মানুষেব রক্তশোষণ কবিয়া নিজেদের উদর স্ফীত করিতে চাহিতেছে। অর্থই তাহাদের একমাত্র কাম্য, অর্থোপার্জনের জন্য তাহারা যে কোন ঘৃণ্য পথই অবলম্বন করিতে পারে। তাহাদেব কাছে মানুষের মানমর্যাদা, ব্যক্তিস্বাধীনতা, বাঁচামবা কোন কিছুরই দাম নাই। শাসক শ্রেণীর কাছেও তাহারা প্রশ্রয় পাইয়া থাকে। ইহাব প্রতিকার করা একার কাজ নহে। দলবদ্ধভাবে যে অন্যায় কবা হইতেছে, তাহাব প্রতিকার করিতে হইলে সাধারণ মানুষকেও দলবদ্ধই হইতে হইবে। শুধু নৈতিক প্রতিবাদ করিলেই চলিবে না, সংঘবদ্ধভাবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামও করিতে হইবে। অভিজ্ঞতা হইতে এই নূতন চেতনা লাভ করিয়া বিশ্বনাথ বুঝিতে পারেন, সংঘশক্তি হইতে নিজেকে আর বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখা চলে না। সকলের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া তিনি কালীনাথের সঙ্গে মোকাবিলা করিতে যান।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় বিপন্ন মানবাত্মার ক্রন্দন উপলক্ষ্য করিয়া দিগিন্দ্রচন্দ্র 'মশাল' নাটক রচনা করিলেন ; ইহার কাহিনী এই প্রকার—

দেশবিভাগেব পূর্বে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা মানুষের মনে যে বিষ ছড়াইল, বিভক্ত হইবার পরও সেই বিষক্রিয়া চলিতে লাগিল। বিভাগোত্তর এই পটভূমিতেই 'মশাল' রচিত। মতি ও ললিতা দুই ভাইবোন। মতি পশ্চিমবঙ্গে একটি লোহার কারখানার শ্রমিক। বিধবা ললিতা তাহার নাবালক পুত্র লইয়া দেশবিভাগের পরেও পূর্ববঙ্গেই বাস করিতেছিল। কিন্তু সেখানে পুনরায় সাম্প্রদায়িক আগুন জ্বলিয়া উঠিল। সেই আগুনে ললিতা তাহার পুত্র দুলালকে হারায় এবং নিজেও লাঞ্ছিতা হয়। অনেক কষ্টে সে মতির কাছে চলিয়া আসে। পূর্ববঙ্গের প্রতিক্রিয়া পশ্চিমবঙ্গেও দেখা দেয়।

মুসলমানদের উপর হাঙ্গামা শুরু হয়। কারখানার শ্রমিকদের মধ্যেও সাম্প্রদায়িকতা মাথা চাড়া দিয়া উঠে। শঙ্কর, জালাল, শোভনলাল প্রভৃতি সহকর্মীদের লইয়া মতি এই সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। কারখানার মালিকপক্ষ শ্রমিক ছাঁটাইয়ের সুযোগ হিসাবে ব্যবহারের জন্য এই সাম্প্রদায়িকতাকে উস্কাইতে থাকে। ভেদবুদ্ধি জাগাইয়া শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্য নষ্ট করাই তাহাদের উদ্দেশ্য। দালাল শ্রমিক হীরালাল কারখানার মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নানারূপ গুজব রটাইতে থাকে। রাজনৈতিক গুণ্ডা রামকান্তকে মালিক পক্ষ অশান্তি সৃষ্টির কাজে লাগায়। দলের পাণ্ডা সাজিয়া সে মুসলমান বস্তীতে হামলা শুরু করে। জালাল নিরুপায় হইয়া তাহার মাতৃহারা নাবালক পুত্র জয়নালকে আনিয়া মতির আশ্রয়ে রাখে। জয়নালকে লইয়া আরম্ভ হয় ললিতার মানসিক দ্বন্দ্ব, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ললিতার মাতৃহৃদয়ই জয়ী হয়। রামকান্ত জানিতে পারে যে, জালালের পুত্র জয়নালকে মতির বাড়ীতে আশ্রয় দেওয়া হইয়াছে। জালাল সংগ্রামী শ্রমিক, সুতরাং তাহাকে দেশছাড়া করিতে হইলে তাহার পুত্রটিকে শেষ করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে রামকান্ত একদিন রাত্রে দলবল লইয়া মতির বাড়ীতে হানা দেয়, কিন্তু আসিয়া দেখে বাড়ী খালি। রামকান্ত বুঝিতে পারে, টের পাইয়া ললিতা জয়নালকে লইয়া আগেই পলাইয়াছে। সে ললিতা ও জয়নালকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য চেষ্টা করিতে থাকে। কিছু দূরে পথের ধারে এক গাছের আড়ালে তাহাকে দেখিতে পায়। ললিতার কোল হইতে বর্বরের মত রামকান্ত জয়নালকে ছিনাইয়া লয়। ললিতা আর্তনাদ করিয়া উঠে। এমন সময় মতি আসিয়া খবর দেয় গুণ্ডারা জয়নালকে আগুনে পুড়াইয়া মারিয়াছে চেষ্টা করিয়াও সে ঠেকাইতে পারে নাই। ললিতা কাঁদিতে কাঁদিতে মাটিতে লুটাইয়া পড়ে। এতবড় আঘাত পাইয়াও জালাল নিজের জন্মস্থান পশ্চিমবঙ্গ ছাড়িয়া যাইতে নারাজ। সে কাবুলীওয়ালার ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে শ্রমিক শক্তিকে পুনরায় সংহত করিতে সচেষ্ট হয়। অবস্থা আয়ত্তের বাহিরে গিয়াছে দেখিয়া মতি প্রায় হাল ছাড়িয়া দেয়। মতির এই দুর্বলতা দেখিয়া ললিতা ব্যথা পায়। সংগ্রামবিমুখতার জন্য দাদাকে সে ভর্ৎসনা করে। এদিকে সুযোগ বুঝিয়া মালিক পক্ষ জঙ্গী শ্রমিকদিগকে ছাঁটাই করে। প্রতিরোধ তো দূরের কথা, প্রতিবাদ করিবার শক্তিও শ্রমিকদের নাই। চারিদিকে একটা অসহায় অবস্থা। সেই অবস্থার মধ্যেও

বিভীষিকা দূর করার আশায় শঙ্কর, শোভনলাল প্রভৃতি কয়েকজন শ্রমিক সাহসে ভর করিয়া শান্তির মিছিল বাহির করে। রামকান্তের দলের লোক ছোরা মারিয়া শোভনলালকে হত্যা করে। হিন্দু শ্রমিক মুসলমান শ্রমিকের জন্য প্রাণ দেয়। শোভনলালের এই আত্মত্যাগ শ্রমিকশ্রেণীর মনোবল ফিরাইয়া আনে। মতি নিজের ভুল বুঝিতে পারে। শান্তির জন্য মিলিত শক্তির সংগ্রামে তাহার বিশ্বাস ফিরিয়া আসে। শোভনলালের মৃতদেহ পুরোভাগে রাখিয়া শান্তির মিছিল বাহির হয়। সকলের মুখেচোখে একটি ভাবই ফুটিয়া উঠে—প্রথমে আমরা মানুষ—তারপর হিন্দু কি মুসলমান।

'মশাল' চেক ভাষায় অনূদিত হইয়াছে।

উদ্বাস্তু জীবনের এক বিচিত্র কাহিনী লইয়া দিগিন্দ্রচন্দ্রের 'জীবন-স্রোত' নাটক রচিত হয়। ইহার এই কাহিনী হইতে বিষয়-বস্তুর নূতনত্ব লক্ষ্য করা যাইবে—

গীতা দেশবিভাগের পরে মাতাপিতা ভাইবোন সব দাঙ্গায় হারাইয়া দৈবক্রমে পশ্চিম বঙ্গে চলিয়া আসিতে সক্ষম হয়, কিন্তু শিয়ালদহ স্টেশনে আসিয়াই নারীশিকারীদের পাল্লায় পড়ে। বরদা আশ্রমের স্বামী অঘোরানন্দ পুলিশের সাহায্যে তাহাকে উদ্ধার করিয়া আশ্রমে লইয়া যায়। আশ্রমে এই ধরণের অনাথা মেয়েদেরই আশ্রয় দেওয়া হয়। আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ স্বামী তেজসানন্দ প্রথম জীবনে রাজনৈতিক বিপ্লবী দলের কর্মী ছিলেন। স্বাধীনতা লাভের পর রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। আশ্রমে গীতার ক্লাস করেন। তিনি বেদান্তের আদর্শে মেয়েদের জীবন গঠিত করিতে চাহেন। তবে আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে অধ্যাত্মবাদের সমন্বয় কী ভাবে করা যায়—এমন চিন্তাও তাঁহার আছে। গীতা কারণে-অকারণে এখন জিতেনের বাড়ীতে আসে। জিতেনের মা হেমাঙ্গিনীকেও গীতার খুবই ভাল লাগে। প্রায় প্রতি সন্ধ্যায়ই আসিয়া গীতা তাঁহাকে মহাভারত পড়িয়া শোনায়। জিতেন ইতিহাসের অধ্যাপক। সে খুব গরীব অবস্থা হইতে মানুষ হইয়াছে। সে বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস লইয়া গবেষণার কাজে ব্যস্ত। জিতেনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ও আলাপ সালাপের ফলে গীতার যেন নতুন করিয়া একটা জীবনবোধ আসে। জিতেনের কাছ হইতে রবীন্দ্র-সাহিত্য লইয়া গিয়া সে পড়িতে থাকে। আশ্রম জীবনের মধ্যে একটা অসম্পূর্ণতা আছে, তাহার এই বোধ আসে। গীতা

উপলব্ধি করে, রবীন্দ্রনাথ জীবনের পরিপূর্ণতার কথা বলিয়াছেন। জিতেনের প্রতি তাহার আকর্ষণ আরও বাড়িয়া যায়। গীতার এই ভাবান্তর স্বামী অঘোরানন্দ লক্ষ্য করে। গীতাকে সে সাবধান করিয়া দেয় যে তাহার এই ভাব আশ্রমভাবের বিরোধী। জিতেনের বাড়ীতে ঘনঘন যাতায়াতের জন্য সে গীতাকে ভর্ৎসনাও করে। তাহার ফলে গীতার জিদ আরও বাড়িয়া যায়। এদিকে স্বামী তেজসানন্দ কিছুদিনের জন্য তীর্থ পর্যটনে যান। তাঁহার সঙ্গে জিতেনের মা হেমাঙ্গিনীও গিয়াছেন। এই সুযোগে অঘোরানন্দ তাহার স্বরূপ প্রকাশ করে। সে গীতাকে জীবনসঙ্গিনী করিতে চাহে। গীতা ঘৃণাভরে তাহার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। অঘোরানন্দ প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া উঠে। গীতার উপর নানাভাবে নির্যাতন চলে। সহ্য করিতে না পারিয়া একদিন সন্ধ্যার পরে গীতা জিতেনের বাড়ী চলিয়া যায়। তাহার অবস্থার কথা শুনিয়া জিতেনের দুঃখ হয়, কিন্তু স্বামীজী ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত গীতাকে যাইয়া আশ্রমেই থাকিতে বলে। গীতা আশ্রমে ফিরিতে অসম্মতা হয়। জিতেন বিপাকে পড়ে। কথায় কথায় গীতা নিজের মনের অভিলাষ ব্যক্ত করিয়া ফেলে—ভালবাসার কথা জানায়, তাহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে অনুরোধ করে। এই অকৃত্রিম সরল ভালবাসাকে জিতেনের অস্বীকার করার ক্ষমতা হয় না। গীতার প্রস্তাবে সে সম্মত হয়। কিন্তু সমস্যা দেখা দেয়, জিতেন যখন বলে যে, ধর্মানুসরণ করিয়া বিবাহপদ্ধতিতে সে বিশ্বাস করে না, একমাত্র রেজিস্ট্রি করিয়াই তাহাদের বিবাহ হইতে পারে। গীতার প্রশ্নের উত্তরে জিতেন যখন স্পষ্ট করিয়াই বলে যে, ধর্মে ও ভগবানে তাহার বিশ্বাস নাই, তখন গীতার মন প্রচণ্ড আঘাত পায়। ধর্ম সম্পর্কে জিতেনের আগ্রহ না দেখিলেও তাহার মনের উদারতা দেখিয়া গীতার এই ধারণা হইয়াছিল যে, অন্তত ভগবানে তাহার বিশ্বাস আছে। কিন্তু সে যে নাস্তিক হইতে পারে, এমন চিন্তা তাহার মনে কোনদিন আসে নাই। কুয়াশার পর্দাটা যেন হঠাৎ সরিয়া যায়। গীতার ধর্মবিশ্বাস ভালবাসার অন্তরায় হইয়া দাড়াইল। তাহার নিজেকে অপরাধী বলিয়া মনে হইল। ভোরের আলো দেখা দিতে না দিতেই অশ্রুসিক্ত লোচনে সে জিতেনের ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। জিতেনের বন্ধুপত্নী অধ্যাপিকা যূথিকা দত্তের জরুরী তার পাইয়া স্বামী তেজসানন্দ হেমাঙ্গিনী সহ তাড়াতাড়ি চলিয়া আসিলেন। আসিয়া দেখিলেন আশ্রমের মধ্যে এক গুরুতর ষড়যন্ত্র হইয়াছে। ষড়যন্ত্রের প্রধান পাণ্ডা

অঘোরানন্দ। তাহার সঙ্গে আছে আশ্রমের পৃষ্ঠপোষক অবসরপ্রাপ্ত এক জজ ও এলিজা নাম্নী এক মার্কিন মহিলা। এই মহিলা কিছুদিন আগে স্বামীজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিরক্ত হইয়া স্বামীজী আশ্রম তুলিয়া দিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। কিন্তু গীতাকে লইয়া সমস্যায় পড়িলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন, ধর্মবিশ্বাস বাধা দিলেও জিতেনের প্রতি গীতার আকর্ষণ রহিয়াছে। মতবিরোধ থাকিলেও ব্যক্তি হিসাবে জিতেনকে স্বামীজী শ্রদ্ধা করেন। স্বামীজীর বুঝিতে বাকী রহিল না যে, গীতার এই প্রেম ব্যর্থ হইলে তাহার জীবন বিষাদময় হইয়া যাইবে। এই অন্তর্দ্বন্দ্ব হইতে নিজেকে মুক্ত করার শক্তি গীতার নাই। সুতরাং মুক্তির পথ তাহাকেই দেখাইতে হইবে। মানবতাকেই তিনি ঊর্ধ্বে স্থান দিলেন এবং গীতাকে বুঝাইলেন যে জিতেনের মতানুসারে বিবাহ করিলে তাহার কোন অধর্ম হইবে না। স্বামীজীর কথায় গীতা সম্মত হইল।

বিষয়-বস্তুর নূতনত্ব এবং জীবনদৃষ্টির অভিনবত্বের গুণে দিগিন্দ্রচন্দ্রের একাঙ্ক নাটকগুলিও বিশেষ ভাবেই উল্লেখযোগ্য। নবনাট্য আন্দোলন যে একাঙ্ক নাটক রচনারও প্রেরণা দিয়াছে, তাহার রচনা হইতেই তাহা প্রমাণিত হইতে পারে।

দিগিন্দ্রচন্দ্রের 'পূর্ণগ্রাস' বিষাদান্ত একাঙ্কিকা। কলিকাতার শহরতলীর একটি বস্তি। জমিদার বহুদিনের এই বস্তিটি ভাঙিয়া অট্টালিকা নির্মাণ করিতে চাহেন। বস্তিবাসীদিগকে উৎখাত করিবার জন্য সমন চাপিয়া গিয়া জমিদার আদালত হইতে একতরফা ডিক্রী আনেন। জমিদারের কর্মচারী একদিন বস্তি ভাঙিবার জন্য পুলিশ লইয়া আসে। নিরুপায় বস্তিবাসীরা প্রতিরোধের চেষ্টা করে। তাহাদিগকে হটাইবার জন্য পুলিশ লাঠি, টিয়ার গ্যাস ইত্যাদি চালায় এবং অবশেষে বন্দুকের গুলি ছোঁড়ে। গুলিতে বস্তির একজন শ্রমিকের একটি শিশুপুত্র মারা যায়। শিশুর মাতা পাগলিনীর মত মৃত পুত্রকে আনিয়া পুলিশের পায়ের কাছে রাখে এবং মর্মভেদী আর্তনাদ করিয়া উঠে।

''গোলটেবিল' ব্যঙ্গ নাটিকা। যুদ্ধের বাজারে জাতীয়তাবাদী পত্রিকার মালিকগণ প্রচুর অর্থের মালিক হন। ফলে পত্রিকা পরিচালনার নীতিরও পরিবর্তন হয়। সম্পাদকগণের স্বাধীনতা ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইয়া আসিতে থাকে। মালিকগণ সম্পাদকদিগকে তাঁহাদের হাতের পুতুল করিয়া তুলিতে

চাহেন। ব্যঙ্গ বিদ্রূপের সাহায্যে এই নাটকে তাহারই একটি চিত্র তুলিয়া ধরা হইয়াছে।

'কাঁঠালের আমসত্ত্ব' রাজনৈতিক ব্যঙ্গ নাটিকা। ভারত সরকারের জাতীয় পরিকল্পনায় অনুসৃত মিশ্র অর্থনীতি যে যথার্থ সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিতে পারে না, হাস্যরসের মধ্য দিয়া তাহাই দেখানো হইয়াছে। বলা হইয়াছে, এই পরিকল্পনার দ্বারা শেষ পর্যন্ত একচেটিয়া পুঁজিবাদই লাভবান হইতেছে। এই নাটকেএকটি সমাজতান্ত্রিক টুপি প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করা হইয়াছে। নীলাম ডাকিয়া যখন জনসাধারণকে বুঝানো হইতেছে যে এই টুপি নীলামে কিনিয়া মাথায় পরিলে কাহারও আর দুঃখকষ্ট থাকিবে না, সকল সমস্যার অবসান হইবে, তখন দেখা গেল, একজন মাড়োয়ারী সর্বোচ্চ দাম দিয়া টুপিটি কিনিয়া লইয়া সকলের মাথার উপরে তাহা ঘুরাইতে লাগিল। নীলাম ডাকিবার সময় বিভিন্ন ব্যক্তির প্রশ্নের মধ্য দিয়া দেশের বর্তমান অবস্থার চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে।

'অপচয়' বিষাদান্ত একাঙ্কিকা। পূর্ববঙ্গ হইতে আগত বিধবা রমণী সুশীলা পাঁচজনের কাছ হইতে সাহায্য লইয়া কোনরকমে কন্যার বিবাহের আয়োজন করিয়াছে; কিন্তু লগ্নের কিছুক্ষণ আগে জানিতে পারিল পাত্র আসিবে না। তাহার মাথায় বজ্রপাত হইল। সম্মান রক্ষার আশায় উদ্বাস্তু কলোনীর ফটিক নামে একটি ছেলের সঙ্গে সুশীলা কন্যা সন্ধ্যাকে সেই লগ্নেই বিবাহ দিতে উদ্যোগী হইল। ফটিক অসচ্চরিত্র বলিয়া সন্ধ্যা তাহাকে বিবাহ করিতে অস্বীকার করিল এবং মিলন নামক একটি হকার যুবকের গলায় মালা দিল। প্রকাশ পাইল যে, ফটিকই পাত্রপক্ষের কান ভারি করিয়া বিবাহে ভাংচি দিয়াছে। মিলন ভিন্ন জাতের। সুতরাং তাহার সঙ্গে কন্যাকে বিবাহ দিতে সুশীলা অসম্মত। মিলনই এই ষড়যন্ত্র করিয়াছে ভাবিয়া সুশীলা তাহাকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিল। অন্যত্র লইয়া যাইবার জন্য সন্ধ্যা মিলনকে অনুরোধ করিল। মিলন তাহাতে অপারগতা জানাইল। সন্ধ্যা ভাবিল মিলন তাহাকে ভালবাসিলেও কাপুরুষ বলিয়াই অপারগতা জানাইতেছে। ক্ষোভে অভিমানে মিলনের কাছ হইতে সে অন্যত্র গেল। অন্য কারণে মিলন সন্ধ্যাকে গ্রহণ করিল না। ডাক্তার তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছে যে, তাহার ফুসফুসে ক্ষয়রোগ হইয়াছে।

'এপিঠ-ওপিঠ' মিলনান্ত একাঙ্কিকা। দেশবিভাগের পরে বড় বোন

করুণা কলিকাতায় আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে ছোট বোন রেণুর বাসায়। ছোট বাসা স্থান সংকুলান হয় না। করুণার স্বামী বেকার। করুণা কাগজের ঠোঙা বানাইয়া যতটা পারে রেণুর অভাবের সংসারে সাহায্য করে। কিন্তু আর্থিক অসচ্ছলতার দরুণ দুই বোনের মধ্যে প্রায়ই কথা কাটাকাটি হয় এবং একদিন তাহা গিয়া চরমে পৌছে। করুণা আঘাত পাইয়া অন্যত্র চলিয়া যাইবে স্থির করে। স্বামী আসা মাত্র সে তাহাকে উত্ত্যক্ত করিয়া তোলে এবং রিক্সা ডাকিতে বলে। স্বামী বিরক্ত হইয়া বাহিরে চলিয়া যায়। করুণা যখন তাহার জিনিসপত্র বাঁধিতে থাকে, তখন রেণু আসিয়া বাধা দেয় এবং বলে যে, একমাস হইল তাহার স্বামীর চাকরি নাই। করুণা তখন রেণুর রুক্ষ মেজাজের কারণ বুঝিতে পারে এবং সহানুভূতিতে তাহার মন ভরিয়া যায়। খানিকক্ষণ বাদে স্বামী ঘরে ফিরিলে করুণা তাহাকে বলে যে, ছোট বোনের এই বিপদের দিনে তাহাকে ফেলিয়া সে অন্যত্র যাইতে পারিবে না।

'পাকা দেখা' মিলনান্ত একাঙ্কিকা। ধনী পরিবার। কনিষ্ঠা কন্যা মঞ্জুলার পাকা দেখার দিন। বনেদি ঘরে সম্বন্ধ স্থির করিয়াছে। পাত্রপক্ষের লোকজনের আসিতে আর বড় বিলম্ব নাই। বাড়ীর সকলেই ব্যস্ত। বড় কন্যা মৃদুলার বিবাহ হইয়াছে আধুনিক পরিবারে। বড় ভাই পরেশ অমায়িক প্রকৃতির লোক। মধ্যম ভ্রাতা নরেশ সাহেবীভাবাপন্ন। বিধবা গৃহকর্ত্রী সুখলতা স্নেহশীলা ও সহৃদয়া। তিনি পরিবারের ঐতিহ্য মানিয়া চলিতে চাহেন। মৃদুলা ও নরেশ মায়ের সমস্ত কাজ সমর্থন করে না। সুখলতাও তাহাদের উৎকট আধুনিকতা সহ্য করিতে পারেন না। যে-ঘরে পাকা দেখা ও আশীর্বাদ হইবে, সুখলতা প্রতিবেশিনী মোক্ষদাকে বলে সেই ঘরে বসিয়া পান সাজিবে। এ বাড়ীতে চিরদিনই তাহা হইয়া আসিয়াছে। মৃদুলার তাহা পছন্দ হয় না—কারণ, মোক্ষদা বস্তির লোক। সে কৌশলে মোক্ষদাকে অন্য ঘরে সরাইয়া দেয়। মোক্ষদা নিজেকে অপমানিত বোধ করিয়া চলিয়া যায়। সুখলতা টের পাইয়া মৃদুলাকে তিরস্কার করেন এবং অবিলম্বে বস্তিতে চলিয়া যান। মায়ের ভর্ৎসনায় ব্যথিতা হইয়া মৃদুলা শ্বশুর বাড়ীতে চলিয়া যাইতে উদ্যত হয়। সুখলতা মোক্ষদাকে লইয়া ফিরিয়া আসেন। ইতিমধ্যে মৃদুলার স্বামী আসিয়া উপস্থিত হয় এবং তাহার কৌশলে মা ও মেয়ের মধ্যে মিটমাট হইয়া যায়। ততক্ষণে পাত্রপক্ষের লোকজন আসিয়া পড়িয়াছে।

'পুনর্জীবন' জৈবসমস্যামূলক একাঙ্কিকা। বসন্ত পাটনী ভেক লইয়া বৈরাগী হইয়াছে—ধর্মাকাঙ্ক্ষা হইতে নয়, পদ্মকে ভালবাসে বলিয়া। এই ভালবাসা ছিল শৈশব ও কৈশোর হইতে, কিন্তু অসবর্ণ বলিয়া পদ্মর বিবাহ হয় অন্যের সঙ্গে। বিবাহিত জীবনে পদ্ম সুখী হইতে পারে নাই; কারণ, কিছুদিন যাইতে না যাইতেই স্বামী তাহাকে ত্যাগ করে। সেই অবস্থায় পদ্মর উপর গ্রামের জমিদারের নজর পড়ে। বসন্ত পদ্মকে লইয়া দেশান্তরী হয় এবং কয়েক বৎসর পরে গ্রামের মায়া কাটাইতে না পারিয়া তাহারা আবার গ্রামেই ফিরিয়া আসে। ভেক লইয়া তাহারা কণ্ঠীবদল করে এবং গান গাহিয়া ভিক্ষান্নে জীবিকা নির্বাহ করিতে থাকে। বসন্ত একদিন ওলাউঠায় আক্রান্ত হইয়া মরণাপন্ন হয়। মৃত্যুকে শিয়রে দেখিয়া বসন্তের এক নূতন অনুভূতি আসে। পদ্ম তখন অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায়। ইহার আগেও পদ্ম অনেকবার অন্তঃসত্ত্বা হইয়াছে, কিন্তু লোকনিন্দার ভয়ে প্রতিবারই ঔষধ প্রয়োগ করিয়া বসন্ত তাহার ভ্রূণহত্যা করাইয়াছে। বসন্ত পদ্মর সেই অতৃপ্ত মাতৃত্বের বেদনাভরা মূর্তিটি যেন স্পষ্ট দেখিতে পায়। মনে মনে সে প্রতিজ্ঞা করে, ভাল হইয়া উঠিলে সে গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে এবং পদ্মর গর্ভস্থ সন্তানকে কোলে আসিতে দিবে। পদ্ম ও তাহার কোলে একটি সুন্দর শিশুর স্বপ্নে তাহার মন ভরিয়া উঠে।

'বেওয়ারিস' মনস্তত্ত্বমূলক একাঙ্কিকা। অপরেশবাবু সওদাগরী অফিসে কাজ করেন। যৌবনে কিছুদিন তিনি স্বদেশীও করিয়াছিলেন। পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময় তাঁহারই গ্রামের নমিতা নাম্নী একটি গরীব মেয়ে কলিকাতায় চাকরির সন্ধানে আসিয়া তাঁহার আশ্রয় নেয়। অপরেশবাবু নমিতাকে লইয়া মাঝে মাঝে এখানে ওখানে যান। তাঁহার স্ত্রী জানেন, চাকরি জুটাইয়া দিবার জন্যই নমিতাকে লইয়া যাওয়া হয়। বাহিরের লোকের কাছে অপরেশবাবু নমিতাকে শ্যালিকা বলিয়া পরিচয় দিতেন। একদিন অপরেশবাবুর এক বন্ধু আসিয়া রহস্য করিতে করিতে ফাঁস করিয়া দিলেন যে নমিতাকে লইয়া অপরেশবাবু প্রায়ই চৌরঙ্গীতে সিনেমা দেখিতে যান। স্ত্রীর কাছে ধরা পড়িয়া অপরেশবাবু অপ্রস্তুত হন।

'দাম্পত্য কলহে চৈব' দিগিন্দ্রচন্দ্রের একটি প্রহসন। বিষ্টু রায় প্রচুর অর্থের মালিক, কিন্তু নিঃসন্তান। চোরা কারবারে সে সিদ্ধহস্ত। কলিকাতার উপকণ্ঠে নূতন বাড়ী করিয়াছে। গৃহে শান্তি নাই। স্বামী-স্ত্রীতে কলহ।

কৃপণ স্বভাব—সৎকাজে একটি পয়সাও ব্যয় করে না। তাহারই গৃহে কিছুকাল লালিতপালিত দূরসম্পর্কীয় ভাগিনেয় রাখাল একদিন সন্ধ্যার পরে লাইব্রেরীর জন্য চাঁদা চাহিতে আসে। চাঁদা না দিয়া বিষ্টু তাহাকে তিরস্কার করে এবং শূন্য হাতে ফিরাইয়া দেয়। কিছুক্ষণ বাদে এক তরুণ সন্ন্যাসী বিষ্টুর বাড়ীতে উপস্থিত হয়। স্বামী-স্ত্রী তখন কলহ করিতেছিল; কিন্তু সাধুকে দেখিয়া উভয়েই থামিয়া যায়। সাধু তাহাদের আশীর্বাদ করে। উভয়ে মনের বেদনা সাধুকে জানায়। সাধু আশ্বাস দেয় তাহাদের সন্তান হইবে; তবে ভৈরবের নামে কিছু মানৎ দরকার। বিষ্টু ও তাহার স্ত্রী শশিমুখী পাঁচ শত পাঁচ শত করিয়া হাজার টাকা সাধুর পায়ের কাছে আনিয়া রাখে। সাধু তাহাদিগকে অন্য ঘরে চলিয়া যাইতে বলে। সকাল বেলা দেখা যায় সাধু উধাও। উভয়ে চেঁচামেচি করিতে থাকে। ইত্যবসরে রাখাল আসিয়া পাঁচ শত টাকার একটি রসিদ ও নগদ পাঁচ শত টাকা মামাকে দিতে চাহে। পরে ফাঁস হইয়া যায় যে, রাখালের এক বন্ধু সাধু সাজিয়া পূবরাত্রে আসিয়াছিল। বিষ্টু ও শশিমুখী তখন বুঝিতে পারে রাখালেরই এই কাণ্ড।

'আপেক্ষিক' মনস্তত্ত্বমূলক একাঙ্কিকা। মধ্যবিত্ত চাকরিজীবী অমল তাহার অফিসে ইউনিয়ন গড়িবার চেষ্টা করে। মালিক তাহাকে টাকা দিয়া হাত করিবার প্রয়াস পায়। অমল টোপ গেলে। কয়েক মাসের বর্ধিত হারে বেতন লইয়া একদিন সে অফিস হইতে বাড়ীতে ফিরে। মধ্যবিত্তসুলভ কত রঙীন কল্পনা তাহার মনে। এক সঙ্গে এত টাকা পাইয়া স্ত্রী নীলিমার মুখখানি হাসিতে ভরিয়া উঠিবে। কিন্তু সে যাহা ভাবিয়াছিল হইল তাহার বিপরীত। আনন্দের আতিশয্যে সে যখন মালিকের প্রশংসা করিতে লাগিল, স্ত্রীর মুখখানি তখন ম্লান ও বিবর্ণ হইয়া গেল। নীলিমার মুখের দিকে চাহিয়া অমলের নিজেকে যেন অপরাধী মনে হইতে লাগিল। অমল স্ত্রীর হাতে মনিব্যাগটি তুলিয়া দিল। নীলিমা সামান্য কয়েকটি টাকা লইয়া মনিব্যাগটি নিস্পৃহভাবে স্বামীর হাতে ফিরাইয়া দিল। স্ত্রীর এই ঔদাসীন্যে আহত হইয়া অমল মনিব্যাগটা স্ত্রীর দিকে ছুঁড়িয়া মারিল। তাহা লাগিয়া টেবিল হইতে কয়েকটা কাঁচের জিনিস মেজেতে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল। নীলিমা মুখ ঘুরাইয়া স্বামীর দিকে চাহিল এবং হাসিতে লাগিল।

দিগিন্দ্রচন্দ্রের 'তরঙ্গ' সম্পর্কে কবি-সমালোচক মোহিতলাল মন্তব্য করিয়াছিলেন, ...বাস্তবদৃষ্টির দৃঢ়তার পরিচয় আছে; ...নাটকে গতি আছে,

তাপ আছে, স্ফুলিঙ্গ আছে! ...ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন. 'নাট্যকার বৈপ্লবিক শক্তির সমস্ত উত্তাপ ও উত্তেজনা তাঁহার নাটকে ধরিয়াছেন।' এই উভয় উক্তিই তাঁহার প্রায় সকল নাটকের উপরই প্রযোজ্য।

সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত সর্বপ্রথম নূতন যুগের নূতন নাটক তুলসী লাহিড়ীব 'দুঃখীব ইমান'। ইতিপূর্বে নবনাট্য আন্দোলনের যুগে যে সকল নাটক বচিত হইয়াছে, ব্যবসায়িক রঙ্গমঞ্চে তাহাদেব অভিনয় কবিবার দুঃসাহস কেহই প্রকাশ করেন নাই। ইহাদের সকল প্রয়াসই তখন পর্যন্ত সৌখীন নাট্য প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু 'দুঃখীব ইমান'ই সর্বপ্রথম ইহাব সেই বেড়ী ভাঙ্গিয়া দিল। ইহা দীর্ঘকাল ধবিয়া কলিকাতার তদানীন্তন একটি বিশিষ্ট রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়া সাধাবণ দর্শকদিগের কৌতূহল নিবৃত্ত করিযাছিল। এই সম্পর্কে নাট্যকাব তাঁহার নাটকের ভূমিকায় উল্লেখ করিয়াছেন—'নাটক বচনা শেষ হওয়াব পর Indian Peoples Theatre-এর উৎসাহী সভ্যেরা একে রূপ দেবাব ইচ্ছা করলেন, কিন্তু নানা কাবণে হলো না। শুনে ভাল লাগ্‌লেও মঞ্চস্থ হলে এ'ব পরিণতি কি হবে, এই ভেবে ব্যবসায়ী রঙ্গমঞ্চের কর্তৃপক্ষেবা ইতস্ততঃ কব্‌তে লাগ্‌লেন। কলারসিক নট ও নাট্যকার শ্রীযুক্ত (বর্তমানে স্বর্গত) মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য মহাশয় একে প্রথমে মিনার্ভা ও পবে শ্রীরঙ্গমের দরবারে হাজির করলেন। ফল হলো না। এ'র প্রাকৃত ভাষা ও পবিবেশের জন্য পবিত্যক্ত হয়ে অচল পয়সার মত এটি সুটকেশের এক ধাবে পড়ে রইল। তারপর হঠাৎ এক শুভক্ষণে আবার মনোরঞ্জনবাবুব চেষ্টাতেই নাটকটি নাট্যাধিনায়ক শিশিব-কুমার ভাদুড়ী মহাশয়কে পড়ে শুনাবাব সুযোগ হলো। তিনি এ'ব রূপায়ণের ভার নিলেন।' অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহারই পরিচালিত 'শ্রীরঙ্গম' মঞ্চে ইহার অভিনয় আরম্ভ হইল। কি অবস্থাব ভিতর দিয়া যে নবযুগেব নূতন বাংলা নাটক সাধারণ রঙ্গমঞ্চের ভিতর অভিনয়ের মাধ্যমেও প্রথম আত্মপ্রকাশ করিল, ইহা হইতে তাহাই বুঝিতে পারা যাইবে। ১৯৪৭ সনের ১২ই ডিসেম্বর তারিখে শ্রীরঙ্গম্ নাট্যমঞ্চে ইহার প্রথম উদ্বোধন হয়। এ' যাবৎকাল আড়ম্বরপূর্ণ বেশভূষা ধারণ করিয়া রোমান্টিক এবং ঐতিহাসিক পৌরাণিক নাটকে যে সকল অভিনেতা অভিনেত্রী অংশ গ্রহণ করিতেন, তাঁহারাই ইহাতে সর্বপ্রথম বাংলার সে'দিনকার নিরন্ন কৃষক কৃষাণীর বেশ

ধারণ করিয়া রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হইলেন। সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের এক নূতন অধ্যায় খুলিয়া গেল।

পঞ্চাশের মন্বন্তরের মধ্যে বাংলার অন্নবস্ত্রহীন কৃষক দলে দলে যে পশুর মত নিজেদের প্রাণ বলিই দিয়াছে, তাহা নহে—মৃত্যুর, মুখোমুখি দাড়াইয়াও মধ্যে মধ্যে চকিত বিদ্যুদ্দীপ্তির মত মনুষ্যত্বের যে মহিমাও বিকাশ করিয়াছে, নাট্যকার 'দুঃখীর ইমানে'র মধ্যে তাহাই অনুভব করিয়াছেন। দীনবন্ধু বাংলার কৃষক তোরাপ-চরিত্রের মধ্যে যে ইমানদারীর পরিচয় পাইয়াছিলেন, এমন কি, বিংশ শতাব্দীতে শরৎচন্দ্র তাঁহার 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসের ভিতর দিয়াও মুসলমান কৃষক আকবরের মধ্যেও যে ধর্মবোধের অনুভব করিয়াছিলেন, মনুষ্য জীবনের চরম দুর্গতির মধ্যেও নাট্যকার তুলসী লাহিড়ী বাংলার কৃষকের মধ্যে তাহারই সন্ধান করিয়াছেন। এখানে মানুষের প্রতি বিশ্বাস ও সহানুভূতি যে রূপ লাভ করিয়াছে, তাহা দীনবন্ধু কিংবা শরৎচন্দ্রেরই তুল্য ; তবে দীনবন্ধু কিংবা শরৎচন্দ্রের শিল্পগুণ ইহাতে নাই, এই মাত্র পার্থক্য। কাহিনীটি উল্লেখযোগ্য—

১৩৫০ সাল। দেশে অন্নাভাব দেখা দিয়াছে। উত্তর বাংলার একটি ক্ষুদ্র গ্রামের কৃষক ধর্মদাস, তাহার স্ত্রীর নাম বিলাতী। ধর্মদাসের জমি-জমা নাই, পরের জমিতে জন খাটিয়া খায়। কেহ এখন আর জন খাটায় না, বিলাতী পরের ধানে চিঁড়া কুটিয়া কোনরূপে দুইটি পেট এখনও কায়ক্লেশে চালাইতেছে। অস্থাবর সামান্য পৈতৃক সম্পত্তি ছিল, অন্যায় ভাবে দাদা রঘুনাথ তাহাকে বঞ্চিত করিলে ধর্মদাস চুরি করিয়া নিজের ভাগ আদায় করিয়াছিল। ফলে ধরা পড়িয়া কিছুদিন জেল খাটিয়া আসিয়াছে, দাগী বলিয়া গ্রাম্যলোকের এখন সে অবিশ্বাসভাজন। গ্রামে ধান চাল চুরি হইতেছিল, পল্লীরক্ষা সমিতি রাত্রি জাগিয়া গ্রাম পাহারা দিত, প্রতি রাত্রে ধর্মদাসকে ডাকিয়া হাজিরা লওয়া হইত। বিরক্ত হইয়া একদিন সে থানায় দারোগাবাবুর নিকট গিয়া তাহাকে ইহা হইতে নিষ্কৃতি দিবার জন্য প্রার্থনা করিল। ইতিমধ্যে সিভিক গার্ড বাজারে চাউলের দোকানের সম্মুখে লাইনে দাঁড়াইয়া মারামারি করিবার অপরাধে জামাল নামক এক কৃষককে বাঁধিয়া আনিল। তাহার সঙ্গে তাহার বালক পুত্র বচিরুদ্দি ছিল, সে বাপের সঙ্গে আসিয়াছিল, মুড়ি কিনিতে গিয়া সে বাপের সঙ্গচ্যুত হইয়াছিল, ইতিমধ্যে বাপকে থানায় ধরিয়া আনিয়াছে; আঘাত গুরুতর হইয়াছিল বলিয়া জামালকে

জামীন দিতে বলা হইল, জামীন হইবার কেহ নাই, অবশেষে তাহাকে গারদে পুরা হইল। ছেলের নাম করিয়া জামাল কাঁদিতে কাঁদিতে লোহার গরাদে মাথা কুটিতে লাগিল; বচিরুদ্দি ছুটিয়া আসিয়া বাপের জন্য কাঁদিতে লাগিল। দেখিয়া ধর্মদাস বিচলিত হইল। তাহারও একটি পুত্র জন্মিয়াছিল, শৈশবেই মরিয়াছে, বাঁচিয়া থাকিলে আজ বচিরুদ্দির মত বড় হইত। ধর্মদাস বালকটির ভার লইল, তাহাকে বাড়ীতে পৌছাইয়া দিতে স্বীকৃত হইল। ধর্মদাসের গ্রামে একটা বড চুরি হইল। তাহার দাদা রঘুনাথের কার্তুজ সহ বন্দুক চুরি গেল। রঘুনাথ থানায় জানাইল, ধর্মদাস চুরি করিয়াছে। দারোগাবাবু সরজমীনে তদন্ত করিতে আসিলেন, ধর্মদাসকে ডাকাইলেন; সে অস্বীকার করিল, বলিল, শত্রুতা বশতঃ রঘুনাথ তাহার নামে মিথ্যা নালিশ করিয়াছে। থানাতল্লাসী করিয়া তাহার বাড়ীতে কিছু পাওয়া গেল না। সেইরাত্রেই চৈতন সাহার গুদাম হইতে এক বস্তা চাউল চুরি গিয়াছিল; একজন অপরিচিত লোক সেইরাত্রে তাহার ঘোড়া কাড়িয়া লইয়া গিয়াছিল বলিয়া গ্রামের জমিদার বিপুল রায় আসিয়া দারোগার নিকট অভিযোগ করিলেন। জামালকে পূর্বেই দারোগাবাবু ছাড়িয়া দিয়াছিলেন. অনুসন্ধানের ফলে বার মাইল দূরে তাহার বাড়ীর সম্মুখে জমিদারবাবুর ঘোড়া বাঁধা দেখিতে পাওয়া গেল। জামালের বাড়ী তল্লাসী করিয়া এক বস্তা চাউল পাওয়া গেল। চৈতন সাহা চাউলের বস্তা নিজের বলিয়া সনাক্ত করিল। জামালকে পুনরায় গ্রেপ্তার করিয়া রঘুনাথের বাড়ীতে তদন্ত ক্ষেত্রে আনা হইল। জামাল দোষ অস্বীকার করিল। দারোগাবাবু জামালকে সে কোথায় চাউল পাইয়াছে, তাহা জানিবার জন্য পীড়ন করিতে লাগিলেন। সে বলিল, সে জানে, কিন্তু বলিতে পারে না, কারণ, সে বেইমান হইতে পারিবে না। দেখিয়া ধর্মদাস আর সহ্য করিতে পারিল না। বলিল, সে চৈতন সাহার গদী হইতে চাউলের বস্তা চুরি করিয়া বন্দুক দেখাইয়া জমিদারের ঘোড়া কাড়িয়া লইয়া নিরন্ন জামালকে রাতারাতি সাহায্য করিয়া ঘরে ফিরিয়াছে, চুরির অপরাধে সে-ই দণ্ডনীয়। বিলাতী কাঁদিয়া উঠিল, সে তাহাকে নিরস্ত হইতে বলিল। সমবেত জনতা এক দাগী চোরের ন্যায়পরায়ণতা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল। রঘুনাথের আপত্তি সত্ত্বেও দারোগাবাবু জামাল ও ধর্মদাস উভয়কেই মুক্ত করিয়া দিলেন।

নিতান্ত ক্ষুদ্রের মধ্যেও মহত্ত্বের সন্ধান করা এই যুগের সকল শ্রেণীর

সাহিত্যেরই একটি বিশেষত্ব হইয়াছে, বাংলার দুর্ভিক্ষ মহামারী বাস্তুত্যাগের দুর্যোগের মধ্যেও যে মনুষ্যত্বের চকিত দীপ্তি কোন কোন মুহূর্তে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা অস্বীকার করিলে মানুষ হইয়া বাঁচিয়া থাকিবারও সকল শক্তি লুপ্ত হইয়া যায়। মানুষকে বিশ্বাস করিতে হইবে, মানুষের সম্পর্কে আশা করিতে হইবে এই দৃষ্টিভঙ্গি লইয়াই এই নাটক রচিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে মাস্টার মহাশয়ের চরিত্রটি আদর্শমূলক এবং জমিদার বিপুল রায়ের চরিত্রটি শরৎচন্দ্রের 'দেনা-পাওনা'র অনুকরণ-জাত। অন্যান্য চরিত্র ক্ষুদ্র হইলেও জীবন্ত এবং শক্তিশালী। ধর্মদাসের চরিত্র নাট্যকারের একটি বিশিষ্ট সৃষ্টি বলিয়াই গণ্য হইবার যোগ্য।

'নীল-দর্পণে'র মত 'দুঃখীর ইমান'ও উদ্দেশ্যমূলক সৃষ্টি। এ বিষয়ে নাট্যকার তাঁহার উদ্দেশ্য এইভাবে গ্রন্থের 'নিবেদনে' প্রকাশ করিয়াছেন,—'ধনতান্ত্রিক সভ্যতার চরম পরিণতি মন্বন্তরের দিনে এই চিরবঞ্চিত ও অবজ্ঞাতর দল, যারা ধন-লোভীর লোভের যূপ-কাষ্ঠে বলি হয়েছিল তাদের ছবি আঁক্‌তেই এই নাটকের সৃষ্টি।' এই নাটকের প্রেরণা সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন, 'রচনার সময় inspired হয়েছিলাম, এদেশের ও বিদেশের বহু মনীষীর চিন্তাধারার সংস্রবে এ'সে। বিশেষ করে বঙ্কিমচন্দ্রের "বাংলার কৃষক" ও "রামধন পোদ" বহু প্রেরণা দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কাছেও আমার ঋণ অনেক। বিদেশের Synge, Bernard Shaw এবং H. G. Wells এর নাম উল্লেখ না করলে অপরাধী হব।' কিন্তু এই বিষয়ে প্রকৃত কথা তিনি সর্বশেষে বলিয়াছেন, তিনি লিখিয়াছেন, এই নাটকখানি 'চিন্তা ও plan করেছি যে অবস্থায় যাদের দেখে, পঞ্চাশের মন্বন্তরে তাদের অনেকেই এই হতভাগ্য দেশ থেকে চিরবিদায় নিয়ে চিরশান্তি ধামে গিয়ে জুড়িয়েছে।' সুতরাং মন্বন্তরের মর্মান্তিক দৃশ্য তিনি প্রত্যক্ষ করিয়া সমগ্র অন্তর দিয়া তাহার বেদনা অনুভব না করিলে Synge, Bernard Shaw, কিংবা H. G. Wells ত নয়-ই, বঙ্কিমচন্দ্রের 'বাংলার কৃষক' কিংবা 'রামধন পোদ'ও তাঁহাকে কোনই প্রেরণা দিতে পারিত না।

গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের পার্শ্ববর্তী কয়লাখনি অঞ্চলে এক জনবিরল গ্রামে এক হিন্দুস্থানীর চা-এর দোকানকে কেন্দ্র করিয়া তুলসী লাহিড়ীর 'পথিক' নাটকটি রচিত হইয়াছে। এ কথা স্বীকার করিতেই হয় যে, উত্তর বাংলার মুসলমান কৃষক জীবনের সঙ্গে নাট্যকারের যে পরিচয়ের প্রমাণ তাঁহার পূর্ববর্তী

নাটকখানির ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে, বাংলার পশ্চিম সীমান্ত অতিক্রম করিয়া যে খনি অঞ্চলের জীবনটি এখানে তিনি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার ভিতর দিয়া তাঁহার সেই পরিচয়ের প্রমাণ প্রকাশ পায় নাই। সেইজন্য ইহার জীবন-চিত্র বাস্তব ও কল্পনায় মিশ্রিত হইয়া কখনও প্রত্যক্ষ এবং কখনও ভাববাষ্পাচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছে ; কাহিনীর অতি-নাটকীয়তা এবং লক্ষ্যচ্যুতি ইহার অন্যতম ত্রুটি। সমগ্র পরিকল্পনাটির মধ্যে একটি কবিদৃষ্টির পরিচয় প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকিলেও, তাহা শেষ পর্যন্ত বিশেষ কার্যকর হইয়া উঠিতে পারে নাই।` কাহিনীটি সংক্ষেপে এই—

গ্রাণ্ড্ ট্রাঙ্ক রোডের ধারে একটি ক্ষুদ্র দোকান ঘর। বৃদ্ধ যশমাল ইহার মালিক। একটু দূরেই একটি কয়লাখাদ আছে, তাহার বাবু ও মজুরেরা ইহাতে আসিয়া বসিয়া চা-সিগেরেট খায়। যশমালের পুত্র সুদর্শন, বাঙ্গালী মহিলাকে বিবাহ করিয়াছিল, স্ত্রী জীবিত নাই, এক কন্যা, নাম সুমিত্রা, গোমোতে মিশনরী ইস্কুলে পড়িয়াছে, লেখাপড়া জানে, অর্থের লোভে সুদর্শন তাহাকে এক বৃদ্ধের নিকট বিবাহ দিয়াছিল, বৃদ্ধের মৃত্যুর পর হইতে সে যশমলের নিকট থাকে, খরিদ্দারকে মধ্যে মধ্যে চা পরিবেশন করে। সুদর্শন কনট্রাক্টরিতে বহু টাকা নষ্ট করিয়া যশমলের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। বৃদ্ধ একমাত্র পুত্রের সকল অনাচার নীরবে সহ্য করে। কয়লা খাদের দুই একজন বাবু সুমিত্রাকে প্রেম নিবেদন করে, সে প্রত্যাখ্যান করিয়া তাহাদিগকে ফিরাইয়া দেয়। একদিন পথে সর্বস্বান্ত হইয়া অসীম রায় নামক কলিকাতার এক সাহিত্যিক সেই দোকানে আসিয়া আশ্রয় লইল। সুমিত্রা তাহার প্রতি অনুরক্ত হয়। অসীম তাহার অনুরোধে সেখানেই বাস করিতে থাকে, কুলীদের পক্ষ হইয়া কয়লা খাদের গোলমাল মিটাইয়া দেয়। কয়লা খাদের মালিক এক ডাকাতের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়া তাহার প্রাণনাশ করিবার সঙ্কল্প করে। কিন্তু সঙ্কল্প ব্যর্থ হয়, সুদর্শনের গুলিতে অসীম আহত হয়, ডাকাতের গুলিতে সুদর্শন নিহত হয়। সুমিত্রার আকর্ষণে অসীম সেখানেই থাকিতে সম্মত হয় ; কিন্তু সে হয়ত আঘাত হইতে বাঁচিয়া উঠিল না।

'দুঃখীর ইমান' নাটকের মত ইহাতে জীবনের কোন বড় কথা নাই ; যে জীবনকে নাট্যকার এখানে চিত্রিত করিতে চাহিয়াছেন, সেই জীবনের অভিজ্ঞতাও তাঁহার খুব নিবিড় নহে, তবে তাঁহার কবি-কল্পনায় ইহাতে একটি সমুচ্চ বিষয়ের পরিকল্পনা ধরা দিয়াছিল, এ কথা সত্য। ভারতের বৃহত্তম

রাজপথ গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের ধারের একটি ক্ষুদ্র দোকান ঘর, পরিশ্রান্ত পথিকের ক্ষণিকের আশ্রয় মাত্র। এই চিত্রটির মধ্যে জীবনেরই একটি সুগভীর ইঙ্গিত আছে, এ কথা সত্য। কিন্তু নাট্যকারের বর্ণনার ভঙ্গির ভিতর দিয়া এই বিষয়টি স্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারে নাই। তাহাব ফলে নাট্যকাহিনীটি নিতান্ত গতানুগতিক বলিয়া মনে হয়। অসীম এবং সুচিত্রার চরিত্র আদর্শমূলক। তবে অন্যান্য চরিত্রের বাস্তব গুণ অনেকখানি অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, 'দুঃখীর ইমানে'র পর এই নাটকের মধ্যে নাট্যকার নূতন কোন বিষয় কিংবা ভাব পরিবেশন করিতে পারেন নাই।

উত্তর বাংলার নিরক্ষর মুসলমান কৃষক সমাজেব বাস্তব জীবন-সংস্কারের সার্থক রূপায়ণের দিক হইতে তুলসী লাহিড়ীর 'ছেঁড়া তার' নাটকখানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহা ১৯৫৩ সনে (১৩৫৯ সাল) প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহা কোনও সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত না হইলেও, কলিকাতাব বিশিষ্ট একটি নাট্যপ্রতিষ্ঠান ইহাকে মধ্যে মধ্যে অভিজাত রঙ্গমঞ্চের ভিতর দিয়া অভিনীত করিয়া বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী হইয়াছে। ইহাব কাহিনীও পঞ্চাশের মন্বন্তরের পটভূমিকায় রচিত, তবে তুলসী লাহিড়ীব এই বিষয়ক অন্যান্য নাটকের তুলনায় ইহার মধ্যে সূক্ষ্মতর জীবন-দর্শন এবং গভীরতর শিল্পবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষতঃ যে জীবন ইহাব ভিতব দিয়া রূপায়িত হইয়াছে, তাহা প্রধানতঃ তুলসী লাহিড়ীর অন্যান্য নাটকের অনুরূপ হইলেও ইহার সঙ্গে নাট্যকারের পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে। এই গুণেই ইহা এই নাট্যকারের একটি বিশেষ শক্তিশালী রচনা। অন্তর ও বহির্মুখী বিস্তার সত্ত্বেও কাহিনীর দৃঢ়সংবদ্ধতা ইহাব আর একটি বিশিষ্ট গুণ। কাহিনীটি সংক্ষেপে এই প্রকার—

বাল্যজীবনের দুই সহপাঠী বন্ধুর সঙ্গে একদিন দৈবাৎ সাক্ষাৎ হইয়া গেল—একজনের নাম মহিমবাবু, তিনি এখন কৃষিবিভাগের ডিপুটি ডিরেকটার, সহরে থাকেন ; আর একজনের নাম রহিমদ্দি, সে কৃষক, দারিদ্র্য বশতঃ লেখা পড়া চালাইতে না পারিয়া নিজের গ্রামে থাকিয়াই সামান্য জমিজমা চাষাবাদ করিয়া দিন চালায়। মহিমবাবু সদাশয় ব্যক্তি, দরিদ্র সহপাঠীকে বিস্মৃত না হইয়া নিজের ঘরে ডাকিয়া আনিয়া খাওয়াইয়া দাওয়াইয়া পরিতুষ্ট করিয়া তাহার স্ত্রী ফুলজান ও পুত্র বসিরের জন্য নানা জিনিসপত্র পারিতোষিক দিয়া দিলেন; ছেলে বেলায় রহিমদ্দি গান গাহিত

বলিয়া তাহার নিজের জন্য একটি দিলরুবা কিনিয়া দিলেন। পরম আনন্দে রহিম উপহার সামগ্রী লইয়া গ্রামে ফিরিয়া আসিল। প্রতিবেশীরা দেখিতে পাইয়া কেহ ঈর্ষান্বিত, কেহ আনন্দিত হইল। গ্রামের মাতব্বর হাকিমদ্দি তাহাকে চোর বলিয়া ধরাইয়া দিতে গিয়া নিজেই বিপদে পড়িল। ক্রমে গ্রামে আকাল দেখা দিল। চারিদিকে হাহাকার শুরু হইয়া গিয়াছে। এক টাকায়ও এক সের চাউল পাওয়া যায় না। কৃষকের হাতে টাকাই বা কোথায়? কৃষকেরা পুত্র পরিবার সহ আসন্ন উপবাসের আশঙ্কায় যেমন কাতর, দুই একজন ধনী মাতব্বর ধানের গোলা লুঠ হইবার ভয়ে তেমনই শঙ্কিত। গ্রামের সকলেরই আহার নিদ্রা দূর হইয়াছে। ক্রমে হাহাকার বাড়িতে লাগিল। কৃষক লাঙ্গল, গরু, বীজধান সবই বেচিল। দুই এক জন স্ত্রীও বেচিল। ধনীদেরও আতঙ্ক বাড়িতে লাগিল। হাকিমদ্দি রহিমদ্দির পৈতৃক জমাজমি প্রায় সব পূর্বেই গ্রাস করিয়াছে, তাহার সঙ্গে রহিমের পৈতৃক শত্রুতা। গ্রামের লোক হাকিমদ্দির নিকট সাহায্যের জন্য ছুটিল, সে নিজের মান রক্ষা করিয়া তাহার নিকট যাইতে পারিল না. স্ত্রী পুত্রের মুখে আহার তুলিয়া দেওয়া তাহার কঠিন হইয়া উঠিল। অনাহারে বৃদ্ধা জননী মরিল। স্ত্রীপুত্র সহ নিজেও মৃত্যুর প্রতীক্ষায় রহিল। নিরুপায় হইয়া একদিন স্ত্রী-পুত্রকে তাহার এক আত্মীয়ের বাড়ী পাঠাইয়া দিল; কিন্তু পরদিন তাহারা বিমুখ হইয়া ফিরিয়া আসিল। দুর্দিনে আত্মীয় তাহাদিগকে গ্রহণ করিল না। হাকিমদ্দির বাড়ীতে লঙ্গরখানা খুলিয়াছে, দলে দলে গ্রামের লোক সেখানে গিয়া এক বেলা দুই মুঠা খাইতে পাইতেছে। রহিমদ্দি স্ত্রীপুত্রকে প্রাণ ধরিয়া সেখানে পাঠাইতে চাহিল না—হাকিমদ্দির সঙ্গে তাহার চিরকালীন শত্রুতার কথা স্মরণ করিয়া তাহার মনে বাধিল। কিন্তু একদিন ক্ষুধার্ত শিশুপুত্রের ক্রন্দন আর সহ্য করিতে পারিল না। নিজে নিরাহারে থাকিয়া ফুলজান ও রসিরকে হাকিমদ্দির বাড়ীর লঙ্গরখানায় পাঠাইল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফুলজান ছেলের হাত ধরিয়া ফিরিয়া আসিল। বলিল, হাকিমদ্দি তাহাদের চিনিতে পারিয়া বলিয়াছে, যাহারা চৌকিদারী ট্যাক্স দেয়, তাহারা এখানে খাইতে পায় না। হাকিমদ্দি ফুলজানকে তাহার অন্তঃপুরে গিয়া খাইতে বলিল। ইহার ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া সে চলিয়া আসিয়াছে। রহিম পৈতৃক আমলে ধনী ছিল, এখনও সামান্য জমিজমা আছে—সে ট্যাক্স দিত। ক্ষুধার্ত স্ত্রীপুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া রহিমদ্দি উন্মাদের মত হইয়া গেল। সে

এক টুক্‌রা কাগজে তালাক নামা লিখিয়া বলিল, 'আমি তোকে তালাক দিলাম, এই তালাক নামা দেখাইয়া তুই সেখানে গিয়া বসিয়া খা।' কিন্তু সে তালাক দিবার পরিণাম সেই মুহূর্তে ভাবিয়া দেখিতে পারিল না। তাহা হইলে ফুলজান এই গৃহে আর আসিতে পারিবে না। ফুলজানকে তালাক দিয়া পুত্র বসিরকে লইয়া রহিমদ্দি সহরে মহিমবাবুর আশ্রয়ে আসিল। ভাবিল, অঘ্রাণের ধান উঠিলে গ্রামে ফিরিয়া ফুলজানকে পুনরায় ফিরাইয়া আনিবে। ফুলজান হাকিমদ্দির বাড়ীতে বাঁদী হইয়া রহিল। চারি মাস কাটিয়া গিয়াছে। বসির অসুস্থ হইয়া পড়িল। মায়ের নিকট যাইবার জন্য সে অধীর হইয়া পড়িল। মন্বন্তরের দুর্যোগ তখন কাটিয়া গিয়াছে। মহিমবাবু রহিমকে দেশে ফিরিয়া তাহার স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হইবার পরামর্শ দিলেন। রহিম দেখিল, তাহার স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হইবার একটি বাধা আছে। যাহাকে তালাক দেওয়া যায়, তাহাকে পুনরায় বিবাহ করা যায় না। যদি অন্য কেহ তাহাকে নিকা করিয়া তালাক দেয়, তবে সে তাহাকে নিকা করিয়া গ্রহণ করিতে পারে। মহিমবাবু বুঝাইলেন, 'শাস্ত্র অপেক্ষা হৃদয়ের শক্তি বড়, যে ভাবেই হোক তাহাকে তোমার জীবনে গ্রহণ করিতেই হইবে।' রুগ্ন পুত্রকে লইয়া রহিমদ্দি দেশে ফিরিল। প্রতিবেশীরা এক ফকিরকে কিছু অর্থ দিয়া ফুলজানকে নিকা করিতে এবং পরদিনই পুনরায় তালাক দিতে রাজি করাইল। হাকিমদ্দি ফুলজানকে ত্যাগ করিতে চাহিল না। ছেলের মা মা বলিয়া কান্না শুনিয়া রহিমদ্দি হাকিমদ্দির বাড়ী হইতে ফুলজানকে ধরিয়া আনিল, ফুলজান সন্তানকে কোলে তুলিয়া লইল; কিন্তু 'হাদীজ খেলাপ হইবার ভয়ে দাঁতে দাঁত চাপিয়া' সে চুপ করিয়া রহিল, রহিমের দিকে ফিরিয়াও তাকাইল না। রহিম ফুলজানকে তাহার সঙ্গে ছেলেকে লইয়া দেশ ছাড়িয়া যাইবার কথা বলিল। সে অশ্রুভারাক্রান্ত দুইটি দৃষ্টি কেবল নীচের দিকে স্থির করিয়া রাখিল। রহিম অস্থির হইয়া উঠিল। এদিকে হাকিমদ্দি লোক-জন লইয়া তাহার অনুসরণ করিয়া আসিতেছে। রহিমদ্দি সহসা দিলরুবাটা হাতে লইল, ইহাতে সুর চড়াইতে গেল, তারগুলি সহসা ছিঁড়িয়া গেল। কি ভাবিয়া সে ঘরের দরজা বন্ধ করিল। ফুলজানকে ছাড়িয়া দিবার জন্য প্রতিবেশীরা আসিয়া হাকিমদ্দিকে যখন আক্রমণ করিল, তখন ঘরের দরজা খুলিয়া দেখা গেল গলায় দড়ি বাঁধা রহিমদ্দির মৃতদেহ ঘরের মধ্যে ঝুলিতেছে; সকলে বুঝিল, সে আত্মহত্যা করিয়াছে। ফুলজানের পক্ষে

তাহার ছেলেকে লইয়া সেই বাড়ীতে বাস করিবার আর কোন বাধা রহিল না।

এই নাটকের প্রধান চরিত্র রহিমদ্দি ও ফুলজান। রহিমদ্দি বাল্যকাল হইতেই গান গাহিত, দোতারা বাজাইত, তাহার মধ্যে একটু ভাবাবেগের স্পর্শ ছিল। সেই জন্যই এক সঙ্কট হইতে রক্ষা পাইতে স্ত্রীকে যেমন সে তালাকও দিতে পারে, তেমনই আর এক সঙ্কট হইতে রক্ষা পাইবাব জন্য নিজের গলায় দড়ি দিয়াও মরিতে পারে, হাদীজের খেলাপ করিয়া ফুলজানকে লইয়া দেশান্তরী হইয়া যাইবাব কথাও বলিতে পারে। তাহার চরিত্রের এই নিগূঢ় পরিচয়ই এই নাটকেব ট্র্যাজিডির কারণ। কিন্তু ফুলজানের চরিত্র ইহা হইতে স্বতন্ত্র। সহজাত বৃত্তির মত তাহাব মধ্যে ধর্মবোধেব বিকাশ হইয়াছে, কোরাণ-হাদীজের কথা সে পুথি পড়িয়া, কিংবা মৌলভির নিকট শুনিয়া কিছুই শিখে নাই। মুসলমান পরিবারে তাহার জন্ম, মুসলমান আচার-জীবনেব সংস্কাব তাহাব মজ্জা ও ধমনীতে গিয়া বাসা বাঁধিয়াছে। সেই জন্য তাহাব মধ্যে ইহাব শক্তি অত্যন্ত প্রবল। এই রক্ষণশীল শক্তির জন্যই রহিমদ্দিকে এতদিনেব প্রতীক্ষার পর লাভ করিয়াও তাহাব কথায় সে স্বীকৃতি জানাইতে পারিল না। ইহা তাহাব চরিত্রেব পক্ষে নিতান্ত স্বাভাবিক। নাট্যকারেব এই সুগভীর জীবনবোধ ফুলজানেব চরিত্রটিকে একটি বিশেষত্ব দান করিয়াছে। এই নাটকের মধ্যে উত্তর বাংলার মুসলমান কৃষক-জীবনেব সঙ্গে নাট্যকারেব যে পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা বিস্ময়কর। আধুনিক বাংলাব আঞ্চলিক জীবন লইয়া কথা সাহিত্যে যে কয়খানি উচ্চাঙ্গের রচনা প্রকাশিত হইয়াছে, ইহা নিঃসন্দেহে তাহাদেরই সমধর্মী বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। রঙ্গমঞ্চ ব্যতীত পাঠ্য হিসাবে নাটকের আবেদন এদেশে এখনও সৃষ্টি হয় নাই বলিয়া এই নাটকখানি কথা সাহিত্যেব মত প্রচাব লাভ করিতে পারে নাই।

এই নাটকেব আর একটি প্রধান গুণ ইহাতে তুলসী লাহিড়ীর অন্যান্য নাটকেব মত জনকল্যাণমূলক সাধারণ বক্তৃতা শুনিতে পাওয়া যায় না। নিরবচ্ছিন্ন কাহিনীর ভিতব দিয়া ইহার প্রবাহ যেমন রক্ষা পাইয়াছে, তেমনই মানবিক কৌতূহল মুহূর্তের জন্যও শিথিল হইয়া পড়িতে দেয় নাই। এই নাটকখানিকে নিঃসন্দেহে বাংলা নাট্য সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ কীর্তি বলিয়া গ্রহণ করা যায়।

সদ্য বিভক্ত বাংলার পাকিস্তান অংশের এক হিন্দু পরিবারের সমস্যা ভিত্তি

করিয়া তুলসী লাহিড়ী তাঁহার 'বাংলার মাটি' নাটক রচনা করিয়াছেন। নাটকের প্রারম্ভেই নাট্যকার একটি সুদীর্ঘ 'নিবেদন' প্রকাশ করিয়া এই নাটক রচনায় তাঁহার কি উদ্দেশ্য ছিল, তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। তাহাতে তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে, 'একটা বিশেষ তত্ত্ব ফুটিয়ে তোলার পরোক্ষ দায়িত্বও নাট্যকারের আছে। তাই নাটকের সার্থকতা নির্ভর করে নাট্যকারের ঐ সব সৃষ্টি বিন্যাস ও ব্যঞ্জনা শক্তির উপর। নাট্যকার হিসাবে এ সত্য আমি বিশ্বাস করি। এই বিশ্বাসের প্রকৃত শক্তি পরীক্ষা করিবার জন্য বিশেষভাবে এই নাটক রচনা ক'রেছি।' তিনি এই সম্পর্কে আরও লিখিয়াছেন, 'আজকের যুগে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক প্রভৃতি সব কিছু সমস্যাই যেন জড়িয়ে গেছে। এর যে-কোন একটা ধরে টান্‌লেই অপরগুলি এত স্বাভাবিকভাবে, সজোরে সবেগে এসে দাঁড়ায় যে, তাদের এড়িয়ে চলা অসম্ভব। তাই এই নাটকে সব কিছু সমস্যা জড়িয়ে নিয়ে একে একটা বিশেষ বিশেষণ দেওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ নাটক সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক যাই হোক না কেন, এটা ভাঙ্গা বাংলার বতমান ভাঙ্গা মনের কাহিনী। বাংলার ভাগের পর থেকে যা' দেখেছি, শুনেছি, ভেবেছি, বুঝেছি, তাই দিয়ে এ নাটক সাজিয়েছি। সঙ্গে সঙ্গে সমস্যার সমাধান সম্বন্ধে আমার চিন্তায় যতটুকু পেয়েছি, তারও একটু ইঙ্গিত দর্শকের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা ক'রেছি। যদিও বেশ জানি যে সেই চিন্তাধারার সঙ্গে কেউ হয়ত একমত হবেন, কেউ হয়ত বা হবেন না।' ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে, বিভক্ত বাংলার বিচিত্র সমস্যা লইয়া আলোচনা করিয়া নিজের দিক হইতে তাহাদের কোন সমাধান তিনি নির্দেশ করিয়াছেন, সেই সমাধান যে সকলের গ্রহণীয় নাও হইতে পারে, এই বিষয়েও তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং বাংলাব মাটিকে এখানে যথার্থ নিরপেক্ষভাবে প্রত্যক্ষ করিয়া নৈর্ব্যক্তিক কোন পবিচয় তিনি এখানে প্রকাশ করিতে পারেন নাই, একথা তাঁহার নিজেব উক্তি হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে, নাটকের এই কাহিনীর মধ্য দিয়াও তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে—

কিছুদিন হইল বাংলা বিভক্ত হইয়া তাহার পূর্বাংশে পাকিস্তান স্থাপিত হইয়াছে, দলে দলে হিন্দু বাস্তুত্যাগ করিয়া পশ্চিম বাংলায় চলিয়া যাইতেছে। অবসরপ্রাপ্ত কালীবাবু বিধবা পুত্রবধূ কিরণশশী, বয়স্কা অবিবাহিতা নাতনী চিত্রা ও নাতি লটুকাকে লইয়া এখনও পাকিস্তানে স্বগৃহেই বাস করিতেছেন।

অন্তহীন আশঙ্কা ও অশান্তির মধ্যে তিনি প্রতিদিন জীবন যাপন করিতেছেন ; তিনি বৃদ্ধ, নিঃসহায় ; পুত্রের অকাল মৃত্যুর পর তাহার পরিবারটির দায়িত্বও তাঁহার উপরই পড়িয়াছে। কি করিবেন ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছেন না। নাতি নাতনীর পড়াশুনা বন্ধ হইয়াছে, স্কুল কলেজে যাইতে পারে না। লট্‌কা পলিটিক্সে ঢুকিয়াছে। তাঁহার প্রতিবেশী আবু মিঞা বয়স্ক ব্যক্তি, ব্যবসায় দ্বারা পশ্চিম বঙ্গে প্রচুর অর্থ উপার্জন করিতেছেন, তিনি সম্প্রতি পাকিস্তানে স্বগৃহে আসিয়াছেন। তিনি কালীবাবুর শুভাকাঙ্ক্ষী, তাঁহাকে নানাভাবে আশ্বাস দিয়া দেশে ধরিয়া রাখিতে চাহেন, অন্যায় অবিচার জুলুম হইতে রক্ষা করেন। আবু মিঞার পুত্রের নাম নুরু মিঞা, তরুণ যুবক, গ্রাজুয়েট্, লীগ কর্মী—প্রতিবেশিতা সূত্রে চিত্রার সঙ্গেও পরিচিত। চিত্রা বি. এ. পযন্ত পড়িয়াছে, পরীক্ষা দিতে পারে নাই, সে নুরু মিঞাকে তাহার জন্য কলিকাতায় একটি চাকুরির সন্ধান করিয়া দিবার সাহায্য করিতে অনুরোধ করিল। দুইজন এই উদ্দেশ্যে গোপনে কলিকাতায় রওয়ানা হইল ; কিন্তু, ধরা পড়িয়া গেল, এই লইয়া সহরে একটা ঢী ঢী পড়িল। বিপত্নীক ধূর্ত উকিল সদানন্দবাবু চিত্রাকে বিবাহ করিয়া নূতন করিয়া সংসার পাতিবাব অভিলাষী ছিলেন, তিনি কালীবাবুকে নুরুব বিরুদ্ধে নারীহরণের অভিযোগ করিবার পরামর্শ দিলেন। সহরে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে এই বিষয় লইয়া তুমুল আলোচনা চলিতে লাগিল। চিত্রা সদানন্দবাবুর বিবাহ প্রস্তাবে রাজি ছিল না, তাহার কোনও পরামর্শ গ্রহণ করিল না। কালীবাবু অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। আবু মিঞা তাহার পুত্র নুরুর সঙ্গে চিত্রার বিবাহ দিয়া সকল দুশ্চিন্তা হইতে তাঁহাকে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য পরামর্শ দিলেন। কালীবাবুব আজন্মসঞ্চিত সংস্কারের মধ্যে নিদারুণ আঘাত লাগিল। চিত্রাও এই প্রস্তাবে রাজি হইল না। কালীবাবু সপরিবারে দেশত্যাগ করিয়া যাইবেন স্থির করিলেন। যাত্রার আয়োজন চলিতে লাগিল। যাত্রার দিন উপস্থিত হইল, জিনিসপত্র বাঁধাছাদা হইল। এমন সময় লট্‌কা পথে এক বেআইনী শোভাযাত্রায় যোগ দিবার জন্য বিহারী পুলিশের লাঠিতে আহত হইল। লট্‌কাকে ঘর হইতে পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গেল। মুসলমান যুবকেরা তাহার জামিনের জন্য মহকুমা হাকিমের নিকট দরখাস্ত লইয়া ছুটিল। তথাপি কালীবাবু চিত্রাকে তৎক্ষণাৎ যাত্রা করিতে আদেশ কবিলেন, চিত্রা এই বলিয়া আবু মিঞার নিকট তাহার প্রতিবাদ করিল, 'নানা, দিনের পর দিন,

নিরঙ্কুশ অত্যাচার দেখে দেখে, আমার অসহ্য হয়ে উঠেছিল। আজ আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি, এখানেও প্রতিবাদ আছে, অত্যাচারকে বাধা দেবার মানুষ আছে। দুঃখকষ্ট নির্যাতনে আমি ভয় পাই না, নানা। আমি মরে যাচ্ছিলাম আত্মার অপমানে। আজ ওরা লড়্‌বে, আর আমি পালাব? এ' আমি পার্ব না, কিছুতেই পার্ব না' [আবু চিত্রার মাথায় হাত দিল।]

বিভাগোত্তর পূর্ব বাংলার হিন্দুর পারিবারিক জীবনের সমস্যাটি এখানে বাস্তবরূপ লাভ করিলেও ইহার সমাধান নিতান্ত অবাস্তব। সেইজন্য শক্তিশালী রচনা হওয়া সত্ত্বেও নাটকটি আশানুরূপ জনপ্রিয়তা লাভ করিতে পারে নাই। ইহার মধ্যে আবু মিঞা চরিত্রটিও নিতান্ত আদর্শমূলক। তাহার মুখে হিন্দু মুসলমানের মিলনাত্মক যে সকল বক্তৃতা শুনা গিয়াছে, তাহা কাহিনীর গতি একদিক দিয়া যেমন শিথিল করিয়াছে, তেমনই ইহার বাস্তব মূল্য হ্রাস করিয়া দিয়াছে। নাট্যকার তাহার মধ্য দিয়াই যে এই সম্পর্কিত তাঁহার নিজস্ব মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। সাম্প্রদায়িক কলহের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্যখানে দাঁড়াইয়াও যে আমরা আবু মিঞার মুখে শুনিতে পাই, 'আমরা হিন্দু হই, মুসলমান হই, আমরা বৌদ্ধ খ্রীষ্টান যাই হই, সবার আগে আমরা বাঙ্গালী', তাহা রোমান্টিক নাটক রচনার যুগের সিরাজুদ্দৌল্লার অনুরূপ বক্তৃতার প্রতিধ্বনি মাত্র। অনেক ক্ষেত্রেই তুলসী লাহিড়ী পূর্ববর্তী যুগের নাট্য রচনার সংস্কার হইতে সম্পূর্ণ পরিত্রাণ পান নাই, এই শ্রেণীর চরিত্রের পরিকল্পনাই তাহার প্রমাণ। লট্‌কার চরিত্রটি শেষভাগে নিতান্ত আদর্শ-ধর্মী হইয়া উঠিয়াছে, নায়িকা চিত্রাও ইহার প্রভাব হইতে পরিত্রাণ পায় নাই। এই নাটকে মুসলমান চরিত্র সম্পর্কে যে পক্ষপাত প্রকাশ পাইয়াছে, নাট্যকার এই 'অভিযোগ' বিষয়ে অজ্ঞ ছিলেন না। তিনি তাহার জবাবে নাটকের 'নিবেদনে' লিখিয়াছেন, 'আমি হিন্দু হয়ে, হিন্দুর ত্রুটি যদি কিছু বেশি ক'রেই দেখিয়ে থাকি, সেটা কোনও বিদ্বেষ থেকে আসে নি।' কিন্তু ত্রুটি 'কিছু বেশি করেই' দেখাইবার ফলে নাট্যকাহিনী যে অবাস্তব হইয়া যায়, নাট্যকার সেদিকে লক্ষ্য করেন নাই। এই সকল বক্তৃতা এবং উদ্দেশ্য প্রচার ব্যতীতও নাটকখানির রচনায় নাট্যকারের যে শক্তির পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। সংলাপের কিছু কিছু অংশ বাদ দিয়া পশ্চিম বঙ্গ সরকার ১৯৫৩ সনে ইহা প্রথম অভিনয় করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন।

তুলসী লাহিড়ীর সর্বশেষ নাটক 'লক্ষ্মীপ্রিয়ার সংসার' ১৯৫৯ সনে প্রকাশিত হয়। বিভাগোত্তর যুগের মধ্যবিত্ত পরিবারের অর্থনৈতিক সমস্থা কেন্দ্র করিয়া ইহা রচিত হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য সম্পর্কে নাট্যকার নিজেই ভূমিকায় লিখিয়াছেন, 'স্বাধীনতার পরবর্তী যুগে অর্থনৈতিক চাপে নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণী ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে নেমে এসে মজদুর শ্রেণীতে পরিণত হচ্ছে। অথচ, সংসার চালানর দায়িত্ববোধ, সুরুচি ও সুনীতিবোধ তাদের সাধারণ মজদুরের মত শুধু নিজেদের চিন্তায় জীবন যাপন করবার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাই, যে পরিবারের কর্মসংস্থান আছে, তার ঘরে পোষ্য বেকাব সংখ্যাও যথেষ্ট। গৃহকর্ত্রী গৃহিণী সবাইকে জড়িয়ে রাখবার জন্য পদে পদে নিজেকে বঞ্চনা করছে এবং গৃহকর্তা অর্থ এনে তার হাতে তুলে দিয়ে নিজে বঞ্চিত হয়ে ক্ষোভে দুঃখে সংসারের উপর বীতরাগ হচ্ছে।' এই বিষয়টিই নাট্যকার একটি কাহিনীর ভিতর দিয়া রূপ দিয়াছেন। নিম্ন মধ্যবিত্ত পবিবারের কর্তা ইন্দ্রনাথ ওভারটাইম খাটিয়া সংসারের আয় বাড়াইতে গিয়া মদ্যাসক্ত হইয়াছেন, ক্রমে এই পথেই তাঁহার সর্বনাশ অনিবার্য হইয়া উঠিল, অবহেলা ও অশিক্ষায় পুত্রেরা বিপথগামী হইয়াছে, অনাহার বশতঃ এই পবিবারের গৃহকর্ত্রী লক্ষ্মীপ্রিয়া চিররুগ্না। বয়স্থা কন্যা তাহাব দুঃখের সমভাগিনী, ইহাদের জীবন-যুদ্ধের 'এক বেদনাময় দৃশ্যের উপর কাহিনীর যবনিকা নামিয়া আসিয়াছে।' কিন্তু নাট্যকার আশাবাদী। সেইজন্য নাটকেব ভরতবাক্যে আমাদিগকে শুনাইয়াছেন, 'আমাদের এগিয়ে চল্‌তে হবে। হার মানা চল্‌বে না।' 'লক্ষ্মীপ্রিয়ার সংসার' তুলসী লাহিড়ীর অন্যান্য নাটকের তুলনায় শক্তিহীন; ইহা যে উদ্দেশ্য-প্রণোদিত রচনা, তাহা ইহার কোন অংশেই গোপন থাকিতে পারে নাই। জীবনের বহির্মুখী পরিচয় ইহাতে যত প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, অন্তর্মুখী পরিচয় তত প্রাধান্য লাভ করিতে পারে নাই; তথাপি সমস্যা-কণ্টকিত জীবনের মধ্যে মনুষ্যত্বের মহিমা সন্ধানে ইহা সম্পূর্ণ ব্যর্থ নহে।

সলিল সেন এই যুগের একজন শক্তিশালী নাট্যকার। কেবল মাত্র গতানুগতিক কৃষক জীবন ভিত্তি করিয়াই যে তিনি নাটক রচনা করিয়াছেন, তাহা নহে—বরং প্রকৃত কৃষক জীবন আশ্রয় করিয়া তাঁহার একখানি নাটকও রচিত হয় নাই, বাঙ্গালী জীবনের বহু-বিচিত্র ক্ষেত্র হইতেই তিনি নাটক রচনার উপাদান সংগ্রহ করিয়া নবনাট্য আন্দোলনের মধ্যে বৈচিত্র্য

সৃষ্টি করিয়াছেন। নতুবা ইতিমধ্যেই কেবলমাত্র কৃষক শ্রমিক ও কেরাণী জীবনভিত্তিক নাটক বাংলা নাট্য সাহিত্যে বৈচিত্র্যহীনতার সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। দরিদ্র শিক্ষক, দোকানদার, মাউলী, স্টেশন মাস্টার ইহাদের জীবনাচরণে যে পরস্পর পার্থক্য আছে, ইহাদের সুখ-দুঃখেরও যে প্রকারভেদ হইয়া থাকে, তাঁহার মধ্যে ইহাব সার্থক অনুভূতি দেখা যায়। মানব-চরিত্রের এই সূক্ষ্ম পার্থক্য-বোধেব উপবই তাঁহাব নায়ক-চরিত্রের পরিকল্পনা হইয়াছে। তাঁহার নাটকের আব একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁহার অধিকাংশ নাটক পুরুষচরিত্র-প্রধান, পুরুষ চবিত্রেব অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য উদ্ধার করিযা তাহাব সংগ্রাম কবিবার শক্তিটিকে তিনি যে ভাবে জাগাইয়া তুলিতে পারেন, স্ত্রী চরিত্রের মধ্য হইতে তাহা পাবেন না। সেইজন্য তাঁহার নাটকগুলি নানা দিক দিযাই নূতন জীবনের আস্বাদ দেয়।

সলিল সেনেব প্রথম নাটক 'নতুন ইহুদি' ১৯৫৩ সনে প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহার পূর্ববর্তী বৎসর হইতেই কলিকাতার ব্যবসাযী সাধারণ রঙ্গমঞ্চে ইহা অভিনীত হইতে থাকে। তুলসী লাহিড়ীর পরই এই যুগের নাট্যকাবদিগের মধ্যে তাঁহার নাটক সাধাবণ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইবাব গৌরব লাভ কবে। বাস্তুত্যাগী এক দবিদ্র শিক্ষক-পরিবাব অবলম্বন করিয়া ইহা বচিত হয়। ইহার কাহিনী এই—

মনোমোহন ভট্টাচার্য পূর্ব পাকিস্থানেব এক মাধ্যমিক স্কুলেব ভি. এম্. পাশ পণ্ডিত। স্কুলে সংস্কৃত পাঠ বন্ধ হইয়া যাওয়ায় মনোমোহন কর্মচ্যুত হইয়া দেশ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। চাকুবীব আশায তিনি স্ত্রী অন্নপূর্ণা, অনূঢ়া কন্যা পরী এবং দুই পুত্র—অর্ধপাগল মধ্যম পুত্র দুইখ্যা ও কনিষ্ঠ পুত্র মোহনকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন। স্কুলের দুইমাসের মাহিনা ও বাস্তুভিটা বিক্রয়ের অর্থই মনোমোহনেব হাতে একমাত্র সম্বল। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মহেন্দ্র একজন রাজনৈতিক কর্মী ছিল এবং ইংরাজ রাজত্বেই জেলে তাহার মৃত্যু হয়। মাধ্যমিক স্কুলের মৌলভী মীর্জা সাহেব মনোমোহনের একজন সহকর্মী ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু। মনোমোহনের দেশত্যাগে তিনিই সর্বাধিক দুঃখিত হইলেন এবং বহু চেষ্টা সত্ত্বেও বন্ধুর প্রাপ্য গ্র্যাটুইটির টাকা স্কুল হইতে আদায় করিয়া দিতে পারিলেন না বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলেন। কলিকাতায় পৌছিয়া কয়েক মাসের মধ্যেই মনোমোহনের সঞ্চিত অর্থ নিঃশেষ হইল। অনাহারে দুর্বল দেহ লইয়া সারাদিন চাকুরীর চেষ্টা করিয়া

মনোমোহন ব্যর্থ হইলেন এবং অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। আত্মমর্যাদার জন্য 'শহীদ পরিবার' বলিয়া সরকারের নিকট হইতে সাহায্য প্রার্থনাও করিলেন না। সংসারের অবস্থা ক্রমশই শোচনীয় হইতে লাগিল। ক্ষুধার তাড়নায় তুইখ্যা চুরি করিয়া টাকা আনিল। কিন্তু অসৎ উপায়ে অর্জিত অর্থ মনোমোহন ও অন্নপূর্ণা গ্রহণ করিলেন না, বরং তুইখ্যাকে ইহার জন্য ভর্ৎসনা করিলেন। তুইখ্যা সেই অর্থ ভগিনী পরীর বিবাহে প্রয়োজন হইবে বলিয়া সঞ্চয় করিতে লাগিল। অর্থাভাবে কনিষ্ঠ পুত্র মোহনের পড়াশুনা বন্ধ হইল। সে প্রথমে কুলীগিরি এবং পরে ধর্মঘট হওয়া এক কারখানায় চাকুরী লইল। শ্রমিক-কর্মী মহেন্দ্র যখন মৃত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আদর্শের কথা স্মরণ করাইয়া দিল, মোহন তীব্র অনাহারের মধ্যেও তখনই সেই চাকুরীতে ইস্তফা দিল এবং মহাজনের মাল ফিরি করিয়া রাস্তায় রাস্তায় বিক্রয় করিতে লাগিল। পরী ছিন্নবস্ত্রা হইয়া প্রায় অনাহারে মায়ের সহিত ভাঙ্গা ঘরের মধ্যে দিন কাটাইতে লাগিল এবং অসৎ ব্যক্তিগণের লুব্ধদৃষ্টি হইতে নিজের যৌবন রক্ষা করিয়া চলিল। মনোমোহন কঠিন অসুখে পড়িলেন এবং তুইখ্যার উপর চোবের উপর বাটপাড়ি হইল, সে আত্মরক্ষার চেষ্টায় খানিকটা অসতকতাবশতঃ ট্রামের তলায় পড়িল এবং তাহার একটি পা কাটা গেল। তুইখ্যার প্রাণের আশঙ্কা দেখা দিল, মনোমোহন এবং তুইখ্যার ঔষধপথ্যের জন্য অর্থের বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িল। অন্নপূর্ণা স্বামি-পুত্রের প্রাণের আশায় হাতের সোনা বাঁধানো লোহা খুলিয়া দিলেন। তাড়াতাড়ি অর্থের প্রয়োজনে মোহন বিনা লাইসেন্সে মাল বিক্রয় করিতে গিয়া হাজতবাস করিল। পরী শেষ পযন্ত নিরুপায় হইয়া সংসারের অভাব মিটাইতে দেহবিক্রয় করিতে বাধ্য হইল। ইতিমধ্যে হাসপাতালে তুইখ্যার মৃত্যু হইল। এই মৃত্যুসংবাদ পাইয়া অসুস্থ মনোমোহনও শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

বাংলা দেশের এক অনাবিষ্কৃত আঞ্চলিক জীবন ভিত্তি করিয়া সলিল সেনের 'মৌ-চোর' নাটকটি রচিত হইয়াছে। নাট্যকার 'পূর্বাভাসে' লিখিয়াছেন, 'আঠার ভাটি (সুন্দর বন) বাদা অঞ্চলের অসহায় মানুষের দুঃখ কষ্ট আনন্দ ভালোবাসা, সমবেদনার সাথে অঙ্কিত করছি "মৌ-চোর" নাটকেব মাধ্যমে। কাঠুরে, পেতেল, মৌলী আর অজস্র ভূমিহীন মজুর যারা অন্নহীন, একটা সুন্দর-সুখী ঘর বাঁধবার আশায় প্রাণ হাতে ক'রে যারা এগিয়ে যায় বাঘ-সাপ-লুটপাটের দেশে, নিরমনিষ্যির জঙ্গলে ভরসা ক'রে নিয়ে যায়,

"মোবরা গান্ধীর চেলা"দের কিস্তি নৌকোর "বাউলী" ক'রে, তাদের কথাই নাটকের উপজীব্য।' এই বিষয়বস্তু লইয়া একজন অখ্যাতনামা কথা-সাহিত্যিক একখানি ছোট গল্প রচনা করিয়াছিলেন, তাহাই নাট্যকারকে এই নাটকখানি রচনার প্রেরণা দিয়াছিল; তারপর তিনি উক্ত ছোটগল্প লেখকের সহায়তায় সুন্দরবন অঞ্চল ভ্রমণ করিয়া ইহার জীবন সম্পর্কে প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভ করিবার সুযোগ পান। তাঁহার এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাব উপর ভিত্তি করিয়াই তিনি নাটকখানি রচনা করেন। এই অভিজ্ঞতা যে তাঁহার কতখানি নিবিড় হইয়া উঠিয়াছিল, নাটকখানি পাঠ করিলে তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। ইহার কাহিনী এই প্রকার—

নিতাই বৈরাগীর অবস্থা হীন হইয়া পড়িযাছে, সংসাবে এক বয়স্থা কন্যা, নাম ময়না। তাহার বিবাহের কোন ব্যবস্থা হইতেছে না। মহাজন সনাতন নিতাইর নিকট পাঁচশত টাকা পাইত, ক্রমেই সুদ বাড়িতেছে, পবিশোধ করিবার কোন উপায় হইতেছে না। অবশেষে নিতাই সনাতনের হাবা পুত্র ফড়িং-এর সঙ্গে ময়নাব বিবাহ দিতে স্বীকৃত হইল। গ্রামের এক চাষী যুবক বতনকে ময়না ভালবাসিত। কিন্তু রতন দবিদ্র গৃহহীন, টাকা দিয়া পিতাব ঋণ শোধ করিয়া ময়নাকে বিবাহ কবিবার শক্তি নাই, ময়না তাহাকে সত্বর অর্থ সংগ্রহ করিতে বলিল। রতন বাউলীব ব্যবসায কবিতে মনস্থ করিল। মহাজনের নিকট হইতে টাকা ধার লইযা নৌকা ক্রয় করিয়া কয়েকজন সঙ্গী সহ সুন্দরবনের অভ্যন্তরে গিয়া মধু মোম সংগ্রহ কবাব ব্যবসায়ই বাউলীর ব্যবসায়। ইহাতে বিপদ আছে, কিন্তু ভূমিহীন মজুরের ইহা ছাড়া অর্থোপার্জনের আর কোন উপায় নাই। রতন ধর্মদাস এবং গোবাচাঁদকে সঙ্গে লইয়া এবং বংশীকে দলের বাউলী নিযুক্ত করিয়া মধু সংগ্রহের জন্য সুন্দববনের ভিতর প্রবেশ করিল। মহাজন সনাতন মণ্ডল পুত্র ফড়িং-এর সঙ্গে ময়নার বিবাহের জন্য তাগিদ করিতে লাগিল, অন্যথায় শাসাইল বন্ধকী ভিটেমাটি হইতে তাহাকে উচ্ছন্ন করিবে। ময়না রতনের ফিরিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু দীর্ঘদিন যাবৎ তাহাব কোন সংবাদ পাওয়া যাইতেছে না। গভীর জঙ্গলের মধ্যে গিয়া তাহাদের দুর্দশার একশেষ ভোগ করিতে হইতেছিল বলিয়া তাহাদেরও দেশে ফিরিতে বিলম্ব হইতেছিল। অবেশষে এক ফকির আসিয়া গ্রামে সংবাদ দিল যে, রতনকে বাঘে খাইয়াছে, ময়না মনের সকল শক্তি হারাইল এবং রুগ্ন পিতার ইচ্ছার উপরই আত্মসমর্পণ

করিল। সনাতন হাবা পুত্রের বিবাহের আয়োজন করিতে লাগিল। ময়না এখনও রতনের আশা পরিত্যাগ করিতে পারে না। রতনকে বাঘে আক্রমণ করিয়াছিল সত্য, কিন্তু প্রাণবধ করে নাই; বাউলীর নির্দেশ এই যে, যাহাকে একবার বাঘে ছুঁইবে, তাহাকে লইয়া আর কেহ দেশে ফিরিতে পারিবে না, তাহাকে বনেই ত্যাগ করিয়া আসিতে হইবে। কিন্তু বংশী মহানুভবতা প্রকাশ করিয়া রতনকে দলের মধ্যে গ্রহণ করিল এবং সামান্য যে মধু সংগ্রহ করিয়াছিল তাহা লইয়াই দেশের দিকে ফিরিল। পথে বনবিভাগের কর্মচারীর দল তাহাদের পরিশ্রমের অর্জনের উপর ভাগ বসাইল, সংবাদ পাইয়া সনাতন মহাজন টাকা আদায় করিবার জন্য আগাইয়া আসিল, মধু বিক্রয় করিয়া যে সামান্য অর্থ পাওয়া গিয়াছিল, তাহার সমস্তই সনাতন বংশীর নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া রসিদ দিতেও অস্বীকার করিল। রতন ফিরিয়া আসিয়া শুনিল, সেই দিনই ফড়িংএর সঙ্গে ময়নার বিবাহ হইবে। ছুটিয়া সে ময়নার নিকট গিয়া তাহার সঙ্গে মিলিত হইল। এ'দিকে আক্রোশ বশতঃ বংশী সনাতনকে হত্যা করিল, পুলিশ আসিয়া তাহাকে বাঁধিয়া লইয়া গেল।

বাংলার আঞ্চলিক জীবন আশ্রয় করিয়া ইতিপূর্বে তুলসী লাহিড়ী যে এই যুগের কয়েকখানি সার্থক নাটক রচনা করিয়াছেন, সে কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। ইহার মধ্যে তাহারই আর একটি পরিচয় পাওয়া যায় সত্য, তথাপি এ কথাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, ইহার জীবন বাংলা সাহিত্যে কেবল মাত্র যে নূতন তাহাই নহে, ইহার পরিচয় অধিকতর নিবিড়। বাউলীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অর্থহীন সংস্কারগুলি তাহার জীবনকে যে জটিল করিয়া তুলিয়াছিল, এক বিপদ্‌সঙ্কুল পথে চলিতে গিয়া দৈবনির্ভরতা মানুষকে যে কোন কোন সময় মনুষ্যত্বহীন করিয়া তুলে, তাহা সুগভীর দৃষ্টি দ্বারা নাট্যকার এখানে উদ্ধার করিয়াছেন। জীবনের চরম দুর্গতির মধ্যেও মনুষ্যত্বের সন্ধান যেমন এই যুগের নাটকের একটি প্রধান বিশেষত্ব, ইহাও তাহারই পরিচয়ে সার্থক। এই নাটকের বংশী বাউলীর চরিত্রের মত শক্তিশালী চরিত্র এই যুগের নাটকে খুব অল্পই সৃষ্ট হইয়াছে। বন-বিভাগের কর্মচারী ও সনাতন মণ্ডলের সঙ্গে বাউলী ব্যবসায়ীদিগের ব্যবহারের যে পরিচয় এই নাটকের শেষাংশে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে যে একটু অতিরঞ্জন ও অতিনাট্যিক ত্রুটি প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু সামগ্রিক ভাবে বিচার করিলে এই ত্রুটি নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়াই মনে হইবে। ইহার

বিষয়বস্তু অভিনব বলিয়াই দর্শকের নিকট প্রথম আকর্ষণ সৃষ্টি করিলেও, ইহার মধ্যে যে সুগভীর জীবন-দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা নাটকখানিকে একটি বিশেষ মর্যাদা দান করিতে সমর্থ হইয়াছে। বাংলার লোক-জীবন যে কত বিচিত্র, ইহার মধ্য দিয়া তাহারও পরিচয় পাওয়া যায়। এই যুগে কেবল মাত্র গতানুগতিক কৃষি ও শ্রমিক জীবনকেন্দ্রিক যে সকল নাটক রচিত হইয়া থাকে, তাহার মধ্যেও ইহা একটি দুর্লভ ব্যতিক্রম সৃষ্টি করিয়াছে।

কেবল মাত্র নিম্নশ্রেণীর জীবন অবলম্বন করিয়াই যে সলিল সেন নাটক রচনা করিয়াছেন, তাহা নহে। অভিজাত জীবন অবলম্বন করিয়া তাঁহার 'সন্ন্যাসী' নামক নাটক রচিত হয়। ইহার বিষয়-বস্তু এই—

ডাঃ মণিমোহন, সত্য ও শঙ্কর রায় তিনজনে অভিন্নহৃদয় বন্ধু। মণিমোহন ডাক্তার, সত্য ব্যারিস্টার ও শঙ্কর ইঞ্জিনীয়ার হইয়া ভবিষ্যতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে, ইহাই তাহাদের স্বপ্ন ও সঙ্কল্প ছিল। তাহাদের পারস্পরিক বন্ধুত্ব সকলের নিকট ঈর্ষ্যার বস্তু ছিল। সত্য শ্রীমতী নামে একটি মেয়েকে ভালবাসিত। বিলাত হইতে ব্যারিস্টারী পাশ করিয়া আসিয়া সে শ্রীমতীকে বিবাহ করিবে ইহাই ঠিক ছিল। সত্যের বিলাত যাইবার পূর্বে একটি দুর্ঘটনা ঘটিল। শ্রীমতী অন্তঃসত্ত্বা। সত্যের সন্তান তাহার গর্ভে। এই কলঙ্ক হইতে মুক্তি পাইবার উদ্দেশ্যে উভয়েই আত্মহত্যা করিবে, সত্য ইহা শ্রীমতীকে জানাইল। শ্রীমতী গর্ভস্থ সন্তান লইয়া আত্মহত্যা করিতে অস্বীকার করিল। সত্য রিভলবার লইয়া শ্রীমতীকে গুলি করিতে গিয়া ব্যর্থ হইল। কিন্তু নিজে আত্মহত্যা করিল। মণিমোহন শ্রীমতীর নিকট সকল ঘটনা শুনিয়া তাহাকে লইয়া নিরুদ্দেশ হইল। হাসপাতালে মৃত্যুশয্যায় সত্য শঙ্করকে বলিল যে, শ্রীমতী তাহার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে। মণিমোহন ও শ্রীমতী একসঙ্গে নিরুদ্দেশ হওয়াতে শঙ্করের স্থির বিশ্বাস হইল যে, মণিমোহন শ্রীমতীর প্রতি আসক্ত এবং সে বন্ধুকে প্রতারণা করিয়াছে। মণিমোহনকে খুন করিবে বলিয়া শঙ্কর প্রতিজ্ঞা করিল। মণিমোহন শ্রীমতীকে লইয়া বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া পড়িল। কোন বন্ধু বা আত্মীয়-স্বজনের নিকট হইতে কোনরূপ সাহায্য পাইল না। এমন কি, শঙ্করের ঠিকানায় চিঠি লিখিয়াও কোন উত্তর আসিল না। শেষে নিরুপায় হইয়া সে বাংলা দেশের বাহিরের কোন প্রদেশের একটি ছোট শহরে চলিয়া গেল। নিজের চেষ্টায় কারখানার মালিক হইল। নিজে ডাক্তার হইয়াও ডাক্তারী

বৃত্তি ত্যাগ করিল। নূতন স্থানে সোমেন্দ্রনাথ রায় এই ছদ্মনামে পরিচিত হইল। শ্রীমতীও আশা দেবী নাম গ্রহণ করিল। মণিমোহন বাহিরে নিজের স্ত্রী বলিয়া পরিচয় দিলেও শ্রীমতীর সহিত বন্ধুর স্ত্রী সম্পর্কই রক্ষা করিয়া চলিল। শ্রীমতীর গর্ভে সত্যের কন্যা নিয়তিকে নিজের সন্তানস্নেহে মণিমোহন মানুষ করিযা তুলিল। ইহার পর বিশবছর কাটিয়া গেল। শঙ্কর অনেক অনুসন্ধানের পর একদিন মণিমোহনের ঠিকানা পাইয়া বাংলা দেশের বাহিরে তাহার বাড়ীতে উপস্থিত হইল। সোমেন্দ্রনাথ রায়ই যে মণিমোহন তাহা মুহূর্তের মধ্যে চিনিয়া লইতে তাহার দেরী হইল না। মণিমোহনও আগন্তুক ধূর্জটিপ্রসাদকে শঙ্কর বলিয়া চিনিতে পারিল। শঙ্কর মণিমোহনকে সত্যের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিবাব অপরাধে হত্যা কবিবে বলিয়া জানাইল। শ্রীমতী শঙ্করের উদ্দেশ্য জানিতে পারিয়া তাহাদের অতীত জীবনের সকল ঘটনা বিবৃত করিল এবং নিয়তি যে সত্যেরই কন্যা এবং মণিমোগন যে এতকাল সন্ন্যাসীব ন্যায় জীবনযাপন কবিয়া সত্যেবই স্ত্রী ও কন্যাকে প্রতিপালন করিয়া আসিয়াছে তাহাও জানাইল। শঙ্কর নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া তাহার সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

ইহার কাহিনীব মধ্যে যে রোমাণ্টিকতার স্পর্শ আছে, তাহাই নাটক খানিকে সলিল সেনের অন্যান্য নাটকের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য দান করিয়াছে।

ইহার পরবর্তী রচনা 'দর্পণ'। ইহার কাহিনীও রোমাণ্টিকতার স্পর্শ হইতে মুক্ত নহে। তাহা এই—

বিষ্ণু এক গ্রাম্য দোকানদার। তাহার একমাত্র ছেলে মধু। মধুও মুদীখানায় বসিয়া কেনাবেচা করে। এই মুদীর দোকানে গ্রামের বড ছোট সকলেরই যাতায়াত আছে। কেহ কেহ দোকানের সম্মুখে বেঞ্চিতে বসিয়া নানা বিষয় লইয়া আলোচনাও করে। পাটের অফিসের কেরাণী হরিমাধব, চাষা-গৃহস্থ নারাণ, মুরু, গ্রাম্য শিক্ষক ভট্টাচার্যবাবু, জমিদার শুভঙ্করবাবু, ডাক হরকরা দীনু, চৌকিদার প্রায় সকলকেই কোন না কোন প্রয়োজনে বিষ্ণুর দোকানে আসিতে হয়। বিষ্ণুর ছেলে মধু অত্যন্ত চালাক-চতুর। কথাবার্তার মধ্যে বাচালতা প্রকাশ পাইলেও সে বেশ বুদ্ধিমান। দোকানের পাশে দোতালা বাড়ীর রেডিও হইতে বাংলা সংবাদ অত্যন্ত আগ্রহের সহিত শুনিত। বোম্বাইএর নৌ-বিদ্রোহ, দেশের বিভিন্ন স্থানের রাজনৈতিক অবস্থা প্রভৃতি সকল খবরাখবর তাহার নখদর্পণে। দেশের

অবস্থা লইয়া মধু অনেক সময় ক্রেতাদিগের সহিত আলোচনা করিত। গ্রামে নির্বাচন-পর্ব অর্থাৎ ভোট গ্রহণ স্থরু হইল। জমিদার শুভঙ্করবাবু নির্বাচনে দাঁড়াইয়াছেন। ভোটের পুর্বে তিনি সভা করিয়া সাধারণ গরীব দুঃখীদের সেবা করিবার আশ্বাস দিলেন। কিন্তু নির্বাচনে দাঁড়াইবার পর গ্রামে তাঁহার আর অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। বেশির ভাগ সময় তিনি কলিকাতায় থাকেন। গ্রামের উন্নতি অপেক্ষা স্বজন-পরিজন পোষণেই অধিকাংশ সময় তিনি ব্যয় করিতে লাগিলেন। দেশের স্বাধীনতার পর বিভিন্ন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের কণ্ট্রোল হইয়া যাওয়ায় গ্রামের লোকের দুঃখ-দুর্দশা চরম হইয়া উঠিল। শুভঙ্করবাবুর দ্বারা কোন উপকারই হইল না। বিষ্ণুর মুদী-দোকানে আর পূর্বের মত কেনাবেচা নাই। স্বাধীনতার পর সকল জিনিসেরই কণ্ট্রোল হইবার দরুণ তাহার দোকানে বিশেষ বিশেষ জিনিসপত্র আর পাওয়া যায় না। মধু অনেক চেষ্টা করিয়াও বিনা ঘুষে কণ্ট্রোলের পারমিট বা লাইসেন্স সংগ্রহ করিতে পারিল না। দোকানের অবস্থা খারাপ দেখিয়া বিষ্ণু মনে মনে চিন্তা করিল যে, বড়লোকের মেয়ের সহিত ছেলের বিবাহ দিয়া মধুকে গোলদার করিয়া দিবে। মধু বিবাহ করিতে চাহিল না। দেশেব সাধারণ মানুষের অবস্থা দেখিয়া তাহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। গরীব গৃহস্থদের সাধ্যমত সে সাহায্য করিতে লাগিল। একদিন মধু কলিকাতা যাইবার আকাঙ্ক্ষা করিল। চোরাবাজারী দাঙ্গা-হাঙ্গামায় দেশের সাধারণ মানুষের অবস্থা ক্রমশই খারাপ হইতেছে দেখিয়া ইহাব প্রতিকার কল্পে এক আরজি লইয়া শুভঙ্করবাবুর নিকট জানাইবে বলিয়া কলিকাতায় যাত্রা করিল। মধু যেদিন কলিকাতায় পৌছাইল, সেই দিনই স্পেশাল আইন পাশ লইয়া কলিকাতায় ভীষণ গোলমাল হইতেছিল এবং পুলিশ জনসাধারণের উপর গুলি চালাইতেছিল। মধু সেই গুলির আঘাতেই প্রাণ দিল। বিষ্ণু ও তাহার স্ত্রী জগমোহিনী রেডিওতে মধুর মৃত্যুসংবাদ পাইয়া কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়িল।

সলিল সেনের পরবর্তী নাটক 'দিশারী'র মধ্যেও বিশেষ বৈচিত্র্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। ইহার কাহিনী এই—

চিত্তপ্রিয় একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী এবং বনেদী ঘরের সন্তান। পিতা-প্রপিতামহদিগের বেহিসাবী স্বভাব সেও উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করিয়াছিল। সেও অত্যন্ত বেহিসাবী এবং আয়ের তুলনায় ব্যয় করিত বেশি।

সংসারের অকারণ খরচপত্র লইয়া স্ত্রী কমলার সহিত প্রায়ই মনোমালিন্য হইত। কোম্পানীর মালপত্র ক্রয় করিবার দায়িত্ব থাকায় চিত্তপ্রিয়ের নিকট সর্বদাই প্রচুর অর্থ থাকিত। চিত্ত নিজেকে একজন বিরাট মহাজন বলিয়া মনে করিত এবং এই মিথ্যা মর্যাদাবোধের দরুণ তাহার অত্যধিক বাজে খরচ হইত। সে পাড়ার অধিকাংশ লোককেই কোম্পানীর অর্থ হইতে ধার দিত এবং পাডার ছেলেদের খেলাধুলা ব্যাপারে অকৃপণভাবে খরচ করিত। এই ভাবে কোম্পানীর বহু অর্থ চিত্ত খবচ করিয়া ফেলিল। একদিন অফিসের সেক্রেটারী ও এ্যাকাউণ্টটেণ্ট মিঃ দত্ত তাহার নিকট হিসাব চাহিলেন। চিত্ত হিসাব চাহিবার দরুণ নিজেকে অপমানিত বোধ করিল এবং চাকুরী ছাড়িয়া দিল। চাকুরী ছাড়িয়া দিয়াও চিত্ত তাহার স্বভাব অনুযায়ী নিজের খরচের পরিমাণ কমাইতে পারিল না। অপবের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া ক্রমান্বয়ে দেনাগ্রস্ত হইয়া পডিল। এক সময়ে সে যাহাদের টাকা ধার দিয়াছিল, তাহারা কেহই টাকা পবিশোধ করিল না, বরং তাহার নামে বদনাম করিতে লাগিল। চিত্ত দর্জির কাজ জানিত। টাকার অভাবে নিজে ব্যবসাও করিতে পারিল না। এদিকে দিনের পর দিন সংসারের অবস্থা খারাপ হওয়ায় স্ত্রীপুত্রকন্যাসহ সে উপবাস করিতে লাগিল। কথামত টাকা দিতে না পারিবার জন্য চিত্ত পাওনাদারদের কাছে প্রতিদিন অপমানিত হইতে লাগিল। বনেদী-মাতাল মনোহরের কাছ হইতে টাকা পাইবার লোভে চিত্ত একদিন মদ খাইয়া বাডী ফিরিল। কমলা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইল। চিত্ত নিজের প্রতি ঘৃণায় গলায় কাপডের ফাঁস লাগাইয়া আত্মহত্যা করিতে গেল। কিন্তু স্ত্রীর চোখে পডায় সে যাত্রা রক্ষা পাইল। চিত্তের স্ত্রী কমলা সংসারের অভাবের কথা তাহার দাদা মফঃস্বল স্কুলের শিক্ষক সুধীরকে জানাইল। সুধীর তাহার সেভিংস্ সার্টিফিকেটের জমানো টাকা দিয়া তাহাদের সাংসারিক বিপর্যয়ের হাত হইতে রক্ষা করিল।

সলিল সেনের এ যাবৎ সর্বশেষ নাট্যরচনা 'ডাউন ট্রেণ'। ইহাও সাধারণ রঙ্গমঞ্চে কিছু দিন অভিনীত হইয়াছিল। একটি সত্য ঘটনা ভিত্তি করিয়া নাটকটি রচিত হইয়াছে বলিয়া নাট্যকার দাবী করিয়াছেন। কাহিনীটি এই প্রকার—

সত্যভূষণ মফঃস্বলের এক স্টেশন মাস্টার : স্ত্রী অপর্ণা রুগ্ন, নিজের দারিদ্র্য ও অবহেলায় স্ত্রীর কোন যত্ন লইতে পারেন না। একমাত্র পুত্র খোকা

শিবপুরে থাকিয়া ইঞ্জিনীয়ারিং পড়ে। সত্যভূষণ অত্যন্ত কর্তব্যনিষ্ঠ ও সত্যপরায়ণ। সেদিন স্ত্রীকে জংশনের রেল-হাসপাতালে পাঠাইবার কথা, পুত্রকে আসিতে লিখিয়াছিলেন; ট্রেণের সময় হইয়াছে, অথচ সে তখনও আসিয়া উপস্থিত হয় নাই। রিলিফ্ না আসা পর্যন্ত তিনিও স্টেশন ছাড়িয়া যাইতে পারেন না। ঘোষবাবু একজন নিয়মিত যাত্রী, সত্যভূষণের বন্ধু, প্রবীণ ব্যক্তি, তিনি রুগ্না বন্ধুপত্নীকে জংশনের হাসপাতালে পৌছাইয়া দিতে স্বীকৃত হইলেন। ঘোষবাবু তাহাকে লইয়া চলিয়া গেলেন। অর্থের চিন্তায় সত্যভূষণ অধীর হইয়া পড়িলেন—স্ত্রীর অসুখের জন্য ব্যয়, পুত্রের লেখাপড়ার ব্যয়, বিধবা ভগিনীর সংসারের সাহায্য ইত্যাদি কোনদিনই তাঁহার সামান্য মাসিক মাহিয়ানায় সঙ্কুলান করা সম্ভব নহে। পাটের ব্যবসায়ী নরেন পাল দাদনের বহু টাকা সঙ্গে লইয়া রাত্রির জন্য আসিয়া সত্যভূষণের আশ্রয় প্রার্থনা করিল; নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও সত্যভূষণ নরেন পালের বিশ হাজার টাকা স্টেশন ঘরের লোহার সিন্ধুকে এক রাত্রির জন্য গচ্ছিত রাখিলেন, নরেন পালকে নিজের কোয়ার্টারে গিয়া শুইতে বলিলেন। সত্যভূষণের তখন যে পরিমাণ অর্থের প্রযোজন, তাহা কোনদিনই তাঁহার মত ব্যক্তির সৎ উপায়ে উপার্জন করা সম্ভব নহে, এ কথা তিনি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন। ক্রমে রাত্রি ঘনাইতে লাগিল। নির্জন স্টেশন গৃহে তিনি নিঃসঙ্গ বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। 'এখন যে ক'রেই হোক—যত টাকা লাগে, অপর্ণাকে আমার ভাল ক'রে তুল্‌তেই হবে।' তাহার মনে এক ভয়ঙ্কর সংকল্প জাগিয়া উঠিল। নরেন পালকে হত্যা করিলে তাহার গচ্ছিত বিশ হাজার টাকা তিনি অধিকার করিতে পারেন, ইহাতে তাহার সমস্ত অভাব মিটিবে। রাত্রি গভীর হইল। তিনি স্টেশন গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। অনেক ক্ষণ পর আবার ফিরিয়া আসিলেন। ভোর হইয়া আসিল, লোকে বলাবলি করিতে লাগিল, ডিস্‌টেন্ট্ সিগ্‌নেলের নিকট একটা লোক রাত্রের কোন ট্রেণে কাটা পড়িয়াছে। লোকটা কে? সত্যভূষণ অবিচলিত ভাবে স্টেশন গৃহে বসিয়া রহিলেন। নরেন পাল আসিয়া তাহার গচ্ছিত টাকা চাহিল। দেখিয়া সত্যভূষণ চমকিয়া উঠিলেন। তাহার ত আসিবার কথা নহে! এমন সময় চৌকিদার ছুটিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, খোকাবাবু ট্রেণে কাটা পড়িয়াছে। এ কি হইল? নরেন পাল ডাকাতের ভয়ে তাহার কোয়ার্টারে আশ্রয় না লইয়া সেই রাত্রে তাহার কয়ালের বাড়ীতে গিয়া রাত্রি

যাপন করিয়াছিল ; গভীর রাত্রে খোকা আসিয়া কোয়ার্টাবে শুইয়াছিল, নরেন পাল মনে করিয়া নিজের একমাত্র পুত্র খোকাকেই কি সত্যভূষণ হত্যা করিয়া অন্ধকারেই তাহার দেহ রেলপথের উপর ফেলিয়া রাখিয়া আসিয়াছিলেন ? সত্যভূষণ পাগল হইয়া গেলেন।

নাট্যকাব লিখিয়াছেন, '"চিরুটি মার্ডার কেস" সত্য ঘটনা কিন্তু মর্মান্তিক। আর পাগলেব মুখে খাপছাড়া খাপছাড়া ভাবে শোনা সত্ত্বেও এই নাটকে অতিরঞ্জিত কাহিনীটুকুর সবটাই কাল্পনিক।' ঘটনাকালেব ঐক্য ও সংক্ষিপ্ততা এই নাটকের একটি বিশিষ্ট গুণ। সন্ধ্যা হইতে সকাল পর্যন্ত এই নাটকেব ঘটনার সময়, অথচ ইহাব মধ্য দিয়াই ঘটনাগত ঐক্য রক্ষা কবিয়া কাহিনী সুস্পষ্ট পবিণতি পর্যন্ত পৌছিয়াছে। সত্যভূষণ-চরিত্রেব অন্তর্দ্বন্দ্ব, কাহিনীর নাটকীয় গুণ সর্বত্র বক্ষা করিয়াছে, বলিষ্ঠ এক বাস্তব জীবনবোধ ইহার মধ্যে যথার্থ নাটকীয় শক্তি সঞ্চার করিয়াছে। অন্ধকার গৃহে নবেন পাল বলিয়া নিজের পুত্রকে হত্যা করিবাব এবং হত্যার পর মৃত্যুর প্রমাণ লোপ করিবাব যে প্রয়াস সত্যভূষণেব মত চরিত্রে দেখা যায়, তাহা কতকটা অস্বাভাবিক মনে হইতে পারে , কিন্তু প্রত্যক্ষ দৃশ্যেব মধ্য দিয়া ইহাদের অনুষ্ঠান হয় নাই বলিয়া ইহাদের অস্বাভাবিকতা বোধ ততখানি কাসকর বলিয়া মনে হয় না। হত্যা করিবার প্রবৃত্তি আকস্মিক উত্তেজনাজাত হইলেও, মৃত্যুর প্রমাণ লোপ করিবার প্রবৃত্তি স্থিরমস্তিষ্ক-প্রসূত। সত্যভূষণের মত আজীবন সত্যানুরাগী ব্যক্তির মনে এই উভয় প্রবৃত্তি পবপর কি ভাবে কার্যকবী হইতে পাবে, তাহা বিবেচনার বিষয়। তথাপি এই নাটক যে ঘটনা সংস্থাপনা, চরিত্র-সৃষ্টি ও বাস্তব জীবনেব রূপায়ণে এই যুগের একটি উল্লেখযোগ্য রচনা, তাহা অস্বীকাব করিবাব উপায় নাই।

জীবনের নূতন নূতন ক্ষেত্র হইতে বিষয়বস্তু সংগ্রহ কবিবার যে প্রবণতা এই নাট্যকারেব মধ্যে দেখা যায়, তাহা এই যুগের আর কোনও নাট্যকারেব মধ্যেই নাই।

সাম্প্রতিক কালের তরুণ নাট্যকারগণের মধ্যে কিরণ মৈত্রও সুনাম অর্জন করিয়াছেন। তাঁহার বেশীর ভাগ নাটকই জীবন-সমস্যার পঙ্কে নিমজ্জিত ক্রমক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্ত পরিবারের ব্যথা-বেদনা-কেন্দ্রিক। তাঁহার 'বারঘণ্টা' নাটক ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত হয়। মধ্যবিত্ত পরিবারের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার দুঃখ জ্বালা ব্যতীত ইহাতে আর কিছুই নাই ; অনবরত কঠিন কঠোর

জীবনসংগ্রামের ফলে তাহারা কতকটা বাধ্য হইয়াই যে অবক্ষয়ের পথে চলিতেছে, এই নাটকে তাহারই এক বাস্তব পরিচয় পাওয়া যায়।

অমিয় একজন সাধারণ কেরাণী। রুগ্না স্ত্রী, অনূঢা ভগ্নী, অধোন্মাদ পিতাকে লইয়া তাহার সংসার। তিন ভাই আছে, কিন্তু তাহারাও অকর্মণ্য, একজন অন্ধ, একজন ছাত্র, একজন বেকাব। সুতরাং সকলেরই দায়ভার স্বল্পবিত্ত কেরাণী অমিয়কে বহন করিতে হয়। বাড়ীওয়ালা আছে, আছে অন্যান্য পাওনাদার ; মাসের মধ্যে ত্রিশদিনই নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম—দুঃখ আর দারিদ্র্য। এই সংগ্রাম কেবলমাত্র অমিয়র জীবনেই সত্য নহে। তাহার পরিবার কেন্দ্র করিয়া আরও যে সব চরিত্র নাটকেব মধ্যে আসিয়াছে তাহারাও সমভাবে দুঃখী। লটারীর টাকা পাইবার স্বপ্ন দেখে জগৎবাবু, ব্যবসায় করিয়া ঐশ্বর্যবান হইবার দিবাস্বপ্ন দেখে অলক ; বাড়ীওয়ালা দ্বারিকবাবুর অবস্থা সচ্ছল নহে। পৈতৃক ভিটা একখানি আছে, কিন্তু বিত্ত নাই। কালো মেয়ে মায়ার বিবাহ দিবার দুশ্চিন্তায় তাঁহারও দিনের পর দিন নিদ্রাহীন রাত কাটে। মোট কথা মধ্যবিত্ত জীবনে শান্তি নাই, শান্তির স্বপ্ন দেখাও যেন তাহাদের জীবনে অবাঞ্ছিত। কেবলমাত্র দিনযাপন এবং প্রাণধারণ, কায়ক্লেশে পরিশ্রম অথচ 'বারো ঘণ্টাই' দুঃখদারিদ্র্য ব্যথা বেদনার অশ্রুসজল মুহূর্ত।

মধ্যবিত্ত জীবনের এই ট্র্যাজেডী কেন্দ্র কবিয়াই 'বাবো ঘণ্টা' নাটকের বিষয়-বস্তু গড়িয়া উঠিয়াছে। কাহিনী সত্য, কিন্তু তাহার উপযুক্ত নাটকীয় বিকাশ না হইয়া তাহা চিত্রধর্মী হইয়াছে। সেই জন্য যে সকল চরিত্র আসা-যাওয়া করিয়াছে, তাহাদের দুঃখ-বেদনা মনে স্থায়ী ও গভীর ছাপ আঁকিয়া যাইতে পারে না। উপযুক্ত বিন্যাস-কৌশলের অভাবে চরিত্রগুলির ট্র্যাজেডী অনেক ক্ষেত্রেই জোর করিয়া আনা হইয়াছে—স্বাভাবিক ও সাবলীল স্ফুরণ হয় নাই।

তাঁহার 'চোরাবালি' নাটকেও এই একই সমস্যা। সোমনাথ বৃদ্ধ বয়সেও প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়া সংসার চালাইয়া যাইতেছেন। বিশ্রামের কণা মাত্র অবসর তাঁহার নাই। পিতা প্যারালিসিস্ রোগী। স্ত্রী, কন্যা এবং দুই পুত্র লইয়া সংসার। বড় ছেলে অজয় কোনক্রমে কিছু উপার্জন করিয়া আনে, ছোট অসীম স্কুলের ছাত্র, কন্যা গীতাও ছাত্রী ছিল, কিন্তু সংসারের অভাবে তাহাকেও উপার্জনের জন্য চাকরীর সন্ধানে বাহির হইতে হইয়াছে। কষ্টের সংসার তবু চলিতেছিল কায়ক্লেশে, কিন্তু তাহার এই নামেমাত্র চলাটুকুও ভাগ্যবিধাতার

ইচ্ছা ছিল না। একদিন সংবাদ আসিল বড ছেলে অজয় ট্রেন হইতে পড়িয়া পা দুটি চিরতরে নষ্ট করিয়াছে। এই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাশিত হইয়া পডিল যে চাকুরী যাইবার পর অজয় ট্রেনে ফেরী করিত। অজয়ের অভাবে সংসাবে আসে নূতন ধাক্কা। ছোট ছেলে অসীমবাবুর সহিত মিলিয়া ব্যবসা করিতে গিয়া অতঃপর জুয়ার আড্ডার সহিত জডিত হইয়া পড়ে। কন্যা গীতা সামান্য চাকরীতে সংসারের অভাব কুলায় না বলিয়া এ্যামেচার থিয়েটার স্থরু করিয়া দেয়। তাহার থিয়েটার করিবাব বিরুদ্ধে মধ্যবিত্ত জীবনের সংস্কার প্রবল হইয়া উঠে—একদিন অনেকটা বিনাদোষেই গীতাকে বাড়ী ছাডিতে হয়। ভাঙনের মুখে কিছুই রোধ করা যায় না। সোমনাথেব কষ্টের সংসাব এইভাবেই ধীরে ধীবে ভাঙনেব মুখে অগ্রসর হইয়া চলে। নাটকের শেষেব দিকে সোমনাথের জীবনে একটি স্থখেব ঘটনা ঘটিযাছে। উন্মার্গগামী কনিষ্ঠ পুত্র সংজীবনেব পথে অগ্রসব হইয়াছে—কিন্তু যে বিরাট ভাঙনের পথে আজ সমস্ত মধ্যবিত্ত সমাজ চলিয়াছে, সেখানে এই প্রতিশ্রুতি ক্ষণস্থায়ী মানসিক সান্ত্বনার কাবণ হইতে পাবে, ভাঙনের প্রতিরোধ কবিবাব ক্ষমতা ইহার নাই।—যে পথে মধ্যবিত্ত সমাজ আজ চলিয়াছে, তাহা চোরাবালিব পথ—ডুবিতেই হইবে—হাজার সংগ্রামেও মুক্তি নাই, ইহাই নাট্যকাবের বক্তব্য।

'সঙ্কেত' নাটকখানি একটু ভিন্ন প্রকৃতির। ইহা সামাজিক নহে, মানসিক সমস্যা লইয়া নাটকটির কাহিনী গডিয়া উঠিয়াছে। এই প্রসঙ্গে লেখক বলিয়াছেন, '······খোঁজ নিয়ে জেনেছি এদেশে মানসিক রুগীর সংখ্যা প্রচুর। এই যন্ত্রণাব যুগে তো তার সংখ্যা বেড়েই চলেছে। তাদেব জীবনকথায় নাটকীয়তাও কিছু কম নেই। তাই সাহস করে এ-পথে পা বাডিয়েছি।'

নায়িকা স্বপ্নার স্বামী বীবেশ সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। পথে জনৈক ব্যক্তির সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়, কোনক্রমে জানিতে পারে যে, বীরেশের নিকট কিছু অর্থ আছে। সেই ব্যক্তিটি—নাটকে যে মিঃ মজুমদাব নামে পরিচিত—বীরেশকে জনৈক স্বামীজির আশ্রমে লইয়া যাইবার অছিলায় পথে এক সেতুর উপর হইতে নদীতে ফেলিয়া দিয়া হত্যা করে। বীরেশের টাকাটাই সে শুধু আত্মসাৎ করিল না. একটি ব্যাগের মধ্যে স্বপ্নাকে লিখিত বীরেশের একটি চিঠি পাইয়া সে তাহা ডাকবাক্সে ফেলিয়া দিল।

বীরেশের বাড়ীতে যখন চিঠি আসিল, তখন তাহার ভাই জ্ঞানেশ সেই চিঠি পায়, স্বপ্নার নামের চিঠি হইলেও সে তাহা খুলিয়া পড়ে এবং জানিতে পারে যে, বীরেশ সন্ন্যাসী হইয়া গিয়াছে, সে আর সংসারে ফিরিবে না। জ্ঞানেশ প্রাণ ধরিয়া চিঠিখানি স্বপ্নাকে দিতে না পারিয়া নিজের সুটকেশের মধ্যে লুকাইয়া রাখিল। এদিকে স্বপ্নার দিন কাটে স্বামীর প্রতীক্ষায়। ধীরে ধীরে সে ঘুম রোগগ্রস্ত হইয়া পড়ে। স্বপ্নার এই ঘুমের কারণ কেহই বুঝিয়া উঠিতে পারে না। ঠিক তেমনি জ্ঞানেশের মধ্যেও পাগলামির অঙ্কুর দেখা যায়। নিজের সুটকেশ সে কাহাকেও খুলিতে দিত না এবং প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে পোস্ট অ্যাফিসে ঘোরাফেরা করিত। কথায় কথায় তাহার রাগ, চিঠির প্রতীক্ষা এবং অপরের চিঠি খুলিয়া পড়ার অভ্যাস ক্রমশ অস্বাভাবিক আকার ধারণ করিল। এই মানসিক ব্যাধির জটিল গ্রন্থি উন্মোচন করিল সফল নামে একজন মনস্তত্ত্ববিদ্। সে ঐ পরিবারের একজন বন্ধু এবং স্বপ্না ও বীরেশের শুভাকাঙ্ক্ষী। একদিন সফলের ডাক্তারখানায় জনৈক মানসিক রোগীর অকস্মাৎ প্রবেশ ঘটিল। সে জল দেখিলেই ডুবিয়া মরিবার ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিত। সফলের কেমন যেন ধারণা হয়, স্বপ্নার ঘুম রোগ, বীরেশের অন্তর্ধান এবং জ্ঞানেশের বায়ুগ্রস্ততার সহিত এই নবাগত আগন্তুকের যোগ আছে। মনঃসমীক্ষার ফলে সফল জানিতে পারে যে বীরেশ প্রায়ই স্বপ্নাকে বলিত যে ঘুমের মধ্যেই তাহাকে সবচেয়ে সুন্দর দেখায়। সফলের মনে হইল, স্বপ্নার এই অস্বাভাবিক ঘুমের কারণ তাহাই, ঐ সময়ই সে বীরেশের স্বপ্নসান্নিধ্য লাভ করে। নবাগত রোগীটির সমীক্ষায় জানা যায় যে, সে এক-জনকে জলে ডুবাইয়া হত্যা করিয়াছে এবং তাহার পর হইতেই জল দেখিয়া তাহার আতঙ্ক। ইহার পর সমস্যা সহজ হইয়া আসে। সফল জ্ঞানেশ মারফৎ স্বপ্নাকে জানায় যে, বীরেশকে হত্যা করা হইয়াছে—সে আর ফিরিবে না এবং এই সত্য প্রকাশের পর স্বপ্না এবং জ্ঞানেশ ক্রমশ স্বাভাবিক হইয়া আসে।

কাহিনীর মধ্যে নাটকীয়তা থাকিলেও, তাহা সুবিন্যস্ত নহে। মনস্তত্ত্বের জটিল সমস্যার সমাধানের জন্য লেখক যে সব ঘটনার আশ্রয় লইয়াছেন, তাহা কষ্টকল্পিত। বিশেষ করিয়া মিঃ মজুমদারের সকলের নিকট আকস্মিকভাবে আগমন এবং তাহার অসুস্থতার সহিত বীরেশের অন্তর্ধানের যোগ সম্বন্ধ বাহির করা যেন কেবল মাত্র নাটকের প্রয়োজনেই ঘটিয়াছে, সেইজন্যই নাটকের এই অংশটি দুর্বল।

'যা হচ্ছে তাই' নাটকটি বিদ্রূপাত্মক। নাট্যকার ইহাতে ভোটের ব্যাপার লইয়া প্রার্থীদের অনুপযুক্ততার কথা প্রকাশ করিয়াছেন। ঘটনা সাধারণ, নাটকীয়তা থাকিলেও, তাহা সুষ্ঠুভাবে বিন্যস্ত বলা চলে না।

'এক অঙ্কে শেষ' কতগুলি একাঙ্ক নাটকের সংকলন। জীবনসমস্যার বিবিধ রূপ লইয়া নাটকগুলি রচিত। 'কোথায় গেল' নাটিকার বিন্যাস কৌশলে নূতনত্ব আছে। তথাপি নূতন ক্ষেত্র হইতে বিষয়বস্তু সন্ধানের কৃতিত্ব নাট্যকারের প্রাপ্য।

উৎপল দত্ত কেবল মাত্র নাট্য-পরিচালক ও অভিনেতা রূপেই নহেন, নাট্যকাররূপেও পরিচয় লাভ করিয়াছেন। তাহার 'ছায়ানট' নাটক ছায়াচিত্র জগতে যবনিকার অন্তরালে বাস্তব জীবনের সুখদুঃখ আশানৈরাশ্যের যে অভিনয় হইয়া থাকে, তাহার রূপায়ণে সার্থক হইয়াছে। ইহা মুখ্যতঃ কৌতুক রসাশ্রিত রচনা হইলেও, ইহাতে জীবনের সুগভীর বেদনার একটি দিকও আছে। ছায়াচিত্রলোকের যে সকল নরনারী ছায়ালোকে অভিনয় করিয়া সহস্র সহস্র দর্শকের চিত্তবিনোদন করিতেছে, তাহাদেরও ব্যক্তি জীবনের ক্ষুদ্র বৃহৎ আশা আকাঙ্ক্ষা প্রেম ভালবাসা বঞ্চনার কথা কেহ কখনও ভাবিয়া দেখিবার অবকাশ পায় না। তিনি তাহাই এই নাটকের মধ্য দিয়া নাটকের দর্শকদিগের সম্মুখে ধরিয়াছেন। কাহিনীর পরিকল্পনা ও চরিত্র সৃষ্টি অনেক ক্ষেত্রেই নাটকীয় গুণ লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে।

উৎপল দত্তের নাটক 'অঙ্গার' দীর্ঘকাল ধরিয়া সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়া দর্শকদিগকে আনন্দ দান করিতেছে, বাংলা নাটকের বিষয়-বস্তুর দিক দিয়া ইহাতে তিনি যে নূতনত্বের অবতারণা করিয়াছেন, তাহা অভিনন্দন যোগ্য। কাহিনীটি এই—

আসানসোলের শেলডন কলিয়ারী। এক ভাব-বিলাসী দরিদ্র বাঙ্গালী যুবক বিনু এই খনিতে শট্‌ফায়ারারের শিক্ষানবিশীর কাজ করিতে আসিয়াছে। সঙ্গে বিধবা মা, আর ছোট বোন সুমনা। সে স্বপ্ন দেখে শুশুনিয়া পাহাড়ের নীচে একদিন ছোট্ট একটি ঘর বাঁধিবে, তুলসী তলায় মা সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বালাইয়া দিবেন, সুমনা শঙ্খধ্বনি করিবে। তাহাদের পাশের কোয়ার্টারে থাকেন টাইম কীপার, তাঁহার একমাত্র মেয়ে রূপা কিশোরী, চটুল নৃত্যে বিনুর আশে পাশে ঘুরিয়া বেড়ায়, বিনুর ঘরের আঙ্গিনায় একদিন রজনীগন্ধার ঝাড় ফুটাইবে—সেও স্বপ্ন দেখে। বিনুর শুভানুধ্যায়ী

সহকর্মী দীননাথ একদিন খনির দুর্ঘটনায় মবিল, মালিকেব অবিচাবে তাহাব মৃত্যু পর্যন্ত প্রমাণিত হইল না। বিনুব স্বপ্ন ভাঙ্গিল। সে সকল শ্রমিকদেব লইয়া দাবী করিল, খনিব নীচে যে বিষাক্ত গ্যাস জমিয়াছে তাহা বাহিব না কবিলে কেহ জীবন বিপন্ন করিয়া খনিতে নামিবে না। মালিক পক্ষ এই দাবী মানিল না। জুলুম চলিবাব উপক্রম হইল। শ্রমিকেরা ধর্মঘট আরম্ভ কবিল। দেডমাস কাটিয়া যায়, শ্রমিকদেব ঘবে ঘবে অন্ন বস্ত্রেব নিদারুণ অভাব দেখা দিল। মালিকও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে লাগিল, তাবপব মালিক পক্ষ শ্রমিকদিগেব সম্মুখে এক প্রলোভনেব জাল বিস্তাব কবিল। খনিব ভিতবে বায়ু প্রবেশেব জন্য একটি পাথবেব পাঁচিল ধ্বসাইতে হইবে—ইহাব জন্য কয়েকজন শ্রমিক আবশ্যক। যাহাবা এই কাজ কবিতে খনিব নীচে নামিবে, তাহাদিগকে মোটা অঙ্কেব বোনাস দেওয়া হইবে, দৈবাৎ কোন দুর্ঘটনা ঘটিলে পবিবাবকে অনেক টাকা ক্ষতিপূবণ দেওয়া হইবে। একদিকে প্রাণেব ভয, অন্যদিকে অর্থেব প্রলোভন। প্রায দুই মাস যাবৎ ধর্মঘটেব ফলে গৃহে অন্নবস্ত্রেব অভাব। দবিদ্র শ্রমিকেবা ভাবিতে লাগিল। সকলেই বুঝিল, এই কাজ অনুচিত, প্রাণনাশেব সম্পূর্ণ আশঙ্কা আছে, তথাপি দাবিদ্র্যেব জ্বালায বিনু আব কয়েকজন সহকর্মীব সঙ্গে খাদেব নীচে নামিল। কাজ কবিতে কবিতেই বুঝিতে পাবিল, খাদে আগুন লাগিল, বিস্ফোবণেব ভয়ঙ্কব শব্দ হইল, খাদেব মুখ দিয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া ধোযা উঠিতে লাগিল। আগুন হইতে খাদেব সম্পত্তি রক্ষা কাববাব জন্য মালিক পক্ষ ভূগর্ভস্থ জলেব বাধ ভাঙ্গিয়া দিল, হতভাগ্য শ্রমিকদিগকে নীচ হইতে তুলিবাব কোন চেষ্টা কবিল না। কাবণ, ইহাতে যে পবিমাণ অর্থ ক্ষতিপূবণ দিতে হইবে, তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী মূল্যেব কয়লা আগুন হইতে বক্ষা পাইবে। বিনু তাহার সহকর্মী কয়েকজনেব সঙ্গে খনিগভে ডুবিযা মবিল।

এই নাটক সম্পর্কে একজন সমালোচক বলিয়াছেন, 'পবিচ্ছন্ন চেতনা, মর্মলব্ধ জীবনবোধ এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিযে যে "অঙ্গাব" নাটক উৎপল দত্ত বচনা কবেছেন, বাংলা নাট্য সাহিত্যেব নিঃসন্দেহে এ এক উজ্জ্বল সংযোজন।' এই উক্তি অতিবঞ্জিত নহে। এই নাটক প্রযোজনাব মধ্যেও যে শিল্প-কুশলতার পবিচয় পাওয়া যায, তাহাও বাংলাব বঙ্গমঞ্চ জগতে এক নূতন অধ্যায় যোজনা কবিয়াছে।

অজিত গঙ্গোপাধ্যায় প্রধানতঃ আধুনিক পাশ্চাত্ত্য নাটকেব অনুসরণে

কয়েকখানি বাংলা নাটক রচনা করিলেও তাঁহার এই অনুসরণের একটু বিশেষত্ব আছে। বাংলা নাট্যসাহিত্যের পূর্ববর্তী যুগে অনুবাদ নাটক কিংবা অনুসরণ-জাত নাটক বুঝাইতে যাহা রচিত হইত, সাম্প্রতিক কালে তাহার ব্যতিক্রম দেখা যায়, এই ব্যতিক্রমের পরিচয় অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের নাটকে যতখানি স্পষ্ট, অন্য কাহারও নাটকের মধ্যে তত স্পষ্ট নহে। পাশ্চাত্ত্য নাটকের ভাবটুকু মাত্র অবলম্বন করিয়া তিনি তাহাকে একদিক দিয়া যেমন বাংলার সমাজ-জীবনে সার্থক স্বাঙ্গীকরণ করিয়া লইতে পারেন, তেমনই অন্য দিক দিয়া পাশ্চাত্ত্য ও প্রাচ্য ভাবের মধ্য দিয়াও তিনি সামঞ্জস্যের সন্ধান করিয়া থাকেন, এই সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়াসও অনেক ক্ষেত্রেই তাঁহার সার্থকতা লাভ করিয়াছে। সেইজন্য তাঁহার নাটকের মধ্যে একটি সুগভীর মননশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়, এইগুণে তাঁহার নাটক আধুনিক সমাজে কেবলমাত্র দৃশ্য নহে, পাঠ্যও বটে। অভিনয়ের যে গুণই ইহাদের ভিতর দিয়া প্রকাশ পা'ক না কেন, পাঠ্য নাটক (reading drama) হিসাবেও তাঁহার নাটকগুলি সমাদর লাভ করিবার যোগ্য।

অজিত গঙ্গোপাধ্যায় পাশ্চাত্ত্য নাট্যকার ইবসেনের 'হেডা গ্যাবলার' নাটকখানি অনুসরণ করিয়া তাঁহার 'শকুন্তলা রায়' নামক নাটকখানি রচনা করিয়াছেন। ইহার সম্পর্কে একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক লিখিয়াছেন, 'ইহা একাধারে বাংলা ও নাটক হয়েছে।' এ কথা সত্য। কারণ, আধুনিক পাশ্চাত্ত্য নাটকের অনেক অনুবাদ এমন দেখা যায় যে, তাহা নাটক হইলেও বাংলা নহে—পাশ্চাত্ত্য জীবন তাহাতে প্রকট হইয়া থাকে। এই নাটকখানির এই ত্রুটি নাই বলিলেই চলে।

তাঁহার পরবর্তী নাটক 'নির্বোধ'—পাশ্চাত্ত্য নাট্যকার ডস্টয়েভস্কির *Idiot* নামক নাটকের ছায়া অবলম্বন করিয়া রচিত। ডস্টয়েভস্কি তাঁহার *Idiot* নাটকের মধ্য দিয়া যে সমস্যার অবতারণা করিয়াছেন, তাহা সকল সমাজেরই সমস্যা হইতে পারে। নাট্যকার স্বচ্ছন্দে ইহার মধ্যে একটি বাঙ্গালী জীবনকে গ্রহণ করিয়া তাহার মধ্য হইতেও অনুরূপ সমস্যাটির সন্ধান করিয়াছেন। সংলাপের ভাষার বিশিষ্ট সাহিত্যধর্মিতা ইহার রচনা সুখপাঠ্য করিয়া তুলিয়াছে। ইহা এই নাট্যকারের রচনা মাত্রেরই একটি বিশেষ গুণ।

লেস্‌লে রিচার্ডসনের *For Our Mother Malaya* নাটক অবলম্বন করিয়া অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের 'মালয় মায়ের ডাক' নাটক রচিত হইয়াছে।

মালয়ের মুক্তি-সংগ্রামকে ভিত্তি করিয়া ইহা রচিত, ইহা বাঙ্গালীর জীবন ও বাংলা দেশের সঙ্গে স্বাঙ্গীকৃত করিয়া রচিত না হইলেও, মালয় দেশের চাষী ও শ্রমিক জীবনের যে সমস্যা তাহা এদেশেরও সমস্যা বলিয়া এদেশের জীবনেও ইহার আবেদন ব্যর্থ নহে। বৈদেশিক পরিবেশে রচিত হইলেও সুপরিচ্ছন্ন ভাষার গুণে ইহার মধ্যে বিজাতীয়ত্ব প্রকট হইয়া উঠিতে পারে নাই।

'থানা থেকে আসছি' নাটকখানিই অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় নাট্যরচনা। ইহা পাশ্চাত্ত্য নাট্যকার জে. বি. প্রিস্ট্‌লি রচিত *An Inspector Calls* নাটকের অনুসরণে রচিত। যে সুগভীর মনন-শীলতার উপর ভিত্তি করিয়া মূল নাটকখানি রচিত হইয়াছিল, তাহার অনুসরণকারী এই রচনার মধ্য দিয়াও তাহার পরিচয় অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। ইহা এই রচনাটির একটি প্রধান বিশেষত্ব। যে যুগে সাধারণ বহির্মুখী উত্তেজনা-মূলক ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া সাধারণতঃ অতিনাটক (melodrama) রচিত হইয়া থাকে, সেই যুগে এই শ্রেণীর মননশীল পাশ্চাত্ত্য নাটকের অনুসরণে বাংলা নাটক রচনা করিয়া বাংলা নাটক রচনার মধ্যে এই নাট্যকার যে একটি গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই নাটকখানিরও দৃশ্যগুণ অপেক্ষা পাঠ্যগুণ কোন অংশেই অল্প নহে। জীবনের একটি নিগূঢ় তত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া নাটকটি রচিত হইলেও, ইহার কাহিনী ও সংলাপ প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত নাটকীয় গতি লাভ করিয়াছে, অনুসরণকারী রচনা হইলেও 'থানা থেকে আসছি'র মধ্যে এই গুণটুকু সর্বত্র রক্ষা পাইয়াছে। ইহার কাহিনী দৃঢ়সংবদ্ধ এবং সংলাপ স্বচ্ছ, অথচ রহস্যাচ্ছন্ন একটি মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া পুলিশী জবানবন্দীর আকারে ইহা রচিত। ইহার কাহিনীর সূত্রটি এই—সহরের ধনী ব্যবসায়ী চন্দ্রমাধব সেন, তাহার চাইতেও বড় ব্যবসায়ী ও ধনী শেখর বসু, তাহাদের মেয়ে ও ছেলে শীলা আর অমিয়। ইহাদের এন্‌গেজমেণ্ট পার্টির আসর বসিয়াছে, চন্দ্রমাধব সেনের সুরম্য প্রাসাদের সুসজ্জিত বৈঠকখানায়। প্রত্যেকের মনে খুসী উপছাইয়া পড়িতেছে, আশা ও আনন্দের আর অন্ত নাই, এমন সময় পদ্মপুকুর থানার দারোগা তিনকড়ি হালদার আসিয়া জানাইলেন, তিনি থানা হইতে আসিয়াছেন একটি মেয়ের আত্মহত্যার তদন্তে। বৈঠকখানার আনন্দোজ্জ্বল ছবি সহসা ম্লান হইয়া গেল। কর্তব্যপরায়ণ দারোগা তাঁহার অপ্রিয় ও কঠিন কর্তব্য সমাধান করেন।

এই তদন্তের ফলে ধরা পড়িয়া যায় যে, চন্দ্রমাধব সেনের ঐশ্বর্যের ভিতের মধ্যে ফাটল আছে। অভিজাত একটি বাঙ্গালী পরিবারের মধ্যে ইহার জীবন সুন্দর ও সহজভাবে স্বাঙ্গীকৃত হইয়াছে।

অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের মৌলিক নাটক 'নচিকেতা'। ইহা কঠোপনিষদের কাহিনী অবলম্বন করিয়া রচিত। পাশ্চাত্ত্য নাটক অনুসরণের মধ্য দিয়া নাট্যকারের যে মননশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়, ইহার মধ্য দিয়াও তাহারই প্রকাশ দেখা যায়। ইহা কাহিনী-প্রধান রচনা নহে, বরং তত্ত্বমূলক রচনা। ইহার মধ্য দিয়া তিনি যে তত্ত্বটির সন্ধান করিয়াছেন, Engels-এর একটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়া তাহার নির্দেশ দিয়াছেন। প্রাচীন ভারতীয় জীবন-সাধনার মধ্য হইতে নাট্যকার এখানে একটি চিরকালীন জীবনসত্যের সন্ধান পাইয়াছেন। সংযত ভাব ও স্বচ্ছ সংলাপের গুণে তাঁহার এই নাটকখানিও বিশেষত্বপূর্ণ। ইহার সুনিবিড় প্রাচীন পরিবেশ কোন দিক দিয়াই শিথিল হইয়া পড়িতে পারে নাই—সাম্প্রতিক কালে এই শ্রেণীর রচনা নিতান্ত বিরল।

ফরাসী লেখক আনাতোল ফ্রাঁস্ রচিত একমাত্র প্রহসন অবলম্বন করিয়া অজিত গঙ্গোপাধ্যায় 'মৌন মুখর' নামক প্রহসনখানি রচনা করিয়াছেন। বাঙ্গালী জীবনের মধ্যে ইহার স্বাঙ্গীকরণের প্রয়াস নাট্যকারের সার্থক হইয়াছে। পাশ্চাত্ত্য লেখক চেখভের 'সি গাল' নামক নাটকের দ্বারা অনুপ্রাণিত রচনা অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের 'আকাশ-বিহঙ্গী'। বাঙ্গালীর জীবনে ইহারও স্বাঙ্গীকরণের প্রয়াস সার্থক হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত অজিত গঙ্গোপাধ্যায় বহু একাঙ্ক নাটকেরও রচয়িতা। উপরে তাহার নাটকের যে সাহিত্যগুণের উল্লেখ করিলাম, একাঙ্ক নাটকগুলির মধ্যেও তাহার পরিচয় থাকিবার ফলে ইহারা বহুলাংশে সাহিত্যিক মর্যাদার অধিকারী হইয়াছে। তাঁহার একাঙ্ক নাটকের মধ্যে 'সেদিন বঙ্গলক্ষ্মী ব্যাঙ্কে', 'নব স্বয়ংবর', 'প্রমত্ত প্রহসন', 'নব-দূর্বা-দল-শ্যাম', 'আজকের উত্তর' প্রভৃতি আধুনিক বাংলা একাঙ্ক নাটক রচনার এক নূতন অধ্যায় যোজনা করিয়াছে।

নিতান্ত সাম্প্রতিক নাট্যকারদিগের মধ্যে ধনঞ্জয় বৈরাগীও খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার রচনা রোমান্টিকধর্মী—এই যুগের নাট্যকারদিগের মধ্যে তাঁহার ইহাই স্বাতন্ত্র্য। তাহার প্রথম নাটক 'ধৃতরাষ্ট্র' ১৯৫৭ সনে প্রকাশিত হয়। ইহার কাহিনী এই প্রকার—

স্বদেশী যুগের নামকরা বিপ্লবী ধীরাজ ঘোষের বড়ছেলে স্বরূপ ব্যবসায়

করিয়া লক্ষ্মীকে গৃহে অচলা করিয়াছে। ৪২-এর আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে মৃত অনুজকল্প বন্ধু শঙ্করের স্ত্রী সতী আর মেয়ে শান্তা ধীরাজবাবুর আশ্রিত। মৃতদার ধীরাজবাবুর সংসারে সতী সর্বময়ী কর্ত্রী। ছোটছেলে ধ্রুব বিশেষ কি কাজে পরীক্ষার মুখেই আজ বাড়ী ফিরিতেছে। শান্তা ধ্রুবর বাগ্‌দত্তা। বাড়ীর গাড়ী তাহাকে স্টেশন হইতে লইয়া ফিরিলে দেখা গেল যে সে উন্মাদ। ইহাতে সকলেই বিমূঢ় হইয়া পড়িল। কিন্তু শান্তার সেবায় ধ্রুব দ্রুত আরোগ্যের পথে চলিল। এমন সময় হঠাৎ স্বরূপের কারখানায় শ্রমিকনেতা প্রভাত খুন হইল। ইহারই মধ্যে স্বরূপ নির্বাচনে পিতার রাজনৈতিক সহকর্মী ও বন্ধু বিনয়বাবুর বিরোধিতা করিতে অগ্রসর হইল। এই কাযে পিতার সম্মতিও সে আদায় করিয়াছে। অথচ বহুদিনের পোষিত, শান্তার প্রতি অবরুদ্ধ কামনা প্রকাশ হইয়া পড়িল। শান্তাকে সে অপমান করিতেও দ্বিধা করিল না। এদিকে স্বরূপকে আক্রমণ করিয়া 'ধৃতরাষ্ট্র' নামে এক নির্বাচনী পুস্তিকা প্রচারিত হইল। ধ্রুবর বন্ধু অজয় ইহার লেখক মনে করিয়া স্বরূপ তাহাকে অপমান ও প্রহার করিল, ঘটনার এই চরম মুহূর্তে ধ্রুব মলয়াকে জানায় যে সে পাগল নহে। দাদা তাহাকে ঔষধ খাওয়াইয়া পাগল করিতে চেষ্টা করিলে সে পাগলের ভাণ করিয়া বাড়ীতে আসিয়াছে। সে আরও জানায় যে, প্রভাতকে তাহার দাদাই খুন করাইয়াছে এবং 'ধৃতরাষ্ট্রে'র লেখক ধ্রুব স্বয়ং। শান্তাকে স্বাবলম্বী হইতে বলিয়া সে বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যায়। এমন সময় প্রভাতকে খুন করানোর অপরাধে পুলিশ আসিয়া পড়ে। চারিদিকের আক্রমণে স্বরূপ বিভ্রান্ত। ভয়ে নিরাশায় সে বৃদ্ধ পিতার পক্ষপুটে আশ্রয় লইতে চায়। বৃদ্ধ ধীরাজবাবুর বিহ্বলতার মধ্যে মঞ্চের উপর যবনিকা নামিয়া আসে।

ধীরাজবাবু মহাভারতের ধৃতরাষ্ট্রের মত পুত্রস্নেহে অন্ধ বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে, ইহাই নাটকের নামকরণের উদ্দেশ্য।

ইহার পরের বৎসরই ধনঞ্জয় বৈরাগীর 'রুপোলি চাঁদ' প্রকাশিত হয়। ইহার কাহিনী এই—

লেখা-পড়া না শিখিয়া বিশু 'মোটর'-এর গ্যারেজ করিয়াছে। ইহাতে পিতা হরিপদবাবুর ক্ষীণ আপত্তি থাকিলেও শেষে বিশুর নিষ্ঠা দেখিয়া সবই মানিয়া লইয়াছেন। কিন্তু বিশুর এই কাজকে তাহার দিদি সরযূ ও ভগ্নীপতি অজিত বিশেষ অপছন্দ করে। বিশু সমগ্র ব্যস্ত এলাকাটির প্রীতি ও শ্রদ্ধা-

ভাজন। সকলেই তাহার কথা মানে,—সকলের চেয়ে বড় বন্ধু সতুর স্ত্রী সাবিত্রী। সাবিত্রীর বিশুর প্রতি আনুগত্য অনেকে সতুর মদ্যপান ও উচ্ছৃঙ্খলতার কারণ বলিয়া মনে করে। বস্তিরই আর এক বাসিন্দা খুড়ো ও তাঁহার মেয়ে মায়া বিশুর বিশেষ ঘনিষ্ঠ—আত্মীয়ের মত। এমন সময় বস্তিতে পর পর কয়েকটি ঘটনা ঘটে। সদাহাস্যময় ট্রেনের ক্যানভাসার খুড়ো দূর-সম্পর্কের এক পিসির নিকট হইতে সাত হাজার টাকা পান। এই সংবাদে প্রতিবেশী দেবব্রতবাবু মায়াকে পুত্রবধূ করিতে ইচ্ছা করেন। অন্যদিকে সরযূ শ্বশুর-শাশুড়ীর সহিত কলহ করিয়া পিতৃগৃহে চলিয়া আসিয়াছে। তাহাকে ফিরাইতে আসিয়া অজিত অসুস্থ হইয়া পড়ে। বিশুর প্রতিদ্বন্দ্বী গ্যারেজের মালিক রাজেনবাবু তাহার কর্মীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করিতে থাকেন। এমন সময়, প্রবঞ্চকদিগের জ্বালায় অতিষ্ঠ হইয়া খুড়ো রামকৃষ্ণ মিশনে সমস্ত টাকা দান করিয়া বসেন। সাবিত্রীও সতুর ভালর জন্য নিজের পুরাতন পেশা সেবিকা-বৃত্তিতে ফিরিয়া যায়। বিশুর গ্যারেজে সতু আবার আসিতে আরম্ভ করিয়াছে, এমন সময় চোরাইমাল রাখার অপবাদে রাজেনবাবু পুলিশ লইয়া উপস্থিত হন। অনুসন্ধানের পর চোরাইমালসহ ধরা পড়িলে সতু সকল অপরাধ নিজের স্কন্ধে তুলিয়া লইয়া পুলিশের সহিত চলিয়া যায়।

ইহার মধ্য দিয়া বাস্তব জীবন-বোধের একদিক দিয়া যেমন প্রশংসনীয় পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে, তেমনই কাহিনীর পরিণতিতে যে একটু আদর্শ-বাদেরও ছোঁয়াচ লাগিয়াছে, তাহাও অস্বীকার করা যায় না।

ধনঞ্জয় বৈরাগীর পরবর্তী নাটক 'এক মুঠো আকাশে'র সঙ্গে তাহার 'রুপোলি চাঁদের' কাহিনীর শেষাংশের ঐক্য আছে। দুর্গত জীবনের মধ্য হইতেও মানবত্বের সমুচ্চ মহিমার সন্ধান করা ইহারও লক্ষ্য। ইহার কাহিনীটি এই প্রকার—

ব্যর্থতা হতাশা আর বঞ্চনায় ঘেরা বদ্ধ-অন্ধকার ঘরের ফাঁক দিয়া ভাগ্য-বিড়ম্বিত আদর্শবাদী যুবক কেষ্ট এক মুঠো আকাশের দিকে তাকাইয়া ক্ষীণ আশার বাণী যেন শুনিতে পায়। কিন্তু রাস্তার ছেলে শ্যামল ও বস্তির এক মেয়ে গৌরীকে লইয়া অর্থোপার্জনের এক অন্যায় পথ অনুসরণ করিয়া সে চলিল শ্যামল বিপথে তলাইয়া গেল, সে চুরি করিয়া ধরা পড়িল, গৌরীও প্রলোভনকে জয় করিতে না পারিয়া অন্য এক ভ্রান্ত পথ অনুসরণ করিতে চলিয়া গেল। দুঃখে বেদনায় ও হতাশায় কেষ্ট যখন বিহ্বল, তখন

তাহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল, আর এক ভাগ্যবিড়ম্বিত মেয়ে চিনু। দুঃখের মধ্য দিয়া সে জীবনকে চিনিয়াছিল, কেষ্টকেও সে ভুল করে নাই। কিন্তু তাহার শিক্ষায়ই যে শ্যামল চোর হইয়াছে, তাহার দায়িত্ব সে কি করিয়া মুছিয়া দিবে? সেইজন্য শ্যামলের চুরির অপরাধকে সে নিজেই স্বীকার করিয়া লইয়া কারাবরণ করিল, তাহাব মহানুভবতার স্পর্শে শ্যামলের যদি কিছু কল্যাণ হয়!

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, 'রুপোলি চাঁদে'র কাহিনীর পরিণতি ও ইহার পরিণতি অভিন্ন। ধনঞ্জয় বৈরাগী এই যুগের অন্যান্য অনেক উল্লেখযোগ্য নাট্যকারের মত ধরণীর ধূলিমাটি শক্ত করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিতে পারেন না, কখনও কখনও তাঁহাব মুষ্টি শিথিল হইয়া গিয়া তাঁহার দৃষ্টি ঊর্ধ্বগামী হইয়া পড়ে। এই নাটকখানিতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

ইহার পব ধনঞ্জয় বৈরাগী তাঁহার 'এক পেয়ালা কফি' নাটক রচনা ও সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করেন। ইহাব কাহিনী এই—

অরুণ গুপ্ত বিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক। তিনি কলিকাতা হইতে মাইল তিরিশেক দূরে এক ধনাঢ্য-ব্যক্তিব বাগানবাড়ীতে ছবি তুলিতে গিয়াছেন। খুব বেশী রকম বৃষ্টির জন্য 'অপমৃত্যু'র ছবি তোলাব কাজ বন্ধ। কিন্তু মহড়া থামে নাই। এমনই এক মহড়া চলিবাব সময় কাহিনীর পট উন্মোচিত হয়। লক্ষ্য কবা যায় যে, অরুণ গুপ্তের আচরণে তাঁহার সহকর্মিগণ সন্তুষ্ট নয়। নানা খুঁটিনাটি বিষয় লইয়া মিঃ গুপ্তের সঙ্গে তাহাদেব মনান্তর। এমন কি, রূপসজ্জাকর ও ভাবী অংশীদাব মণ্টুব সঙ্গে তাঁহাব প্রায় হাতাহাতি হওয়ার উপক্রম। চিত্রের নায়ক অলোককুমাব এবং নায়িকা চিত্রা দেবীকে তিনি তিরস্কার করেন। পরিচালকেব এই উগ্র স্বভাবেব জন্য তাঁহার দলের কর্মিগণকে প্রায় একযোগে একটা ছোটখাট বিদ্রোহ করিতে দেখা যায়। গুপ্ত সাহেবের পুবানো বন্ধু ও সঙ্গীত পরিচালক ব্রজেন রায়ের মধ্যস্থতায় তখনকার মত সকলে শান্ত হয়। ইহার কিছু পবই হঠাৎ দেখা গেল যে, কফির পেয়ালায় বিষ মিশাইয়া তিনি আত্মহত্যা কবিয়াছেন। সকলে যখন এই আত্মহত্যার ঘটনায় কাতর করুণ হইয়া পড়িয়াছেন, এমন সময় লেখক বীরু বোস ঘোষণা করেন যে, ইহা আত্মহত্যা নয়—হত্যা। এমন কি, আত্মহত্যার স্বীকারোক্তি-সূচক পত্রটিও সত্য নয়। পুলিশ-ইন্‌স্‌পেক্টার মিঃ ঘোষ বিশেষ তৎপরতার

সঙ্গে এই হত্যার রহস্যের কিনারার চেষ্টা করিতে থাকেন। শেষে মণ্টু অরুণ গুপ্তের প্রেতাত্মার ছদ্মবেশে ব্রজেন রায়ের কাছে উপস্থিত হয়। তিনি ইহাতে ভয় পাইয়া নিজের দোষ স্বীকার করিয়া ফেলেন। মিঃ ঘোষ ব্রজেন রায়ের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হইবে ঘোষণা করিলে যবনিকা নামিয়া আসে।

ঘটনা উপস্থাপনার দিক হইতে ইহার মধ্যে তাহার পূর্ববর্তী নাটকগুলি হইতে বিশেষ কোন ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায় না।

ধনঞ্জয় বৈরাগীর 'রজনীগন্ধা' নাটকখানির একটি বিশেষত্ব আছে। ইহাতে মাত্র চারিটি চরিত্র—আশা চৌধুরী, দেবব্রত, রবি দত্ত ও বিমল। তথাপি কাহিনীর প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত ইহার কৌতূহল রক্ষা পায়। ইহার মধ্যেও মৃত্যুর বিভীষিকা এবং ঘটনার ঘনঘটা আছে, কিন্তু ঘটনা ঘনসন্নিবিষ্ট ও নাটকীয় গুণ-সমৃদ্ধ।

ধনঞ্জয় বৈরাগী নাট্যকার, অভিনেতা ও মঞ্চ-পরিচালক, সুতরাং অভিনয় ও নাট্য রচনার আঙ্গিকের সঙ্গে তাহার পরিচয় অত্যন্ত নিবিড়। সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই তাহার নাটক রচিত হইয়াছে বলিয়া ইহাদের অভিনয় কখনও প্রায় ব্যর্থ হয় না।

ধনঞ্জয় বৈরাগীর সর্বশেষ নাটক 'আর হবে না দেরী' ১৯৬০ সনের ১৫ই ডিসেম্বর তারিখ হইতে কলিকাতার নব-প্রতিষ্ঠিত এক সাধারণ রঙ্গমঞ্চে প্রথম মঞ্চস্থ করা হইয়াছে। ইহার কাহিনী এই প্রকার—

এক ভাঙ্গা বাড়ীতে আশ্রয় লইয়াছে একদল ছিন্নমূল, অবহেলিত, বঞ্চিত মানুষ। এই বঞ্চনার মধ্যেই তাহারা আশা নিরাশার স্বপ্ন দেখে। সেই জীর্ণ আচ্ছাদনের নিচেই অসিত ও শ্রীলতার দাম্পত্য জীবন মধুর হইয়া ফুটিয়া উঠিতে চায়। বুড়ো দাদুর ভবিষ্যতের স্বপ্ন নিদারুণভাবে ভাঙ্গিয়াছে। তথাপি তিনি দীপ্তি ও অপর সকলের দুর্ভাগ্যের সহিত সংগ্রামকে লক্ষ্য করেন। তাহাদের জয় কামনা করেন। এই পরিবেশের মধ্যে আসিয়া পড়ে এক যুবক, কানাই সামন্ত তাহার নাম। সে এই দলের একজন হইলেও সতেজে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে চায়। সর্বহারা জনতাকে লইয়া তাহার বিপ্লব-শপথ। আর তাহাতেই তো দেশের সর্বময় কর্তা, শাহুজী, ভীত হইয়া পড়িয়াছেন। এই শাহুজীই কিন্তু একদিন বিদেশী শাসকগণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছিলেন। তাহারই পুরস্কার স্বরূপ দেশের কর্তৃত্বভার আজ তিনি পাইয়াছেন। অথচ কানাই সামন্তের বিদ্রোহকে রোধ করিতে তিনিই ছদ্মবেশে ভাঙ্গা বাড়ীতে

আসিলেন। নিজের শাসন-ভোগের পথকে কণ্টকশূন্য করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। কিন্তু সেখানে তিনি নিজের মনুষ্যত্বকে আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন। শিল্পপতি ও ক্ষমতালোভীদের শঠচক্রের জাল ছিঁড়িয়া বাহির হইয়া আসিলেন। নিজের পুরাতন সত্তাকে ফিরিয়া পাইলেন। অন্যদিকে দেশব্যাপী বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে। শোষণের প্রাসাদ ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। সেই বিপ্লব-বহ্নির শিখায় পুরাতন ভাঙাবাড়ীটির অন্ধকার দূর হইল। প্রভাত হইতে আর দেরী হইবে না,—অচিরেই সূর্য উঠিবে।

সাম্প্রতিক নাট্যকার প্রতাপচন্দ্র চন্দ্রের সঙ্গে নবনাট্য আন্দোলনের কোন যোগ না থাকিলেও, তাঁহার 'শহরতলী' নাটকখানি শহরতলীর নোংরা বস্তির দুর্গত জীবন আশ্রয় করিয়া রচিত হইয়াছে। বৃদ্ধ রুগ্ন নিবারণ বস্তিতে একটি চায়ের দোকান করে, গ্রাম হইতে তাহার নবীনা সুন্দরী স্ত্রী রূপোও সঙ্গে আসিয়াছে। সেইজন্য অকমা যুবকদের তাহার দোকানে সহজেই আড্ডা জমিয়া উঠে। গৌরহরি যাত্রার দলে পার্ট করে, ননীলাল ফুটবল খেলে, তাহারা দোকানে বসিয়া রূপোর অনুগ্রহ প্রত্যাশী হইয়া থাকে। ক্রমে নানা প্রলোভন দেখাইয়া গৌরহরি নিবারণকে তাড়াইয়া রূপোকে লাভ করে। ইহাই নাটকের মূল কাহিনী। ইহার চরিত্র রূপায়ণে যে বাস্তব জীবন-দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা প্রশংসনীয়। এই কাহিনীর সমান্তরালবর্তী বস্তি জীবনাশ্রিত নিম্ন মধ্যবিত্ত জীবনেরও একটি কাহিনী ইহাতে আছে, ইহার নায়িকা কমলা। কমলার নিগৃহীত জীবনের সুখকর পরিণতি নাট্যকাহিনীর গুণ বৃদ্ধি করিয়াছে। বস্তিজীবন যে শুধু বৈচিত্র্যহীন, তাহাই নহে—'এখানে হাসি আছে, ভাল আছে, মন্দ আছে, কান্না আছে'—নাট্যকার তাহার রচনায় ইহাই প্রমাণিত করিয়াছেন।

প্রতাপচন্দ্র দুইখানি প্রহসনও রচনা করিয়াছেন, তাহাদের নাম 'অম্লমধুর' ও 'প্রজাপতি'। দুইখানিই অভিজাত-জীবনভিত্তিক রচনা। ইহাদের মধ্য দিয়া নাট্যকারের একদিকে যেমন বাস্তব জীবনবোধ, তেমনই অন্যদিকে সূক্ষ্ম রসবোধের সার্থক পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। প্রতাপচন্দ্রের সংলাপ স্বচ্ছ ও নাট্যকাহিনী গতিশীল, কোথাও অনাবশ্যক বক্তৃতা কিংবা অতি-নাটকীয় ঘটনা দ্বারা ভারাক্রান্ত নহে। প্রতাপচন্দ্র 'আজব দেশ' নামক একখানি অদ্ভুতরসাত্মক প্রহসনও রচনা করিয়াছেন, ইহার চরিত্র পরিচয় এই —'যাহাদের শুধু গোঁপ আছে', 'যাহাদের শুধু টিকি আছে', 'যাহাদের শুধু দাড়ি

আছে' ইত্যাদি। ইহার মধ্যেও নাট্যকারের কৌতুকোচ্ছল সরস মনটির সার্থক পরিচয় পাওয়া যায়।

বীরু মুখোপাধ্যায় সাম্প্রতিক বাংলা নাট্যকারদিগের মধ্যে সুপরিচিত। তাঁহার 'সংক্রান্তি' নাটক গিরিশ নাট্যোন্নয়ন প্রতিযোগিতার প্রথম বৎসরে (পরে দ্রষ্টব্য) প্রথম পুরস্কার লাভ করিয়াছে। ইহার বিষয় পরে আলোচিত হইয়াছে। তাঁহার দ্বিতীয় নাটক 'সাহিত্যিক' ১৯৫৭ সনে প্রথম প্রযোজিত হয়। এই নাটকের বিষয়-বস্তু সম্পর্কে নাট্যকার 'গোড়ার কথা'য় বলিয়াছেন, 'মাত্র কয়েক বছর আগের একটি বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রেই এই গল্পটি আমার মাথায় আসে। এক সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিকের মৃত্যুদিনে মৃতদেহ সৎকারের সামান্যতম খরচটুকু পযন্ত তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও কিছু শুভানুধ্যায়ীব চেষ্টায় সংগৃহীত হয় এবং সেই অর্থেই তাঁর পারলৌকিক ক্রিয়াদি ও কিছুদিনের সংসার খরচ পর্যন্ত চালাতে হয়। তার প্রায় এক সপ্তাহ পরেই দেখেছি সুসজ্জিত সভামণ্ডপে কি আকুল শোকোচ্ছ্বাস—দেশের গণ্যমান্য বরেণ্য নেতাদের। শুনেছি স্মৃতিরক্ষার সংখ্যাহীন প্রতিশ্রুতি, দেখেছি স্মৃতি-তহবিলের মর্মন্তুদ পরিহাস। সব মিলিয়ে সমস্ত ঘটনাটিকে এক নিষ্ঠুরতম প্রহসন বলে মনে হয়েছিল আমার। এ নাটকের উৎস ঐ ঘটনাটুকুই।' নাটকটি ব্যঙ্গাত্মক করিয়া রচিত হইলেও ইহার মধ্যে এই সুগভীর বেদনার কথাটিও গোপন হইয়া থাকিতে পারে নাই। তবে ইহাতে ব্যক্তি অপেক্ষা সমষ্টি লক্ষ্য বলিয়া জীবন-রসের অনুভূতি খুব নিবিড় হইয়া উঠিতে পারে নাই। 'সংক্রান্তি' নাটকখানি এই ত্রুটি হইতে মুক্ত। বীরু মুখোপাধ্যায় 'রাহুমুক্ত' নামে একটি যাত্রার আঙ্গিকে অভিনেয় নাটক রচনা কবিয়াছেন। প্রতীক চবিত্র সৃষ্টি করিয়া যুদ্ধ-শান্তি প্রভৃতি হাল আমলের সমস্যা ইহার উপজীব্য।

সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী সাম্প্রতিক নাট্যকার রূপে কয়েকটি বিষয়ে কৃতিত্বেব পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার 'ছায়াবিহীন' নাটক এই সম্পর্কে প্রথম উল্লেখযোগ্য। ইহা ফরাসী নাট্যকার জঁা পল সার্তর্-এর *Morts sans sepulture* অথবা Men without Shadows অবলম্বনে রচিত হইলেও 'বাংলা দেশের জল হাওয়া রীতিনীতির সঙ্গে' ইহাকে মানাইয়া লওয়া হইয়াছে। নাট্যকার লিখিয়াছেন, 'সব দিক থেকে বিবেচনা করলে সার্তর্-এর ১৯৪৬ সালে লেখা *Morts sans sepulture*-এর সঙ্গে 'ছায়াবিহীন'-এর মিল আছে,

ভাব অর্থ আব বসেব দিক থেকে। অমিল হয়েছে চবিত্র সৃষ্টিতে এবং ব্যবহাবিক প্রয়োজনে। আঙ্গিকেব দিক থেকে 'ছায়াবিহীন' সার্ত্‌ব্‌-এর নাটকেব প্রতিভূ।' সার্ত্‌ব্‌-এব এই নাটকেব বস বীভৎস। আনুপূর্বিক বীভৎস বস অবলম্বন কবিয়া বাংলায় ইতিপূর্বে কোন নাটক বচিত হয নাই। এই দিক দিয়া নাটকখানি বাংলা সাহিত্যে অভিনব, বাঙ্গালী জীবনেব মধ্যে ইহাব বৈদেশিক কাহিনী স্বাঙ্গীকবণ ব্যর্থ হয় নাই, চবিত্রসৃষ্টিও সার্থক বলিতে পাবা যায়। সংলাপেব ভাষা স্বচ্ছ ও গাঢবদ্ধ সুতবাং উচ্চাঙ্গ নাটকেব উপযোগী।

সোমেন্দ্রচন্দ্র কয়েকটি উল্লেখযোগ্য একাঙ্ক নাটকও বচনা কবিয়াছেন। ইহাদেব প্রত্যেকটিব সংক্ষিপ্ত পবিচয এই প্রকাব—Neil Grant বচিত *The man who thought for himself* নাটকটিব ছায়া অনুসবণ কবিয়া তাহাব 'যে নিজেব কথা ভেবেছিল' একাঙ্ক নাটকটি তিনি বচনা কবেন। নাট্যকাব ইহাতে নূতন কোন কোন বিষযও সংযোজন কবিযাছেন। কোন শাসন ক্ষমতাই যে মানুষেব আত্মসচেতনতাকে ভাঙ্গিযা দিতে পাবে না, তাহাই সঙ্কেতে এই নাটকেব ভিতব দিয়া প্রকাশ পাইযাছে। নাট্যকাব নিজেই বলিযাছেন 'বড নীতি যদি বাজনীতি হয়, তাহা হইলে এ টাকে বাজনৈতিক satire বলা যেতে পাবে।'

ইহাব পব সোমেন্দ্রচন্দ্রেব 'মহাকবি অশ্বঘোষ' নামক একাঙ্ক নাটক বচিত হয়। নাটকটি বুদ্ধ জযন্তী উপলক্ষে বচিত হইযাছিল। ইহা 'বুদ্ধ-চবিত' বচয়িতা অশ্বঘোষেব জীবনালেখ্য। অতঃপব স্ট্রিণ্ডবার্গেব *Pariah* নামক নাটকটিব 'স্বচ্ছন্দ অনুবাদ' স্বরূপ তাহাব 'অন্ত্যজ' নামক নাটকটি বচিত হয়। ইহা 'বুদ্ধিগ্রাহ্য মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ধর্মী নাটক' বলিয়া বিদগ্ধ সমাজেব নিকট আদরণীয় হইবাব যোগ্য।

নিম্নশ্রেণীব জীবন-যাত্রাব ভিতব দিযা শ্রেণী সংঘাতকে পকট কবিয়া তুলিয়া সোমেন্দ্রচন্দ্র তাঁহাব 'মূলধন' নামক একাঙ্ক নাটক বচনা কবেন। ইহাও ববার্ট কেম্প-বচিত *Asset* নামক নাটকটি অবলম্বন কবিয়া লিখিত। বর্তমান জীবনেব অর্থনৈতিক পবিবেশে ভবিষ্যতেব আশা ও স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যাওযা একটি সংসাবেব কাহিনী অবলম্বন কবিয়া সোমেন্দ্রচন্দ্রেব 'সকাল বেলাব এক ঘণ্টা' নাটক বচিত হইয়াছে। ইহাব পব তিনি 'সন্ধ্যাবেলাব এক ঘণ্টা' নামক ব্যঙ্গাত্মক নাটক বচনা কবিযাছেন। ইহাব সম্বন্ধে নাট্যকাব

লিখিয়াছেন, 'সকাল বেলায় যে কথাটা দুঃখের, সন্ধ্যাবেলায় সেই কথাটাই হাসির।' কিন্তু এই হাসির অন্তরালে ব্যঙ্গের ভাব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। সম্পূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে সোমেন্দ্রচন্দ্রের 'আশংসা' নামক একাঙ্ক নাটক রচিত হইয়াছে। একটি রাজনৈতিক মতবাদ ইহার আলোচনার বিষয়। প্রত্যেকটি একাঙ্ক নাটকের মধ্য দিয়াই নাট্যকারের বাস্তব জীবনবোধ ও স্বচ্ছ সংলাপের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতেই রচনাগুলি বিশেষত্ব লাভ করিয়াছে। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংস্রবের ফলে তাঁহার নাটক-গুলিতে যে মননশীলতার পরিচয় সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে তাঁহার রচনা মাত্রই বিদগ্ধ সমাজের মনোরঞ্জন করিবার উপযোগিতা লাভ করিয়াছে। নাট্যরচনায় সোমেন্দ্রচন্দ্র কৌলিক সংস্কারেরই উত্তরাধিকারী হইয়াছেন। তাঁহার পিতা কাশিমবাজারের মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী কেবলমাত্র যে নাটকের উৎসাহদাতাই ছিলেন, তাহাই নহে—তিনি স্বয়ং নাট্যকারও ছিলেন। পরশুরামের 'চিকিৎসা সঙ্কট' নামক সুপরিচিত কৌতুক-কাহিনীকে তিনি 'মনোপ্যাথি' নামে একটি সার্থক নাট্যরূপ দিয়াছিলেন। তাঁহার এই নাট্যরূপ-খানি সাধারণের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রীতি লাভ করিয়াছিল।

পরেশ ধর সাম্প্রতিক কালের একজন উল্লেখযোগ্য নাট্যকার। তাঁহার 'শুধু ছায়া' নামক নাটকখানি আঙ্গিকের অভিনবত্বে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। কেহ কেহ মনে করিয়াছেন, ইহা ইতালীয় নাট্যকার পিরান-ডেলোর '*Six characters in search of an author*' নামক নাটকটির অনুকরণে রচিত। কিন্তু এই সম্পর্কে নাট্যকার বলিয়াছেন, " 'শুধু ছায়া' আমার সম্পূর্ণ মৌলিক রচনা।" রচনার দিক দিয়া বিশেষত্ব থাকিলেও পিরান-ডেলোর উক্ত নাটকের সঙ্গে যে ইহার আঙ্গিকের দিক দিয়া সাদৃশ্য দেখা যায়, তাহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। অনুরূপ বিষয় লইয়া আরও একখানি সংক্ষিপ্ত নাটক বাংলা সাহিত্যে রচিত হইয়াছে। তবে এই নাট্যকার এই নাটকের বিষয় আধুনিক বাঙ্গালীর জীবনের মধ্যে এমন ভাবে স্বাঙ্গীকৃত করিয়া লইয়াছেন যে, তাহার বৈদেশিক পরিচয় সম্পূর্ণ প্রচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে।

ইহাতে ছায়া এবং কায়া এই দুই শ্রেণীর চরিত্র আছে। জীবনবাদী লেখক সুমঙ্গল, তাহার স্ত্রী মালা, মামুলী ফিল্ম গল্পলেখক সমীর সেন, ফিল্ম কোম্পানীর লোক ইহারা এই নাটকে বাস্তব চরিত্র বা কায়ারূপধারী; কিন্তু ইহার আর এক শ্রেণীর চরিত্র সুমঙ্গল রচিত ফিল্ম নাটকের নায়ক নায়িকা ও

তাহাদেব সহকর্মী, তাহাব idea বা ভাব মাত্র, তাহাবাই ছায়া। ইহাবা মূর্তি ধাবণ কবিযা নাটকেব মধ্যে আবির্ভূত হইযাছে। লেখক সুমঙ্গলেব ইচ্ছা অনুযাযী ইহাবা আচবণ কবিয়াছে। ইহাব মধ্য দিযা সাম্প্রতিক কালেব সমাজ জীবনেব সমস্যাব রূপাযণ হইযাছে। সংলাপেব বলিষ্ঠ ভাষা এবং কাহিনী উপস্থাপনাব অভিনবত্বে নাটকখানি জনসাধাবণেব দৃষ্টি আকর্ষণ কবিতে সক্ষম হইযাছে।

পবেশ ধবেব দ্বিতীয বচনা 'ডানা ভাঙ্গা পাখী।' ইহা মৌলিক সামাজিক নাটক। ইহাব মধ্যে সমাজেব নিম্নতম স্তব হইতে উচ্চতম স্তব পর্যন্ত বিভিন্ন জীবনেব আশা-আকাঙ্ক্ষা সুখ দুঃখ নৈবাশ্যেব একটি বাস্তব চিত্র প্রকাশ পাইয়াছে। মধ্য-মধ্যবিত্ত পবিবাবেব কন্যা মাধবী কি ভাবে উচ্চতম মধ্যবিত্তেব স্তবে আবোহণ কবিতে গিযা নিম্নতম মধ্যবিত্তেব স্তবে নামিযা আসিল, ইহাতে তাহাব পবিচয পাওযা যায। জীবনেব বিভিন্ন স্তবে যে বৈচিত্র্য দেখা যায, তাহাব সুনিপুণ অনুভূতিতে এই নাটক বিশেষত্ব লাভ কবিযাছে। এই নাটকে নতন যে আঙ্গিক ব্যবহৃত হইযাছে, তাহাও লক্ষ্য কবিবাব যোগ্য।

ঋত্বিক ঘটক বর্তমান কালেব অন্যতম নাট্যকাব। ইহাব 'দলিল' নাটক পূর্ববঙ্গেব বাস্তুহাবা জীবন সমস্যা লইযা বচিত। পদ্মাব স্রোতেব মত বাস্তুচ্যুত বাঙ্গালী জনজীবনেব যে ধাবা অনিবার্য গতিতে অলঙ্ঘ্য পবিণতিব দিকে অগ্রসব হইতেছে, তাহাবই ঘাত প্রতিঘাতকে কেন্দ্র কবিযা নাটকটি বচিত হইযাছে। দৃষ্টভঙ্গীব দিক দিয়া নাটকটি 'নবান্ন'ব ঐতিহ্য অনুসাবী।

উমানাথ ভট্টাচার্য অনুবাদ নাটকেব ক্ষেত্রে পাবচিত। ইহাব অনূদিত 'নীচেব মহল' নাটকটি সাধাবণ মঞ্চে সাফল্যেব সহিত অভিনীত হইযাছে। গলসওযার্দিব নাটক অবলম্বনে ইহাব 'ঘূর্ণি' নাটকটি বচিত। রুমানীয নাট্যকাব মিহাইল সেবাস্তিযানেব নাটক অবলম্বনে বচিত উমানাথ ভট্টাচার্যেব 'শেষ সংবাদ' সার্থক অভিনযে ধন্য হইয়াছে। মৌলিক বচনা হিসাবে 'জল' নাটকটি উল্লেখযোগ্য। ভাড়াটে বাড়ীব কলেব জলেব চাহিদাকে কেন্দ্র কবিয়া লেখক মধ্যবিত্ত ভাড়াটিযা জীবনেব সুখদুঃখ আশা-নিবাশাব কথা সুন্দব ভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। বচনা কৌশলে নৈপুণ্যেব ছাপ আছে।

স্নিগ্ধ বন্দ্যোপাধ্যায় সাম্প্রতিক কালেব তরুণ নাট্যকাবদিগেব অন্যতম। ইহাব প্রথম প্রকাশিত নাটক 'স্ত্রিযাশ্চবিত্রম'। পাবিবাবিক তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া পুবাতন কালেব শাশুড়ী এবং আধুনিক কালেব পুত্রবধূকে

ঘিরিয়া নাটকটি গড়িয়া উঠিয়াছে। নাটকের সংলাপ এবং ঘটনা-বিন্যাস যথোপযুক্ত।

জোছন দস্তিদার আর একজন তরুণ নাট্যকার। ইহার রচিত 'দুই মহল' নাটক বর্তমানে জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে। বর্তমান সমাজ উঁচু এবং নীচু এই দুইটি মাত্র মহলেই সীমাবদ্ধ। সেই দুই মহলের কাহিনীই ইহাতে রূপায়িত হইয়াছে। ভণ্ড অমায়িকতার ছদ্মবেশে কতিপয় মানুষ সমাজের নীচু তলার বিকৃত বিকলাঙ্গ কতিপয় মানুষ লইয়া যে ব্যবসা চালাইতেছে, তাহাব নির্মম চিত্র লেখক নাটকে উন্মুক্ত করিয়াছেন। বিন্যাস কৌশলে নাটকীয় রস ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

সাম্প্রতিক কালের একাঙ্ক নাটক রচয়িতাদিগের মধ্যে গিবিশংকবেব একটি বিশেষ স্থান আছে। শ্রমিক আন্দোলনেব উপব ভিত্তি করিযা তাঁহাব 'প্রবাহ' নাটকখানি রচিত হইয়াছে। ইহা পাঁচটি দৃশ্যে সম্পূর্ণ, সুতবাং একাঙ্ক নাটক বলা যায় না। জীবন দৃষ্টিব স্বচ্ছতা এবং সংলাপে ব্যবহৃত ভাষাব পরিচ্ছন্নতা এই নাটকটির বৈশিষ্ট্য।

গিরিশংকবেব 'শেষ সংলাপ' নূতন আঙ্গিকে বচিত একখানি একাঙ্ক নাটক। ইহাব একটি মাত্র চবিত্র এবং একমাত্র তাহাব সংলাপেই নাটকেব সমাপ্তি ঘটিযাছে। একটি ভাগ্যবিডম্বিত জীবনেব অন্তর্দ্বন্দ্ব একক সংলাপেব ভিতর দিয়া এখানে সার্থকভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। তাঁহার একটি একাঙ্ক নাটক সংগ্রহের নামও 'শেষ সংলাপ', ইহাতে 'এক চিল্‌তে', 'টান', 'আশ্বাস', 'শিখা', 'বোশনাই', 'শহীদস্মৃতি' ও 'শেষ সংলাপ' নামক নাটকগুলি সংগৃহীত হইয়াছে। ইহাদেব প্রত্যেকটি রচনাই একান্ত বাস্তবধর্মী, রোমাণ্টিকতাব স্পর্শ ইহাদেব মধ্যে কিছুমাত্র নাই। আধুনিক সাধারণ বাঙ্গালী জীবনেব দুর্গতি ও জটিলতা সম্পর্কে তাঁহাব জ্ঞান প্রত্যক্ষ ও বাস্তব, মানুষ ও সমাজ সম্পর্কে তাঁহার নিজস্ব চিন্তাব ধাবাও সুস্পষ্ট, তাহাই তাঁহাব এই নাটকগুলিব মধ্য দিযা রূপায়িত হইয়াছে।

গিরিশংকরের আর একখানি একাঙ্ক সংগ্রহেব নাম 'সমুদ্র ধ্রুপদী'। ইহাতে 'শর্বরী : মানস : সবিতা' ও 'সাইবেন' নামক দুইখানি একাঙ্ক নাটক সংকলিত হইয়াছে। প্রথম নাটকটির মধ্যে রোমাণ্টিকতার একটু স্পর্শ থাকিলেও দ্বিতীয় নাটকখানি বাস্তবধর্মী।

নবনাট্য আন্দোলনের মধ্য হইতে যে কয়েকজন নবীন নাট্যকারের উদ্ভব

হইয়াছে সুনীল দত্ত তাঁহাদের অন্যতম। নাটককে জীবনের প্রতিফলক ও জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত করার মাধ্যম হিসাবে যাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন, ইনি তাঁহাদের অন্যতম। ইংরেজী ১৯৫০-৫১ সনে নাট্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে সুনীল দত্ত 'লুঠতরাজ' নামক একটি একাঙ্ক নাটিকা লইয়া আবির্ভূত হন। দুইটি দৃশ্য ও উনিশটি চরিত্র সম্বলিত এই নাটিকার মধ্যে শ্রমিক শ্রেণীর দেশপ্রেম এবং মালিক পক্ষের অনমনীয় গোঁড়ামি ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে।

ইহার পরেই তিনি 'হরিপদ মাস্টার' নাটক রচনা করেন। এক দরিদ্র সহকারী প্রধান-শিক্ষক এই নাটকের নায়ক। মধ্যবিত্ত জীবনের জ্বালা-যন্ত্রণা দুঃখকষ্ট সব সহ্য করিয়াও দাবি আদায়ের জন্য সংগ্রাম করাটা তাহার ধাতে আসে না। শিক্ষকদের সংগ্রামের তিনি বিরোধী, আশা করেন যে সৎভাবে শিক্ষকতা করার ন্যায্য স্বীকৃতি হিসাবে প্রধান শিক্ষকের শূন্যপদ তাহাকেই দেওয়া হইবে। চাকুরী ও পরিবারের ক্ষেত্রে একে একে নানা প্রতিকূল ঘটনার মধ্য দিয়া তাহার মোহমুক্তি এই নাটকের কাহিনীতে বিবৃত হইয়াছে।

১৯৫৬ সনে সুনীল দত্তের দুইখানি নাটক প্রকাশিত হয়। 'অঙ্কুর' স্ত্রী চরিত্র বর্জিত কিশোর-নাটক। ইহাতে প্রধান চরিত্রের সংখ্যা ১৫টি, ৪টি করিয়া দৃশ্যের দুইটি অঙ্কে নাটকটি সমাপ্ত। কুসঙ্গের প্রভাবে প্রতিভাদীপ্ত একটি কিশোরের জীবন কি ভাবে সহৃদয় সহানুভূতিশীল আচরণে সংশোধিত হইয়া সুস্থ সৃষ্টিশীলতার পথে অগ্রসর হইতে থাকে, নাটকের কাহিনীতে তাহাই উপজীব্য করা হইয়াছে। 'জতুগৃহ' নাটকে আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুতে সুনীল দত্ত নিজের পূর্বতন নাটকগুলি হইতে ভিন্ন পথে পাদচারণা শুরু করেন। এই নাটকটির পটভূমি শ্রমিক-আন্দোলনের হইলেও এখানে মনোবিকলন প্রধান উপজীব্য। এই নাটকটি ৪টি অঙ্কে বিভক্ত। চরিত্র মোট ৯টি—৮টি পুরুষ-চরিত্র ও ১টি স্ত্রী-চরিত্র। তরুণী স্ত্রীর প্রতি উগ্র প্রেমে আন্দোলনের নেতার পদস্খলন এবং ক্রুর কামনা ও একাকিত্বের নির্জনতায় শুকাইয়া যাওয়া একটি নারীর হৃদয় লইয়া এই নাটকের কাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে।

ইহার পরই প্রকাশিত হয় তাঁহার 'ত্রিনয়ন'—তিনটি একাঙ্ক নাটকের সংকলন। 'কুয়াশা', 'নিশির ডাক' ও 'স্মৃতিচিহ্ন'—এই তিনটি একাঙ্ক নাটক ইহার অন্তর্ভুক্ত। স্ত্রীর প্রতি সন্দিগ্ধ গোয়েন্দা অফিসারের ভ্রমভঙ্গ এবং ফেরারী দেশপ্রেমিককে আশ্রয় দিয়া চাকুরীর ঝুঁকি নেওয়া 'কুয়াশা'র উপজীব্য।

তিনটি পুরুষ ও একটি স্ত্রী-চরিত্র এই নাটিকায় আছে। 'নিশির ডাক' নাটিকাটিতে মোট ৬টি পুরুষ চরিত্র আছে। কালী প্রতিমার গলার হীরার নেকলেস চুরি করার রোমাঞ্চকর কাহিনীর মধ্য দিয়া সাধুবেশী তিনটি দুর্বৃত্তের অন্তর্দ্বন্দ্বকে অবলম্বন করিয়া ইহার কাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে। মোট ৬টি চরিত্র—২টি পুরুষ, ২টি স্ত্রী ও ২টি শিশু-চরিত্র —লইয়া 'স্মৃতিচিহ্ন' নাটিকাটি রচিত। এক ধনীর শিশুপুত্রের জন্মদিনে তাহারই অভুক্ত জারজ সন্তানকে লইয়া তাহার দাসীমাতার আবির্ভাব এবং ইহাকে কেন্দ্র করিয়া বিভিন্ন চরিত্রের দ্বান্দ্বিক বিন্যাস লইয়া নাটকখানির কাহিনী পরিকল্পিত হইয়াছে।

সুনীল দত্তের চারিটি কিশোরদের উপযোগী একাঙ্ক নাটিকার সঙ্কলন 'হবু রাজার দেশে' শিশু-নাটিকার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। 'হবু রাজার দেশে', 'ভূতের পাল্লরে', 'শিক্ষা বভ্রাট' ও 'অনুতাপ'— এই চারিটি নাটিকা ইহার অন্তর্ভুক্ত।

ইহা ছাড়া দেশের বিভিন্ন গণ-আন্দোলন, নির্বাচন প্রভৃতি উপলক্ষে একাধিক ব্যঙ্গ-নাটিকাও তিনি লিখিয়াছেন। 'জবাব', 'মালাবদল', 'শুভদৃষ্টি', 'ভাঙা তরী', 'বিপুলের সংসার', 'সংবিধান বিভ্রাট' তাহার এই জাতীয় নাটিকা। তাহার সাম্প্রতিকতম পূর্ণাঙ্গ নাটক 'অভিশপ্ত ক্ষুধা'।

বিভূতি মুখোপাধ্যায়ের 'কষ্টিপাথর' নামক নাটকটি খোসবাগে নবাব সিরাজদ্দৌল্লার কবরের পটভূমিকায় রচিত হইয়াছে। নাটকের পাত্রপাত্রী ঐতিহাসিক হইলেও নাটকটি ইতিহাসাশ্রয়ী নহে—ইহা রোমান্টিক। জনশ্রুতি এই যে, সিরাজের কবরের নিকট অমাবস্যার অন্ধকার রাত্রে বেগম লুৎফার ক্রন্দনধ্বনি শ্রুত হয়। এক স্বপ্নবিলাসী যুবক এই জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া খোসবাগে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তাহার কবিত্ব ও কল্পনার উপর ভিত্তি করিয়া নাটকখানি রচিত হইয়াছে। ইহার ভাষা কবিত্বপূর্ণ ও সরস, জীবনদৃষ্টি রোমান্টিক, সুতরাং আধুনিক নাটকে ইহা একটি ব্যতিক্রম।

নবনাট্য আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংশ্রব ব্যতীতও স্বাধীনভাবে বাংলার বিভিন্ন সামাজিক সমস্যামূলক নাটক রচনা করিয়া যাঁহারা খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে জ্ঞানেন্দ্রনাথ চৌধুরীর নাম উল্লেখযোগ্য। এক প্রধান শিক্ষকের জীবন অবলম্বন করিয়া তাঁহার 'মাষ্টার' নাটকখানি রচিত

হইয়াছে, মধ্যবিত্ত জীবনের আর্থিক সমস্যা লইয়া 'মধ্যবিত্ত', অভিজাত পরিবারের দাম্পত্য জীবন সমস্যা লইয়া 'ডাইভোর্স', চাষী গৃহস্থের জীবন লইয়া 'বিচার' নাটক রচিত হইয়াছে। অন্যান্য অনুরূপ সমাজের বিভিন্ন বিষয় লইয়া তাঁহার 'ঝকমারি', 'সেকাল ও একাল', 'বেকারের স্বপ্ন', 'উত্তরাধিকারী', 'জয় হিন্দ' বা সোনার স্বপন', 'গজ-কচ্ছপ', 'পাগল', 'বসন্ত-বিদায়' প্রভৃতি নাটক রচিত হয়। তাঁহার কোন নাটকই পঞ্চাঙ্ক কিংবা ত্রয়াঙ্ক নাটক নহে, অথচ একাঙ্ক নাটকও নহে। বিভিন্ন দৃশ্যে বিভক্ত হইয়া আধুনিক সমাজের বিচিত্র সমস্যা ইহাদের মধ্যে বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহার রুচিবোধ উন্নত, ভাষা পরিচ্ছন্ন ও জীবনদৃষ্টি স্বচ্ছ। 'নাট্যাঞ্জলি' নামে তাঁহার নাটকগুলি প্রকাশিত হইয়াছে।

'নাট্যাঞ্জলি' বারটি নাটকের সংকলন। ইহাতে আধুনিক সমাজ-সমস্যামূলক, হাস্যরসাত্মক এবং রূপকধর্মী বিভিন্ন শ্রেণীর নাটকই সংকলিত হইয়াছে। আধুনিক সমাজ-ব্যবস্থাকে ব্যঙ্গ করিয়া তাঁহার হাস্যরসাত্মক নাটকগুলি রচিত হইয়াছে, ইহাদের মধ্যে তাঁহার যে বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতেই তাঁহার রচনা নিতান্ত লঘুস্তরে নামিয়া আসিতে পারে নাই। তাঁহার 'জয়হিন্দ' বা 'সোনার স্বপন' নাটকটি নানা কারণে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহাতে মাটি, বায়ু, সাগর বা জল, আগুন, পর্বত ইত্যাদিকে বিভিন্ন নরনারীর রূপ দেওয়া হইয়াছে। যেমন, 'মাটি—মাতৃকারূপা পূর্ণবয়স্কা যুবতী, পরনে সবুজ শাড়ী ভারতীয় পদ্ধতিতে পরা, মাথায় সাদা ও লাল ফুলের মুকুট' ইত্যাদি। ইহার মধ্যে নাট্যকারের আশাবাদের সুর ধ্বনিত হইয়াছে। সুগভীর মননশীলতার পরিচয়ে তাঁহার এই রচনাটি পরম সার্থক। ইহার মধ্যে তিনি সার্থক অমিত্রাক্ষর ছন্দও ব্যবহার করিয়াছেন।

সাম্প্রতিক কালে রমেন লাহিড়ীও নাট্যকাররূপে পরিচয় লাভ করিয়াছেন। ১৯৫৮ সনে তাঁহার 'অপরাজিত' নাটক রচিত হয়। মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী জীবনের একটি হাসিকান্নার কাহিনী ইহাতে নাটকীয় রূপ লাভ করিয়াছে। তাঁহার একাঙ্ক নাটক 'মনোবিকলন' উল্লেখযোগ্য রচনা।

সপ্তম অধ্যায়

পূর্ব-পাকিস্তানের বাংলা নাটক

(১৯৪৭—১৯৬০)

১

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে নাটকের সহিত নাট্যমঞ্চের যে একটি নিগূঢ় সম্পর্ক রহিয়াছে, তাহা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, নাটকের স্বরূপ ও উৎকর্ষ বিচার করিতে হইলে তাহা কেবলমাত্র অধ্যয়ন দ্বারাই সম্ভব হয় না, অভিনয় দেখিয়া ইহার প্রাণশক্তি যথার্থরূপে পরীক্ষা করিতে হয়। নাটক অভিনয়ের জন্য স্থায়ী নাট্যমঞ্চের প্রয়োজন হয় এবং নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা না হইলে নাটক রচনার জন্য মঞ্চসম্পর্কিত যে বিস্তৃত অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয়, তাহা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না। মঞ্চের সহিত সুষ্ঠু সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া সংলাপগুলি নাটকীয় রূপ লাভ করে এবং নাটকান্তর্গত চরিত্রগুলি প্রাণবন্ত হইয়া গতিশীল হয়। নাট্যকাহিনীর স্বাভাবিক বিন্যাস ও পরিমিত বিস্তৃতির জন্য নাট্যমঞ্চের সহিত নাট্যকারের একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা আছে। সার্থক নাট্যসৃষ্টিতে স্থায়ী সাধারণ নাট্যমঞ্চের যে কতখানি গুরুত্ব, তাহা পাশ্চাত্ত্য দেশের স্থায়ী নাট্যমঞ্চ এবং সুলিখিত, সার্থক ও মঞ্চ-সাফল্যমণ্ডিত নাটকের প্রাচুর্য দ্বারা প্রমাণিত হয়।

পূর্ব পাকিস্তানে নাট্যসাহিত্যের সমৃদ্ধির পথে প্রধান অন্তরায় স্থায়ী সাধারণ নাট্যমঞ্চের অভাব। কেবলমাত্র নাট্যমঞ্চই নহে, এখানে কোন পেশাদারী বা সৌখীন অভিনয়-সম্প্রদায়ও নাই। সেই হেতু, মুসলমান নাট্যকারদিগের মঞ্চসম্পর্কে যেমন কোনরূপ অভিজ্ঞতা নাই, তেমনি নাট্যশালার অভাবে নাটক রচনায় তাঁহারা আশানুরূপ প্রেরণা বা প্রয়োজনও অনুভব করেন না। এখানে যে সকল নাটক রচিত হইয়াছে, তাহাদের পাঠোপযোগী সাহিত্যগুণ থাকিলেও অধিকাংশেরই মঞ্চ-সাফল্য সম্পর্কে সন্দেহ আছে। পূর্ব পাকিস্তানের নাট্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে অবশ্যই ইহা একটি গুরুতর দৈন্য তাহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। নাটক অভিনীত হইলে তাহা জনসাধারণের

মনে যে আলোড়ন সৃষ্টি করে, তাহাতে নাটক-রচয়িতা ও অভিনেতা যুগপৎ প্রতিপ্রবুদ্ধ হয় এবং সাধারণ দর্শকের ভাবগ্রাহিতা ও সমালোচনার উপর নাটকের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ অধিকতর নির্ভর করে। বিভাগোত্তর পূর্ব পাকিস্তানে স্থায়ী সাধারণ নাট্যমঞ্চের অভাবে সার্থক নাট্যকার ও নাট্যশিল্পী অর্থাৎ অভিনেতা-অভিনেত্রীর আত্মপ্রকাশও সম্ভব হয় নাই।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের নাট্যসাহিত্যের যেরূপ সমৃদ্ধিময় ঐতিহ্য আছে এবং এমন কি, পশ্চিমবঙ্গের বাংলা নাটকের পশ্চাতেও যেমন হিন্দু যাত্রার ঐতিহ্য স্বীকার করা হয়, সেইরূপ ঐতিহ্য পূর্ব পাকিস্তানের নাটকের নাই। নাটকের উদ্ভব সাধারণতঃ ধর্মকে অবলম্বন করিয়াই সম্ভব হইয়াছে, এই দৃষ্টান্ত পৃথিবীর প্রায় সকল সাহিত্যেই আছে। মুসলমান-সম্প্রদায় পৌত্তলিকতা বিরোধী। ইসলাম্ ধর্মীয় কোন উৎসবকে কেন্দ্র করিয়া বা পৌরাণিক কোন কাহিনী অবলম্বন করিয়া নাটক রচনার কোন ইতিহাসের সন্ধান পাওয়া যায় না। মুসলমান সমাজ অপেক্ষাকৃত ধর্মভীরু, রক্ষণশীল ও অশিক্ষিত হওয়ায় সামাজিক ক্রিয়াকলাপ বা উৎসাহ উদ্দীপনা হইতেও বঞ্চিত ছিল। অতএব, স্বাভাবিক-ভাবেই মুসলমান সমাজের নিখুঁত চিত্র কোন নাটকের মধ্য দিয়া প্রকাশলাভের সুযোগ ঘটে নাই। বিভাগ পূর্ব বাংলা দেশে কয়েকজন মুসলমান নাট্যকারের রচনার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, তাহাতে ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গির কোনরূপ পরিচয় নাই, বরং হিন্দু সংস্কৃতি ও ধর্মজীবন হইতেই তাহাদের উৎপত্তি ও বিকাশ-ধারা লক্ষ্য করা যায়।

দেশবিভাগের পর হইতে মুসলমান সম্প্রদায়ের ধর্মীয় ও জাতীয় জীবনে এক বিশেষ পরিবর্তনের আভাস সূচিত হয়। রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা ও হিন্দু-সংস্কৃতির প্রভাব হইতে মুক্তির ফলে মুসলমান সাহিত্যিকগণ এক স্বতন্ত্র উৎসাহ ও উদ্দীপনা অনুভব করেন। ইসলাম ধর্ম, জাতি ও সামাজিক রীতিনীতি সম্পর্কে এক সুগভীর ও সচেতন ভাবের স্পর্শে সাম্প্রতিক সাহিত্য সমৃদ্ধিলাভ করিতে সুরু করে। নাট্যসাহিত্যের ক্ষেত্রেও পূর্ব পাকিস্তানে নবপ্রচেষ্টা ও নূতন পন্থা নিরূপণের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়।

(২)

পাকিস্তান সৃষ্টির পর নবচৈতন্য ও উৎসাহে উদ্বুদ্ধ হইয়া যে সকল শক্তিশালী নাট্যকার নাটক রচনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ইব্রাহিম

খান্, আবুল ফজল এবং শাহাদৎ হোসেনের নাম উল্লেখযোগ্য। ইব্রাহিম খান্ ইঁহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় নাট্যকার। তাঁহার নাটকগুলির মধ্যে প্রধানতঃ সমাজ-সংস্কারের ঔৎসুক্য লক্ষ্য করা যায়। দরিদ্র, মূর্খ সাধারণ গ্রামবাসীদের দুঃখ-বেদনায় নাট্যকারের সংবেদনশীল অন্তর সর্বদাই ব্যথিত ও বিচলিত। রক্ষণশীল মোল্লাদিগের কুসংস্কারজাত অজ্ঞতার প্রতি ইব্রাহিম খানের বিক্ষুব্ধ মনের বিদ্বেষপূর্ণ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের পরিচয়ও তাঁহার নাটকের মধ্যে লাভ করা যায়। তাঁহার বহুল পরিচিত সামাজিক নাটক 'কাফেলা'। এই নাটকটির কাহিনী অতি সাধারণ। এক গ্রামে কয়েকজন শিক্ষিত যুবক মিলিত হইয়া একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ করিল। একজন রক্ষণশীল মুন্সী তাহাদের এই সৎপ্রচেষ্টায় বাধা দিতে লাগিল। ইহাতে মুন্সীর প্রথমা স্ত্রী স্বামীর বিরোধিতা করিয়া বিপক্ষদলে যোগদান করিল। অবশেষে মুন্সী নিজের পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইল এবং তাহার নিজের বাড়ীতেই মুন্সীর স্ত্রী বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিল। মুন্সী, মুন্সীর প্রথমা স্ত্রী এবং বাগা মিঞার চরিত্র অতিশয় স্বাভাবিক ও জীবন্ত হইয়াছে। কিন্তু সমগ্রভাবে বিচার করিলে নাটকটি অতিনাট্যিক দোষ হইতে মুক্ত নহে এবং মুখ্যতঃ ইহা একটি সামাজিক ব্যঙ্গচিত্রেরই রূপলাভ করিযাছে। এই সকল ত্রুটি সত্ত্বেও ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, পাকিস্তান সৃষ্টির পর মুসলমান মধ্যবিত্ত সমাজে যে নূতন ভাবের আলোড়ন সুরু হইয়াছিল, তাহারই সার্থক প্রতিফলন 'কাফেলা'র মধ্যে লক্ষ্য করা যায়।

আবুল ফজল অনেক একাঙ্কিকা রচনা করিয়াছেন। তাঁহার প্রসিদ্ধ দুইটি নাটক 'চৌচির' ও 'একটি সকাল'। সামাজিক বিবিধ সমস্যা তাঁহার নাটকের বিষয়বস্তু। তথাকথিত সমাজনেতাদিগের ভুলভ্রান্তির প্রতি আবুল ফজলের ব্যঙ্গজ্বালামিশ্রিত সমালোচনা তাঁহার নাটকগুলিকে একটি স্বতন্ত্র মর্যাদা দান করিয়াছে। আবুল ফজল মুখ্যতঃ ঔপন্যাসিক এবং সেই-হেতু, তাঁহার নাটকের চরিত্রগুলি যথার্থ নাটকীয় সংলাপের মধ্য দিয়া জীবন্ত হইয়া উঠিতে পারে নাই—সংলাপ-প্রধান কাহিনী হইয়াছে মাত্র। তাহার পরিহাসের সূক্ষ্মতাও পরিবেশন-গুণের অভাবে স্থূল ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের পরিচয়ই প্রকাশ করে। তাঁহার নাট্যাকারে জীবনী-রচনার প্রয়াস প্রশংসার যোগ্য। 'কায়েদে আজম' আবুল ফজল লিখিত জীবনী-নাটক। জীবনী-নাটক রচনায় যে সূক্ষ্ম নাটকীয় কলাকৌশলের প্রয়োজন, তাহা আবুল ফজলের নাটকে দৃষ্টি-

গোচর হয় না। জীবনী-নাটকের আদর্শস্বরূপ 'আব্রাহাম্ লিঙ্কন', 'দি লেডী উইথ দি ল্যাম্প', প্রভৃতির সহিত 'কায়েদে আজম'কে এক পংক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নহে।

শাহাদৎ হোসেন এবং অন্যান্য কয়েকজন নাট্যকার যেমন আকবর উদ্দীন, ইব্রাহিম খলিল এবং গোলাম রহমান প্রধানতঃ ঐতিহাসিক নাটক রচনা করিয়াছেন। জনসাধারণের মধ্যে জাতীয় চেতনা জাগ্রত করিবার প্রয়াসই মুখ্যতঃ তাঁহাদের ঐতিহাসিক নাটকগুলির মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। নাট্যকার হইলেও কবি হিসাবেও শাহাদৎ হোসেনের খ্যাতি আছে। তাঁহার ভাষায় একটি স্বতন্ত্র মাধুর্য বর্তমান। 'মসনদের মোহ', 'আনারকলি' তাঁহার উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক নাটক। ইতিহাসের পটভূমিকা থাকিলেও 'আনারকলি' মুখ্যতঃ প্রণয়কাহিনী। এই প্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের ঐতিহাসিক নাটকগুলি স্মরণ করা যাইতে পারে। তবে দ্বিজেন্দ্রলালের ন্যায় শাহাদৎ হোসেনের কোনরূপ উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব নাই। দ্বিজেন্দ্রলালের ইতিহাসের অভিজ্ঞতা সুদূরপ্রসারী এবং তিনি শেকস্‌পীয়ারের সমগ্র ঐতিহাসিক নাটকের সহিত পরিচিত ছিলেন। জার্মান লেখক শীলারের রচনাও দ্বিজেন্দ্রলাল পাঠ করেন এবং জার্মান রোমান্টিসিজম্ সেই সময় মুখ্যতঃ হিন্দু লেখকদিগের মানসজগৎ অধিকার করে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষে হিন্দু লেখকদিগের নিকট দেশপ্রেম প্রধানতঃ একটি বিশিষ্ট ধর্মমতে রূপান্তরিত হইয়াছিল। এই জাতীয় কোনরূপ প্রভাব পূর্ব পাকিস্তানের নাট্যকারদিগের লিখিত ঐতিহাসিক নাটকে অনুভব করা যায় না।

'মসনদের মোহ' নাটকের জান্নাত্-উন্-নিসার চরিত্রে দ্বিজেন্দ্রলালের 'নূরজাহান্' চরিত্রের সামান্য ইঙ্গিত পাওয়া যায়। দুই অঙ্কে সমাপ্ত 'মসনদের মোহ' চরিত্রগত দুর্জ্ঞেয়তায় এবং বিয়োগান্ত নাটকের রহস্যঘন গাম্ভীর্যে, দ্বিজেন্দ্রলালের 'নূরজাহান' বা 'শাহজাহানে'র সমকক্ষতা অর্জন করিতে পারে নাই। যদিও 'মসনদের মোহে'র বিষয়বস্তু বাংলার ইতিহাসের একটি চরম সঙ্কট মুহূর্ত হইতে গৃহীত হইয়াছে এবং নাট্যকার ইহার মাধ্যমে একটি নৈতিক শিক্ষাদর্শ প্রচারের প্রয়াস পাইয়াছেন, তথাপি নাটক হিসাবে তাহা সার্থক হয় নাই। যে বিপদ বা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইলে মানুষের জীবনের মূল্য যাচাই হয় এবং বিবিধ দ্বন্দ্বসংঘাতে মানুষের অখণ্ড পরিচয় উদ্ভাসিত হইয়া উঠে,

সেইরূপ কোন চিত্র শাহাদৎ হোসেনের নাটকে লাভ করা যায় না। নাট্যাকারে তিনি কেবল বিশেষ বিশেষ কতকগুলি ঘটনা বিবৃত করিয়া গিয়াছেন মাত্র।

ঐতিহাসিক নাটক রচনার ক্ষেত্রে আকবর উদ্দীনেরও একটি বিশেষ স্থান আছে। ঐতিহাসিক নাটক ব্যতীত তিনি সামাজিক নাটকও রচনা করিয়াছেন। 'আজান' তাঁহার লিখিত একটি বিশিষ্ট সামাজিক নাটক। 'সিন্ধু-বিজয়' ও 'নাদির শাহ' তাঁহার বিখ্যাত দুইটি ঐতিহাসিক নাটক। মোহাম্মদ বিন্ কাসিমের সিন্ধুবিজয় ঘটনা অবলম্বন করিয়া 'সিন্ধু-বিজয়' নাটক-টির কাহিনী পরিকল্পিত হইয়াছে। স্থানীয় সম্রাট্ দাহিরের সহিত মোহাম্মদ বিন্ কাসিমের সংগ্রাম এবং অন্যায় ও অসঙ্গতভাবে দাহিরের দুই কন্যা মীরা ও উমা কর্তৃক বিন্ কাসিমের উপর দোষারোপ ও তাহাকে নৃশংস ভাবে হত্যার কাহিনীই 'সিন্ধু-বিজয়' নাটকের মধ্যে পাওয়া যায়। অতি সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে নাটকটি শেষ হইলেও নাট্যকারের রচনাকৌশলের নিদর্শন ইহাতে যথেষ্ট আছে। চরিত্র-চিত্রণেও আকবর উদ্দীন দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন।

'নাদির শাহ' নাটকটির কাহিনী আফগান্ সম্রাট্ নাদির শাহের দিল্লী বিজয়াভিযানের ঘটনা অবলম্বনে লিখিত। নাটকটিতে ঘটনার ঘনঘটা আছে, কিন্তু ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রাঙ্কন আশানুরূপ সার্থক হয় নাই।

পূর্ব পাকিস্তানের প্রবীণ নাট্যকারদিগের কোন রচনার মধ্যে সার্থক সৃষ্টি-কুশলতার নিদর্শন পাওয়া যায় না। নাটকের বিশিষ্ট শিল্পগুণ অপেক্ষা নাটকের মধ্য দিয়া বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য প্রচারের প্রতি নাট্যকারগণ অধিকতর সচেতন। পাশ্চাত্ত্য নাটকের গঠনাদর্শ অনুসরণ করিলেও তাহার অন্তঃশক্তি গ্রহণ-ক্ষমতার পরিচয় পূর্ব পাকিস্তানের কোন নাট্যকারের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না। প্রধান লেখকগণের মধ্যে কবি জসিমুদ্দীন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদ্ধতিতে একটি নাটক রচনা করেন। 'বেদের মেয়ে' তাহার বিখ্যাত নাটক। গুলিস্তানের অপেশাদারী এক অভিনেতৃদল কর্তৃক সাফল্যের সহিত অভিনীত হওয়ায় ইহা অধিকতর জনপ্রিয় হইয়াছে।

'বেদের মেয়ে' পাশ্চাত্ত্য নাটকের অনুকরণে লিখিত নাটক নহে। ইহাকে লোক-নাট্য (Folk-play) বলাই অধিকতর সঙ্গত। সাপুড়িয়া-স্ত্রী চম্পার বিষাদময় জীবনের কাহিনী 'বেদের মেয়ে'র নাট্যবস্তু। চম্পা রূপসী। তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়া গ্রামের মোড়ল তাহাকে প্রলুব্ধ করিবার চেষ্টা

করিল। সাপুড়িয়ারা মোড়লকে বাধা দিল। কিন্তু মোড়ল তাহাতে নিবস্ত হইল না। উভয় পক্ষে প্রচণ্ড বিবাদ বাধিল। চম্পা শেষে নিজের সতীধর্ম বিসর্জন দিয়া সমগ্র সাপুড়িয়া দলকে রক্ষা করিল। চম্পার স্বামী অন্য এক বালিকাকে বিবাহ করিল। মোড়লের ভোগতৃষ্ণা নিবৃত্ত হইলে চম্পা পরিত্যক্তা হইয়া স্বামীর নিকট ফিরিয়া আসিল। কিন্তু সেখানে তাহার আর স্থান হইল না। চম্পার বাঁচিয়া থাকিবার আর কোন আবরণ রহিল না। স্বেচ্ছায় সে মৃত্যু বরণ করিল।

জসিমুদ্দীন মুখ্যতঃ কবি। তাহার নাটকে নাট্যধর্ম ও শিল্পচেতনা অপেক্ষা গীতিকবিতার স্পর্শই অধিকতর অনুভব করা যায়। তাহার ভাষাও অপূর্ব কাব্যসুষমামণ্ডিত হইয়াছে। বিশেষতঃ সংলাপে আঞ্চলিক গ্রাম্যভাষার সুযোগ্য ব্যবহার করিয়া জসিমুদ্দীন তাঁহার অপূর্ব রচনাশক্তির পরিচয় দিয়াছেন এবং ফলে, নাটকটিও সাধারণের নিকট অধিকতর আবেদনগ্রাহ্য হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ চম্পার সংলাপের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে:

চম্পা। বৈষ্টমি। তুইত জানস না, আমার বুকের মদ্দি আইজ কেমন করতাছে—আমি সারা রাত জাইগ্যা থাকি, আমার সঙ্গে সঙ্গে নিশিযালের মাটির চেরাগ জ্বলতি থাকে। সকাল আইলে মাটির চেরাগ নিব্যা যায়, কিন্তুক মনের আনল নেবেনা। আমি মাটির উপর কয়লা দিয়া আমাগো বাইগ্যার নায়ের নক্সা আঁকি—আলার বাইগ্যারা কোন স্থান হইতে কোন নদী দিয়া কোথায় যাইতেছে, তা আমি কয়লার দাগ দিয়া আক্যা চায়া চায়া দেখি। সেই বাইগ্যার দল আইজ আমারে ভুইল্যা গ্যাছে।

চম্পার বেদনাময় করুণ কাহিনী অতিশয় সহৃদয়তার সহিত বিবৃত হইলেও 'বেদের মেয়ে' নাটকে চারিত্রিক দ্বন্দ্ব সংঘাত প্রবল হইয়া উঠে নাই এবং ঘটনাবর্তও স্থানে স্থানে শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। অতি নাটকীয় দোষ হইতেও 'বেদের মেয়ে' নাটকটি সম্পূর্ণ মুক্ত নহে।

পূর্ব-বাংলার গ্রাম্যজীবনের সুখদুঃখের ছবি আজিমুদ্দীনের নাটকের মধ্য দিয়াও সুন্দরভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। তিনিও জসিমুদ্দীনের পথই অনুসরণ করিয়াছেন। আজিমুদ্দীনের লিখিত 'মহুয়া' নাটকটি 'বেদের মেয়ে'রই অনুকরণ বলা যায়।

নুরুল মোমেন 'নেমেসিস' নাটকটি রচনা করিয়াই বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁহার এই নাটকটি ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইলে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষিত মহলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। 'নেমেসিস' একটি দীর্ঘ একাঙ্ক নাটক। ইহার রচনাশৈলী অপূর্ব। নাটকীয় রচনামাধুর্যের ক্ষেত্রে

মুরুল মোমেনকে পূর্ব পাকিস্তানের সর্বপ্রথম সচেতন শিল্পী বলিয়া আখ্যাত করা যায়। 'নেমেসিসে'র পরিকল্পনা সম্পূর্ণ অভিনব এবং একটি মাত্র চরিত্রের দ্বন্দ্বই নাটকটির মূল বিষয়। এই একটি চরিত্রের দীর্ঘ সংলাপের ভিতর দিয়া সমগ্র নাট্যকাহিনী বিবৃত হইয়াছে এবং সার্থকভাবেই একটি চরিত্রের পরিপূর্ণ ছবি পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

'নেমেসিসে'র নায়ক একজন স্কুল-মাস্টার। ১৯৪৩ সালে বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষের সময়ে সে এক প্রথম শ্রেণীর চোরাকারবারী হইয়া উঠিল। চোরা-কারবারে যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় করিয়াও সে কোন শান্তি পাইল না। ন্যায়-অন্যায়ের প্রবল মানসিক দ্বন্দ্বে তাহার অন্তর জর্জরিত হইতে লাগিল। অবশেষে সে আত্মঘাতী হইয়া সকল দুষ্কৃতি হইতে রক্ষা পাইতে চাহিল।

নুরুল মোমেন তাঁহার নাটকে এক দুর্লভ রচনাশক্তির দ্বারা নায়কের দ্বন্দ্ব সংঘাতের চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন এবং তাঁহার নাটকে নায়কের অনুতাপ, ব্যথা-বেদনা, ভাগ্যদেবীর নিষ্ঠুর পরিহাস সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। 'নেমেসিস' নাটকটির প্রতিটি সংলাপের মধ্যে নাট্যকারের তীক্ষ্ণ ধীশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। 'নেমেসিস' হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল :

> দেখা হলো দুর্ভিক্ষ রাক্ষসীর সঙ্গে। ইনটেলেক্‌টের মূল্য তার কাছে কয়েক টুকরো হাড়ের বেষ্টনীতে ছটাক-খানেক মগজ মাত্র। তার নড়বড়ে দাঁতের প্রথম কামড়েই বাবা প্রাণ দিলেন। ফোকলার মাঝে পড়ে অর্ধচিবানো অবস্থায় মা আর আমি রইলাম বেঁচে।

উচ্চশ্রেণীর নাটকীয় মর্যাদায় ভূষিত হইলেও 'নেমেসিস' নাটকের মঞ্চ সাফল্য সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ আছে।

নুরুল মোমেনের 'রূপান্তর' পরিহাসমুখর একটি মিলনান্ত নাটক নাটকটির কাহিনীর মধ্যে কোনরূপ অসাধারণত্ব নাই। একজন পণ্ডিত ব্যক্তি স্ত্রীজাতি ও বিবাহ সম্পর্কে এক অভিনব দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া বিদেশ হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিল। দেশে ফিরিয়া সে তাহার বাগ্‌দত্তা পাত্রীর সহিত বিবাহ প্রত্যাহার করিল, যদিও সে পাত্রীটিকে পূর্বে কখনও দেখে নাই। সে তাহার সহকারিণীর প্রেমে পড়িয়া তাহাকে বিবাহ করিবার সিদ্ধান্ত করিল। সেই সময় পূর্ব-বাগ্‌দত্তা পাত্রীর নিকট হইতে সে তাহার বিবাহ নাকচ করিবার একটি পত্র পাইল। সে এক জটিল সমস্যার সম্মুখীন হইল। কিন্তু এই সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান হইল যখন সে আবিষ্কার করিল যে, তাহার সহ-কারিণীই ছদ্মবেশধারিণী তাহার পূর্ব-বাগ্‌দত্তা পাত্রী।

নাটকের হাস্যরসাত্মক পরিণতির মধ্যে নাট্যকারের শ্লেষাত্মক মনোবৃত্তির বিশেষ তীব্রতা নাই। স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ শ্লেষ প্রয়োগ থাকিলেও তাহাতে বিদ্রূপাত্মক জ্বালা নাই। বক্রোক্তি, উপমা ও আপাতবিরোধী শব্দ প্রয়োগে সংলাপগুলি উপাদেয় ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। ইহার নাটকীয় সংস্থান ও চরিত্রচিত্রণে রবীন্দ্রনাথের 'চিরকুমার সভা'র প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। নাটকের রচনাশৈলীর ভিতর দিয়া নুরুল মোমেনের একটি বিশিষ্ট ব্যক্তিসত্তা প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহার রচনারীতিতে প্রমথ চৌধুরীর প্রভাব অনুভূত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ—'রূপান্তর' নাটক হইতে আধুনিক নারী সম্পর্কিত সংলাপের কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল।

জাহাঙ্গীর। আধুনিকা কিনা জানি না ঃ তবে চিনি। হ্যাঁ, প্রায় দেখি : কানে চকমকে হীরের দুল, শুভ্র তনুকে লেপ্‌টে আছে ঝলমলে টিস্যু শাড়ী অগ্রগতির পাটিসাপটা যেন! Creamy ডিল্লী-সাস! চলেন নৃত্য-ছন্দে ; দুতলা তিনতলায় চড়াই-উৎরাই পর্যন্ত হয়ে যায় পিয়ানোর টুংটাং বাজনার মত, পা কোন সিঁড়ি ছোঁয় ; কোনটা ছোঁয়ও না।

নাট্যবস্তু ও রচনাশৈলীর দিক হইতে নুরুল মোমেন প্রবীণ ও নবীন নাট্যকারগণের মধ্যে সেতুস্বরূপ। তাঁহার সম্পর্কে এই মন্তব্য নিঃসন্দেহে স্বীকার করা যায়।

নবীন নাট্যকারগণের কয়েকটি বিশিষ্ট নাটক দ্বারা পুর্ব পাকিস্তানের সাম্প্রতিক নাট্যসাহিত্য বিশেষ ভাবে সমৃদ্ধ হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে শওকত্ ওসমান, মুনীর চৌধুরী, আসকার ইব্‌নে শাইখ প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহাদের নাটকগুলি যেমন সাহিত্যগুণে সমৃদ্ধ তেমনি মঞ্চে সফল অভিনয়ে সার্থক হইবার যোগ্য।

শওকত্ ওসমান সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার ভিত্তিতে নাটক রচনা করিয়াছেন। তিনি মানব জীবনের বিবিধ ভুলভ্রান্তি, ত্রুটি-বিচ্যুতিকে অবলম্বন করিয়া তীব্র ব্যঙ্গ ও হাস্যরসের অবতারণা করিয়াছেন। উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ইচ্ছাকৃত অত্যাচার ও পীড়নে সমাজের সাধারণ লোকের কিরূপ দুঃখ ও লাঞ্ছনা হয়, তাহার নিখুঁত বাস্তবচিত্র শওকতের নাটকে পাওয়া যায়। ব্রিটিশ রাজত্বে উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী অর্থাৎ তথাকথিত আই. সি. এস্.-দের আচরণ তাঁহার তীব্র উপহাসের বিষয় হইয়াছে। শওকতের 'আমলার মামলা' নাটকটি ইহার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। 'তস্কর ও লস্কর'ও তাঁহার একটি বিশিষ্ট সামাজিক সমস্যাপ্রধান নাটক।

মানুষের স্বার্থলোলুপতা ও দুর্বলতাকে কেন্দ্র করিয়া ব্যঙ্গবিদ্রূপ সৃষ্টিতে শওকত অসামান্য পারদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার 'কাঁকরমণি' একটি উল্লেখযোগ্য নাটক।এই নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র সোলেমান একজন চাউল-ব্যবসায়ী। সে জেন্দা হইতে পাথর এবং রাজপুতানার মরুভূমি হইতে বালি লইয়া আসিয়া চাউলের সহিত মিশাইয়া বিক্রয় করিত। সে দুইজন কবর-খননকারীর সাহায্যে শূন্য কবরের ভিতর এই খাদ্যসামগ্রী মজুত রাখিত। কবর-খননকারী দুইজন জীবিত মানুষকেও কবর দিতে পারে বলিয়া গর্ব করিত। সোলেমান সরকারী কর্মচারীকে ঘুষ দিয়া এই চোরা কারবার চালাইত। একবার সে উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী জামসেদ চৌধুরীকে তাহার প্রদত্ত উৎকোচে সম্মত করাইতে না পারিয়া বিপদে পড়িল এবং আজাদ নামক একজন তরুণ ব্যারিস্টারের শরণাপন্ন হইল। আজাদ জামসেদ চৌধুরীর ভাবী জামাতা। সোলেমানের নিকট হইতে এক লক্ষ টাকার প্রতিশ্রুতিতে আজাদ তাহাকে বিপদ হইতে রক্ষা করিল। কিন্তু সোলেমান মৃতের ভাণ করিয়া আজাদের প্রাপ্য টাকা ফাঁকি দিতে চেষ্টা করিল। আজাদও শাকিলার সহানুভূতি আকর্ষণ করিবার জন্য মৃতের ভাণ করিল। কবরক্ষেত্রে আজাদকে দেখিয়া সোলেমান হতবুদ্ধি হইল। এইভাবে আজাদ সোলেমানেব নিকট হইতে প্রতিশ্রুত অর্থ এবং শাকিলার সহানুভূতি উভয়ই লাভ করিল।

নাট্যকার শ্লেষ ও কৌতুক-রসের মধ্য দিয়া অভিজাত ধনী সম্প্রদায়ের আচার ও ক্রিয়াকলাপের নিখুঁত বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। কল্পনা ও বাস্তব উভয়ের সংমিশ্রণে লিখিত এই নাটকের কয়েকটি বিশেষ ঘটনা ইহার নাটকীয় গতি অব্যাহত রাখিয়াছে। নাটকের সংলাপগুলি নাট্যকারের কৌতুকপূর্ণ বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের পরিচয় দান করে। 'কাঁকরমণি' হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল :

আজাদ। সত্যি শাকিলা, বঁড়শীতে মাছ গেঁথে এই খেলা তোমার ভাল লাগছে ?

শাকিলা। টোপে কাঁটা থাকে, তা ভুলে গিয়েছিলে।

আজাদ। (উত্তেজিত ভাবে দাঁড়াইয়া) বেশ মনে রেখো, আমি-ও পুরুষ।

শাকিলা। তুমিও মনে রেখো, পানি পদ্মায়-মেঘনায়-বিলে-পুকুরে-টিউব-ওয়েলে পাওয়া যায়। তবু চাতক বৃষ্টি-বিন্দুর দিকে চেয়ে থাকে।

কৌতুক রস পরিবেশনে নাট্যকার সর্বত্র সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতে পারেন নাই। যথাযথ প্রয়োগ-নৈপুণ্যের অভাবে নাটকের কোন কোন অংশ

অত্যন্ত দুর্বল হইয়াছে। শাকিলার পিতা সোলেমানের সহিত যখন তাহার পরিচয় করাইয়া দিল, তখন শাকিলার উক্তিগুলি চরিত্রানুগ হয় নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'কাঁকরমণি' হইতে অংশবিশেষ উদ্ধৃত হইল :

শাকিলা। আচ্ছা, হতি আমার চাচা—এমন ধেড়ে old চাচা রয়েছে আগে দেখা হয় নি কেন?

সোলেমান। আমরা একে অপরকে ভাইয়ের মত মনে করি—মামতুতো—ভাই—খালাতো।

শাকিলা। I see, spiritual relation (মেমসাহেবী কায়দায় উচ্চারণ) আপনাদের সম্বন্ধটা আধ্যাত্মিক—কহাণী।

বহুবিধ ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও শওকত ওসমানের 'কাঁকরমণি' মঞ্চে পূর্ণ সার্থকতা লাভ করিবার যোগ্য।

সমাজ-সচেতন নাট্যকার হিসাবে মুনীর চৌধুরীর প্রাধান্যও অস্বীকার করা যায় না। তাহার লিখিত 'কবর' ও 'মানুষ' দুইটি উল্লেখযোগ্য নাটক। 'কবর' নাটকটি অতিনাট্যিক দোষে দুষ্ট হইলেও নাট্যকারের শিল্পচাতুর্যের নিদর্শন ইহাতে দুর্লভ নহে। পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা আন্দোলনের পটভূমিকার উপর ইহার নাট্যবস্তু গড়িয়া উঠিয়াছে। রূপকের সহায়তায় সত্যান্বেষণের প্রয়াসের ভিতর দিয়া নাট্যকারের নির্ভীক মনের পরিচয় পাওয়া যায়। রূপকধর্মী হইলেও নাটকীয় চরিত্রগুলির মানবিক গুণ ক্ষুণ্ন হয় নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'কবর' নাটকের কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল :

মূর্তি। তোমার সব কষ্ট বুঝি, মা। নাক মুখ বেয়ে আমার কেবল রক্ত গড়িয়ে পড়ছিল। সমস্ত দুনিয়াটা ঝাপসা হয়ে এলো। আমার তখন খালি কি মনে হচ্ছিল জান মা? মনে হচ্ছিল তুমি বুঝি আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছো। সেই সেবার টাইফয়েড জ্বরের ঘোরে যখন খালি প্রলাপ বকতাম, তখন যেমন আমায় জড়িয়ে ধরে কাঁদতে—ঠিক তেমনি। আর আমার নাক মুখ গড়িয়ে তোমার চোখের গরম নোনা পানি কেবল ঝরছে। ঝরছে।

রূপকধর্মিতা এবং কয়েকটি ঘটনা ও চরিত্রের মধ্যে বাস্তবগামিতা উভয়ের সমাবেশে নাটকখানি উপভোগ্য হইয়াছে।

মুনীর চৌধুরী অনুবাদ নাটকেও প্রশংসনীয় কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছেন। তাঁহার জর্জ বার্নার্ড শ'র *You Never Can Tell* এর নাট্যোপযোগী বাংলা অনুবাদ 'কেউ কিছু বলতে পারে না'। এই জাতীয় অনুবাদে অপর একজন নাট্যকারের নাম উল্লেখ করা যায়, তিনি কবীর চৌধুরী। আমেরিকার লেখক ক্লিফর্ড ওডেটে'র *Waiting for Lefty*-র তিনি বাংলা অনুবাদ করিয়াছেন। তাঁহার অনূদিত নাটকটির নাম 'আহ্বান'।

নবীন নাট্যকারদিগের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছেন আস্‌কার ইব্‌নে শাইখ। তিনি একজন আদর্শবাদী নাট্যকার। মানব জীবনের বৃহত্তর আদর্শের দিকটি তাঁহার অধিকাংশ নাটকে সুন্দরভাবে রূপায়িত হইয়াছে। জমিদার-শাসিত বাংলাদেশের নিখুঁত সমাজ-জীবনের পরিচয় আস্‌কার ইবনের নাটকে যেমন পাওয়া যায়, অন্যত্র তাহা দুর্লভ। জমিদারের অত্যাচারে লাঞ্ছিত সাধারণ গ্রামবাসীর দুঃখ-বেদনাকে নাট্যকার তাঁহার নাটকে অত্যন্ত সহৃদয়তার সহিত বর্ণনা করিয়াছেন। 'বিরোধ', 'পদক্ষেপ', 'বিদ্রোহী পদ্মা', 'দুরন্ত ঢেউ' প্রভৃতি তাঁহার উল্লেখযোগ্য নাট্যসৃষ্টি। আস্‌কারের সামাজিক নাট্যকাহিনীর উপর তারাশঙ্করের কোন কোন উপন্যাসের প্রভাব অনুভব করা যায়।

আস্‌কার ইবনে শাইখ সামাজিক নাটক ছাড়াও ঐতিহাসিক নাটক রচনাতেও পারদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন। সিপাহী বিদ্রোহের ঘটনা অবলম্বনে লিখিত 'অগ্নিগিরি' তাঁহার প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক নাটক। মৈমনসিংহ গীতিকার কাহিনী ভিত্তি করিয়া আস্‌কার ইবনে শাইখ কয়েকটি গীতিপ্রধান নাটকও রচনা করিয়াছেন। কাব্য ও সঙ্গীতের সুষমায় এই নাটকগুলি রসোত্তীর্ণ হইয়াছে। কেবলমাত্র এই জাতীয় নাটকে আঞ্চলিক ভাষা-ব্যবহারে তিনি বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারেন নাই।

পূর্ব পাকিস্তানে সাম্প্রতিক কালে 'নৌফেল ও হাতেম' নামক কাব্য-নাট্য রচনা করিয়া কবি ফররুখ্ আহমদ বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। নূতন ভঙ্গিতে অমিত্রাক্ষর ছন্দে এই নাটকটি লিখিত। মুসলমান নাট্যকারদিগের মধ্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দে সর্বপ্রথম নাটক রচনা করিয়া ফররুখ্ আহমদ একটি নূতন নাট্যপদ্ধতির প্রবর্তন করিয়াছেন। ফররুখের নাটক রচনায় মাইকেল মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিত কাব্যসমূহই যে একমাত্র প্রেরণা ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। মাইকেলের ন্যায় ভাষার গাম্ভীর্য ও ওজস্বিতায় এবং ছন্দ নির্মাণ কৌশলে ফররুখ সম্পূর্ণ সার্থক না হইলেও, তাঁহার সযত্ন আন্তরিক প্রয়াস উপেক্ষণীয় নহে। মাইকেলের 'মেঘনাদবধ কাব্য' হইতে কয়েকটি উদ্ধৃতি দিয়া 'নৌফেল ও হাতেম' কাব্য-নাট্যটির কাব্যগুণ প্রদর্শন এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। 'মেঘনাদবধ কাব্যে' বীরবাহুর মৃত্যুতে রাবণের বিলাপ :

"………কে আর রাখিবে
এ বিপুল-কুল-মান এ কাল-সমরে !

বনের মাঝারে যথা শাখাদলে আগে
একে একে কাঠুরিয়া কাটি, অবশেষে
নাশে বৃক্ষে, হে বিধাতঃ, এ দুরন্ত রিপু
তেমতি দুর্বল, দেখ, করিছে আমারে
নিরন্তর! হ'ব আমি নির্মূল সমূলে
এর শরে! তা না হ'লে মরিত কি কভু
শূলী শম্ভু সম ভাই, কুম্ভকর্ণ মম,
অকালে আমার দোষে?......"

'নৌফেল ও হাতেম' নাটকে নৌফেলের তীব্র মানসিক দ্বন্দ্ব:

সংশয় সন্দেহ মনে দোলা দেয় জুলমাতের তীরে
অনিশ্চিত। অনিশ্চিত অন্ধকারে কাফেলা যেমন
মঞ্জিলের রাহা ভুলে দীর্ণ হয় তীব্র বচসায়
বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন পথে; তিক্ত চিন্তা তেমতি প্রাণের
নিয়েছে প্রশান্তি কেড়ে সংশয়-বিদীর্ণ এ জীবনে।
শান্তি নাই, স্বস্তি নাই সুপ্তিহীন রাত্রির প্রহরে।

'মেঘনাদবধ কাব্যে' ইন্দ্রজিতের সমরাভিযানের উদ্যোগে রাবণ উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিতেছে:

কহ সবে মুক্তকণ্ঠে, সাজে অরিন্দম
ইন্দ্রজিৎ। ভয়াকুল কাঁপুক শিবিরে
রঘুপতি, বিভীষণ, রক্ষঃ-কুল-কালি,
দণ্ডক অরণ্যচর ক্ষুদ্র প্রাণী যত।

'নৌফেল ও হাতেম' নাটকে নৌফেলের সংকল্পে দৃঢ়তা:

যায় যদি জিন্দেগী আমার, দেখে যেতে চাই তবু
মৃত্যু তার। রাজ্য যদি যায়—তবে যাক, তাজ তখ্‌ত
লুটায় ধুলায় যদি, লুটাক, বিদ্রোহী প্রজাদল
ঝাণ্ডা যদি তোলে বিদ্রোহের—করুক বিদ্রোহ তারা
দেখে যেতে চাই তবু মৃত্যু তার।......

'নৌফেল ও হাতেমে'র নাটকীয় রচনাভঙ্গিতে ফররুখের বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। সংলাপগুলি চরিত্রানুযায়ী পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। এ'ক্ষেত্রে নাট্যকারের সতর্কদৃষ্টি প্রশংসনীয়। নৌফেল রাজা। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই তাহার ভাষা হইতে সাধারণ কাঠুরিয়ার ভাষা পৃথক হবে। এই প্রসঙ্গে 'নৌফেল ও হাতেমে'র কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল:

বৃদ্ধ। চলো যাই কাঠের সন্ধানে
কিম্বা চলো ফিরে যাই ঘরে। অসংখ্য ভল্লুক, বাঘ
এ বনে লুকিয়ে আছে, আজদাহার আস্তানা
এখানে।

১ম পুত্র। হাতেম তায়ীর খোঁজে যাব ঘন অরণ্যে।

২য় পুত্র॥ আমিও
একসঙ্গে যেতে চাই শিকার সন্ধানে।

৩য় পুত্র॥ কাঠ কাটা
আজ তবে বন্ধ থাক।

'নৌফেল ও হাতেম' সম্পূর্ণ নূতন আঙ্গিকে রচিত নাটক, এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এই পদ্ধতিতে নাটক রচনার ভবিষ্যৎ যে বিশেষ আশাপ্রদ নহে, তাহা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়।

পূর্বোল্লিখিত নাট্যকারগণ ব্যতীত পূর্ব পাকিস্তানে অন্য যাঁহারা নাটক রচনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে আনিস চৌধুরী, আবদুল হক, আলী মনসুর, কাজী মহম্মদ ইলিয়াস, ওবায়দুল হক, সৈয়দ ওয়ালী-উল্লাহ, আবু জাফর শামসুদ্দিন, আশ্‌ফাকুজ্জমান, মুফাখ্‌খারুল ইসলাম প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

অষ্টম অধ্যায়

জীবনী-নাটক

(১৯৩৯—১৯৬০)

বিংশ শতাব্দীতে বাংলা নাট্যসাহিত্যের আর একটি বিশিষ্ট রূপ প্রকাশ পায়, তাহা জীবনী-নাটক। বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক চরিত্র অবলম্বন করিয়া বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্তও যে সকল নাটক রচিত হইয়াছে, তাহা প্রধানতঃ রোমান্টিক নাটক; ঐতিহাসিক জীবনচরিত ইহাদের মধ্য দিয়া কীর্তিত হইলেও ঐতিহাসিক তথ্যের প্রতি যে ইহাদের মধ্যে নিষ্ঠা প্রদর্শন করা হয় নাই, বরং উচ্ছ্বাস ও আবেগমূলক তথ্য ও অতথ্যে পূর্ণ হইয়া ইহারা কতকগুলি সাময়িক প্রয়োজনীয়তা সিদ্ধ করিয়াছে, তাহা পূর্ববর্তী আলোচনা হইতে দেখা গিয়াছে; কিন্তু জীবনী-নাটক প্রকৃতপক্ষে তাহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ইহাদের মধ্যে উনবিংশ শতাব্দীর বিশিষ্ট কতকগুলি জীবন চরিতই ভিত্তি করা হইয়াছে, এই চরিত্রগুলি সুদূর ঐতিহাসিক লোক হইতে আসে নাই, বরং তাহার পরিবর্তে বহুলাংশে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত জগৎ ও জীবন আশ্রয় করিয়া বিকাশ লাভ করিয়াছে বলিয়া ইহাদের রচনায় কোনও অতথ্য কিংবা যুক্তিহীন হৃদয়াবেগ প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই। বাংলার মধ্যযুগে চৈতন্যদেবের ব্যক্তিত্ব অবলম্বন করিয়া বিপুল এক জীবনী-সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা সর্বাংশেই যুক্তি ও বিচারভিত্তিক না হইলেও যে বিশেষ সম্প্রদায় কর্তৃক রচিত এবং প্রতিপালিত হইয়াছিল, তাহার আধ্যাত্মিক দৃষ্টির সঙ্গে যোগ স্থাপন করিয়া সহজেই পুষ্টিলাভ করিয়াছিল। বিংশ শতাব্দীতেও যে জীবনী-নাটক কয়খানি রচিত হইয়াছিল, তাহাও যুগোচিত যুক্তি ও বিচারকেই আশ্রয় করিয়া বিকাশ লাভ করিয়াছিল, সমসাময়িক ইতিহাসাশ্রিত রোমান্টিক নাটকের ধারা হইতে ইহারা স্বতন্ত্র ছিল। অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকেই ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ যে 'প্রতাপাদিত্য' নাটক রচনা করিয়াছিলেন, কিংবা দ্বিজেন্দ্রলাল রায় যে 'রাণা প্রতাপ' ঐতিহাসিক নাটক

রচনা করিয়াছিলেন, বিংশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যবর্তী কালে রচিত জীবনী-নাটক কয়খানি ইহা অপেক্ষা সকল বিষয়েই স্বতন্ত্র। ইহাদের মধ্যে যে কয়টি জীবনী আশ্রয় করা হইয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকটিই উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর সমাজ হইতেই গৃহীত হইয়াছে।

উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর মধ্যে সমাজ-চেতনা যতখানি শক্তিশালী ছিল, রাষ্ট্রীয় চেতনা ততখানি শক্তিশালী ছিল না। এই সমাজ-চেতনার উপরই রাষ্ট্রীয়-চেতনা ক্রমে শক্তি লাভ করিয়াছিল সত্য, কিন্তু তথাপি শিক্ষা এবং সমাজ-সম্পর্কিত চেতনার ভিতর দিয়াই পরিণামে ইহার উন্মেষ হইয়াছিল। সুতরাং উনবিংশ শতাব্দীব বাঙ্গালীর মনীষা সমাজ ও সাহিত্যচিন্তার ভিতর দিয়াই বিকাশ লাভ করিয়াছিল। কিন্তু মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের বাংলা ঐতিহাসিক নাটকের নায়ক মাত্রই রাষ্ট্রীয় শক্তির অধিকারী—রাজা বাদশাহ। চৈতন্যদেব, তাঁহার পার্ষদ, কিংবা অনুরূপ ভারতীয় অন্যান্য কোন কোন ধর্মগুরুকে অবলম্বন করিয়া যে কয়খানি নাটক বাংলা নাট্যসাহিত্যের মধ্য ও আধুনিক যুগেও রচিত হইয়াছিল, অলৌকিকতা-বিশ্বাসকে আশ্রয় করিবার ফলে তাঁহাদের জীবনীভিত্তিক নাটকগুলিও পৌরাণিক নাটকের পর্যায়ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে, আধুনিক জীবনী-নাটকের রস তাহাদের মধ্য দিয়াও সঞ্চারিত হইতে পারে নাই। এমন কি, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবন ও কর্ম উনবিংশ শতাব্দীরই বিষয় হইলেও ক্রমে তাঁহার ধর্মজীবন ও সাধনা সম্পর্কে নানা অলৌকিক কাহিনী জন্মলাভ করিবার ফলে তাঁহার জীবনভিত্তিক যে কয়খানি নাটক সাম্প্রতিক কালে রচিত হইয়াছে, তাহাও পৌবাণিক নাটকের লক্ষণাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে।

যে জীবনী-নাটকের কথা এই অধ্যায়ে আলোচনা করিতে চাই, তাহার সঙ্গে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনীসম্পর্কিত নাটকগুলির এই জন্যই কোনও সম্পর্ক কল্পনা করা যায় না। ইহারা রচনার দিক দিয়া আধুনিকতম হইলেও প্রেরণার দিক দিয়া মধ্যযুগীয়। আধুনিকতম জীবনী-নাটকের প্রধান বিশেষত্বই এই যে, ইহারা মানুষেরই লৌকিক জীবন ভিত্তি করিয়া রচিত, কোন প্রকার অলৌকিকতা বা mysticism-এর কথা তাহাদের মধ্যে নাই। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে এদেশের সমাজ অলৌকিকতা-সিদ্ধ ভগবান্ বলিয়াই বিশ্বাস করিয়া থাকে; সাধারণ মানবিক নিয়মে তাঁহার জীবন উদ্‌যাপিত হইয়াছে বলিয়া কেহ কল্পনাও করিতে পারে না।

সেইজন্য কিছুদিন পূর্বে, এমন কি ১৯৪৮ সনে তাঁহার জীবন ভিত্তি করিয়া তারকনাথ মুখোপাধ্যায় যখন একখানি নাটক রচনা করিয়া কলিকাতার অধুনা-লুপ্ত রঙ্গমঞ্চ 'কালিকা থিয়েটারে' তাহা অভিনয় করাইবার জন্য বিজ্ঞাপন প্রচার করেন, তখন রামকৃষ্ণ ভক্ত ও শিষ্য সম্প্রদায় কর্তৃক এই বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন করা হয়; কারণ, তিনি পরমপুরুষ ভগবান, তাঁহার জীবন লৌকিক জীবন নহে, নিগূঢ় ধর্মীয় তাৎপযব্যঞ্জক; সুতরাং রঙ্গমঞ্চে তাহা অভিনেয় নহে। এই আপত্তির বিরুদ্ধে রঙ্গমঞ্চ পরিচালক ও নাট্যকারকে সেদিন নতি স্বীকার করিতে হইয়াছিল। নাট্যোল্লিখিত সকল চরিত্রেরই নাম ঈষৎ পরিবর্তিত করিয়া সেদিন তাহা রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়াছিল। তারপর দর্শকগণ যখন উক্ত নাটকের মধ্য হইতে লৌকিকতার পরিবর্তে অলৌকিকতারই আস্বাদ লাভ করিল, নাটকের নায়ককে প্রকৃতই মানুষের পরিবর্তে ভগবান বলিয়াই প্রত্যক্ষ করিল, তখন তাহারা তৃপ্তি লাভ করিল। ইহার পর হইতে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনী আশ্রয় করিয়া এই যুগেও যে সকল নাটক রচিত হইয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকটিই প্রত্যক্ষভাবে তাহার সঙ্গে সম্পর্কিত সকল চরিত্রেরই নাম উল্লেখ করিবার পথে কোন অন্তরায় অনুভব করে নাই। ধর্ম সম্পর্কিত যে গোঁড়ামির ভাব ছিল, পরমহংসদেবের জীবনীসম্পর্কিত অলৌকিকতা প্রচারের মধ্য দিয়াই তাহার নিবৃত্তি হইয়াছে। সুতরাং তাঁহার সম্পর্কিত যে নাটক অদ্যাবধি রচিত হইয়াছে, তাহাদিগকে যথার্থ জীবনী-নাটকের পর্যায়ভুক্ত করা যায় না। কিন্তু নিতান্ত সাম্প্রতিক কালে তাঁহার জীবন ও সাধনা অবলম্বন করিয়া যে কয়খানি নাটক রচিত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর চরিত্র রামপ্রসাদের জীবন অবলম্বন করিয়াও নিতান্ত সাম্প্রতিক কালে দুই একখানি নাটক রচিত হইয়াছে; কিন্তু তাহাও জীবনী-নাটকের পর্যায়ভুক্ত করিবার উপায় নাই; যে কারণে উনবিংশ শতাব্দীর চরিত্র রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবন অবলম্বন করিয়া রচিত নাটক জীবনী-নাটকের পর্যায়ভুক্ত করা যায় না, সেইকারণেই অষ্টাদশ শতাব্দীর চরিত্র রামপ্রসাদের জীবন অবলম্বন করিয়া রচিত নাটকও জীবনী-নাটক বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। তাঁহার জীবনের সঙ্গেও এমন কতকগুলি অলৌকিক বৃত্তান্ত আসিয়া জড়িত হইয়াছে যে, তাহাদিগের দ্বারা কোন বাস্তবধর্মী নাটক রচিত হওয়া অসম্ভব। অষ্টাদশ শতাব্দীর চরিত্র রাজা

কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনী অবলম্বন করিয়াও সাম্প্রতিককালে ইন্দুমাধব ভট্টাচার্য একখানি নাটক রচনা করিয়াছেন। তাহাও অনৈতিহাসিক তথ্য দ্বারা ভারাক্রান্ত বলিয়া রোমাণ্টিক নাটকের পর্যায়ভুক্ত হইয়াছে, জীবনী-নাটকের বিশেষত্ব লাভ করিতে পারে নাই।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, জীবনী-নাটক বলিতে বাংলা সাহিত্যে যাহা রচিত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য। যে দেশের সাহিত্যে যথার্থ ঐতিহাসিক নাটকও রচিত হইতে পারে নাই, সেই দেশে জীবনী-নাটক বহুল পরিমাণে রচিত হইবে তাহা আশা করা অসঙ্গত। কারণ, এই জাতির মধ্যে সূক্ষ্ম ঐতিহাসিকতা-বোধ থাকিলে অধিকাংশ ঐতিহাসিক নাটক রচনাই রোমাণ্টিক নাটকে পর্যবসিত হইত না, ঐতিহাসিক নাটকের সূত্র ধরিয়াই জীবনী-নাটক রচিত হইয়া থাকে। কারণ, জীবনী-নাটকও একদিক দিয়া ঐতিহাসিক নাটকই। তবে ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যে প্রধানতঃ রাজনৈতিক চরিত্র অর্থাৎ রাজা বাদশাহ কিংবা তাহাদের সম্পর্কিত জীবনসমূহই প্রাধান্য লাভ করে, কারণ, আমাদের দেশের ইতিহাস রাজা বাদশাহ'রই ইতিহাস মাত্র, তাঁহাদের সিংহাসন লইয়া সংগ্রামের বৃত্তান্ত ব্যতীত এদেশের ইতিহাস আর কিছুই লিখিয়া রাখে নাই, সুতরাং এই ইতিহাস পাঠ করিয়া যাঁহারা নাটক লিখিতে প্রবৃত্ত হ'ন, তাঁহারা ইহাদেরই জীবন আশ্রয় করিয়া নাট্য-কাহিনী পরিকল্পনা করিয়া থাকেন, কিন্তু জীবনী-নাটক এ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে যে কয়খানি রচিত হইয়াছে, তাহাদের কোনটিই কোন যুগেরই এই শ্রেণীর ঐতিহাসিক চরিত্র অবলম্বন করিয়া রচিত হয় নাই। বরং তাহার পরিবর্তে সামাজিক মানুষেরই চরিত্র অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বাংলা সাহিত্যে যে আধুনিক প্রকৃতির জীবন-চরিত রচনার সূত্রপাত হইয়াছিল, জীবনী-নাটক প্রধানতঃ তাহা হইতেই উপকরণ সংগ্রহ করিয়া রচিত হইয়াছে। এক কথায় বলিতে গেলে ইহারা উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য জীবন-চরিতের নাট্যরূপ মাত্র। জীবন-চরিতের অতিরিক্ত ইহাদের মধ্যে কোন নূতন তথ্য নাই, সুতরাং ইহাদের মধ্যে বিশেষ বিশেষ চরিত্রের জীবনী-সম্পর্কিত নূতন কোন উপকরণ উপহার দেওয়া হয় নাই, বরং বিস্তৃত জীবন-কাহিনীকে সংক্ষিপ্ত করিয়া কয়েকটি দৃশ্যের মধ্য দিয়া মাত্র প্রকাশ করা হইয়াছে। সুতরাং প্রচলিত জীবনী

(biography) হইতে যে ইহাদের তথ্যগত মূল্য কোনদিক দিয়াই বেশী প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা নহে—কেবল মাত্র কোন কোন বিষয় যাহা পাঠ্য মাত্র ছিল, তাহা রঙ্গমঞ্চের উপর দিয়া দৃশ্য হইয়াছে, এই মাত্র। সুতরাং ইহাদিগকে জীবনী-নাটক বলিয়া উল্লেখ করিলেও এমন কথাও মনে হইতে পারে যে, ইহাদের মধ্যে যতখানি 'নাটক' আছে, ততখানিও জীবনী নাই। এমন কি, বাংলা রোমান্টিক কিংবা ঐতিহাসিক নাটক অপেক্ষা ইহাদের সাহিত্যিক মূল্য যে সর্বদাই বেশী প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাও স্বীকার করিবার উপায় নাই। কারণ, রোমান্টিক নাটক রচনায় নাট্যকারগণ কাহিনীর দিক দিয়া যে স্বাধীনতা গ্রহণ করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছেন, ইহাদের মধ্যে তাঁহারা তাহা পান নাই; প্রতিপদেই জীবন-চরিতকে তাঁহাদের অনুসরণ করিতে হইয়াছে। অথচ প্রত্যেক জীবনীতেই যে নাটকীয় অংশ সুপ্রচুর আছে, তাহাও সত্য নহে; যে জীবনীতে তাহা যে পরিমাণ আছে, তাহাই নাট্যকারকে কাজে লাগাইতে হইয়াছে, স্বাধীনভাবে নূতন নূতন পরিবেশ কল্পনা করিয়া তাহাতে নাটকীয় অবকাশ সৃষ্টি করিবার সুযোগ পান নাই। মৌলিক সামাজিক নাটক রচনাতেও এই বিষয়ে যে সুযোগ পাওয়া যায়, জীবনী-নাটকের কাহিনীতে তাহা পাওয়া যায় না।

একদিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যায়, ঐতিহাসিক নাটক সম্পর্কেও কোন কোন বিষয়ে যে স্বাধীনতা পাওয়া যায়, জীবনী-নাটক সম্পর্কে তাহাও পাওয়া যায় না। কারণ, ইতিহাস-পরিবেষিত তথ্যাবলীর মধ্যে মধ্যে যে ফাঁকটুকু পড়ে, তাহা ঐতিহাসিক নাটকের নাট্যকার ইচ্ছামত পূর্ণ করিয়া দিতে পারেন, এই বিষয়ে কেবলমাত্র তাঁহার চরিত্রগুলির বৈশিষ্ট্যের উপর লক্ষ্য রাখিতে হয়; কিন্তু জীবনী-নাটকের নাট্যকারের চরিত্র সম্পর্কিত কাল্পনিক কোন কাহিনীর আশ্রয় লইবার উপায় থাকে না, তাহা হইলে পরিচিত চরিত্রগুলি সম্পর্কিত যে সংস্কার সাধারণের মধ্যে গড়িয়া উঠে, তাহাতে আঘাত লাগে। যেমন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর দাতা বলিয়া পরিচিত থাকিলেও তাঁহার দানশীলতা সম্পর্কে কোন কাল্পনিক কাহিনী তাঁহার জীবনী-নাট্যকারের রচনা করিবার অধিকার নাই; অথচ ঐতিহাসিক নাট্যকার কেবল মাত্র ঐতিহাসিক পরিবেশ রক্ষা করিয়া তাহাও কল্পনা হইতে রচনা করিতে পারেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, জীবনী-নাটক রচনার দায়িত্ব অনেক বেশী, কিন্তু বাংলা সাহিত্যে নাট্যকারগণ নাটক

রচনায় তথ্য ও তত্ত্ব সম্পর্কিত যে নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহার অভ্যাস আয়ত্ত করিবার ফলে জীবনী-নাটক রচনার প্রেরণা লাভ করিতে পারেন না। জীবনী-নাটক শিক্ষাগত বা academic প্রকৃতির রচনা, ইহাতে জীবনরস অপেক্ষা তথ্য অধিক প্রকাশ পায়; সেইজন্য নাটক পাঠের যে আনন্দ, তাহা সর্বদা ইহার মধ্য হইতে লাভ করা যায় না। পাঠে যে আনন্দ ও জ্ঞান পাওয়া যায়, ইহার মধ্য দিয়া তাহার অতিরিক্ত আর কিছুই পাওয়া যায় না। সেইজন্য কোন জীবনী-নাটকই বাংলা সাহিত্যে জীবন-চরিতকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে নাই। তবে এ কথা সত্য, ইউরোপীয় সাহিত্যে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। এমিল জোলার জীবন-চরিত অবলম্বন করিয়া যে নাটক রচিত হইয়াছে, তাহা তাঁহার জীবন-চরিত অপেক্ষাও শক্তিশালী রচনা বলিয়া সকলেই স্বীকার করিবেন, কিন্তু বাংলা সাহিত্যে তাহার ব্যতিক্রম হইয়াছে।

জীবনী-নাটক রচনাব আর একটি প্রধান নাটকীয় ত্রুটি প্রায়ই দেখা যায় যে, ইহা বিশেষ কোন জীবনের একটি মাত্র পবম নাটকীয় ঘটনা আশ্রয় করিয়া রচিত হইবার পবিবর্তে জীবনের একটি বিরাট অংশ লইয়াই রচিত হইয়াছে। তাহার ফলে ইহাদের মধ্যে কালগত ঐক্য যেমন বক্ষা পাইতে পারে না, তেমনই ঘটনাগত ঐক্যও রক্ষা পাইতে পারে না। অথচ এই দুইটি বিষয়ই নাটকের সার্থকতার জন্য যে কতখানি প্রয়োজনীয়, তাহা আমরা সকলেই জানি। জীবনী-নাটকে যাঁহার চবিত্র কীর্তিত হয়, তাঁহার জীবন স্বভাবতই কর্মবহুল হইয়া থাকে, সর্বদাই যে তাঁহার কর্ম একলক্ষ্যমুখী হইয়া থাকে, তাহাও নহে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কথাই যদি ধরা যায়, তাহা হইলেও দেখা যায় যে, তাঁহার বিচিত্র কর্মমুখী জীবনের বিভিন্ন স্বতন্ত্র ধারা ছিল। তিনি আদর্শ মাতৃভক্ত, তিনি পরদুঃখকাতর, তিনি বিদ্যানুরাগী, তিনি সমাজ-সংস্কারক, তিনি স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীস্বাধীনতা, বিধবা-বিবাহের প্রবর্তক, তিনি আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন ব্যক্তি ইত্যাদি ইত্যাদি। তাঁহার এই সকল বিভিন্ন গুণ একই নাটকের মধ্য দিয়া প্রকাশ করাই বাংলা জীবনী-নাট্যকারের উদ্দেশ্য। এই কথা অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, এই সকল বিভিন্ন গুণের পরিবর্তে কেবলমাত্র একটি গুণ আশ্রয় করিয়া যদি একটি পূর্ণাঙ্গ নাটক রচিত হয়, তবে নাট্যকাহিনীর উদ্দেশ্যগত ঐক্য যেমন রক্ষা পায়, সবগুলি বিষয়কে একসঙ্গে গ্রহণ করিলে, তাহা তেমন রক্ষা হইতে পারে না—এই জন্য নাটক হিসাবে

কাহিনী শক্তিহীন হইয়া পড়ে। অথচ বাংলা জীবনী নাট্যকারের ইহা ছাড়া অন্য উপায় নাই। কারণ, ঈশ্বরচন্দ্রের মাতৃভক্তি সম্পর্কে কয়েকটি যে কাহিনী প্রচলিত আছে, কেবলমাত্র তাহা ভিত্তি করিলে একটি পূর্ণাঙ্গ নাটক রচিত হইতে পারে না। অথচ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবন বাঙ্গালী পাঠকের নিকট এতই পরিচিত যে, তাঁহার সম্পর্কে নূতন কিছু কাহিনী যোগ করিয়া তাঁহার মাতৃভক্তির বিভিন্নমুখী পরিচয় প্রকাশ করিতে গেলে, পাঠক সমাজ তাহা কিছুতেই গ্রহণ করিবে না। এমন কি, পৌরাণিক নাটক সম্পর্কেও কেবল মাত্র প্রচলিত কাহিনীই গৃহীত হইয়া থাকে—দাতা কর্ণের দান সম্পর্কে যে কয়টি কাহিনী পুরাণে কীর্তিত আছে, তাহার অতিরিক্ত একটি কাহিনীও পৌরাণিক নাটকে গ্রহণ করিবার উপায় নাই। ঐতিহ্য অনুসরণ করিয়া যাহা জন্মলাভ করে, ঐতিহ্যের সূত্র ধরিয়াই তাহার অনুসরণ করিতে হয়। পৌরাণিক নাটক রোমাণ্টিক জগতের কাহিনী বলিয়া ইহাতে কল্পনার সংমিশ্রণ করিয়া ঐতিহ্যানুসারী বিবরণকেও পল্লবিত করা গেলেও জীবনী-নাটকে তাহা করিবার একেবারেই অধিকার থাকে না। সেইজন্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কেবলমাত্র মাতৃভক্তির বিষয় অবলম্বন করিয়া কোন পূর্ণাঙ্গ নাটক রচিত হইতে পারে না। বাধ্য হইয়া নাট্যকারকে তাঁহার জীবনের অন্যান্য উপকরণ ইহার মধ্যে আনিয়া যুক্ত করিতে হয়। তাহার ফলে নাটকে উদ্দেশ্যগত ঐক্য থাকে না। সুতরাং ইহা দ্বারা নাটকের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়, অর্থাৎ ইহা দ্বারা যাহা হয়, তাহা নাটক নহে। এই দিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিলে মনে হইতে পারে, জীবনী-নাটকের মধ্যে কোন জীবন-চরিতের খণ্ডিত কোন কোন অংশ থাকিলেও তাহা জীবনীই, নাটক নহে—কেবলমাত্র নাট্যাকারে পরিবেষিত জীবনীর তথ্য, সেই তথ্যও সম্পূর্ণ নহে; কারণ, আনুপূর্বিক জীবনকে কোন নাটকেরই উপজীব্য করিবার উপায় নাই। সুতরাং এই কথাই সত্য যে, জীবনী-নাটকে আমাদের জীবনী-পাঠের যেমন জ্ঞান পূর্ণ হয় না, তেমনই নাটকের আনন্দও পরিপূর্ণভাবে লাভ করিতে পারা যায় না।

নাটক মাত্রেরই প্রাণ ইহার দ্বন্দ্ব, যে কাহিনীর মধ্যে পরস্পর বিপরীতধর্মী দুইটি আদর্শ বা স্বার্থের দ্বন্দ্ব নাই, তাহা নাটক নহে, তাহা জীবন-পাঁচালী। জীবন-পাঁচালী যে নাটক নহে, তাহা পূর্বেও বলিয়াছি। জীবন-চরিতের মধ্যে দ্বন্দ্ব থাকিলেও, সেই দ্বন্দ্ব সর্বদাই যে নাটকীয় পরিচয় লাভ করিতে পারে, তাহা নহে। বিশেষতঃ যে জীবনীর মধ্য দিয়া বিভিন্নমুখী কর্মের সন্ধান দেওয়া

হয়, তাহাতে যে দ্বন্দ্ব দেখা দিতে পারে, তাহাও বিভিন্নমুখী হইতে বাধ্য। কিন্তু নাটকীয় কাহিনীর মধ্যে দ্বন্দ্বের দিক দিয়াও যদি ঐক্য না থাকে, তবে তাহা যে সক্রিয় হইতে পারে না, তাহাও সত্য। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার বিভিন্ন লোকহিতকর কার্যে বিভিন্ন দিক হইতে বাধা পাইয়াছেন, সমাজের বিভিন্ন প্রকৃতির স্বার্থকে আঘাত করিয়া তাঁহার সাধনা সিদ্ধিলাভ করিয়াছে, সুতরাং তাঁহার জীবনীভিত্তিক নাটকের মধ্যেও একটি অখণ্ড দ্বন্দ্বের শক্তি সঞ্চারিত করা সম্ভব নহে; এইভাবে নাটকীয় বিষয়বস্তুও দৃঢ়সংবদ্ধ হইয়া উঠিবার অবকাশ পায় না, নিতান্ত শিথিলবদ্ধ হইযা পড়ে। জীবনীনাটকেব এই একটি প্রধান ত্রুটি প্রায় অপরিহার্যরূপেই দেখা যায়। শিথিলবদ্ধ কতকগুলি চিত্রের সমাবেশে জীবনী-নাটক প্রধানতঃ রচিত হয়, নাটকের বিষয়বস্তু এখানে একটি পরিচিত জীবনীকে অনুসরণ করে, স্বাধীন ভাবে স্ফূর্তি লাভ করিতে পারে না বলিয়া নিজের মধ্যে একটি অখণ্ডতা লাভ করিতে পারে না। সুতরাং নাটকরূপে এখানেও ইহার ত্রুটি প্রকাশ পায়।

বাংলা সাহিত্যে যে সামান্য কয়খানি জীবনী-নাটক রচিত হইয়াছে, তাহাদের প্রায় কোনখানিই উপরোক্ত ত্রুটি হইতে মুক্ত নহে। রামমোহন, বিদ্যাসাগর ও মধুসূদনের জীবন-চরিতই প্রধানতঃ বাংলা জীবনী-নাটকেব বিষয়বস্তু রূপে গৃহীত হইয়াছে। পরমহংসদেবের জীবনী লইয়া সাম্প্রতিক কালে যে একাধিক নাটক রচিত হইয়াছে, সে সম্পর্কে পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, তাহা পৌরাণিক নাটকের লক্ষণাক্রান্ত হইয়াছে। কিন্তু উক্ত তিনজন মনীষীকে অবলম্বন করিয়া যে নাটক কয়খানি রচিত হইয়াছে, তাহার সব কয়খানিতেই উক্ত জীবনীসমূহকে প্রায় জন্ম হইতে না হইলেও কৈশোব বা যৌবন কাল হইতে মৃত্যু পর্যন্ত অবলম্বন করা হইয়াছে। এই সুদীর্ঘকালে বিভিন্নমুখী কর্মধারার পরিচয়ে ইহারা বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছে সত্য, কিন্তু নাটকীয় গুণ ইহাদের মধ্য দিয়া কতদূব প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাই আমাদের আলোচনার বিষয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দুই একটি জীবনীর খণ্ডাংশ অবলম্বন করিয়া সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যে দুই একটি একাঙ্ক নাটকও রচিত হইয়াছে। একদিক দিয়া বলিতে গেলে জীবন-চরিত হইতে বিষয়বস্তু আহরণ করিয়া যত সার্থক একাঙ্ক নাটক রচনার সুযোগ পাওয়া যায়, পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনার সুযোগ তত পাওয়া যায় না।. কারণ, একাঙ্ক নাটক সমগ্র জীবনীর একটি মাত্র নাটকীয় ঘটনা

বা বিষয় লইয়া রচিত হইতে পারে। প্রত্যেক কর্মী কিংবা সাধকের জীবনে এই প্রকার প্রচুর অবকাশ আছে। জীবনী হইতে কেবলমাত্র সেই বিষয়গুলি যথাযথ সন্ধান করিয়া লইতে পারিলে তাহা দ্বারা সার্থক একাঙ্ক নাটক রচিত হইবার পথে ভাব কিংবা আঙ্গিকগত কোন বাধা থাকিতে পারে না। কিন্তু এই বিষয়ে এই পর্যন্ত যে প্রয়াস দেখা যায়, তাহা যে খুব ব্যাপক তাহা আজও বলিতে পারা যায় না।

উনবিংশ শতাব্দী হইতেই বাংলা সাহিত্যে আধুনিক জীবন-চরিত রচিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে; ইহাদের মধ্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আত্মজীবনী', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'জীবন-স্মৃতি', শিবনাথ শাস্ত্রীর 'আত্মজীবনী' ইত্যাদি রচনা আত্মজীবনী (auto-biography)-মূলক, এই শ্রেণীর রচনা আধুনিক কোন জীবনী-নাটকেব অবলম্বন হয় নাই। বিশেষতঃ ইঁহাদের প্রত্যেকেরই জীবন প্রধানতঃ ভাবমূলক, কর্মমূলক নহে—সুতরাং ইঁহাদের সাধনায় ভাব-গম্ভীবতা যতই থাকুক না কেন, কর্মের বৈচিত্র্য নাই; সেইজন্য জীবনী-নাট্যকারেব দৃষ্টি ইহাদেব দিকে আকৃষ্ট হইতে পারে নাই। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়েব 'বিদ্যাসাগব জীবন চরিত' এবং যোগেন্দ্রনাথ বসু রচিত 'মাইকেল মধুসূদন দত্তেব জীবন-চরিত' 'আত্মজীবনী' শ্রেণীর রচনা নহে, কিন্তু তথ্য পরিবেশনের দিক দিয়া বাংলা সাহিত্যে এই দুইখানি জীবন-চরিত বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থান লাভ করিয়াছে। এই দুইখানি জীবন-চরিতই মুখ্যতঃ আধুনিক জীবনী-নাটকের অবলম্বন রূপে গৃহীত হইয়াছে। রাজা বামমোহন রায়েব জীবন-সম্পর্কেও বিস্তৃত তথ্য সংগৃহীত হইয়া ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার জীবনও ভাব এবং জ্ঞানের গভীরতার দিক দিয়াই নহে, প্রত্যক্ষ কর্মের মধ্য দিয়াও সার্থকতা লাভ কবিয়াছে। সেইজন্য তাঁহার জীবনও একখানি উল্লেখযোগ্য জীবনী-নাটকের অবলম্বনরূপে গৃহীত হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, জীবনী-নাটকে বিষয়বৈচিত্র্য নাই; দুইজন সমাজ-সংস্কারক এবং একজন জীবন-দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত ভাব-বিলাসী কবির জীবন অবলম্বন করিয়াই মাত্র আধুনিক কালে তিনচারিখানি জীবনী-নাটক বাংলা সাহিত্যে রচিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে মাত্র একখানি সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে।

আরও একটি বিষয় এখানে লক্ষ্য করা যাইতে পারে যে, বাংলা

সাহিত্যে যাঁহারা এই সামান্য কয়খানি জীবনী-নাটকও রচনা করিয়াছেন, তাঁহারা কেহই পরিচিত নাট্যকার নহেন, বরং কথা-সাহিত্যিক। সুতরাং দেখা যায়, বাঙ্গালী নাট্যকারদিগের মধ্যে এই সংস্কার গড়িয়া উঠিতে পারে নাই।

বাংলা সাহিত্যের প্রথম জীবনী-নাটক 'শ্রীমধুসূদন' সুপরিচিত কথা-সাহিত্যিক বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় বা বনফুল কর্তৃক ১৯৩৯ সনে রচিত হয়। ইহা যোগীন্দ্রনাথ বসুর 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত' নামক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জীবন-চরিত অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে। ইহার সম্পর্কে নাট্যকার ভূমিকায় উল্লেখ করিয়াছেন, 'এই নাটকের নায়ক মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। ইহা ইতিহাস অথবা জীবন-চরিত নহে—নাটক। ইহার সমস্ত কথোপকথন ও অধিকাংশ দৃশ্য-পরিকল্পনা কাল্পনিক। মধুসূদনের জীবন-চরিত পাঠ করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে আমার যাহা ধারণা হইয়াছে, তাহাই এই নাটকের বিষয়-বস্তু। অবশ্য মধুসূদনের জীবনের প্রধান ঘটনাগুলির ও সমসাময়িক ইতিহাসের মর্যাদা রক্ষা করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছি।'

নাট্যকার যে লিখিয়াছেন 'ইহা ইতিহাস অথবা জীবন-চরিত নহে—নাটক' এই কথাটি একটু বুঝিয়া দেখিবার প্রয়োজন আছে। তিনি নিজেই ইহার পর বলিয়াছেন যে, 'মধুসূদনের জীবনের প্রধান ঘটনাগুলির ও সমসাময়িক ইতিহাসের মর্যাদা রক্ষা করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছি।' তাহা হইলে ইহা ইতিহাস নহে, এমন কথা বলিবার উপায় নাই। জীবনের অতীত ঘটনা মাত্রই ইতিহাস; সুতরাং এখানে 'মধুসূদনের জীবনের প্রধান ঘটনাগুলির' যদি পরিচয় 'সাধ্যমত'ও দেওয়া হইয়া থাকে, তথাপি ইহা ইতিহাস ব্যতীত আর কিছুই নহে; কারণ, ঐতিহাসিকও অতীত জীবনের বৃত্তান্ত 'সাধ্যমত'ই বর্ণনা করিয়া থাকেন; প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি যথাযথ বিষয়ের বর্ণনা যেমন তাহাতে থাকেও না, তেমনই যে সকল বিষয়ের বর্ণনা থাকে, তাহাও ঐতিহাসিকের 'সাধ্যমত' সত্য বলিয়া বর্ণিত হয়। সুতরাং এই নাটক ইতিহাস, তবে জীবনেতিহাস। মধুসূদনের জীবনে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে বলিয়া তাঁহার জীবন-চরিতে বর্ণিত আছে, এখানে তাহার অতিরিক্ত ঘটনা কিছু নাই; কিন্তু প্রকৃত কথাবার্তায় যে ভাষা তিনি ব্যবহার করিয়াছেন, সেই ভাষা এখানে নাই, তাহা থাকিবার কথাও নহে, থাকিলে ইতিহাসের দাবী পূর্ণতর হইতে পারিত, কিন্তু তাহা না থাকিবার জন্য নাট্যসাহিত্যের দাবী ক্ষুণ্ণ হয় নাই; সেইজন্য

ইহা একদিক দিয়া যেমন জীবনেতিহাস, আর এক দিক দিয়া জীবনী-সাহিত্য। নাট্যকার 'সমসাময়িক ইতিহাসের মর্যাদা রক্ষা করিতেও যে সাধ্যমত চেষ্টা' করিয়াছেন, তাহাতেও ইহার ঐতিহাসিকতা রক্ষা করিতে তিনি যে সজাগ ছিলেন, তাহা বুঝিতে পারা যায়; সুতরাং সকল দিক দিয়াই ইহার ঐতিহাসিকতার দাবী পূর্ণ হইতে পারে। অতএব নাট্যকার যে বলিয়াছেন, ইহা ইতিহাস নহে, তাহা সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না ; যদি ইতিহাসই হইয়া থাকে, তবে ইহা মধুসূদনের জীবনেরই ইতিহাস হইয়াছে, সুতরাং ইহা জীবন-চরিতও বটে, 'কথোপকথন ও দৃশ্য-পরিকল্পনা'র কাল্পনিকতার জন্য ইহার ঐতিহাসিক কিংবা জীবন-চরিতগত মূল্য যাহা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, তাহা এমন কিছুই নহে। নাট্যকার তাঁহার ভূমিকার শেষাংশে এই কথাও বলিয়াছেন, 'এই নাটকের চরিত্রগুলি তিমিরাচ্ছন্ন পৌরাণিক চরিত্র নহে।' সুতরাং ইহাদের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে তিনিও নিঃসন্দিগ্ধ।

যাহা হউক, 'শ্রীমধুসূদন' একাধারে জীবনী ও নাটক, কেবল মাত্র নাটক নহে। কারণ, স্বাধীন নাটক হিসাবে ইহার ত্রুটি অনেক, কেবল মাত্র জীবনী-নাটক রূপে ইহার মূল্য প্রকাশ পাইয়াছে। জীবন-চরিত রূপে যেমন ইহার মূল্য নগণ্য, নাটক হিসাবেও তাহাই। আঠার বৎসর বয়স হইতে মধুসূদনের মৃত্যু পর্যন্ত তাঁহার এই সুদীর্ঘ প্রায় ত্রিশ বৎসরের জীবন অবলম্বন করিয়া 'শ্রীমধুসূদন' নাটক রচিত হইয়াছে। কালগত ঐক্য ইহা দ্বারা যে রক্ষা পাইতে পারে না, তাহা নিতান্ত স্বাভাবিক, ইহার ঘটনাস্থল ভারতবর্ষে কলিকাতা ও মাদ্রাজ এবং ইউরোপে ভার্সাই সহর; সুতরাং স্থানগত ঐক্যও ইহাতে নাই; একটি ভাববিলাসী জীবনের বিভিন্নমুখী কর্মধারার পরিচয় ইহাতে আছে, ইহার এই ভাববিলাসিতার সূত্রেই ইহার মধ্যে বিষয় ও ভাবগত ঐক্য অনেকটা রক্ষা পাইয়াছে—এ কথা অবশ্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সুতরাং সাধারণ নাটকের বহির্মুখী রূপ-বিচারে ইহার যে বিশেষ মূল্য আছে, তাহা নহে; তবে ইহার ভিতর দিয়া অন্যান্য যে সাহিত্যগুণ বিকাশ লাভ করিয়াছে, তাহার জন্যই ইহার মূল্য স্বীকার করিতে হয়। এই মূল্য ইহার নাটক হিসাবে মূল্য নহে, অন্যান্য বিষয়ের দিক হইতে ইহার মূল্য। তাহাই এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইবে।

'শ্রীমধুসূদনে'র কাহিনী-বিন্যাসে ইহার যে একটি প্রধান ত্রুটি প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা এই যে, জীবন-চরিতে মধুসূদনের জীবন-কথা যে ভাবেই বিন্যস্ত

থাকুক না কেন, নাটকের মধ্যে তাহা প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত নাট্যকারের নূতন করিয়া পুনর্বিন্যাস করিয়া লইবার যে প্রয়োজন ছিল, নাট্যকার তাহা করেন নাই। কাহিনীর অগ্রগতির ধারায় ইহার বিভিন্ন অংশে ইহার মধ্যে সমতা রক্ষা পায় নাই। নাটকটি কুড়িটি দৃশ্যে সম্পূর্ণ, ইহাতে কোন অঙ্ক-বিভাগ নাই; এই কুড়িটি দৃশ্যের মধ্য দিয়া মধুসূদনের ১৮ বৎসর বয়স হইতে ৪৯ বৎসর বয়সের মৃত্যুকাল পর্যন্ত স্পর্শ করিয়াছে। কিন্তু নয়টি দৃশ্য পর্যন্ত অর্থাৎ প্রায় অর্ধেক জুড়িয়াই তাঁহার ১৮ বৎসরের জীবনের কাহিনীই বর্ণিত হইয়াছে। অতঃপর নাটকের অবশিষ্ট অর্ধেক অংশে তাঁহার অবশিষ্ট প্রায় ত্রিশ বৎসরের জীবন-বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। সেইজন্য নাটকের প্রথমাংশে যেমন কালগত ঐক্য রক্ষা পাইয়াছে, শেষাংশে তেমনই তাহা নির্মমভাবে বিনষ্ট হইয়াছে। ইহাতে দেবকীর সঙ্গে বিবাহের ব্যর্থতার কথা অনাবশ্যক প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, অথচ রেবেকার সঙ্গে কি ভাবে যে প্রণয়েব সঞ্চার হইল, কিংবা বিবাহের পর বিচ্ছেদও আসিল, তাহার কোন প্রসঙ্গই নাই। অবশ্য জীবন-চরিত হইতেও এই বিষয়ে অধিক কিছু জানা যায় না, অথচ এই ক্ষেত্রে কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করাও নাট্যকার যথার্থই অসঙ্গত মনে করিয়াছেন। নাট্যকাহিনীর এই অর্ধাংশ পর্যন্ত মধুসূদনের উপর শ্রদ্ধার আকর্ষণ হইতে পারে, এমন কোনও গুণের সন্ধান নাট্যকার তাঁহাব চরিত্রে পান নাই—তাহার গুণের মধ্যে কেবল বিশুদ্ধ ইংরেজী ভাষণ ও নিরঙ্কুশ মদ্য পান। ইহা দ্বারা তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাব আকর্ষণ হয় না।

নাট্যকাহিনীকে যদি দুইভাগে ভাগ করা যায়, তবে এই পর্যন্ত মধুসূদনের পারিবারিক জীবনের এবং ইহাব পর হইতে তাঁহার সাহিত্য-জীবনের সূত্রপাত হইয়াছে। মধুসূদন সম্পর্কিত নাটক এই পর্যন্ত তাঁহাব পারিবারিক জীবন ভিত্তি করিয়া যাহা রচিত হইয়াছে, তাহাই সার্থক হইয়াছে, পরবর্তী অংশ অত্যন্ত বিক্ষিপ্ত হইয়াছে—ইহাতে যেমন জীবনরস নাই, তেমনই নাট্যকাহিনীর গতিও অব্যাহত থাকিতে পারে নাই। মধ্যে সুদীর্ঘ ব্যবধান সৃষ্টি করিয়া কাহিনী অগ্রসর হইয়াছে। রেবেকার সঙ্গে বিবাহ, তাহাব সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদ, মধুসূদনের কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন, ইউরোপ যাত্রা, ইউরোপ হইতে প্রত্যাবর্তন ইত্যাদি পূর্বাপর-সম্পর্ক-বিহীন পরস্পর বিচ্ছিন্ন ঘটনারূপে উপস্থিত হইয়াছে; ইহাদের মধ্য দিয়া কোন অখণ্ড সূত্র রক্ষা পায় নাই। নাটকের প্রথমাংশে কাহিনীর মধ্যে ঘটনাগত যে নিবিড়তা ছিল, এই

অংশে তাহা একেবারেই নাই। কেবলমাত্র তাঁহার জীবনের কতকগুলি উল্লেখ-যোগ্য ঘটনা তালিকার মতই এখানে বর্ণিত হইয়াছে। মধুসূদনের সমগ্র জীবন অবলম্বন করিয়া একখানি নাটক রচনা করিবার জন্যই এই ত্রুটি অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছে। বিদ্যা অর্জনের জন্য ত্যাগ সহিষ্ণুতা ও দুঃখ সহ্য করিবার শক্তির মধ্যে তাঁহার চরিত্রের প্রতি শ্রদ্ধাভাব জাগ্রত করিবার সুযোগ ছিল, নাট্যকার তাহার সদ্ব্যবহার করেন নাই; বরং তাহার পরিবর্তে মধুসূদনের মদ্যপান ও বিলাসিতার দিকটাই এই নাটকে বড় করিয়া দেখিয়াছেন। এমন কি, পিতার হাত হইতে গড়গড়ির নল লইয়া তিনি তাঁহার সম্মুখেই তামাক খাইতেন, পিতার হাত হইতে মদের গ্লাস লইয়া মদ্যপান করিতেন, এই সকল বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিতগুলি যত স্পষ্ট হইয়াছে, ইউরোপীয় প্রাচীন কাব্য পাঠ করিবার মধ্যে তাঁহার যে সুগভীর অনুরাগ ও নিষ্ঠা ছিল, তাহার পরিচয় তত স্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারে নাই। সেইজন্য মনে হইবে যে, মধুসূদনের গুণের দিকটা এই নাটকে গৌণ করিয়া দোষের দিকটাই মুখ্য করা হইয়াছে। মধুসূদনের মাতৃভক্তিও আদর্শস্থানীয় ছিল, তাঁহাব উচ্চাভিলাষের সঙ্গে মাতৃভক্তির একটি নাটকীয় দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করিবার যে সুযোগ নাট্যকারের এই নাটকে ছিল, তাহারও পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা হয় নাই বলিয়াই মনে হইবে। এক কথায় বলিতে গেলে মধুসূদনের সাহিত্য-জীবনের পরিচয় যেমন সংক্ষিপ্ত, তেমনই বিক্ষিপ্ত এবং তেমনই প্রধানতঃ নাটকীয় গুণবর্জিত হইয়া একটি শিক্ষামূলক বা academic বর্ণনার পর্যায়ভুক্ত হইয়াছে মাত্র। একান্ত জীবন-চরিতের পথে অগ্রসর না হইয়া তাঁহার ব্যক্তিচরিত্রের সুগভীর তলদেশে প্রবেশ করিতে পারিলে ইহার মধ্যেও বৈচিত্র্য সৃষ্টি হইতে পারিত।

রেবেকার চরিত্র পরিকল্পনায় নাট্যকার যে তাঁহার প্রতি অমর্যাদা করিয়াছেন, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। মধুসূদনের জীবন-চরিত হইতে রেবেকা সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না সত্য, কিন্তু তথাপি যতটুকু পাওয়া যায় ততটুকু দ্বারা 'শ্রীমধুসূদন' নাটকে তাঁহার যে চরিত্র পরিকল্পিত হইয়াছে, তাহা সঙ্গত হইয়াছে বলিয়া মনে হইতে পারে না। মধুসূদনের জীবনচরিত-রচয়িতা-যোগীন্দ্রনাথ বসুর রচনা হইতে জানা যায়, আত্মীয়স্বজনের অমতেই রেবেকা মধুসূদনের প্রতি প্রেমাসক্ত হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, মধুসূদনও *Captive Lady*-র উপক্রমণিকায় তাঁহার প্রতি সুগভীর প্রেম ব্যক্ত করিয়া এক সুদীর্ঘ কবিতা লিখিয়াছিলেন।

ইহাদেব সন্তানাদি জন্মিযাছিল। ইহাদের মধ্যে পববর্তী জীবনে প্রেমেব অভাব দেখা দিয়াছিল, সামান্য কথা লইয়া তাঁহাদেব মধ্যে বিবাদ বাধিত, হেন্‌বিয়েটাকে দেখিয়া বেবেকাব প্রতি প্রেমে মধুসূদনের শৈথিল্য দেখা দিয়াছিল, কিংবা বেবেকা হেনবিয়েটাকে সন্দেহেব চক্ষে দেখিতেন এই সকল কথা তাঁহাব জীবনচবিতে নাই, বেবেকার জীবনেব যে সামান্য পবিচয়টুকুও ইহাতে আছে, তাহা দ্বাবা এই সকল বিষয় অনুমান করা যায় না। বিশেষতঃ কুমাবী হেনবিয়েটাব সান্নিধ্যে আসিয়া মধুসূদন তাঁহাব একাধিক সন্তানেব জননী বেবেকাকে অবহেলা কবিয়া তাঁহাব প্রতিই আসক্ত হইয়াছিলেন, এমন কথা কল্পনা কবিলে মধুসূদন এবং বেবেকা উভয়েবই মর্যাদায আঘাত লাগে। মধুসূদন তাঁহাব পববর্তী কালে 'আত্মবিলাপ' কবিতাব মধ্যেও বেবেকাব প্রতি প্রণয়েব ব্যর্থতাব জন্য বিলাপ কবিয়াছেন, কাহাবও বিশ্বাসঘাতকতা এই বিবাহভঙ্গেব কারণ, ইহা হইতেও তাহা মনে হয না। ইহাব অন্য কোনও নিগূঢ় কাবণ ছিল, তাহা প্রকাশ পায় নাই, মধুসূদনেব মাদ্রাজ জীবনেব অনেক কথাই অপ্রকাশিত আছে। সুতবাং মধুসূদনেব মত মর্যাদাসম্পন্ন চবিত্রেব দাম্পত্যজীবন সম্পর্কে কোন বিষয় কল্পনাব সাহায্যে সৃষ্টি কবিতে হইলে, এই বিষযে যথেষ্ট সতর্ক থাকা আবশ্যক। বেবেকাব চবিত্র মধুসূদনেব প্রণয়-ভাগিনীব যোগ্য চবিত্র রূপে যে কল্পিত হইতে পাবে নাই, তাহা সত্য।

হেনবিয়েটা যদিও দীর্ঘতব কাল ধবিয়া মধুসূদনেব জীবনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, তথাপি তাঁহাব জীবনও এই নাটকে বিচ্ছিন্ন ভাবে চিত্রিত হইয়াছে বলিয়া তাহা বস-নিবিড হইযা উঠিতে পাবে নাই, একটি সুস্পষ্ট রূপও তাহা লাভ কবে নাই। বিদেশী মহিলা হইযাও ভাবতীয় হিন্দুনাবীব মত স্বামীব দুর্ভাগ্য মাথায় তুলিয়া লইবাব মধ্যে তাঁহাব যে তাপসীব একটি রূপ প্রকাশ পাইযাছিল, এই নাটকেব মধ্যে তাহা স্পষ্ট হইয়া উঠিতে পাবে নাই, এমন কি, যোগীন্দ্রনাথ বসুব জীবন-চবিতেব মধ্যেও এই বিষয়টি যতখানি মর্মস্পর্শী কবিয়া চিত্রিত হইয়াছে, নাটকে সেই তুলনায তাহা বিশেষ কিছুই হয় নাই।

'শ্রীমধুসূদনে'ব নাট্যকাব কথাসাহিত্যিক, সুতবাং তাঁহাব সংলাপেব ভাষা আদর্শ স্থানীয়, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তিনি কল্পনাব আশ্রয় গ্রহণ কবিবাব প্রবৃত্তিকে পদে পদে দমন করিয়াই এই জীবনী-নাটক রচনা কবিয়াছেন। কথাসাহিত্যিক হওয়া সত্ত্বেও ঐতিহাসিকেব মত তাঁহার তথ্যনিষ্ঠা প্রকাশ

পাইয়াছে। 'শ্রীমধুসূদন' নাটকখানি 'শ্রীরঙ্গম্'-নাট্যমঞ্চে দীর্ঘদিন কৃতিত্বের সহিত অভিনীত হইয়াছিল; শিশিরকুমার ভাদুড়ীর মধুসূদনের ভূমিকায় অভিনয়ই ইহার প্রধান আকর্ষণ ছিল।

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় রচিত জীবনী-নাটক 'বিদ্যাসাগর' ১৯৪২ সনে প্রকাশিত হয়। ইহা প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবনী অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে। এই সম্পর্কে নাট্যকার তাঁহার 'ভূমিকা'য় উল্লেখ করিয়াছেন,—'প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিচিত্র কর্মবহুল জীবনের আলেখ্য একটি নাটকে অঙ্কিত করা শক্ত। আমি তাঁহার জীবনের একটি কার্যকে মূলসূত্র রূপে গ্রহণ করিয়া বিদ্যাসাগর ব্যক্তিটিকে ফুটাইবার প্রয়াস পাইয়াছি।' নাট্যকার-উল্লেখিত বিদ্যাসাগরের কার্যটি তাঁহার বিধবা-বিবাহ প্রচার। প্রধানতঃ চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিদ্যাসাগর চরিত অবলম্বন করিয়া এই নাটক রচিত হইলেও নাট্যকার 'নাটকীয় প্রয়োজনে জ্ঞাতসারেই নিম্নলিখিত কার্যগুলি' করিয়াছেন, যেমন ইহাতে 'ঐতিহাসিক ঘটনার পারম্পর্য' রক্ষা করা হয় নাই, 'একাধিক স্থানে কল্পনার আশ্রয়' লইয়াছেন এবং 'বিদ্যাসাগর ব্যতীত অন্যান্য বিখ্যাত চরিত্রগুলির ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে ইতিহাস সম্মত' করিতে পারেন নাই। এমন কি, শেষোক্ত কার্যটির জন্য নাট্যকার 'তাঁহাদের বংশধরদিগের নিকট ক্ষমা-প্রার্থনা করিয়াছেন।' এই নাটকের ঘটনা-স্থল বীরসিংহ, কলিকাতা, কর্মটাঁর; ঘটনাকাল প্রধানতঃ বিধবা-বিবাহ বিধিবদ্ধ হইবার (১৮৫৬) সমসাময়িক ও তাহার কিছু পরবর্তী। সুতরাং 'শ্রীমধুসূদন' নাটক অপেক্ষা ইহার মধ্যে উদ্দেশ্য ও কালগত ঐক্য অনেক বেশী পরিমাণে রক্ষা পাইয়াছে। এই পঞ্চাঙ্ক নাটকে ৩২টি পুরুষ চরিত্র এবং ৭টি স্ত্রী চরিত্র স্থান লাভ করিয়াছে। বিদ্যাসাগর ব্যতীত প্রায় প্রত্যেকটি চরিত্র স্বভাবতঃই অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, অনেকেই একবারের বেশী রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হয় নাই। ইহার ফলে কাহিনী কাল-গত যে সংহতিই সৃষ্টি করিবার প্রয়াস পাক না কেন, তাহা নিবিড়তা লাভ করিতে পারে নাই। প্রত্যেকটি চরিত্রই যে বিধবা-বিবাহের সূত্র ধরিয়াই ইহাতে আসিয়াছে, তাহা নহে—জীবন-চরিতে উল্লেখিত প্রত্যেকটি সে যুগের সুপ্রসিদ্ধ চরিত্রকে কোন না কোন উপায়ে দৃশ্যের মধ্য দিয়া অবতীর্ণ করাইবার লোভ অনেক সময় নাট্যকার দমন করিতে পারেন নাই। তবে মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনী অবলম্বন করিয়া লিখিত 'শ্রীমধুসূদন' রচনার পর তাঁহার

চরিত্রকে দৃশ্যের ভিতর দিয়া তিনি অবতীর্ণ করান নাই—তাঁহার প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র।

এই নাটকে বিধবা-বিবাহ প্রচারক বিদ্যাসাগরের পরিচয় দেওয়াই নাট্যকারের উদ্দেশ্য ছিল; কিন্তু তাঁহার পরদুঃখকাতরতা ও দানশীলতার বৃত্তান্তও তাঁহার চরিত্রের সঙ্গে এমন ভাবে জড়িত যে, তাহার প্রসঙ্গও ইহা হইতে পরিত্যক্ত হইতে পারে নাই। এমন কি, সংস্কৃত কলেজের চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া দামোদর সাঁতরাইয়া রাত্রি করিয়া ভ্রাতার বিবাহোপলক্ষে বাড়ী ফিরিয়া তিনি যে মাতার আদেশ পালন করিয়া মাতৃভক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন, এই প্রসঙ্গটি তাঁহার বিধবা-বিবাহ প্রচার কার্যের সঙ্গে কোন দিক দিয়া জড়িত না থাকিলেও নাট্যকার ইহাও নাটকের মধ্য দিয়া উপস্থিত করিয়াছেন। সুতরাং যদিও বিধবা-বিবাহ প্রচারের বিষয়টিই এই নাটকে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, তথাপি বিদ্যাসাগরের জীবনের অন্যান্য প্রসঙ্গও যে ইহাতে একেবারেই পরিত্যক্ত হইয়াছে, তাহা নহে—প্রায় সকল প্রসঙ্গই ইহাতে কোন না কোন ক্রমে আসিয়া গিয়াছে। সুতরাং ইহাকেও সার্থক একলক্ষ্যমুখীন রচনা বলিয়া নির্দেশ করিবার উপায় নাই।

এই নাটকের আর একটি প্রধান ত্রুটি এই যে, ইহার কোন কোন দৃশ্য নাটকীয় পরিচয় লাভ করিবার পরিবর্তে শিক্ষামূলক (academic) তর্কসভায় পরিণত হইয়াছে, ইহাতে নাট্যকাহিনীর ধারা স্বভাবতঃই বাধাপ্রাপ্ত হইয়া নাটকীয় কৌতূহল দূর হইয়া গিয়াছে। এই সম্পর্কে তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে রাধাকান্ত দেবের বিচার-সভার উল্লেখ করা যায়। ইহা পণ্ডিতের শাস্ত্রীয় তর্কসভা, ইহার নাটকীয় গুণ কিছুমাত্র নাই। অথচ বিদ্যাসাগরের জীবনীতে ইহা যেমন সত্য, বিধবা-বিবাহের প্রচারের দিক দিয়াও ইহা তেমনই আবশ্যক, এই নাটকে ইহাকে পরিত্যাগ করা কঠিন। এই সকল ক্ষেত্রেই জীবনী-নাটকের ত্রুটি নিতান্ত প্রকট হইয়া থাকে; নাট্যকারের ইচ্ছা না থাকিলেও কোন কোন দৃশ্য তাঁহাকে নাটকের মধ্যে গ্রহণ করিতে হয়, তাহাতে জীবন-তথ্য প্রচারিত হইলেও নাট্যগুণ বিসর্জন দিতে হয়। বিধবা-বিবাহের প্রসঙ্গটি যতখানি নাটকীয় ক্রিয়া-মূলক, তদপেক্ষা অধিক শাস্ত্রীয় তর্কমূলক; ইহাতে নাটকীয় কর্ম-ধারা বিকাশের সুযোগ সীমাবদ্ধ, পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনা করিতে হইলে সেইজন্য নাট্যগুণ-বিবর্জিত প্রসঙ্গও ইহাতে গ্রহণ না করিয়া উপায় নাই। এই নাটকে অনেক ক্ষেত্রেই তাহা হইয়াছে। শাস্ত্রীয় তথ্যের পরিবর্তে হৃদয়ের অনুভূতি

হইতেই বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহের প্রেরণা আসিয়াছিল; এই নাটকে শাস্ত্রকথা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, বিদ্যাসাগরের হৃদয়ানুভূতি তাহার অন্তরালবর্তী হইয়া আছে। শাস্ত্রকথাকে গৌণ করিয়া হৃদয়ের অনুভূতিকে মুখ্য করিতে পারিলে নাটক হিসাবে ইহা অধিকতর সার্থকতা লাভ করিতে পারিত। বিদ্যাসাগরের বাল্যসঙ্গিনী যে সুরোর অকালবৈধব্য বিদ্যাসাগরের অনুভূতিশীল হৃদয়কে প্রথম আঘাত করিয়াছিল, তাহার প্রসঙ্গ এই নাটকে উল্লেখযোগ্য স্থান লাভ করিতে পারে নাই। কল্পনা দ্বারা এই প্রসঙ্গ পল্লবিত করা অসঙ্গত বলিয়া নাট্যকার সে পথ পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহার জীবনীতে এই বিষয়ে সামান্য যে উল্লেখ মাত্র পাইয়াছেন, তাহাই নিতান্ত সংক্ষিপ্ত ভাবে এখানে কাজে লাগাইয়াছেন। কোন সর্বজনবরেণ্য চরিত্র অবলম্বন করিয়া জীবনী-নাটক রচনার যে ত্রুটি অপরিহার্য, ইহাতে তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে মাত্র। সেইজন্যই জীবনী-নাটক জীবনী হইলেও নাটক হয় না এই নাটকে বিধবা-বিবাহ প্রচারক বিদ্যাসাগরের পরিচয়ই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, অথচ তাঁহার মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রবর্তন করিবার মূল প্রেরণা যেখান হইতে আসিয়াছিল, তাহা স্পষ্ট হইয়া উঠিতে না পারিলে, ইহার যথার্থ শক্তি প্রকাশ পাইতে পারে না। সেইজন্য শাস্ত্রের কথাই এখানে অহেতুক প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, তাঁহার হৃদয়ের কথা গৌণ হইয়া রহিয়াছে। এ কথা সত্য যে, বিধবা-বিবাহ প্রচারের মধ্য দিয়াই বিদ্যাসাগর চরিত্রের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় প্রকাশ পাইতে পারে নাই, তাঁহার চরিত্রের অন্যান্য গুণের সঙ্গে ইহার মৌলিক সম্পক আছে; সেইজন্য অন্যান্য গুণগুলি অপরিস্ফুট থাকিলেও মূল চরিত্র যথার্থ পরিস্ফুট হইতে পারে না, এই নাটকে বিদ্যাসাগরের চরিত্র সম্পর্কে তাহাই হইয়াছে। কোন চরিত্রের কেবল মাত্র একদেশদর্শিতা দ্বারা সেই চরিত্রের সম্যক্ মর্যাদা রক্ষা অসম্ভব, 'বিদ্যাসাগর' নাটক এই ত্রুটি হইতে মুক্ত হইতে পারে নাই। বিধবা-বিবাহের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট না থাকিলেও বিদ্যাসাগরেব জীবন-ভিত্তিক এই নাটক রচনা করিতে গিয়া তাঁহার জীবনের বিশেষ উল্লেখযোগ্য কতকগুলি ঘটনা এই নাটকে পরিবেশনের লোভ নাট্যকার সংযত করিতে পারেন নাই। এই শ্রেণীর কোন কোন ঘটনার প্রত্যক্ষ দৃশ্যের মধ্য দিয়া অবতারণা করা হইয়াছে, আবার কোন কোন ঘটনার পরোক্ষ বর্ণনা করা হইয়াছে। শেষোক্ত প্রণালী ইহার নাট্যগুণ আরও ক্ষুণ্ণ করিয়াছে।

বিদ্যাসাগরের পর এই নাটকে আর প্রায় সকল চরিত্রই সমান স্থান অধি-

কার করিয়াছে। ইহা এক-চরিত্র-প্রধান রচনা ; কিন্তু জীবনী-নাটক হইলেও যে তাহা একান্ত এক-চরিত্র-প্রধান রচনা হইবে, এমন কোন কথা নাই। বিদ্যাসাগরের জীবনে তাঁহার জননী ভগবতী দেবীর একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল, নাটকের মধ্যে ভগবতী দেবী সেই স্থান লাভ করিতে পারেন নাই। বিদ্যা-সাগরের পত্নী দিনময়ী দেবীও এই নাটকের মধ্যে কোন উল্লেখযোগ্য অংশ অধিকার করিতে পারেন নাই। বিদ্যাসাগরের বহির্মুখী কর্মজীবনকে ইহাতে প্রাধান্য দিবার ফলে তাঁহার পারিবারিক জীবন এখানে মুখ্য স্থান লাভ করিতে পারে নাই, অথচ পারিবারিক জীবনের মধ্য দিয়াই মানবিক গুণ বিকাশের যে সুযোগ সহজেই পাওয়া যায়, বহির্মুখী কর্মজীবনের মধ্য দিয়া তাহা তত সহজে পাওয়া যায় না। নাট্যকার এখানেও বিদ্যাসাগরের প্রচলিত জীবন-চরিতকে নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসবণ করিবার ফলে ইহার এই ত্রুটি অপরিহার্য হইয়াছে। কিন্তু তথাপি এ কথা স্বীকার করিতে হয়. দিনময়ীব যে ক্ষীণতম পরিচয়টি এই নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার মধ্যে তাঁহাব চরিত্রে যথার্থ নাটকীয় গুণ প্রকাশ পাইয়াছে, কিন্তু তাহা নাট্যকাহিনীব মধ্যে অত্যন্ত নগণ্য স্থান অধিকার করিয়াছে। এই নাটকে ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের চরিত্রটি সংক্ষিপ্ত হইলেও সুন্দর এবং বাস্তবধর্মী হইয়াছে, ইহা বিদ্যাসাগরের জনকের যোগ্যতা রক্ষায় সম্পূর্ণ সার্থক। কিন্তু সমগ্র নাটকের মধ্যে তাঁহারও স্থান এত সংক্ষিপ্ত যে, তাঁহার চরিত্র নাট্যকাহিনীব উপর কোন সক্রিয় প্রভাব বিস্তাব কবিতে পারে নাই।

নাটকে কেবলমাত্র পরিবেশ সৃষ্টি করিবার জন্য তৎকালীন অনেক স্বনামধন্য ব্যক্তিব ইহাতে অবতাবণা করা হইয়াছে, কাহিনীর দিক দিয়া এতগুলি চরিত্রেব এখানে প্রয়োজন অপরিহার্য ছিল না, সর্বসমেত প্রায় চল্লিশটি পুরুষ চরিত্র এবং সাতটি স্ত্রী চরিত্র ইহাতে আছে। তাঁহার পুর্ববর্তী নাটক 'শ্রীমধুসূদনে'র সঙ্গে অনেক চরিত্রই এখানে অভিন্ন। বিস্তৃত পরিবেশ সৃষ্টি ব্যতীত নাট্যকাহিনীতে ইহাদের অনেকেরই সক্রিয় অংশ নাই। জীবনী নাটকের এই ত্রুটিগুলি অনেকটা অপরিহার্য।

মাইকেল মধুসূদনের জীবনী অবলম্বন করিয়া অজয়কুমার চক্রবর্তী 'মহাকবি' নামক জীবনী-নাটক রচনা কবেন। ইহা ১৯৫২ সনে প্রকাশিত হয়। নাট্যকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন, '১৯৪৮ সালের মে মাসে নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী কর্তৃক অভিনীত "মাইকেল মধুসূদন" দর্শনের পর এই

রচনার সূত্রপাত হয়।' ইহা প্রধানতঃ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের 'শ্রীমধুসূদনের'ই অনুকরণ-জাত রচনা হইলেও মধ্যে মধ্যে নাট্যকার নিজস্ব মৌলিক চিন্তারও পরিচয় দিয়াছেন। ইহার সংলাপের ভাষা অধিকতর সহজ ও প্রত্যক্ষ; 'শ্রীমধুসূদনে' মধ্যে মধ্যে যেমন রোমাণ্টিকতার প্রশ্রয় দেওয়া হইয়াছে, ইহাতে তাহা হয় নাই। ইহার মধ্যেও মধুসূদনের আনুপূর্বিক জীবন অবলম্বন করিবার ফলে নাটকীয় যে ত্রুটি অপরিহার্য, সেই সকল ত্রুটিই প্রকাশ পাইয়াছে। এই নাটকে মধুসূদনের প্রথম বিবাহিতা পত্নী রেবেকার প্রসঙ্গ একেবারেই পরিত্যক্ত হইয়াছে, হেনরিয়েটাকে লইয়াই মধুসূদনের মাদ্রাজ-জীবনের সূত্রপাত হইয়াছে।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম জনপ্রিয় কথা-সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ১৯৫৪ সনে তাঁহার রচিত 'রামমোহন' জীবনী-নাটক প্রকাশিত করেন। এই জীবনী-নাটকখানির একটি প্রধান গুণ এই যে, রামমোহনের কর্মবহুল জীবনের সমগ্র অংশই ইহার উপজীব্য না হইয়া কেবল মাত্র এই নাটকের প্রয়োজনে যে সকল ঘটনা ইহার মধ্যে আসিয়াছে, নাট্যকার তাহাই ইহাতে গ্রহণ করিয়াছেন। এই সম্পর্কে তিনি নিজেই 'লেখকের বক্তব্যে' উল্লেখ করিয়াছেন, 'কর্মী ও পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ রামমোহনের জীবন এত বিচিত্র ঘটনার দ্বন্দ্বে আলোড়িত যে সেগুলিকে উপযুক্তভাবে সাজাতে পারলেই তারা নাটকীয় হ'য়ে উঠে। অপরিসীম প্রলোভন সত্ত্বেও এমন বহু জিনিসকে আমি ব্যবহার করতে পারিনি—যেগুলি অবলম্বন করে আরো অন্ততঃ তিনখানা নতুন নাটক রচনা করা চলে।' এই উপলব্ধি ইহার পূর্বে রচিত আর কোনও জীবনী-নাট্যকারের মধ্যে দেখা যায় নাই। রামমোহনের বিলাতযাত্রার সূচনাতেই নাট্যকাহিনীর যবনিকাপাত হইয়াছে। তাঁহার ইংলণ্ডের প্রবাস-জীবন যদিও নাট্যগুণসমৃদ্ধ ছিল, তথাপি নাট্যকার তাহা এই নাটকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, মধুসূদন-সংক্রান্ত জীবনী-নাটক দুইখানিতেই এই ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু তথাপি নাটকে কালগত ঐক্য রক্ষা পায় নাই, ইহার ঘটনাকাল ১৭৯৪ সন হইতে ১৮৩০ সন পর্যন্ত বিস্তৃত।

'রামমোহন' নাটকটি আরম্ভ হইয়াছে রামমোহনের বিশ বৎসর বয়স হইতে। পৌত্তলিকতা-বিরোধী ও স্বাধীনবুদ্ধি রামমোহনের সহিত তাঁহার পিতা দেওয়ান রামকান্তের সংঘর্ষের মধ্য দিয়া নাটকের সূচনা। রামমোহনের

জননী তারিণীদেবীর পিতা শ্যামাকান্ত ভট্টাচার্যের অভিশাপের সহিত নিজের আর্থিক দুর্গতি ও রামমোহনের বিজাতীয় আচরণ রামকান্তকে প্রায় ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিয়াছে। প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত হইয়াছে রামকান্তের শ্রাদ্ধবাসরে—গৃহদেবতার কাছে নিজের ম্লেচ্ছতা ও নাস্তিক মনোভাবের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন নাই বলিয়া তারিণী রামমোহনকে পিতৃশ্রাদ্ধের অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন।

দ্বিতীয় অঙ্কের আরম্ভ হইয়াছে রামমোহনের অগ্রজ জগমোহনের মৃত্যুব পর তাঁহার পত্নী অলকমণি দেবীর সহমরণের একটি বীভৎস দৃশ্য দিয়া। রাম-মোহন ভ্রাতৃবধূকে বাঁচাইতে পারেন নাই; কিন্তু তাঁহার চিতাশয্যার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সংকল্প লইয়াছেন যে, ভারতবর্ষ হইতে সতীদাহের পাপ তিনি চির-তরে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিবেন। ইহার পর হইতে হিন্দু সমাজ ও নিজ পরিবারের সহিত রামমোহনেব বিবোধ চবমে উঠিয়াছে। পৈতৃক আবাস পরিত্যাগ করিয়া রামমোহন রাধানগরে নূতন আবাস নির্মাণ করিয়াছেন। কিন্তু সমাজপতি রামজয় বটব্যালেব অত্যাচারে তাঁহাকে সেখান হইতেও বিতাড়িত হইতে হইয়াছে এবং রামজয়কে উৎসাহ দিয়াছেন স্বয়ং রামমোহনের জননী তারিণী দেবী।

তৃতীয় অঙ্কে রামমোহনের কলিকাতার কর্মক্ষেত্র দেখানো হইয়াছে। সংগ্রামী বিপ্লবী রামমোহন নিজের বিপুল কর্মোদ্দীপনাকে দিকে দিকে ছড়াইয়া দিয়াছেন। উনবিংশ শতাব্দীব অনেক প্রধান ব্যক্তিই এই অঙ্ক হইতে নাটকে প্রবেশ করিয়াছেন—ডেভিড হেয়ার, দ্বারকানাথ ঠাকুর, কালীনাথ মুন্সী, অন্নদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। রামমোহনের প্রতিপক্ষ রূপে দেখা দিয়াছেন রাধাকান্ত দেব, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তাবাচাঁদ দত্ত, কালীনাথ তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি। জাস্টিস্ স্যার এডোয়ার্ড হাইড্ ঈস্টের গৃহে 'মহা-বিদ্যালয়' (হিন্দু কলেজ) পরিকল্পনার একটি ঐতিহাসিক ও নাটকীয় দৃশ্যে রামমোহনকে কি ভাবে কলেজের পরিচালক সমিতি হইতে সরাইয়া দেওয়া হইল, তাহা দেখানো হইয়াছে। জননী তারিণী দেবীর সহিত রামমোহনের শেষ সাক্ষাৎকার ঘটিয়াছে—ম্লেচ্ছ পুত্রের গৃহে জলবিন্দু গ্রহণ না করিয়াও তেজস্বিনী মাতা সত্যাশ্রয়ী পুত্রকে তাঁহার অকুণ্ঠ আশীর্বাদ জানাইয়া গিয়াছেন। সতীদাহ প্রসঙ্গে গবর্নর-জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের সহিত রামমোহনের সাক্ষাতের একটি অসাধারণ দৃশ্যও এই অঙ্কে রহিয়াছে।

চতুর্থ অঙ্ক গড়িয়া উঠিয়াছে রামমোহনের সতীদাহ-নিরোধ বিল এবং

রাধাকান্ত দেব প্রমুখ 'ধর্মসভা'র নেতৃবৃন্দের বিরোধের মধ্য দিয়া। রামমোহন ও তাঁহার দলবল বেণ্টিঙ্কের সাহায্যে সতী-বিল পাশ করাইয়াছেন, ফলে ক্রোধক্ষিপ্ত 'ধর্মসভা' রামমোহনের মৃত্যুকামনা করিতেছে—পথে ক্রুদ্ধ জনতা রামমোহনকে আক্রমণ করিতে আসিতেছে। রামমোহন সমস্ত নিন্দা ও বিরোধিতার মধ্যে নিজের উন্নত মস্তক লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। 'ধর্মসভা'র পক্ষ হইতে ফ্রান্সিস্ বেথি সতী-বিলের বিরুদ্ধে দরখাস্ত লইয়া বিলাতে গিয়াছেন—সতী-বিলের সমর্থনে রামমোহনও রওনা হইবেন। একটি সুযোগও আসিয়া গিয়াছে, দিল্লীর বাদশাহ রামমোহনকে রাজদূতের মর্যাদা দিয়া তাঁহার ব্যক্তিগত প্রয়োজনেই ইংলণ্ডে পাঠাইতে চান।

সমস্ত বাধা-ভয়-দুঃখকে ঠেলিয়া দিয়া রামমোহন বিলাত-যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। এই যাত্রায় তাঁহার প্রধান সঙ্গী কে হইবেন ? কেন—রাজারাম ! মুসলমানের সন্তান, ক্রীশ্চান কর্তৃক লালিত এবং হিন্দু ব্রাহ্মণ রামমোহনের আশ্রিত এই রাজারামের মধ্যেই রামমোহন ভারতের প্রাণ-প্রতীকটির সন্ধান পাইয়াছেন এবং তাহাকে বক্ষে লইয়াই তাঁহার এই দূর দুর্গমের যাত্রা সার্থক হইয়া উঠিবে !

এই জীবন-কাহিনীর মধ্যে যে নাটকীয় উপাদান আছে, নাট্যকার তাহার সদ্ব্যবহার করিয়াছেন, তবে কতকগুলি দৃশ্য কতদূর অভিনয়যোগ্য তাহা বিবেচ্য।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর কর্ম-জীবন যে বাংলা জীবনী-নাটকের সার্থক ভিত্তিরূপে গৃহীত হইতে পারে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। অথচ এই বিষয়ে আজ পর্যন্ত কোন উল্লেখযোগ্য নাটক রচিত হয় নাই। একান্ত সমসাময়িক বিষয় অবলম্বন করিয়া নাটক রচনার কতকগুলি বাধা আছে ; কারণ, তাঁহার সম্পর্কিত অনেক চরিত্রই এখনও জীবিত আছেন। তাহাদের রূপায়ণ নানা কারণেই কঠিন। তথাপি এই বিষয়ে একখানি মাত্র নাটক রচিত হইয়াছে, তাহা শৈলেশ বিশী রচিত 'নেতাজী'। ১৯৪৬ সনে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার পর এই বিষয়ে আর কোন উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায় না।

নবম অধ্যায়

নাট্যশালা ও নাট্য-সংস্থা

(১৯১২—১৯৬০)

এক

গিরিশ প্রতিভার অস্তদিগন্তে শারদ পূর্ণিমার চন্দ্র ছিলেন অমরেন্দ্রনাথ দত্ত। অমৃতলাল বসু তখন দূরদিগন্তের নক্ষত্র—আলো আছে, কিন্তু দীপ্তি নাই। নিকটবর্তী গ্রহের দ্যুতি লইয়া দেখা দিলেন দানীবাবু (সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, গিরিশচন্দ্রের পুত্র)—স্থির, অচঞ্চল; কিন্তু অপরের আলোয় উদ্ভাসিত। গিরিশ-উত্তর যুগের বাংলা রঙ্গমঞ্চ সেইজন্য বেশ কিছুদিন গিরিশচন্দ্রের যুগেই আবর্তিত হইয়াছিল। এই যুগের নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল এবং ক্ষীরোদপ্রসাদও পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক নাটকের মাধ্যমে অতীতচারী ছিলেন। ভক্তি ও বীররসই তখন বেশী পরিবেশিত হইত। এই গতানুগতিকার পথেই বাংলা রঙ্গমঞ্চে বিশ শতকের প্রথম দুই দশক অতিক্রান্ত হইল। নূতন ভাবে, নূতন আঙ্গিক এবং প্রয়োগ-কৌশলে নূতনত্ব দেখা দিল বিশ শতকের তৃতীয় দশকে—'আর্ট থিয়েটার' ও 'নাট্যমন্দির' প্রতিষ্ঠায়। গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পরে এবং 'আর্ট থিয়েটার' ও 'নাট্যমন্দির' প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত বাংলার রঙ্গমঞ্চকে যাঁহারা গতিশীল করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে নট, নাট্যকার এবং পরিচালক অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্রবোধচন্দ্র গুহ, 'মনোমোহন থিয়েটারে'র প্রতিষ্ঠাতা মনোমোহন পাঁড়ে, 'মিনার্ভা-'র তদানীন্তন স্বত্বাধিকারী উপেন্দ্রনাথ মিত্র প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এই সময় বাংলার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়—(১) 'মিনার্ভা'-য় 'উজ্জ্বলে মধুরে', 'হেস্তনেস্ত', 'হুলুস্থুলু', 'বিদায় অভিশাপ', 'ক্লিওপেট্রা', 'মিশরকুমারী', 'বশীকরণ', প্রভৃতি, (২) 'ষ্টার' রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়—দ্বিজেন্দ্রলালের 'আনন্দ বিদায়', ভূপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সওদাগর', 'ওথেলো', 'আযোধ্যার বেগম' প্রভৃতি এবং (৩) 'মনোমোহন-'এ অভিনীত নাটকের মধ্যে 'মোগলপাঠান' ও 'দেবলাদেবী' উল্লেখযোগ্য।

রবীন্দ্রনাথকে ব্যঙ্গ করিয়া রচিত দ্বিজেন্দ্রলালের 'আনন্দ-বিদায়ে'-র অভিনয় ১৩১৯ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে 'ষ্টার' রঙ্গমঞ্চে স্থরু হয়। কিন্তু রবীন্দ্রানুরাগী দর্শকবৃন্দ সে অভিনয় বন্ধ করিয়া দেন। ব্যক্তিগত আক্রমণ ও ব্যক্তিগত কলঙ্ক ইতিপূর্বে বাংলা রঙ্গমঞ্চে উপস্থাপিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই ; কিন্তু জনরুচি তখন সংস্কৃত এবং মার্জিত। ফলে 'আনন্দ-বিদায়' অভিনয়ের দুরবস্থা দেখিয়া এই ধরণের অভিনয়ে আর কেহ সাহসী হন নাই। এই দিক দিয়া বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে 'আনন্দ-বিদায়' স্মরণীয় হইয়া আছে।

অমরেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁহার শেষ জীবনে 'ষ্টার' রঙ্গমঞ্চ 'লীজ' নেন। অপর চারিজন স্বত্বাধিকারীর মধ্যে অন্যতম ছিলেন হরিপ্রসাদ বসু। এই সময় সেখানে ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সওদাগর' ('মার্চেন্ট অব ভেনিস' অবলম্বনে) অভিনীত হয়। ভূপেন্দ্রনাথ নাটক এবং কুশীলবদের নামকরণ করেন বাঙ্গালীর মত। সেই অনুযায়ী শাইলক=কুলীরক, এণ্টোনিও=অনিলকুমার, ব্যাসানিও=বসন্তকুমার, পোর্সিয়া=প্রতিভা, যেসিকা=যূথিকা-য় রূপান্তরিত হয়। 'শাইলক' বা কুলীরক-এর স্থকঠিন ভূমিকায় অবতীর্ণ হন স্বয়ং অমরেন্দ্রনাথ। ১১ই ডিসেম্বর (১৯১৫) তিনি অসুস্থ অবস্থায় অভিনয় করেন। ১২ই ডিসেম্বর নূতন নাটক 'সাজাহান'। 'ঔরঙ্গজেব'-এর ভূমিকায় অভিনয় করার সময়ে তৃতীয় অঙ্কের পর তিনি অভিনয়-ক্ষমতা হারান, তাঁহার মুখ দিয়া রক্ত উঠিতে থাকে। ৬ই জানুয়ারী, ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। স্থকণ্ঠ ও শক্তিশালী অভিনেতা অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন দ্বারিকানাথ দত্তের বংশধর, শিক্ষাবিদ্ হীরেন্দ্রনাথ দত্তের ভ্রাতা। বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে সংগঠনমূলক কার্যে এবং রঙ্গমঞ্চ বিষয়ক পত্রিকাদির মাধ্যমে রঙ্গমঞ্চের উন্নতি সাধনের জন্য তিনি চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন। তাঁহার মৃত্যুতে বাংলা রঙ্গমঞ্চ অভিভাবক-শূন্য হইয়া পড়ে। কারণ, অমৃতলাল বসু তখন জীবিত থাকিলেও কর্ম-শক্তিহীন, নিষ্প্রভ ; আর দানীবাবু শক্তিমান অভিনেতা হইলেও নেতৃত্বের ও পরিচালনার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে 'মিনার্ভা'-য় প্রমথনাথ ভট্টাচার্যের 'ক্লিওপেট্রা' অভিনীত হয়। দানীবাবু অ্যাণ্টনী ও তারাসুন্দরী ক্লিওপেট্রার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। সে সময় বা তাহার কিছু আগে বিলাতে স্যার বীরভম ট্রি সেকস্‌পীয়রের 'ক্লিওপেট্রা' বেশ কৃতিত্বের সঙ্গে অভিনয় করেন। সেই অভিনয়ের শততম অভিনয় রজনীর স্মারকগ্রন্থ কলিকাতায় পাওয়া যাইত। 'ক্লিওপেট্রা'-য়

প্রমথনাথ বীবভম ট্রি-কে অনুসরণ করেন। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে এখানে ক্ষীরোদ-প্রসাদের গীতিনাট্য 'কিন্নরী' মঞ্চস্থ হয় (৩২শে শ্রাবণ, ১৩২৫)। 'কিন্নবী' প্রথমে 'ষ্টার' ও মিনার্ভা' উভয় মঞ্চেই অভিনীত হয়। এই ব্যাপারে অভিনয় স্বত্ব লইয়া তদানীন্তন 'ষ্টাব' রঙ্গমঞ্চের পবিচালক অপরেশচন্দ্র মামলা কবিয়, মিনার্ভা-র কাছে পবাজিত হন। এই ঘটনার ফলেই ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চে নাটকের অভিনয় সম্পর্কিত নিয়মাবলী সর্বপ্রথম বিধিবদ্ধ হয়। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে 'মিনার্ভা'-য় বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্তেব 'মিশর কুমারী' অভিনীত হয়। মঞ্চসজ্জা, দৃশ্যসজ্জা, পোষাক পবিচ্ছদ, বাদ্য ও সংগীত, সর্বোপবি মনোরম পারিপার্শ্বিকতায় 'মিশর কুমাবী' দর্শকেব প্রাণমন হরণ করে। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে নরেশচন্দ্র মিত্র এবং রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায় 'মিনার্ভা'-য় যোগদান করেন 'মিনার্ভা'র তদানীন্তন কর্ণধার উপেন্দ্রনাথ মিত্রেব উদার আহ্বানে। উপেন্দ্রনাথ মিত্র ছিলেন শিক্ষিত ও দুরদর্শী। বাংলা রঙ্গমঞ্চে আসন্ন নবযুগকে তিনি উপলব্ধি করিযা এযুগেব শিক্ষিত ও যুবক অভিনেতৃবৃন্দকে স্বাগত জানান। সাহিত্যিক মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রস্তাবে উপেন্দ্রবাবু ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথেব 'বশীকরণ' মঞ্চস্থ করেন। 'বশীকরণে'র প্রধান ভূমিকায অবতীর্ণ হন রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায। পবে 'ষ্টার' বঙ্গমঞ্চেও 'বশীকবণ' মঞ্চস্থ হয়। কিন্তু 'ষ্টার' 'মিনার্ভা'কে ম্লান করিতে পাবে নাই। ঐ বৎসবই 'মিনার্ভা'য 'চন্দ্রগুপ্ত' অভিনীত হয়। চাণক্য—নবেশচন্দ্র, অ্যান্টিগোনাস—রাধিকানন্দ। 'চন্দ্রগুপ্ত'-র অভিনয়ে 'মিনার্ভা' প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

এই সময় রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে এক অঘটন ঘটে। 'মিনার্ভা' তথন 'শকুন্তলা'-র মহলায় ব্যস্ত। এই মহলা চলার সময় ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই অক্টোবর (বুধবার, শ্যামাপূজার পূর্বদিন) 'মিনার্ভা' অগ্নিদগ্ধ হয়। ফলে রঙ্গমঞ্চ ও প্রেক্ষাগার সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়। 'মিনার্ভা'র উদ্বোধন হইয়াছিল ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই জানুয়ারী 'ম্যাকবেথ'-এর অভিনয়ের মাধ্যমে। প্রায় ত্রিশ বৎসর পরে চলার পথে ইহা সুকঠিন আঘাতের সম্মুখীন হয়।

এই পর্বে 'মনোমোহন থিয়েটারে'-র নায়ক ছিলেন দানীবাবু। এখানে অভিনীত নাটকের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মোগল পাঠান' এবং নিশিকান্ত বসুর 'দেবলাদেবী' উল্লেখযোগ্য। 'মোগল পাঠান' অভিনীত হয় ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে :—শের শা—দানীবাবু, হুমায়ুন—চুনীবাবু, চাঁদ—বসন্তকুমারী,

সোফিয়া—শশিমুখী। 'দেবলাদেবী'-তে দানীবাবুর খিজির চরিত্রের অভিনয় এক অপূর্ব কীর্তি। মতিয়ার ভূমিকায় অভিনয় করেন আশ্চর্যময়ী।

অমরেন্দ্রনাথের পরে আনন্দমোহন হালদার 'ষ্টার' রঙ্গমঞ্চ লীজ নেন। তাহার পর লেসী হইলেন গিরি মল্লিক। গিরিবাবুর সময়েই, ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে অপরেশচন্দ্র 'মিনার্ভা' রঙ্গমঞ্চের ম্যানেজারী ছাড়িয়া 'ষ্টার'-এ ম্যানেজার রূপে যোগদান করেন। সঙ্গে ছিলেন তারকনাথ পালিত এবং তারাসুন্দরী। এই বৎসরেরই মার্চ মাসে 'ষ্টার'-এ মহাসমারোহে দেবেন্দ্রনাথ বসুর 'ওথেলো' অভিনীত হয়। ভূমিকায় অংশগ্রহণ করেন তারকনাথ পালিত (ওথেলো), তারাসুন্দরী (ডেসডিমোনা), অপরেশচন্দ্র (ইয়াগো), প্রবোধ বসু (ক্যাশিয়ো)। কিন্তু 'ওথেলো'-র অভিনয় 'ষ্টার' রঙ্গমঞ্চে জমে নাই। এই সময় গিরিবাবু 'ষ্টার' ছাড়িয়া দিলে রঙ্গমঞ্চ লীজ নেন স্বয়ং অপরেশচন্দ্র। লেসী অপরেশচন্দ্র রঙ্গমঞ্চকে জাঁকাইয়া তুলিবার জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিলেন। অবশেষে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর স্বরচিত 'অযোধ্যার বেগম'-এর অভিনয়ে অপরেশচন্দ্র সফলকাম হইলেন। চুনীলাল দেব (মীরকাসিম), লক্ষ্মীকান্ত মুখোপাধ্যায় (সুজাউদ্দৌলা), তারাসুন্দরী (অযোধ্যার বহু বা বউ বেগম), অপরেশচন্দ্র (হাফেজ রহমান), কৃষ্ণভামিনী (ছায়া), নীহারবালা (জিন্নাৎ), রাধাচরণ ভট্টাচার্য (লছমী প্রসাদ) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেন। অভিনয়ের চমৎকারিত্বে এবং পরেশচন্দ্র বসু (পটল বাবু) কর্তৃক অঙ্কিত দৃশ্যসজ্জার মনোহারিত্বে 'অযোধ্যার বেগম' 'ষ্টার' রঙ্গমঞ্চের এক স্মরণীয় অর্ঘ্য হইয়া আছে। ভূতনাথ দাস ইহার সংগীতশিক্ষক ছিলেন।

এই পর্বের যে-সকল সাংস্কৃতিক সংস্থায় নাট্যাভিনয়ের রেওয়াজ ছিল তাহাদের মধ্যে 'ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউট', 'ওল্ড ক্লাব', 'ইভনিং ক্লাব', এবং 'বিচিত্রা' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও অভিনয় সংক্রান্ত ব্যাপারে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের কোন সংস্থা বা মঞ্চ না-থাকায় ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে এই অভাব দূরীকরণের জন্য 'ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউট'-এর প্রতিষ্ঠা হয়। অবশ্য প্রথমে ইহার নাম ছিল 'Society for the higher training of young men.' সেদিন ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত, আনন্দমোহন বসু, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক বিনয়েন্দ্র সেন, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ তদানীন্তন বাংলার শিক্ষা জগতের কর্ণধারগণ। প্রথমে

ইহার নিজস্বভবন ছিল না, সংস্কৃত কলেজের পুরাতন বাড়ীর এক হলঘরে ইহার অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন হইত। ইহার সাহিত্য শাখার সভাপতি ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। এখানে প্রথমে অভিনীত হয় 'সেকস্‌পীয়র'-এর 'জুলিয়াস্ সিজার' (২৭ শে জানুয়ারী, ১৮৯৯) এবং মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ'। নাট্যরূপ দান করিয়াছিলেন পণ্ডিতপ্রবর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। অভিনয় পরিচালনায় ছিলেন নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী এবং প্রধান উৎসাহদাতা ছিলেন অধ্যাপক মন্মথ মোহন বসু। শিক্ষিত ছাত্র অভিনেতা, অধ্যাপক ও পণ্ডিতবর্গ তাহাদের শিক্ষক ও পরিচালক। সুতরাং স্বভাবতই এখানকার অভিনয়ের রুচি মার্জিত ও উন্নত শ্রেণীর ছিল।

এখানে শুধু অভিনয়ই হইত না, এই সংস্থার পরিচালকমণ্ডলী ইহার মাধ্যমে ছাত্র ও যুবসমাজের সম্মুখে একটি নূতন এবং উচ্চ আদর্শ তুলিয়া ধরিবার প্রয়াস পান। গ্রন্থাগার, বিতর্ক ও আলোচনা সমিতি, ক্রীড়াবিভাগ, সাংস্কৃতিক বিভাগ ও পত্রিকা বিভাগ—এতগুলি বিভিন্ন বিভাগে ছাত্র ও যুবকবৃন্দকে উৎসাহিত করা হইত। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে শিশিরকুমার ভাদুড়ী এখানে যোগদান করেন। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই মার্চ 'ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউট'-এ 'হ্যামলেট' মঞ্চস্থ হয়। এই অভিনয়ে শিশিরকুমার প্রথম মঞ্চাবতরণ করেন ('ক্লডিয়াস' ও 'হ্যামলেট'-র পিতার প্রেতাত্মার ভূমিকায়)। ঐ বৎসরই এখানে 'কুরুক্ষেত্র' অভিনীত হয়। যোগ দিলেন নরেশচন্দ্র মিত্র (দুর্বাসা-র ভূমিকায়)। পর বৎসর এখানে গিরিশচন্দ্রের 'বুদ্ধদেব' নাটকে নাম ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া শিশিরকুমার উদাত্ত কণ্ঠের সুললিত আবৃত্তিতে দর্শকবৃন্দকে চমৎকৃত ও মুগ্ধ করেন। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর এখানে দ্বিজেন্দ্রলালের 'চন্দ্রগুপ্ত' অভিনীত হয়। চাণক্য—শিশিরকুমার, কাত্যায়ন—নরেশচন্দ্র, নন্দ—রাঘবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ইহার কিছুদিন পুর্বে 'মিনার্ভা' রঙ্গমঞ্চে চন্দ্রগুপ্ত নাটকে চাণক্যের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন দানীবাবু। গিরিশ-উত্তর যুগের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের সার্থক সৃষ্টি 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের একই ভূমিকায় গিরিশ-উত্তর যুগের দুই শক্তিমান অভিনেতা প্রায় একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন মঞ্চে অবতীর্ণ হন।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ শে মার্চ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভাইস্-চ্যান্সেলার ডঃ দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারীর সম্মানার্থে 'ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউট'-এ রবীন্দ্রনাথের 'বৈকুণ্ঠের খাতা' অভিনীত হয়। শিশিরকুমার এবং

নরেশচন্দ্র যথাক্রমে 'অবিনাশ' ও 'কেদার' রূপে মঞ্চে অবতীর্ণ হন। পরের বৎসর ১লা সেপ্টেম্বর এখানে ক্ষীরোদপ্রসাদের 'ভীষ্ম' মঞ্চস্থ হয়। অধ্যাপক শিশিরকুমার তখন ইহার অভিনয় ও প্রয়োগ পদ্ধতির শিক্ষকতা করেন। এই অভিনয়ে অমাত্যর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন অধ্যাপক নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব ভাইস্-চ্যান্সেলার)। ইহার পরেও নিমন্ত্রিত হইয়া শিশিরকুমার এখানে কয়েকবার অভিনয় করেন। 'ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউট' আজ স্বভবনে সুপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু সে আজ হৃতগৌরব, সামর্থ্যহীন। সৌখীন সম্প্রদায়ের ক্ষণিক আসর জমাইয়া সে তাহার পূর্বস্মৃতিকে স্মরণ করে।

এ যুগের অপর দুইটি সংস্থা 'ইভনিং ক্লাব' ও 'ওল্ড ক্লাব'। 'ইভনিং ক্লাব' ছিল কর্নওয়ালিস স্ট্রীট ও কৈলাসচন্দ্র বসু স্ট্রীটের সংযোগ-স্থলে। ইহার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল এবং ইহার অন্যতম পরিচালক, শিক্ষক ও প্রধান অভিনেতা ছিলেন নট-নাট্যকাব প্রমথনাথ ভট্টাচার্য। 'চন্দ্রগুপ্ত' এখানকার এক স্মরণীয় অভিনয়। ভূমিকায় অবতীর্ণ হন হরিদাস চট্টোপাধ্যায় (চন্দ্রগুপ্ত), তিনকড়ি চক্রবর্তী (সেলুকাস ও ভিক্ষুক), গণদেব গাঙ্গুলী (বাচাল)। 'ওল্ড ক্লাব' ছিল ওয়েলিংটন স্ট্রীট ও বহুবাজাব স্ট্রীটের মোড়ে এক বাড়ীতে। এখানে কেবল শিশিবকুমারই নন, তাঁহাব সঙ্গে প্রধান প্রধান অংশে অবতীর্ণ হইতেন নির্মলেন্দু লাহিড়ী, ললিতমোহন লাহিড়ী এবং বিশ্বনাথ ভাদুড়ী। তিনকড়ি চক্রবর্তীও এখানকাব সভ্য ও অভিনেতা ছিলেন। লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, এই তিনটি সাংস্কৃতিক সংস্থার সৌখীন অভিনেতৃগণই পরবর্তী কালে বাংলাব সাধারণ রঙ্গমঞ্চে নূতন যুগের সূচনা করেন, এই নব-যুগের প্রদীপ্ত ভাস্কর ছিলেন শিশিরকুমার ভাদুড়ী।

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীব 'বিচিত্রা' ক্লাব বা সভা এই পর্বের এক বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান। ইহার অন্যতম উদ্যোক্তা ও সম্পাদক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃষ্ঠপোষক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুব, গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ প্রমুখ ঠাকুর বাড়ীর সাহিত্যিক ও শিল্পিবৃন্দ। আর ইহার সভ্যশ্রেণীভুক্ত ছিলেন (অবশ্যই বিনা দক্ষিণায়) কলিকাতার জ্ঞানী, মানী ও শিল্পিবৃন্দ। 'বিচিত্রা'র বৈঠকে রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য কবি, সাহিত্যিক ও শিল্পিগণের কবিতা ও প্রবন্ধাদি পঠিত ও আলোচিত হইত। সেই সঙ্গে ছিল নাচ, গান ও অভিনয়ের ব্যবস্থা।

এখানে অভিনীত নাটকের মধ্যে 'ডাকঘর' ও 'বৈকুণ্ঠের খাতা' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে এখানে 'ডাকঘর' মঞ্চস্থ হয়। দুইদিন অভিনয় হয়। প্রথম দিনের দর্শক ছিলেন 'বিচিত্রা'-র সদস্যবৃন্দ। দ্বিতীয় দিনে নিমন্ত্রিত হইয়া দর্শকরূপে উপস্থিত ছিলেন মহাত্মা গান্ধী, বালগঙ্গাধর তিলক, মদনমোহন মালব্য, অ্যানি বেশান্ত প্রভৃতি মহিলা ও গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ। নাটকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন রবীন্দ্রনাথ (ঠাকুরদা), গগনেন্দ্রনাথ (মাধব), অবনীন্দ্রনাথ (মোড়ল), অসিতকুমার হালদার (দইওয়ালা), আশামুকুল দাস (অমল), অবনীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা কন্যা সুরূপা দেবী (সুধা) প্রভৃতি। 'বিচিত্রা ভবনে'র দ্বিতলের হলঘরের একপ্রান্তে ঠাকুরবাড়ীর রুচি ও সৌন্দযবোধের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ছোট একটি রঙ্গমঞ্চ নির্মিত হয়। মঞ্চ ও অঙ্গসজ্জার স্বাভাবিক সৌন্দর্যে ও অভিনয়ের চমৎকারিত্বে দর্শকবৃন্দ মুগ্ধ হইয়াছিলেন । ইহার কিছুকাল পরে এখানে 'বৈকুণ্ঠের খাতা' অভিনীত হয়। অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অজিতকুমার চক্রবর্তী, অসিতকুমার হালদার প্রভৃতি। 'বৈকুণ্ঠের খাতা'-র অভিনয় বেশ কৌতুককর ও চমকপ্রদ হইয়াছিল। কিন্তু সাধারণ রঙ্গমঞ্চে এ পর্বে রবীন্দ্র-নাটক বিশেষ সমাদৃত হয় নাই। কারণ, জনরুচি তখনও ছিল অনেক পশ্চাৎপদ। তবে পরবর্তীকালের 'আর্ট থিয়েটার' ও 'নাট্যমন্দিরে'র উপর ইহার কলাশিল্প ও প্রয়োগপদ্ধতির গভীর প্রভাব লক্ষিত হয়।

'ষ্টার' রঙ্গমঞ্চে যখন 'অযোধ্যার বেগম' পূর্ণোদ্যমে চলিতেছে, তখন উত্তর কলিকাতাতেই 'ম্যাডান থিয়েটার' এক নূতন রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত করে, 'কর্ণ-ওয়ালিস' মঞ্চ (বর্তমান 'শ্রী' সিনেমা হল)। এখানে 'আলমগীর' (প্রথম অভিনয় ১০ই ডিসেম্বর, ১৯২১)-র নাম ভূমিকায় অবতীর্ণ হইলেন শিশিরকুমার। পেশাদারী অভিনেতা হিসাবে এই তাঁহার প্রথম মঞ্চাবতরণ। অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন প্রবোধ বসু, সত্যেন দে, গোপাল ভট্টাচার্য, কুসুমকুমারী প্রভৃতি। প্রায় পাশাপাশি দুইটি মঞ্চে মহাসমারোহে অভিনয় চলিতেছে। ছাত্র ও তরুণসমাজের ভিড় জমিল 'আলমগীরে'র আসরে। কারণ, এখানে অধ্যাপকের মঞ্চাবতরণ হইয়াছিল—অভিভাবকবৃন্দের শাসনের রাশ একটু শিথিলও হয় সম্ভবতঃ এই কারণেই। রঙ্গমঞ্চের নানাবিধ উন্নতির প্রসঙ্গ ছাড়িয়া দিলেও রঙ্গমঞ্চে শিশিরকুমারের শুধু আবির্ভাবই বাংলা রঙ্গমঞ্চের

সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছে। এ মঞ্চে তিনিই একমাত্র কৃতী অভিনেতা। সেইজন্য এক মঞ্চে শিশিরকুমার একা, অপর মঞ্চে প্রতিষ্ঠিত এক শিল্পিগোষ্ঠী পরস্পরের প্রতিযোগিতার সম্মুখীন।

ইতিমধ্যে 'ষ্টার' রঙ্গমঞ্চে এক ভাঙ্গা-গড়া দেখা দিল। অপরেশ বাবু লীজ পালটাইয়া দিলেন, অবশ্য ম্যানেজার হইলেন তিনিই স্বয়ং। সেক্রেটারী বা সম্পাদকরূপে নিযুক্ত হইলেন প্রবোধচন্দ্র গুহ। এ্যাটর্নী সতীশচন্দ্র সেন, কুমারকৃষ্ণ মিত্র, হরিদাস চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতিকে লইয়া পরিচালক সমিতি গঠিত হইল। এই নূতন ব্যবস্থায় 'ষ্টার' রঙ্গমঞ্চ পরবর্তী ১লা বৈশাখ (১৩৩০ বঙ্গাব্দ) হইতে 'আর্ট থিযেটাব' নামে পবিচিত হইবে। ইতিমধ্যে ৩১শে চৈত্র, ১৩২৯ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত পুবানো কর্ণধারগণ এখানে মঞ্চস্থ কবেন 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'তুটি প্রাণ' এবং 'স্থদামা'। ওদিকে 'ম্যাডান'-দের 'বেঙ্গলী থিয়েট্রি-ক্যাল কোম্পানী'-র কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আদর্শ ও মতবাদের দিক হইতে বনিবনা না হওয়ায় শিশিরকুমার 'কর্ণওয়ালিস' রঙ্গমঞ্চ ত্যাগ করেন। তিনি তখন 'আলফ্রেড' রঙ্গমঞ্চ ভাড়া করিয়া সেখানে 'বসন্ত লীলা' গীতিনাট্যের অভিনয় করেন (১৩৩০ বঙ্গাব্দ, ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দ)। 'বসন্ত লীলা'-র সাফল্য নাট্যখানির সাফল্য সূচিত করে। 'বসন্ত লীলা' সপ্তাহখানেক অভিনীত হইবার পর এখানে 'আলমগীর' অভিনীত হয়। বাংলা বঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে 'শিবরাত্রির সলতে' তখন 'মিনার্ভা-'ই। 'ষ্টার' রঙ্গমঞ্চে আর্ট থিয়েটারের নূতন আসর তখনও জমে নাই, 'মনোমোহন' নিবু-নিবু। এই সময় শিশিরকুমারও একটি স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ গঠনে ব্রতী হইয়া 'মনোমোহন' রঙ্গমঞ্চে 'নাট্যমন্দির' স্থাপন করেন। নবীন যুগের অরুণোদয় আসন্ন হইয়া আসিল।

দুই

বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে নূতন যুগ সূচিত হইল 'আর্ট থিয়েটার' ও 'নাট্যমন্দির'-এর প্রতিষ্ঠায়। নব-প্রতিষ্ঠিত এই দুই রঙ্গমঞ্চেরই যাত্রা সুরু হয় পৌরাণিক নাটকের মাধ্যমে, যুগাবতার পরমপুরুষেব লীলাকে অমৃতরসে পরিণত করিয়া। 'আর্ট থিয়েটারে'র উদ্বোধন হয় 'কর্ণার্জুনে'র অভিনয়ে ১৫ই আষাঢ, ১৩৩০ (৩০শে জুন, ১৯২৩), আর 'নাট্যমন্দির'-এর উদ্বোধন হয় 'সীতা' নাট্যাভিনয়ের মাধ্যমে (৬ই আগস্ট, ১৯২৪)। 'আর্ট থিয়েটার'-এ'কর্ণার্জুন'-এর ভূমিকা ছিল এইরূপ: কর্ণ—তিনকড়ি চক্রবর্তী (পরে কিছুদিন অহীন্দ্র চৌধুরী), অর্জুন—অহীন্দ্র চৌধুরী (পরে কিছুদিন কালীপ্রসন্ন পাইন), দ্রৌপদী —নিভাননী। 'কর্ণার্জুন' 'আর্ট থিয়েটাব'-এ বেশ জমিয়াছিল। 'কর্ণার্জুন'-ই বঙ্গরঙ্গমঞ্চে সর্বপ্রথম তিন শততম অভিনয় সৌভাগ্য লাভ করে। 'আর্ট থিয়েটারে' পূর্ব হইতেই সিট রিজার্ভ করিয়া রাখা যাইত। এই নিয়ম এই প্রথম দেখা গেল। 'আর্ট থিয়েটার' বুধবারেও অভিনয় সুরু করেন। প্রথম বুধবারের অভিনয় হয় ২৯শে আগস্ট, ১৯২৩। অভিনীত নাটক ছিল 'রাজা ও রাণী'। দৃশ্যপট, মঞ্চসজ্জা এবং বেশভূষায় উৎসাহিত হইয়া সাহায্য ও নির্দেশ দান করেন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মঞ্চোপবি কাশ্মীরী আবহাওয়ায় সেদিনের দর্শক বেশ আনন্দিত ও কৌতূহলোদীপ্ত হইয়া উঠে।

নাট্যমন্দির-এ 'সীতা' নাট্যাভিনয়ে মঞ্চাবতরণ করেন শিশিরকুমার ভাদুড়ী (রাম), বিশ্বনাথ ভাদুড়ী (লক্ষ্মণ), তারাকুমার ভাদুড়ী (ভরত), তুলসী-চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (শত্রুঘ্ন), ললিতমোহন লাহিড়ী (বশিষ্ঠ), মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য (বাল্মীকি), যোগেশচন্দ্র চৌধুরী (শম্বুক), কৃষ্ণচন্দ্র দে (বৈতালিক), পান্নাবাণী (কৌশল্যা), প্রভা (সীতা), ঊষারাণী (ঊর্মিলা), নীরদাসুন্দরী (তুঙ্গভদ্রা) প্রভৃতি। প্রথম অভিনয়ে উপস্থিত ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, নির্মলচন্দ্র চন্দ্র, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজেন্দ্র বিদ্যাভূষণ প্রমুখ ব্যক্তিগণ। প্রথমে শিশিরকুমারই ছিলেন 'নাট্যমন্দিবে'র একক অধিকারী। দুই বৎসর পরে 'নাট্যমন্দির' লিমিটেড কোম্পানীতে পরিণত হয়। 'মনোমোহন' মঞ্চে

নাট্যমন্দিরের স্থিতিকালও পূর্ণ দুই বৎসর নয়। এই সময়ে 'সীতা' ভিন্ন 'নাট্য-মন্দিরে' 'পাষাণী', 'জনা' ও 'পুণ্ডরীক' অভিনীত হয়। 'জনা'র উদ্বোধন হয় ২০শে জ্যৈষ্ঠ (বুধবার), ১৩৩২ (৩রা জুন, ১৯২৫)। এই সময় নরেশচন্দ্র মিত্র 'আর্ট থিয়েটার' ত্যাগ করিয়া 'নাট্যমন্দির'-এ যোগদান করেন। 'নাট্য-মন্দির'-এর দেখাদেখি 'আর্ট থিয়েটার'ও 'জনা' মঞ্চস্থ করে। প্রবীর 'নাট্যমন্দির'-এ শিশিরকুমার, 'আর্ট থিয়েটার'-এ দানীবাবু। দর্শকবৃন্দ ও শহরবাসী বিস্মিত ও কৌতুকাবিষ্ট। রূপারোপের অভিনবত্বে ও আঙ্গিকের নূতনত্বে 'নাট্যমন্দির' বেশ কৃতিত্বের পরিচয় দেয়। এখানে নামভূমিকায় অবতীর্ণা হন সুপ্রতিষ্ঠিতা অভিনেত্রী তারাসুন্দরী। 'জনা'র পর 'পাষাণী', তাহার পর 'পুণ্ডরীকে'র শুভ উদ্বোধন হয় ২৭শে শ্রাবণ (বুধবার), ১৩৩২ বঙ্গাব্দ। এই নাটকের প্রথম অভিনীত রজনীর টিকিট বিক্রয়লব্ধ অর্থ 'দেশবন্ধু স্মৃতিভাণ্ডারে' প্রদত্ত হয় (এই বৎসরই দেশবন্ধুর মৃত্যু হয়)।

'নাট্যমন্দির' প্রতিষ্ঠা পর্বে কলিকাতায় দুইটি মাত্র রঙ্গমঞ্চ—'নাট্যমন্দির' ও 'আর্ট থিয়েটার'। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে 'মিনার্ভা' ভস্মীভূত হয়। নবনির্মিত 'মিনার্ভা'র পুনরায় শুভ উদ্বোধন হয় মহাতাপচন্দ্র ঘোষের 'আত্মদর্শনে'র নাট্যাভিনয়ের মাধ্যমে ৮ই আগস্ট, ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে। এই সময় 'নাট্যমন্দির'-এ টিকিটের মূল্য বৃদ্ধি পায়। উচ্চহারের আসন হইল দশ ও পাঁচ টাকার। নিম্নতম প্রবেশ মূল্য হইল এক টাকা। ইহাতে একদিকে সাধারণ দর্শক শ্রেণীর অসুবিধা হইয়াছিল সত্য, কিন্তু গণতান্ত্রিক যুগে অবাঞ্ছিতদের কিছু পরিমাণে দূরে রাখা সম্ভব হইয়াছিল। 'মনোমোহন' রঙ্গমঞ্চে 'নাট্যমন্দিরে'র অভিনয় হয় ১৩৩২ বঙ্গাব্দের বড়দিন পর্যন্ত। ৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩২ বঙ্গাব্দে 'আলমগীর' মঞ্চস্থ হয়। নামভূমিকায় শিশিরকুমার এবং উদিপুরীর ভূমিকায় তারাসুন্দরী অবতীর্ণ হন। অতঃপর এখানে অভিনীত হয় 'জনা', 'সীতা', 'আলিবাবা', 'পুনর্জন্ম', 'চাটুয্যে বাড়ুয্যে' প্রভৃতি। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বর 'নাট্যমন্দির' লিমিটেড কোম্পানীতে পরিণত হয়। তখনই এ সম্প্রদায় উদয়-বিলয়-এর জীর্ণ আবাস 'মনোমোহন' রঙ্গমঞ্চ ত্যাগ করিয়া 'কর্ণওয়ালিশ' রঙ্গমঞ্চে উঠিয়া আসে। মঞ্চসজ্জায়, দৃশ্যসজ্জায় ও প্রেক্ষাগারের নূতন ব্যবস্থাপনায় তখন 'কর্ণওয়ালিশ' ছিল আদর্শস্থানীয় রঙ্গমঞ্চ।

১৩৩২ বঙ্গাব্দে 'ষ্টার' রঙ্গমঞ্চে 'আর্ট থিয়েটার' সম্প্রদায় বঙ্কিমচন্দ্রের

'চন্দ্রশেখর' মঞ্চস্থ করে। নামভূমিকায় অবতীর্ণ হন রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়। পুরাতন 'ষ্টার' রঙ্গমঞ্চে এই নাটকের নামভূমিকায় অবতীর্ণ হইতেন অমৃতলাল মিত্র। এই অভিনয়ে সবদিক দিয়াই নবীন প্রবীণ বা পুরাতনের কাছে পরাজয় বরণ করে। 'নাট্যমন্দির' 'মনোমোহন' রঙ্গমঞ্চ ত্যাগ করিয়া আসিবার পর 'আর্ট থিয়েটার' সম্প্রদায় ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে 'মনোমোহন' রঙ্গমঞ্চ 'লীজ' লইয়া অপরেশচন্দ্রের 'শ্রীবামচন্দ্র' নাটকের অভিনয় করেন। এই নাটকের বিভিন্ন ভূমিকায় ছিলেন দুর্গাদাস, অহীন্দ্র চৌধুরী, সুশীলাবালা (বড ও ছোট) প্রভৃতি। অতঃপর 'আর্ট থিয়েটার' সম্প্রদায় তাঁহাদের দুইটি রঙ্গমঞ্চে দুইটি পুবাণো নাটকেব অভিনয় করেন—'ষ্টার'-এ ক্ষীরোদপ্রসাদেব 'অশোক' এবং 'মনোমোহন'-এ গিরিশচন্দ্রের 'শঙ্করাচার্য'। এই বৎসরই 'ষ্টার' মঞ্চে রবীন্দ্রনাথের 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটক মঞ্চস্থ হয়। গীতবহুল ধনঞ্জয় বৈরাগীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন প্রসিদ্ধ গায়ক-নট মুকুন্দ দাস।

'কর্ণওয়ালিশ' মঞ্চে 'নাট্যমন্দির'-অভিনীত নাটকের মধ্যে 'বিসর্জন', 'ষোডশী', 'দিগ্বিজয়' ও 'নর-নারায়ণ' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই মঞ্চে 'নাট্যমন্দির'-এর উদ্বোধন হয় 'সীতা' নাটকের অভিনয় মাধ্যমে (৮ই আষাঢ, ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ)। ১১ই এবং ১২ই আষাঢ (১৩৩৩) এখানে 'বিসর্জন' অভিনীত হয়। রঘুপতির ভূমিকায় অবতীর্ণ হন স্বয়ং শিশিরকুমাব। এ নাটকের সুরকার ছিলেন দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আর দৃশ্যসজ্জায় ছিলেন শিল্পী রমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। সু-অভিনয়, অভিনব সজ্জা, এবং সুকণ্ঠ গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে-র গান সত্ত্বেও এ নাটক জমে নাই। কারণ, দর্শক তখনও সংস্কারাচ্ছন্ন। 'নর-নারায়ণ'-এর উদ্বোধন হয় ১৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ। শিশিরকুমার (কর্ণ), বিশ্বনাথ ভাদুড়ী (শ্রীকৃষ্ণ), চারুশীলা (দ্রৌপদী), কৃষ্ণভামিনী (পদ্মাবতী), হরিসুন্দরী (গান্ধারী) প্রভৃতি প্রধান ভূমিকাসমূহে অবতীর্ণ হন। কৃষ্ণভামিনী এই সময় 'আর্ট থিয়েটার' ত্যাগ করিয়া 'নাট্যমন্দির'-এ যোগদান করেন। শিশিরকুমারের দ্বিতীয় অভিনীত সামাজিক নাটক (প্রথম ছিল 'প্রফুল্ল') 'ষোড়শী' (প্রথম অভিনয় ২১শে শ্রাবণ, ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ)। এই সময় হইতে এখানে নিয়মিতভাবে প্রতি বৃহস্পতিবারে অভিনয় হইতে থাকে। 'ষোড়শী'-তে জীবানন্দ-র ভূমিকায় শিশিরকুমাব এবং 'ষোড়শী'-র ভূমিকায় চারুশীলা অভিনয় করিতেন। মাস খানেক অভিনীত হইবার পর ইহার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'শেষ রক্ষা' নাটকের অভিনয়

যুক্ত হয়। এই সময় 'নাট্যমন্দির' পুরাতন নাটকেরও অভিনয় করিতেন। তাহাদের মধ্যে 'প্রফুল্ল' উল্লেখযোগ্য (অভিনীত হয় ১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ)। 'নাট্যমন্দির'-এর সঙ্গে পাল্লা দিয়া ঐ সময় 'ষ্টার' রঙ্গমঞ্চেও 'আর্ট থিয়েটার' দানীবাবুকে লইয়া 'প্রফুল্ল'-র অভিনয় করেন। কিন্তু 'নাট্যমন্দির'-এর কাছে তাঁহাদের প্রয়াস নিষ্প্রভ ছিল। পরবর্তী কালে 'নবনাট্যমন্দির' ও 'শ্রীরঙ্গম'-এও শিশিরকুমার 'প্রফুল্ল'-র অভিনয় করেন। সাধারণ রঙ্গমঞ্চে তাঁহার শেষ অভিনীত নাটকও এই 'প্রফুল্ল'।

১৩৩৫ বঙ্গাব্দে 'নাট্যমন্দির'-এ 'বিল্বমঙ্গল' অভিনীত হয় (প্রথম অভিনয় ৫ই জ্যৈষ্ঠ)। নামভূমিকায় শিশিরকুমার এবং পাগলিনী চরিত্রে কৃষ্ণভামিনী অবতীর্ণ হন। ধর্মভাবাপন্ন নাটকের অভিনয় আমাদের দেশে কোনদিনই ব্যর্থ হয় নাই; শিশিরকুমার এই ধর্মভাবকে অমৃতরসে রূপ দেন। এই সময়ে প্রতিভাশালিনী অভিনেত্রী কঙ্কাবতী সাহু বি. এ. 'নাট্যমন্দির'-এ যোগদান করেন। এই বৎসরেরই অগ্রহায়ণ মাসে শিশিরকুমার যোগেশ চৌধুরীর 'দিগ্বিজয়ী' নাটক মঞ্চস্থ করেন এবং স্বয়ং নাদির শাহ-র ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। এই নাটকে মাঘ মাসে 'ভারত নারী'-র ভূমিকায় কঙ্কাবতী প্রথম মঞ্চাবতরণ করেন। 'দিগ্বিজয়ী' শিশির-প্রতিভার এক অবিস্মরণীয় কীর্তি। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা অক্টোবর গিরিশস্মৃতি সমিতি কর্তৃক গিরিশ পার্কে গিরিশচন্দ্রের মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠাকল্পে অর্থ সংগ্রহের জন্য 'নাট্যমন্দির'-এ 'বিশেষ রজনী'রূপে 'প্রফুল্ল' অভিনীত হয়। ১৩৩৬ বঙ্গাব্দেও 'দিগ্বিজয়ী' মহাসমারোহে 'নাট্যমন্দির'-এ অভিনীত হয়। এই সময় 'নাট্যমন্দির'-এর নূতন দানের মধ্যে 'তপতী' ও 'রমা' উল্লেখযোগ্য। সাধারণ রঙ্গমঞ্চে 'রাজা ও রাণী' বহুবার সমাদৃত হইলেও তাহার পরিবর্তিত রূপ 'তপতী' রঙ্গমঞ্চে সাফল্য লাভ করে নাই। 'তপতী'-কে সার্থকভাবে রূপায়িত করিতে শিশিরকুমার সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়া সফল হইলেন বটে; কিন্তু জনসাধারণ তাঁহার অর্ঘ্য গ্রহণ করে নাই। 'আর্ট থিয়েটার'-এও অনুরূপ ঘটনা ঘটে 'গৃহপ্রবেশ'-এর নাট্যাভিনয়ে।

ইতিপূর্বে ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে 'ষ্টার' রঙ্গমঞ্চে 'চিরকুমার সভা' অভিনীত হয়। বাংলার সাধারণ রঙ্গমঞ্চে এই নাটকটি রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য নাটকের অগ্রদূত। সম্ভবতঃ ইহার অভিনয়-সাফল্যই রবীন্দ্রনাথকে 'গৃহপ্রবেশ', 'শোধবোধ', 'শেষরক্ষা', 'তপতী' প্রভৃতি নাটককে অভিনয়-উপযোগী রূপ দান করিতে

অনুপ্রেরিত করে। 'আর্ট থিয়েটার' এবং 'নাট্যমন্দির'-এ রবীন্দ্রনাটক প্রায় সমান সংখ্যক অভিনীত হয়। 'আর্ট থিয়েটার'-এ অভিনীত হয় 'চিরকুমার সভা', 'শোধবোধ', এবং 'গৃহপ্রবেশ', আর 'নাট্যমন্দির'-এ অভিনীত হইয়াছিল 'বিসর্জন', 'শেষরক্ষা' এবং 'তপতী'। পৌরাণিক নাটকের অভিনয়ে 'আর্ট থিয়েটার'-কে ম্লান করিলেও শিশিরকুমার রবীন্দ্রনাটকের ক্ষেত্রে অভিনয় জগতে 'আর্ট থিয়েটার'-কে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। কারণ, রবীন্দ্রনাটকের অভিনয়ে 'আর্ট থিয়েটার' নানাভাবে ঠাকুরবাড়ীর শিল্পিগোষ্ঠীর সাহায্য লাভ করিয়াছিল। সাধারণ ভাবে বলা যায় যে, রবীন্দ্র-নাটক এযুগে বিশেষ সমাদর লাভ করে নাই। ইহার মূলে ছিল মার্জিত ও সংস্কৃত রুচির অভাব।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন আমাদের দেশের সর্বপ্রথম নৃত্য-নাট্যকার। ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে 'নটীর পূজা'-র অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর কন্যা গৌরীদেবী নটীর ভূমিকায় অভিনব নৃত্যশিল্পে কলিকাতার শিক্ষিত সমাজকে মুগ্ধ ও বিস্ময়চকিত করেন। সেদিনের এই নৃত্যচ্ছন্দেব অভিনয়ে কলিকাতার সংরক্ষণশীল সমাজ নিন্দার হেতু খুঁজিয়া বাহির করেন। কিন্তু ইহার পর হইতে অনেক সংরক্ষণশীল ঘরেই নূপুরনিক্কণ শোনা যাইতে লাগিল। রবীন্দ্রনাথ বোলপুরে নৃত্য বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। শিক্ষকরূপে বৃত হইলেন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের নৃত্যবিশেষজ্ঞরা। ফলে আজ 'নৃত্যেরই তালে তালে' যুগের অতিক্রান্তি। শুধু তাহাই নয়, সেদিন 'আর্ট থিয়েটার' ও 'নাট্যমন্দির' রবীন্দ্রনাটকের আসর জমাইতে না-পারিলেও তাহার ক্ষেত্র প্রশস্ত করিয়া গিয়াছে। সেইজন্য আজ 'বহুরূপী' সম্প্রদায় একেব পর এক রবীন্দ্রনাটক পরিবেশনে সক্ষম। শুধু প্রয়োগ বিদ্যার নৈপুণ্যেই নাটক জমে না; তাহাকে উপলব্ধি করিবার মত শিক্ষা ও রুচি চাই। সৌভাগ্যবশতঃ 'বহুরূপী' আজ সেই দুর্লভ সুযোগ পাইয়াছেন।

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের নাট্যরূপ প্রথমে 'আর্ট থিয়েটার' মঞ্চস্থ করিলেও এক্ষেত্রে 'নাট্যমন্দির', বিশেষভাবে, শিশিরকুমার, অভূতপুর্ব কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। 'ষোড়শী' ও 'রমা' তাঁহার দুই কীর্তিস্তম্ভ। যে 'রমা'-কে সার্থক নাট্যরূপ দিতে অসমর্থ হইয়া 'আর্ট থিয়েটার' শরৎচন্দ্রের হস্তে ফেরৎ দেন, তাহাকে লইয়া শিশিরকুমার যে কীর্তিস্তম্ভ রচনা করিয়াছেন, তাহাই শিশিরবাবুর কৃতিত্বের স্মারক হইয়া রহিয়াছে।

এই পর্বে 'মনোমোহন থিয়েটার'-এর উল্লেখযোগ্য অভিনীত নাটক শচীন্দ্র সেনগুপ্তের 'রক্ত কমল'। 'মনোমোহন'-এর পরিচালক ছিলেন তখন 'অরোরা ফিল্মস্'-এর মালিক অনাদি বসু। পাঁচ দৃশ্যের এই নাটকের জন্য কবি নজরুল ইসলাম সাতখানি গান লিখিয়া দেন। চারখানি গান প্রতি দৃশ্যের শেষে এক কল্পিত চরিত্ররূপে গাহিয়াছিলেন ইন্দুবালা। অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন নির্মলেন্দু লাহিড়ী, বিশ্বনাথ ভাতুড়ী, গণেশ গোস্বামী, শেফালিকা এবং সরযূবালা।

এই সময় বাংলা রঙ্গমঞ্চের জগতে এক 'খাপছাড়া' ভাবের সৃষ্টি হয়। রাধিকানন্দ ও সুশীলাবালা 'নাট্যমন্দির' ত্যাগ করিয়া নিজেরাই পৃথক এক দল গঠন করেন। অভিনয়ের দক্ষতার সঙ্গে পরিশ্রম ও সংগঠনের ক্ষমতাও ছিল রাধিকানন্দের। প্রথমে তাঁহারা 'নিউ এম্পায়ার'-এ রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা' মঞ্চস্থ করেন (পৌষ, ১৩৩৫)। অর্জুনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন রাধিকানন্দ স্বয়ং। তাঁহাদের দ্বিতীয় অর্ঘ্য 'পাণ্ডবগৌরব'। ভ্রাম্যমাণ, অর্থহীন অথচ শক্তিমান এই অভিনেতাকে সেদিন সাহায্য করেন কুমার গোপিকারমণ রায় এবং শিশিরকুমার ভাতুড়ী। শিশিরকুমারের 'নাট্য-মন্দির'-এ রাধিকানন্দ ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে 'নিবেদিতা' মঞ্চস্থ করেন (২৬শে, ২৭শে এপ্রিল)। নরেশচন্দ্র মিত্র 'ষ্টার' রঙ্গমঞ্চ ত্যাগ করেন, আব নির্মলেন্দু লাহিড়ী তারাসুন্দরীকে লইয়া ভ্রাম্যমাণ অভিনয়েব দল গঠন করেন। দানীবাবুও 'ষ্টার-মিনার্ভা-মনোমোহন' ও 'মনোমোহন-মিনার্ভা-ষ্টার' করিয়া শেষ পর্যন্ত 'ষ্টার' রঙ্গমঞ্চেই স্থায়ী হন। এখানে তখন 'সাজাহান', 'বলিদান', 'প্রফুল্ল', 'সরলা' প্রভৃতি অভিনীত হয়। প্রতিষ্ঠাব ছয় বৎসর পবেই 'নাট্যমন্দির'-এর আলো নিভিয়া গেল। বছর দুই পরে 'আর্ট থিয়েটারে'রও সেই দশা হইল (১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দ)। ১৩৩৭ বঙ্গাব্দে শহরে তিনটি রঙ্গমঞ্চ— 'ষ্টার', 'মিনার্ভা' আর 'মনোমোহন' অবশিষ্ট রহিল।

শিশিরকুমারের 'নাট্যমন্দির' এবং 'আর্ট থিয়েটার'-এর দৃষ্টিভঙ্গি ও সৃষ্টিতেও যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। 'আর্ট থিয়েটার'-এর 'কর্ণার্জুন' ও 'নাট্য-মন্দির'-এর 'সীতা'; 'আর্ট থিয়েটার'-এর 'শ্রীকৃষ্ণ' ও 'নাট্যমন্দির'-এর 'নর নারায়ণ'-এ ইহাদের পার্থক্য অত্যন্ত স্পষ্টভাবে লক্ষিত হইত। প্রযোজনায় যে উন্নত শিল্পচেতনা এবং অভিনয়ের যে অন্তরস্পর্শী আবেদন 'নাট্যমন্দির'-এ প্রকাশ পাইত, 'আর্ট থিয়েটার' সে গৌরব কোনদিনই অর্জন করিতে পারে

নাই। শিল্পীর আত্মপ্রকাশের ভিতর দিয়া সমস্ত নাটকখানিকে উপস্থাপনা এবং তাহার পরিণতির তীর্থে পৌঁছাইয়া দেওয়ার জন্য দৃশ্যপট, সংগীত, নৃত্য, আঙ্গিক অভিনয়, আলোকচিত্র—সবই তাহার সঙ্গে সুসমঞ্জস করিয়া তুলিবার সার্থক প্রয়াস লক্ষিত হয় শিশিরকুমারের প্রয়োগ-নৈপুণ্যে। ফলে রঙ্গমঞ্চে দেখা দিল স্বভাবানুগের আবেদন।। এই ভাবেই বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে নূতন এক যুগ দেখা দিল। এইজন্যই শিশিরকুমার যুগ-প্রবর্তক।

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে সদলবলে শিশিরকুমার নিউইয়র্ক-এর তদানীন্তন থিয়েটার জগতের প্রতিষ্ঠিত পরিচালিকা মিস এলিজাবেথ মার-বেরীর আমন্ত্রণে 'সীতা'-র নাট্যাভিনয় প্রদর্শন করিতে আমেরিকায় যাত্রা করেন। ভারতীয় রঙ্গমঞ্চের ঐতিহ্যকে বিদেশীদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিবার এ অপূর্ব সুযোগ শিশিরকুমারই গ্রহণ করেন। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে অক্টোবর 'ব্যালটিমুর থিয়েটার'-এ 'সীতা' নাটক অভিনীত হয়। নিউইয়র্ক শহরে এই সময় সতু সেনের সঙ্গে শিশিরকুমারের সাক্ষাৎ হয়। সতু সেন তখন নিউ-ইয়র্কের 'ভ্যাণ্ডারবিল্ট থিয়েটার'-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁহার সহায়তায় সেখানে ছয় রাত্রির জন্য 'সীতা' অভিনীত হয়। দেশীয় বৈশিষ্ট্য ও ঐতিহ্যানুরাগী শিশিরকুমার 'সীতা'-র মাধ্যমে প্রাচীন ভারতকেই তুলিয়া ধরিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। সেইজন্য সম্ভবতঃ বাহ্যিক চাকচিক্যময় নিউইয়র্কের তাহা রুচিসম্মত হয় নাই। ফিরিবার পথে শিশিরকুমার দিল্লীতে রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান হিসাবে 'ভাইসরয়'-এর প্রাসাদে 'সীতা'-র অভিনয় প্রদর্শন করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন (১৯৩১)।

তিন

বিদেশ প্রত্যাগত শিশিরকুমারের অন্তরে আশার নূতন চেতনা, চোখে মুখে এক অপূর্ব দীপ্তি। কী যেন একটা সঙ্কল্প তাঁহাব অন্তরে বাসা বাঁধিয়াছে। 'আর্ট থিয়েটার' নাই, 'নাট্যমন্দির'-ও বিলুপ্ত। প্রেরণা আশ্রয় খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। সৌভাগ্যবশত: কলিকাতার কয়েকজন নাট্যশিল্পানুরাগী ব্যক্তি এই সময় সমবায় ভিত্তিতে 'রঙমহল'-এর প্রতিষ্ঠা করেন। 'রঙমহল'-এর উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র দে, শিশির মল্লিক, যামিনী মিত্র, সতু সেন প্রভৃতি। শিশিরকুমার প্রধান অভিনেতা ও অভিনয়ের শিক্ষকরূপে 'রঙমহল'-এ যোগদান করেন। প্রযোজনা ও সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন সতু সেন। যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর 'বিষ্ণুপ্রিয়া'-র অভিনয় মাধ্যমে 'রঙমহল'-এর শুভ উদ্বোধন হয় ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই আগস্ট। শিশিরকুমার (নিমাই), প্রভা (বিষ্ণুপ্রিয়া), কঙ্কাবতী (শচীমাতা) প্রভৃতি প্রধান প্রধান ভূমিকায় মঞ্চাবতরণ করেন। কলিকাতায় তখন চারিটি রঙ্গমঞ্চ—'ষ্টার', 'মিনার্ভা', 'নাট্যনিকেতন' এবং 'রঙমহল'।

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে 'আর্ট থিয়েটার'-এর ম্যানেজার হন অহীন্দ্র চৌধুরী। 'ষ্টার' রঙ্গমঞ্চে অনুরূপা দেবীর 'মন্ত্রশক্তি' তখন অভিনয় জগতে নূতন সাড়ার সৃষ্টি করে। উপন্যাসকে নাট্যরূপ দেন অপরেশচন্দ্র স্বয়ং। অভিনয়াংশে তিনকড়ি চক্রবর্তী (মথ্‌রো), কৃষ্ণভামিনী (বাণী), ইন্দুভূষণ (অম্বর) উচ্চশ্রেণীর অভিনয়ে দর্শকবৃন্দকে চমৎকৃত করেন। 'মন্ত্রশক্তি'-র সাফল্য 'কর্ণার্জুন'-এর জনপ্রিয়তাকে স্মরণ করাইয়া দেয়। ইহার পর আবার কেমন যেন ভাঙনের পালা। দানীবাবুর মৃত্যু হয় ২৯শে নভেম্বর, ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দ। 'ষ্টার' রঙ্গমঞ্চে অনুরূপা দেবী-র 'পোষ্যপুত্র'-র শ্যামকান্তের ভূমিকাই তাঁহার জীবনের শেষ অভিনয়। পুরাতন যুগের নক্ষত্রের আলোয় আলোকিত এক গ্রহ নিষ্প্রভ হইয়া গেল। গিরিশচন্দ্র ও অমৃতলাল মিত্রের শিষ্যের যুগও অতিক্রান্ত হইল। ইহার কিছুদিনের মধ্যেই চুনীবাবু ও কৃষ্ণভামিনী মারা যান। অপরেশচন্দ্রও অসুস্থ, 'একে একে নিভিছে দেউটি।' 'আর্ট থিয়েটার' গোষ্ঠীর 'চাঁদের হাটে' ভাঙন লাগিল। তখন সেখানে

শিশিরকুমার 'নব নাট্যমন্দির'-এর প্রতিষ্ঠা করেন। 'নব নাট্যমন্দির' এখানে মাত্র চার বৎসর ছিল। 'নব নাট্যমন্দির'-এর প্রতিপক্ষ হিসাবে তখনকার দিনের 'নাট্যনিকেতন' ও 'রঙমহল'-এর নাম উল্লেখযোগ্য। শিশিরকুমার কিছুদিন 'নাট্যনিকেতন'-এর সঙ্গেও সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে 'নব নাট্যমন্দির'-এ অভিনীত হয় শরৎচন্দ্রের 'বিরাজ বৌ', 'বিজয়া', জলধর চট্টোপাধ্যায়ের 'রীতিমত নাটক', শচীন সেনগুপ্তের 'দশের দাবী' এবং রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ' ও 'শ্যামা'। এতদ্ব্যতীত পূর্বে অভিনীত নাটকের মধ্যে 'প্রফুল্ল', 'বলিদান', 'চন্দ্রগুপ্ত', 'সীতা', 'শেষরক্ষা', 'দিগ্বিজয়ী' প্রভৃতি নাটক অভিনীত হয়। শিশিরকুমার স্বয়ং 'বিবাজ বৌ'-র নাট্যরূপ দেন এবং তাহা অভিনীত হয় ২৮শে জুলাই, ১৯৩৪। এই পর্বের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য নাট্যাভিনয় ছিল 'বিজয়া' (প্রথম অভিনয় ৬ই পৌষ, ১৩৪১ বঙ্গাব্দ)। নাটকের প্রধান আকর্ষণ ছিল দুইটি চরিত্র—রাসবিহারী ও বিজয়া। এই ভূমিকাদ্বয়ে শিশিরকুমার ও কঙ্কাবতী অসামান্য অভিনয় করেন।

কিন্তু 'নব নাট্যমন্দির'ও বেশীদিন স্থায়ী হইল না। শিশিরকুমারের স্পর্ধিত স্বাতন্ত্র্য একক। সেখানে সহ নাই, সহনশীলতাও নাই। 'নব নাট্যমন্দির' বন্ধ হইয়া গেলে শিশিরকুমারের পুনরাবির্ভাব দেখা গেল কয়েক বৎসর পরে। সদ্য বিলুপ্ত 'নাট্যনিকেতন'-এর ভাঙা আসরেই তিনি তাঁহার নটজীবনের শেষ কীর্তিস্তম্ভ 'শ্রীরঙ্গমে'র মঞ্চ জাঁকাইয়া তুলিলেন। জীবনের শেষ পর্বে এই তাঁহার নিজস্ব সর্বশেষ মঞ্চ। এইখানেই তাঁহার প্রতিভা অচঞ্চল ভাবে সর্বাপেক্ষা অধিক কাল (প্রায় চৌদ্দ পনেরো বৎসর) একাদিক্রমে অভিনয়ের সোনার ফসল ফলাইয়াছিল।

এই পর্বে রঙ্গমঞ্চে অভিনয়-রীতি ও প্রয়োগনৈপুণ্যে যে নূতনত্ব শিশির-প্রতিভা সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহাকে আরও সক্রিয় এবং ব্যাপক করিয়া তুলিলেন প্রযোজক সতু সেন। বাংলা রঙ্গমঞ্চে তাঁহার উল্লেখযোগ্য কীর্তি ঘূর্ণায়মান স্টেজ সৃষ্টি। 'রঙমহল' মঞ্চে 'মহানিশা' নাট্যাভিনয়ে এদেশের দর্শক তাহা প্রথম প্রত্যক্ষ করে। দৃশ্যসজ্জায় যেমন ঘূর্ণায়মান মঞ্চ সময় সংক্ষিপ্ত করে, তেমনই 'মুড লাইট' তাহাকে (অভিনয় নৈপুণ্যকে) আরও বর্ণাঢ্য ও মধুরতর করিয়া তুলে। 'মহানিশা'-র অভিনয় সাফল্য 'রঙমহল'-কে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা দান করে। এই নাটকের বিভিন্ন ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করেন

নরেশ মিত্র, যোগেশ চৌধুরী, রবি রায়, ভূমেন রায়, চারুবালা, শেফালিকা, রাজলক্ষ্মী (বড়) প্রভৃতি। শক্তিশালী অভিনেতা রতীন বন্দ্যোপাধ্যায় এই নাটকেই সর্বপ্রথম মঞ্চে অবতীর্ণ হন। এই নাটকের নাট্যরূপ ও প্রযোজনায় ছিলেন যথাক্রমে যোগেশ চৌধুরী ও সতু সেন।

'মহানিশা'-র সাফল্যে অনুপ্রাণিত হইয়া প্রবোধচন্দ্র গুহ অনুরূপা দেবীর 'মা'-র নাট্যাভিনয়ে আত্মপ্রকাশ করেন (পৌষ, ১৩৪০)। 'জননী' নাটকে 'নাট্যনিকেতন'-এ 'ওয়াগন স্টেজ' প্রথম ব্যবহৃত হয়। 'নাট্যনিকেতন'-এর একটি সার্থক প্রয়াসরূপে উল্লেখ করিতে হয় মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের 'চক্রব্যূহ'-র অভিনয় (প্রথম অভিনয়—২৫শে নভেম্বর, ১৯৩৩)। এই নাটকের দৃশ্য পরিকল্পনায় ছিলেন চারু রায়, সংগীত ও স্বরসংযোজনায় নজরুল ইসলাম, আর নৃত্য পরিকল্পনায় নীহারবালা। এই নাটকের প্রধান আকর্ষণ ছিল শকুনি। 'শকুনি'-র ভূমিকায় অহীন্দ্র চৌধুরী 'কর্ণার্জুন'-এর শকুনিকে (নরেশচন্দ্র) ম্লান করিয়া দেন। 'নাট্যনিকেতন'-এর দ্বিতীয় স্মরণীয় অর্ঘ্য ছিল শচীন সেনগুপ্তের ঐতিহাসিক নাটক 'সিরাজদ্দৌলা' (প্রথম অভিনয় ২৯শে জুন, ১৯৩৮)। পরিচালনায় ছিলেন সতু সেন ও নির্মলেন্দু লাহিড়ী। অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন নির্মলেন্দু লাহিড়ী (সিরাজ), রবি রায় (গোলাম হোসেন), শিবকালী চট্টোপাধ্যায় (মীরজাফর), ভূপেন চক্রবর্তী (ওয়াট্‌স্), নীহারবালা (আলেয়া), সরযূবালা (লুৎফা), নিরুপমা (ঘসেটি বেগম) প্রভৃতি। নির্মলেন্দু লাহিড়ী এবং সরযূবালার অভিনয় আজও স্মরণীয়।

'শ্রীরঙ্গম'-এর উদ্বোধন হয় নূতন নাট্যকার তারাকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'জীবনরঙ্গ'-র নাট্যাভিনয়ের মাধ্যমে (১০ই জানুয়ারী, ১৯৪২)। তাহার পর এখানে স্মরণীয় নাট্যাভিনয়ের মধ্যে 'মাইকেল মধুসূদন', 'পরিচয়', 'প্রশ্ন', 'তখতে তাউস' প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। 'শ্রীরঙ্গম'-এ মাইকেল অভিনীত হইবার কিছু আগে 'রঙমহল' মাইকেলের জীবনী সম্বন্ধীয় অন্য নাটক (মধুসূদন) মঞ্চস্থ করেন। সেখানে নামভূমিকায় অহীন্দ্র চৌধুরী সমবেত দর্শকমণ্ডলীকে মুগ্ধ করেন ; কিন্তু 'শ্রীরঙ্গম'-এ নামভূমিকায় শিশিরকুমার শ্রেণীবিশেষকে প্রীত ও উৎসাহিত করেন। 'বিপ্রদাস' যখন 'শ্রীরঙ্গম'-এ মঞ্চস্থ হয়, তখন শিশিরকুমার অনুজ বিশ্বনাথ ভাদুড়ীকে 'শ্রীরঙ্গম'-এর দায়িত্বভার অর্পণ করেন। 'শ্রীরঙ্গমে'র শেষ স্মরণীয় অর্ঘ্য 'আলমগীর'-এর পুনরভিনয় (১০ই ডিসেম্বর, ১৯৫১)। এই তারিখেই মঞ্চে শিশিরকুমারের ত্রিশ বৎসর পূর্ণ হয়। ফলে

সুহৃদ, অনুরাগীদের এই অভিনয়ের মাধ্যমে তিনি আপ্যায়িত করেন। বৃদ্ধবয়সেও 'আলমগীর'-এর নামভূমিকায় তিনি বেশ সজীব অভিনয় করেন।

'শ্রীরঙ্গম'-এর প্রতিষ্ঠাপর্বে আরও একটি উল্লেখযোগ্য রঙ্গমঞ্চ ছিল 'নাট্যভারতী'। শিশির মল্লিক, যামিনী মিত্র প্রভৃতির ব্যবস্থাপনায় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দুই পুরুষ'-এর অভিনয় মাধ্যমে 'নাট্যভারতী'-র শুভ উদ্বোধন হয়। বিভিন্ন ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করেন নরেশ মিত্র, যোগেশ চৌধুরী, ছবি বিশ্বাস, জহর গাঙ্গুলী, মিহির ভট্টাচার্য, অঞ্জলি, ছায়া প্রভৃতি। এখানে অভিনীত নাটকের মধ্যে 'পথের ডাক', 'কঙ্কাবতীর ঘাট', 'তটিনীর বিচার', 'সংগ্রাম', 'মুক্তি', 'ধাত্রীপান্না', 'দেবদাস' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। 'ধাত্রীপান্না' 'নাট্যভারতী'-র শেষ নিবেদন। এখানে ইহার দশটি অভিনয়ের পর 'নাট্যভারতী'-র দ্বার রুদ্ধ হয় (১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দ)।

১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দ। কলিকাতায় তখন প্রতিষ্ঠিত চারিটি রঙ্গমঞ্চ—'ষ্টার', 'মিনার্ভা', 'রঙমহল' ও 'শ্রীরঙ্গম'। 'রঙমহল'-এর অর্ঘ্য তখন 'মুক্তির ডাক', 'সেই তিমিরে' প্রভৃতি। রূপায়ণে ছিলেন ধীরাজ ভট্টাচার্য, নীতিশ মুখোপাধ্যায়, গুরুদাস, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, ঊষা দেবী, অপর্ণা দেবী ও রাজলক্ষ্মী (বড)। 'ষ্টার'-এ পুরাতনের তখন পুনরাবৃত্তি—'ষ্টারে'র নাট্যকার ও পরিচালক তখন মহেন্দ্র গুপ্ত। শিল্পসাধনার কোন সার্থক সিদ্ধিতে তিনি 'ষ্টার'-কে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই। তবে তাঁহারই রচিত 'মহারাজ নন্দকুমার' সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয় এবং জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এই সময় এখানে সমবেত শিল্পিগোষ্ঠীতে ছিলেন মহেন্দ্র গুপ্ত, অহীন্দ্র চৌধুরী, মিহির ভট্টাচার্য, রাণীবালা, পূর্ণিমা, বন্দনা প্রভৃতি। আর 'মিনার্ভা'-য় অভিনীত হয় 'চরিত্রহীন', 'বঙ্গে বর্গী' প্রভৃতি। অভিনয়াংশে ছিলেন নরেশ মিত্র, সন্তোষ সিংহ, ছবি বিশ্বাস, জহর গাঙ্গুলী, সরযূবালা, রমা দেবী, মলিনা দেবী প্রভৃতি। এইভাবে বাংলার রঙ্গমঞ্চ বেশ কিছুদিন গতানুগতিকতার আবর্তে মন্থরভাবে আবর্তিত হইতেছিল।

এই ভাঁটার টানে 'শ্রীরঙ্গম'-ও ভাসিয়া গেল। শিশিরকুমারের জীবন সাধারণ রঙ্গমঞ্চে শেষ হইল। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে জানুয়ারী তাঁহার এবং বাংলার রঙ্গমঞ্চের জীবনে এক বেদনাবিধুর দিন। ঐ দিন তাঁহাকে 'শ্রীরঙ্গম' ছাড়িয়া আসিতে হয়। ২২শে জানুয়ারী 'মিশর কুমারী', ২৩শে জানুয়ারী 'চন্দ্রগুপ্ত' এবং ২৪শে জানুয়ারী 'প্রফুল্ল' অভিনীত হয়। সেদিন যোগেশরূপী

শিশিবকুমাব সত্যই বলিয়াছিলেন, 'আমাব সাজান বাগান শুকিয়ে গেল'। এত বড সত্যকথা আব কোন অভিনেতা কোনদিনই উচ্চাবণ কবেন নাই।

শিশিবকুমাব ভাদুডীব পবলোকগমনেব সঙ্গে সঙ্গে বাংলা বঙ্গমঞ্চেব আব এক যুগেব অবসান হইল। বাংলা বঙ্গমঞ্চেব ক্রমবিকাশেব ধারা অনুসবণ কবিলে দেখা যায়, কয়েকটি বিশিষ্ট প্রতিভা অবলম্বন কবিয়া ইহাব এক একটি যুগ সৃষ্টি হইয়াছে, অবশ্য এই শ্রেণীব প্রতিভাব অধিকাবী ব্যক্তিব সংখ্যা যেমন খুব বেশী নহে, যুগেব সংখ্যাও বেশী নাই—গিবিশচন্দ্রকে অবলম্বন কবিযা বাংলা বঙ্গমঞ্চেব প্রথম যুগ সৃষ্টি হইয়াছিল, গিবিশচন্দ্র সাধাবণ বাঙ্গালী দর্শকদিগেব মধ্যে বঙ্গমঞ্চেব প্রতি যে কৌতূহল ও আগ্রহ সৃষ্টি কবিয়াছিলেন, পববর্তী কালে এই পথে যাঁহাবা আসিযাছেন, তাহাবা সকলেই তাহাবই সদ্ব্যবহাব কবিবাব পূর্ণ সুযোগ লাভ কবিয়াছেন। আজ হইতে প্রায পঁয়ত্রিশ বৎসব পূর্বে বঙ্গমঞ্চে শিশিরকুমাব ভাদুডীব আবির্ভাবেব সঙ্গে সঙ্গে ইহাব দ্বিতীয় যুগেব সূচনা দেখা দিয়াছিল। শিশিরকুমাবেব আবির্ভাবেব কিছুকাল পযন্ত প্রথম যুগেব প্রভাব একেবাবে লুপ্ত হইয়া যাইতে পাবে নাই, তবে এ কথা সত্য গিবিশচন্দ্রেব মৃত্যুব পব হইতেই তাহাব প্রভাব হ্রাস পাইযা আসিতেছিল, শিশিবকুমাবেব সাধনাব ভিতবেই তাহা অস্তমিত হইযা গেল।

বঙ্গমঞ্চের উত্থানপতনেব সঙ্গে দেশেব নাট্যসাহিত্যেব একটি অবিচ্ছেদ্য যোগ না থাকিয়া পাবে না। ভাবতে মুসলমান অধিকাবেব পব সর্বত্রই বঙ্গমঞ্চেব যে অধঃপতন বা বিলোপ দেখা গিযাছিল, তাহাব ফলে স্বভাবতঃই সে যুগে ভাবতেব কোন প্রাদেশিক ভাষাতেই একখানিও উল্লেখযোগ্য নাটক বচিত হইতে পাবে নাই। তাবপব এদেশে ইংবেজ অধিকাব স্থাপিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই যে নাটক বচনাব এত উৎসাহ দেখা দিল, তাহাব কাবণ যে কলিকাতাব বঙ্গমঞ্চেব প্রতিষ্ঠা, তাহা ত কেহই অস্বীকাব কবিতে পাবিবেন না। গিবিশ-চন্দ্রকে কেন্দ্র কবিযা বাংলা সাহিত্যে শত শত নাটক বচিত হইয়াছে। তিনি নিজে যেমন তাঁহাব অকৃপণ দানে বাংলা নাট্যসাহিত্যকে পুষ্ট কবিয়াছেন, তেমনই অন্যদিকে তাঁহাব প্রদর্শিত পথ অনুসবণ কবিযা বহু নাট্যকাব অগ্রসব হইয়া আসিয়াছিলেন। শিশিবকুমাবেব দ্বাবা সে কায কতদূব সম্ভব হইয়াছে, তাহা বিচাব কবিয়া দেখা যাইতে পাবে।

শিশিবকুমাব নিজে একখানিও নাটক বচনা কবেন নাই, অন্যের রচিত নাটক অভিনয় করিয়াছেন মাত্র। ইহা হইতে মনে হওয়া অস্বাভাবিক নহে যে,

গিরিশচন্দ্র যে কাজ করিয়াছেন, শিশিরকুমার সে কাজ করিতে পারেন নাই। কিন্তু এই বিষয়ে একটি কথা এখানে মনে রাখিতে হইবে যে, গিরিশচন্দ্রের যুগে অভিনয়োপযোগী নাটকের অভাব ছিল, সেইজন্য নাটক রচনার কার্যও তাঁহাকে নিজেকেই করিতে হইয়াছে। শিশিরকুমারের যুগে সে অভাব পূর্ণ হইয়াছিল, সুতরাং নিজে নাটক রচনা করিয়া অভিনয় করিবার তাঁহার কোন প্রয়োজনীয়তা ছিল না। এমন কি, এ কথাও সত্য যে, নাট্যকার হিসাবে শিশিরকুমার কোন পরিচয় দিতে পারেন নাই; সুতরাং সে প্রয়োজন যদি থাকিত, তথাপি তিনি যে তাহা যথার্থ পূর্ণ কবিতে পারিতেন, তাহা নহে; সুতরাং গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে শিশিরকুমারের এই দিক দিয়াও পার্থক্য ছিল। তথাপি শিশিরকুমার কি ভাবে রঙ্গমঞ্চের মধ্য দিয়া বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে নূতন যুগ সৃষ্টি করিলেন, তাহা বিচার করিয়া দেখিতে হয়।

শিশিরকুমারের প্রথম কাজ বাংলার রঙ্গমঞ্চকে তিনি সামাজিক পাতিত্য হইতে রক্ষা করিয়াছেন। শিশিরকুমারের সমসাময়িক কাল পর্যন্ত বাংলার ব্যবসায়ী রঙ্গমঞ্চ, কিংবা অভিনেতা অভিনেত্রীর কার্যে যাঁহারা নিযুক্ত থাকিতেন তাঁহারা নানা কারণেই যথাযোগ্য সামাজিক মর্যাদা লাভ করিতে পারেন নাই। যে সমাজ হইতে তাঁহাদের অভিনেত্রী সংগ্রহ করিয়া মঞ্চব্যবসায় পরিচালনা করিতে হইত, সমাজের দৃষ্টিতে তাহা পতিত ছিল বলিয়া স্বভাবতঃই ব্যবসায় সূত্রে তাঁহাদের সাহচর্যে যাঁহাদের জীবন কাটাইতে হইত, তাঁহারাও সমাজে নিন্দনীয় হইতেন। ইংরেজি শিক্ষিত আধুনিক রুচি ও নীতিবোধ সম্পন্ন কলিকাতার সমাজের পূর্বে রঙ্গমঞ্চের প্রতি আকর্ষণ অনুভব না করিবার ইহাই কারণ ছিল। দেশের মননশীল সমাজের নিকট রঙ্গমঞ্চের কোন আবেদন ছিল না; অথচ এ কথা সকলেই বুঝিতে পারেন যে, দেশের উচ্চশিক্ষিত ও চিন্তাশীল সমাজের এদিকে যদি দৃষ্টি আকৃষ্ট না হয়, তবে রঙ্গমঞ্চই হউক, কিংবা নাট্যসাহিত্যই হউক, কাহারও উন্নতি সম্ভব নহে। শিশিরকুমার কেবল মাত্র আত্মপ্রত্যয়ের উপর নির্ভর করিয়া সেদিন একটি অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত জীবিকা পরিত্যাগ করিয়া এই জীবনে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। এ বিষয়ে তিনি যে দুঃসাহস দেখাইয়াছিলেন, তিনি যদি সেদিন তাহা না দেখাইতেন, তবে বাংলার রঙ্গমঞ্চ বর্তমানে যে সামাজিক মর্যাদা লাভ করিয়াছে, তাহা সম্ভব হইতে কত দেরী হইত, আজ তাহা কল্পনা করাও কঠিন। শিশিরকুমারকে দিনের পর দিন এ অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া বাংলার অভিনেতা অভিনেত্রী

গোষ্ঠীর জন্য বর্তমান মর্যাদা আদায় করিতে হইয়াছে, এ কাজ একদিনে সম্ভব হয় নাই। রঙ্গমঞ্চ যে উচ্চশিক্ষিত সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিরও জীবিকার ক্ষেত্র হইতে পারে, তাহা তিনি ক্রমে ক্রমে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। ১৯২৮ কিংবা ১৯২৯ সনে তিনি যখন একবার তাঁহার দলবল লইয়া ঢাকা সহরে কয়েক রাত্রির জন্য অভিনয় করিতে যান, তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-সমিতি হইতে তাঁহাকে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্বর্ধনা জানান হয়। সেই সম্বর্ধনার উত্তরে তিনি একটি কথা বলিয়াছিলেন, তাহা বর্তমান গ্রন্থকার এখনও স্মরণ করিতে পারেন। শিশিরকুমার তাঁহার ভাষণ প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, 'ঢাকায় এসে আমার মনে হচ্ছে, আমি যেন জাতে উঠেছি।' এ কথার তাৎপর্য অত্যন্ত স্পষ্ট। তাঁহার এই কথা হইতেই তখনও তিনি কলিকাতায় সামাজিক মর্যাদা লাভ করিবার জন্য যে কি কঠিন সংগ্রাম করিতেন, তাহা বুঝাইতে চাহিয়াছেন। আজ যাঁহারা অনেকেই শিশির-কুমারের মৃত্যুসংবাদ পাইবামাত্র ফুলের মালা লইয়া তাঁহার মৃতদেহের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিবার জন্য ছুটিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেই পঁচিশ বৎসর পূর্বেও তাঁহাকে কোন সামাজিক মর্যাদা দিতে কুণ্ঠাবোধ করিয়াছেন। শিশিরকুমারের এই উক্তি তাহারই প্রমাণ। শিশিরকুমার তাঁহার অতুলনীয় অভিনয় প্রতিভার গুণে সকল বাধাবিঘ্ন জয় করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। সমাজের অবজ্ঞা তাঁহাকে আদর্শচ্যুত করিতে পারে নাই। নিজের লক্ষ্যের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা লইয়া অগ্রসর হইয়াছেন, ইহার মধ্য দিয়াই তাঁহার চরিত্র শক্তির যথার্থ বিকাশ হইয়াছে। আত্মপ্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে শিশিরকুমার শিক্ষিত বাঙ্গালীর মনীষা এইদিক দিয়া আকর্ষণ করিয়াছিলেন। সম্ভ্রান্ত সমাজ যে আজ রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত হইয়াছে, তাহার মূল যে তিনিই, তাহা আমরা কোনদিন অস্বীকার করিতে পারিব না।

'বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস' বইখানির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হইবার পর, আজ হইতে প্রায় পাঁচ বৎসর পূর্বে, একদিন যখন শিশিরকুমারের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়, তখন বাংলা রঙ্গমঞ্চের এমনই একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস গ্রন্থাকারে রচনা করিবার প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি আলোচনা করেন। ইংরেজি রঙ্গমঞ্চের সুদীর্ঘ ইতিহাস রচিত হইয়াছে, তাহা অনুসরণ করিলে একটি জাতির সাংস্কৃতিক জীবনের ক্রমবিকাশের একটি বিশিষ্ট ধারার সঙ্গে পরিচয় লাভ করা যায়। বাংলায় নাটকের ইতিহাস ইদানীং কিছু কিছু রচিত হইয়াছে

সে কথা সত্য, কিন্তু যে রঙ্গমঞ্চ হইতে নাটক স্ব-রূপ লাভ করিয়া জাতির হৃদয়েব একান্ত সন্নিকটবর্তী আসন লাভ করিয়াছে, তাহার কোনও পূর্ণাঙ্গ বিবরণ আমাদের জানা নাই। শিশিরকুমার বাংলা রঙ্গমঞ্চের প্রথম হইতে আধুনিকতম কাল পর্যন্ত ইহার বিচিত্র জীবনধারাব সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন। আলোচনাকালে দেখা গেল, এই বিষয়ে তাঁহার স্মৃতিশক্তি তখনও এমনই প্রখর যে তিনি সমস্ত বিষয়টির ঐতিহাসিক পারম্পর্য রক্ষা করিয়া তাহা মৌখিক প্রকাশ করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম। বাংলা নাটকের ইতিহাসের মত বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসও খুব প্রাচীন নহে ; তথাপি প্রথম হইতেই যে বাধাবিঘ্ন জয় কবিয়া বাংলা রঙ্গমঞ্চ আজ বাঙ্গালীর সাংস্কৃতিক জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষার বিকাশ সম্ভব করিয়া তুলিয়াছে, তাহাব ইতিহাস বিচিত্র ঘটনাসঙ্কুল। বাঙ্গালীর জীবনে বহুদিন যাহার অস্তিত্ব ছিল, তাহাকে তাহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তিরূপে সৃষ্টি করিয়া তুলিবার ইতিহাস প্রত্যেক অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিরই অনুসরণযোগ্য। জাতীয় রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা রঙ্গমঞ্চের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচিত হউক, ইহাই শিশিবকুমারেব অভিপ্রায় ছিল। তিনি নিজের জীবনে তাঁহার কোন ইচ্ছাই পূর্ণ দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। যে শিল্পকে তিনি জীবনেব শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত অনুশীলন করিয়াছেন, তাহার সম্পর্কিত কোন কিছুরই অভাব তাঁহার সহ্য হইত না।

তথাপি শিশিরকুমারের প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও বাংলাব নাট্যসাহিত্য তাঁহা দ্বাবা কোনদিক দিয়াই লাভবান্ হইতে পারে নাই। শিশিবকুমার নিজে যেমন কোন নাটক রচনা করেন নাই, তেমনই কেবল মাত্র তাঁহাকেই কেন্দ্র করিযা বাংলাব কোন নাট্যকার-গোষ্ঠীও গড়িযা উঠিতে পাবে নাই। তাঁহার মত একজন বিদগ্ধ শিল্পী কি এ কাজ যথার্থ সম্ভব করিয়া তুলিতে পারিতেন না ? অভিনেতার প্রভাব সমাজে সাময়িক, কিন্তু সার্থক নাট্যকারের সৃষ্টি দেশ ও কালোত্তীর্ণ। সুতবাং শিশিরকুমারের মধ্যে অভিনেতার যে গুণই প্রকাশ পাক না কেন, তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই যদি তাহা তিরোহিত হইয়া যায়, তবে বাঙ্গালীর সাংস্কৃতিক জীবনে তিনি কি কীর্তি রাখিয়া গেলেন? একথা সত্য, শিশিরকুমার অভিনয় ও নাট্যকলা সম্পর্কে যত অধ্যয়ন করিয়াছেন, লিখিত ভাবে তিনি তাহা তত প্রকাশ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার সঙ্গে সামান্যকাল আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যাইত, নাটক সম্পর্কে এত বড় পণ্ডিত ব্যক্তি এদেশে আর দ্বিতীয় নাই, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত

তিনি তাঁহার অধ্যয়নের স্পৃহা জাগ্রত রাখিয়াছিলেন, এ কথাও সত্য। তিনি অধ্যয়ন ও অভিনয় লইয়া সমস্ত জীবনই ব্যস্ত ছিলেন। তথাপি ব্যবসায়ের সঙ্গে যুক্ত থাকিবার ফলে ইহার আর্থিক দিকটিও লক্ষ্য রাখিবার যে দায়িত্ব আছে, তাহা পালন করিতে গিয়া তিনি গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে কিছু লিখিয়া যাইবার সুযোগ পান নাই। কিন্তু এ সম্পর্কে আমাদের দায়িত্বই কি আমরা পালন করিয়াছি? আমরা, যাঁহাদের মঞ্চপরিচালনা কিংবা অভিনয় করা কাজ নহে, তাঁহারা স্বচ্ছন্দেই তাঁহার অমূল্য সান্নিধ্য লাভ করিয়া তাহা দ্বারা এই বিষয়ে প্রেরণা লাভ করিতে পারিতাম। কেবল মাত্র তাঁহার সান্নিধ্য হইতে বাংলা সাহিত্যের একটি মূল্যবান গ্রন্থ রচিত হইতে পারিত। এক বিষয়ে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া যিনি সমাজকে এক অমূল্য সম্পদ উপহার দিয়া থাকেন, তাঁহার নিকটই আমরা সব কিছুই প্রার্থনা করিয়া আমাদের শূন্য ঝুলি পূর্ণ করিতে চাহিব এই কথাও অর্থহীন। শিশিরকুমার যাহা দিবার, তাহা সমাজকে অকৃপণ হস্তে দিয়াছেন; তাঁহার প্রত্যক্ষ সাহচর্যের সুযোগ লাভ করিয়াও আমরা যদি আমাদের কর্তব্যচ্যুত হইয়া থাকি, তবে তাহার জন্য তাঁহাকে দোষী করা যায় না। ইহার দায়িত্ব নিজেদের উপর লওয়াই সঙ্গত।

শিশিরকুমারের মৃত্যুর পূর্ব হইতেই বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে নূতন প্রাণ-বন্যা লক্ষিত হইতেছিল। রঙ্গমঞ্চ এখন ছায়াচিত্রের (সিনেমার) অনুগামী। দৃশ্যসজ্জায়, অঙ্গসজ্জায়, আঙ্গিকে, উপস্থাপনায় এমন কি প্রযোজনা ও অভিনয়েও 'সিনেমা আর্টিস্টরা' আসিলেন আধুনিক ভাব ও ভঙ্গি লইয়া। রঙ্গমঞ্চে আবার উপন্যাসের নাট্যরূপ ফিরিয়া আসিল। 'শ্যামলী'-ই তাহার প্রথম সার্থক পদক্ষেপ। 'শ্যামলী'-ই বাংলা রঙ্গমঞ্চে সর্বপ্রথম পাঁচশত অভিনয় রজনীর সৌভাগ্য লাভ করে। 'ষ্টার' রঙ্গমঞ্চে 'শ্যামলী' নাটকের প্রধান ভূমিকায় ছিলেন জহর গাঙ্গুলী, উত্তমকুমার, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, মিহির ভট্টাচার্য, অনুপকুমার প্রভৃতি।

বাংলা রঙ্গমঞ্চে সিনেমা জগতের অনুকরণে বীভৎস রস দেখা দেয় 'রঙমহল-এ' 'উল্কা'য় এবং 'মিনার্ভা'-য় 'এরাও মানুষ'-এ।

১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষার্ধে 'মিনার্ভা' রঙ্গমঞ্চ অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ হয়। প্রায় এক বৎসর পরে ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে ডিসেম্বর 'মিনার্ভা'-র দ্বার পুনরুদ্ঘাটিত হয় জলধর চট্টোপাধ্যায়ের নূতন নাটক 'ডাঃ শুভঙ্কর'-র অভিনয়ের

মাধ্যমে। নাট্যকারই নাটক পরিচালনা করেন। প্রধান তুইটি ভূমিকায় অবতীর্ণ হন সীতাদেবী ও অসিতবরণ।

আধুনিক নাট্য আন্দোলনের ইতিহাসে সৌখীন এবং অবৈতনিক সংস্থাগুলির মধ্যে 'লিটল থিয়েটার গ্রুপ' সর্বাগ্রগণ্য। এগারো বৎসর পূর্বে সেকস্‌পীয়র-এর নাটকের অভিনয়ে এই সংস্থার যাত্রা স্থরু হয়। তখন অবশ্য সংস্থার নাম ছিল 'এ্যামেচার সেকস্‌পীয়ারিয়ানস্‌' এবং অভিনয়ও হইত ইংরেজিতে। ইহার বৎসর তিনেক পরে ইঁহারা বর্তমান নাম গ্রহণ করিয়া বাংলা নাটকের উন্নতিসাধনের মাধ্যমে সমাজচেতনা জাগ্রত করার উদ্দেশ্য ও আদর্শ গ্রহণ করেন। এই সংস্থা ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জুন 'মিনার্ভা' রঙ্গমঞ্চের পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। পেশাদারী অভিনয়ের ক্ষেত্রে পুরোপুরি সৌখীন সম্প্রদায়ের এই প্রথম পদক্ষেপ। 'মিনার্ভা' রঙ্গমঞ্চে 'লিটল থিয়েটার গ্রুপ'-এর প্রথম অর্ঘ্য 'ছায়ানট', পরিচালনা করেন উৎপল দত্ত। গত বছরের ৩০শে আগস্ট 'ছায়ানট'-এর শেষ অভিনয় হয়। তাহার পর অভিনীত হয় 'ওথেলো' (বঙ্গানুবাদ) এবং গোর্কী-র 'লোয়ার ডেপথ্‌স্‌' অবলম্বনে উমানাথ ভট্টাচার্য রচিত 'নীচের মহল'। 'অঙ্গার' এই সংস্থার চতুর্থ নিবেদন। 'অঙ্গার'-এর শুভ উদ্বোধন হয় ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৫৯। গত ১০ই জুন মিনার্ভায় 'অঙ্গার' নাটকের শততম অভিনয় রজনীর স্মারক উৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। এই নাটকের স্থরকার—রবিশঙ্কর, পরিচালক—উৎপল দত্ত, দৃশ্যসজ্জায়—নির্মল গুহ রায় এবং উপদেষ্টা তাপস সেন। পুরাপুরি সমবায়ের ভিত্তিতে ইঁহারা 'মিনার্ভা' রঙ্গমঞ্চের পরিচালনা করিতেছেন। সম্প্রদায়ের শিল্পী হইতে সামান্যতম কর্মচারী ও দ্বাররক্ষক পযন্ত সকলেই রঙ্গমঞ্চের সমান অংশীদার। এ ধরণের যৌথ-প্রতিষ্ঠান রূপে রঙ্গমঞ্চ আমাদের দেশে এই প্রথম।

১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হইয়া দেশের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে 'শিশুরঙমহল' (সি. এল. টি.) আপন কৃতিত্বে দেশ-বিদেশ-জোড়া খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের গান, ছড়া,নাচ, আবৃত্তি, অভিনয় প্রভৃতি শিল্পনৈপুণ্যে উৎসাহিত এবং শিক্ষিত করাই 'শিশুরঙমহলে'র উদ্দেশ্য। ইহাব প্রতিষ্ঠাতা এবং সাধারণ সম্পাদক শ্রীসমর চট্টোপাধ্যায়, সভাপতি শ্রী এন. এন. বোস। ইহাদের প্রকাশনী বিভাগ হইতে 'শিশুরঙমহল'-এর মুখপত্র প্রকাশিত হয়; উদ্দেশ্য বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছেলে-মেয়েদের এবিষয়ে

উৎসাহিত করা। ডক্টর জুলিয়াস হাক্সলি 'শিশুরঙমহল'-এর এক বার্ষিক অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া বিশেষ প্রীত ও আনন্দিত হন। তিনি 'ইউনেস্কো' (UNESCO)-র সভায় 'শিশুরঙমহল'-এর কার্যকলাপ ও পরিচালন পদ্ধতি শিক্ষকদের শিক্ষণীয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করার এক প্রস্তাব পেশ করেন।

১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে 'শিশুরঙমহল' তের দিন ব্যাপী যে বিরাট অনুষ্ঠান করে তাহাতে চীন, জাপান, ব্রিটেন, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের শিশুদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কলিকাতায় এই উৎসবে যোগদান করে। চৌরঙ্গী ও হ্যারিংটন স্ট্রীটের মোড়ে এই উৎসব প্রাঙ্গণ প্রায় এক পক্ষকালব্যাপী সরগরম ছিল। 'চাচা নেহেরু' এই উৎসবে যোগদান করিয়া শিশুশিল্পিবৃন্দ এবং সংস্থা পরিচালকবৃন্দকে উৎসাহিত করেন।

কেন্দ্রীয় 'সংগীত-নাটক-আকাদমী'-র সহায়তায় ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে ডক্টর হাক্সলি-র প্রস্তাব আমাদের দেশে কার্যকর হয়। কারণ, এই বৎসরই ১০ই নভেম্বর ১৫জন শিক্ষক লইয়া 'শিশুরঙমহল'-এর 'প্রথম' 'শিক্ষক শিক্ষাকেন্দ্র' আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হইয়াছে। উদ্বোধন করেন শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই সংস্থার সপ্তম বার্ষিক উৎসব ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে ডিসেম্বর সুরু হইয়া এক পক্ষকাল চলিয়াছিল। সেবারকার উৎসবে ৩০টি বিদ্যালয় যোগদান করে। তদ্ভিন্ন ছিল উড়িষ্যার 'শিশুমহল' এবং বিদেশাগত 'চেক পুতুল নাচিয়ে' সম্প্রদায়। যোধপুরী 'পুতুল নাচিয়ে' সম্প্রদায়ও ছিল। চেকদল কলিকাতার নাগরিক ও শিশুদের মুগ্ধ ও চমৎকৃত করে তাহাদের হাতের আশ্চর্য কৌশলে। আবহসংগীত, পুতুলদের অঙ্গভঙ্গি, নাচিয়েদের সংলাপ—সব মিলাইয়া সে এক অপূর্ব সৃষ্টি। অভিনয় ও নৃত্যানুষ্ঠানের দিক দিয়া 'অবন পটুয়া', 'সাতভাই চম্পা' ও 'মৃগুলি' পুনরাবৃত্তিমূলকভাবে অভিনীত হয়। ১৯৬০ সনে 'শিশুরঙমহল'-এর নূতন অর্ঘ্য ছিল 'হলদে ঝুটি', 'ক্ষুদে ভূতের খেলা' ও 'আজব দেশ'। তিনটি অভিনয়ই সার্থক ও সুন্দর হইয়া উঠে। ছড়ার আসরেও এবার অনেক নূতন ছড়া শোনা যায়। বিদ্যালয়গুলির অভিনয়ের ক্রমোন্নতি 'শিশুরঙমহল'-এর প্রয়োজনীয়তার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

১৯৫৯ সনের শেষভাগে 'শিশুরঙমহল'-এর ১০০ জন সদস্য লইয়া গঠিত একটি দল বোম্বাই শহরে পরিক্রমায় বাহির হয়। ৯ই অক্টোবর কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়া ১৮ই তারিখে তাহারা কলিকাতায় ফিরিয়া আসে। সেখানে ১২ই তারিখে অক্টোবর 'জিজো' নাটকের অভিনয় মাধ্যমে তাহাদের

উৎসব-অনুষ্ঠান সুরু হয়। 'জিজো' ভিন্ন অভিনীত হয় 'অবন পটুয়া' ও 'মিঠুয়া'। বোম্বাই শহর তখন বৃষ্টিভেজা হইলেও ইহাদের আসর কিন্তু সবগরমই ছিল। সেদিন বোম্বাই-এর তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীচ্যবন ইহাদেব সাহচর্যে আসিয়া আনন্দ লাভ করেন এবং শিশুদিগকে উৎসাহিত করেন। চারিদিক হইতে অভিনন্দন ও নিমন্ত্রণ আসিতে লাগিল।

১৯৬০ সনের প্রথম ভাগে 'শিশুবঙমহল' অভিনীত 'ঝগড়াটি পড়ুয়া' বিশেষ সমাদর লাভ কবে।

'শিশুরঙমহল'-এর প্রয়াসকে সমর্থনসূচক ভাবে 'বিশ্বরূপা' রঙ্গমঞ্চেব কর্তৃপক্ষ 'শিশুনাট্য শাখা' স্থাপন কবেন। ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই জানুয়াবী (রবিবার) শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিদেব উপস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গেব মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় 'বিশ্বরূপা'য় শিশুনাট্য শাখার উদ্বোধন করেন। শুধু শিশুদের জন্য এইরূপ নাট্যপ্রদর্শনীর ব্যবস্থা ভারতীয় রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে ইহাই সর্বপ্রথম। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুবী। শিশুনাট্য শাখা 'বিশ্বরূপা'-র নাট্য-উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্যতম প্রয়াস। এই শাখাব পাবচালক শ্রীবিমল ঘোষ (মৌমাছি) সকলকে সাদর সম্ভাষণ জানাইয়া ঘোষণা করেন যে, শিশুশিল্পীদেব পারিশ্রমিক, বিনা খরচায় চিকিৎসার ব্যবস্থা, বৃত্তি ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দেওয়া হইবে। বিমল ঘোষ রচিত 'মায়া মুকুব' ঐ দিন তাঁহারই পরিচালনায় অভিনীত হয়।

'শ্রীবঙ্গম'-এব ধ্বংসাবশেষের উপব 'আরোগ্য নিকেতন' এর অভিনয়েব মাধ্যমে 'বিশ্বরূপা' বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে 'আবোগ্য নিকেতন' রূপেই দেখা দিল। কাহিনী, অভিনয়ের উপস্থাপনা, দৃশ্য ও মঞ্চসজ্জা এমন কি শিল্পিগোষ্ঠীও নূতন। 'আবোগ্য নিকেতন'-এর পর 'ক্ষুধা' এবং ক্ষুধা-র পর 'সেতু'। ১৯৫৯ সনের ৩০শে আগস্ট 'ক্ষুধা' ৫৭৩ অভিনয় বজনী পূর্ণ করিয়া দর্শকবৃন্দের অভিনয় দর্শনের ক্ষুধা মিটাইয়াছে। বাংলা রঙ্গমঞ্চে আর কোন নাটক এত দীর্ঘ দিন ধবিয়া অভিনয় সৌভাগ্য লাভ করে নাই। সেই বৎসরই মহাসপ্তমীর দিন (বৃহস্পতিবার) 'বিশ্বরূপা'-য় নূতন নাটক 'সেতু' মঞ্চস্থ হয়। ১৯৬০ সনের ২০শে আগস্ট শনিবার 'সেতু'-র ২০০ শত অভিনয় রজনীর স্মারক উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বর্তমানে অন্যান্য রঙ্গমঞ্চের মধ্যে 'ষ্টার' রঙ্গমঞ্চে গত ১১ই আগস্ট হইতে সুবোধ ঘোষের 'শ্রেয়সী' উপন্যাসের নাট্যরূপ 'শ্রেয়সী'-র অভিনয় চলিতেছে। 'মিনার্ভা'-য় 'অঙ্গার' চলিতেছে এবং 'রঙমহল'-এ

ধনঞ্জয় বৈরাগীর 'এক পেয়ালা কফি' ১৫০তম অভিনয় রজনী অতিক্রান্ত হইয়াছে। ইহার পর ইহাতে বিমল মিত্রের উপন্যাস 'সাহেব বিবি গোলামে'র নাট্যরূপ অভিনীত হইতে থাকে।

বাংলা নাট্য-উন্নয়ন-পরিকল্পনায় 'বিশ্বরূপা' রঙ্গমঞ্চের কর্তৃপক্ষ বহুমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে—(১) শিশু নাট্য শাখা স্থাপন, (২) রঙ্গমঞ্চ বিষয়ক গ্রন্থাগার স্থাপন, (৩) গিরিশচন্দ্রের অমর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলিমূলক গিরিশ নাট্য প্রতিযোগিতা (অভিনয়)-এর আয়োজন এবং (৪) 'গিরিশ থিয়েটার' স্থাপন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'বিশ্বরূপা' রঙ্গমঞ্চে 'বিশ্বরূপা'-রই কর্তৃপক্ষের পরিচালনাধীনে গত ২৯শে জুলাই, ১৯৬০ 'গিরিশ থিয়েটার'-এর শুভ উদ্বোধন হয়। উদ্বোধন অনুষ্ঠানের পর গিরিশচন্দ্রের 'বিল্বমঙ্গল' নাটকের নির্বাচিত পাঁচটি দৃশ্য অভিনীত হয়। 'গিরিশ থিয়েটার'-এর প্রথম অর্ঘ্য সলিল সেন রচিত 'ডাউন ট্রেন' (প্রথম অভিনীত হয় ৩১শে জুলাই, ১৯৬০)। নাট্যসম্পাদনায় ও নির্দেশনায়—বিধায়ক ভট্টাচার্য, মঞ্চসজ্জায় কবি দাশগুপ্ত, রূপসজ্জায় শক্তি সেন, আঙ্গিক নির্দেশনায় তাপস সেন। অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করিয়াছেন রাধামোহন ভট্টাচার্য (মঞ্চে প্রথম) জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, বিধায়ক ভট্টাচার্য, গীতা দে, জয়শ্রী সেন প্রভৃতি।

যে আদর্শে স্থানীয় জাতীয় রঙ্গমঞ্চ স্থাপনের আকাঙ্ক্ষা গিরিশচন্দ্রের ছিল, অন্ততঃ যে-আদর্শের স্বপ্নচ্ছায়ায় তিনি বাংলার সাধারণ রঙ্গমঞ্চকে 'ন্যাশনাল থিয়েটার' নামকরণ করার প্রতিবাদ জানাইয়া নিজের পরিশ্রম ও চেষ্টায় গড়িয়া তোলা দল ত্যাগ করিয়াছিলেন, বাংলা রঙ্গমঞ্চের শতাব্দী ব্যাপী সাধনার সিদ্ধিতে আজ 'বিশ্বরূপা' রঙ্গমঞ্চ জাতীয় নাট্যগুরুর নামাঙ্কিত রঙ্গমঞ্চ স্থাপন করিয়া দেশবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। 'বিশ্বরূপা' রঙ্গমঞ্চে 'গিরিশ থিয়েটারে'র 'ডাউন ট্রেন' 'অভিনয় কিছুকালের মধ্যেই বন্ধ হইয়া গিয়াছে। 'বিশ্বরূপা' কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করিয়াছেন যে, অচিরেই স্বগৃহে 'গিরিশ থিয়েটারে'র দ্বারোদ্ঘাটন হইবে।

১৯৬০ সনের ১৫ই ডিসেম্বর হইতে দক্ষিণ কলিকাতায় একটি সাধারণ রঙ্গমঞ্চের উদ্বোধন হয়, ইহার নাম 'থিয়েটার সেণ্টার'। ধনঞ্জয় বৈরাগী রচিত 'আর হবে না দেরী' নাটকখানি দিয়া ইহার উদ্বোধন হয়, তরুণ রায় ইহা পরিচালনা করেন। ইতিপূর্বেও কালীঘাটে 'কালিকা থিয়েটার' বৎসর দুই অভিনয় করিবার পর বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

চার

১১ই নভেম্বর, ১৯৫৭ সন কলিকাতা 'বিশ্বরূপা' রঙ্গমঞ্চের কর্তৃপক্ষ বাংলা দেশের প্রখ্যাত পত্র-পত্রিকার মঞ্চবিভাগীয় সম্পাদক ও বিশিষ্ট নাট্যামোদীদিগের সহিত এক বিশেষ ভাবে আহূত আলোচনা-সভায় মিলিত হইয়া আলাপ আলোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে বাংলার নাট্যোন্নয়ন কল্পে ত্রিবিধ কর্মসূচী সম্পন্ন এই বিবৃতি প্রচার করেন।

প্রথম কর্মসূচী—নাট্যগুরু মহাকবি গিরিশচন্দ্রের নামানুসারে গিরিশ নাট্য প্রতিযোগিতা। পৌরাণিক, ঐতিহাসিক কিংবা সামাজিক মৌলিক বা অনূদিত কিংবা উপন্যাসের নাট্যরূপে যাঁহারা যে কোন বিভাগে এক কিংবা একাধিক আঙ্গিকে পারদর্শিতা বা নূতনত্ব দেখাইতে পারিবেন, তাঁহাদের মধ্য হইতে নির্বাচিত প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানাধিকারীকে নিম্নলিখিত ভাবে পুরস্কৃত করা হইবে—

প্রথম পুরস্কার প্রথম স্থানাধিকারী নাট্য সংস্থা, দ্বিতীয় পুরস্কার দ্বিতীয় স্থানাধিকারী নাট্য সংস্থা, শ্রেষ্ঠ টীম ওয়ার্ক, শ্রেষ্ঠ নাট্যকার, শ্রেষ্ঠ পরিচালক, শ্রেষ্ঠ আলোকশিল্পী, শ্রেষ্ঠ অভিনেতা, শ্রেষ্ঠ সহ অভিনেতা, শ্রেষ্ঠ টাইপ চরিত্রাভিনেতা, শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী, শ্রেষ্ঠ গায়ক, শ্রেষ্ঠা গায়িকা, শ্রেষ্ঠ নৃত্যশিল্পী (পুরুষ), শ্রেষ্ঠ নৃত্যশিল্পী (মহিলা)।

দ্বিতীয় কর্মসূচী—'বিশ্বরূপা' কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করিতেছেন যে, আগামী ১৮৫৮ সনের জানুয়ারী মাস হইতে ডিসেম্বর অবধি যে সব সৌখীন সম্প্রদায় 'বিশ্বরূপা' মঞ্চ ভাড়া লইয়া যে কোন নাটক অভিনয় করিবেন, তাঁহাদের এই দ্বিতীয় কর্মসূচীর পরিকল্পনার মধ্যে যোগদান করিবার সুযোগ থাকিবে। যোগদানকারী সংস্থার নাট্যকার (অবশ্য নূতন নাটক হইলে) পরিচালনা, প্রযোজনা, সঙ্গীত, নৃত্য ও অভিনয়ের শ্রেষ্ঠত্ব 'বিশ্বরূপা'র নিজস্ব বিচারক মণ্ডলী দ্বারা নির্ধারিত হইবে। বৎসরান্তে উক্ত বিচারক মণ্ডলীর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নিম্নলিখিত পুরস্কারগুলি (প্রথম কর্মসূচীর অনুরূপ) বিতরণ করা হইবে। উভয় পরিকল্পনারই প্রত্যেকটি পুরস্কার বিশিষ্ট নাট্যকার, অভিনেতা ও অভিনেত্রীর স্মৃতিরক্ষার জন্য তাঁহাদের এক একজনের নামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

তৃতীয় পরিকল্পনা—গিরিশ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা। 'বিশ্বরূপা' কর্তৃপক্ষ আরও

ঘোষণা করিতেছেন যে, ১৯৫৮ সনের প্রথমার্ধে নাট্যশালায় একটি পাঠাগার স্থাপন করিবেন। এই পাঠাগারে বাংলার তথা সমস্ত পৃথিবীর মঞ্চ সম্বন্ধীয় তথ্য-বহুল পুস্তকাবলী, মঞ্চ সম্বন্ধীয় মাসিক ও সাময়িক পত্রিকা এবং নাটকাবলী রাখা হইবে। ইত্যাদি

ইঁহাদের দ্বিতীয় কর্মসূচীটি কার্যক্ষেত্রে পবিত্যক্ত হইয়াছিল এবং প্রথম পরিকল্পনাটির জন্য মোট ৮৩ জন বিচারক নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

বাংলার বাস্তব জীবনভিত্তিক সর্বপ্রথম নাটক রামনারায়ণ তর্করত্ন রচিত 'কুলীন কুল-সর্বস্ব' ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে একটি নাট্য প্রতিযোগিতাব ফল স্বরূপই যে বচিত হইয়াছিল, এ কথা সকলেই জানেন। রংপুরেব জমিদার কালীচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে সংবাদপত্রে একটি বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া কুলীনের বহু বিবাহের দোষ কীর্তনকারী সর্বশ্রেষ্ঠ নাটককে ৫০৲ টাকা পুরস্কার দিবার প্রতিশ্রুতি দেন। রামনারায়ণ তর্করত্ন 'কুলীন কুল-সবস্ব' নাটক রচনা করিয়া এই প্রতিযোগিতায় প্রেরণ করেন, তাঁহার রচনা সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হওয়ায় তিনিই সেই পুরস্কার লাভ করেন। রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী লইয়া ইতিপুর্বে দুই একখানি বাংলা নাটক রচিত হইয়াছিল, বাঙ্গালীর প্রত্যক্ষ জীবনভিত্তিক নাট্য রচনা ইহাই প্রথম। বিদ্যোৎসাহী জমিদারের মনে যদি এই প্রতিযোগিতার পরিকল্পনা স্থান না পাইত, তবে বাঙ্গালীর বাস্তব জীবন অবলম্বন করিয়া নাটক রচিত হইতে যে কত বিলম্ব হইত, তাহা বলিতে পারা যায় না।

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের পর সুদীর্ঘ এক শত বৎসরেরও অধিককাল অতীত হইয়া গিয়াছে, বাংলা নাটক নিজস্ব গতিপথের সন্ধান পাইয়া সম্মুখের দিকে ক্রমাগত অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে, এই প্রকার নাটক রচনার প্রতিযোগিতা এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে আরও দুই একবার অনুষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া জানিতে পারা যায়। ১৯৫৮ সনে বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চে এই যে 'নাট্য প্রতিযোগিতা'র অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে, তাহার প্রকৃতি পূর্ববর্তী অনুষ্ঠান হইতে স্বতন্ত্র; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহার ভিতর দিয়া অতি সাম্প্রতিক বাংলা নাটকের গতি ও প্রকৃতি অনুসরণ করিবার একটি সুযোগ পাওয়া গিয়াছে। ইহার একজন বিচারক হিসাবে ইহার সম্বন্ধে বর্তমান গ্রন্থকারের যাহা মনে হইয়াছে, তাহা এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি।

এ কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ১৮৫৩ সনে রংপুরের জমিদার যখন নাটক

প্রতিযোগিতার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার সম্মুখে কোন অভিনয় কিংবা রঙ্গমঞ্চের আদর্শ বর্তমান ছিল না; সেই নাটকের অভিনয়ের কোন প্রয়োজনীয়তা আছে, তাহাও তিনি সেদিন মনে করেন নাই। কিন্তু সাম্প্রতিক যে প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান হইয়াছে, তাহা একটি ব্যবসায়ী রঙ্গমঞ্চ কেন্দ্র করিয়াই পরিকল্পিত হইয়াছে এবং অভিনয় ইহার মধ্যে একটি মুখ্যস্থান অধিকার করিয়াছে। তারপর প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান ইহার মধ্যে যে রূপ লাভ করিয়াছে, তাহাতে নাটক-প্রতিযোগিতা অপেক্ষা ইহার যে 'অভিনয়' প্রতিযোগিতা রূপই অধিক স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, তাহা অতি সহজেই বুঝিতে পারা গিয়াছে। অভিনয়-ক্রিয়া এবং মঞ্চের বিভিন্ন আঙ্গিকের মধ্যে ইহার 'নাটক' বা নাট্য-পরিচয় অনেকখানি প্রচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। সুতরাং নাট্য প্রতিযোগিতা কথাটির পরিবর্তে অভিনয় প্রতিযোগিতা বলিলেই ইহার যথার্থ পরিচয় প্রকাশ পায়। পূর্বেই বলিয়াছি, বাংলার সর্বপ্রথম নাটক প্রতিযোগিতা পরিকল্পনাকারীর মনে যথার্থ নাটক প্রতিযোগিতাব কথাই স্থান পাইয়াছিল, তাঁহার প্রেরণাতেই বাংলা ভাষার বাস্তবধর্মী নাটক সেদিন প্রথম জন্মলাভ করিয়াছিল। সাম্প্রতিক এই প্রতিযোগিতায় অভিনয়ের আঙ্গিকের দিকে যে ভাবে দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে, নাট্য রচনার দিকে তাহার একাংশও দেওয়া হয় নাই। সুতরাং বাংলা দেশের প্রথম নাট্যপ্রতিযোগিতা যে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পারিয়াছিল, এক শতাব্দীরও অধিককাল পরবর্তী কালে অনুষ্ঠিত সাম্প্রতিক এই নাট্যপ্রতিযোগিতা সেই উদ্দেশ্য পূরণ করিতে পারে নাই।

সাম্প্রতিক নাট্যপ্রতিযোগিতার উদ্দেশ্য ইহার বিজ্ঞাপিত নিজস্ব ভাষায় এখানে উল্লেখ করা যাইতেছে। ইহা এই বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়াছিল যে—'পৌরাণিক, ঐতিহাসিক কিংবা সামাজিক মৌলিক বা অনুবাদিত বা উপন্যাসের নাট্যরূপে যাঁহারা যে কোনো বিভাগে এক কিংবা একাধিক আঙ্গিকে পারদর্শিতা বা নূতনত্ব দেখাইতে পারিবেন, তাঁহাদের মধ্যে নির্বাচিত প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানাধিকারীকে নিম্নলিখিতভাবে পুরস্কৃত করা যাইবে।' এই বলিয়া বিভিন্ন বিষয়ে মোট পনরটি পুরস্কারের তালিকা ঘোষণা করা হইয়াছিল। ইহাতে নাট্যকার হইতে আরম্ভ করিয়া নৃত্যশিল্পী পর্যন্ত সকলেরই স্থান ছিল। অর্থাৎ একই নাটকের অভিনয়ে যে পনরটি পুরস্কার ঘোষিত হইয়াছে, তাহাদের সঙ্গে নাট্যকারের পুরস্কারটিও সমান মূল্যের অধিকারী। একটি

সার্থক অভিনয়ের পনর ভাগের এক ভাগ কৃতিত্ব নাট্যকারের প্রাপ্য, ইহা ছাড়া তাঁহার বিশেষ কৃতিত্বের কোন স্বীকৃতি নাই। অথচ এ কথা কেহই স্বীকার করিতে পরিবেন না যে, একটি সার্থক অভিনয়ে নাট্যকার এবং নৃত্য-শিল্পী সমান মর্যাদার অধিকারী, কারণ, নাট্যকারের সার্থক সৃষ্টি কালজয়ী হইয়া থাকে, কিন্তু অভিনয়ে আঙ্গিকের আবেদন সাময়িক মাত্র। সেক্সপীয়রের নাটক কে কবে কি ভাবে অভিনয় করিয়াছেন, তাহা আমরা জানি না, কিন্তু সেক্সপীয়রকে আমরা জানি। সুতরাং নাট্যকার এবং অভিনেতা, রূপসজ্জাকর কিংবা নৃত্যশিল্পীর কিছুতেই একাসনে স্থান হইতে পারে না। নাট্যকারের স্থান ইহাদের অনেক উর্ধ্বে, তাহাকে সেই মর্যাদা না দিলে নাট্য প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্য সফল হয় না। আলোচ্য প্রতিযোগিতায় সেই ত্রুটি যে কতকটা প্রকাশ পাইয়াছে, সেকথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কারণ, ইহাতে কোনও নাট্যকার রচিত নাটক গৃহীত হয় নাই। সৌখীন অভিনয়ের দল বা সংস্থাগুলিকেই আহ্বান জানান হইয়াছে। যে সকল নাট্যকারের উচ্চাঙ্গ নাটক রচনা করিবার শক্তি থাকা সত্ত্বেও, কোন অভিনয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে যোগ নাই, তাহারা এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে পারেন নাই। সুতরাং ইহার বিচার দ্বারাই সাম্প্রতিক বাংলা নাটক সম্পর্কে কোন চূড়ান্ত বিচারে আসিয়া পৌঁছিতে পারা যাইবে এমন মনে করা ভুল হইবে। অতএব এই প্রতিযোগিতায় যাহা হইয়াছে, তাহা প্রধানতঃ অভিনয়েরই বিচার হইয়াছে, নাটকের বিচার সেই পরিমাণে বিশেষ কিছুই হইতে পারে নাই।

যাহা হউক, এই প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠানের ফলে কলিকাতা ও ইহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল হইতে মোট ১৩২টি নাট্যসংস্থা ইহাতে যোগদান করিয়াছিল। পূর্বেই বলিয়াছি, স্বাধীন ভাবে কোনও নাট্যকারকে তাহার নাটক লইয়া ইহাতে যোগদানের উপায় ছিল না, সেইজন্য বাংলাদেশে আজ যে সকল নাটক রচিত হইতেছে, তাহার সামগ্রিক কোন পরিচয় এই নাটকগুলি হইতে পাইবার উপায় নাই, তবে একটা আভাস পাওয়া যায় এই মাত্র। কিন্তু এই আভাসটুকুর মূল্যও নিতান্ত অল্প নহে। ইহাদের ১৩২টিই যে মৌলিক নাটক ছিল, তাহা নহে। ইহাদের একটি প্রধান অংশ প্রচলিত বাংলা উপন্যাসের নাট্যরূপ মাত্র, সুতরাং সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে, বাংলা নাটকের প্রতিযোগিতার মধ্যে ইহাদের স্থান দিবার কোন

সঙ্গত কারণ ছিল না; কারণ, মৌলিক নাটক রচনা করা এবং উপন্যাসের নাট্যরূপ দেওয়া এক কথা নহে। এমন কি, শরৎচন্দ্রের দুইখানি নাটককেও নাট্যরূপ দিয়া প্রতিযোগিতায় গ্রহণ করা হইয়াছিল, কিন্তু শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হিসাবে তাঁহার নাম গৃহীত হয় নাই। শরৎচন্দ্র ব্যতীতও শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসের নাট্যরূপ এবং মন্মথ রায় প্রমুখ খ্যাতনামা নাট্যকারদিগের নাটকও প্রতিযোগিতায় অভিনীত হইয়াছিল, কিন্তু পুরস্কার ঘোষণার মধ্যে নাট্যকার হিসাবে তাঁহাদের কোন কৃতিত্বের উল্লেখ শুনিতে পাওয়া যায় নাই। কাহিনীর দিক দিয়া শরৎচন্দ্রের 'বামুনের মেয়ে' এবং 'শ্রীকান্তে'র 'কমললতা' বিশেষ গৌরবের অধিকারী, একথা সকলেই স্বীকার করিলেও দেখা গেল যে, ইহাদের নাট্যরূপ পুরস্কার-প্রাপ্ত নাটকগুলির তুলনায় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হইয়া পড়িল। সুতরাং একথা সহজেই মনে হইতে পারে যে, নাটককে এখানে অভিনয় হইতে স্বতন্ত্র করিয়া বিচার করা হয় নাই, বিশেষ অভিনয়-সংস্থার অভিনয়-গুণের ভিতর দিয়াই নাটকের মূল্য নিরূপিত হইয়াছে, ইহা কতদূর সমর্থনযোগ্য তাহা বিবেচ্য।

পূর্বেই বলিয়াছি, বাংলা সাহিত্যের প্রথম যে নাট্যপ্রতিযোগিতা হইয়াছিল, তাহাতে নাটককে স্বাধীন ভাবেই বিচার করা হইয়াছিল, অভিনয়ের ভিতর দিয়া বিচার করা হয় নাই। ইহার একটি প্রধান গুণ প্রকাশ পায় যে, রঙ্গমঞ্চের সম্পর্ক ব্যতীতও নাটকের সাহিত্য হিসাবে যে একটি স্বাধীন মূল্য আছে, তাহার যথার্থ মূল্য তাহাতেই দেওয়া যাইতে পারে। অভিনয়ের ভিতর দিয়া অনেক বিষয় একাকার হইয়া যায়, বিশেষতঃ আধুনিক যুগে মঞ্চোপকরণ এত বাড়িয়াছে যে, তাহাদের ভিতরে নাটকের যথার্থ পরিচয়টি অনেক সময় প্রচ্ছন্ন হইয়া যায়। সেই জন্য নাটক বিচারে রঙ্গমঞ্চ কিংবা অভিনয়কে আনিয়া যুক্ত করা কতদূর সমীচীন হয়, তাহা বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখার প্রয়োজন। বিশেষতঃ নাটক বিচার যাঁহাদের কাজ, আধুনিক অভিনয় বিচার করিবার দক্ষতা তাঁহাদের নাও থাকিতে পারে এবং মঞ্চব্যবস্থা এবং অভিনয়ের আঙ্গিক বিচারে যাঁহারা অভিজ্ঞ, তাঁহাদের যে উচ্চ সাহিত্য-রসবোধ থাকিবে, তাহারও কোন কথা নাই। সুতরাং আমাদের দেশে আজ রঙ্গমঞ্চ বা অভিনয় গুণ যে মর্যাদারই অধিকারী হউক, যথার্থ নাটক তাহার মধ্য হইতেই যে একদিন রচিত হইবে, এমন কোন কথা নাই।

উচ্চাঙ্গের নাটক রঙ্গমঞ্চ নিঃসম্পর্কিত হইয়াও রচিত হইতে পারে, কিন্তু বর্তমান প্রতিযোগিতায় এই শ্রেণীর নাট্যকারকে উৎসাহ দিবার কোন প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায় নাই। সুতরাং ইহা হইতে ব্যাপকভাবে বাঙ্গালী নাট্যকারগণ নাটক রচনার প্রেরণা লাভ করিতে পারিবেন, এমন আশা করা যায় না।

এই প্রতিযোগিতায় যে ১৩২খানি অভিনয়-সংস্থা যোগ দিয়াছিলেন, তাঁহারা বিভিন্ন শ্রেণীর নাটক অভিনয়ের জন্য উপস্থিত করিয়াছিলেন—ইহাদের প্রকৃতি হইতে সাম্প্রতিক বাংলা নাটক যে কোন পথে চলিয়াছে, তাহার একটি সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইবে। ১৩২খানি নাটকের মধ্যে একখানি মাত্র ছিল পৌরাণিক, একখানি ঐতিহাসিক, একখানি রামকৃষ্ণদেবের জীবনীমূলক এবং অবশিষ্ট সকলগুলিই সামাজিক। কোন প্রহসন কিংবা গীতিনাটক কোনও অভিনয়সংস্থাই উপস্থিত করেন নাই। এই বিষয়টি একটু বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার প্রয়োজন আছে। দেখা যাইতেছে যে, বিভাগোত্তর যুগে পৌরাণিক নাটক একেবারেই লুপ্ত হইয়া গেল। উনবিংশ শতাব্দীতে যে পৌরাণিক নাটকের প্রবাহ সৃষ্টি হইয়া বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ধরিয়াও অতিশয় সঙ্কোচের সহিত অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে, বিভাগোত্তর যুগের নাট্যসাহিত্যে তাহার আর কোনই স্থান রহিল না। পৌরাণিক বিষয়বস্তু মানবিক গুণ-প্রধান না হইলে সাহিত্যে তাহা স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে না; অর্থাৎ পুরাণ কেবল পুরাণ হইয়া সাহিত্যে বাঁচিয়া থাকিতে পারে না, মানুষকে ভিত্তি করিয়াই তাহাকে বাঁচিয়া থাকিতে হয়। বাংলার বিগত শতাব্দীর পৌরাণিক নাটক প্রধানতঃ বিশ্বাস ও ভক্তিরসাশ্রিত ছিল, আজ জাতির মন হইতে বিশ্বাস ও ভক্তির ভাব দূর হইয়া গিয়া যুক্তিবাদের বিকাশ হইয়াছে। যুক্তিবাদের সম্মুখে পৌরাণিক আদর্শ টিকিয়া থাকিতে পারে না, সেইজন্য আধুনিক যুগে পৌরাণিক নাটকের আর অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার পরই ঐতিহাসিক নাটকের কথা। বাংলা সাহিত্যে যথার্থ ঐতিহাসিক নাটক খুব বেশী রচিত হয় নাই। ঐতিহাসিক নাটক প্রধানতঃ দেশাত্মবোধ-প্রচারমূলক রচনা হইত; সেই জন্য দেশ স্বাধীন হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ইহার আবেদন একেবারে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। সেইজন্যই ১৩২ খানি নাটকের মধ্যে মাত্র একখানি ঐতিহাসিক নাটক প্রতিযোগিতায় যোগদান করিবার জন্য প্রার্থনা করে; কিন্তু এই নাটকও বৈশিষ্ট্য-বর্জিত বলিয়া বিচারকগণ ইহাকে

অভিনয়ের অনুমতি দেন নাই। পূর্বেই বলিয়াছি, সামাজিক নাটকগুলির প্রধান একটি অংশ নাট্যান্তরিত বাংলা উপন্যাস। তাহাদের মধ্যে কয়েকটি অভিনয়ার্থ গৃহীত হয়। ইহাদের মধ্যে শরৎচন্দ্র প্রমুখ রচিত উপন্যাসের নাট্যরূপ থাকিলেও এই শ্রেণীর কোন রচনাই পুরস্কারযোগ্য বিবেচিত হয় নাই। পূর্বেই বলিয়াছি, স্বাধীন এবং স্বতন্ত্রভাবে এখানে নাট্যকাহিনীর মূল্য বিচার করিবার কোন অবকাশ ছিল না, অভিনয়ের ভিতর দিয়াই কাহিনী এখানে বিচার করা হইয়াছে বলিয়া বাংলার শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিকের রচনাও এখানে মূল্যহীন বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। ইহার পর মৌলিক নাটক, ইহাদের সংখ্যাই সর্বাধিক ছিল। যে ১৩২খানি নাটক প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়াছিল, তাহাদের মধ্য হইতে ৩৫খানি নাটক বিচারকগণ অভিনয়যোগ্য বলিয়া বিবেচনা করিয়া অভিনয় করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে যে চারখানি পুনরভিনয়ের জন্য নির্বাচিত হইয়াছে, তাহাদের সব কয়খানিই মৌলিক সামাজিক নাটক, একখানিও নাটকান্তরিত উপন্যাস কিংবা অন্য কোন শ্রেণীর নাটক ছিল না। এই চারিখানি নাটকের মধ্যে যে দুইখানি নাটক পুরস্কার লাভ করিয়াছে, তাহাদের সম্পর্কে একটু বিশেষভাবে আলোচনা করা যাইতে পারে।

যে নাটকখানি এই প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে, তাহার নাম 'সংক্রান্তি', রচয়িতা বীরু মুখোপাধ্যায়। ইহার কাহিনী সংক্ষেপে এই—এক উচ্ছৃঙ্খল জমিদার-পুত্রের পত্নী এক পুত্রের জন্মদান করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। জমিদার ভৃত্যেরও সেই সময়েই একটি পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়। জমিদারের শিশুপুত্রটি দৈবজ্ঞের বিচারে প্রচুর বিত্তশালী হইবে জানিয়া জমিদার-ভৃত্য তাহার নিজের নবজাত শিশুটির সঙ্গে গোপনে তাহার বিনিময় করিয়া লয়। কালক্রমে দেখা যায়, ভৃত্যগৃহে পালিত জমিদার-পুত্রটি দূষিত ব্যাধির সংসর্গ-জনিত জড় ও হাবা প্রকৃতির হইয়াছে। জমিদার গৃহে ভৃত্যপুত্রটি জমিদার-সন্তানরূপেই পালিত হইতে থাকে। জ্ঞাতিশত্রু উচ্ছৃঙ্খল জমিদারের সম্পত্তি হস্তগত করে, জমিদার-সন্তানরূপে পালিত ভৃত্যপুত্র সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে ধরা পড়ে। প্রকৃত জমিদার-পুত্র ভৃত্যদম্পতীর চরম অশান্তির কারণ হয়, বসন্তে ভৃত্যপত্নীর মৃত্যু হয়, জড় জমিদার-সন্তানটিও তাহার অনুগমন করে। কারাগার হইতে ফিরিবার দিন ভৃত্য তাহার নিজের সন্তানের পরিচয় দেয়, প্রতিপক্ষ জমিদারের বেত্রাঘাতে তাহার মৃত্যু হয়। বিধবা জমিদার-জননী ভৃত্যপুত্রকে নিজের

পৌত্ররূপে গ্রহণ করিলেন। এই কাহিনী উপলক্ষে আধুনিক শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের বিষয়ও উল্লেখ করা হইয়াছে।

বলাই বাহুল্য যে, এই কাহিনীর মধ্যে কোনই বিশেষত্ব নাই। জমিদার-পুত্রের সঙ্গে ভৃত্যপুত্রের বিনিময়ের একটি অস্বাভাবিক বিষয়ের উপর এই কাহিনীর ভিত্তি। কিন্তু ইহা অবলম্বন করিয়া যে অভিনয় কৌশল প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা সত্যই বিস্ময়কর। সৌখীন সম্প্রদায়গুলি যে উচ্চ অভিনয় মান সৃষ্টি করিয়াছে, সেই তুলনায় বাংলা নাটকের দৈন্য সকলকেই আঘাত করে।

এই প্রতিযোগিতায় যে নাটকটি দ্বিতীয় পুরস্কার লাভ করিয়াছে, তাহার নাম 'বারো ঘণ্টা', রচয়িতার নাম কিরণ মৈত্র। সকাল ছয়টা হইতে আরম্ভ করিয়া সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত সময়ের মধ্যে একটি নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে যে বিপর্যয় ঘটিয়া গেল, তাহার বাস্তব রূপায়ণ ইহাতে উচ্চাঙ্গের সার্থকতা লাভ করিয়াছে। ইহার মধ্যে কাহিনীর বিশেষত্ব কিছুমাত্র নাই, একদিনের ঘটনা লইয়া একটি শিথিলবদ্ধ কাহিনী রচিত হইয়াছে, কিন্তু চিত্রগুলির জীবনানুগত্য এত প্রবল যে, স্বাভাবিক অভিনয় গুণে ইহারা সজীব হইয়া উঠিয়াছে। ইহাও নাট্যগুণ-সমৃদ্ধ নহে, কিন্তু সার্থক অভিনয়গুণে ইহা আকর্ষণীয় হইয়া উঠিয়াছিল। ১৩২খানি নাটকের মধ্যে এই দুইখানি নাটক যে বিচারকমণ্ডলীর মতে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে, তাহাতে সাম্প্রতিক বাংলা নাটক কোন পথে চলিয়াছে, তাহার কতকটা আভাস পাওয়া যাইতে পারে।

ইহার পরের বৎসরও অর্থাৎ ১৯৫৯ সনে এই রঙ্গমঞ্চেই অনুরূপ প্রতি-যোগিতার অনুষ্ঠান হইয়াছে, তাহাতে নাটকের সংখ্যা অল্প এবং তাহাদের মান আরও নিম্নমুখী ছিল।

পাঁচ

চল্লিশোত্তব ভাবতেব সাংস্কৃতিক জীবনেব ইতিহাসে 'ভাবতীয় গণনাট্য সংঘে'ব উদ্ভব একটি বিশেষ ঘটনা। পবাধীন ভাবতে সর্বভাবতীয় ভিত্তিতে একটি নব সাংস্কৃতিক আন্দোলন 'ভাবতীয় গণনাট্য সংঘে'ব উদ্যোগেই সম্ভব হয এবং গুজবাট হইতে মণিপুব, কাশ্মীব হইতে কেবালা পযন্ত এক সাংস্কৃতিক চেতনা দেখা দেয়। ভাবতেব বিভিন্ন প্রদেশেব বহু নাট্যকাব, অভিনেতা, নৃত্যবিদ্, সুবকাব, কবি এই আন্দোলনেব পুবোভাগে আসিযা দাঁড়ান। স্বাধীন ভাবতে সর্বভাবতীয় ভিত্তিতে যে সমস্ত সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড দেখা যাইতেছে, অনেক ক্ষেত্রেই তাহাব মূল প্রেবণা যোগাইয়াছে ভাবতীয গণনাট্য সংঘ।

ভাবতেব জাতীয জীবনে এই নব সাংস্কৃতিক চেতনা আনয়নেব গৌবব বাংলা দেশেব, কাবণ, বাংলা দেশেই 'ভাবতীয গণনাট্য সংঘে'ব সূচনা। বাংলাব শিল্পী ও সাহিত্যিকবৃন্দই ভাবতেব বিভিন্ন স্থানে নব সাংস্কৃতিক বাণী লইয়া যান এবং তাহাবই ফলে অল্প কয়েক বৎসবেব মধ্যেই ভাবতেব এক প্রান্ত হইতে অপব প্রান্ত পযন্ত ভাবতীয় গণনাট্য সংঘেব শাখা-প্রশাখা বিস্তাব লাভ কবে।

বর্তমান শতকেব চতুর্থ দশকে বাংলা দেশে একটি নতুন সাহিত্য আন্দোলন জন্মলাভ কবে। এই সাহিত্যিকগোষ্ঠীব প্রধান লক্ষ্য ছিল সাহিত্যকে কল্পনাপ্রবণতা হইতে মুক্ত কবিযা বাস্তবমুখীন কবিযা তোলা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেব সময এই সাহিত্যিকগোষ্ঠী একটি সংঘ গড়িয়া তোলেন। কেবল সাহিত্যিকদিগকে লইয়াই সংঘ গঠিত হইল না; বিভিন্ন ধবনেব বহু শিল্পীও আসিযা এই সংঘে যোগ দিলেন। সংঘটিব নাম হইল 'ফ্যাসীবিবোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ'। এই সংঘকেই 'ভাবতীয গণনাট্য সংঘে'ব প্রস্তুতি বলা চলে। সংঘেব সভ্য নাট্যকাবগণ নাটক লিখিতে লাগিলেন, কবিবা গান বচনা কবিতে লাগিলেন, সুবকাবেবা সুব দিতে লাগিলেন। 'ফ্যাসীবিবোধী লেখক ও শিল্পী সংঘে'ব অভ্যন্তবেই গড়িয়া উঠিল একটি শিল্পিদল। তাঁহাদেব শিল্পসৃষ্টিব মূল প্রেবণা ও উৎস ছিল গণজীবন। এই সময় দুইজন প্রবীণ শিল্পীকে পাইয়া এই শিল্পিদল অনেকখানি শক্তি অর্জন কবিলেন। নট ও নাট্যকাব মনোবঞ্জন ভট্টাচার্য এবং কবি হবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এই নব

সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পুরোধা হইলেন। মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য সাহায্য করিলেন তাঁহার বহুদিনের মঞ্চলব্ধ অভিজ্ঞতা ও পরামর্শ দিয়া, আর হরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সাহায্য করিলেন তাঁহার সঙ্গীত ও কণ্ঠস্বর দিয়া। হরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে একটি গানের দল গড়িয়া উঠিল।

এদিকে ১৯৪৩ সালে বাংলার বুকে নামিয়া আসিল দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া। মানুষের সেই দুর্দিনে এই শিল্পিগোষ্ঠী অত্যন্ত বিচলিত হইলেন। মানুষের কান্নাকে তাঁহারা ভাষা দিলেন, সমাজবিরোধীদের বিরুদ্ধে তাঁহারা লেখনী ধারণ করিলেন। চাউলের জন্য মানুষকে দোকানের সামনে 'লাইন' দিতে হয়। এই দৃশ্যকে কেন্দ্র করিয়া হরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ইংরেজীতে 'কিউ' নামে এবং বিজন ভট্টাচার্য 'আগুন' নামে দুইটি একাঙ্কিকা লিখিলেন। দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিলেন 'অভিযান' নামে দুই দৃশ্যের একটি নাটিকা।

এই সময় হরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে 'শ্রীরঙ্গমে' এই শিল্পিগোষ্ঠীর একটি অনুষ্ঠান হয়। তাহাতে পূর্বোক্ত একাঙ্ক নাটক দুইটির অভিনয়, গান ও হরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'দহিভলার গান' দর্শকবৃন্দকে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করে এবং এক নবনাট্য আন্দোলনের পূর্বাভাস দেয়।

ইহার পর আসে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের একাঙ্কিকা 'হোমিওপ্যাথি', বিনয় ঘোষের 'ল্যাবরেটরী' ও বিজন ভট্টাচার্যের 'জবানবন্দী'। বিনয় ঘোষের 'ল্যাবরেটরী' নাটিকার একটি ভূমিকায়ই প্রথম অবতীর্ণ হইয়া শম্ভু মিত্র দর্শক-দিগের প্রশংসা অর্জন করেন। দিগিন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার 'অভিযান' নাটিকাটি 'রমেশ স্মৃতি ভবনে' একটি সঙ্গীত বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের দ্বারা অভিনয় করান এবং তাহার পর নাটিকাটিকে বাড়াইয়া 'দীপশিখা' নাম দেন।

মন্বন্তর তখন বাংলাকে বিপর্যস্ত করিয়া দিয়াছে। চতুর্দিকে অন্নের জন্য হাহাকার। অনাহারে লোক পোকামাকড়ের মত রাস্তায় পড়িয়া মরিতেছে। এই দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষকে বাঁচাইবার জন্য বিনয় রায়ের নেতৃত্বে একদল শিল্পী বাংলার বাহিরে গিয়া অর্থ সংগ্রহ করেন। দলটির নাম দেওয়া হইয়াছিল 'মৈ ভুখা হুঁ স্কোয়াড্'। উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানে নৃত্যগীতাদি প্রদর্শন করিয়া তাঁহারা লাহোর পর্যন্ত গিয়া পৌঁছেন। এই শিল্পিদলের প্রচেষ্টায় উত্তর ভারতের মানুষ বাংলার যথার্থ অবস্থার চিত্র দেখিতে পায় এবং সাহায্য ভাণ্ডারে অকাতরে অর্থদান করে। তখনও পর্যন্ত 'গণনাট্য সংঘ' স্থাপিত না হইলেও উত্তর ভারতে তাঁহারা গণনাট্যের বীজ বপন করিয়া আসেন।

এঁদিকে দুর্ভিক্ষে চাষী জীবনের দুর্দশা লইয়া রচিত বিজন ভট্টাচার্যের 'জবানবন্দী' নাটিকাটি অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়া উঠে। শিল্পীরা এই নাটিকাটি লইয়া বাংলার বিভিন্ন জেলায় গিয়া অভিনয় করিতে থাকেন। দিগিন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যাযের 'দীপশিখা' নাটিকাটিও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বহু জায়গায় অভিনীত হয়। ফলে গণনাট্য আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রশস্ত হইতে থাকে।

ইহার পর আসে 'নবান্ন'র যুগ। নবান্ন নাটক দিয়াই 'গণনাট্য সংঘে'র দৃঢ়ভিত্তি রচিত হয়। কৃষক সমাজের চরম দুর্দশার স্বাক্ষর 'নবান্ন'। একদিকে অন্নের জন্য হাহাকার, অন্যদিকে মুনাফাবাজদের সীমাহীন লোভ, দুর্নীতি ও অবিচাবের নগ্নচিত্র তুলিয়া ধবে 'নবান্ন'। পেশাদার মঞ্চে তখন পুবাতনের গিলিতচবণ চলিতেছে। জাতীয় জীবনেব এত বড সঙ্কটেও তাঁহারা সম্পূর্ণ উদাসীন। 'নবান্ন' গণমানসে এক নূতন নাট্যবোধ আনিয়া দিল। অপরিচিত নাট্যকার, অখ্যাত-অজ্ঞাত শিল্পিগোষ্ঠী, মঞ্চহীন শিল্পী সম্প্রদায, চটনির্মিত রঙবিহীন পশ্চাৎপট—অথচ শিল্পীদের আদর্শ ও নিষ্ঠাবলে অনাড়ম্বর 'নবান্ন'ই বাংলার নাট্যজগতে প্রাণের এক নতুন জোয়ার আনিল। 'ফ্যাসীবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘে'র সাংস্কৃতিক শাখাটি 'ভারতীয গণনাট্য সংঘ' নামে স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানে পবিণত হইল।

'নবান্ন' পরিচালনায় কৃতিত্বের পরিচয় দিলেন শম্ভু মিত্র ও বিজন ভট্টাচার্য। প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন মনোরঞ্জন ভট্টাচায। নবান্নকে সফল করিয়া তুলিতে অক্লান্ত পরিশ্রম করিলেন সুধী প্রধান এবং আবও অনেকে। 'নবান্ন' গোষ্ঠীর অনেকেই আজ অভিনয় জগতে সুপরিচিত। দেখিতে দেখিতে 'গণনাট্য সংঘে'র খ্যাতি চারিদিকে ছডাইয়া পডিল এবং অচিরেই ইহা একটি সব ভারতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইল। মনোরঞ্জন ভট্টাচাব হইলেন 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘে'র প্রথম সভাপতি।

এই সময় বোম্বাই শহরে 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘে'র দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়। উদয়শঙ্করের সহকর্মী শান্তি বর্ধনের নেতৃত্বে সেখানে গডিয়া উঠে একটি নৃত্যের দল। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে তরুণতরুণীরা গিয়া সেই নৃত্যের দলে যোগ দেন। সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন বিখ্যাত সেতারী রবিশঙ্কর। 'স্পিরিট অব ইণ্ডিয়া' নামে একটি নৃত্যনাট্য রচিত হয়। 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘে'র এই নৃত্যশিল্পী-সম্প্রদায় বিভিন্ন প্রদেশে নৃত্যনাট্যটি প্রদর্শন করিয়া প্রশংসা অর্জন করে। তারপর এই সম্প্রদায় আর একটি

নৃত্যনাট্য 'ইম্‌মরটাল ইণ্ডিয়া' বা 'অমর ভারত' নাম দিয়া রচনা করে। এই নৃত্যনাট্যটিও ভারতের বহু জায়গায় প্রদর্শিত হয়। তবে প্রথম নৃত্যনাট্যটি গুণগতভাবে যতটা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, দ্বিতীয়টি ততখানি উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে নাই।

ইতিমধ্যে 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘে'র সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠানের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন নিরঞ্জন সেন। তিনি কলেজে অধ্যাপনা করিতেন। অধ্যাপনা ছাড়িয়া তিনি সারা ভারতে 'গণনাট্য সংঘ'কে সুসংগঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করিলেন। ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরিয়া ঘুরিয়া 'গণনাট্য সংঘ'কে তিনি সংগঠিত করিলেন। 'গণনাট্য সংঘে'র বিস্তার ও সংহতিকরণে তাহার দান ও ত্যাগস্বীকার সর্বজনস্বীকৃত।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও দেশবিভাগ বাংলার বুকে আর এক দুর্যোগ ডাকিয়া আনিল। তখন 'গণনাট্য সংঘে'র শিল্পীরা নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারিলেন না। দাঙ্গার বিষময় ফল দেখাইয়া ও হিন্দু মুসলমানের ঐক্যের আবেদন জানাইয়া রচিত হইল 'শহীদের ডাক' ছায়ানাট্য। যন্ত্রশিল্পী জ্ঞান মজুমদার অক্লান্ত পরিশ্রম করিলেন এই ছায়ানাট্যটিকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলিবার জন্য। 'শহীদের ডাক' সফল হইল। এই ছায়ানাট্য দেখিয়া অজস্র হিন্দু-মুসলমান একত্রে চোখের জল ফেলিল।

'নবান্ন'-পর্বের পরে কিছুকাল 'গণনাট্য সংঘে'র নাট্যশাখাটি প্রায় নিষ্ক্রিয় অবস্থায়ই ছিল। দিগিন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাস্তুভিটা' নাটক আবার এই শাখাকে উজ্জীবিত করিয়া তুলিল। দেশবিভাগের পরে বাস্তুত্যাগের বেদনাকে কেন্দ্র করিয়া এই নাটক রচিত। ১৯৫৭ সালে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের পরিচালনায় 'বাস্তুভিটা' মঞ্চস্থ হইয়া প্রচুর অভিনন্দন লাভ করিল। এই সময় দিগিন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'গণনাট্য সংঘে'র পশ্চিম বঙ্গ শাখার নাট্য বিভাগের সম্পাদকপদে নির্বাচিত হন। তিনি জেলায় জেলায় 'গণনাট্য সংঘে'র শাখা গড়িয়া তুলিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন এবং তাহার চেষ্টা ফলবতীও হয়। যাঁহারা নিষ্ক্রিয় হইয়া গিয়াছিলেন, তাহারা আবার সক্রিয় হইয়া উঠেন। ইহা ছাড়া কোন কোন জেলায় নূতন শাখাও প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই সময় সুরকার সলিল চৌধুরী 'গণনাট্য সংঘে'র সঙ্গীত বিভাগটিকে নূতন প্রাণশক্তিতে উজ্জীবিত করিয়া তোলেন। বাংলা গানের সুরে অভিনবত্ব আসে। সলিল চৌধুরীর সুর যাদুশক্তির মত কাজ করে।

তাঁহার বিচিত্র সুর এক উন্মাদনা আনিয়া দেয় ও দেখিতে দেখিতে তাঁহার সুখ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে।

অতঃপর 'গণনাট্য সংঘে'র শিল্পীরা দিগিন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুর্ণগ্রাস' ও 'তরঙ্গ' নাটক মঞ্চস্থ করেন।

এই সময় দক্ষিণ কলিকাতায় একটি নাট্যশাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁহারা প্রথমে সলিল চৌধুরীর 'অরুণোদয়ের পথে' ও 'জনান্তিক' নাটক মঞ্চস্থ করেন।

মাঝখানে কলিকাতায় 'গণনাট্য সংঘে'র আর একটি দল কিছুদিন নাটক প্রযোজনা করেন। পানু পালের 'ভাঙ্গা বন্দর', বীরু মুখোপাধ্যায়ের 'ঢেউ' ও ঋত্বিক ঘটকের 'দলিল' নাটক তাঁহারা মঞ্চস্থ করেন। উৎপল দত্ত কিছুদিন পরই আবার তাঁহার 'লিটল্ থিয়েটার গ্রুপ' গড়িয়া তোলেন এবং 'গণনাট্য সংঘ' পরিত্যাগ করেন। ঋত্বিক ঘটকের 'দলিল' নাটকটি বোম্বাইতে 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘে'র সর্বভারতীয় নাট্যোৎসবে প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিল।

মমতাজ আহ্‌মদ-এর পরিচালনায় অনুশীলন শাখা 'ইস্পাত' নাটক সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করে। অবশ্য পরে অনুশীলন দল 'গণনাট্য সংঘ' ছাড়িয়া স্বতন্ত্র নাট্যদল হিসাবেই কাজ করে।

উত্তর কলিকাতায় একটি নাট্য শাখা প্রথমে মণি মজুমদারের 'নাগপাশ' ও ভানু চট্টোপাধ্যায়ের 'আজকাল' নাটক মঞ্চস্থ করে। কিন্তু এই শাখাটি বেশিদিন টিকে নাই।

ধীরেন দাসের উদ্যোগে রাজাবাজার অঞ্চলে একটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই শাখা ধীরেন দাস রচিত 'পুনর্জন্ম' ও 'গাঙ্গুলী মশাই' নাটক বহু স্থানে অভিনয় করে।

দক্ষিণ কলিকাতা শাখার বড় সাফল্য বীরু মুখোপাধ্যায় রচিত যাত্রা-পালা 'রাহুমুক্ত'। এই যাত্রাটি অতিশয় জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং শত শত বার অভিনীত হয়।

কয়েক বৎসর পরে দক্ষিণ কলিকাতা শাখা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। এক ভাগ 'শৌভনিক' ও আর এক ভাগ 'প্রান্তিক' নাম নেয়। 'শৌভনিক' কিছুদিন পর 'গণনাট্য সংঘে'র বাহিরে চলিয়া যায়। 'প্রান্তিক' গণনাট্য সংঘের শাখা হিসাবেই কাজ করিতে থাকে। গিরিশ নাট্য প্রতিযোগিতায়

প্রান্তিক শাখা বীরু মুখোপাধ্যায়ের 'সংক্রান্তি' নাটক মঞ্চস্থ করিয়া প্রথম পুরস্কার লাভ করে।

'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ' একটি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান। এযাবৎ ইহার সর্বভারতীয় ভিত্তিতে আটটি সম্মেলন ও নাট্যোৎসব হইয়া গিয়াছে। এই সম্মেলন ও নাট্যোৎসবগুলি ভারতের বহু ভাষাভাষী বিভিন্ন অঞ্চলবাসীদের একটি সাংস্কৃতিক মিলনক্ষেত্র। এত বেশি সংখ্যক শিল্পীর সমাবেশ আর কোন সম্মেলন বা নাট্যোৎসবেই হয় না।

'ভারতীয় গণনাট্য সংঘে'র নির্ভরযোগ্য ও সুসংবদ্ধ কোন ইতিহাস অদ্যাবধি রচিত হয় নাই। সুতরাং সংশ্লিষ্ট মহলের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট হইতে যাহা জানা গিয়াছে, তাহারই উপর নিভর করিয়া 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘে'র এই সংক্ষিপ্ত পরিচিতিটুকু দেওয়া হইল। নবনাট্য আন্দোলনে ও নব সাংস্কৃতিক চেতনার উদ্বোধনে 'গণনাট্য সংঘে'র দান কতটুকু তাহা উপলব্ধি করিতে কিয়ৎপরিমাণে সাহায্য হইতে পারে, এই আশায়ই 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘে'র গোড়ার ইতিহাস ব্যক্ত করা হইল।

বাংলার এবং বহির্বঙ্গীয় বহুসংখ্যক নাট্যগোষ্ঠীর একটি সংস্থা 'থিয়েটার সেণ্টার'। কলিকাতার এই প্রতিষ্ঠান 'থিয়েটার সেণ্টার' ইণ্ডিয়া এবং ইউনেসকো (UNESCO)-র আই. টি. আই. (ITI) অর্থাৎ 'ইণ্টারন্যাশনাল থিয়েটার ইনস্টিটিউটে'র সঙ্গে যুক্ত। মোটামুটি হিসাবে নিম্নোক্ত কয়েকটি আদর্শকে সামনে রাখিয়া ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় 'থিয়েটার সেণ্টারের' জন্ম হয়:

(১) বিভিন্ন নাট্যগোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সংযোগ সাধন।
(২) কলাকৌশল প্রভৃতি বিষয়ে সহায়তা দান।
(৩) নাট্যবিষয়ক বক্তৃতা ও বিতর্কমূলক আলাপ-আলোচনার ব্যবস্থা।
(৪) নাটকের প্রাক্‌-আনুষ্ঠানিক মহড়ার সুযোগ দান।
(৫) একটি ক্ষুদ্রায়তন নাট্যমঞ্চ ও একশত আরামদায়ক আসন সমন্বিত প্রেক্ষাগৃহের প্রতিষ্ঠা।
(৬) নাট্যসম্পর্কিত গ্রন্থাগার স্থাপন।
(৭) সর্বভারতীয় এবং আন্তর্জাতিক নাট্যসংস্থার সংবাদ পরিবেশন।
(৮) নাট্যসৃষ্টির অঙ্গাঙ্গি-বিষয় সম্পর্কে সাপ্তাহিক পঠনপাঠন।

প্রতিষ্ঠার প্রথম বৎসরেই অর্থাৎ ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনটি বাংলা ও একটি হিন্দী নাটক লইয়া বাৎসরিক নাট্যোৎসবের উদ্বোধন হয়। এই বারের অনুষ্ঠান সম্পর্কে মাত্র একটি মন্তব্য উল্লেখ করিলেই তাহার গুরুত্ব পরিস্ফুট হইবে। 'The festival gave an undoubted impetus to the theatre movement in Calcutta' 'থিয়েটার সেণ্টারে'র প্রতিষ্ঠার সূচনা হইতেই বহুসংখ্যক নাট্যসংস্থা ইহার গোষ্ঠীভুক্ত হয়। আজ পর্যন্ত প্রায় ৪৬টি নাট্যগোষ্ঠী 'থিয়েটার সেণ্টারে'ব সঙ্গে যুক্ত আছে। নাট্যসংস্থা ছাড়া একক সভ্যশ্রেণীব সংখ্যাও এক সময় ছিল প্রায় এক হাজার।

বিভিন্ন দেশীয় ভাষায় প্রতিনিধিত্ব করিবার মত নাটক বিশেষ অভিনীত না হইলেও, ১৯৫৬ সনে যে নাট্যোৎসব অনুষ্ঠিত হয়, তাহা কতকাংশে সর্ব-জাতিক। বাংলা, হিন্দী, তেলেগু, গুজবাটি প্রভৃতি ভারতীয় ভাষার নাটক তো ছিলই, তাহা ছাড়া একটি ইংরেজী নাটকও অভিনীত হয়। এই বছরেব নাট্যোৎসবের উদ্বোধন ভাষণে শ্রীহুমায়ুন কবির যে মন্তব্য করেন, তাহা প্রণিধান-যোগ্য। তিনি বলেন, 'এই নাট্যোৎসব সৌখিন এবং পেশাদার নাট্যগোষ্ঠীব মধ্যে সহযোগিতার ভাব সৃষ্টি করিয়া নাট্য আন্দোলনকে আগাইয়া লইয়া যাইবে। দ্বিতীয়তঃ ইহার ফলে বিভিন্ন ভাষাভাষীদের আবির্ভাব ও সংযোগ ঘটিবে একই রঙ্গমঞ্চে।' 'থিয়েটার সেণ্টার' ও 'হুমায়ুন থিয়েটার' কর্তৃক যুক্তভাবে দ্বিতীয় বার্ষিক নাট্যোৎসব পরিচালিত হয়। বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠী অভিনীত এই অভিনয় দেখিয়া প্রখ্যাত অভিনেতা-নাট্যকার রাজ কাপুব বলিয়াছিলেন যে, 'তিনি ভারতের প্রায় সর্বত্র ভ্রমণ করিয়া একটি সত্য উপলব্ধি করিয়াছেন—নাটকের ক্ষেত্রে ভাষার ব্যবধান বড় ব্যবধান নয়। নাটকের নিজস্ব একটি ভাষা আছে।'

মূল উদ্দেশ্যগুলির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এই প্রতিষ্ঠান গত কয়েকবৎসর ধরিয়া কাজ করিয়া যাইতেছেন। যে সব সৌখিন নাট্যসংস্থা সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে সর্বপ্রধান সুবিধা, ইহার নিজস্ব নাট্যমঞ্চ। নাটক পুরাপুরিভাবে মঞ্চস্থ করিবার আগে এখানকার মঞ্চে মহড়া দিবার সুযোগ অনেকেই গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে শিশিরকুমার ভাদুড়ী হইতে শুরু করিয়া প্রখ্যাত, অল্পখ্যাত এবং অখ্যাত বহু নটনটী ও নাট্যসংস্থার নাম উল্লেখ করা যায়।

'থিয়েটার সেণ্টারে'র আর একটি বিশিষ্ট পদক্ষেপ, একাঙ্ক নাটক

প্রতিযোগিতার প্রবর্তন। সর্বভারতীয় নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে এ-জাতীয় প্রতিযোগিতা এই প্রথম। যোগদানকারী নাট্যসংস্থাসমূহের মধ্যে 'দর্পণ' নাট্যগোষ্ঠী তাঁহাদের একাঙ্ক নাটক 'নবজন্ম' অভিনয়ের জন্য প্রথমবার প্রথম পুরস্কার লাভ করেন।

দ্বিতীয় বার্ষিক একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতায় যোগ দিলেন চুয়াল্লিশটি নাট্যগোষ্ঠী। প্রতিযোগিতায় সাঁইত্রিশটি বাংলা নাটক ছাড়া, তুইটি করিয়া গুজরাটি, হিন্দী ও তেলেগু নাটক এবং একটি মালয়ালম্ নাটক ছিল। প্রথম বৎসরের সঙ্গে তুলনা করিলে দেখা যাইবে, প্রায় দ্বিগুণ নাট্যসংস্থা এইবারের প্রতিযোগিতায় যোগদান করিযাছিলেন। প্রতি বৎসরই বিচারকমণ্ডলীতে ছিলেন বিভিন্ন বিভাগের দিক্‌পাল কৃতী এবং কুশলীবৃন্দ। তাহা ছাড়া অনেক নাট্যপরিচালক, অভিনেতা, অভিনেত্রী, সাহিত্যিক ও সমালোচক ইহার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

প্রতিযোগিতায় সাধারণ পুরস্কাব ব্যতীত আর কয়েকটি বিশেষ পুরস্কারের ব্যবস্থা হয়। বাংলা ছাড়া অন্য ভাষায় অভিনীত নাটকের জন্য পুরস্কাব পাইয়াছেন কলিকাতাব অন্ধ্র এ্যাসোসিয়েশন, তাঁহাদের তেলেগু নাটক Ee samsaram ('এ সংসাবম্') অভিনয় করিয়া। অভিনীত হিন্দী নাটকসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের জন্য একটি পুবস্কাব ঘোষিত হয়। তাহার জন্য তুই হইতে আড়াই ঘণ্টার মধ্যে অভিনয়যোগ্য মূল হিন্দী (অনুবাদ নয়) নাটক হওয়া প্রয়োজন। যোগদানকারী আটত্রিশটি নাট্যসংস্থার মধ্যে সর্বাঙ্গীণ কুশলতার জন্য বিজয়ী হইলেন 'অনামিকা নাট্যগোষ্ঠী'।

১৯৫৮ সনে যে একাঙ্ক নাট্য প্রতিযোগিতা শুরু হয়, তাহার পরিসমাপ্তিতে প্রথম পুরস্কার পাইলেন ওড়িষ্যার 'কলাবিকাশকেন্দ্র', তাঁহাদের 'শ্বেতপদ্ম' নাটকের জন্য।

১৯৫৯ সনে একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা ছাড়া বার্ষিক নাট্যোৎসবের স্থলে কার্যকরী সমিতি মাসিক নাট্যানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন। এই নূতন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ পরীক্ষামূলক ভাবে গ্রহণ করা হয়। প্রতি ইংরেজী মাসের প্রথম শুক্র, শনি এবং রবিবার একই নাটক সেণ্টারের নিজস্ব মঞ্চে মঞ্চস্থ হইবার ব্যবস্থা হইল। একই সময়ে ক্রমাগত বহু রজনীর অভিনয় দর্শনের ক্লান্তির পরিবর্তে সভ্যবৃন্দ প্রতিমাসে একটি করিয়া নূতন নাটক দেখিতে পারিবেন। তাহা ছাড়া 'থিয়েটার সেণ্টারে'র ক্ষুদ্রায়তন প্রেক্ষাগৃহ নিঃসন্দেহে আরামপ্রদ এবং আগা-

গোড়া সমস্ত দর্শকই সংলাপাদি সমানভাবে শুনিতে পারিবেন। ইহার একটি অসুবিধার দিকও আছে। সেণ্টারের সভ্য ছাড়া সাধারণের জন্য এ-জাতীয় অনুষ্ঠানের সার্থকতা নাই।

১৯৫৯ এর অক্টোবরে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় 'সুন্দরম' নাট্যগোষ্ঠী তাঁহাদের 'মৃত্যুর চোখে জল' নাটকের জন্য প্রথম পুরস্কার পাইলেন। ১৯৬০ সনেও বাৎসরিক নাট্যোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই বছর একই সময়ে কলিকাতায় আরও কয়েকটি নাট্যোৎসব ও নাট্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। একই সময়ে উৎসবগুলি অনুষ্ঠিত হওয়াতে 'থিয়েটার সেণ্টার'কে এই বৎসর বিপুল আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। এই অভিজ্ঞতাও উল্লেখযোগ্য। তবু প্রসঙ্গক্রমে বলা চলে যে, নাট্যসংস্থা ও অভিনয় যেমন বাড়িয়াছে, তেমনি নাট্যরসপিপাসু দর্শকও এখন বহু। 'থিয়েটার সেণ্টার' প্রথমে যে ভূমিকা লইয়াছিলেন, তাহা এখন অনেকাংশে ফলপ্রসূ হইয়াছে। অনেক প্রতিষ্ঠান তাহাতে হাত মিলাইয়াছেন।

নাটকের দিক হইতে এই বৎসরের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হইল নাট্য-সংস্থার প্রমোদকর হইতে অব্যাহতিলাভ। এই অব্যাহতি বাংলা নাট্য আন্দোলনের একধাপ অগ্রগতি। ইহার ফলে অপেশাদার নাট্যগোষ্ঠীর পক্ষে নাটক মঞ্চস্থ করিবার পথ যে অনেকটাই সুগম হইল, তাহাতে সন্দেহ নাই এবং এই কৃতিত্বে 'থিয়েটার সেণ্টারে'র ভূমিকা সার্থক।

১৫ই ডিসেম্বর (১৯৬০) হইতে 'থিয়েটার সেণ্টার' সাধারণ রঙ্গমঞ্চে পরিণত হইয়া নিয়মিত নাটক অভিনীত হইতে আরম্ভ করিয়াছে।

১৯৪৭ সনের আগস্ট মাসে 'রোমিও অ্যাণ্ড জুলিয়েট' নাটকের কয়েকটি নির্বাচিত দৃশ্যের অভিনয় দ্বারাই কলিকাতার বিশিষ্ট নাট্যসংস্থা 'লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপে'র প্রথম আবির্ভাব হয়। ইহার পর হইতে ইহা অব্যাহত ভাবে অগ্রসর হইতে থাকে। প্রায় দুই বৎসর যাবৎ ইহা কলিকাতার একটি বিলুপ্ত-প্রায় সাধারণ রঙ্গমঞ্চ পুনরুজ্জীবিত করিয়া নিয়মিত অভিনয় করিয়া যাইতেছে, সেকথা পূর্বেও একবার উল্লেখ করা হইয়াছে। ইংরেজি নাটকের কিংবা ইংরেজি নাটকের বাংলা অনুবাদ অভিনয় করাই ইহার মূলতঃ উদ্দেশ্য থাকিলেও বর্তমানে ইহা প্রগতিশীল মৌলিক বাংলা নাটকের অভিনয় করিয়া কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছে।

১৯৪৭ সনে এই নাট্যসংস্থা পুনরায় সেক্সপীয়রের আর একখানি ইংরেজি

নাটকের অভিনয় করিল, তাহা 'রিচার্ড দি থার্ড'। তখন পর্যন্তও কলিকাতায় সেক্সপীয়র প্রচারই তাঁহাদেব উদ্দেশ্য ছিল। এই সূত্রেই এই গোষ্ঠীর তখন নামকরণ করা হইয়াছিল, 'অ্যামেচার সেক্সপীয়ারিয়ান্‌স্‌'। ইহাতে এই প্রতিষ্ঠানের যত খ্যাতি হইয়াছিল, ক্ষতিও তাহা অপেক্ষা কোন অংশে কম হয় নাই। ১৯৫০ সন পর্যন্ত ইংরেজি ভাষাতেই নাটক অভিনয় চলিতে লাগিল। সেক্সপীয়র ছাড়াও অন্যান্য সামাজিক সমস্যামূলক ইংরেজি নাটক অভিনয় করিবার প্রয়াস দেখা দিল। ইহার ফলে প্রথমতঃ ক্লিফর্ড ও'ডেট্‌স্‌-এর 'ওয়েটিং ফর লেফ্‌টি' নাটক অভিনীত হইল।

স্বাভাবিক কারণেই তখন 'অ্যামেচাব সেক্সপীয়াবিয়ানস' নামটি পরিত্যক্ত হইয়া নূতন নামকরণ হইল, 'লিটল থিয়েটার গ্রুপ'। তারপর বার্ণার্ড শ-কেও আসরে নামান হইল। 'মেরি ওয়াইভস্‌ অফ উইণ্ডসর', 'ওথেলো' এবং 'আর্মস অ্যাণ্ড দি ম্যান' ইত্যাদি অভিনয় কবিবার পর লাভক্ষতির হিসাব করিয়া দেখা গেল, জমার ঘবে উন্নততব প্রয়োগনৈপুণ্য আর খরচের খাতায় বিপুল অর্থনাশ হইয়াছে।

ইতিমধ্যে পরীক্ষামূলকভাবে দুইটি বাংলা নাটক মঞ্চস্থ করা হইল। তাহা হইতে এই অভিজ্ঞতা লাভ হইল যে, নবনাট্য আন্দোলন বা নাটকের মধ্য দিয়া নূতন সমাজচেতনা গড়িয়া তুলিতে গেলে সব চেয়ে আগে দরকার নাটকের উন্নততর প্রযোজনা। তারপর ক্রমান্বয়ে স্বদেশী-বিদেশী নাটকের অভিনয়ের মধ্য দিয়া নূতনতর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলিতে লাগিল।

বাংলাভাষায় বিদেশী পোষাকে বিদেশী নাটক অভিনয় কবিবার দিকটি সর্বপ্রথম ইহাদের নজরে পড়ে। সিমনভের 'রাশিয়ান কোয়েশ্চন'-এর শ্রীসরোজ দত্ত-কৃত অনুবাদ লইয়াই সেই পথে প্রথম পদক্ষেপ হইল। আলোক সম্পাতে যাদুসৃষ্টি করিলেন তাপস সেন।

ইহার পর সুনীল চট্টোপাধ্যায় অনূদিত 'মার্চেণ্ট অফ ভেনিস' ও পরে 'ম্যাক্‌বেথ' অভিনয় করিয়া ইহা সাফল্য লাভ করে।

রবীন্দ্র-নাটক অভিনয়ের বেলাতেও ইঁহারা প্রচলিত রীতি দ্বারা চালিত হইলেন না। যথেষ্ট মঞ্চসজ্জার ব্যবহার ও নতুন ধরণের পোষাক ও রূপসজ্জা সৃষ্টি করিবার দুঃসাহস তাঁহাদের ছিল।

চারমাস মহড়া দিবার পর ১৯৫৩-র জুলাই মাসে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের খোলা মাঠে 'অচলায়তনে'র অভিনয় হইল। ইহার ফলে একদিকে যেমন

সূক্ষ্মতম রসিকতার উত্তরে অভিনন্দন উচ্চারিত হইল দর্শকের প্রচণ্ড হাসিতে, অন্যদিকে অনেক রবীন্দ্রভক্তের সঙ্গে লেখনীযুদ্ধে নামিতে হইল। তাহাতেও ইঁহারা হাল ছাড়িলেন না। 'কালের যাত্রা', 'তপতী' প্রভৃতি 'রবীন্দ্র ভারতী'তে সুধীবৃন্দের সামনে অভিনীত হয় এবং প্রশংসা লাভ করে।

তারপব উনবিংশ শতাব্দীতে লেখা কয়েকটি নাটকের উপর দৃষ্টি পড়িল। তাহার প্রথম ফল মাইকেলের 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' অভিনয়। পোষাক পরিচ্ছদ সম্পর্কে গবেষণা করিতে গিয়া ঐতিহাসিক নাটক অভিনয়েব ঝোঁকটা আসিল সেই সঙ্গেই। সিরাজউদ্দৌলা নাটক অভিনয়ের প্রস্তুতিব পিছনে রহিয়াছে বিরাট শ্রম, অর্থব্যয় ও তদানীন্তন পোষাক-পবিচ্ছদ আচাব-আচরণ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে অনলস অধ্যয়ন।

উমানাথ ভট্টাচার্য অনূদিত গোর্কিব 'লোয়ার ডেপথস্' অবলম্বনে লেখা 'নীচের মহল' লইয়া বাংলা পরিবেশে বিদেশী নাটকের উপস্থাপন হইল।

শুধু শহরের প্রেক্ষাগৃহে কিংবা পার্কে নয়, মফস্বলে অনেক মাঠ-ঘাট পাব হইয়া অভিনয় করিবার অভিজ্ঞতা ইঁহাদেব রহিয়াছে।

অনেক নাট্যগোষ্ঠী মুখ্যচরিত্রাভিনেতার অভিনয়ের উৎকর্ষের উপর জোব দিয়া থাকেন। ইঁহারা Individual acting-এ (ব্যক্তিগত কৃতিত্বে) বিশ্বাসী নহেন, দলগত অভিনয়ের সামগ্রিক নৈপুণ্যে আস্থাশীল। ইঁহাদেব সাম্প্রতিক নাটক 'অঙ্গারে' ইহার পরিচয় আছে।

শুধু অভিনয় সম্পর্কে নয়—প্রয়োগ-কৌশল, শিল্পীর মুড ইত্যাদি নানাবিষয়ে পৃথিবীর নাট্যশালার ইতিহাস হইতে ইঁহারা পাঠ গ্রহণ করেন। প্রতি সপ্তাহে পাঠচক্রের অধিবেশন হয়।

ত্রৈমাসিক 'পাদপ্রদীপ' পত্রিকার তিনটি সংখ্যা 'লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপে'র পরিচালনাধীনে প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন কারণে পত্রটি ক্রমান্বয়ে চালাইয়া যাওয়া সম্ভব হয় নাই। পত্রিকার আকারে না হইলেও নবনাট্য আন্দোলন সম্পর্কে একটি 'বুলেটিন' প্রকাশ করিবার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ইঁহাদের আছে।

'মিনার্ভা' রঙ্গমঞ্চে ইঁহাদের অভিনয় সুরু হয় জুন, ১৯৫৯এ। তখন লক্ষ্য ছিল, অল্প সময়ের ব্যবধানে নতুন নাটক পরিবেশন করা। সেই উদ্দেশ্য লইয়া দুইমাস আড়াই মাস 'ছায়ানট' এবং 'ওথেলো' মঞ্চস্থ করিবার পর নতুন

নাটক 'নীচের মহল' অভিনীত হইল। 'ছায়ানট' তখনও পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে চলিতেছিল ; নাট্যগোষ্ঠীর আদর্শ অনুযায়ী এই পরিবর্তন দর্শকদের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিল। প্রায় তিন মাস ধরিয়া 'নীচের মহল' মঞ্চস্থ করিয়া দেখা গেল, আর্থিক দিক দিয়া প্রায় দেউলিয়া হইবার উপক্রম হইয়াছে। তারপরই 'অঙ্গার' নাটকের প্রস্তুতি চলিতে লাগিল।

এই নাটক মঞ্চস্থ হইবার পর দর্শক সাধারণের অকুণ্ঠ সাড়া পাওয়া গেল। আর্থিক দুর্যোগ প্রায় কাটিয়া গিয়াছে। দীর্ঘদিন ধরিয়া ক্রমান্বয়ে এই নাটক সাফল্যের সহিত অভিনীত হইয়া চলিয়াছে। পঞ্চাশ রজনীর পরই নতুন নাটক পরিবেশন করিবার পরিকল্পনা আপাততঃ অবাস্তব মনে হইলেও, নূতন নাটকের মহড়া এবং অভিনয় বন্ধ থাকিবে না। প্রেক্ষাগৃহের নির্দিষ্ট অভিনয়-তালিকা-বহির্ভূত এই সমস্ত নাটক সপ্তাহের অন্য দিনে কিংবা অন্যত্র পরিবেশিত হইবে।

নিজেদের অপেশাদার নামে অভিহিত করিলেও, এখন ইঁহাদের অবস্থান পেশাদার অপেশাদারের মাঝখানে। 'মিনার্ভা' রঙ্গমঞ্চে স্থায়ী ভাবে অভিনয় শুরু করিবার পর হইতে শিল্পীদের পেশাদার সীমারেখার হিসাবে অভিনয় করিবার ব্যবস্থার কথা চিন্তা করা হইতেছে। তবে এখন পর্যন্ত প্রায় সব শিল্পীই অন্যত্র জীবিকা অর্জন করিতেছেন। তাঁহারা সংস্থার সভ্যদের কো-অপারেটিভ প্রথায় সংঘবদ্ধ করিবার পরিকল্পনা লইয়াছেন। এই কাজ অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। এই প্রয়াস সার্থক হইলে তাহা সারা ভারতে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করিবে।

গোষ্ঠীর চিন্তাধারাকে কেন্দ্র করিয়া একটি নাট্য-একাডেমী গড়িয়া তুলিবার পরিকল্পনা ইঁহাদের আছে। এখানে নাটক ও অভিনয় শিল্প সম্বন্ধে ইঁহাদের স্বকীয় চিন্তাধারার উপর study classএর আয়োজন করা হইবে। প্রস্তাবিত একাডেমী স্থাপনার কাজ বাস্তবে রূপায়িত হইলে সর্বক্ষণের জন্য কয়েকজন কর্মী নিযুক্ত করা হইবে।

দিল্লীতে 'ললিতকলা একাডেমী'তে অভিনয় করিবার পর ভারতের প্রায় সমস্ত অঞ্চল হইতে ইঁহারা অভিনয় করিবার আমন্ত্রণ পাইয়াছেন। স্থায়ী প্রেক্ষাগৃহে নাটক অনুষ্ঠান শুরু করায় এখন পর্যন্ত এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করা সম্ভব হয় নাই। সম্প্রতি পল রবসন, চার্লি চ্যাপলিন প্রভৃতি প্রতিভাধরদের জন্মোৎসব উদ্‌যাপন করিয়া পূর্বসূরিদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের Ministry of Scientific Research & Cultural Affairs-এর কাছ হইতে সংস্থা হিসাবে ইহারা মধ্যে মধ্যে আর্থিক সাহায্য পাইয়া থাকেন।

১৯৪৯ সালে নীতিগত প্রশ্ন লইয়া 'গণনাট্য সংঘে'র পশ্চিম বঙ্গ শাখার মধ্যে খানিকটা দ্বিধাদ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় এবং তাহার ফলে কিয়ৎপরিমাণে নিষ্ক্রিয়তাও আসে। 'গণনাট্য সংঘে'র কিছু সংখ্যক শীর্ষস্থানীয় কর্মী এই নিষ্ক্রিয়তায় অস্বস্তি বোধ করেন এবং 'গণনাট্য সংঘে'র আদর্শকেই সম্মুখে রাখিয়া স্বতন্ত্রভাবে নাট্যপ্রযোজনায় উদ্যোগী হন। ১৯৪৯ সনের শেষভাগে দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেষ্টায় 'নাট্যচক্র' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন স্থানে আলোচনাচক্র বসাইয়া আধুনিক নাট্যসাহিত্য ও নাট্যকলা সম্পর্কে আলোচনা করা। এই ধরণের কয়েকটি আলোচনাচক্র বসিবার পর 'নাট্যচক্র' নাট্যপ্রযোজনার কথা ভাবিতে থাকে। স্থির হয় দীনবন্ধু মিত্র রচিত 'নীল-দর্পণ' মঞ্চস্থ করা হইবে। এই বিষয়ে প্রধান উদ্যোগী হইলেন দিগিন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধী প্রধান, বিজন ভট্টাচার্য ও জ্ঞান মজুমদার। ১৯৪৫ সাল হইতে 'নীল-দর্পণ' মঞ্চস্থ করিবার চেষ্টা চারিবার ব্যর্থ হয়; গণনাট্য সংঘও দুইবার চেষ্টা করিয়া শেষ পর্যন্ত ছাড়িয়া দেয়। পঞ্চম বারের চেষ্টায় 'নাট্যচক্র' কর্তৃক 'নীল-দর্পণ' অভিনীত হইয়া এই যুগের দর্শকদিগকেও সমভাবে মুগ্ধ করে। আধুনিক যুগের মঞ্চ ও দর্শকরুচির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া 'নীল-দর্পণ'কে মাত্র আড়াই ঘণ্টার নাটকে রূপান্তরিত করা হয়; কিন্তু দীনবন্ধুর নাটকের মূল বক্তব্য বা কাহিনীকে কোনভাবে ক্ষুণ্ন করা হয় নাই। 'নীল-দর্পণ' এর এই নবরূপায়ণ নাট্যরসিকদিগের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। 'নীল-দর্পণ' বিভিন্ন স্থানে অভিনীত হইয়া জনসাধারণের মধ্যে এক নূতন উদ্দীপনা আনিয়া দেয় এবং নবনাট্য আন্দোলনের দিগন্তকে প্রসারিত করে। 'নীল-দর্পণ' এই সময়ে 'রঙমহল মঞ্চের' কর্তৃপক্ষ নিয়মিতভাবে মঞ্চস্থ করিতে অগ্রসর হন; কিন্তু কোন এক অদৃশ্য হস্তের তর্জনীভয়ে ভীত হইয়া তাঁহারা শেষ পর্যন্ত পশ্চাদপসরণ করেন।

'নাট্যচক্র' প্রযোজিত 'নীল-দর্পণে' যাঁহারা অভিনয় করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন বিজন ভট্টাচার্য, দিগিন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধী প্রধান, গঙ্গাপদ বসু, নৃবেন্দু ঘোষ, সত্য রায়, শোভা সেন, গীতা সোম, সীতা বন্দ্যোপাধ্যায়, নিপুণা

বন্দ্যোপাধ্যায়, আরতি মৈত্র প্রভৃতি। 'নীলদর্পণ' নাটকে আলোকসম্পাত করিয়া তাপস সেন তাঁহার প্রতিভার বিশেষ পরিচয় দেন।

'নীলদর্পণ'-এর পরে নাট্যচক্র রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' ধরে এবং বেশ কিছুদিন মহড়াও চালায়; কিন্তু নন্দিনীর ভূমিকায় অভিনয় করার মত যোগ্য মহিলা শিল্পী সংগ্রহ করিতে না পারায়, 'রক্তকরবী' মঞ্চস্থ করার আশা ছাড়িয়া দেয়। কিছু শক্তিমান শিল্পী দলত্যাগ করায় 'নাট্যচক্র' দুর্বল হইয়া পড়ে এবং কিছুদিনের মধ্যেই উঠিয়া যায়। নাট্যচক্রের আয়ু স্বল্পস্থায়ী হইলেও ইহার 'নীলদর্পণ' প্রযোজনা নবনাট্য আন্দোলনের পদযাত্রায় একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

এই সময় 'অশনি চক্র' নামক আর একটি নাট্য প্রতিষ্ঠান নবনাট্য আন্দোলনে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে। উহার প্রথম নাটক দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাস্তুভিটা'। নাটক পরিচালনা করিয়াছিলেন মমতাজ আহ্‌মদ খাঁ। 'অশনি চক্রে'র প্রথম প্রচেষ্টাই সুধী দর্শকবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়। ইহার পর দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় স্থায়ী পরিচালক রূপে এই নাট্যপ্রতিষ্ঠানে যোগ দেন। অশনি চক্র প্রতিষ্ঠা অর্জন করে দিগিন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মশাল' নাটক মঞ্চস্থ করিয়া। 'অশনি চক্রে'র 'মশাল' তখন নাট্যরসিকমহলে একটি আলোচ্য বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। নাট্যকার নিজে এই নাটকের পরিচালনা করিয়াছিলেন। কলিকাতা ও কলিকাতার বাহিরে 'অশনি চক্র' প্রায় চল্লিশ বার 'মশাল' উপস্থিত করে। ইহার দলগত অভিনয়নৈপুণ্য দেখিয়া দর্শকগণ অভিভূত হইয়া যাইতেন। বিভিন্ন সময়ে 'মশাল'-এ অভিনয় করিয়াছেন সাধন সরকার, সত্য রায়, অশ্রু ভট্টাচার্য, বীণা বসু, আরতি মৈত্র, কল্যাণী সেন, চিত্ত চট্টোপাধ্যায়, গৌরীশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, অবনী দত্ত প্রভৃতি।

দিগিন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'তরঙ্গ' নাটকের উপর হইতে সরকারী নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হইবার পর 'অশনি চক্র' এই নাটকটি মঞ্চস্থ করিয়াও যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করে। 'তরঙ্গ' নাটকে যাঁহারা অভিনয় করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন চারুপ্রকাশ ঘোষ, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় ও নিবেদিতা দাশ।

এতদ্ব্যতীত রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' ও 'মুক্তির উপায়' কিরণ মৈত্রের 'নাটক নয়', হীরু মুখোপাধ্যায়ের 'ঢেউ', দিগিন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গোলটেবিল' প্রভৃতি নাটকও 'অশনি চক্র' সাফল্যের সহিত মঞ্চস্থ

করে। নবনাট্য আন্দোলনে 'অশনি চক্রে'র দানকে অস্বীকার করা যায় না।

নবনাট্য আন্দোলনের ইতিহাসে 'বহুরূপী'র অভ্যুদয় নিঃসন্দেহে একটি উজ্জ্বল অধ্যায়। আঙ্গিকে, অভিনয়ে ও প্রযোজনায় 'বহুরূপী' নাট্যগোষ্ঠী যে অভিনবত্ব আনয়ন করে, তাহার ফল সুদূর প্রসারী। 'গণনাট্য সঙ্ঘ' নাটকের ক্ষেত্রকে সম্প্রসারিত করে, আর বহুরূপী করে নাট্যশিল্পের মানোন্নয়ন। এ যুগে মঞ্চকলার গুণগত পরিবর্তনে বহুরূপীর দান বিশেষভাবে স্মরণীয়।

ইহার উদ্যোগ পর্বে এক আশাতীত যোগাযোগ হইয়াছিল। শম্ভু মিত্রের নবনাট্যচেতনা, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের মঞ্চাভিজ্ঞতা, তুলসী লাহিড়ীর নাট্যপ্রতিভা ও কালী সরকারের অভিনয় কুশলতাই ইহার প্রাণশক্তি যোগাইয়াছিল। ইহাকে মণিকাঞ্চনযোগ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে যে, 'গণনাট্য সংঘে'র অভ্যন্তরে ইহার আদর্শ বিষয়ে মতান্তর দেখা দেওয়ায় কতিপয় শিল্পী ইহার সম্পর্ক ত্যাগ করেন এবং সৃষ্টির নূতন পথ খুঁজিতে থাকেন। সৃষ্টির এই বেদনা হইতে যেমন নাট্যচক্রের উদ্ভব হইয়াছিল, 'বহুরূপী'রও তেমন জন্ম হইল। শম্ভু মিত্রের নেতৃত্বে গড়িয়া উঠিল 'বহুরূপী'। তরুণ ও প্রবীণের মিলন হইল—একদিকে দেখা যায় মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, তুলসী লাহিড়ী, কালী সরকার প্রভৃতির মত প্রবীণদিগকে, আর এক দিকে দেখা যায় শম্ভু মিত্র, গঙ্গাপদ বসু, শোভেন মজুমদার, জ্যাকেরিয়া, অমর গঙ্গোপাধ্যায়, মহম্মদ ইজ্‌রাইল, সবিতাব্রত দত্ত, তৃপ্তি মিত্র, গীতা ভাদুড়ী (বর্তমানে দত্ত) প্রভৃতি তরুণতরুণীদিগকে। প্রখ্যাত গায়ক দেবব্রত বিশ্বাস এই দলে যোগ দিলেন। গোড়ার দিকে কিছুদিন পর্যন্ত কানু বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে যুক্ত হইলেন দুই তরুণ প্রতিভা—তাপস সেন ও খালেদ চৌধুরী।

'বহুরূপী'র প্রথম নাটক তুলসী লাহিড়ীর 'পথিক'। পঞ্চাশের কাছাকাছি ই. বি. আর. ম্যানসন ইন্‌স্টিটিউটে (বর্তমানে নেতাজী সুভাষ হল) 'পথিক' প্রথম মঞ্চস্থ হয়। নাটকের অভিনয় ও প্রযোজনা অভিনবত্বের পরিচয় দেয়। অভিনয়ে যেন বিন্দুমাত্র খুঁতও কোথাও দেখিতে পাওয়া গেল না। উপরে যাঁহাদের নামোল্লেখ করা হইয়াছে, তাঁহারা প্রায় সকলেই সেইদিন মঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। আলোকসম্পাতে তাপস সেনের কৃতিত্ব প্রকাশ পাইল এবং মঞ্চসজ্জাকর রূপে খালেদ চৌধুরীর শক্তির আভাস পাওয়া

গেল। 'নবান্ন'র পর 'পথিক' দ্বিতীয় নাটক, ইহাতে শম্ভু মিত্র নাট্যপরিচালক হিসাবে আর একবার দক্ষতার পরিচয় দিলেন।

'পথিক'-এর পর 'বহুরূপী' যশের আর একটি সোপানে আরোহণ করিল তুলসী লাহিড়ীর 'ছেঁড়া তার' মঞ্চস্থ করিয়া। এই নাটকের বক্তব্য ও বিষয়বস্তু দর্শকদের অন্তর স্পর্শ করিল। 'ছেঁড়া তার' নাটকেই শম্ভু মিত্র ও তৃপ্তি মিত্রের অভিনয়ক্ষমতার পুর্ণ বিকাশ হইল। তাঁহাদের খ্যাতি মুখে মুখে ছড়াইয়া পড়িল। নাট্যপরিচালকরূপে শম্ভু মিত্রের তৃতীয় সাফল্য 'ছেঁড়া তার'। নিউ এম্পাযাব মঞ্চে 'ছেঁড়া তার'-এর প্রথম অভিনয় হয়।

'ছেঁড়া তার'-এর পর 'বহুরূপী' দুইটি নাটক মঞ্চস্থ করে—রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়' ও শম্ভু মিত্রের 'উলু খাগড়া'। 'উলু খাগড়া'র রচয়িতা হিসাবে অবশ্য শম্ভু মিত্র ছদ্ম নাম ব্যবহার করেন। 'চার অধ্যায়' নাটকে সবিতাব্রত দত্ত ও তৃপ্তি মিত্র বিশেষ অভিনয় কুশলতার পরিচয় দেন। বাংলার অগ্নিযুগ নিন্দিত হইয়াছে এই অভিযোগে 'চার অধ্যায়'-এর বিরুদ্ধে কোন কোন মহল হইতে গুঞ্জন উঠে; তবে কিছুদিনেব মধ্যেই গুঞ্জন থামিয়া যায় এবং বিভিন্ন জায়গায় 'চার অধ্যায়' অভিনীত হইয়া প্রশংসিত হইতে থাকে; 'উলু খাগড়া' নাটকটি কিন্তু জনসম্বর্ধনা লাভে সমর্থ হয় নাই।

ইহার পর 'বহুরূপী' সম্প্রদায়ের অভ্যন্তরে কিছু মতান্তর হয়। মতান্তরের ফলে তুলসী লাহিড়ী, কালী সরকার, সবিতাব্রত দত্ত, মহম্মদ ইজরাইল, গীতা ভাদুড়ী প্রভৃতি কয়েকজন দল ত্যাগ করেন। এই সময় 'বহুরূপী'কে দুইটি একাঙ্ক নাটক ও কবিতা আবৃত্তিব উপর নির্ভর করিয়া টিকিযা থাকিতে হয়। একাঙ্ক নাটক দুইটির নাম হইল: 'বিভাব নাটক' ও 'সেদিন বঙ্গলক্ষ্মী ব্যাঙ্কে'। শেষেরটি চেকভ-এর একটি একাঙ্ক নাটকের অনুসরণে লিখিত।

'বহুরূপী' সম্প্রদায় কবিতা আবৃত্তির ক্ষেত্রেও কিছু অভিনবত্ব আনয়নের চেষ্টা করে। সমবেত কণ্ঠে কবিতা আবৃত্তির অনুশীলন করা হয়। ঐকতান সঙ্গীতের মত ছন্দ, যতি, মিল ইত্যাদি রক্ষা করিয়া মিলিত কণ্ঠে কবিতা-আবৃত্তি যথার্থই এক বিচিত্র পরিবেশ সৃষ্টি করে। আবৃত্তি অনুশীলনের দ্বারা শিল্পীদের উচ্চারণ শুদ্ধি কণ্ঠস্বরের বিভিন্ন পর্দা ব্যবহার ও স্বরবিস্তার কৌশল আয়ত্ত হয়। সুতরাং অভিনয়বিস্তার প্রাথমিক গুণগুলিকে আয়ত্ত করিতে এই অনুশীলন প্রভূত সাহায্য করে।

ধীরে ধীরে সম্প্রদায়ের সভ্যসভ্যারা তাঁহাদের ঐকান্তিক নিষ্ঠার দ্বারা

দলটিকে আবার সুসংগঠিত করিয়া তোলে। এই সময় 'বহুরূপী' এক বিরাট নাট্য প্রযোজনায় উদ্যোগী হয়। ইবসেন-এর 'দি এনিমি অব দি পিপল্' অবলম্বনে রচিত 'দশচক্র' নাটক। এই নাটকে বহু বিচিত্র ধরণের চরিত্র। শম্ভু মিত্র হতোদ্যম না হইয়া এই অসাধ্য সাধনে ব্রতী হন। তাঁহার সাধনা সফল হয়। 'দশচক্র' মঞ্চস্থ হইয়া দলগত অভিনয়ের এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করে, এমন চরিত্রবহুল নাটকের সুসমঞ্জস অভিনয় দেখিয়া দর্শকবৃন্দ অভিভূত হন। ভীড়ের দৃশ্যে প্রতিটি চরিত্রের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা কম কৃতিত্বের কথা নহে।

অতঃপর 'বহুরূপী' সম্প্রদায় মন্মথ রায়ের 'ধর্মঘট' ও গঙ্গাপদ বসুর 'অংশীদার' নাটক দুইটি মঞ্চস্থ করে, কিন্তু এই নাটক দুইটি জনপ্রিয়তা অর্জন করিতে পারে নাই।

'বহুরূপী' খ্যাতির শীর্ষে আরোহণ করে রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' নাটক প্রযোজনা করিয়া। তাপস সেনের আলো এবং খালেদ চৌধুরীর মঞ্চসজ্জা ও আবহসঙ্গীত এই প্রযোজনার অপরিহার্য অঙ্গ। 'বহুরূপী' অভিনীত 'রক্তকরবী' কিন্তু গোড়ার দিকে কলিকাতার পত্রপত্রিকাসমূহ কর্তৃক নিন্দিতই হইয়াছিল। তাহাদের অভিযোগ ছিল—রবীন্দ্রনাথের সাংকেতিক নাটককে বাস্তবানুগ পদ্ধতিতে মঞ্চস্থ করিয়া নাটকের মর্যাদাহানি করা হইয়াছে। বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে এই নাটক অভিনয়ের অনুমতি আদায় করিতে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছিল। কিন্তু দিল্লীতে অভিনীত হইয়া বহুরূপীর 'রক্তকরবী' যেদিন আধুনিক নাটক প্রযোজনায় শ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ করিল, সেদিন সমস্ত প্রতিবাদ স্তব্ধ হইয়া গেল। সেই হইতে 'রক্তকরবী'র অবাধ পরিক্রমা চলিতে লাগিল। 'রক্তকরবী' 'বহুরূপীর' শিরে স্বর্ণমুকুট পরাইয়া দিল।

ইহার পর 'বহুরূপী'র আশ্চর্য সাফল্য 'পুতুল খেলা'। ইবসেন-এর 'দি ডল্স্ হাউস্' অবলম্বনে রচিত এই নাটক। 'পুতুল খেলা' নাটকে শম্ভু মিত্র ও তৃপ্তি মিত্র যে অভিনয়োৎকর্ষ দেখাইয়াছেন, সমসাময়িক মঞ্চে তাহা আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। মঞ্চসজ্জা এবং আলোকপাতে যথেষ্ট কল্পনা ও সংযমের পরিচয় পাওয়া যায়। 'পুতুল খেলা' জনপ্রিয়তার পথে 'বহুরূপী'কে আর এক ধাপ অগ্রসর করিয়া দেয়।

'বহুরূপী' রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' এবং 'মুক্তধারা'ও মঞ্চস্থ করিয়াছে। 'ডাকঘর' পরিচালনা করিয়াছিলেন তৃপ্তি মিত্র। সুধী দর্শকবৃন্দ কর্তৃক তাঁহার

নাট্য নির্দেশনা প্রশংসিত হইয়াছিল। 'মুক্তধারা' কিন্তু জনপ্রিয়তা অর্জন করিতে সক্ষম হয় নাই।

বলিতে দ্বিধা নাই 'ভারতীয় গণনাট্য' সংঘ নাট্য আন্দোলনের যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করে, 'বহুরূপী' তাহারই উপর একটি সুরম্য সৌধ নির্মাণ করিয়াছে। এই সৌধ নির্মাণের কৃতিত্বের গৌরবও বড় কম নহে। 'বহুরূপী'র অনুশীলন বিজ্ঞানসম্মত। ইহার কর্মিগণ নিরলস ও একনিষ্ঠ। আধুনিক নাট্যকলা সম্পর্কে তাঁহারা যে কতখানি চর্চা করিয়া থাকেন, তাঁহাদেব মুখপত্র ত্রৈমাসিক 'বহুরূপী' পড়িলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়।

নবনাট্য আন্দোলনে বহুরূপীর দান অবিস্মরণীয়। অভিনয়কলা, মঞ্চ প্রযোজনা, প্রচার প্রভৃতি বিভিন্ন দিক দিয়া এই সম্প্রদায় নূতনত্ব আনিয়াছেন। শম্ভু মিত্রের মত পরিচালক, তৃপ্তি মিত্রের মত অভিনেত্রী, তাপস সেনের মত আলোক সম্পাতকারী এবং খালেদ চৌধুরীর মত মঞ্চ সজ্জাকরকে পাইয়া যে কোন দেশের নাট্যশালাই গৌরব বোধ করিতে পারে। নিজস্ব স্থায়ী মঞ্চ না পাইয়াও নাট্যকলার এতখানি উৎকর্ষ বিধান করা যথেষ্ট শক্তির পরিচায়ক। আধুনিক কলাসম্মত নাট্য প্রযোজনার জন্য বহুরূপীর নাম ইতিহাসের পাতায় চির উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে

দেশীয় যাত্রার আঙ্গিকের উপর আধুনিক বিজ্ঞানের প্রয়োজনমত ব্যবহার দ্বারা অভিনয়ে নূতন রীতির প্রবর্তক 'শৌভনিক' নাট্যগোষ্ঠী। Mass Theatre, Community Theatre বা Open Air Theatre-এর ভিত্তিতেই তাঁহাদের 'গণনাট্যাভিনয়, গোষ্ঠী-অভিনয় বা মুক্ত অঙ্গন' অভিনয় পরিকল্পিত হইয়াছে। ইঁহাদের এই অভিনব প্রচেষ্টা 'গণরঙ্গমহল' নামেও পরিচিত।

এই প্রতিষ্ঠানের কয়েকজন কর্মী দক্ষিণ কলিকাতার 'গণনাট্যসংঘে'র সঙ্গে বহুদিন যাবৎ যুক্ত ছিলেন। 'ভারতীয় গণনাট্যসংঘে'র ১৯৫৩ সনের বোম্বাই অধিবেশন হইতেই Free Theatre বা Mass Theatre-এর সূচনা হইয়াছিল। সর্বসাধারণের জন্য নামমাত্র প্রবেশ মূল্যে নাটক পরিবেশন করাই ইহাদের উদ্দেশ্য ছিল। 'রাহুমুক্ত' নাটকের অভিনয়ই ইহাদের এই বিষয়ক প্রথম প্রচেষ্টা। তারপর ইহারা ম্যাক্সিম গোর্কির 'মা' নাটকের অভিনয় করেন। এই অভিনয়ের সার্থকতা দেখিতে পাইয়া ইহার কর্মিগণ উৎসাহিত হইলেন। ইহার পর হইতেই এই তিনটি আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া ইহারা অগ্রসর হইতে

লাগিলেন, 'প্রথমতঃ রঙ্গমঞ্চকে সকল দর্শকেরই আর্থিক আয়ত্তের অধীনস্থ করা; দ্বিতীয়তঃ কর্মক্লান্ত, শ্রান্ত, ব্যথিত ও উৎসাহহীন মানুষকে শিল্পসৃষ্টির মাধ্যমে উন্নততর জীবন-রসের সন্ধান দেওয়া; তৃতীয়তঃ মঞ্চশিল্পের বিভিন্ন আঙ্গিকের মাধ্যমে শিক্ষামূলক (প্রচারমূলক নয়) বাস্তবানুগ নূতন নাটক, নাট্যকার ও নবীন প্রতিভাধর শিল্পীদের সম্মিলিত করা।'

১৯৫৮ খ্রীঃ এপ্রিলমাসে ভবানীপুব অঞ্চলে ডি. এন. মিত্র স্কোয়ারে 'শৌভনিকে'র গণ-রঙ্গমহলের (Mass Theatre) যাত্রা সুরু হয়। সেদিন ইহাদের একমাত্র সম্বল ছিল অসীম মনোবল। আর্থিক কৃচ্ছ্রতাকে বাদ দিলেও নানা বিরূপ সমালোচনাও ইহাদের প্রতিবন্ধক ছিল। ডি. এন. মিত্র স্কোয়ার মুক্ত-রঙ্গালয়ের পক্ষে প্রশস্ত পরিবেশ মোটেই নয়। ইহা ছাড়া, এত বিরাট প্রচেষ্টার পক্ষে অভিজ্ঞতাও তাঁহাদের যথেষ্ট ছিল না। ঐ বছরই তাঁহারা আবার নূতন করিয়া সংগঠনকে ঢালিয়া সাজিবার চেষ্টা করিলেন। গোর্কীর 'মা' ছাড়াও সুবোধ ঘোষের 'মা হিংসী', ইবসনের 'দি গোস্ট্স্' অভিনয় কবিয়া গণসংযোগেব প্রশস্ত পথ উন্মুক্ত করিলেন, এক টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সায় তিনখানা নাটকের অভিনয় দেখিবার ব্যবস্থা করিলেন। প্রচেষ্টা সার্থক হইল। দক্ষিণ কলকাতায় রাসবিহারী এভিনিউ ও শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোডের সংযোগ স্থলে নাট্যকার অভিনেতা বীরেশ মুখোপাধ্যায় অন্যতম চিত্র প্রযোজক প্রমোদ লাহিড়ীর যুগ্ম প্রচেষ্টায় ১৯৬০ সনে ২৭শে নবেম্বর 'মুক্ত-অঙ্গন বঙ্গালয়' স্থাপিত হইয়াছে। নিয়মিত ভাবে সপ্তাহে তিন দিন গোর্কীর 'মা' অভিনীত হইয়াছে। ১৯৬১ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী হইতে ১২ই মার্চ পর্যন্ত ইহারা নিজেদের স্থায়ী রঙ্গমঞ্চে রবীন্দ্র জন্ম-শত-বার্ষিকী পালন করিবেন। 'গোরা', 'বাঁশরী', 'মুক্তির উপায়', 'রাজা' এবং 'রাজা ও রাণী' ইহারা অভিনয় করিবেন। এই অনুষ্ঠান শেষ হইলে বিদেশী গল্পের ছায়া অবলম্বনে লিখিত নিবেদিতা দাসের সামাজিক প্রহসন 'যা নয় তাই' অথবা রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' নিয়মিত অভিনয় করিবেন। 'রাশিয়ান কালচারাল ডেলিগেসন'কে ইহারা গোর্কীর 'মা' এবং 'গোরা' হইতে কিছু অংশ অভিনয় করিয়া দেখাইবেন স্থির করিয়াছেন।

প্রকৃত শিল্পীর কাজ রসসৃষ্টি করা, আত্মপ্রচার বা দলীয়-প্রচার নয়—এ কথা ইহারা মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন। পরিবেশ সৃষ্টির পথে যতটুকু যান্ত্রিক সহযোগিতার প্রয়োজন ইহারা সেইটুকু গ্রহণ করিয়া থাকেন। বিশেষ করিয়া মুক্ত-অঙ্গনের তিন দিক খোলা রঙ্গমঞ্চে আলোর খেলা লইয়া ইহারা বিপদে

পড়িয়াছিলেন। এই ত্রুটি সংশোধন করিতে ইহাদের আলোক সম্পাতের বিদেশী শিল্পীগোষ্ঠীর কাছ হইতে অনেক কিছু কৌশল শিক্ষা করিয়াছেন।

'শৌভনিকে'র শিল্পিগণ এই পর্যন্ত কলকাতা, হাওড়া, হুগলী, চব্বিশ পরগণা, বর্ধমান, পশ্চিম দিনাজপুর, কুচবিহার, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি অঞ্চলে অভিনয় করিয়া আসিয়াছিলেন। ইঁহাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় বলা হইয়াছে, ইঁহারা একটি নাট্যবিদ্যালয় পরিচালনা করিবেন। নাট্য বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার কথাও বিশেষ ভাবে ইঁহারা ভাবিতেছেন।

ইহার সাধারণ সম্পাদিকা শ্রীমতী নিবেদিতা দাস নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের শেষের দিকের অভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। হয়ত তাঁহারই অনুপ্রেরণায় Mass Theatre অথবা প্রাচীন যাত্রা অভিনয়ের দিকে ইহাদের দৃষ্টি পড়িয়াছিল। যন্ত্রের কৌশল ইহাদের অভিনয়কে ব্যাহত করে না। নতুন নতুন ইঙ্গিতের মাধ্যমে ইঁহারা পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছেন, আলোক সম্পাতের মাধ্যমে তাহা গভীর করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইহার সঙ্গে আছে সঙ্ঘবদ্ধ অভিনয় ও গতিশীল নাট্যরচনা।

বর্তমান অপেশাদার নাট্যসংস্থাগুলির মধ্যে বিজন ভট্টাচার্য প্রতিষ্ঠিত নাট্যসংস্থা 'ক্যালকাটা থিয়েটার' আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান। বিজন ভট্টাচার্য আধুনিক নবনাট্য আন্দোলন তাঁহার 'নবান্ন' নাটক রচনা এবং অভিনয়ের মাধ্যমে সুরু করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার নাট্য প্রতিষ্ঠান 'ক্যালকাটা থিয়েটারে'র উদ্দেশ্যের কথা বিশদভাবে বলিবার কিছু নাই।

প্রায় দশ এগার বৎসর পূর্বে গণনাট্য সঙ্ঘ হইতে চলিয়া আসিবার পর বিজন ভট্টাচার্য 'ক্যালকাটা থিয়েটারে'র প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময় তাঁহার সহিত আসিয়া যোগ দেন বাংলা রঙ্গমঞ্চের অন্যতমা শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী স্বর্গীয়া প্রভাদেবী। ইঁহার অকুণ্ঠ সহযোগিতায় উৎসাহী হইয়া বিজন ভট্টাচার্য স্বরচিত দুইখানি নাটক 'কলঙ্ক' এবং 'মরাচাঁদ' 'ক্যালকাটা থিয়েটারের' পক্ষ হইতে প্রযোজনা করেন। এই দুইখানি নাট্য প্রযোজনা করিয়াই 'ক্যালকাটা থিয়েটার' জনসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয়।

'কলঙ্ক' এবং 'মরাচাঁদে'র পর ক্যালকাটা থিয়েটার বিজন ভট্টাচার্যের আর দুইখানি নাটক 'স্বর্ণকুম্ভ' ও 'জতুগৃহ' প্রযোজনায় উদ্যোগী হয়। কিন্তু বিজন ভট্টাচার্যের অসুস্থতা এবং প্রভাদেবীর অকস্মাৎ পরলোক গমনে নাটক দুইটি বন্ধ থাকে। ইহার পর বিজন ভট্টাচার্যকে স্থানান্তরে যাইতে হয়, ফলে

কয়েক বৎসরের জন্য 'ক্যালকাটা থিয়েটারে'র কার্যক্রম এক প্রকার বন্ধই থাকে।

কিন্তু সাময়িক ভাবে নাট্য প্রযোজনা স্থগিত রাখিলেও বিজন ভট্টাচার্য এবং তাঁহার 'ক্যালকাটা থিয়েটার' নাট্যজগৎ হইতে বহির্ভূত হইয়া যায় নাই। ১৯৫৯ সালে বিজন ভট্টাচার্য তাঁহার নবতম নাটক 'গোত্রান্তর' 'ক্যালকাটা থিয়েটাবে'র পক্ষ হইতে পরিবেশন করিয়া নূতন ভাবে জনচিত্ত জয় করিতে সক্ষম হইলেন। 'গোত্রান্তর' নাটকের অভিনয় এবং প্রয়োগকলা বাংলা রঙ্গমঞ্চের আর এক নূতন অধ্যায় সৃষ্টি করিল। ইহার পর বিজন ভট্টাচার্য তাঁহার 'মরাচাঁদ' নাটকটিই নবপর্যায়ে মঞ্চস্থ করিলেন। 'মরাচাঁদে'র দৃশ্যপট পরিকল্পনা প্রযোজনাব ক্ষেত্রে আর এক দিগ্‌দর্শন। ইহার মাধ্যমে শুধু প্রযোজক হিসাবেই নহে, অভিনেতারূপেও বিজন ভট্টাচার্য স্বীয় প্রতিভাব স্বাক্ষর রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন। বস্তুত পক্ষে 'মরাচাঁদে'র নায়ক পবন চরিত্রের অভিনয়ে বিজন ভট্টাচার্যেব সমকক্ষ অভিনেতা বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে খুঁজিয়া পাওয়া সহজসাধ্য নহে।

সমাজ সচেতন নূতন বলিষ্ঠ নাটক, তাহার প্রয়োগকলা এবং অভিনয় আঙ্গিকের নূতন নূতন পরীক্ষাই 'ক্যালকাটা থিয়েটারে'র উদ্দেশ্য। বিজন ভট্টাচার্যেব এই উদ্দেশ্য ক্যালকাটা থিয়েটারের মাধ্যমে পরিপুর্ণ ভাবেই উজ্জীবিত হইয়াছে, তাঁহার আধুনিকতম নাটক 'মরাচাঁদে'র প্রয়োগ কৌশলই তাহাব প্রমাণ।

১৯৫৬ সাল হইতে মধ্য কলিকাতার একটি সৌখীন নাট্য সংস্থা 'অচলায়তন' নাম লইয়া ববীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের নাটক অভিনয় করিতেছিল। ১৯৫৭ সালে গণনাট্য সংঘেব অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সংগঠক অভিনেতা শ্রীসুধী প্রধান উক্ত সংঘ পরিত্যাগ করিলে 'অচলায়তন' তাঁহার সহযোগিতা লাভ করে। তখন হইতে তিনি এই সংগঠনের সাহায্যে তাঁহার সম্পাদিত 'নীল-দর্পণ' অভিনয় করাইতে থাকেন। এই সংগঠনের সাহায্যে তিনি দ্বাদশ বৎসর পরে বিখ্যাত নাটক 'নবান্ন'র পুনরাভিনয় করেন। তুলসী লাহিড়ীর নাটক 'লক্ষ্মীপ্রিয়ার-সংসার'ও এই সংগঠনের সাহায্যে সর্বপ্রথম কলিকাতায় 'বিশ্বরূপা' মঞ্চে অভিনীত হয়। অসুস্থ শরীর লইয়া এই নাটকে তুলসী লাহিড়ী তাঁহার জীবনের সর্বশেষ অভিনয় করেন। ইহার পর শ্রীসুধী প্রধান 'কুলীন কুল-সর্বস্ব' প্রযোজনা ও সম্পাদনা করিয়া উক্ত সংগঠনের সাহায্যে ১৯৬১

সালের ৬ই জানুয়ারী শুক্রবার সন্ধ্যায় সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ মঞ্চে (পুরাতন সাঁস্থসি থিয়েটার প্রাঙ্গণে) অভিনয় করেন। এই প্রতিষ্ঠানের ইহা একটি উল্লেখযোগ্য কীর্তি।

১৮৭৬ সনে এই নাটকের সর্বশেষ অভিনয় হইয়াছিল, সুতরাং প্রায় এক-শত বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া ইহার পুনরভিনয় স্বভাবতই সাধারণের মধ্যে কৌতুহল সৃষ্টি করিল। এই অভিনয় সম্পর্কে বিভিন্ন সাময়িক পত্রে যে মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্য হইতে মাত্র একটি মন্তব্য এখানে উদ্ধৃত করিলেই এই প্রতিষ্ঠানের কৃতিত্বের বিষয় বুঝিতে পারা যাইবে।

১৪ই জানুয়ারী ১৯৬১ সনের 'দেশ' পত্রিকা 'কুলীন কুল-সর্বস্ব' অভিনয় সম্পর্কে উল্লেখ করিয়াছেন,—

'দেশের অতীত ঐতিহ্যের সঙ্গে বর্তমান নাট্য প্রগতির ধারাকে সুষমভাবে মিলিয়ে বাংলার নাট্য-আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাবার ব্রত নিয়ে 'অচলায়-তন' নাট্য সংস্থা কয়েক বৎসর যাবৎ নানা রসের নাটক পরিবেশন করে আসছেন। এবারে তাঁরা রাম নারায়ণ তর্করত্ন রচিত বাংলার প্রথম মৌলিক সামাজিক নাটক 'কুলীন কুল-সর্বস্ব' অভিনয়ের আয়োজন করেছিলেন। গত ৬ই জানুয়ারী সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের রঙ্গমঞ্চে এই অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়েছিল। অভিনয়ের প্রারম্ভে অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য এবং শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী রাম নারায়ণ ও তাঁর নাটক সম্বন্ধে আলোচনা করেন। 'কুলীন কুল-সর্বস্ব' নাটকের রচনা ও প্রথম অভিনয় কাল আজ থেকে একশো বছর আগে। কৌলীন্যের নামে তৎকালীন সমাজে যে নির্মম নারীনিগ্রহ চল্‌ত, তারই একটি বাস্তব চিত্র পাওয়া যায় এই নাটকে। রাম নারায়ণ রক্ষণশীল সমাজে বর্ধিত ও সংস্কৃত শিক্ষায় দীক্ষিত হয়েও সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে পেছপাও হননি—তাঁর রচিত এই নাটকটি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। 'আরো একটি কারণে 'কুলীন কুল-সর্বস্ব' বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। রাম নারায়ণই প্রথম সংস্কৃত নাটকের ধারা অনুসরণ করে বাংলায় সামাজিক নাটক লিখতে এগিয়ে এসেছিলেন। তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে মাইকেল প্রমুখ বাংলায় নাটক লেখবার প্রেরণা লাভ করেছিলেন। বাংলা নাট্য সাহিত্যের প্রথম পাদপীঠ এমনিভাবে রচিত হয়েছিল শতবর্ষ আগে। এদিক দিয়ে রাম নারায়ণ তর্করত্ন একজন সত্যিকারের পথিকৃৎ। এযুগে 'কুলীন কুল-সর্বস্বে'র নাম অনেক নাট্যামোদীর জানা থাকলে তার বিষয়-বস্তু বা অভিনয়

সম্বন্ধে অধিকাংশেরই বিশেষ কোন ধারণা নেই। 'অচলায়তন' সম্প্রদায়ের বর্তমান প্রচেষ্টা তাই নাট্যোৎসাহীদের কাছে একটি দুর্লভ সুযোগ এনে দিয়েছে। এজন্যে এদের সাধুবাদ জানাই।'

'আধুনিক মঞ্চরীতির আদর্শে এই প্রাচীন নাটকের বিচার করলে ভুল হবে। ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত বা নাট্যদ্বন্দ্বের অবকাশ এই নাটকে একান্ত পরিমিত। এব সার্থকতা তৎকালীন সমাজের প্রতিচ্ছবি হিসাবে সে যুগের মানুষেব বেদনা-বোধকে এ যুগের দর্শকের মনে সঞ্চারিত করার মধ্যে। 'অচলায়তনে'র অভিনয় আয়োজন এদিক দিয়ে সাফল্য লাভ করেছে। তবে এই সঙ্গে বলা দরকার যে, প্রথম বজনীতে শিল্পীদের অভিনয়ে এবং মঞ্চ-ব্যবস্থার উন্নতির প্রচুর অবকাশ ছিল। নেপথ্য-স্মারকের উপর অধিকাংশ শিল্পীকে নির্ভরশীল দেখলুম। দলগত নৈপুণ্যও উল্লেখযোগ্যের পর্যায়ে পড়ে না। এ সব ত্রুটি শোধরান শক্ত নয়, এবং আমাদের বিশ্বাস 'অচলায়তন' যে নিষ্ঠার সঙ্গে প্রাচীন এই নাটকটিকে লোকের সামনে তুলে ধববার চেষ্টা করেছেন, তা-ই তাঁদের প্রেরণা দেবে এই সব ভুলচুক শুধ্‌রে নেবার। প্রথম রাত্রিব অভিনয়ে যাঁরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ব্রাহ্মণ ও সূত্রধারের ভূমিকায় ছিলেন দুই অধ্যাপক—অজিত ঘোষ ও সাধন ভট্টাচার্য। কুলপালক (সুশীল চট্টোপাধ্যায়), অনৃতাচার্য (পিনাকী বসু), বর (কালী সরকার), যশোদা (শান্তা চট্টোপাধ্যায়) ও ফুলকুমারী (গীতা সেন) উল্লেখযোগ্য অভিনয়-কৃতিত্বের পবিচয় দেন। অনিল বাগচির সুরারোপে শ্যামলী মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে নটীর সঙ্গীত সকলের প্রশংসা অর্জন করে। মাঝে মাঝে গায়িকার স্বর প্রক্ষেপণে সামঞ্জস্যের অভাব অনুভূত হয়েছিল। সুধী প্রধান নাটকটিব প্রযোজনা ও সম্পাদনা করেন। কালী সরকার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন।'

উপরোক্ত দুইজন অধ্যাপক ব্যতীতও একজন অধ্যাপয়ত্রীও এই নাটকে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি শ্রীমতী ইলা মিত্র, সুলেখিকা বলিয়াও পরিচিতা, তিনি শাস্তবীর অংশে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন। এই নাটকের অভিনয় দ্বারা এই সৌখীন নাট্য প্রতিষ্ঠানটি একটি বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী হইয়াছে।

উপরে যে কয়টি নাট্য সংস্থার উল্লেখ করা হইল, তাহা ব্যতীত আধুনিক কালে যে অসংখ্য সংস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাদের তালিকা দেওয়া সহজসাধ্য

নহে ; প্রথম বৎসর 'বিশ্বরূপা' রঙ্গমঞ্চ কর্তৃক যে সৌখীন নাট্য সংস্থাগুলির মধ্যে নাট্য প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান হইয়াছিল, তাহাতেই প্রায় দেড়শত বিভিন্ন নাট্য সংস্থা যোগদান করিয়াছিল। কলিকাতা ও ইহার উপকণ্ঠ ব্যতীতও পশ্চিম বাংলার সুদূর মফঃস্বল অঞ্চলেও অনুরূপ বহু প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে, ইহাদের মধ্যে প্রায়ই নাট্য প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠানও হইয়া থাকে। সাম্প্রতিক কালে নাট্য প্রতিযোগিতা বাঙ্গালীর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের একটি উল্লেখযোগ্য অঙ্গ হইয়াছে, ইহা অবলম্বন করিয়াও নূতন নূতন নাট্য সংস্থা সর্বত্রই গড়িয়া উঠিতেছে।

এই সকল নাট্যসংস্থাগুলি দ্বারা সাম্প্রতিক বাংলা নাটকের আরও একটি দিক যে বিশেষ পুষ্টি লাভ করিতেছে, তাহাও লক্ষ্য করা যাইতে পারে—তাহা একাঙ্ক নাটক। পুর্ণাঙ্গ নাটক অপেক্ষা একাঙ্ক নাটকের অভিনয় অনেক দিক দিয়াই সুবিধাজনক। যে সকল প্রতিষ্ঠানের অর্থসঙ্গতি পরিমিত, তাহারা স্বভাবতঃই পুর্ণাঙ্গ নাটকের পরিবর্তে একাঙ্ক নাটকই অভিনয় করিয়া থাকে। এই দিক দিয়া. একাঙ্ক নাটকের রচনা ও অভিনয় উভয়ই সমানভাবে উৎসাহ লাভ করিয়া থাকে। সেইজন্য একাঙ্ক নাটকের প্রতিযোগিতা পুর্ণাঙ্গ নাট্য প্রতিযোগিতা হইতে অধিকতর জনপ্রিয়তা লাভ কথিয়াছে। ১৯৬০ সনে বিশ্বরূপা নাট্যোন্নয়ন পরিকল্পনাব উদ্যোগে যে একাঙ্ক নাটকের প্রতিযোগিতা হইয়া গিয়াছে, তাহাতে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য মৌলিক নাটকেব সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের বিষয় এখানে উল্লেখ না করিলে আধুনিক নাট্য আন্দোলনে নাট্য সংস্থাগুলি যে কি দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে, তাহা সম্যক্ উপলব্ধি করা যাইবে না।

'শিল্পীমন' নামক নাট্য-সংস্থা কর্তৃক অভিনীত উৎপল দত্ত রচিত 'ঘুম নেই' নামক একাঙ্ক নাটকটি আধুনিক বাংলা একাঙ্ক নাটক রচনায় একটি উল্লেখ-যোগ্য সৃষ্টি বলিয়া উল্লেখ করিবার যোগ্য। কয়েকটি লরী ড্রাইভারের জীবন ভিত্তি করিয়া কাহিনীটি পরিকল্পিত হইয়াছে, ইহার জীবন দর্শনে যে বাস্তবানু-গত্য প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা সচরাচর লক্ষ্য করা যায় না। বহির্মুখী জীবনা-চরণ অভিন্ন হইলেও প্রত্যেকটি চরিত্রের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য আছে, তাহার অনু-ভূতিতে ইহার চরিত্র সৃষ্টিও সার্থক হইয়াছে। বাস্তব জীবনের নূতন নূতন ক্ষেত্র হইতে নাটকীয় বিষয়বস্তু সন্ধানের কৃতিত্বও নাট্যকারের প্রাপ্য।

শ্রীমতী সোমালী বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত '১৪ই জুলাই' নামক একাঙ্ক নাটকটি

'শিল্পী মহল' নামক এক সৌখীন নাট্য-সংস্থা কর্তৃক অভিনীত হইয়াছিল। প্রাত্যহিক জীবনের নিতান্ত অবহেলিত বিষয়বস্তুর মধ্যেও যে জীবনের বিচিত্র কৌতুককর উপকরণ প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকে, এই নাটকের মধ্য দিয়া তাহারই অনুসন্ধান সার্থক হইয়াছে। ১৪ই জুলাই বিশ্বপ্রলয় সংঘটিত হইবে বলিয়া যে ভবিষ্যদ্বাণী সংবাদপত্রে প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা ভিত্তি করিয়া ইহা রচিত হইয়াছিল; ইহার কাহিনী একটি কৌতুককর পরিবেশ রচনা করিলেও, ইহার মধ্যে মানব-জীবনের কয়েকটি মূল সত্যও নিহিত ছিল। সেইজন্য কৌতুককর পরিবেশের ভিতর দিয়াও ইহা গভীর জীবনরসের ইঙ্গিত প্রকাশ করিয়াছে।

আধুনিক মধ্যবিত্ত পরিবারের একটি মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা লইয়া শঙ্করনাথ ভট্টাচার্যের 'আবর্ত' নামক একাঙ্ক নাটকটি রচিত হইয়াছিল। 'রূপ ও অরূপ' নামক নাট্য-সংস্থা ইহা প্রযোজনা করেন। ছিন্নমূল সমাজের মধ্যবিত্ত পরিবারের বাস্তব সমস্যার উপলব্ধি ও রূপায়ণ ইহাতে উল্লেখযোগ্য সার্থকতা লাভ করিয়াছে। পিতৃ-পরিবারের প্রতিপালিকা চাকুরীজীবিনী নারী কি ভাবে পারিবারিক স্বার্থের জন্য ব্যক্তি স্বার্থ বিসর্জন দিতেছে, তাহার সার্থক উপলব্ধি ইহাতে দেখা যায়। এই ভাবে নাট্যসংস্থাগুলি একাঙ্ক নাটক রচনা ও প্রযোজনার ভিতর দিয়াও যে উৎসাহ সঞ্চার করিয়াছে, তাহা নাট্য আন্দোলনে একটি বিশেষ শক্তি সঞ্চার করিয়াছে।

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট—ক

১৯০১ হইতে ১৯৬০ সন পর্যন্ত প্রকাশিত বাংলা নাটকের তালিকা

১৯০১

বসু, অমৃতলাল—যাদুকরী
,, ,, —বৈজয়ন্তবাস
ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ—মৃচ্ছকটিক
—মুদ্রারাক্ষস
—বিক্রমোর্বশী
—মালবিকাগ্নিমিত্র
—মহাবীর চরিত
—চণ্ড কৌশিক
—বেণী সংহার
ঘোষ, গিরিশচন্দ্র —অশ্রুধারা
—মনের মতন
—অভিশাপ
গোস্বামী মনোমোহন —শাজাদী রোশেনারা

১৯০২

বসু, অমৃতলাল —নবজীবন
,, ,, —অবতার
ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ —প্রবোধচন্দ্রোদয়
,, ,, —নাগানন্দ
,, —দায়ে প'ড়ে দারগ্রহ
রায়, দ্বিজেন্দ্রলাল—প্রায়শ্চিত্ত
,, মনোমোহন—রিজিয়া
বিদ্যাবিনোদ, ক্ষীরোদপ্রসাদ—সাবিত্রী
—সপ্তম প্রতিমা
দত্ত, অমরেন্দ্রনাথ—ফটিক জল
ঘোষ গিরিশচন্দ্র—শান্তি
—ভ্রান্তি
দেব, চুনীলাল—কুব্জ ও দরজী
বন্দ্যোপাধ্যায়, রামলাল—অভিষেক
—অনাথিনী
—প্রেমপাশ
বিদ্যারত্ন, নিত্যবোধ—একাদশ বৃহস্পতি

১৯০৩

রায়, দ্বিজেন্দ্রলাল—তারাবাঈ
বিদ্যাবিনোদ, ক্ষীরোদপ্রসাদ—বেদৌরা
বিদ্যাবিনোদ, ক্ষীরোদপ্রসাদ—বঙ্গের প্রতাপ-আদিত্য
,, —রঘুবীর
ঘোষ, গিরিশচন্দ্র—আয়না
দে, দুর্গাদাস—ল-বাবু
ঘোষ, মহাতাপচন্দ্র—স্বতনে স্বতনে
গোস্বামী, মনোমোহন—সংসার
বন্দ্যোপাধ্যায়, রামলাল—নাচ

১৯০৪

বসু, অমৃতলাল—বাহবা বাতিক
ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ—রজতগিরি
,, —ধনঞ্জয়বিজয়
,, —বিদ্ধশালভঞ্জিকা
,, —কর্পূরমঞ্জরী
,, —প্রিয়দর্শিকা
ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ—চিরকুমার সভা
বিদ্যাবিনোদ, ক্ষীরোদপ্রসাদ—বৃন্দাবন-বিলাস
,, —রঞ্জাবতী
দত্ত, অমরেন্দ্রনাথ—শ্রীরাধা
ঘোষ, গিরিশচন্দ্র—সৎনাম
মুখোপাধ্যায়, হরিসাধন—ঔরঙ্গজেব

গোস্বামী, মনোমোহন—সংসার
বিদ্যারত্ন, নিত্যবোধ—প্রেমের পথ
,, ,, —দিলবাহার
রায়, দীনেন্দ্র—দস্যুবন্ধন
গোস্বামী, মনোমোহন—মুরলা
বন্দ্যোপাধ্যায়, রামলাল—পেন্নার
মিত্র, মহেন্দ্রনাথ—কাপালিনী

১৯০৫

রায়, দ্বিজেন্দ্রলাল—প্রতাপসিংহ
দত্ত, অমরেন্দ্রনাথ—শিবরাত্রি
,, —ঘুঘু
,, —বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ
দত্ত, অমরেন্দ্রনাথ—প্রণয় না বিষ
,, —এস যুবরাজ
মিত্র, অতুলকৃষ্ণ—বাপ্পারাও
ঘোষ, গিরিশচন্দ্র—হরগৌরী
সরকার, রামলাল—বিদেশী
রায়, মনোমোহন—ঐন্দ্রিলা
দেব, চুনীলাল—নশিব
গোস্বামী, মনোমোহন—পৃথ্বীরাজ
চট্টোপাধ্যায়, হরিপদ—প্রহ্লাদচরিত্র
,, ,, —শুকদেব চরিত্র
বসু, হরনাথ—জাগরণ

১৯০৬

বসু, অমৃতলাল—সাবাস বাঙ্গালী
রায়, দ্বিজেন্দ্রলাল—দুর্গাদাস
বিদ্যাবিনোদ, ক্ষীরোদপ্রসাদ—উলূপী
,, —পদ্মিনী
মিত্র, অতুলকৃষ্ণ—শিরী-ফরহাদ
ঘোষ, গিরিশচন্দ্র—সিরাজদ্দৌল্লা
,, —বাসর
,, —মীর কাশিম
মুখোপাধ্যায়, হরিসাধন—বঙ্গবিক্রম
দেবী, স্বর্ণকুমারী—দেব কৌতুক
,, —কনে বদল
বন্দ্যোপাধ্যায়, রামলাল—অদৃষ্ট
,, ,, —চাঁদের হাট
গঙ্গোপাধ্যায়, অবিনাশ—শিবচতুর্দশী
রায়, মনোমোহন—জাগরিতা বা মিবার কীর্তি
বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্র—বিধির লিখন
চট্টোপাধ্যায়, হরিপদ—ভৃগুচরিত
,, শেষ প্রভাস বা যদুবংশধ্বংস
,, লবণ-সংহার
বসু, হরনাথ স্বর্ণহার

১৯০৭

ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ—জুলিয়স্ সীজার
বিদ্যাবিনোদ, ক্ষীরোদপ্রসাদ—চাঁদবিবি
,, ,, —পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত
,, ,, —রক্ষঃরমণী
মিত্র, অতুলকৃষ্ণ—লুলিয়া
ঘোষ, গিরিশচন্দ্র—য্যায়সা-কা-ত্যায়সা
,, —ছত্রপতি শিবাজী
বন্দ্যোপাধ্যায়, চণ্ডীচরণ—ভূতের খেলা
গোস্বামী, মনোমোহন—সমাজ
চট্টোপাধ্যায়, হরিপদ—পদ্মিনী
দাস, কেদারনাথ—হুরা

১৯০৮

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ—শারদোৎসব
,, —মুকুট
রায়, দ্বিজেন্দ্রলাল—নূরজাহান
,, —সোরাব-রুস্তাম
,, —সীতা
,, —মেবার পতন
বিদ্যাবিনোদ, ক্ষীরোদপ্রসাদ—নন্দকুমার
,, —দাদা ও দিদি
,, —অশোক

বিদ্যাবিনোদ, ক্ষীরোদপ্রসাদ—বাসন্তী
,, —বরুণা
,, —ভূতের বেগার
দত্ত, অমরেন্দ্রনাথ—দলিতা ফণিনী
,, —কেয়া মজেদার
মিত্র, অতুলকৃষ্ণ,—তুফানি
,, —হিন্দা হাফেজ
ঘোষ, গিরিশচন্দ্র—শাস্তি কি শান্তি
দেব, চুনীলাল—তিনটি আপেল
? —মহিলা মজলিস
রায়, হারাধন—মীরা উদ্ধার
,, ,, —পার্থ পরীক্ষা
মুখোপাধ্যায়, প্রফুল্লচন্দ্র—তমালী
সেন, সত্যচরণ—কেরাণীবাবু
চট্টোপাধ্যায়, হরিপদ—রণজিতের জীবনযজ্ঞ
,, —দুর্গাসুর
মুখোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন—ছত্রপতি শিবাজী

১৯০৯

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ—প্রায়শ্চিত্ত
রায়, দ্বিজেন্দ্রলাল—সাজাহান
বিদ্যাবিনোদ, ক্ষীরোদপ্রসাদ—দৌলতে দুনিয়া
দত্ত, অমরেন্দ্রনাথ—আশা-কুহকিনী
মিত্র, অতুলকৃষ্ণ—দমবাজ
,, —আয়েসা
,, —রংরাজ
মুখোপাধ্যায়, হরিপদ—রাণী দুর্গাবতী
ঘোষ, শিশিরকুমার—শ্রীনিমাই সন্ন্যাস
গোস্বামী, মনোমোহন—কর্মফল
,, সুরেন্দ্রনাথ—রূপ-সনাতন
দেব, চুনীলাল—বাহবা
বসু, হরনাথ—ময়ুর সিংহাসন
,, —গুরুগোবিন্দ
,, —মহারাষ্ট্র গৌরব
গুপ্ত, যোগেন্দ্রনাথ—আনারকলি
বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ—ভূতের বিয়ে
মুখোপাধ্যায়, ভূতনাথ—ভণ্ড
বিদ্যারত্ন, নিত্যবোধ—কুসুমে কীট
নন্দী, বিপিনবিহারী—শিখ

১৯১০

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ—রাজা
বিদ্যাবিনোদ, ক্ষীরোদপ্রসাদ—বাংলার মসনদ
মিত্র, অতুলকৃষ্ণ—পাষাণে প্রেম
,, —ঠিকে ভুল
ঘোষ, গিরিশচন্দ্র—শঙ্করাচার্য
বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ—উপেক্ষিতা
,, ,, —গুরুঠাকুর
ঘোষ, হরনাথ—বেহুলা
মুখোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন—দশচক্র
সরকার, ভবনাথ—বিধিলিপি
চট্টোপাধ্যায়, হরিপদ—দীনবন্ধু
,, কুমুদনাথ—বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ
সেন, শশাঙ্কমোহন—সাবিত্রী

১৯১১

রায়, দ্বিজেন্দ্রলাল—চন্দ্রগুপ্ত
,, —পুনর্জন্ম
বিদ্যাবিনোদ, ক্ষীরোদপ্রসাদ—পলিন
দত্ত, অমরেন্দ্রনাথ—জীবনে মরণে
মিত্র, অতুলকৃষ্ণ—জেনোবিয়া
,, —শাহাজাদী
ঘোষ, গিরিশচন্দ্র—অশোক
,, —তপোবল
দেবী, স্বর্ণকুমারী—পাকচক্র
মিত্র, চারুচন্দ্র—আক্কেল সেলামী
গঙ্গোপাধ্যায়, অবিনাশ—রুক্‌মারী
দেবী, অমলা—ভিখারিণী
বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ—বেজায় রগড়
,, ,, —সৎসঙ্গ

বন্দ্যোপাধ্যায়, মণিলাল—বাজীরাও
চট্টোপাধ্যায়, হরিপদ—অন্নপূর্ণা
,, ,, —রুগড়
,, ,, —তারা
রায়, সুরেন্দ্রনাথ—তক্তে তাউস্
দেবী, জ্ঞানদানন্দিনী—সাত ভাই চম্পা

১৯১২

বসু, অমৃতলাল—খাস দখল
ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ—ডাকঘর
ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ—মালিনী
,, —বিদায়-অভিশাপ
,, —অচলায়তন
রায়, দ্বিজেন্দ্রলাল—পরপারে
,, —আনন্দবিদায়
বিদ্যাবিনোদ, ক্ষীরোদপ্রসাদ—মিডিয়া
,, ,, —খাঁজাহান
মিত্র, অতুলকৃষ্ণ—প্রাণের টান
,, —মোহিনী মায়া
,, —আসল ও নকল
ঘোষ, গিরিশচন্দ্র—গৃহলক্ষ্মী
মুখোপাধ্যায়, হরিসাধন—আকবরের স্বপ্ন
বন্দ্যোপাধ্যায়, অবিনাশ—পরিণাম
রায়, হারাধন—যোগমায়া
রায় চৌধুরী, দেবকুমার—দেবদূত
ঘোষ, যামিনীচন্দ্র—বেল্লিক বুড়ো
বসু, মনোমোহন—রূপকথা
রায়, মথুরানাথ—কুলীনকুমার
বাগ্‌চি, দেবকণ্ঠ—উজ্জলে মধুরে
চট্টোপাধ্যায়, হরিপদ—জয়দেব
,, —চাণক্য
,, —অলর্ক
বন্দ্যোপাধ্যায়, মণিলাল—রাণী মীনাবতী

১৯১৩

বসু, অমৃতলাল—নবযৌবন
বিদ্যাবিনোদ, ক্ষীরোদপ্রসাদ—ভীষ্ম
,, ,, —রূপের ডালি
দত্ত, অমরেন্দ্রনাথ—প্রেমের জেপলিন
,, সত্যেন্দ্রনাথ—রঙ্গমল্লী
বন্দ্যোপাধ্যায়, অশ্বিনীকুমার—প্রেম-পারাবার
,, বিজয়বসন্ত—সমাধি
গোস্বামী, মনোমোহন—ধর্ম্মবিপ্লব
দেবী, সরলাবালা—পরিণাম
বসু, হরনাথ—পল্লীর পরিণাম
চট্টোপাধ্যায়, হরিপদ—বিদুর
সর্বাধিকারী, নগেন্দ্রপ্রসাদ—ঝঞ্ঝা
রায়চৌধুরী, প্রমথনাথ—ভাগ্যচক্র

১৯১৪

রায়, দ্বিজেন্দ্রলাল—ভীষ্ম
বিদ্যাবিনোদ, ক্ষীরোদপ্রসাদ—নিয়তি
মুখোপাধ্যায়, অপরেশচন্দ্র—রঙ্গিলা
দত্ত, হারাধন—যযাতি
বাগ্‌চি, দেবকণ্ঠ—হেস্ত নেস্ত
রায়, হারাধন—রাম অবতার
বন্দ্যোপাধ্যায়, মণিলাল—অহল্যাবাঈ
মুখোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন—রূমেলা
রায়, অক্ষয়কুমার—নাদির শা
দেবী, অমলা—শক্তি
বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ—ক্ষত্রবীর
ভট্টাচার্য, প্রমথনাথ—ক্লিওপেট্রা
চট্টোপাধ্যায়, হরিপদ—ব্রহ্মতেজ
,, —নীলকণ্ঠ
বন্দ্যোপাধ্যায়, রামলাল—মায়াপুরী
রায়, মনোমোহন—রিজিয়া

১৯১৫

রায়, দ্বিজেন্দ্রলাল—সিংহল বিজয়
বিদ্যাবিনোদ ক্ষীরোদপ্রসাদ—বাদশাজাদী
" " —আহেরিয়া
মুখোপাধ্যায়, অপরেশচন্দ্র—আহুতি
" " —শুভদৃষ্টি
চট্টোপাধ্যায, হরিপদ——বাণী জয়মতী
কুণ্ডু, কৃষ্ণচন্দ্র—ক্লিওপেট্রা
চৌধুরী, পশুপতি—শ্মশান
চট্টোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র—ধর্মপথ
মজুমদার, বিজয়চন্দ্র—সংশোধন
বাগ চি, দেবকণ্ঠ—হুলুস্থুল
চট্টোপাধ্যায, দেবেন্দ্রনাথ—রাজা বৈদ্যনাথ
" নিতাইপদ—শ্মশানে মিলন
ঘোষ, শৈলেন্দ্রনাথ—কপিলের তেজ
মিত্র, অক্ষয়কুমার—মরণে বরণ
দাসগুপ্ত, বঙ্কিমচন্দ্র—জহর যজ্ঞ
দেবী, দুলভবালা—কমলা-হরণ
চট্টোপাধ্যায়, মৃণালচন্দ্র—মানে মানে
বন্দ্যোপাধ্যায, নির্মলশিব—বীরবাজা
" মৃণালচন্দ্র—শ্যামাসুন্দর
রায়, প্রভাতচন্দ্র—শ্বেতপদ্ম
রায়চৌধুরী, প্রমথনাথ—হামির
বন্দ্যোপাধ্যায, সুরেন্দ্রনাথ—শের শা
রায়, সুরেন্দ্রনারায়ণ—রূপের ফাঁদ
বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ—সাইন অব দি ক্রস্
" " —সওদাগর
" " —গোঁসাইজি
সরকার, বিপিনচন্দ্র—একোদ্দিষ্ট প্রহসন
মুখোপাধ্যায়, দাশরথি—কণ্ঠহার
বসু, যোগীন্দ্রনাথ—দেববালা
চৌধুরী, কালীপ্রসন্ন—ব্রতভঙ্গ
নন্দী, ক্ষিতীশচন্দ্র—মুক্তি
কুণ্ডু, কৃষ্ণচন্দ্র—বাতভুপুরে
ভট্টশালী, নলিনীকান্ত—বীরবিক্রম
বন্দ্যোপাধ্যায়, কেশবচন্দ্র—জড়ভরত
" মণিলাল—মাধবরাও
" " —ব্রতউদ্‌যাপন

১৯১৬

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ—ফাল্গুনী
রায, দ্বিজেন্দ্রলাল—বঙ্গনারী
বিদ্যাবিনোদ, ক্ষীরোদপ্রসাদ—রামানুজ
মুখোপাধ্যায়, অপরেশ—রামানুজ
বসু, হরনাথ—ভক্ত কবীর
বসু, মনোজমোহন—সোনায সোহাগা
রায়চৌধুরী, প্রমথনাথ—আক্কেল সেলামী
মুখোপাধ্যায, সৌরীন্দ্রমোহন—হাতের পাঁচ
রায সুরেন্দ্রনাথ—মুকুরে মুস্কিল
বসু রায, নিশিকান্ত—বাপ্পা রাও
মিত্র, শৈলেন্দ্রনাথ—অভয মাষ্টার
দাশগুপ্ত, সরযূবালা—দেবোত্তর বিশ্বনাট্য
মল্লিক, অপূর্বকুমার—রূপসী
রায, ভোলানাথ—কুবলাশ্ব
রক্ষিত হারাণচন্দ্র—জড়ভরত
ঘোষ, মতিলাল—ধ্রুব
বসু, নারায়ণচন্দ্র—হামির
বন্দ্যোপাধ্যায, নির্মলশিব—চোর বা বাহাদুর
দত্ত শশধর—পূরুত দাদা
বন্দ্যোপাধ্যায, সুরেন্দ্রনাথ—মোগল-পাঠান
" মণিলাল—বারাণসী
" হরিপদ—মান
চট্টোপাধ্যায়, পাঁচকড়ি—বিয়ের বাজার
সতীন্দ্রনাথ—যূথিকা
দাসগুপ্ত, বরদাপ্রসন্ন—প্রেমের তুফান
গোস্বামী, মনোমোহন—সাধনা

১৯১৭

বিদ্যাবিনোদ, ক্ষীরোদপ্রসাদ—বঙ্গে রাঠোর
দেবী, স্বর্ণকুমারী—নিবেদিতা
ভট্টাচার্য, অহিভূষণ—উত্তরা-পরিণয়
চট্টোপাধ্যায়, হরিপদ—রামনির্বাসন
পাল, যতীন্দ্রনাথ—একে আর
ঘোষ, মতিলাল—বৃন্দাবন বিহার
,, —পরশুরাম
চট্টোপাধ্যায়, পাঁচকড়ি—বিয়েরে নজর
বন্দ্যোপাধ্যায়, অভয়াচরণ—মোহন মাধুরী
,, নির্মলশিব—রাতকানা
রায়, অতুলানন্দ—পাণিপথ
দাশগুপ্ত, বরদাপ্রসন্ন—মতির মালা

১৯১৮

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ—গুরু
বিদ্যাবিনোদ, ক্ষীরোদপ্রসাদ—কিন্নরী
দত্ত, অমরেন্দ্রনাথ—কিস্‌মিস্‌
মুখোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন—শেষ বেশ
রায়চৌধুরী, প্রমথনাথ—চিতোরোদ্ধার
,, —জয়-পরাজয়
গঙ্গোপাধ্যায়, অবিনাশ—চাঁদে চাঁদে
বাগ চি, দেবকণ্ঠ—ছবির বাজার
বসু রায়, নিশিকান্ত—দেবলা দেবী
চট্টোপাধ্যায়, হরিপদ—শ্রীগৌরাঙ্গ
পাল, যতীন্দ্রনাথ—রং বাহার

১৯১৯

মুখোপাধ্যায়, অপরেশচন্দ্র—উর্বশী
—দুমুখো সাপ
গুপ্ত, মণীন্দ্রকৃষ্ণ—কনোজকুমারী বা সংযুক্তা
চট্টোপাধ্যায়, পাঁচকড়ি—পরদেশী
বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ—কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ
,, ভূপেন্দ্রনাথ—বিদ্যাধরী
,, নির্মলশিব—মুখের মত
দাশগুপ্ত, বরদাপ্রসন্ন—মিসবকুমারী
গোস্বামী, মনোমোহন—বিধির বিধান
সরকার, গুরুদাস—বিভ্রাট

১৯২০

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ—অরূপ রতন
মুখোপাধ্যায়, অপরেশচন্দ্র—রাখীবন্ধন
,, —ছিন্নহার
গঙ্গোপাধ্যায়, অবিনাশচন্দ্র—ওলোট পালোট
চট্টোপাধ্যায়, হরিপদ—মেঘনাদ
রায়, হেমেন্দ্রকুমার—প্রেমের প্রেমারা
মুখোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন—পঞ্চশর
বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ—হিন্দুবীর
দেবী, অনুরূপা—বিদ্যারণ্য
বসু, দেবেন্দ্রনাথ—কুহকী
গুপ্ত, জ্ঞানেন্দ্রনাথ—মনীষা
চট্টোপাধ্যায়, মহেন্দ্রনাথ—নব-নারায়ণ
মুখোপাধ্যায়, রাধাকমল—নিদ্রিত নারায়ণ
মল্লিক, কুমুদরঞ্জন—দ্বারাবতী
চট্টোপাধ্যায়, হরিপদ—ক্ষণা দেবী
বসু, মনোজমোহন—রেশমী রুমাল

১৯২১

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ—ঋণশোধ
বিদ্যাবিনোদ, ক্ষীরোদপ্রসাদ—মন্দাকিনী
,, —আলমগীর
মুখোপাধ্যায় অপরেশচন্দ্র—অযোধ্যার বেগম
বসু মল্লিক, অতুলকৃষ্ণ—সমরাভিষেক
দাশ, দীনেশরঞ্জন—উতঙ্ক
বন্দোপাধ্যায়, অতুলকৃষ্ণ—পাগলের হাট
দাশগুপ্ত, বঙ্কিমচন্দ্র—চিতোর গৌরব
বন্দোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ—সেকেন্দার শাহ
,, —বৈবাহিক
ঘোষজায়া, শৈলবালা—মোহের প্রায়শ্চিত্ত
বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ—কেলোর কীর্তি

বসু, মনোজমোহন—যুগাবতার
সরকার, শৈলেন্দ্রনাথ—নসিরুদ্দীন
চট্টোপাধ্যায়, হরিপদ—জয়লক্ষ্মী

১৯২২

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ—মুক্তধারা
বিদ্যাবিনোদ, ক্ষীরোদপ্রসাদ—রত্নেশ্বরের মন্দিরে
মুখোপাধ্যায়, অপরেশচন্দ্র—অপ্সরা
„ —সুদামা
বসু, নিশিকান্ত—বঙ্গে বর্গী
চট্টোপাধ্যায়, পাঁচকড়ি—আজব গলৎ
রায়, সুরেন্দ্রনাথ—প্রাণের টান
দাশগুপ্ত, বরদাপ্রসন্ন—নাদির শাহ
শেঠ, হরিহর—প্রতিভা
দাশগুপ্ত, বঙ্কিমচন্দ্র—নদের পাগল
বন্দ্যোপাধ্যায়, ভুপেন্দ্রনাথ—পেলারামের স্বাদেশিকতা
„ „ —ফুলশর
„ নির্মলশিব—নবাবী আমল
গঙ্গোপাধ্যায়, মণিলাল—মুক্তার মুক্তি
চট্টোপাধ্যায়, হরিপদ—ভক্তের ভগবান

১৯২৩

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ—বসন্ত
বিদ্যাবিনোদ, ক্ষীরোদপ্রসাদ—বিদুরথ
মুখোপাধ্যায়, অপরেশচন্দ্র—কর্ণার্জুন
দেবী, অনুরূপা—কুমারিল ভট্ট
চট্টোপাধ্যায়, হরিপদ—সংহার স্বয়ংবর
দাশগুপ্ত, বরদাপ্রসন্ন—রকমারি
বসু, হরনাথ—চক্রে চাকী
সেনগুপ্ত, নরেশচন্দ্র—আনন্দ-মন্দির
রায়, মন্মথ—মুক্তির ডাক
রায়, মনোমোহন—মালবের বাণী
বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ—আলেকজাণ্ডার

১৯২৪

মুখোপাধ্যায়, অপরেশচন্দ্র—ইরাণের রাণী
„ —বন্দিনী
চৌধুরী, যোগেশচন্দ্র—সীতা
বসুরায়, নিশিকান্ত—ললিতাদিত্য
বসু, প্রফুল্লকুমার—কাঞ্চনমালা
„ শ্রীশচন্দ্র—সন্দিগ্ধা
রায়চৌধুরী, প্রমথনাথ—দিল্লী অধিকার
রাহা, সুধীন্দ্রনাথ—মহারাষ্ট্র
বন্দ্যোপাধ্যায় ভুপেন্দ্রনাথ—জোর বরাত
„ নির্মলশিব—রূপকুমারী

১৯২৫

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ—গৃহপ্রবেশ
বিদ্যাবিনোদ, ক্ষীরোদপ্রসাদ—গোলকুণ্ডা
ঘোষ, মহাতাপচন্দ্র—আত্মদর্শন
বন্দ্যোপাধ্যায়, ভুপেন্দ্রনাথ—কৃতান্তের বঙ্গদর্শন
সেনগুপ্ত, নরেশচন্দ্র—ঠাকুর মেলা
চট্টোপাধ্যায়, পাঁচকড়ি—রাখীবন্ধন
বসু, হরনাথ—ভ্যালুপেএবেল

১৯২৬

বসু, অমৃতলাল—ব্যাপিকা-বিদায়
„ —বন্দেমাতরম্
ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ—চিরকুমার সভা
„ —শোধবোধ
„ —নটীর পূজা
„ —ঋতু-উৎসব
„ —রক্তকরবী
বিদ্যাবিনোদ, ক্ষীরোদপ্রসাদ—জয়শ্রী
„ —রাধাকৃষ্ণ
„ —নর-নারায়ণ
মুখোপাধ্যায়, অপরেশচন্দ্র—শ্রীকৃষ্ণ
„ —চণ্ডীদাস

সেনগুপ্ত, নরেশচন্দ্র—ঋষির মেয়ে
দাশগুপ্ত, বরদাপ্রসন্ন—শ্রীদুর্গা
চট্টোপাধ্যায়, পাঁচকড়ি—জয়মাল্য
মুখোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন—লাখটাকা
,, ,, —নারীরাজ্যে
বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ—বাঙ্গালী
,, —যুগমাহাত্ম্য
,, চারু—জয়শ্রী

১৯২৭

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ—ঋতুরঙ্গ
মুখোপাধ্যায়, অপরেশচন্দ্র—শ্রীরামচন্দ্র
,, —মগের মুলুক
,, —পুষ্পাদিত্য
বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ—ডাবি টিকিট
চট্টোপাধ্যায়, হরিপদ—তুলসীদাস
রায়, মন্মথ—চাঁদ সদাগব
চট্টোপাধ্যায়, পাঁচকড়ি—শম্বরাসুব
সরকার, শৈলেন্দ্রনাথ—গৌরাঙ্গলীলা
চট্টোপাধ্যায়, পাঁচকড়ি—লয়লীমজনু
দাশগুপ্ত, ববদাপ্রসন্ন—নর্তকী

১৯২৮

বসু, অমৃতলাল—যাজ্ঞসেনী
ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ—শেষ রক্ষা
মুখোপাধ্যায়, অপরেশচন্দ্র—ফুল্লরা
চৌধুরী, যোগেশচন্দ্র—দিগ্বিজয়ী
রায়, মন্মথ—দেবাসুর
চট্টোপাধ্যায়, বসন্তকুমার—মীরাবাঈ
? —সত্যের সন্ধান
বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ—দাতা কর্ণ
দাশগুপ্ত, বঙ্কিম—রক্তের লেখা
চট্টোপাধ্যায়, জলধর—ত্রিমূর্তি

১৯২৯

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ—পরিত্রাণ
,, —তপতী
দত্ত, সত্যেন্দ্রনাথ—ধুপের ধোঁয়ায়
দেবী, হেমলতা—শ্রীনিবাসের ভিটা
নিয়োগী, অখিল—বাপ্পাদিত্য
দাশগুপ্ত, বরদাপ্রসন্ন—কর্মবীর
সেনগুপ্ত, নরেশচন্দ্র—নারায়ণী
,, শচীন্দ্রনাথ—রক্তকমল
দাশগুপ্ত, বরদাপ্রসন্ন—সুভদ্রা
চট্টোপাধ্যায়, জলধর—প্রাণের দাবী
রায়, মন্মথ—শ্রীবৎস
চট্টোপাধ্যায়, পাচকড়ি—মানিনী
,, ,, —সৎমা
,, ,, —সৌমিত্রী
নিয়োগী, অখিল—মহাপূজা
দাশগুপ্ত, বরদাপ্রসন্ন—সবুজ সুধা
বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ—শঙ্খধ্বনি
,, —শাঁখের করাত
ঘোষ, সিদ্ধেশ্বর—পতিতা
রাহা, সুধীন্দ্রনাথ—সমুদ্রগুপ্ত
মুখোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্র—হারানো রতন
বন্দ্যোপাধ্যায়, মণিলাল—জাহাঙ্গীর

১৯৩০

মুখোপাধ্যায়, অপরেশচন্দ্র—মন্ত্রশক্তি
,, —শকুন্তলা
দেবী, স্বর্ণকুমারী—দিবা কমল
রায়, মন্মথ—মহুয়া
ঘটক, সতীশচন্দ্র—হাটে হাঁড়ি
,, ,, —অগ্নিশিখা
বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র—মুক্তির পথে
চট্টোপাধ্যায়, জলধর—রাঙা রাখী

সবকার, শৈলেন্দ্রনাথ—চাটনী
ঘোষ, মন্মথনাথ—ত্রিবেণী
চট্টোপাধ্যায়, পাঁচকড়ি—চাঁদ সওদাগর
,, —মা
বাহা, সুধীন্দ্রনাথ—মানসী
ইস্‌লাম, নজরুল—ঝিলিমিলি
সেনগুপ্ত, শচীন্দ্রনাথ—গৈরিক পতাকা
বায, মন্মথ—কারাগার

১৯৩১

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ—নবীন
,, —শাপমোচন
মুখোপাধ্যায়, অপবেশচন্দ্র—মুক্তি
,, —শ্রীগৌরাঙ্গ
চৌধুবী, যোগেশচন্দ্র—শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া
বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ—দেশের ডাক
,, —ধরপাকড়
দাশগুপ্ত, ববদাপ্রসন্ন—একলব্য
বায, হেমেন্দ্রকুমাব—ধ্রুবতারা
,, মন্মথ—সাবিত্রী
,, ,, ,, একাঙ্কিকা
মুখোপাধ্যায, সৌরীন্দ্রমোহন—স্বয়ংবরা
ঘটক, সতীশচন্দ্র—পদধুলি
ইস্‌লাম, নজরুল—আলেয়া
সেন, নিশিকান্ত—কেয়াফুল
সেনগুপ্ত, শচীন্দ্রনাথ—ঝড়ের রাতে

১৯৩২

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ—কালের যাত্রা
মুখোপাধ্যায়, অপরেশচন্দ্র—পোষ্যপুত্র
,, —বিদ্রোহিণী
মৈত্র, রবীন্দ্রনাথ—মান্‌ময়ী গার্লস্‌ স্কুল
চট্টোপাধ্যায়, জলধর—আঁধারে আলো
,, —অসবর্ণা
সেনগুপ্ত, শচীন্দ্রনাথ—সতীতীর্থ
নন্দী, শ্রীশচন্দ্র—মনপ্যাথি
দাশগুপ্ত, ববদাপ্রসন্ন—দেবযানী
বায়, দিলীপকুমাব—আপদ ও জলাতঙ্ক

১৯৩৩

ঠাকুব, ববীন্দ্রনাথ—চণ্ডালিকা
,, —তাসেব দেশ
,, —বাঁশবী
দাশগুপ্ত, ববদাপ্রসন্ন—বনের পাখী
সেনগুপ্ত, নবেশচন্দ্র—নাবাযণী
গুপ্ত, সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ—মহাপ্রস্থান
মুখোপাধ্যায, অসমঞ্জ—জগদীশেব দিগদারী
চৌধুবী, যোগেশচন্দ্র—মহানিশা
চট্টোপাধ্যায, জলধব—মন্দির প্রবেশ
,, —শক্তির মন্ত্র
সেনগুপ্ত, শচীন্দ্রনাথ—জননী
দেবী, অনুরূপা—নাট্যচতুষ্টয
মজুমদার, প্রবোধকুমাব—শুভযাত্রা

১৯৩৪

ঠাকুব, ববীন্দ্রনাথ—শ্রাবণ-গাথা
বায, মন্মথ—অশোক
চট্টোপাধ্যায, পাঁচকড়ি—দরদী
চৌধুবী, যোগেশচন্দ্র—পূর্ণিমা-মিলন
,, ,, —পতিব্রতা
,, ,, —বাংলার মেয়ে
গুপ্ত, ভূপেন্দ্রনাথ—কষ্টিপাথর
বন্দ্যোপাধ্যায, মণিলাল—মহামানব
ভট্টাচার্য, মনোরঞ্জন—চক্রব্যূহ
বাহা, সুধীন্দ্রনাথ—মারাঠা মোগল
বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ—সরমা
সেনগুপ্ত, শচীন্দ্রনাথ—দশেব দাবী
রায়, শৈলেন—কাজরী
হালদার, সুধাংশুকুমার—অভিনব

১৯৩৫

বিশী, প্রমথনাথ—ঋণং কৃত্বা
চট্টোপাধ্যায়, বসন্তকুমার—অবশেষে
বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ—বৈকুণ্ঠে বাজি
 ,, —শিবশক্তি
ভট্টাচার্য, মনোরঞ্জন—ব্রতচারিণী
চট্টোপাধ্যায়, জলধর—আত্মাহুতি
চৌধুরী, যোগেশচন্দ্র—পথের সাথী
রায়, মন্মথ—খনা
বসু রায়, নিশিকান্ত—ধর্ষিতা
ভট্টাচার্য, প্রসাদ—মানময়ী বয়েজ স্কুল
রায়, মন্মথ—কাজলরেখা
মিত্র, প্রভাময়ী—দেউল
গুপ্ত, সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ—শ্যামা
রাহা, সুধীন্দ্রনাথ—বীর্যশুল্কা
রায়, সুশীল—মানময়ী গার্লস কলেজ

১৯৩৬

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ—নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা
চৌধুরী, যোগেশচন্দ্র—নন্দরাণীর সংসার
বিশী, প্রমথনাথ—ঘৃতং পিবেৎ
চট্টোপাধ্যায়, জলধর—রীতিমত নাটক
বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মলশিব—মুখচোরা
চট্টোপাধ্যায়, পাঁচকড়ি—দময়ন্তী নাটক
 ,, —রূপসী ইরাণী
গোস্বামী, রমেশচন্দ্র—কেদার রায়
হালদার, সুধাংশুকুমার—একাঙ্কিকা
রাহা, সুধীন্দ্রনাথ—শিবার্জুন
 ,, ,, —সর্বহারা
 ,, ,, —বভ্রুবাহন
বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ—ব্রহ্মতেজ
চট্টোপাধ্যায়, বসন্তকুমার—সতী

১৯৩৭

রায়, মন্মথ—সতী
চট্টোপাধ্যায়, পাঁচকড়ি—রেবা
গুপ্ত, মহেন্দ্রনাথ—গয়াতীর্থ
সেনগুপ্ত, নন্দগোপাল—বনটিয়া
 ,, শচীন্দ্রনাথ—প্রলয়
বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু—ডিটেক্‌টিভ
রাহা, বটকৃষ্ণ—পাকচক্র
রায়, মন্মথ—বিদ্যুৎপর্ণা
বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু—বন্ধু

১৯৩৮

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ—চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্য
বিশী, প্রমথনাথ—মৌচাকে ঢিল
রায়, মন্মথ—পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত
 ,, ,, —রাজনটী
বক্সী, অয়স্কান্ত—অভিসারিকা
গোস্বামী, রমেশচন্দ্র—বিদ্যাপতি
সেনগুপ্ত, শচীন্দ্রনাথ—স্বামি-স্ত্রী
বনফুল—মন্ত্রমুগ্ধ
বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু—লালপাঞ্জা
রাহা, সুধীন্দ্রনাথ—বিষ্ণুমায়া
চট্টোপাধ্যায়, বসন্তকুমার—সাবিত্রী
 ,, জলধর—নারীধর্ম
কর, যামিনীমোহন—শান্তিপুরে অশান্তি
গুপ্ত, মহেন্দ্রনাথ—চক্রধারী
সেনগুপ্ত, শচীন্দ্রনাথ—সিরাজদ্দৌল্লা
রায় চৌধুরী, শুভব্রত—মৈত্রেয়ী
মিত্র, সুবোধচন্দ্র—সত্যপ্রিয়া
বাচস্পতি, জ্যোতি—সমাজ
রাহা, সুধীন্দ্রনাথ—বাংলার বোমা

১৯৩৯

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ—শ্যামা নৃত্যনাট্য
বন্দ্যোপাধ্যায় মণিলাল—বাসুদেব

রায়, মন্মথ—রূপকথা
সেনগুপ্ত, শচীন্দ্রনাথ—তটিনীর বিচার
বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ—দুর্গাশ্রীহরি
গুপ্ত, জ্ঞানেন্দ্রনাথ—পাষাণ-প্রতিমা
,, মহেন্দ্রনাথ—অভিযান
,, ,, —সোনার বাংলা
বক্সী, অয়স্কান্ত—ডক্টর মিস্ কুমুদ
চৌধুরী, যোগেশচন্দ্র—মহামায়ার চর
,, ,, —মাকড়সার জাল
রায়, মন্মথ—ছোটদের নাট্যমঞ্চ
চট্টোপাধ্যায়, পাঁচকড়ি—সরমা
ভট্টাচার্য, বিধায়ক—মাটির ঘর
,, ,, —কুহকিনী
কর, যামিনীমোহন—বকধার্মিক
চট্টোপাধ্যায়, পাঁচকড়ি—শিবশক্তি
রাহা, সুধীন্দ্রনাথ—জননী জন্মভূমি

১৯৪০

চৌধুরী, যোগেশচন্দ্র—পরিণীতা
বিশী, প্রমথনাথ—পরিহাস বিজল্পিতম্
চট্টোপাধ্যায়, জলধর—পি. ডব্লিউ ডি.
গুপ্ত, মহেন্দ্রনাথ—গঙ্গাবতরণ
,, ,, —পাঞ্জাব-কেশরী রঞ্জিত সিংহ
,, ,, —সতী
রাহা, সুধীন্দ্রনাথ—রণদাপ্রসাদ
ভট্টাচার্য, বিধায়ক—বিশ বছর আগে
কর, যামিনীমোহন—চূণকাম
সেনগুপ্ত, শচীন্দ্রনাথ—সংগ্রাম ও শান্তি
ঘোষ, বিমলচন্দ্র—মীরা
রায় চৌধুরী, দেবীপ্রসাদ—শিল্পী
বন্দ্যোপাধ্যায়, মণিলাল—অন্নপূর্ণা
চট্টোপাধ্যায়, জলধর—সিঁথির সিঁদুর
কর, যামিনীমোহন—বন্ধুর বিয়ে
,, —মিটমাট

সেনগুপ্ত, শচীন্দ্রনাথ—হরপার্বতী
,, ,, —নার্সিং হোম
চক্রবর্তী, সুরেশচন্দ্র—সত্যপথ
সেন, অনাথগোপাল—বাজে মেয়ে
ভট্টাচার্য, আশুতোষ—আগামী কাল
,, বিধায়ক —মালা রায়

১৯৪১

ভট্টাচার্য, বিধায়ক—বন্নদীপ
গুপ্ত, মহেন্দ্রলাল—উষাহরণ
বক্সী, অয়স্কান্ত—বিংশ সাল
চট্টোপাধ্যায়, বসন্তকুমার—চ্যারিটি শো
রায়, বটকৃষ্ণ—পঙ্কমাঙ্ক
কর, যামিনীমোহন—প্রহেলিকা
,, ,, —কমলে কামিনী
বন্দ্যোপাধ্যায়, নিত্যনারায়ণ—ভুল
,, —দৈবাৎ
ঠাকুর, প্রবোধেন্দুনাথ—অশান্ত
সেনগুপ্ত, শচীন্দ্রনাথ—ভারতবর্ষ
কাব্যশাস্ত্রী, ভোলানাথ—বৃত্রসংহার
ভট্টাচার্য, বিধায়ক—রক্তের ডাক
চট্টোপাধ্যায়, জলধর—কবি কালিদাস
,, ,, —হাউস ফুল

১৯৪২

বিশী, প্রমথনাথ—ডিনামাইট
ভট্টাচার্য, বিধায়ক—তুমি আর আমি
,, ,, —চিরন্তনী
গুপ্ত, মহেন্দ্রনাথ—রাণী ভবানী
চট্টোপাধ্যায়, পাঁচকড়ি—রাখীবন্ধন
গুপ্ত, মহেন্দ্রনাথ—অলকানন্দা
বনফুল—বিদ্যাসাগর
,,—মাইকেল

কৃষ্ণদাস—খুনে
,, —হোটেল
বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর—দুই পুরুষ

১৯৪৩

বিশী, প্রমথনাথ—গভর্ণমেণ্ট ইন্‌স্পেক্টর
বক্সী, অয়স্কান্ত—ভোলা মাষ্টার
গুপ্ত, মহেন্দ্রনাথ—রাণী দুর্গাবতী
,, ,, —মহারাজ নন্দকুমার
গোস্বামী, পরিমল—দুষ্মন্তের বিচার
সেনগুপ্ত, শচীন্দ্রনাথ—মাটির মায়া
,, ,, —ধাত্রীপান্না
বক্সী, অয়স্কান্ত—খুনী

১৯৪৪

বসু, মনোজ—নূতন প্রভাত
গুপ্ত, মহেন্দ্রনাথ—টিপু সুলতান
রায় চৌধুরী, সরোজকুমার—হালদার সাহেব
,, ,, —উদ্বোধন
বনফুল—দশভাগ
মুখোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ—বিশেষ রজনী
ভট্টাচার্য, বিজন—নবান্ন
সেনগুপ্ত, শচীন্দ্রনাথ—রাষ্ট্রবিপ্লব

১৯৪৫

চট্টোপাধ্যায়, জলধর—রথের ঠাকুর
গুপ্ত, মহেন্দ্রনাথ—মঞ্চে ও নেপথ্যে
বন্দ্যোপাধ্যায়, নিত্যনারায়ণ—রক্ততিলক
সেন, রণজিৎকুমার—সব্যসাচী
বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর—চকমকি
মুখোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনারায়ণ—পলাশী
ঘোষ, ক্ষেত্রপালদাস—মায়ামৃগ
চন্দ্র, প্রতাপচন্দ্র—আজব দেশ
,, ,, —সহরতলী

১৯৪৬

দাশগুপ্ত, শশিভূষণ—রাজকন্যার ঝাঁপি
,, অজয়—পলাশীর পরে
বনফুল—সিনেমার গল্প
ভট্টাচার্য, বিধায়ক—তেরশো পঞ্চাশ
,, মনোরঞ্জন—বন্দনার বিয়ে
সেনগুপ্ত, নন্দগোপাল—বসন্তের বাণী
সান্যাল, প্রবোধকুমার—মল্লিকা
শৈলেশ বিশী—নেতাজী
রাহা, সুধীন্দ্রনাথ—মাতৃপূজা
সেনগুপ্ত, শচীন্দ্রনাথ—সিংহাসন
মুখোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ—নন্দিনী

১৯৪৭

লাহিড়ী, তুলসীচরণ—দুঃখীর ইমান্
বিশী, প্রমথনাথ—পারমিট
মুখোপাধ্যায়, তারক—রামপ্রসাদ
সেনগুপ্ত, নন্দগোপাল—যৌবন জলতরঙ্গ
গুপ্ত, মহেন্দ্রনাথ—রায়গড়
,, ,, —শ্রীদুর্গা
ভট্টাচার্য, মনোরঞ্জন—দমাদম দামোদর

১৯৪৮

লাহিড়ী, তুলসীচরণ—পথিক
ঘোষ, কুমারেশ—ম্যানিয়া
সেনগুপ্ত, শচীন্দ্রনাথ—বাংলার প্রতাপ
ভট্টাচার্য, বিধায়ক—তাই তো
চট্টোপাধ্যায়, জলধর—থামাও রক্তপাত
বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু—যুগে যুগে
রাহা, সুধীন্দ্রনাথ—কালীয় দমন
,, ,, —সুবল মিলন
,, ,, —কলঙ্কভঞ্জন
,, ,, —রাই রাজা

ভট্টাচার্য, বিজন—জীয়ন কন্যা
গুপ্ত, মহেন্দ্রনাথ—হায়দর আলি

১৯৪৯

মুখোপাধ্যায়, জিতেন্দ্রনাথ—পরিচয়
ঠাকুর, শুভ—মায়ামৃগ
বন্দ্যোপাধ্যায়, মণিলাল—ঝান্সীর রাণী
রাহা, সুধীন্দ্রনাথ—গোলকুণ্ডা
চট্টোপাধ্যায়, শিবরাম—যখন তারা কথা বল্‌বে

১৯৫০

বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর—দ্বীপান্তর
লাহিড়ী, তুলসীচরণ—ছেঁড়া তার
দাশগুপ্ত, শশিভূষণ—দিনান্তের আগুন
রাহা, সুধীন্দ্রনাথ—বিক্রমাদিত্য
মুখোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ—শিল্পী
রায়, মন্মথ—কৃষাণ

১৯৫১

সেনগুপ্ত, শচীন্দ্রনাথ—তুষার কণা
ঘোষ, শরৎচন্দ্র—জাতিচ্যুত
বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর—বালাজি রাও
ভট্টাচার্য, ইন্দুমাধব—রাজা কৃষ্ণচন্দ্র
চক্রবর্তী, অজয়কুমার—মহাকবি
সেন, সলিল—নূতন ইহুদি

১৯৫২

বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধীরচন্দ্র—জিজাবাঈ
সেন, উৎপলেন্দু—সিন্ধুগৌরব
কাব্যশাস্ত্রী, ভোলানাথ—বামনাবতার
বসু, হরিপদ—ভুল
গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ—রামমোহন
আতর্থী, প্রেমাঙ্কুর—তথ্‌ত-এ-তাউস
চট্টোপাধ্যায়, জলধর—হরিশ্চন্দ্র
ভট্টাচার্য, অনিল ও বিধায়ক—সেই তিমিরে
দাশগুপ্ত, অজয়—তথ্‌ত-এ-তাউস
বন্দ্যোপাধ্যায়, ছবি—কেরাণীর জীবন
রায়, দিলীপকুমার—ভিখারিণী রাজকন্যা
সিংহ, সত্যেন্দ্র—মনোবৈজ্ঞানিক

১৯৫৩

চক্রবর্তী, সুকুমার - কি চাই
জানা, সত্যেন্দ্রনাথ—পনেরো আগষ্ট
দাস, পূর্ণচন্দ্র—অহিংসা
—নৌকা বিলাস
দে, ব্রজেন্দ্র কুমার—দাসীপুত্র
„ „ —গন্ধর্বের মেয়ে
ধর, বিশ্বেশ্বর—রাঠোর শিবাজী
ভট্টাচার্য, বিধায়ক—কা তব কান্তা
„ উমানাথ—চার্জ সীট
মুখোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ—গণশার বিয়ে
„ নিত্যগোপাল—হালখাতা
রায়, মন্মথ—জীবনটাই নাটক
„ —মহাভারতী
„ তরুণ—রূপকথা
„ কেদারলাল—বিচিত্র ভবন
লাহিড়ী, তুলসী—ছেঁড়া তার

১৯৫৪

গঙ্গোপাধ্যায়, অজিত—শকুন্তলা রায়
গুপ্ত, মহেন্দ্রনাথ—সারথী শ্রীকৃষ্ণ
চক্রবর্তী, শিবরাম—প্রাণকেষ্টার কাণ্ড
দাস, পূর্ণচন্দ্র—উত্তরা
দে, ব্রজেন্দ্রকুমার—গাঁয়ের মেয়ে
„ „ —প্রতিশোধ

পাল, বঙ্কিম —মেঘদূত
বসু, বরেন —নতুন ফৌজ
,, সুনীল —সংঘাত
বাগচী, আনন্দমোহন—ভেজা মাটি
ভট্টাচার্য, কৃষ্ণগোপাল—নারী কি শুধু স্বামীর
,, বিধায়ক—মাটির ঘর
,, ,, —পিতাপুত্র
,, ,, —ঝান্সীর রাণী
,, শশধর—মল্লিক্স মেমোরাণ্ডাম
মণ্ডল, প্রকাশচন্দ্র—পুনরুত্থান
মাইতি, জগদীশ—রূপের বিচার
মুখোপাধ্যায়, বিনয়কৃষ্ণ—প্রেমের সমাধি
রায় চৌধুরী, নন্দগোপাল—সম্রাট্ প্রহ্লাদ
শীল, কানাইলাল—চক্রী
সাহা, অবিনাশচন্দ্র—নবীন যাত্রী
সেন, পরেশ প্রসন্ন—তপস্বিনী

১৯৫৫

গুপ্ত, নীহাররঞ্জন—উল্কা
—পদ্মিনী
—রাত্রিশেষ
চক্রবর্তী, হরিপদ—ছত্রপতি শিবাজী
,, নন্দলাল—শরৎচন্দ্র
চট্টোপাধ্যায়, অমিতাভ—রঘু ডাকাত
,, জলধর—ধর্মদ্রোহী
,, সৌরীন্দ্রমোহন—ভাগ্যচক্র
চৌধুরী, পার্থপ্রতিম—সংঘাত
দত্ত, সুনীল—হরিপদ মাষ্টার
দাস, বঙ্কিমচন্দ্র—কালের বিচার
বসু, সুরেন্দ্রকুমার—লিখন
বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণ—স্মিতা
ভট্টাচার্য, বিধায়ক—যুগাবতার রামকৃষ্ণ
ভদ্র, শম্ভুনাথ—সাতটা থেকে দশটা
মুখোপাধ্যায়, বিভূতি—টন্‌সিল
,, বিনয়কৃষ্ণ—মায়ের ছেলে
মৈত্র, দধিচী—নতুন সূর্যোদয়

১৯৫৬

গঙ্গোপাধ্যায়, অজিত—নির্বোধ
গুহঠাকুরতা, ফুলরাণী—রাখী
ঘোষ, জ্যোতির্ময়— কলের গরু
,, সুধাংশু—সত্যের পথে
চট্টোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন—ভক্ত হরিদাস
চৌধুরী, প্রশান্ত—প্রত্যাবর্তন
দত্ত, সুনীল—জতুগৃহ
দাস, কালীপদ—চার শো বিশ
দে, বৈদ্যনাথ—আলো আঁধার
বসু, মনোজ—শেষ লগ্ন
,, ,, —বিলাস কুঞ্জ বোর্ডিং
,, বীরেশ্বর —বাক্‌সিদ্ধ
ভট্টাচার্য, বিধায়ক—মনোময়ী
—তের শ পঞ্চাশ
মিত্র, ধীরেন—মহানায়ক শশাঙ্ক
মুখোপাধ্যায়, বিনয়কৃষ্ণ—স্যমন্তক বা মণিচোর
মৈত্র, শীতাংশু—ঐতিহাসিক শ্যালক
রায়, অন্নদাশঙ্কর—চতুরালি
রায় চৌধুরী, নন্দগোপাল—চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন
শীল, কানাইলাল—রামরাজ্য
সরকার, সঞ্জীব—জয়ের পথে

১৯৫৭

গুপ্ত, নীহাররঞ্জন—চৌধুরী বাড়ী
ঘোষ, রেণুকারাণী—রেবার জন্মতিথি
,, সত্যচরণ—পথের মানুষ
চট্টোপাধ্যায়, রমেন্দ্রনাথ—কৃষ্ণকলি
চক্রবর্তী, বাসুদেব—আমার ছেলে
দত্ত, সুনীল—অঙ্কুর

দাস, শান্তশীল—বন্ধু
দে, ব্রজেন্দ্রকুমার—সবার দেবতা
নন্দী, গোপীনাথ—জনতার কোলাহল
বসু, রাম—নীলকান্ত
বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর—কালরাত্রি
বৈরাগী, ধনঞ্জয়—ধৃতরাষ্ট্র
ভট্টাচার্য, বিধায়ক—ক্ষুধা
মুখোপাধ্যায়, বিনয়কৃষ্ণ—জয়যাত্রা
রায়, দিলীপ—একটি নায়ক
,, মন্মথ—মরাহাতী লাখটাকা
,, বঙ্কুবেহারী—গোবিন্দদাস
সাহা রায়, রবিদাস—খুশির দেশে
সেন, সন্তোষ—এরাও মানুষ
,, সলিল—মৌচোর
,, গুপ্ত, শচীন—সবার উপরে মানুষ
বিশ্বাস, মনোরঞ্জন—কর্মখালি
রায়, কেদার লাল—কুন্তী-কর্ণ-কৃষ্ণা

১৯৫৮

গঙ্গোপাধ্যায়, অজিত—নচিকেতা
,, —থানা থেকে আসছি
,, উপেন্দ্রনাথ—উটরোগ
ঘোষাল, মণীন্দ্রনাথ—বিনোদিনী ক্রিম কোম্পানী
ঘোষ, চিত্তরঞ্জন—কন্যকা
,, নির্মলেন্দু—আশীর্বাদ
,, সরোজ—প্রিয়া
চট্টোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন—নাগকন্যা
,, অমিতাভ—দস্যুকন্যা
চন্দ্র, প্রতাপচন্দ্র—সরস নাটক
চৌধুরী, চিত্ত—মরবার আগে মরব না
দত্ত, উৎপল—পুতুল খেলা
,, অনিলবরণ—বন্যা
,, সুনীল—ত্রিনয়ন
দস্তিদার, লোচন—দুই মহল
দাশগুপ্ত, সাধনা প্রসাদ—ঘরের পার্লামেণ্ট
দে, ব্রজেন্দ্রকুমার—ধর্মের বলি
,, —কুরুক্ষেত্রের আগে
বন্দ্যোপাধ্যায় হরিদাস—জনরব
,, প্রভাতমোহন—রতী
, বি—আয়েসা
বসাক, জিতেন্দ্রনাথ—সম্রাট অশোক
বাগচী আনন্দমোহন—উষার আলো
বৈরাগী ধনঞ্জয়—রুপোলী চাঁদ
ভট্টাচার্য, উমানাথ—নীচের মহল
,, ,, —ঘূর্ণী
, সঞ্জয়—মহাকাব্য
মুখোপাধ্যায় অমরেন্দ্র—তিন সর্গ
রায় চৌধুরী নন্দগোপাল—ছদ্মবেশী
রায় সুরেশচন্দ্র—লঙ্কারণ
শংকর গিরি—শেষ সংলাপ
সেন সলিল—সন্ন্যাসী
লাহিড়ী, রমেন—অপরাজিত

১৯৫৯

গঙ্গোপাধ্যায় অজিত—আকাশবিহঙ্গী
গুপ্ত, দেবনারায়ণ—ডাকবাংলা
,, নীহাররঞ্জন—ময়ূর মহল
গোস্বামী, মদনমোহন—শতাব্দীর আশীর্বাদ
ঘোষ, জগৎপালক—জয়পরাজয়
,, মনোরঞ্জন—পরিবর্তন
দত্ত, উৎপল—ছায়ানট
ধর, পরেশ—শুধুছায়া
নন্দী, সোমেন্দ্রচন্দ্র—সকাল-সন্ধ্যার নাটক
বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু—বহ্নিপতঙ্গ
,, ছবি—চোর
,, শশাঙ্কশেখর—প্রেত মানব
বসাক, জিতেন্দ্রনাথ—সহধর্মিনী
ভট্টাচার্য, বিধায়ক—শুনে পুণ্যবান

ভট্টাচার্য বিশ্বনাথ—ভগবান বিজয়কৃষ্ণ
ভড়, গৌরচন্দ্র—কয়েদী
মুখোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ—টোপ ও চোপোর
,, বীরু—সংক্রান্তি
,, শান্তিরঞ্জন—জিজ্ঞাসা
মৈত্র, কিরণ—বারোঘণ্টা
রায়, মন্মথ—ফকিরের পাথর
,, —কোটিপতি নিরুদ্দেশ
,, চৌধুরী, নন্দগোপাল—ভারত সম্রাট
,, —অপরাধী
লাহিড়ী, তুলসী—লক্ষ্মীপ্রিয়ার সংসার
সত্যকাম—রাজনীতিশ্চ
সেন, মিহির—প্রবেশ নিষেধ
ঘোষ, মনোরঞ্জন—পরিবর্তন
মৈত্র, কিরণ—নাটক নয়

১৯৬০

খগরাজ—পিক্‌নিক
গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ—বারো ভূতে
গুহ নিয়োগী, শৈলেন—ফ্লু
চৌধুরী, প্রশান্ত—তেপান্তর
চট্টোপাধ্যায়, তুষার—চৌকিদার
দত্ত, অনিলবরণ—নীরবে নিভৃতে
,, উৎপল—অঙ্গার
ধর, পরেশ—ডানাভাঙা পাখী
বন্দ্যোপাধ্যায়, ছবি—স্ট্রিট্‌বেগার
মুখোপাধ্যায়, সুনীতকুমার—সাত মহলা বাড়ী
বৈরাগী, ধনঞ্জয়—রজনী গন্ধা
,, —এক পেয়ালা কফি
,, —আর হবে না দেরী
ভট্টাচার্য, বিধায়ক—কান্না হাসির পালা
,, বিজন—গোত্রান্তর
,, উমানাথ—জল
,, শচীন—মরুর কান্না
মিত্র, গজেন্দ্রকুমার—বিধিলিপি
মৈত্র, কিরণ—যা হচ্ছে তাই
মজুমদার, লীলা—গাওনা
রায়, বিমল—অসমাপ্ত
,, মন্মথ—অমৃত অতীত
সেন, অশোক—ওয়েটিং ফর গোডো
সেন, রঞ্জিত—অন্তরঙ্গ
,, সলিল—দিশারী
বৈরাগী, ধনঞ্জয়—আর হবে না দেরী
বিশ্বাস, মনোরঞ্জন—আমার মাটি
চৌধুরী, জ্ঞানেন্দ্রনাথ—নাট্যাঞ্জলি

পরিশিষ্ট—খ

নির্ঘণ্ট

[প্রান্তলিখিত সংখ্যাগুলি পৃষ্ঠা সংখ্যা বুঝিতে হইবে]

অ

আ

খ

গ

ঘ

চ

ছ

জ

ধ

ন

প

ফ

ভ

য

র

হ